আল্লামা মুফতি তাকি উসমানি

দরসে তিরমিযী

(প্রথম খণ্ড)

সম্পাদনা

আল্লামা আবদুল কুদ্দুস (দা.বা.)

মুহ্তামিম ও শাইখুল হাদীসঃ ঢাকা নগরীর ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী বিদ্যাপীঠ
জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ মাদরাসা
খলীফাঃ ভারত উপমহাদেশের স্বনামধন্য বুযুর্গ
আল্লামা আবরারুল হক সাহেব (রহ.) এবং
জামেয়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত, শাইখুল ইসলাম,
মাওলানা শাহ্ আহ্মদ শফী সাহেব (দা.বা.)

[একটি রুচিশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫০২৭৫৬৩, ০১৯১৩৬৮০০১০

প্রথম প্রকাশ ▢ মে ২০১১

দরসে তিরমিযী (প্রথম খণ্ড)

মূল ▢ আল্লামা মুফতি তাকি উসমানি
অনুবাদ ▢ মুহসিন আল জাবির
(মুহাদ্দিস- বাঘারপাড়া মুহিউসসুন্নাহ্ কওমী মাদরাসা যশোর;
লেখক ও গবেষক- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।)

প্রকাশক ▢ মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
আনোয়ার লাইব্রেরী, ১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISBN: 978-984-33-3159-5

মূল্য ▢ ৫০০.০০ টাকা

অর্পণ

মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.)
সরদারে দোজাহান-আখেরি নবী।
হে রাসুলে আরাবি!
তোমাকে অনেক বেশি ভালোবাসি।
তোমাকে স্বপ্নযোগে দেখার জন্য হৃদ
সবটুকু আকুতি।

বৈশিষ্ট্যাবলি

* দরসে তিরমিযীর সংগে পূর্ণ মিল রেখে ছাত্রবোধ অনুবাদ করা হয়েছে।
* ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য দেওয়া হয়েছে।
* ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য ভিন্ন শিরোনামে লেখা হয়েছে।
* দরসে তিরমিযী ভিন্ন শিরোনামে লেখা হয়েছে।
* পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে জটিল স্থানগুলোতে আপত্তি জবাব কিংবা প্রশ্নোত্তরে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে।
* হাদিসের নম্বর দেওয়া হয়েছে।

بأسمه تعالى

সম্পাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ! فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّمُسْلِمَةٍ؛ أَمَا بَعْدُ–

আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ মেহেরবানী যে, তিনি আমাদের জন্য দ্বীনের শিক্ষাকে অনেক সহজ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা এখন উলামায়ে কিরামের দ্বারা বাংলা ভাষার মাধ্যমেও দ্বীনের অনেক খেদমত নিচ্ছেন।

'তিরমিযী শরীফ' গ্রন্থখানা রচনা-কাল থেকেই অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ সমূহের সংগে সংগে তার অনন্যতাকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। হাদীসের অন্যসব গ্রন্থগুলোর মতো তারও রয়েছে আলাদা গুণ- আলাদা বৈশিষ্ট। আল্লাহর রহমতে সেই গুণ আর বৈশিষ্টগুলোর জোরেই হয়তো কিতাবখানা আমাদের দরসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাছাড়া সিহাহ্ সিত্তাহ্ গ্রন্থগুলোর একটিও এই 'তিরমিযী শরীফ'।

কিতাবখানার গুণ আর বৈশিষ্টে মুগ্ধ হয়েই হয়তো পাকিস্তানের বিখ্যাত আলেমে দ্বীন আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী সাহেব দা. বা. কিতাবখানার উপর লিখেছেন 'দরসে তিরমিযী'র মতো একটি অনন্য গ্রন্থ। গ্রন্থখানা ছাত্রদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাদরাসার ছাত্রদের অনেকেই উর্দু ভাষায় দূর্বল হওয়ার কারণে এই অমূল্য গ্রন্থখানা থেকে পূর্ণ উপকৃত হতে পারছেন না বলেই জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ মাদরাসার সুযোগ্য শিক্ষক মাওলানা আনোয়ার হোসাইন এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি দ্বীনের খেদমতের উদ্দেশ্যে 'আনোয়ার লাইব্রেরী' নামে একটা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান খুলেছেন। সেখান থেকেই দরসে তিরমিযীর বাংলা বের করছেন। অনুবাদের কপিখানা আমি নিজে দেখেছি। আমি আশা করি দরসে তিরমিযীর এই বাংলা অনুবাদখানা সবার জন্য উপকারী হবে।

সবার উপকারার্থে আল্লাহ তা'আলা এই গ্রন্থখানাকে কবুল করুন। আমীন।

১০/০৪/২০১১ইং

আবদুল কুদ্দুস

১০/০৪/২০১১ইং

আওলাদে রাসূল আল্লামা সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর অন্যতম খলীফা,
বাংলাদেশের সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হাটহাজারী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়-এর মহা পরিচালক,
বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড বেফাকের চেয়ারম্যান,
জামেয়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত, শাইখুল ইসলাম, হযরতুল আল্লাম,
মাওলানা শাহ্ আহ্মদ শফী সাহেব (দা.বা.)-এর

দোয়া ও বাণী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا . وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الَّذِيْ أَرْسَلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى رَحْمَةً لِّلنَّاسِ وَآتَاهُ الْحِكْمَةَ وَجَوَامِعَ الْكَلِمِ وَعَلَّمَهُ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَظِيْمًا وَّعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ أَمَّا بَعْدُ–

অস্থায়ী এ পৃথিবীতে মানুষ চিরদিন টিকে থাকার জন্য আসেনি। কারণ তাকে স্থায়ী বসবাসের জন্য প্রেরণ করা হয়নি। তাকে প্রেরণ করা হয়েছে অস্থায়ী বসবাসে শুধুই আল্লাহর উপাসনা করার জন্য। তাই আল্লাহ তা'আলা একেক যুগে একেকজন নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন মানব জাতিকে তার উপাসনা রীতি জানিয়ে দেওয়ার জন্য। এই সিলসিলায় সর্বশেষ যিনি এসেছেন, তিনি হলেন- আখেরী নবী, সরদারে দু'জাহান হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি মানব জাতির জন্য নিয়ে এসেছেন শান্তির বার্তা আল কোরআন এবং তাঁর সুন্নাত আল হাদীস। তাই কোরআনের সংগে সংগে হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম। কোরআনের সংগে সংগে মুসলিম জ্ঞানী-গুণীগণ তাই যুগ যুগ ধরে হাদীসের সেবাও করে আসছেন। কেউ মাদরাসা-মকতবে বসে দরস্ ও তাদরীসের মাধ্যমে আর কেউ বা লেখালেখির মাধ্যমে। হাদীসের প্রধান তাসনীফাতগুলোর মধ্যে 'তিরমিযী শরীফ' অন্যতম। এটি একটি جامع। এতে ইসলামের বিধিবিধান সম্বলিত অনেক হাদীস রয়েছে যা হাদীসের অন্যসব গ্রন্থগুলোতে সচরাচর পাওয়া যায় না। তাই হাদীসের ছাত্রদের কাছে গ্রন্থখানার গুরুত্ব রয়েছে অনেক বেশী। আল্লামা তাকী উসমানী সাহেব দা.বা. সেই দিকেই লক্ষ্য করে তিরমিযী শরীফের ওপর 'দরসে তিরমিযী' নামক একখানা ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিরমিযী শরীফ حل করার জন্য গ্রন্থখানার গুরুত্ব অপরিসীম। সে দিকে লক্ষ্য করে বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'আনোয়ার লাইব্রেরী'র পক্ষ থেকে গ্রন্থখানার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে পাণ্ডুলিপিখানা আমাকে দেখানো হয়। আমি তা দেখে আনন্দিত হই এবং দোয়া করি আল্লাহ তা'আলা যেন বাংলা দরসে তিরমিযী নামক এ গ্রন্থখানা ছাত্র, আলেম সমাজ ও জনসাধারণসহ সর্বস্তরের লোকদের জন্য উপকারী হিসেবে কবুল করেন এবং এর সংগে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি যেন রহমত করেন আর বেশী বেশী দিনের খেদমত করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

আহ্মদ শফী
০১/০৪/২০১১ইং

পীরে কামেল, হযরতুল আল্লাম, মাওলানা মুফতী আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহ.) এর সুযোগ্য সাহেবজাদা, কুমিল্লা বরুড়ার বিখ্যাত মাদরাসা 'আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলূম' এর শাইখুল হাদীস ও মোহ্তামীম হযরতুল আল্লাম, মাওলানা মো. নোমান (দা. বা.) এর

বাণী ও দোয়া

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ لِأَهْلِهَا أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِدْرَأُوا الْحُدُوْدَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. أَمَّا بَعْدُ-

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া- তিনি আমাদের প্রতি করুণা করে 'দারুল উলূম দেওবন্দ' এর মতো একটি দ্বীনী বিদ্যাপীঠ তৈরি করে দিয়েছেন। আমাদের জন্য তৈরি করে দিয়েছেন দরস ও তাদরীসের নতুন একটি পথ- 'দরসে নেযামী'। যে পথ ধরে ভারত উপমহাদেশে প্রতি বছর তৈরি হচ্ছে অগণিত আলেম-ওলামা এবং অসংখ্য রাহবারে দ্বীন। এখানে দরস ও তাদরীসের মাধ্যমে কোরআন ও হাদীসের সর্ব বিষয়ে পাণ্ডিত্ব অর্জন করা যায়।

এই দরসে নেযামীতে হাদীসের অনেক মূল্যবান কিতাবাদি দরস্ দেওয়া হয়। তার মধ্যে جامع الترمذي বা 'তিরমিযী শরীফ' অন্যতম। এটি একটি 'جامع'। এতে জমা করা হয়েছে ইসলামের বিধিবিধান সম্বলিত অনেক আহাদীস ও আছারসমুহ। হাদীসে নববীর পাঠকদের জন্য হাদীসের অন্যান্য কিতাবগুলোর মতো এই কিতাবখানাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন ও মুফতী আল্লামা তাকী উসমানী সাহেব দা.বা. সেই দিকেই লক্ষ্য করে তিরমিযী শরীফের ওপর 'দরসে তিরমিযী' নামক একখানা মূল্যবাণ ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিরমিযী শরীফ 'حل' করার জন্য গ্রন্থখানার গুরুত্ব অনেক। তাই বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'আনোয়ার লাইব্রেরী'র পক্ষ থেকে গ্রন্থখানার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে পাণ্ডুলিপিখানা তৈরি করে আমাকে দেখানো হয়। আমি তা দেখে আনন্দিত হই এবং দোয়া করি- আল্লাহ তা'আলা যেন বাংলা দরসে তিরমিযী নামক এ গ্রন্থখানা ছাত্র ও আলেম সমাজসহ সর্বস্তরের লোকদের জন্য উপকারী হিসেবে কবুল করেন। আরো দোয়া করি- তিনি যেন এর সংগে সংশ্লিষ্ট লেখক, সংকলক, অনুবাদক ও সম্পাদকসহ অন্যান্য সকলের প্রতি রহমত করেন এবং অধিক পরিমাণে দ্বীনের খেদমত করার সুযোগ দান করেন। আমীন।

প্রভুর নামে...

শুরুর কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

হে আল্লাহ! হে রহমান! হে রহিম! হে রাব্বুল আলামিন! সমস্ত প্রশংসা শুধুই তোমার। তোমার জন্য আমার সকল উপাসনা। আমার দিবস-রজনীর স্তুতি বন্দনা। তুমি অনন্ত, তুমিই অনাদি। তোমার গুণগান গায় সমস্ত মাখলুক। তুমি তো মহান। পাখিদের কণ্ঠে শুনা যায় তোমারই গান।

হে রাসূলে আরাবি! শ্রেষ্ঠ মানব, আখেরি নবী! তোমার কদম মোবারকে আমার লাখোকোটি সালাম। আমি এক অধম। আমি পাপী। আমি বড় অবুঝ। ব্যর্থ চেষ্টা করেছি তোমার পবিত্র হাদিসের সেবায় নিজেকে জড়াতে। শুধু প্রভুর কাছে আমার জন্য কিঞ্চিৎ সুপারিশের আশায়। আমি তোমাকে ভালোবাসি। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি! বলতে পারো তুলনাহীন এক অনন্য ভালোবাসা।

হে রাসূলের প্রিয় সাহাবি আর তাবেয়িন, তাবে-তাবেয়িনগণ! তোমাদের জন্য তো এ-ই যথেষ্ট যে, তোমাদের বন্ধু রাসূলে আরাবি বলে গিয়েছেন, 'খায়রুল কুরুনি ক্বারনী, ছুম্মাল্লাজীনা ইয়ালূনাহুম, ছুম্মাল্লাজীনা ইয়ালূনাহুম...।

হাদিসের বিশাল রত্নভাণ্ডার আমাদের সামনে আজও রয়েছে। কোরআনের পরেই তো হাদিসের স্থান। হাদিস হলো কোরআন বা ইসলামি শরিয়তের পূর্ণ ব্যাখ্যা-ভাণ্ডার। রাসূলের জীবনচরিত। সুতরাং যে বিদ্যা শিক্ষা করা ইসলামে ফরজ, তার মধ্যে হাদিস-বিদ্যাও রয়েছে। এটাও আমাদের জন্য শিক্ষা করা ফরজ। তাই আমরা হাদিস অধ্যয়ন করি। এ নিয়ে গবেষণা করি। হাদিসের অনেক কিতাবই তো রয়েছে। তিরমিযী শরিফ তার নিজস্ব মর্যাদা নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। চিরকাল থাকবে। দরসে তিরমিযী নামে তারই ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন পাকিস্তানের মুফতি আল্লামা তাকি উসমানি সাহেব। লেখকের এই কিতাবটি সাধারণ-অসাধারণ সবার কাছেই প্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে কওমি মাদরাসার ছাত্রদের কাছে। তিরমিযী পড়া মানেই তো তার ব্যাখ্যা গ্রন্থ দরসে তিরমিযী সংগে থাকবেই। কিতাবটি মূল ভাষা উর্দু হওয়ার কারণে অনেকে অনেক কিছুই তা থেকে উদ্ধার করতে পারেন না। তাই আমরা চেষ্টা করেছি একে সহজ বাক্যে বাংলায় ভাষান্তর করতে। আল্লাহ যেটুকু তৌফিক দিয়েছেন তা-ই পেরেছি। অনুবাদ করার সময় গ্রন্থটিকে ছাত্রদের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। জটিল মাসয়ালা-মাসায়েলগুলো ছাত্ররা যেন সহজেই বুঝতে পারে। সে দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এই অনুবাদের কাজের সংগে যারা জড়িত তাদের মধ্যে মাওলানা মুহসিন আল জাবির, মাওলানা ওসমান গণী, মাওলানা মুরশিদুল হাসান শামীম এবং মাওলানা শামসুদ্দিন সাদি সাহেব অন্যতম। প্রভুর কাছে তাদের কল্যাণ কামনা করছি। বিশেষ করে আমার স্নেহের ভাতিজা মোস্তফা কামাল তো এর ব্যবস্থাপনা কর্মে অনেক শ্রম দিয়েছে। আল্লাহ তার কল্যাণ করুন।

আমি আশা করি এই অনুবাদটি তিরমিযী শরিফ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষের উপকারে আসবে। আল্লাহ তায়ালা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের কল্যাণ করুন। আমিন।

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

রাসূল (স) থেকে বর্ণিত পবিত্রতা অধ্যায় (২)

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত সালাত অধ্যায় (মতন ৩৮)

বিষয়	পৃষ্ঠা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

লেখকের গুরুবাক্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

প্রায় দশ বছর ধরেই দারুল উলুম করাচির তিরমিযী শরিফের দরস অধমের ওপর অর্পিত। আমি সব সময় ভাবি যে, দরসে হাদিসের জন্য যে এলমি ও আমলি যোগ্যতার প্রয়োজন, তা আমার মধ্যে নেই কোনো দিক দিয়েই; তবে অধমকে বুজুর্গদের পক্ষ থেকে যেহেতু এই দরসের মসনদে বসানো হয়েছে এজন্য হুকুম বাস্তবায়নকে ভবিষ্যতের জন্য শুভ লক্ষণ মনে করে এই খেদমত কবুল করি, যে খেদমত আজও চলছে।

শুরুতে যখন নিজের অযোগ্যতার ভীষণ অনুভূতি মিশ্রণে আমি প্রকম্পিত অবস্থায় তিরমিযী শরিফের দরস শুরু করি, তখন আমার মনের ধারে কাছেও এই কল্পনা ছিলো না যে, নিজের দরসের বক্তব্য বিন্যাস ও ছাপার জন্য কখনও প্রস্তুত হবো। কারণ, দরসের তাকরিরগুলো ছাপা সেসব বড়দের জন্য শোভা পায় বাস্তবে যারা এর যোগ্য। কি আমি? আমার তাকরিরগুলোই বা কি? যে, এটা ছাপানোর চেষ্টা করা হবে? কিন্তু বিভিন্ন জটিলতার কারণে কয়েক বছর পর আমি এই গ্রন্থটি বিন্যাস ও প্রকাশনার জন্য সম্মত হলাম, আজ তা আপনার সামনে।

কারণ, দরসে হাদিস এবং বিশেষ করে সহিহ বুখারি ও জামে তিরমিযীর দরসে যেসব তাকরির হয় এবং যেসব আলোচ্য বিষয় বর্ণনা করা হয়, সেগুলো ছাত্রদের কাছে সংরক্ষিত থাকা নানা কারণে জরুরি। এই আলোচ্য বিষয়গুলো সংরক্ষিত থাকলে শুধু পরীক্ষা নয়, এগুলোর প্রয়োজন ভবিষ্যৎ কাজেও হয়। এসব কারণে শুরু থেকে সবকের তাকরির মুখস্থ করার রীতি চলে আসছে ছাত্রদের মধ্যে। প্রথমে এলমি যোগ্যতা এবং লেখার প্রশিক্ষণ এ পর্যায়ের হতো যে, উস্তাদ চাই যতই দ্রুতগতিতে তাকরির করতেন, তারা কমপক্ষে এই তাকরিরের সার নির্যাসতো নিজের খাতায় লিখে নিতো; বরং অনেক সময় এরূপ হতো যে, উস্তাদের তাকরির তো হতো উর্দুতে, আর তখনই ছাত্ররা তা আরবিতে অনুবাদ করে লিখতো। আমি নিজেও তো না কোনো আমাদের উস্তাদদের তাকরিরগুলো লিখেছিলাম আরবিতেই। কিন্তু ইদানিং যোগ্যতার ঘাটতি ও লেখনি শক্তি ব্যাপকভাবে তাদের হ্রাস পাওয়ার কারণে দরসে বসে ছাত্ররা তাকরির লিখতে অক্ষম হয়ে যাচ্ছে। ছাত্রদের সমস্যার এই সমাধানের জন্য বারবার অনুরোধে কোনো কোনো মাদরাসায় এই পদ্ধতি চালু করা হয়েছে যে, উস্তাদ নিজ তাকরির তাদের নিয়মিত লেখান। আমিও যখন দরসে তিরমিযী আরম্ভ করি তখনও এ রীতি অব্যাহত ছিলো। আমাকেও যার অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু অধম অনুভব করেছে যে, এ পদ্ধতিতে দরসের ক্রিয়া, রওনক, গতিশীলতা এবং বিষয়ের আগমন কোরবান হয়ে যায়। অপরদিকে জয়িফ হয়ে পড়ে দরসের গতি। বছর শেষে অসহনীয় বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোনো হক আদায় হয় না।

এই লেখানোর পদ্ধতি তুলে দিতে চেয়েছি। কিন্তু ছাত্ররা সবাই দাবি জানালো যে, এই পদ্ধতি যদি চালু না রাখা হয়, তাহলে দরসের সমস্ত তাকরির উড়ে যাবে বাতাসে। কিছুই আমাদের কাছে সংরক্ষিত থাকবে না। এই কারণে সমাধানের জন্য অধম চাইলো বিগত বছরের যেসব তাকরিরগুলো হয়েছে, সেগুলো যেন ছাত্ররা নিজেদের কাছে ফটোকপি করে রেখে দেয়। কিন্তু তাতেও অনেক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অবশেষে অক্ষম হয়ে এছাড়া আর কোনো উপায় রইলো না যে, বিগত বছরগুলোর কোনো তাকরির একবার ছেপে দেওয়া হবে। ছাত্রদের এ অভিযোগ যাতে দূর হয় এবং দরসও নিজ স্বাভাবিক গতি থেকে বঞ্চিত না হয়। ফলে এই প্রস্তাবের ওপর আমাকে সম্মত হতে হয়।

পড়ার সময় প্রিয় ভাগিনা মৌলভি রশিদ আশরাফও অধমের তাকরিরগুলো হেফাজত করেছিলো। যখন তাকরির ছাপার ইচ্ছা হলো, তখন সে এই দায়িত্ব গ্রহণ করলো, ছাত্রদের কাছ থেকে অতীতের বিভিন্ন বছরের তাকরিরগুলো সংগ্রহ করে আলোচ্য বিষয়গুলো একত্রিত করবে এবং যোগসূত্র রেখে এগুলোকে গ্রন্থে রূপ দিবে। অধ্যয়নকালে আমিও অনেকগুলো লেখা জমা করেছিলাম। আমি সেগুলো তাকে দিই। এগুলো মিলিয়ে যাতে সে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করতে পারে।

মাশাআল্লাহ যেরূপ মেহনত-কষ্ট এবং যোগ্যতার সাথে প্রিয় ভাগিনা এ কাজটি আঞ্জাম দিয়েছে– তা অধমের জন্য শত প্রশান্তি ও আনন্দের কারণ। এর ফলে তার জন্য শুরু থেকে দোয়া আসে। চার পাঁচ বছরের তাকরিরগুলো সামনে রেখে সে প্রথমে তা একত্রিত করেছে। তারপর যত বরাতে তাকরিরের হাদিসগুলোর এসেছে, মূল উৎস থেকে সেগুলোকে বের করে সেগুলোর তাখরিজও অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং এগুলোর মূলপাঠও বর্ণনা করেছে। যেসব বরাত অসম্পূর্ণ ছিলো, সেগুলোকে পূর্ণাঙ্গরূপ দান করেছে। আমি অধ্যয়নকালে যেসব লেখা লিখেছিলাম, কোনো কোনো জায়গায় সেগুলোকে প্রবিষ্ট করে দিয়েছে তাকরিরের মূলপাঠে। কোনো কোনো স্থানে সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেছে টীকা আকারে। আবার কোনো কোনো স্থলে নিজের পক্ষ থেকেও কিছু টীকা লিখেছে। (যেসব টীকায় از مرتب عفی عنه বা সংকলকের পক্ষ থেকে লেখা আছে।) মোটকথা, এই তাকরিরটিকে পূর্ণাঙ্গ উপকারী এবং ব্যাপকরূপ দান করতে নিজের পক্ষ থেকে কোনো কষ্ট আর সে বাদ দেয়নি। এই খেদমতের উত্তম প্রতিদান আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়া-আখিরাতে দান করুন। এলেম ও আমলে তার আরো উন্নতি দান করুন। এলমি ও দীনি খেদমতের তাওফিক তাকে আরও দান করুন। আমিন ॥

যদিও নিজস্ব ব্যস্ততার কারণে এই তাকরিরের ওপর পুনরায় নজর দেওয়ার সুযোগ আমার হয়নি এবং নতুন বিন্যাসের পর পুরোপুরিভাবে দেখতে পারিনি; কিন্তু বিন্যাসকালে প্রিয় ভাগিনা অধমের সাথে পরামর্শ অব্যাহত রাখে। সে সাধনা করে এ কাজ করেছে। এ হিসেবে আমার পুরো বিশ্বাস আছে যে, বর্তমানরূপে এ গ্রন্থটি প্রকাশযোগ্য। এলমি পুঁজিহীনতার স্বীকারোক্তি অবশ্য আমার আছে। যার ফলে ভুল-ত্রুটি তাতে থেকে যাওয়াও সম্ভব এবং কোনো স্থানে লেখা ও বিন্যাসেও ত্রুটি থেকে যেতে পারে। কিন্তু আমি তা প্রকাশ করছি এই আশায় যে, ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টি অতিক্রম করার পর এর ভুলগুলো সংশোধিত হবার সুযোগ হবে ইনশাআল্লাহ। এর ভুলগুলো যাঁরা চিহ্নিত করবেন, তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে আমার ওপর অনুগ্রহ করবেন। আমি যার জন্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

আশা করি তালেবে এলমের জন্য ইনশাআল্লাহ তাদের দরসি প্রয়োজনাদিতে এটি সহায়ক হবে এবং এতে হাদিস ও ফিকহের শাস্ত্রগত বহসগুলো দীর্ঘ ব্যাখ্যা অপেক্ষা বোধ হয় তাদের সামনে অধিক নিয়ন্ত্রিতভাবে এসে যাবে। তাছাড়া কোনো কোনো নতুন বিষয়, যেগুলো আগের শরাহগুলোতে পাওয়া যেতো না, কমপক্ষে তাদের সামনে সেগুলো পরিচিত হয়ে যাবে। বিশেষ করে বিয়ে থেকে পোশাক পরিচ্ছদ পর্যন্ত আলোচ্য বিষয়গুলো এমন, যেগুলোর ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ থাকার কারণে ছাত্রদের সামনে তা আসে না। আশা করি এ গ্রন্থটি সেসব আলোচ্য বিষয়েও ছাত্রদের উপকারী খেদমত করতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

অবশেষে ছাত্রদের কাছে কয়েকটি বিষয় আরজ করতে চাই। এক. শাস্ত্রগত যেসব দীর্ঘ আলোচ্য বিষয়ে বক্তব্য দাওরায়ে হাদিসের সবকে রাখা হয় সেগুলোর উদ্দেশ্য এই নয় যে, এগুলো হুবহু আক্ষরিকভাবে মুখস্থ করতে হবে। আর এটা আশাও করা যায় না যে, পূর্ণ তাফসিল সহকারে এসব আলোচ্য বিষয় সর্বদা স্মরণ থাকবে; মূলত এসব আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এগুলোর দ্বারা এলমে হাদিসের আলোচ্য বিষয়ের এবং এই শাস্ত্রের সাথে ছাত্রদের একটি সম্পর্ক সৃষ্টি হবে, যা তাদের ভবিষ্যৎ অধ্যয়নের অনুকূল পথ তৈরি করবে। তাছাড়া এসব বহসের মূল

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো, তাহকিকের স্পৃহা ছাত্রদের মধ্যে তৈরি করা। অতএব, শুধু বক্তব্য মুখস্থ করার উপর ছাত্রদের কখনও ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয়; বরং তাকরিরে যেসব কথা বর্ণিত হয়, সেগুলো ভাল করে বুঝে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সেগুলোর সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করা উচিত। গভীরভাবে লক্ষ্য করে এসব আলোচনায় প্রশ্নাদি করা উচিত। এসব প্রশ্নাদির সমাধান প্রথমতো উস্তাদদের কাছ থেকে লাভ করবে এবং দ্বিতীয়তো প্রয়োজন হলে পাঠ্যপুস্তক ছাড়া সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গ্রন্থে সেগুলোর সমাধান তালাশ করবে। একজন ভালো ছাত্রের পরিচয় হলো, তার মনে যখন কোনো প্রশ্নের উদয় হবে, তখন তার উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত তার মন প্রশান্ত হবে না।

শিক্ষকতো দরসে বর্ণনা করেন শুধু নিজের অধ্যয়ন এবং তাহকিকের ভিত্তিতে। কিন্তু কোনো উস্তাদ এই দাবি করতে পারেন না যে, তাকরিরের সম্ভাব্য সবগুলো দিক নিয়ে তিনি স্বীয় আলোচনা করে ফেলেছেন এবং এর পরে কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা অবশিষ্ট নেই। ছাত্রদের উচিত, উস্তাদের তাকরির ভালো করে বোঝার পর এলমের শুধু কয়েকটি মূলনীতির ওপর তুষ্ট না থেকে ইলমের তৃষ্ণা না মেটার মতো তলব এবং অনিবারিত পিপাসা সৃষ্টি করা। দাওরায়ে হাদিসে এসব আলোচনার উদ্দেশ্য এই তৃষ্ণা তৈরি করা। এই পিপাসা যদি তৈরি না হয়, তাহলে শুধু তাকরির মুখস্থ করে পরীক্ষায় হয়তো ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এসব তাকরিরের মূল লক্ষ্য অর্জিত হবে না।

দুই. অধিকাংশ ছাত্র ইদানিং তাকরিরে বর্ণিত শাস্ত্রগত বহসগুলোর ওপর পূর্ণ মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে রাখে; হাদিসের মূলপাঠের সাথে সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করে না। এ সমস্ত শাস্ত্রগত বহসগুলো অথচ অতিরিক্তের মর্যাদা রাখে। হাদিসের মূলপাঠগুলোই এলমে হাদিসের আসল মগজ। এজন্য ছাত্রদের কাছে অধমের আরজ হলো, তারা যেনো তাকরিরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে জড়িয়ে হাদিসের মূলপাঠ থেকে উদাসীন না হয়, বরং হাদিসের মূলপাঠ যথাসম্ভব মুখস্থ করা এবং এর অর্থ ভালো করে অনুধাবন করার জন্য পূর্ণ মনোযোগ দেয়। তাকরিরের মূল উপকারিতা অর্জিত হতে পারে তখনই, মূল হাদিস যখন ভালো করে মুখস্থ করবে। অন্যথায় হাদিস শব্দগত ও অর্থগতভাবে বোঝা ছাড়া এসব শাস্ত্রগত বহস মুখস্থ করার উদাহরণ হলো, যেমন- কেউ দেহে পোশাক না পরেই সাজ-সজ্জার প্রতি গুরুত্বারোপ করতে আরম্ভ করলো। তালেবে এলেমদের এ ধরনের কর্মপদ্ধতি থেকে অনেক দূরে থাকা চাই।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আরজ, এলমিভাবে মানুষ যতোই উচ্চ মর্যাদা লাভ করুক, হাদিসের মূলপাঠ, এর সনদ এবং সংশ্লিষ্ট আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে পাণ্ডিত্য ও বিশেষজ্ঞতা যতোই অর্জিত হোক, কিন্তু এই কিতাবি এলেম একটি বাহ্যিক খোলস মাত্র। এর সাথে যদি আমলের স্প্রিট না থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলার নিকট এর কানাকড়িও মূল্য নেই। হাদিস পড়ার আসল উদ্দেশ্য হলো, সুন্নতের অনুসরণের প্রতি গুরুত্বারোপ সৃষ্টি হওয়া, আমলের আগ্রহ তৈরি হওয়া, আল্লাহর ভয়, পরকালের চিন্তা, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক এবং গোনাহ থেকে পরহেজের ব্যাপারে তারাক্কি লাভ হওয়া, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর সাথে মহব্বত বৃদ্ধি পাওয়া। হাদিস পড়াকালে যদি এসব বিষয় সৃষ্টি না হয়, তাহলে কেউ এলমিভাবে যতোই বিষয়াবলি মুখস্থ রাখুক, সে মূলত হাদিসের কোনো ফায়দাই অর্জন করেনি।

তাই দাওরায়ে হাদিসের বছরে নিজের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনয়নের প্রয়োজন। এ যুগে অহেতুক কাজকর্ম থেকে পুরোপুরি বেঁচে থেকে রাতদিন এই ফিকির করা যে, আমাদের আমল-আখলাক, আমাদের জীবন ও কীর্তি আমাদের কথা ও কাজ সে জীবনের কতটুকু মিল আছে আমরা সকাল-সন্ধ্যায় যা পড়ছি। ফাজায়েলের হাদিসগুলো শুধু তেলাওয়াত এবং ওয়াজ-বক্তৃতায় বর্ণনা করার বিষয় না। সেগুলো হচ্ছে, আমাদের জীবন সুসজ্জিত করার জন্য। আমরা যদি এগুলোর ওপর আমল না করি তাহলে এগুলোর ওপর আমল

করার জন্য অন্য কোন মাখলূক সৃষ্টি হবে না। অতএব, হাদিস পড়াকালে আমল-আখলাক সংশোধনের বিশেষভাবে ফিকির করা উচিত। ফাজায়েল ও মোস্তাহাবগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করা উচিত। হাদিসের এলমি বহসগুলো মুখস্থ করার ক্ষেত্রে যদি কোনো ত্রুটি থেকে যায়, তবে তা এতোটা আশঙ্কাজনক নয়, যতোটা বিপদজনক হচ্ছে, হাদিসে এলমি যোগ্যতা তৈরি করা সত্ত্বেও আমল, আখলাক, জীবনকীর্তিতে কোনো পরিবর্তন না আসা। আল্লাহ না করুন যদি এই এলমি যোগ্যতা ও পারদর্শিতার কারণে অন্তরে আত্মপ্রিয়তা, অহংকার এবং আত্মম্ভরিতাবোধ সৃষ্টি হয়, তাহলে এর চেয়ে মারাত্মক ধ্বংসাত্মক আর কিছু নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এসব বিপদ থেকে রক্ষা করুন। আমিন ॥

তালেবে এলমদের নিকট অবশেষে বিনয়ের সাথে আবেদন করছি, তারা যেনো এ নাচিজকে তাদের দোয়াতে স্মরণ রাখে। এই কিতাব দ্বারা যদি কোনো ফায়দা হয়, তবে জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পর অধম ও সংকলকের জন্য যেনো দোয়া করে।

وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ

আহকার মুহাম্মাদ তাকি উসমানি উফিয়া আনহু

খাদিমুত তালাবা দারুল উলুম করাচি

১৫ শাওয়াল, ১৪০০ হিজরি

কিছু কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ ـ

সাধারণত ওলামায়ে কেরাম প্রতিটি এলমের শুরুতে বিশেষ করে হাদিস শাস্ত্রের বেলায় এর শুরুতে প্রাথমিক বিষয়াবলির সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু আলোচনা করেন। এসব বিষয়কে رؤوس ثمانية বলা হয়। এগুলো মোট আটটি।

এক) এলমের সংজ্ঞা, দুই) আলোচ্য বিষয়, তিন) লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, চার) নামকরণের কারণ, পাঁচ) এলমের ফজিলত, ছয়) শাস্ত্রের গ্রন্থাবলির প্রকারভেদ, সাত) এই শাস্ত্রের সংকলনের ইতিহাস এবং আট) সমজাতীয় শাস্ত্রগুলোর মধ্যে এর স্থান।

এই শাস্ত্রের ভূমিকায় আমরা যেসব বিষয় বর্ণনা করতে চাই, আটটি বিষয় সেগুলোতেও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তাছাড়া আরও কিছু জরুরি বিষয়ও থাকবে। এজন্য এই ভূমিকার আলোচ্য বিষয়গুলো رؤوس ثمانية-এর বিন্যাস থেকে কিছুটা আলাদা হবে।

হাদিসের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

ইমাম আল্লামা জাওহারি (র.) আরবি ভাষায় 'সিহাহে' হাদিসের অর্থ বর্ণনা করেছেন,

اَلْحَدِيْثُ اَلْكَلَامُ قَلِيْلُهٗ وَكَثِيْرُهٗ وَجَمْعُهٗ اَحَادِيْثُ ـ

'হাদিস অর্থ কথা বা বাণী, তা চাই কম হোক বা বেশি। এর বহুবচন আহাদিস।

এ হলো হাদীসের আভিধানিক অর্থ। মূলকথা আভিধানিকভাবে সব-ধরনের কথাকে হাদিস বলা হয়। আর হাদিসের পারিভাষিক অর্থে আলেমদের মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু এ ধরনের বিভিন্ন বক্তব্য হয়তো শাব্দিক অথবা ই'তিবারি (মেনে নেওয়া)। এ বিষয়ে আল্লামা তাহের ইবনে সালেহ আল-জাযায়িরি (র.) সুন্দর আলোচনা করেছেন তাঁর গ্রন্থ 'তাওজিহুন্ নজর ফি উসুলিল্ আছার'। তিনি বলেন, হাদিস মূলত ওলামায়ে উসুলে ফিকহের ভাষায় একরকম আর মুহাদ্দিসিনের পরিভাষায় অন্যরকম। এজন্য উভয়ের বর্ণিত সংজ্ঞাগুলোতে পার্থক্য রয়ে গেছে।

উসুলবিদদের মতে হাদিসের সংজ্ঞা–

اَقْوَالُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَفْعَالُهٗ 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও কর্ম।'

এই সংজ্ঞায় তাকরির বা অনুমোদনও অন্তর্ভুক্ত। কেননা, افعال শব্দটি এটাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এমনিভাবে রাসূল ﷺ-এর ঐচ্ছিক অবস্থাগুলোও افعال শব্দের অন্তর্ভুক্ত। এই সংজ্ঞার আলোকে অবশ্য সেসব বর্ণনা হাদিসের সংজ্ঞায় আসে না, যেগুলোতে রাসূল ﷺ-এর অনৈচ্ছিক অবস্থাগুলো বর্ণিত হয়েছে। যেমন, রাসূল ﷺ-এর দেহ মুবারক, তাঁর জন্ম বা ওফাতের বিবরণ; কিন্তু ওলামায়ে উসুলে ফিকহের দৃষ্টিকোণ থেকে এমন বর্ণনা হাদিসের সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে যাওয়া কোনো ক্ষতিকর নয়। কারণ, হাদিস থেকে বিধিবিধান উৎসারণ করাই হলো ওলামায়ে উসুলে ফিকহের উদ্দেশ্য। তাদের মতে যেগুলো থেকে আহকাম উৎসারিত হয়, হাদিস শুধু সেগুলো। আর যেসব বর্ণনায় প্রিয়নবী ﷺ-এর অনৈচ্ছিক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো থেকে যেহেতু কোনো বিধান উৎসারণ হয় না, তাই সেগুলো হাদিসের সংজ্ঞা থেকে বহির্গত থাকলে ওলামায়ে উসুলে ফিকহের মতে এটা কোনো ক্ষতির কারণ নয়।

কিন্তু মুহাদ্দিসিন রাসূল ﷺ-এর ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক অবস্থাসমূহের মধ্যে কোনো ব্যবধান করেন না। তাঁদের উদ্দেশ্য বিধিবিধান উৎসারণ করা নয়; বরং সেসব বিবরণ সংকলন করা, যেগুলো নবী করিম ﷺ -এর দিকে যে কোনো ভাবে সম্বোধিত। তাই তাঁদের মতে হাদিসের সংজ্ঞা হলো–

أَقْوَالُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَأَحْوَالُهُ 'তা রাসূল ﷺ-এর উক্তি, কর্ম ও অবস্থা।'

এই সংজ্ঞাটি অনৈচ্ছিক অবস্থাগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে। হাফেজ সাখাবি (র.) (ফাতহুল মুগিছ : ১২ মদিনা মুনাওয়ারা-১৩৮৮ হিজরি) এই সংজ্ঞাটিকেই এভাবে ব্যাপক আকারে উল্লেখ করেছেন,

والحديث لغة ضد القديم، واصطلاحا ما اضيف الى النبى صلى الله عليه وسلم قولا له او فعلا له او تقريرا او صفة حتى الحركات والسكنات فى اليقظة والمنام.

'হাদিস শব্দটি আভিধানিক অর্থে কাদিম তথা অবিনশ্বরের বিপরীত। আর পরিভাষায় বলা হয়, যা রাসূল ﷺ-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। চাই তাঁর বক্তব্য হোক বা কর্ম বা অনুমোদন অথবা গুণ, এমনকি ঘুমন্ত এবং জাগ্রত অবস্থায় তাঁর গতি ও স্থিতি।'

'হাদিস' নামকরণ সম্পর্কে কতক বক্তব্য

হাদিস নামকরণের কারণ তথা, এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থে যোগসূত্র সম্পর্কেও বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার (র.) 'ফাতহুল বারি'তে বলেছেন, হাদিস শব্দটি কাদিম-এর বিপরীত। আল্লাহ তা'আলার কালাম কাদিম বা অবিনশ্বর। এর বিপরীতে রাসূল ﷺ-এর কালামকে হাদিস (নশ্বর) বলা হয়েছে। হাফেজ সাখাবি (র.) 'ফাতহুল মুগিছে' এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন; কিন্তু নামকরণের এই কারণটি খুবই অযৌক্তিক মনে হয়।

আল্লামা উসমানি (র.) 'ফাতহুল মুলহিমে'র ভূমিকায় একটি সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, হাদিস শব্দটি واما بنعمة ربك فحدث (আপনি আপনার প্রতিপালকের কথা বর্ণনা করুন। –সূরা জোহা : ১১) থেকে গৃহীত। মূলত আল্লাহ তা'আলা এই সূরাতে আলোচনা করেছেন প্রিয়নবী ﷺ-এর ওপর নিজ তিনটি পুরস্কারের কথা এবং প্রতিটি পুরস্কারের শোকর আদায়ের একেকটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন–

১. الم يجدك يتيما فاوى (তিনি কি আপনাকে এতিম অবস্থায় পাননি? তারপর আপনাকে আশ্রয় দান করেননি। –সূরা জোহা : ৬) এই পুরস্কারের কৃতজ্ঞতা আদায়ে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে–

فاما اليتيم فلا تقهر (সুতরাং আপনি এতিমের প্রতি কঠোর হবেন না। -সূরা জোহা : ৯)

২. ووجدك عائلا فاغنى (তিনি আপনাকে নিঃস্ব পেলেন, অতঃপর অভাবমুক্ত করলেন। –সূরা জোহা : ৮)

৩. ووجدك ضالا فهدى (তিনি আপনাকে পথ সম্পর্কে অনবহিত পেলেন। অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন। –সূরা জোহা : ৭)

এতে ضال শব্দ দ্বারা আহকাম ও বিধিবিধান সম্পর্কে না ওয়াকিফহাল হওয়া উদ্দেশ্য। আর হিদায়াত দ্বারা উদ্দেশ্য শরয়ি বিধিবিধান শিক্ষা দেওয়া। এই নেয়ামতের শোকর সম্পর্কে বলা হয়েছে, واما بنعمة ربك فحدث এখানে নেয়ামত দ্বারা শরয়ি বিধিবিধান শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী ﷺ -কে যেসব শরয়ি বিধিবিধান শিক্ষা দিয়েছেন তিনি সেগুলো যেন অন্যদের নিকট পৌছান। নবী করীম ﷺ স্বীয় বচন ও কর্ম দ্বারা কোরআনের এই হুকুম বাস্তবায়ন করেছেন। এজন্য নবীজির বাণী ও কর্মসমূহকে হাদিস বলে।

যদিও আল্লামা উসমানি (র.)-এর এই ব্যাখাটি সূক্ষ্ম, কিন্তু এটা হিকমতের মর্যাদা রাখে ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর। আহকারের মতে পরিষ্কার কথা হলো, রাসূল ﷺ-এর বচন ও কর্মগুলোর জন্য হাদিস শব্দ বিশেষিত করে

নেয়া استعارة الخاص في العام-এর অন্তর্ভুক্ত। আর এই استعارة-এর উৎস স্বয়ং রাসূল ﷺ-এর কোনো কোনো বাণী, যেগুলোতে স্বয়ং রাসূল ﷺ স্বীয় বচন ও কর্মগুলোর জন্য হাদিস শব্দ ব্যবহার করেছেন। এজন্য বলা হয়েছে,

حَدِّثُوا عَنِّيْ وَلَا حَرَجَ ـ صحيح مسلم : ٢/٤١٤، كتاب الزهد باب التثبت في الحديث وحكم كتابة الحديث ابى سعيد الخدرى (رض)

'তোমরা আমার কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা কর, কোনো সমস্যা নেই।'[১]

হজরত আলি (রা.) থেকেও এরূপভাবে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন,

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِيْ ـ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَنْ هُمْ خُلَفَائُكَ؟ قَالَ اَلَّذِيْنَ يَأْتُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ يَرْوِيْ اَحَادِيْثِيْ يُعَلِّمُوْنَهَا النَّاسُ ـ

'হে আল্লাহ! আমার খলিফাদের প্রতি রহম করো। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কারা আপনার খলিফা? জবাবে তিনি বললেন, আমার পরে যারা এসে আমার হাদিস বর্ণনা করবে, তা লোকজনকে শিক্ষা দেবে।'[২]

কোনো কোনো মুহাদ্দিস এই হাদিসটিকে জয়িফ এবং জাল সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু কাজি ইয়াজ (র.) الالماع الى معرفة اصول الرواية وتقييد السماع নামক গ্রন্থে باب في شرف علم الحديث وتشريف اهله তে এই হাদিসটি অনেক সনদে বর্ণনা করেছেন। যা থেকে বোঝা যায়, হাদিসটি ভিত্তিহীন নয়। তাছাড়া আরেকটি হাদিস-এর সমার্থবোধক বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে যে, من حفظ على امتى اربعين حديثا فى امر دينها بعثه الله فقيها و كنت له يوم القيامة شافعا و شهيدا ـ

(مشكوة : كتاب العلم فى الفصل الثالث. ج ١. ص ٦٣)

'আমার উম্মতের স্বার্থে যে তাদের দীনি ব্যাপারে চল্লিশটি হাদিস সংরক্ষণ করবে, তাকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন ফকিহরূপে উঠাবেন। আমি তার জন্য কিয়ামত দিবসে সুপারিশকারি এবং সাক্ষী হবো।:

সনদগতভাবে জয়িফ, যদিও এই হাদিসটি এবং 'আল-মাকাসিদুল হাসানা' নামক গ্রন্থে হাফেজ সাখাবি (র.)-এর তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। কিন্তু সূত্রের আধিক্যের কারণে এটাকে হাসান লিগায়রিহি বলা যেতে পারে। তাছাড়া মিশকাতুল মাসাবিহ ১/৩২ পৃষ্ঠাকে কিতাবুল এলমের প্রথম পরিচ্ছেদে হজরত সামুরা ইবনে জুনদুব এবং মুগিরা ইবনে শু'বা (রা.)-এর হাদিস বর্ণিত রয়েছে,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عنى بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين ـ رواه مسلم

وعن ابن عباس (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الحديث عنى الا ما علمتم ، فمن كذب على متعمدا فليتبوء مقعده من النار ـ

رواه الترمذى (مشكوة جـ١،صـ٣٥ فى الفصل الثانى من كتاب العلم) ـ

টীকা-১. সহিহ মুসলিম : ২/৪১৪ কিতাবুল জুহদ. باب التثبت فى الحديث وحكم كتابة الحديث فى حديث ابى سعيد الخدرى (رض)

টীকা-২. এ হাদিসটি সূত্রসহ আবু নাইম আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-হাফেজ ত্বালহি সূত্রে 'আখবারে ইসবাহান' : (১/৮১) বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে, احاديثى وسنتى শব্দ। ইমাম আল্লামা হায়ছামি (র.) বর্ণনা করেছেন, 'মাজমাউজ জাওয়ায়িদ' : ১/১২৬ এ, তাবারানির আওসাত সূত্রে। ইমাম গাজালি বর্ণনা করেছেন 'ইহইয়াতে' ঃ ১/১১, আর সুয়ুতি 'মিফতাহুল জান্নাতে' বর্ণনা করেছেন। (فى تعليقات العلماء الى معرفة اصول الرواية و تقييد السماع : صـ ١٧)

'আমার কাছ থেকে যে এমন হাদিস বর্ণনা করবে, যেটি সম্পর্কে তার ধারণা এটি মিথ্যা, সে মিথ্যুকদের একজন।'[১] – মুসলিম

'হজরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, না জেনে আমার কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা থেকে বেঁচে থাক। আমার প্রতি যে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করবে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।'[২]

এসব বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, রাসূল ﷺ-এর বাণী ও কর্মের জন্য হাদিস শব্দের ব্যবহার পরবর্তী যুগের পরিভাষা নয়; বরং স্বয়ং রাসূলে কারিম ﷺ থেকে প্রমাণিত। অতএব, দূরবর্তী কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন এ ব্যাপারে নেই।

হাদিস অর্থে কিছু শব্দ প্রায় সমার্থবোধক

আরো কতগুলো শব্দ হাদিসের অর্থে ব্যবহার হয়। সেগুলো রেওয়ায়াত, আছর, খবর, সুন্নত। বিশুদ্ধ কথা হলো, এসব শব্দ হাদিস বিশারদগণের পরিভাষায় সমার্থবোধক। একটিকে অপরটির অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। অনেকে অবশ্য এসব পরিভাষায় পার্থক্য করেছেন; কিন্তু সর্বসম্মতিক্রমে রেওয়ায়াত শব্দটির প্রয়োগ হাদিসের আভিধানিক অর্থেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ, কোনো ঘটনা, কোনো বক্তব্য চাই যারই হোক না কেনো সেটাকে রেওয়ায়াত বলে, বাকি চারটি শব্দ সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে।

হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, হাদিস বলা হয় শুধু রাসূল ﷺ -এর উক্তি, কর্ম ও অবস্থাকে। খবর শব্দটিকে অনেকে এই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু কারো কারো মতে এ দুটোর মাঝে সম্পর্ক বৈপরীত্যের জন্যই নির্দিষ্ট। হাদিস রাসূল ﷺ-এর বাণী ও কর্মসমূহের নাম। আর খবর প্রিয়নবী ﷺ ছাড়া অন্যদের বক্তব্য ও কর্মের নাম। কেউ কেউ বলেন, এ দুটোর মাঝে عموم خصوص-এর সম্পর্ক। খবরটি عام বা ব্যাপক। অন্তর্ভুক্ত করে রাসূল ﷺ-এর এবং অন্যদের বক্তব্য ও কর্মসমূহকেও। আর হাদিস শুধু নবীজি ﷺ-এর জন্যই নির্দিষ্ট।

ফুকাহায়ে খুরাসানের পরিভাষা হলো–

ان الحديث اسم للمرفوع والاثر للموقوف على الصحابة والتابعين

হাদিস শব্দটি মারফু বর্ণনার নাম। আর আছর বলা হয়, সাহাবা ও তাবেয়িনের মাওকুফ।'

ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (র.) নিজের কিতাবটির নাম كتاب الاثار রেখেছেন, যাতে তিনি মাওকুফ আছরগুলো উল্লেখ করছেন। ইমাম গাজালি (র.) احياء العلوم এ ফুকাহায়ে খুরাসানের পরিভাষাই অবলম্বন করেছেন। কিন্তু ইমাম নববি (র.) শরহে সহিহ মুসলিম : ১/৬৩ তে লিখেছেন– যে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশের মতে হাদিস এবং আছরের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়টির প্রয়োগ মারফু, মাওকুফ ও মাকতু সব ধরনের হাদিসের ওপর হয়। ظفر الامانى পৃষ্ঠা : ৪-৫ এ আল্লামা লখনবি (র.) এটাই অবলম্বন করেছেন।

অনেকে বলেন, সুন্নত হলো শুধু প্রিয়নবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের আমলের নাম। হাদিসসমূহকে এটি অন্তর্ভুক্ত করে না। কিন্তু প্রথমেই বলা হয়েছে যে, সাধারণ ব্যবহারে হাদিস, খবর, আছর এবং সুন্নতে কোনো পার্থক্য নেই। এ কারণে হাদিসের বিখ্যাত কিতাব منتقى الاخبار من كلام سيد الابرار صلى الله عليه وسلم তে খবর শব্দটিকে হাদিসের সমার্থবোধক সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাইতো ইমাম তাহাবি (র.) নিজ গ্রন্থের নাম রেখেছেন شرح معانى الاثار । অথচ মারফু হাদিসের সংখ্যা তাতে অনেক। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, তার মতে

টীকা-১. সংকলক কর্তৃক সংযুক্ত।
টীকা-২. সংকলক কর্তৃক সংযুক্ত।

আছর শব্দটি মারফু হাদিসকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাছাড়া হাফেজ ইবনে জারির তাবারি (র.) গ্রন্থের নাম রেখেছেন– تهذيب الاثار। যাতে মারফু মাওকুফ সব ধরনের বর্ণনা রয়েছে। একইভাবে ইমাম তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ি, ইবন মাজাহ, বায়হাকি, দারাকুতনি এবং দারেমি প্রমুখ স্ব-স্ব গ্রন্থাবলিকে সুনান নামে উল্লেখ করেছেন। অথচ এগুলোতে বাচনিক হাদিস প্রচুর পরিমাণ।

মুহাদ্দিসিনের কর্মপদ্ধতির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তাহকিকি কথা হলো, এসব শব্দ সাধারণ ব্যবহারে সমার্থবোধক এবং একটি অপরটির স্থলে প্রচুর পরিমাণ ব্যবহৃত।

(এই আলোচনা হজরত মাওলানা জাফর আহমদ উসমানির (র.) 'ইনহাউস্‌ সাকান'[১] এবং হজরত শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দা আল-হলোবির তাহকিক ও টীকার সাথে বিদ্যমান আছে।)

হাদিস শাস্ত্রের পরিচয় বা সংজ্ঞা

এ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে শুধু হাদিসের সংজ্ঞা। এলমে হাদিসের সংজ্ঞাও জানা আবশ্যক। এলমুল হাদিসের সংজ্ঞায়ও উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে।

আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি (র.) 'উমদাতুল কারি'তে এলমে হাদিসের এই সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন,

علم يعرف به اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله و احواله .

'এমন জ্ঞান যার মাধ্যমে রাসূল ﷺ-এর কথা, কাজ ও অবস্থা জানা যায়।'

'ফাতহুল মুগিছে' হাফেজ সাখাবি (র.) এই সংজ্ঞা দিয়েছেন,

معرفة ما اضيف الى النبى صلى الله عليه وسلم قولا له فعلا او تقريرا او صفة .

'রাসূল ﷺ-এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত কথা, কাজ অথবা অনুমোদন কিংবা গুণ জানার নাম।'

এ দুটি সংজ্ঞা বাহ্যত ব্যাপক। তবে প্রশ্ন হয় যে, এগুলোতে মাওকুফ ও মাকতু হাদিসগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়নি। অথচ এগুলো নিয়েও তো আলোচনা করা হয় এলমে হাদিসে।

এই প্রশ্ন থেকে বাঁচার জন্য 'ফাতহুল বাকি শরহে আলফিয়াতুল ইরাকি'তে এলমে হাদিসের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে,

معرفة ما اضيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى صحابى او الى من دونه قولا او فعلا او صفة او تقريرا .

'রাসূল ﷺ-এর দিকে অথবা সাহাবির দিকে কিংবা তৎপরবর্তীদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত কথা, কাজ অথবা সিফাত অথবা অনুমোদন জানার নাম।'

এই সংজ্ঞাটি যদিও ব্যাপক কেননা, মাওকুফ ও মাকতু হাদিসগুলোও এতে অন্তর্ভুক্ত আছে। তবে কি কি আপত্তি দাঁড়ায় যে, এটি মানি' (সংজ্ঞায় ভিন্ন জিনিস প্রবেশে প্রতিবন্ধক) নয়। কারণ, এতে من دونه শব্দটি অত্যধিক ব্যাপক। যা সাহাবা ও তাবেয়িন ছাড়া রাজা-বাদশাহ, আমির-ওমারা এবং পরবর্তী লোকদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে। ফলে ইতিহাস শাস্ত্রও এলমে হাদিসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। মনে হয়, এই সংজ্ঞা দিয়েছেন যিনি তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো ইতিহাস শাস্ত্রকে হাদিস শাস্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করা। আর এটি একটি বাস্তব ঘটনা যে, সুদীর্ঘ একটি কাল পর্যন্ত এলমে হাদিস ও ইতিহাস বিদ্যায় কোনো পার্থক্য ছিলো না। এ কারণে হাজি খলিফা 'কাশফুজ্‌ জুনুনে এবং শায়খ আ'লা থানবি (র.) 'কাশ্‌শাফু ইসতিলাহাতিল ফুনুনে' এলমে হাদিসের যে সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন তার

টীকা. ১. ইলাউস্‌ সুনানের এই ভূমিকা قواعد فى علوم الحديث নামে ইদারাতুল কোরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়া করাচি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। –সংকলক

আলোকে ইতিহাস শাস্ত্রও তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তারা লিখেছেন, جملة الاخبار المرويات حديث (বর্ণিত সমস্ত সংবাদ হাদিস।) কিন্তু এ কথাটি তখনকার সময় পর্যন্ত সঠিক ছিলো, যখন পর্যন্ত হাদিস শাস্ত্র ও ইতিহাস শাস্ত্র একত্রে ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে যখন ইতিহাস শাস্ত্রের মর্যাদা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্জিত হয়েছে তখন উচিত ছিলো এলমে হাদিসের সংজ্ঞা এমন হওয়া, যেটি ইতিহাসকে অন্তর্ভুক্ত করবে না। অতএব উত্তম হলো, উপরিউক্ত সংজ্ঞায় আরেকটি শব্দ সংযুক্ত করে এরূপ বলা,

هو معرفة ما اضيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى صحابى او الى من دونه ممن يقتدى بهم فى الدين قولا او فعلا او صفة او تقريرا ـ

'রাসূল ﷺ কিংবা সাহাবি কিংবা তৎপরবর্তী দীনি অনুসরণীয় ব্যক্তিগণের দিকে সম্বন্ধযুক্ত কথা, কাজ, গুণ কিংবা অনুমোদন জানার নাম এলমে হাদিস।'

এই শর্তারোপের ফলে রাজা-বাদশাহ ও সাধারণ ওলামার ঘটনাবলি বের হয়ে যাবে এলমে হাদিসের সংজ্ঞা থেকে এবং অন্তর্ভুক্ত থাকবে অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গের ঘটনাবলি। কারণ, হাদিসের কিতাবগুলো এসব দ্বারা পরিপূর্ণ।

এলমে হাদিসের আরো কিছু সংজ্ঞা বিভিন্ন মনীষী থেকে বর্ণিত আছে এবং বাহ্যত এগুলোর মাঝে বৈপরীত্য বোঝা যায়। কারণ, এলমে হাদিসের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। কেউ এক প্রকারের সংজ্ঞা দিয়েছেন, কেউ অন্য প্রকারের, আবার কেউ সব প্রকারের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। আমরা ওপরে যে সংজ্ঞা উল্লেখ করেছি, সেটি সমস্ত প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে। তা সত্ত্বেও প্রতিটি প্রকার আলাদাভাবে অনুধাবন করাও প্রয়োজন।

এলমে হাদিসের প্রকারসমূহ

'ইরশাদুল কাসিদে' আল্লামা ইবনুল আকফানি (র.) লিখেছেন, হাদিস শাস্ত্র প্রথমত দুই প্রকার :

১. علم رواية الحديث

২. علم دراية الحديث

১. এলমে রেওয়ায়াতিল হাদিসের সংজ্ঞা,

هو علم بنقل اقوال النبى صلى الله عليه وسلم و افعاله واحواله بالسماع المتصل وضبطها وتحريرها ـ

'তা হলো রাসূল ﷺ-এর বক্তব্য, কাজ ও অবস্থা অবিচ্ছিন্ন সূত্র শুনে ও মুখস্থ করে বর্ণনা করা সংক্রান্ত বিদ্যা।'

২. এলমে দেরায়াতিল হাদিসের সংজ্ঞা,

هو علم يتعرف به انواع الرواية واحكامها وشروط الرواة واصناف المرويات واستخراج معانيها ـ

'এমন শাস্ত্র যা দ্বারা বর্ণনার প্রকার আহকাম ও রাবিদের শর্ত ও বর্ণিত বিষয়ের প্রকার ও অর্থ উৎসারণ সম্পর্কে জানা যায়।'

অতএব, কোনো হাদিস সম্পর্কে এটা জানা যে, এটি অমুক গ্রন্থে, অমুক সনদে, অমুক শব্দে বর্ণিত হয়েছে; এটা হলো, এলমে রেওয়ায়াতিল হাদিস। আর এ হাদিস সম্পর্কে এ কথা জানা যে, এটি খবরে ওয়াহেদ না মশহুর, সহিহ না দুর্বল, মুত্তাসিল না মুনকাতি' অনুরূপভাবে এর রাবিগণ নির্ভরযোগ্য না অনির্ভরযোগ্য, তাছাড়া এ হাদিস থেকে কী কী বিধিবিধান উৎসারিত হয়, এর কোনো বৈপরিত্য আছে কি না? থাকলে কিভাবে এর অবসান করা যায়– এসব বিষয় এলমে দেরায়াতিল হাদিসের সাথে সংশ্লিষ্ট।

এলমে দেরায়াতিল হাদিস এবং এলমে উসুলে হাদিসকে কোনো কোনো আলেম সমার্থবোধক সাব্যস্ত করেছেন। আল্লামা উসমানি (র.) 'ফাতহুল মুলহিমে'র মুকাদ্দমায় এ মতই প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া (র.) 'আওজাজুল মাসালিকে'র ভূমিকায় এদিকেই ঝোঁক প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এ বিষয়টি প্রশ্নসাপেক্ষ। কারণ, আমরা ওপরে এলমে দেরায়াতিল হাদিসের যে সংজ্ঞা উল্লেখ করেছি এবং আল্লামা ইবনুল আকফানি (র.) থেকে বর্ণিত আছে এবং আমাদের জানা মতে উক্ত আল্লামা প্রথমবার এলমে হাদিসের এই বিভাজন করেছেন। পরবর্তীতে সবাই তার অনুসরণ করেছেন। এই কারণে, আল্লামা সুয়ুতি (র.)-এর 'তাদরিবুর রাবি'তেও এই বিভাজন আল্লামা ইবনুল আকফানি (র)-এরই সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সংজ্ঞায় গভীরভাবে লক্ষ্য করা হলে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইলমে দেরায়াতিল হাদিস ও এলমে উসুল হাদিস সমার্থবোধক নয়। কারণ, এই সংজ্ঞায় অর্থ উৎসারণেরও আলোচনা রয়েছে। যদ্দ্বারা বোঝা যায় যে, হাদিসের বিধিবিধান উৎসারণ করাও এলমে দেরায়াতিল হাদিসের অংশ। অথচ কোনো আলোচনা ইলমে উসুল হাদীসে অর্থ বের করা সংক্রান্ত হয় না। অতএব, বিশুদ্ধ মত হলো, ইলমে দেরায়াতিল হাদিস এবং ইলমে উসুলে হাদিসের মাঝে عموم خصوص-এর সম্পর্ক। এলমে দেরায়াতুল হাদিস ব্যাপক আর এলমে উসূলে হাদিস বিশেষিত। এই পর্যালোচনার আলোকে বলা যেতে পারে যে, এলমে দেরায়াতিল হাদিসেরও দুটি শাখা রয়েছে।

১. علم اصول الحديث (যাতে হাদিসের সনদগত দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।)

২. علم فقه الحديث (যাতে কোনো হাদিস থেকে বিধিবিধান ও মাসায়িল উৎসারণ করা হয়।

এলমে হাদিসের মওজু বা আলোচ্য বিষয়–

কতক আলেম বলেছেন, হাদিস শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় রাসূল ﷺ-এর বাণী, কর্ম ও অবস্থা। অনেকে বলেছেন, সনদ এবং মতন বা সূত্র এবং মূলপাঠ এলমে হাদিসের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বক্তব্য হলো, আল্লামা কিরমানী (র)-এর। তিনি বলেছেন, এলমে হাদিসের আলোচ্য বিষয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সত্তা।

'তাদরিবুর রাবি'তে আল্লামা সুয়ুতি (র.) লিখেছেন, আমার উস্তাদ আল্লামা মহিউদ্দিন কাফিয়াজি আল্লামা কিরমানি (র.)-এর এই বক্তব্যের ওপর প্রশ্ন করতেন যে, রাসূল ﷺএর সত্তাতো চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হতে পারে, হাদিস শাস্ত্রের নয়। কিন্তু আল্লামা সুয়ুতি (র.) বলেন, আমার বড় বিস্ময়বোধ হয়, আমার শাইখের এই বক্তব্যে। কারণ, আল্লামা কিরমানি (র.) সত্তাকে সত্তারূপেই এলমে হাদিসের আলোচ্য বিষয় বলেননি; বরং রাসূলুল্লাহ হিসেবে আলোচ্য বিষয় সাব্যস্ত করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, এটা চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় নয়। অতএব, কাফিয়াজি (র.)-এর এই প্রশ্ন সঠিক নয়। তাহকিকি কথা হলো, রাসূল ﷺ-এর সত্তা রাসূলুল্লাহ হিসেবে সাধারণ এলমে হাদিসের আলোচ্য বিষয়। আর তাঁর বাণী ও কর্মগুলো এলমে রেওয়ায়াতুল হাদিসের আলোচ্য বিষয়। আর সনদ ও মতন হলো, এলমে দিরায়াতুল হাদিসের আলোচ্য বিষয়।

এলমে হাদিসের গরজ ও গায়াত বা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য–

এলমে হাদিসের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো, الاهتداء بهدى النبى صلى الله عليه وسلم (নবী করিম ﷺ-এর সীরাত-আদর্শের পথ পাওয়া।) আর সমস্ত উলূমে দীনিয়ার পরকালীন উদ্দেশ্য একটিই। অর্থাৎ, দুনিয়া-আখিরাতের সৌভাগ্য অর্জনে সফলতা।

এলমে হাদিসের ফজিলত ও মাহাত্ম্য–

এলমে হাদিসের মর্যাদা ও ফজিলতের বিষয়টি দীর্ঘ বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কোরআন হাদিসের অগণিত নছ এই এলমের ফজিলত সাব্যস্ত করে। এখানে সর্বগুলো উল্লেখ করা, সম্ভব না। প্রয়োজন হলে হাফেজ ইবনে আব্দুল বার আন্দালুসি (র.)-এর গ্রন্থ 'জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহি'র শরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে। তাছাড়া এই এলমের ফজিলতের জন্য এতোটুকু যথেষ্ট যে, প্রচুর পরিমাণে দরূদ শরিফ এর বদৌলতে পড়ার সুযোগ হয়। যার বহু ফজিলত রয়েছে।

সমজাতীয় এলেমসমূহ–

ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, প্রথমতো এলেম দুই প্রকার। علوم نقلية ও علوم عقلة ঐতিহ্যগত ও যৌক্তিক বিদ্যা। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি দুই প্রকার, ১. عالية ২. الية। উলুমে আলিয়া আকলিয়্যাহ, যেমন দর্শন, রমল[১], জাফর[২], নুজুম ইত্যাদি। আর উলুমে আলিয়া আকলিয়্যাহ। যেমন, মানতিক। আর আলিয়া নকলিয়্যাহ যেমন, উলূম আরাবিয়্যাহ যথা সরফ, নাহ্ব, বালাগাত। আর উলূমে আলিয়া নকলিয়্যাহ যেমন, তাফসির হাদিস ফিকহ্ ইত্যাদি। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে মর্যাদাবান হলো এই শেষ প্রকার। এলমে হাদিস-এর সাথেই সংশ্লিষ্ট।

হুজ্জিয়াতে হাদিস বা হাদিসের প্রামাণিকতা

এ ব্যাপারে উম্মতে মুহাম্মদিয়া ﷺ একমত রয়েছে যে, হাদিস কোরআনে কারিমের পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কিন্তু বিংশ শতাব্দির শুরুতে যখন মুসলমানদের ওপর পাশ্চাত্য জাতিসমূহের রাজনৈতিক মতবাদের প্রভাব বেড়েছে, তখন স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানদের এমন একটি শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে যারা পাশ্চাত্যের চিন্তা-গবেষণা দ্বারা সীমাহীন প্রভাবিত ছিলো। তারা মনে করতো পৃথিবীতে পাশ্চাত্যের অনুসরণ ব্যতিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। কিন্তু ইসলামের অনেক বিধিবিধান এই পথে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। এজন্য ইসলামের বিকৃতির ধারা আরম্ভ করেছে। যাতে এটাকে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা মোতাবেক তৈরি করা যায়। এই শ্রেণিটিকে আহলে তাজাদ্দুদ বা আধুনিকতাবাদী বলা হয়। হিন্দুস্তানে স্যার সৈয়দ আহমদ খান, মিসরে তাহা হোসাইন, তুর্কিতে জিয়া গোগ আলফ এই শ্রেণির পথ প্রদর্শক। এই শ্রেণির উদ্দেশ্য ততোক্ষণ পর্যন্ত অর্জিত হতে পারেনি যতোক্ষণ পর্যন্ত হাদিসকে পথ থেকে না সরানো যায়। কারণ, হাদিসসমূহে জীবনের প্রতিটি শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট এরূপ বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা রয়েছে, যেগুলো পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সাথে সুস্পষ্টরূপে সাংঘর্ষিক। এ কারণে এই শ্রেণির কেউ কেউ হাদিসকে প্রমাণ হিসেবে মানতে অস্বীকার করেছেন। এই ডাক হিন্দুস্তানে সর্বপ্রথম বুলন্দ করেছেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং তার বন্ধু মৌলবি চেরাগ আলি। কিন্তু তারা হাদিস অস্বীকারের মতবাদকে প্রকাশ্যে ও সুস্পষ্ট ভাষায় পেশ করার পরিবর্তে এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন যে, যেখানে কোনো হাদিস নিজের দাবি পরিপন্থি পরিলক্ষিত হয়েছে, সেখানে এর বিশুদ্ধতাকে অস্বীকার করেছেন। চাই এর সূত্র যতোই শক্তিশালী হোক না কেনো এবং সাথে সাথে কোথাও কোথাও এ বিষয়টিও প্রকাশ করা হতো যে, এই হাদিসগুলো বর্তমান যুগে প্রমাণ হওয়া উচিত নয়। এর সাথে সাথে কোনো স্থানে মতলব উদ্ধারে সহায়ক ও উপকারী হাদিসগুলো দ্বারা প্রমাণও পেশ করা হতো। এর মাধ্যমেই বাণিজ্যিক সুদকে হালাল করা হয়েছে, মু'জিজাগুলোকে অস্বীকার করা হয়েছে, পর্দাকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং বহু পাশ্চাত্য মতবাদকে দেয়া হয়েছে বৈধতার সার্টিফিকেট।

হাদিস অস্বীকারের মতবাদে তাদের পর আরো উন্নতি হয় এবং এই মতবাদ কিছুটা সাংগঠনিকভাবে আব্দুল্লাহ চকরালবির নেতৃত্বে সামনে অগ্রসর হয়। তিনি ছিলেন একটি ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা। নিজেকে যিনি আহলে কোরআন বলতেন। তার উদ্দেশ্য ছিলো হাদিসকে পুরোপুরি অস্বীকার করা। এরপর আসলাম জয়রাজপুরি আহলে কোরআন থেকে সরে এই মতবাদকে আরো সামনে এগিয়ে নেন। এমনকি গোলাম আহমদ পারভেজ এই ফিতনার নেতৃত্ব হাতে নেন এবং এটাকে একটি সুশৃঙ্খল মতবাদ ও চিন্তাধারার কেন্দ্রের রূপ দিয়েছেন। যুবকদের জন্য তার লেখায় বিরাট আকর্ষণ ছিলো। এজন্য তার যুগে এই ফিতনা সবচেয়ে বেশি ছড়িয়েছে। আমরা এখানে এই ফিতনার মৌলিক মতবাদের ওপর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করবো।

টীকা-১. এটি এমন একটি বিদ্যা যাতে বালুর ওপর রেখা টেনে ভবিষ্যৎ অবস্থা জানা যায়। এই বিদ্যা এক বক্তব্য অনুযায়ী হজরত দানিয়াল (আ.)-কে আর দ্বিতীয় উক্তি অনুযায়ী হজরত ইদ্‌রিস (আ.)-কে শেখানো হয়েছিলো। বর্তমান যুগে এই বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনকারি কেউ নেই। যদি কেউ এর দাবি করে তবে সে মিথ্যুক। –রশিদ আশরাফ।

টীকা-২. এই বিদ্যায় হরফসমূহের গোপন রহস্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের দাবি হলো যে, তারা এর সাহায্যে ভবিষ্যৎ অবস্থা ও ঘটনাবলি জানতে পারেন। কিন্তু শরয়িভাবে এর কোনো মর্যাদা নেই। এটা শেখাও সহিহ নয়। –সংকলক।

হাদিস অস্বীকারকারিদের তিনটি মতাদর্শ–

যেসব মতাদর্শ হাদিস অস্বীকারকারিদের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত সামনে এসেছে সেগুলো তিন প্রকার।

১. রাসূলে কারিম ﷺ-এর দায়িত্ব ছিলো শুধু কোরআন পৌছানো। আনুগত্য ওয়াজিব শুধু কোরআনের। রাসূল হিসেবে রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য না সাহাবায়ে কেরামের ওপর ওয়াজিব ছিলো না, আমাদের ওপর ওয়াজিব। নাউজুবিল্লাহ এবং ওহি শুধু মাতলু (প্রত্যক্ষ ওহি), ওহিয়ে গায়রে মাতলু (অপ্রত্যক্ষ ওহি) বলতে কোনো জিনিস নেই। তাছাড়া কোরআনে কারিম বোঝার জন্য হাদিসের প্রয়োজন নেই।

২. হজরত নবী করিম (স)-এর বাণীসমূহ সাহাবাদের জন্যে হুজ্জত ছিলো। কিন্তু আমাদের জন্য হুজ্জত নয়।

৩. রাসূল ﷺ-এর বাণীসমূহ সমস্ত মানুষের জন্য প্রমাণ। কিন্তু বর্তমান হাদিসগুলো আমাদের নিকট নির্ভরযোগ্য সূত্রে পৌছেনি। এজন্য এগুলো মানার দায়িত্ব আমাদের ওপর নয়।

হাদিস অস্বীকারকারিরা যে কোনো শ্রেণি বা দলের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক। তাদের প্রতিটি লেখা এই তিনটি মতবাদ থেকে কোনো না কোনো একটির মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে। আমরা এজন্য সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি তাদের পরস্পর বিরোধী সাংঘর্ষিক মতবাদগুলোর প্রত্যেকটির ওপর।

প্রথম মত খণ্ডন

১. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا أو من ورائ حجاب او يرسل رسولا

‘এমন মর্যাদা মানুষের নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহির মাধ্যম ব্যতিরেকে অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে, অথবা দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে।’ – সূরা শূরা : ৫১

এই আয়াতে রাসূল প্রেরণ ছাড়াও ওহিকে একটি স্বতন্ত্র প্রকাররূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই হলো, ওহিয়ে গায়রে মাতলু।

২. কোরআন শরিফে রয়েছে, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ (এ পর্যন্ত আপনি যে কেবলার অনুসরণ করেছিলেন, সেটাকে এ উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম, যাতে জানতে পারি– কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে পেছনে ফিরে যায়। –সূরা বাকারা : ১৪৩) এতে القبلة দ্বারা উদ্দেশ্য বায়তুল মুকাদ্দাস। এর দিকে মুখ ফেরানোর নির্দেশকে সৃষ্টিকর্তা جعلنا শব্দ দ্বারা নিজের দিকে সম্বোধন করেছেন। অথচ পুরো কোরআনের কোথাও বায়তুল্লাহর দিকে মুখ ফেরানোর নির্দেশ নেই। অবশ্যই এ হুকুম ছিলো ওহিয়ে গায়রে মাতলুর মাধ্যমে। এটাকে নিজের দিকে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট করে দিলেন যে, ওহিয়ে মাতলুর হুকুম ওহিয়ে গায়রে মাতলুর হুকুম পালন করা ওয়াজিব তেমনি গায়রে মাতলুর-ও।

৩. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم (আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছিলে। –সূরা বাকারা : ১৮৭) এই আয়াতে রমজানের রাতে স্ত্রী সহবাসকে খেয়ানত আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে এর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এতে বোঝা গেলো, কোরআনে কারিম এ বিষয়টি স্পষ্ট করছে যে, এর পূর্বে সহবাস হারামের নির্দেশ এসেছিলো। অথচ কোরআনে কারিমের কোথাও এই হুকুম উল্লেখ নেই। অবশ্যই এই নির্দেশ ছিলো ওহিয়ে গায়রে মাতলুর মাধ্যমে। এই হুকুমের বিরোধিতা ছিলো কোরআনে কারিমের দৃষ্টিতে খিয়ানত।

৪. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة (الى قوله تعالى) وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به . (এবং বদরের যুদ্ধে তোমরা যখন হীনবল ছিলে, তোমাদেরকে আল্লাহ তো সাহায্য করেছিলেন। সুতরাং, আল্লাহকে তোমরা ভয় করো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ...এটাতো শুধুমাত্র তোমাদের জন্য

সুসংবাদ ও তোমাদের চিত্ত-প্রশান্তির জন্য আল্লাহ করেছেন। -সূরা আলে ইমরান : ১২৩-১২৬) এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে উহুদের যুদ্ধের সময়। এতে বলা হয়েছে, বদরের যুদ্ধে ফেরেশতা অবতরণের ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহ তা'আলা করেছিলেন। অবশ্য কোরআনের কোথাও এই ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ নেই। এটা ছিলো ওহিয়ে গায়রে মাতলুর মাধ্যমে।

৫. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين (আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দুই দলের এক দল তোমাদের আয়ত্বাধীন হবে। -সূরা আনফাল : ৭) এতেও যে প্রতিশ্রুতির উল্লেখ রয়েছে, সেটা হয়েছিলো ওহিয়ে গায়রে মাতলুর মাধ্যমে। এর উল্লেখ কোরআনে কারিমের কোথাও নেই।

৬. واذا اسر النبى الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نباها به قالت من انبأك هذا قال نبأنى العليم الخبير ـ

(তাঁর স্ত্রীদের একজনকে নবী গোপনে কিছু বলেছিলেন। অতঃপর যখন তা তিনি বলেছিলেন অন্যকে এবং আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন, তখন নবী ﷺ বললেন, 'তিনিই আমাকে অবহিত করেছেন যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত।' -সূরা তাহরিম : ৩)

এ ব্যাপারে কিছু প্রকাশ করলেন এবং কিছু গোপন রাখলেন; নবী যখন সে বিষয়ে তাঁর ওই স্ত্রীকে জানালেন, তখন সে বললো, 'এটি অবহিত কে আপনাকে করলো?' এতে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে যে, হজরত আয়েশা ও হজরত হাফসা (রা.)-এর পুরা ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রকাশ করেছিলেন। কোরআনে কারিমের কোথাও অথচ এ ঘটনার উল্লেখ নেই। অবশ্যই এটি ছিলো ওহিয়ে গায়রে মাতলুর মাধ্যমে।

৭. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ

(যখন তোমরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে, যারা তখন গৃহে রয়ে গিয়েছিলো, তারা বলবে, তোমাদের সঙ্গে আমাদের যেতে দাও। তারা পরিবর্তন করতে চায় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। -সূরা ফাত্হ : ১৫)

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুনাফিকদের খায়বারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহ তা'আলা করেছিলেন। মনে রাখতে হবে, এ ভবিষ্যদ্বাণীও ছিলো ওহিয়ে গায়রে মাতলুর মাধ্যমে। কেননা, কোরআনে কারিমের কোথাও এর উল্লেখ নেই।

৮. এ আয়াতটি, ويعلمهم الكتاب والحكمة

'আর তিনি তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন।' -সূরা বাকারা : ১২৯

আরও বলা হয়েছে, وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم

'আমি অবতীর্ণ করেছিলাম আপনার নিকট কোরআন মানুষদের সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিলো।' -সূরা নাহ্ল : ৪৪

ওপরযুক্ত আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে যে, তার মানসাব একজন ডাক বহনকারীর ন্যায় 'নাঊযুবিল্লাহ' শুধু পয়গাম পৌঁছে দেওয়াই ছিলো না; বরং কিতাব ও হিকমত শেখানো এবং বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যা প্রদানও ছিলো। প্রশ্ন হয়, যদি নবীজি ﷺ-এর এরশাদগুলো প্রমাণ না হয়, তাহলে কিভাবে হতে পারে কিতাব ও হিকমতের বিশদ বিবরণ? আল্লাহর কিতাবের বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যার জন্য প্রিয়নবী ﷺ-এর নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলার প্রয়োজন হতো না? প্রকাশ থাকে যে, এছাড়া তা'লিম সম্ভব নয়। অতএব, যতোক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কথাগুলো প্রমাণ না হবে, লাভ কী ততোক্ষণ পর্যন্ত তা'লিম বা শিক্ষা প্রদানে?

৯. اطيعوا الله-এর সাথে সাথে কোরআনে কারিমের বিভিন্ন স্থানে اطيعوا الرسول শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। যা স্পষ্টরূপে হাদিসের প্রামাণিকতা প্রমাণ করেছে। হাদিস অস্বীকারকারিরা এ সম্পর্কে বলে থাকেন যে, শরি'য়াতের প্রমাণ হিসেবে এই আনুগত্য নয়, বরং মিল্লাতের কেন্দ্র ও শাসক হিসেবে। অর্থাৎ, রাসূল ﷺ-এর বাণীগুলো একজন শাসকরূপে তৎকালীন লোকদের ওপর মান্য করা ওয়াজিব ছিলো। তারপর আনুগত্য করতে হবে রাসূল ﷺ -এর নয়, বরং যারাই শাসক হবে তাদের।

এর দুটি জবাব–

ক. শাসকের আনুগত্যের আলোচনা করা হয়েছে স্বতন্ত্রভাবে পরবর্তীতে। অর্থাৎ, اولى الامر منكم। অতএব, রাসূলের আনুগত্যকে প্রয়োগ করা যায় না এর ক্ষেত্রে।

খ. এখানে اطيعوا الرسول শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটা সর্বজন স্বীকৃত মূলনীতি যে, যখন কোনো اسم مشتق তথা নিষ্পন্নের ওপর কোনো হুকুম লাগানো হয়, তখন ক্রিয়ামূল এই হুকুমের কারণ হয়ে থাকে। যেমন اكرم العالم বাক্যে আলিমের সম্মান প্রদর্শনের কারণ হলো, এলেম। অনুরূপভাবে اطيعوا الرسول বাক্যে আনুগত্যের কারণ শাসকত্ব নয়, রিসালত।

১০. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا 'কিন্তু না, আপনার প্রতিপালকের শপথ! কখনো তারা ঈমান আনবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসংবাদের বিচারভার আপনার ওপর অর্পণ না করে। অতঃপর আপনার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং তা মেনে নেয় সর্বান্তঃকরণে।' –সূরা নিসা : ৬৫

এই আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ-এর বাণীগুলোর আনুগত্য শুধু ওয়াজিব নয়; বরং এর ওপরই নির্ভরশীল ঈমান।

১১. পূর্ববর্তী নবীগণের বাণী কোরআন মাজিদের কয়েকটি স্থানে বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের বাণীগুলোর ওপর উম্মতের আমল ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে আর অবাধ্যদের ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে আজাব। এটা স্পষ্ট দলিল হাদিসের প্রামাণিকতার জন্য।

১২. এরূপ অনেকেই পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে ছিলেন যাঁদের ওপর কোনো কিতাব অবতীর্ণ হয়নি। যদি তাঁদের বাণীগুলোর ওপর আমল ওয়াজিব না হয়ে থাকে তবে তাঁদের প্রেরণ করা হলো কেনো?

১৩. হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর স্বপ্নের ঘটনা কোরআনে কারীমে উল্লিখিত হয়েছে। যাতে সন্তানকে কোরবানি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। এতে প্রমাণিত হয় যে, নবীগণের স্বপ্নও ওহি হয়ে থাকে। প্রকাশ থাকে যে, এটা হলো, ওহিয়ে গায়রে মাতলু।

কিছু যৌক্তিক দলিল

জীবনের প্রতিটি শাখা সম্পর্কে কোরআনে কারিমে যেসব দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, সেগুলো তো সাধারণত, মৌলিক বিধিবিধান সংবলিত। এসব বিধিবিধানের বিস্তারিত বিবরণ ও এগুলোর ওপর আমলের পদ্ধতি সব হাদিস বর্ণনা করেছে। নামাজ পড়ার পদ্ধতি, এর ওয়াক্ত, রাকাত সংখ্যা নির্ধারণ এসবের কিছুই কোরআনে নেই। যদি হাদিস প্রমাণ না হয়, তাহলে اقيموا الصلوة-এর ওপর আমলের পদ্ধতি কি? যদি কেউ বলে যে, সালাত শব্দের অর্থ আরবি অভিধানের আলোকে تحريك الصلوين বা দুই নিতম্ব দোলানো (নৃত্য করা)। অতএব, اقيموا الصلوة-এর অর্থ হলো, নৃত্যের আসর কায়েম কর। আপনার কাছে তাহলে এর কী জবাব?

২. আল্লাহর কিতাব যেন রাসূলের মাধ্যমে প্রেরণের স্থলে সরাসরি আরবের পৌত্তলিকদের ওপর অবতীর্ণ করা হয় কামনা ছিলো. حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه . 'আমরা পড়ার মতো কিতাব যতোক্ষণ না অবতীর্ণ করো (ততোক্ষণ পর্যন্ত ঈমান আনতো না)।'

খেয়াল রাখতে হবে যে, এ সময় মু'জেজাও বেশি প্রকাশ পেতো এবং মুশরিকদের ঈমান আনয়নের আশাও অধিক হতো। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা এই পদ্ধতি অবলম্বন করেননি। প্রশ্ন হলো, যদি হাদিসগুলো প্রমাণ না হয়, তাহলে রাসূল প্রেরণের ওপর কেন জেদ ধরা হলো? মূলত রাসূল এজন্য পাঠানো হয়েছে যে, শুধু কিতাব কোনো জাতির সংশোধনের জন্য কখনও যথেষ্ট হতে পারে না, যতোক্ষণ না এমন শিক্ষক হবেন যিনি এর অর্থ নির্ধারণ করবেন, স্বয়ং এর কার্যত আদর্শ হয়ে আসবেন। আর ততোক্ষণ এটা পর্যন্ত সম্ভব নয়, তার প্রতিটি বাণী ও কর্মের অনুসরণ যতোক্ষণ পর্যন্ত ওয়াজিব না হয়।

৩. সমস্ত উম্মত নির্বিশেষে হাদিসগুলোকে প্রমাণ মেনে আসছে। যদি গোটা উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে থাকে এবং চৌদ্দশ বছর পর্যন্ত পারভেজ সাহেব ব্যতিত ইসলাম অনুধাবনকারি কেউ সৃষ্টি না হয়ে থাকে, তাহলে চিন্তা করা উচিত যে, সে দীন কি অনুসরণযোগ্য হতে পারে– যা চৌদ্দশত বছর পর্যন্ত বুঝতে পারেননি কোনো একজন আদম সন্তানও।

হাদিস অস্বীকারকারিদের প্রমাণসমূহ

১. হাদিস অস্বীকারকারিরা সর্বপ্রথম তাদের দলিল হিসেবে এ আয়াত উল্লেখ করেছেন,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ .

'উপদেশ গ্রহণের জন্য আমি কোরআন সহজ করে দিয়েছি, কে আছ উপদেশ গ্রহণ করবে?' – সূরা কামার : ১৭

০ তাদের বক্তব্য হলো, এই আয়াতের আলোকে কোরআন একেবারেই সহজ। অতএব, তা অনুধাবন এবং কোনো তা'লিম বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই এর ওপর আমল করার জন্য।

০ এর জবাব, কোরআনে কারিমের বিষয়াবলি দুই প্রকার। কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যেগুলোর উদ্দেশ্য আল্লাহর ভয়, পরকালের ফিকির, আল্লাহর দিকে রুজু পয়দা করা এবং সাধারণ উপদেশের বিষয়। আর কিছু বিষয় আছে এমন, যেগুলোতে আহকাম-বিধিবিধান এবং এগুলোর মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। ولقد يسرنا القران আয়াতটি সংশ্লিষ্ট প্রথম প্রকার বিষয়াবলির সাথে, দ্বিতীয় প্রকার বিষয়াবলির সাথে নয়। যার প্রমাণ হলো, ولقد يسرنا القران-এর সাথে বৃদ্ধি করা হয়েছে للذكر শর্ত। যদি বিধিবিধান উৎসারণ করাও সহজ হতো, তবে এই শর্ত করা হতো না। তাছাড়া সামনে বলা হয়েছে فهل من مدكر । هل من مستنبط অথবা هل من مجتهد এ রকম বলা হয়নি। তাছাড়া কোরআনে কারিমের কয়েকটি আয়াতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, এই কিতাব বুঝে আসতে পারে না রাসূল ছাড়া। যেমন, وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم .

'অবতীর্ণ করেছিলাম আমি আপনার নিকটে কোরআন মানুষদের সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিলো।' –সূরা নাহল : ৪৪

২. হাদিস অস্বীকারকারিরা বলেন, কুরআনে কারিমে বিভিন্ন স্থানে স্বীয় আয়াতগুলোকে বায়্যিনাত (স্পষ্ট প্রমাণ) সাব্যস্ত করেছে। এর দ্বারাও বোঝা যায় যে, কোরআন স্বয়ং স্পষ্ট। এর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

০ এর জবাব, এ বিষয়টি সর্বদা মৌলিক আকায়িদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো, তাওহিদ, রিসালত ও আখিরাতের প্রমাণাদি এতো স্পষ্ট যে, সামান্য মনোযোগ দিলেই তা অন্তরে বসে যায়। খ্রিস্টানদের ত্রিত্ববাদী আকিদার তো নয় যে, গোটা বিশ্ব মিলেও তা অনুধাবন করতে পারে না। এর ফলে এটা

আবশ্যক হয় না যে, আহকাম বা বিধিবিধানের ব্যাপারেও কোরআন সম্পূর্ণ সহজ। অথবা কোনো রাসূলের প্রয়োজন এগুলোর ব্যাখ্যার জন্য নেই।

৩. انما انا بشر مثلكم يوحى الى 'তোমাদের মতোই আমি একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।' –সূরা কাহাফ : ১১০

হাদিস অস্বীকারকারিরা বলে, রাসূল ﷺ -কে অন্যান্য মানুষের ন্যায় এই আয়াতে মানব সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতএব, এই আয়াতটি স্পষ্ট যে, রাসূল ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ ওহিয়ে মাতলুর তো অনুসরণ করা ওয়াজিব; কিন্তু রাসূল ﷺ-এর বাণীগুলোর ওপর আমল করা অনাবশ্যক।

১. এর জবাব, বস্তুত আয়াতটিকে পূর্বাপর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে এই প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। আসলে এই আয়াতটি সেসব পৌত্তলিকের জবাবে এসেছিলো, যারা প্রিয়নবী ﷺ-এর নিকট মুজিজা দাবি করে আসছিলো। জবাবে বলা হয়েছে, আমি তোমাদের মতো মানুষ, এজন্য স্বীয় মর্জি মোতাবেক অলৌকিক বিষয় প্রদর্শনে সক্ষম নই, যতোক্ষণ না আল্লাহ ইচ্ছা করবেন। এতে বোঝা গেলে সর্ব ব্যাপারে নয়; বরং শুধু مثلكم শব্দে উপমা দেওয়া হয়েছে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিত অলৌকিক বিষয় প্রদর্শনের ক্ষমতা না থাকার ব্যাপারে।

২. অন্য মানুষের সাথে তার পার্থক্যের কারণ এই আয়াতেই সাব্যস্ত করা হয়েছে ওহিকে। আর ওহি ব্যবহৃত হয়েছে সাধারণরূপে যা ওহিয়ে মাতলু গায়রে মাতলু উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব, এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করা অর্থহীন রাসূল ﷺ-এর বাণীর ওপর আমল করা ওয়াজিব নয়।

৪. হাদিস অস্বীকারকারিরা সেসব ঘটনা দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেন, যেগুলোতে নবীজি ﷺ-এর প্রতি কোনো কাজের ফলে কোরআনে কারিমে ভর্ৎসনা অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন, বদরের যুদ্ধের সময় কয়েদিদের ছেড়ে দেওয়া মুক্তিপণ নিয়ে।

তাদের বক্তব্য হলো, এই ঘটনায় কোরআন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, প্রিয়নবী ﷺ-এর সিদ্ধান্ত আল্লাহর সন্তোষ অনুযায়ী ছিলো না। এজন্য নবীজি ﷺ-এর উক্তি ও কর্মকে ব্যাপক আকারে প্রমাণ বলা যায় কীভাবে?

০ এর জবাব, এসব ঘটনাতে নিঃসন্দেহে প্রিয়নবী ﷺ-এর ইজতিহাদি পদস্খলন ঘটেছিলো। যার ফলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে ওহির মাধ্যমে; কিন্তু যদি গভীরভাবে দেখা হয়, তাহলে এই ঘটনাই হাদিসের প্রামাণিকতা প্রমাণ করে। কারণ যতোক্ষণ পর্যন্ত কোরআন এই ইজতিহাদি ভুলের ওপর সতর্ক করেনি ততোক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত সাহাবি এই হুকুমের ওপর প্রিয়নবী ﷺ-এর অনুসরণ করেছেন। আর যখন কোরআনের সতর্কবাণী অবতীর্ণ হয়েছে তখন রাসূল ﷺ-এর প্রতি তো প্রিয়জন সুলভ ভর্ৎসনা হয়েছে যে,

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى الاية .

'কোনো নবীর জন্য সংগত নয় যে, দেশে কোনো ব্যাপক শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দি রাখা।' –সূরা আনফাল : ৬৭

কিন্তু সাহাবিদের ওপর কোনো প্রকার ভর্ৎসনা হয়নি যে, এই ফয়সালাতে তাঁর নবীজি ﷺ-এর অনুসরণ কেনো করলেন? এতে পরিষ্কার বোঝা যায়, এই ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ করে নিজেদের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। আর রাসূল ﷺ-এর ফয়সালার পুরো দায়দায়িত্ব ন্যস্ত ছিলো তাঁর ওপরই।

৫. সে ঘটনা দ্বারাও হাদিস অস্বীকারকারিরা প্রমাণ পেশ করে, যাতে প্রিয়নবী ﷺ মদিনার আনসারিগণকে তা'বিরে নখল (নর খেজুর গাছের ফুল মাদি খেজুর গাছের ফুলের সাথে বিশেষ পদ্ধতিতে লাগানো) থেকে নিষেধ করেছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম তা বর্জন করলে উৎপাদন হ্রাস পায়। এর ফলে রাসূল ﷺ বললেন–

انتم اعلم بامور دنياكم . 'তোমাদের পার্থিব বিষয়ে তোমরা আমার চেয়ে ভালো জানো।'

অর্থাৎ, এ ব্যাপারে আমার অনুসরণ করা তোমাদের ওপর ওয়াজিব নয়।

এর জবাব, রাসূলে আকরাম ﷺ-এর বাণীগুলোর রয়েছে দুটি দিক–

১. যেসব বাণী তিনি বর্ণনা করেছেন রাসূল হিসেবে।

২. যেসব বাণী দান করেছিলেন তিনি ব্যক্তিগত পরামর্শরূপে।

انتم اعلم بامور دنياكم : এর সম্পর্ক দ্বিতীয় প্রকার বাণীর সাথে। আর আলোচ্য বিষয় হলো, প্রথম প্রকার বাণী সংশ্লিষ্ট। অতএব, এই প্রমাণ ঠিক নয়।

০ এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এটা জানা আমাদের জন্য কঠিন যে, কোন বাণীটি কোন শ্রেণির বা কোন প্রকারের। অতএব, রাসূল ﷺ-এর বক্তব্য ও কর্মগুলোকে ব্যাপকরূপে প্রমাণ বলা যায় না।

০ এর জবাব, রাসূল ﷺ-এর আসল দিক হলো, রাসূল হওয়ার। অতএব, নবীজি ﷺ-এর প্রতিটি কথা ও কর্মকে এই শ্রেণির ওপর প্রযোজ্য ধরে প্রমাণ সাব্যস্ত করা হবে। তবে কোনো স্থানে যদি কোনো প্রমাণ বা নিদর্শন এমন কায়েম হয় যে, এ বাণীটি ব্যক্তিগত পরামর্শের মর্যাদা রাখে এবং বাস্তব ঘটনাও এই যে, পুরো হাদিস ভাণ্ডারে ব্যক্তিগত পরামর্শের উদাহরণ হাতেগণা কয়েকটি এবং এরূপ স্থানে স্পষ্ট ভাষায় বিবরণ রয়েছে যে, এই ইরশাদটি শরয়ি হুকুম নয়; বরং ব্যক্তিগত পরামর্শ। গণা কয়েকটি স্থান ছাড়া এই হাতে বাকি সব বাণী রাসূল হিসেবে সম্পাদিত হয়েছে আর এগুলো সব প্রমাণ।

দ্বিতীয় মত খণ্ডন

হাদিসগুলো এই মতবাদ অনুযায়ী সাহাবিদের জন্য প্রমাণ ছিলো। আমাদের জন্য কিন্তু প্রমাণ নয়। এই মতবাদটি এতো স্বতঃসিদ্ধ ভ্রান্ত যে, এর খণ্ডনের জন্য বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন নেই। এর নির্যাস তো এই বের হয় যে, রাসূল ﷺ-এর রেসালত তো সাহাবি যুগ পর্যন্ত বিশেষিত ছিলো। অথচ নিম্নেযুক্ত আয়াতগুলো তা প্রত্যাখ্যান করে সুস্পষ্ট ভাষায়।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا .

'হে মানুষ! আমি আল্লাহর রাসূল তোমাদের সকলের জন্য।' –সূরা আ'রাফ : ১৫৮

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين .

'আপনাকে প্রেরণ করা হয়েছে জগতের জন্য রহমত স্বরূপ।' –সূরা হজ্জ : ১০৭

تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا .

'তিনি কতো মহান যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফোরকান অবতীর্ণ করেছেন। যাতে করে সে বিশ্ব জগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।' –সূরা ফোরকান : ১

০ তাছাড়া মৌলিক প্রশ্ন হলো, কোরআন বোঝার জন্য রাসূলের শিক্ষার প্রয়োজন আছে কি না? যদি না হয়, তাহলে রাসূল কেন প্রেরিত হয়েছেন? আর যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, সাহাবিদের তো শিক্ষার প্রয়োজন, অথচ আমাদের শিক্ষার প্রয়োজন নেই। অথচ সাহাবায়ে কেরাম স্বয়ং কোরআন অবতরণের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছেন! অবতরণের কারণ সম্পর্কে শানে নুজুল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাদের সামনেই কোরআন নাজিলের পরিবেশ ছিলো। এসব থেকে আমরা বঞ্চিত।

০ হাদিস অস্বীকারকারিরা এর জবাবে সে পুরনো কথাই বলেন, যে রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য সাহাবায়ে কেরামের ওপর মিল্লাতের কেন্দ্র হিসেবে ওয়াজিব ছিলো, রাসূল হিসেবে নয়। এ বিষয়টি রদ করা হয়েছে প্রথমেই।

তৃতীয় মত খণ্ডন

হাদিসগুলো প্রমাণ ঠিকই কিন্তু আমাদের নিকট তা নির্ভরযোগ্য সূত্রে পৌঁছেনি, এই বক্তব্য সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এর উপর নিম্নোক্ত প্রমাণাদি রয়েছে–

১. সেসব মাধ্যমেই আমাদের নিকট কোরআন পৌঁছেছে, হাদিস ও সেসব মাধ্যমেই পৌঁছেছে। এবার যদি এসব সূত্র অনির্ভরযোগ্য হয়, তাহলে কোরআন থেকেও হাত ধুয়ে ফেলতে হবে। হাদিস অস্বীকারকারিরা এর এই জবাব দেন যে, কোরআনে কারীমের আয়াত, انا له لحافظون। 'আমি এর হেফাজতকারী'। –সূরা হিজর : ৯ বলে আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। হাদিস সম্পর্কে এমন কোনো দায়িত্ব নেয়া হয়নি।

প্রথম জবাব হলো, انا له لحافظون। আয়াতটিও আমাদের নিকট সেসব মাধ্যমেই পৌঁছেছে যেগুলো আপনার উক্তি অনুযায়ী অনির্ভরযোগ্য। এর কী প্রমাণ যে, এ আয়াতটি কেউ নিজের পক্ষ থেকে সংযোজন করেনি?

দ্বিতীয় জবাব হলো, এতে কোরআনের হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছে। আল কোরআন উসুলিয়্যিনের সর্বসম্মতিক্রমে শব্দ এবং অর্থের নাম। এ আয়াতটি এজন্য শুধু কোরআনের শব্দের নয়; বরং এর অর্থের সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। আর কোরআনের অর্থের শিক্ষা দেয়া হয়েছে হাদিসে। যদি এই বলা হয় যে, কোরআন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে সেটা আমাদের নিকট এই মাধ্যমগুলোর কারণে নয়; বরং এর অলৌকিকত্ব ও ভাষাগত বালাগাত ও অলঙ্কারের কারণে প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত সেই অলৌকিকত্ব হাদিসের মধ্যে নেই।

০ এর জবাব হলো, প্রথমতো কোরআনের অলৌকিকত্ব আজকালের লোকদের জন্য প্রমাণিত হয় চ্যালেঞ্জের আয়াতগুলো দ্বারা। পক্ষান্তরে চ্যালেঞ্জের আয়াতগুলোও সেসব মাধ্যমেই আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তবে কী এটা সম্ভব নয় যে, অনির্ভরযোগ্য সূত্রগুলো এ আয়াতগুলো শুধু এজন্য বাড়িয়ে দিয়েছে, মানুষ যাতে বুঝতে পারে কোরআন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে।

০ দ্বিতীয়তো, এই বিষয়টি মেনে নেওয়ার ওপর কোরআনের অলৌকিকত্বের প্রমাণ মওকুফ যে, অনুরূপ কালাম কোরআনের চ্যালেঞ্জের জবাবে পেশ করতে পারেনি। আর এই বিষয়টি হাদিস ছাড়া আর কোত্থেকে জানা গেলো?

২. এ কথা আপনি যখন স্বীকার করে নিলেন, হাদিসগুলোর ওপর আমল করা ওয়াজিব। অতএব, নিজে নিজেই এ ফল বের হয় যে, কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত এটি সংরক্ষিত থাকবে। অন্যথায় আবশ্যক হবে যে, আল্লাহ তা'আলা হাদিসের ওপর আমল করা তো ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন, কিন্তু এর সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা করেননি। যে বান্দাদের ওপর সাধ্যাতীত বিষয়ের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন। অথচ এ বিষয়টি لا يكلف الله نفسا الا وسعها। 'আল্লাহ সাধ্যাতীত বিষয়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন না'। –সূরা বাকারা : ২৮৬-এর সম্পূর্ণ বিরোধপূর্ণ।

৩. হাদিস অস্বীকারকারিরা এটাও বলে থাকেন যে, হাদিস অর্থাৎ, খবরে ওয়াহেদগুলো সব মুহাদ্দিসিনের স্পষ্ট বিবরণ অনুযায়ী ظنى বা ধারণামূলক। আর কোরআনে কারিমের স্পষ্ট বিবরণ অনুযায়ী ধারণামূলক বিষয়ের অনুসরণ করা নিষিদ্ধ।

ان يبتغون الا الظن وان الظن لا يغنى من الحق شيئا

'অনুসরণ করে তারা কেবল অনুমানের, সত্যের বিপরীতে অনুমানের কোনো মূল্য নেই।' –সূরা নাজম : ২৮

কিন্তু তাদের এই উক্তিও শুধু ধোঁকাবাজি। বাস্তব ঘটনা হলো, ظن শব্দটি আরবি ভাষায় তিনটি অর্থে ব্যবহৃত। ১) অনুমান-আন্দাজ, ২) প্রবল ধারণা, ৩) প্রমাণ নির্ভর নিশ্চিত জ্ঞান।

কোরআনে কারিমের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে ظن শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ইয়াকিন বা নিশ্চিত বিশ্বাসের অর্থে।

১. الذين يظنون انهم ملقوا ربهم 'তারা বিনীত যারা বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রতিপালকের সাথে নিশ্চিতভাবে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে।' – সূরা বাকারা : ৪৬

২. قال الذين يظنون انهم ملقوا الله 'কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিলো যে, আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে তারা বললো...।' –সূরা বাকারা : ২৪৯

৩. وظن داود انما فتناه 'দাউদ (আ.) বুঝতে পারলেন যে, আমি তাঁকে পরীক্ষা করেছি।' –সূরা সাদ : ২৪

এবার বুঝুন, হাদিসগুলোকে যে ظنى বলা হয়, এটা আন্দাজ-অনুমানের অর্থে নয়; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রবল ধারণা আবার কোনো কোনো স্থানে নিশ্চিত বিশ্বাসের অর্থে ব্যবহৃত। আর কোরআনে যে ধারণার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে তা দ্বারা উদ্দেশ্য অনুমান-আন্দাজ করা। অন্যথায় প্রবল ধারণা শরিয়াতের অগণিত মাসায়িলে প্রমাণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। বাস্তবতা হলো, এটাকে প্রমাণ সাব্যস্ত করা ব্যতিত মানুষ বেঁচে থাকতে পারবে না একদিনও। কেননা, গোটা বিশ্ব এই প্রবল ধারণার ওপরই প্রতিষ্ঠিত। হাফেজ ইবনে হাজার (র.) লিখেন– খবরে ওয়াহিদগুলো এই ধরনের ظن বা ধারণাকে সৃষ্টি করে। অবশ্য কোনো কোনো খবরে ওয়াহেদ যেগুলো বিভিন্ন নিদর্শনাবলি দ্বারা সহায়তা ও শক্তিপ্রাপ্ত, সেগুলো প্রমাণনির্ভর নিশ্চিত জ্ঞানের ফায়দাও দেয়। যেমন সেসব হাদিস যেগুলো বর্ণিত হয়েছে ধারা পরম্পরায় হাফেজ ও ইমামগণ কর্তৃক।

৪. যেসব সূত্রে হাদিসগুলো আমাদের নিকট পৌঁছেছে, সেসব সূত্র অনির্ভরযোগ্য হওয়ার ফতওয়া লাগিয়ে দেয়া অজ্ঞতার প্রমাণ। বস্তুত হাদিসের হিফাজতের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা এক কথায় অনুপম। হাদিসের ইতিহাস দ্বারা জানা যেতে পারে যার বিস্তারিত বিবরণগুলো।

হাদিস সংরক্ষণ

যারা হাদিস অস্বীকার করে তারা বলে, হাদিসগুলো সংগ্রহ হয়েছে তৃতীয় শতাব্দি হিজরিতে। এজন্য এগুলো আসল রূপের ওপর অবশিষ্ট আছে বলে নির্ভর করা যায় না। কিন্তু এই বিভ্রান্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ সর্বপ্রথম দেখা উচিত যে, হাদিস সংরক্ষণের প্রতি কিরূপ গুরুত্বারোপ রাসূলে আকরাম ﷺ-এর যুগ থেকে এ পর্যন্ত করা হয়েছে। হাদিস সংরক্ষণের পদ্ধতি শুধু লেখাই নয়; বরং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য মাধ্যমও রয়েছে। গবেষণা থেকে জানা যায় যে, রিসালাত যুগে এবং সাহাবায়ে কেরামের জামানায় হাদিস সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার হয়েছে নিম্নের তিনটি পদ্ধতি।

প্রথম পদ্ধতি বর্ণনা মুখস্থ করা

হাদিস সংরক্ষণের প্রথম পদ্ধতি হলো, এগুলোকে মুখস্থ করা এবং এই পদ্ধতি সে যুগে নেহায়েত নির্ভরযোগ্য ছিলো। আল্লাহ তা'য়ালা আরববাসিকে দান করেছিলেন অসাধারণ স্মরণশক্তি। তাঁরা শুধু নিজেদেরই নয়; বরং নিজেদের অশ্বগুলোর পর্যন্ত বংশ পরিক্রমা কণ্ঠস্থ করে ফেলতেন। এক এক জনের হাজার হাজার কাব্য মুখস্থ থাকতো। অনেক সময় কোনো একটি বিষয় শুধু একবার শুনে বা দেখে পরিপূর্ণরূপে কণ্ঠস্থ করে ফেলতেন। ইতিহাসে এর অগণিত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তা থেকে কিছু নিচে তুলে ধরা হলো।

বোখারি শরিফে হজরত জা'ফর ইবনে আমর আজ-জামরি (রা.) বর্ণনা করেন, একবার আমি ওবায়দুল্লাহ ইবনে আদি ইবনুল খিয়ারের সাথে হজরত ওয়াহশি (রা.)-এর সাক্ষাতে গেলাম। ওবায়দুল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন– আপনি কী আমাকে চেনেন? ওয়াহশি বললেন– আমি আপনাকে তো চিনি না। তবে আমার এতোটুকু স্মরণ আছে যে, আজ থেকে বহু বছর পূর্বে একদিন আদি ইবনুল খিয়ার নামক এক ব্যক্তির কাছে গিয়েছিলাম। তার ওখানে সেদিন একটি শিশুর জন্ম হয়েছিলো। সে শিশুটিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো চাদরে মুড়িয়ে তার দুধ মাতার নিকট। শিশুটির পুরো দেহ ঢাকা ছিলো। শুধু পাগুলো আমি দেখেছিলাম। সে শিশুর পায়ের সাথে আপনার পা দুটোর খুব বেশি মিল রয়েছে।

ভাবনার বিষয় হলো, যে জাতি এতো সাধারণ বিষয়গুলোকে এতোটুকু নির্ভরযোগ্যতার সাথে মনে রাখে, তাঁরা রাসূলে আকরাম ﷺ-এর বক্তব্য ও কর্মগুলোকে স্মরণ রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করবে কতোটা? অথচ

তাঁদের জন্য এগুলোকে মুক্তির পথ মনে করেন তারা। বিশেষত তাদের সামনে যখন রাসূলে আকরাম ﷺ-এর এ বাণী এসেছিলো,

نَضَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا الخ .

-رواه الشافعي والبيهقي في مدخل و رواه احمد والترمذي وابو داود وابن ماجة والدارمي عن زيد بن ثابت (مشكوة المصابيح كتاب العلم الفصل الثاني ج١، ص٣٥)

'সে বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা তরতাজা ও প্রফুল্ল রাখুন, যে আমার কথা শুনে তা মুখস্থ করলো ও সংরক্ষণ করলো এবং তা পৌঁছে দিলো।'

তাই স্পষ্ট বিষয় যেটা তা হলো, বিস্ময়করভাবে সাহাবায়ে কেরাম এর গুরুত্বারোপ করেছিলেন।

'আল-ইসাবা' গ্রন্থে হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বর্ণনা করেন যে, একবার আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর স্মরণশক্তির পরীক্ষা নিতে চেয়েছিলেন। তাঁকে ডেকে এনে হাদিস বর্ণনা করার আবেদন করেন। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) অনেক হাদিস শুনালেন। একজন লেখক তা লিখছিলো। অতঃপর হজরত আবু হুরায়রা (রা.) সেখান থেকে চলে গেলেন। পরবর্তী বছর তাঁকে আব্দুল মালেক পুনরায় ডাকালেন। তাঁকে বললেন– আপনি গত বছর যেসব হাদিস লিখিয়েছিলেন, সে হাদিসগুলো সেই ধারাবাহিকতার সাথে শুনিয়ে দিন। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) পুনরায় হাদিস শুনাতে আরম্ভ করলেন। লেখক এগুলো মিলাচ্ছিলেন তাঁর লেখার সাথে। কোনো জায়গায় একটি হরফ, একটি বিন্দু এবং ক্ষুদ্রাংশও পরিবর্তন করেননি। চমৎকার ব্যাপার হলো, যে ধারাবাহিকতা ঠিক তা-ই ছিলো।

এর স্পষ্ট প্রমাণ এ ধরনের বিস্ময়কর ঘটনাবলি যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে অসাধারণ স্মরণশক্তি শুধু হাদিস সংরক্ষণের জন্য দান করেছিলেন। নিঃসন্দেহে এমন স্মরণশক্তি হাদিসের জন্য লেখার মতোই নির্ভরযোগ্য মাধ্যম।

দ্বিতীয় পদ্ধতি আমলি নমুনা

হাদিস সংরক্ষণের দ্বিতীয় যে পদ্ধতি সাহাবায়ে কেরাম অবলম্বন করেছিলেন তা ছিলো আমল। অর্থাৎ, তারা প্রিয়নবী ﷺ-এর বক্তব্য ও কর্মগুলোর ওপর হুবহু আমল করে তা স্মরণ রাখতেন। অনেক সাহাবি থেকে বর্ণিত আছে, তারা কোনো আমল করে বলেছেন– هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل (আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন করতে দেখেছি।) এই পদ্ধতিটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। কারণ, যে বিষয়টির ওপর কেউ নিজে আমল করে সেটি হয়ে যায় পাথরের ওপর খোদাইয়ের ন্যায়।

তৃতীয় পদ্ধতি লিখে রাখা

হাদিস লেখার মাধ্যমেও সংরক্ষণ করা হয়েছিলো। ঐতিহাসিকভাবে হাদিস লেখা চারটি স্তরে বিভক্ত করা যায়।

১. অগোছালো আকারে হাদিস লেখা।

২. হাদিস সংকলন করা কোনো এক ব্যক্তি কর্তৃক, যার মর্যাদা ব্যক্তিগত স্মারকের হবে।

৩. গ্রন্থাকারে বিভিন্ন অধ্যায়ে হাদিসগুলোকে বিন্যস্ত করা ব্যতিত সংকলন করা।

৪. গ্রন্থাকারে বিভিন্ন অধ্যায়ে হাদিসগুলোকে সুবিন্যস্তরূপে সংকলন করা।

সাহাবায়ে কেরামের জামানায় রিসালত যুগে প্রথম দু'প্রকারের প্রচলন ভালোরূপে হয়েছিলো। হাদিস অস্বীকারকারিরা রিসালত যুগে হাদিস লেখার বিষয়টি স্বীকার করেন না। তারা মুসলিম ইত্যাদিতে আবু সায়িদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। হাদিসটি হলো–

لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القران فليمحه . 'তোমরা আমার কাছ থেকে আমার কথাগুলো লিখবে না। যে আমার কাছ থেকে কোরআন ছাড়া অন্য কিছু লিখবে সে যেনো অবশ্যই তা মিটিয়ে ফেলে।'

এসব হাদিস অস্বীকারকারিদের বক্তব্য হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক হাদিস লিখতে বারণ করাটাই প্রমাণ যে, হাদিস সে যুগে লেখা হয়নি। তাছাড়া এর ফলে এটাও জানা যায় যে, হাদিসগুলো প্রামাণ্য নয়। অন্যথায় রাসূল ﷺ তা গুরুত্বসহকারে লিখাতেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, হাদিস লেখা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা ছিলো ইসলামের প্রাথমিক যুগে। তার কারণ ছিলো, তখন পর্যন্ত এক কপিতে কোরআনে কারিম সংকলিত হয়নি; বরং বিক্ষিপ্ত আকারে সাহাবায়ে কেরামের নিকট লিখিত ছিলো অপরদিকে সাহাবায়ে কেরামও তখন পর্যন্ত কোরআনের পদ্ধতি সম্পর্কে এতোটা পরিচিত হননি যে, কোরআন এবং কোরআনের মাঝে প্রথম দৃষ্টিতে পার্থক্য করতে পারেন। হাদিসগুলো এমতাবস্থায় যদি লেখা হতো, তাহলে আশঙ্কা ছিলো কোরআনের সাথে সংমিশ্রণের। এই আশঙ্কার কারণে এবং এর পথ রুদ্ধ করার জন্য রাসূল ﷺ হাদিস লিখতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু যখন সাহাবায়ে কেরাম কোরআনের পদ্ধতি সম্পর্কে পুরোপুরি পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন, তখন নবীজি ﷺ হাদিস লেখার অনুমতি দিয়ে দেন। যার বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত আছে হাদিসের গ্রন্থাবলিতে।

১. ইমাম তিরমিযী (র.) জামে' তিরমিযীতে এলেম পর্বে একটি পৃথক অধ্যায় কায়েম করেছেন, باب ما جاء في الرخصة فيه। তাতে হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর নিম্নোক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন,

قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يَجْلِسُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْمَعُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيْثَ فَيُعْجِبُهُ وَلَا يَحْفَظُهُ . فَشَكَى ذٰلِكَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّيْ لَأَسْمَعُ مِنْكَ الْحَدِيْثَ فَيُعْجِبُنِيْ وَلَا أَحْفَظُهُ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْتَعِنْ بِيَمِيْنِكَ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ لِلْخَطِّ . (جامع ترمذى : ٢/١٠٦-١٠٧)

'রাসূল ﷺ -এর মজলিসে এক আনসারি ব্যক্তি বসতেন। রাসূল ﷺ -এর হাদিস শুনতেন। হাদিস তাকে বিস্ময়াভিভূত করতো। কিন্তু তিনি তা মুখস্থ রাখতে পারতেন না। তিনি এ অভিযোগ রাসূল ﷺ -এর নিকট করলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার কাছ থেকে হাদিস শুনি, সে হাদিস আমাকে বিস্ময়াভিভূত করে। কিন্তু আমি তা মুখস্থ রাখতে পারি না। তা শুনে রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তোমার ডান হাতের সহযোগিতা নাও। এতে তিনি ইঙ্গিত করেছেন স্বহস্তে লেখার প্রতি।'

২. হজরত ইমাম আবু দাউদ (র.) তার সুনানে ও ইমাম হাকেম মুস্তাদরাকে : ১/১০৪, كتاب العلم . الأمر بكتابة الحديث। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন,

كنت اكتب كل شئ اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه فنهتنى قريش وقالوا اتكتب كل شئ تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم فى الغضب والرضا . فامسكت عن الكتابة فذكرت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاومأ باصبعه الى فيه فقال اكتب فوالذى نفسى بيده ما يخرج منه الا حق (لفظه لابى داود ج٢، ص٥١٣ وص٥١٤ كتاب العلم)

'রাসূল ﷺ থেকে আমি যা শুনতাম, সংরক্ষণের নিয়তে সবকিছু লিখে ফেলতাম। তখন আমাকে কুরাইশ তা থেকে বারণ করলেন। তারা বললেন, রাসূল ﷺ থেকে যা শুন সবকিছুই লিখে ফেলো? তিনি তো মানুষ, ক্ষুব্ধ অবস্থায় ও স্বাচ্ছন্দ্য অবস্থায় কথা বলেন। তখন আমি লেখা থেকে বিরত হলাম। এ বিষয়টি আলোচনা করলাম রাসূল ﷺ -এর কাছে। ফলে তিনি স্বীয় আঙুল দিয়ে তাঁর মুখের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, যাঁর কুদরতি হাতে আমার আত্মা তাঁর শপথ, এ থেকে আর কিছু বের হয় না হক ছাড়া।'

৩. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকেই মুস্তাদরাকে হাকেমে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন,

قَيِّدُو الْعِلْمَ، قُلْتُ وَمَا تَقْيِيْدُهُ؟ قَالَ كِتَابَتُهُ - (مستدرك ج١، ص١٠٦ كتاب العلم قيدوا العلم بالكتابة)

'এলেমকে তোমরা আবদ্ধ করো। বর্ণনাকারি বলেন, আমি বললাম আবদ্ধ করা মানে কী? বললেন, এটাকে লিখে ফেলো।'

عن ابى هريرة (رضـ) ان النبى صلى الله عليه وسلم خطب فذكر قصة فى الحديث فقال ابو شاه - اكتبوا لى يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابى شاه وفى الحديث قصة - هذا حديث حسن صحيح (ترمذى ج٢، ص١٠٧ ابواب العلم. باب ما جاء فى الرخصة فيه ورواه البخارى فى كتاب العلم تحت باب كتابة العلم - ج١، ص٢١ و ٢٣)

'হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার বক্তব্য রাখলেন। অতঃপর তিনি হাদিসে একটি ঘটনা উল্লেখ করলেন। তখন আবু শাহ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এটি লিখে দিন। ফলে রাসূল ﷺ এরশাদ করলেন, আবু শাহকে তোমরা তা লিখে দাও। এই হাদিসে একটি ঘটনা আছে। হাদিসটি হাসান সহিহ।'

এসব হাদিসগুলো এর স্পষ্ট প্রমাণ যে, হাদিস লেখা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা ছিলো কোনো সাময়িক কারণের ভিত্তিতে। যখন সে কারণ দূরীভূত হয়ে গেছে তখন শুধু এর অনুমতি নয়; বরং নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

হাদিস লিখতে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে ইমাম নববি আরেকটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। সেটি হচ্ছে ব্যাপক লেখা কোনো কালেই নিষিদ্ধ ছিলো না; বরং কোনো কোনো সাহাবি এমন করতেন যে, কোরআনের আয়াতগুলো লেখার সাথে সাথে রাসূল ﷺ -এর ব্যাখ্যা-তাফসিরও লিখে ফেলতেন। এ পদ্ধতিটি ছিলো মারাত্মক আশঙ্কাজনক। কারণ এতে কোরআনের আয়াতের সাথে হাদিস মিশে যাওয়ার আশঙ্কা ছিলো বিরাট। এজন্য শুধু এই পদ্ধতি সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিলো। কোরআন থেকে আলাদা হাদিস লেখা সম্পর্কে কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিলো না। আল্লামা নববি (র.)-এর এই ব্যাখ্যা খুবই যুক্তিযুক্ত। নাসায়ি শরিফের একটি বর্ণনা দ্বারাও এর সহায়তা হয়। হাদিসটি ইমাম নাসায়ি (র.) বর্ণনা করেছেন, كتاب الصلوة باب المحافظة على صلوة العصر এ যে, হজরত আয়েশা (রা.) তার একজন গোলামকে কোরআনে কারিম লেখার নির্দেশ দিয়েছেন। যখন সে حافظوا على الصلوة والصلوة الوسطى আয়াতে পৌঁছলো তখন, الوسطى শব্দের পর وصلوة العصر বাড়িয়ে লেখার জন্য (তিনি তাকে) নির্দেশ দেন। প্রকাশ থাকে যে, العصر শব্দটি কোরআনে কারিমের অংশ ছিলো না; বরং বাড়ানো হয়েছিলো ব্যাখ্যারূপে। যেহেতু তৎকালীন যুগে মূলপাঠ এবং ব্যাখ্যায় পার্থক্য করার সেসব চিহ্ন প্রচলিত ছিলো না, যেগুলো পরবর্তীতে প্রচলিত হয়েছে, তাই এই শব্দটি লিখে দেওয়া হয়েছে মূলপাঠের সাথেই।

এ থেকে বোঝা যায়, রাসূল ﷺ কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যাগুলো হয়তো অন্যান্য সাহাবিও এভাবে লিখেছে। প্রকাশ থাকে যে, এই প্রচলনের ব্যাপক অনুমতি যদি দেওয়া হতো, তাহলে কোরআনের মূলপাঠ নির্ণয় এবং এর হেফাজত মাথা ব্যথার কারণ হয়ে যেতো। বস্তুত হাদিস লেখার নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে এই বিরাট আশঙ্কার দ্বার রুদ্ধ করা হয়েছিলো; কিন্তু কুরআনে কারিম থেকে আলাদা হাদিস লেখার প্রচলন অব্যাহত ছিলো সর্বযুগে। এ কারণে সাহাবি যুগে হাদিসের কয়েকটি সংকলন ব্যক্তিগত স্মারক আকারে তৈরি হয়েছে। এর কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ–

১. আস্ সহিফাতুস্ সাদিকা (الصحيفة الصادقة) : মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) হাদিসের যে একটি সংকলন তৈরি করেছিলেন, এর নাম রেখেছিলেন الصحيفة الصادقة। এটা ছিলো সাহাবিযুগে সবচেয়ে বড় হাদিস সংকলন। এর হাদিসগুলোর মোট সংখ্যা নিশ্চিতরূপে

জানা যায়নি। কিন্তু সহিহ বোখারিতে এর ওপর কিছুটা আলোকপাত হয় ২/২২ كتاب العلم باب كتابة العلم এ বর্ণিত হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর একটি হাদিস দ্বারা।

তিনি বলেন,

ما من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم احد اکثر حدیثا عنه (ای عن النبی صلی الله علیه وسلم) منی الا ما کان من عبد الله بن عمرو فانه کان یکتب ولا اکتب ـ

'আমার চেয়ে বেশি হাদিসের বাহক রাসূল ﷺ-এর কোনো সাহাবি নেই। শুধুমাত্র আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ছাড়া। কারণ, তিনি লিখতেন আর আমি লিখতাম না।'

এ থেকে বোঝা গেলো, হজরত ইবনে আমর (রা.)-এর হাদিস সংখ্যা হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিস অপেক্ষা বেশি ছিলো। হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিস সংখ্যা ৫৩৬৪ অথবা ৫৩৭৪। সহিহ উক্তি দ্বিতীয়টি। অতএব, ইবনে আমর (রা.)-এর হাদিস সংখ্যা সুনিশ্চিতরূপে বেশি হবে এর চেয়ে। এ দিকে হজরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর এই উক্তি আবু দাউদ ও হাকেমের বরাতে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে,

كُنْتُ اَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ اَسْمَعُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

'আমি রাসূল ﷺ থেকে যা শুনতাম সবকিছুই লিখে ফেলতাম'।

এ থেকে বোঝা যায়, (আস-সহিফাতুস্ সাদিকা)-এর হাদিস সংখ্যা ছিলো ৫৩৬৪ থেকেও বেশি।

প্রশ্ন : স্বয়ং হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)-এর বর্ণিত হাদিস, যেগুলো বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছেছে, সেগুলোর সংখ্যা হজরত আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদিস থেকে কম। অতএব হজরত আবু হুরায়রা (রা.) এটা কিভাবে বললেন যে, আমার চেয়ে হাদিস মুখস্থ ছিলো তাঁর বেশি।

জবাব : অন্যদের নিকট সবগুলো বর্ণনা করাকে হাদিস মুখস্থ থাকা আবশ্যক করে না। বাস্তব ঘটনা এই যে, হজরত আবু হুরায়রা (রা.) মদিনায় অবস্থান করেন। যেটি ছিলো তৎকালীন যুগে এলমে দীন অন্বেষীদের প্রাণ কেন্দ্র। এজন্য হাদিস বর্ণনা করার সুযোগ তাঁর বেশি হয়েছিলো। এর পরিপন্থি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) ছিলেন শামে, যেখানে এলমে হাদিস অন্বেষীদের শরণাপন্ন হওয়ার সুযোগ এতোটা ছিলো না। এজন্য হাদিস বেশি মুখস্থ থাকা সত্ত্বেও তাঁর বর্ণিত রেওয়ায়াত সংখ্যা হজরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত সংখ্যা থেকে কম ছিলো। মোটকথা, সহিফায়ে সাদিকা ছিলো তৎকালীন যুগে হাদিসের একটি বিরাট সংকলন এবং হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) এটাকে রাখতেন অত্যন্ত হেফাজতে। তাঁর ওফাতের পর এই সহিফা হস্তান্তরিত হয় তাঁর পুত্র হজরত আমর ইবনে শু'আইব (র.)-এর নিকট। যিনি অধিকাংশ সময় عن ابیه عن جده সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেন। বরং হাফেজ ইবনে হাজার (র.) 'তাহজিবুত্ তাহজিবে' ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাইন ও আলি ইবনুল মাদানি (র.)-এর বক্তব্য বর্ণনা করেছেন, যে হাদিস عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده সূত্রে এসেছে, সেটাকে 'সহিফায়ে সাদিকা'র হাদিস মনে করবে।

২. সহিফায়ে আলি (রা.) (صحیفة علی رض) : আবু দাউদ : ১/২৭৮ كتاب المناسك باب فی تحریم المدینة-এর অধীনে হজরত আলি (রা.)-এর এই বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে,

ما کتبنا عن رسول الله صلی الله علیه وسلم الا القران وما فی هذه الصحیفة الخ

'রাসূল ﷺ থেকে কোরআন ও এই সহিফায় যা কিছু আছে তা ছাড়া আর কিছু আমরা লেখিনি।'

বোখারিতে চার স্থানে, মুসলিমে দুই স্থানে এবং নাসায়ি ও তিরমিযীতেও এই বিবরণটি বর্ণিত হয়েছে। হজরত আলি (রা.)-এর সহিফা তাঁর তলোয়ারের খাপে থাকতো। এই রেওয়ায়াতের বিভিন্ন শব্দ দ্বারা বোঝা যায়

যে, তাতে অন্তর্ভুক্ত ছিলো দিয়ত বা রক্তপণ-মা'আকিল, ফিদিয়া, কিসাস এবং জিম্মিদের বিধিবিধান, যাকাতের নেসাব এবং মদিনা তাইয়িবা হেরেম হওয়ার ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর ইরশাদগুলো ।

৩. **কিতাবুস্ সাদাকা** (كتاب الصدقة) : যেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন এটি সেসব হাদিসের সমষ্টি। এতে জাকাত, সদকা, ওশর ইত্যাদির আহকাম ছিলো। সুনানে আবু দাউদ দ্বারা জানা যায় যে, এ কিতাবটি রাসূল ﷺ স্বীয় গভর্নরদের নিকট পাঠানোর জন্য লিখিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি ওফাত লাভ করেন এগুলো প্রেরণের পূর্বেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর এ কিতাবটি হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর নিকট ছিলো, অতঃপর এসেছে উমর (রা.)-এর নিকট, অতঃপর এসেছে তাঁর দুই সাহেবজাদা হজরত আব্দুল্লাহ এবং উবায়দুল্লাহর কাছে। এরপর তাদের নিকট থেকে নিয়ে হজরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র.) এটা কপি করিয়েছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে হস্তান্তরিত হয় হজরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহর নিকট। হজরত সালেম (র.) থেকে ইমাম ইবনে শিহাব জুহরি (র.) এটা মুখস্থ করেন ও অন্যদের শোনান।

৪. **সুহুফে আনাস ইবনে মালিক (রা.)** (صحف انس بن مالك رضى) : হজরত সায়িদ ইবনে বিলাল (র.) বলেন,

كنا اذا اكثرنا على انس بن مالك فاخرج الينا محالا عنده فقال هذه سمعتها من النبى صلى الله عليه وسلم فكتبتها و عرضتها .

'যখন আমরা হজরত আনাস ইবনে মালেক (র.)-এর নিকট বেশি পীড়াপীড়ি করলাম তখন তিনি তার কাছ থেকে একটি কাগজ বের করলেন। অতঃপর বললেন, রাসূল ﷺ থেকে এগুলো আমি শুনেছি, অতঃপর লিখেছি এবং এগুলো পেশ করেছি (তাঁর সামনে)।'

তাদবিনে হাদিস–সাইয়িদ মানাজির আহসান গিলানি : ৬৭-৬৮ মুস্তাদরাকে হাকেমের[১] বরাতে।

এতে বোঝা যায়, হজরত আনাস (রা.)-এর নিকট হাদিসের কয়েকটি সংকলন ছিলো।

৫. **সহিফায়ে আমর ইবনে হাজম (রা.)** (صحيفة عمرو ابن حزم رض) : হজরত আমর ইবনে হাজম (রা.)-কে যখন রাসূল ﷺ নাজরানের গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন, তখন তাঁর হাদিস সংবলিত একটি সহিফা তাঁর নিকট অর্পণ করেছিলেন। এটি লিখেছিলেন হজরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)। আবু দাউদ ইত্যাদিতে এ সহিফা থেকে বাছাইকৃত যেসব অংশ এসেছে সেগুলো দ্বারা বোঝা যায়, তাতে অন্তর্ভুক্ত ছিলো পবিত্রতা, নামাজ, জাকাত, হজ, উমরা, জিহাদ, সিরাত, গনিমত ইত্যাদি সংক্রান্ত হাদিস।

৬. **সহিফায়ে ইবনে আব্বাস (রা.)** (صحيفة ابن عباس رض) : হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর আজাদকৃত দাস কুরায়ব ইবনে আবু মুসলিম থেকে এই ইতিহাস 'তাবাকাতে ইবনে সাদ' বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কিতাবগুলোর এতো বিশাল ভাণ্ডার লাভ করেছিলেন যেগুলো পূর্ণ একটি উটের বোঝা ছিলো।

৭. **সহিফায়ে ইবনে মাসউদ (রা.)** (صحيفة ابن مسعود رض) : 'জামিউ বায়ানিল এলমি ওয়া ফাজলিহি' গ্রন্থে আল্লামা ইবনে আব্দুল বার বর্ণনা করেছেন যে, হজরত আব্দুর রহমান ইবনে মাসউদ (রা.) একটি গ্রন্থ বের করে বললেন, আমি শপথ করে বলছি যে, এটি লিখিত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কর্তৃক।

৮. **সহিফায়ে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)** (صحيفة جابر بن عبد الله رض) : মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে যে, হজরত জাবের (রা.) হজের বিধিবিধান সম্পর্কে একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। 'তারিখে কাবিরে' ইমাম বোখারি (র.) হজরত মা'মার (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন,

---

টীকা-১. ৩/৫৭৩-৫৭৪. كتاب معرفة الصحابة، ذكر انس بن مالك

قال رأيت قتادة قال لسعيد بن ابى عروبة امسك على المصحف فقرأ البقرة فلم يخط حرفا فقال يا ابا النضر لانا لصحيفة جابرحفظ منى لسورة البقرة ـ (كتاب التاريخ الكبير جـ٧. صـ٢٨٦)

'তিনি বলেন, আমি কাতাদাকে দেখেছি, তিনি সায়িদ ইবনে আবু আরূবাকে বলেছেন, মোসহাফটি আপনার নিকট ধরে রাখুন অতঃপর তিনি বাকারা তিলাওয়াত করলেন। একটি হরফও কিন্তু লিখলেন না। তিনি অতঃপর বললেন, হে আবু নজর! আমি জাবেরের সহিফা বেশি মুখস্থকারী সূরা বাকারা অপেক্ষা।'

৯. সহিফায়ে সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) (صحيفة سمرة بن جندب رض) : 'তাহজিবুত্ তাহজিবে' হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বর্ণনা করেছেন যে, সোলায়মান ইবনে সামুরা (রা.) স্বীয় পিতা সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) থেকে একটি বড় কপি বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সিরিন (র.) বলেন,

ان الرسالة التى كتبها سمرة لاولاده يوجد فيها علم كثير ـ

'সামুরা (রা.) যে পুস্তকটি তাঁর সন্তানদের জন্য লিখেছিলেন তাতে পাওয়া যায় প্রচুর বিদ্যা।'

১০. সহিফায়ে সা'দ ইবনে্ উবাদা (রা.) (صحيفة سعد بن عبادة رض) : 'তাবাকাতে' ইমাম ইবনে্ সা'দ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হজরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা.) একটি সহিফা বিন্যস্ত করেছিলেন। যাতে তিনি হাদিসগুলো সংকলন করেছিলেন।

১১. সুহুফে আবু হুরায়রা (রা.) (صحف ابى هريرة رحـ) : হজরত হাসান ইবনে আমরের এই ঘটনা ইমাম হাকেম (র.) মুস্তাদরাকে এবং আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (র.) জামিউ বায়ানিল এলমে' বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন– আমি হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর সামনে একটি হাদিস বর্ণনা করেছি। আবু হুরায়রা (রা.) এ হাদিস সম্পর্কে অবগত নন বলে প্রকাশ করলেন। আমি বললাম, আমি এ হাদিসটি শুনেছি আপনার কাছ থেকে। এর ফলে হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, যদি এ হাদিসটি আমি বর্ণনা করে থাকি, তাহলে তা আমার কাছে লিখিত থাকবে। ফলে তিনি হাদিসের কিছু কিতাব বের করে আনলেন। তালাশ করার পর সেগুলোতে সে হাদিস পেয়ে গেলেন।

বোঝা গেলো, হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর কাছে তাঁর বর্ণিত সমস্ত হাদিস লিপিবদ্ধ ছিলো। তাইতো তার কাছে ৫৩৬৪টি হাদিসের লিখিত একটি ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু এর ওপর প্রশ্ন হয় যে, হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর এই উক্তি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি লিখতাম না। তাহলে এই বিবরণের কী ব্যাখ্যা? এর জবাব হলো, এই উক্তির দ্বারা বোঝা যায় যে, হজরত আবু হুরায়রা (রা.) রিসালতযুগে এবং খুলাফায়ে রাশিদিনের প্রাথমিক যুগে হাদিস লিখতেন না; কিন্তু শেষ বয়সে মনে করলেন এই বর্ণনাগুলো আবার ভুলে যাই কিনা। তাই তিনি নিজের বর্ণিত হাদিসগুলো সংকলন করেছেন। অতএব, কোনো বৈপরীত্য রইলো না। এ কারণে হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর দিকে কয়েকটি হাদিস সম্বন্ধযুক্ত সহিফা রূপে।

ক. মুসনাদে আবু হুরায়রা (রা.) (مسند ابى هريرة رض) : আল্লামা ইমাম ইবনে সা'দ (র.) 'তাবাকাতে' বর্ণনা করেছেন যে, হজরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজের পিতা আব্দুল আজিজ ইবনে মারওয়ান মিসরের গভর্নর থাকাকালে কাসির ইবনে মুর্‌রাকে চিঠি লিখেছিলেন যে, আপনার নিকট সাহাবি বর্ণিত যতোগুলো হাদিস রয়েছে সেগুলো সব আমার কাছে পাঠিয়ে দিন শুধুমাত্র আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিস ছাড়া। কারণ, এগুলো আমার নিকট আছে। এতে বোঝা যায়, হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিসগুলো তাঁর কাছে মওজুদ ছিলো লিখিত আকারে।

খ. মুয়াল্লাফে বশির ইবনে নাহিক (র.) (مؤلف بشير بن نهيك) : হজরত বশির ইবনে নাহিক (র.) ছিলেন হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর শিষ্য। হজরত ইমাম দারেমি (র.) বর্ণনা করেছিলেন, তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আমি যা শুনতাম তা লিখে ফেলতাম। পরবর্তীতে আমি এই সংকলনটি হজরত আবু হুরায়রা

(রা.)-এর খেদমতে পেশ করলাম। বললাম, এগুলো সেসব হাদিস যেগুলো আপনার কাছ থেকে আমি শুনেছি। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, হ্যাঁ।

গ. সহিফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান (র.) ((صحيفة عبد الملك بن مروان (رحـ)) আগে লেখা হয়েছে, আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-কে ডেকে তার কিছু হাদিস লিখেছিলেন পরীক্ষামূলকভাবে।

ঘ. সহিফায়ে হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ (র.) (صحيفة همام بن منبة) : হজরত হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর প্রসিদ্ধ শিষ্য। তিনি হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিসগুলোর একটি সংকলন বিন্যস্ত করেছিলেন। যার নাম হাজি খলিফা উল্লেখ করেছেন কাশফুজ্জুনুনে আস্ সহিফাতুস্ সহিহা নাম বলে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) স্বীয় মুসনাদে এই সহিফাটি পরিপূর্ণ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (র.) ও স্বীয় সহিহে বহু হাদিস এই সহিফা সূত্রে এনেছেন। এই সহিফার কোনো হাদিস উল্লেখ করলে তিনি বলেন,

عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -

'হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ বলেন, এ হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক আমাদের নিকট বর্ণিত হাদিস। অতঃপর তিনি কতগুলো হাদিস উল্লেখ করলেন। বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন।'

কয়েক বছর পূর্বে সৌভাগ্যক্রমে পাওয়া যায় এই সহিফার মূল পাণ্ডুলিপিটি। এর একটি কপি জার্মানির বার্লিনের লাইব্রেরিতে রয়েছে। দ্বিতীয় কপিটি আছে দামেশকের কুতুবখানা মাজমায়ে এলমিতে। সিরাত ও ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ এ দুটি কপি মিলিয়ে তত্ত্ববিদ ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ এই সহিফাটি ছেপে দিয়েছেন। এতে ১৩৮টি হাদিস রয়েছে। মুসনাদে আহমদের সাথে যখন এটাকে মেলানো হয়, তখন কোথাও একটি হরফ বা একটি বিন্দুতেও পার্থক্য ছিলো না।

এ বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য উক্ত উদাহরণগুলো যথেষ্ট যে, রিসালতযুগে এবং সাহাবায়ে কেরামের জামানায় হাদিস লেখার নিয়ম খুব ভালোরূপে প্রচলিত ছিলো। শুধু বড় কয়েকটি সংকলনের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করলাম। এগুলো ছাড়া রাসূলে কারিম ﷺ যেসব ব্যক্তিগত চিঠি লিখেছেন অথবা কাউকে কোনো কথা লিখে দিয়েছেন কিংবা ফরমান জারি করেছেন এগুলোতো আলাদা। এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ বড় বড় কিতাবগুলোতে দেখা যেতে পারে। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, হাদিস সংকলনের এসব প্রচেষ্টা ছিলো ব্যক্তিগত ধরনের এবং সরকারিভাবে তিন খলিফার যুগে হাদিস সংকলন ও প্রকাশনার প্রতি এমন গুরুত্বারোপ ছিলো না, যেরূপ ছিলো কোরআন সংকলনের ক্ষেত্রে। কোরআনে কারিমের ন্যায় হাদিসের একটি সংকলন সরকারি তত্ত্বাবধানে তৈরি করানোর জন্য হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এবং উমর ফারুক (রা.) উভয়ই নিজ নিজ যুগে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু অবশেষে দুজনেই এ কাজটি থেকে বিরত থাকেন। যার কারণ হলো, তখন পর্যন্ত সরকারি তত্ত্বধানে তৈরি হয়েছিলো কোরআনে কারিমের শুধু একটি কপি। যদি হাদিসের কোনো সংকলনও এমন তৈরি করা হতো তাহলে ধারণা করা হতো যে, এর সাথে সাথে পরবর্তী মুসলমানদের সম্মান ও আজমত প্রায় কোরআনের পর্যায়ে পৌঁছে যেতো। তাছাড়া, কোরআনে কারিম ভুলে গিয়ে এর রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রচারে মশগুল হয়ে যাওয়ার এই আশঙ্কাটি হজরত উমর (রা.) প্রকাশ করেছেন নিম্নেযুক্ত ভাষায়,

انى كنت اردت ان اكتب السنن وانى ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فاكتبوا عليها وتركوا كتاب الله الخ (مقدمة فتح الملهم : صـ٢٣١ بحوالة مدخل للبيهقى)

'আমি মনস্থ করেছিলাম সুনান লিখতে। অতঃপর স্মরণ করলাম পূর্ববর্তী জাতির কথা। তারা অনেক কিতাব লিখেছে এবং সেগুলোর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, আর আল্লাহর কিতাব বর্জন করেছে।'

হজরত উমর (রা.)-এর এই সিদ্ধান্তের ওপর হাদিস 'অস্বীকারকারিরা নিজেদের আনন্দ প্রকাশ করেন এবং এটাকে দাঁড় করাতে চান হাদিসের প্রামাণিকতার বিরুদ্ধে প্রমাণরূপে। কিন্তু তাদের এ প্রমাণ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। প্রথমতো এ কারণে যে, হজরত উমর (রা.) সরকারিভাবে হাদিস সংকলনের বিরোধিতা করেছিলেন, ব্যক্তিগতভাবে লেখার নয়। এ কারণে তৎকালীন যুগে বহু সাহাবি হাদিস লিখে রেখেছিলেন ব্যক্তিগতভাবে। বাকি রইলো সে হাদিস যাতে উল্লেখ রয়েছে যে, উমর (রা.) সাহাবায়ে কেরামকে একত্রিত করে হাদিসের সংকলনগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বেশি বেশি হাদিস বর্ণনা করতে নিষেধ করতেন। এ বিষয়ে 'জামিউ বায়ানিল ইলমে' আল্লামা ইবনে আব্দুল বার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এর সারনির্যাস হলো, প্রথমতো এসব বর্ণনা দুর্বল। এ কারণে 'আল আহকামে' আল্লামা ইবনে হাজম (র.) এগুলোর মধ্য হতে প্রত্যেকটি রেওয়ায়াতের সমালোচনা করে তানকিদ করেছেন রাবিদের বিরুদ্ধে।

আর এসব রেওয়ায়াত যদি সহিহও হয় তবুও হজরত উমর (রা.)-এর মূল উদ্দেশ্য ছিলো চূড়ান্ত পর্যায়ের সতর্কতা যেনো হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে অবলম্বন করা হয়। আর এটা তখন সম্ভব ছিলো যখন প্রচুর হাদিস বর্ণনা প্রবণতার ওপর প্রথম দিকে কড়াকড়ি থাকে। হজরত উমর (রা.) অন্যথায় সতর্কতার সাথে হাদিস বর্ণনা করার বিরোধী ছিলেন না যে শুধু তাই নয়, বরং ছিলেন এর আহ্বায়ক। এ কারণেই তিনি ইসলামি বিশ্বের প্রতিটি প্রদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন শিক্ষক-মু'আল্লিম এবং তার উদ্দেশ্য এই বর্ণনা করেছেন যে, তারা জনগণকে ফরজ ও সুন্নতের তা'লিম দিবেন। স্বয়ং হজরত উমর (রা.) শত শত হাদিসের রাবি। তাঁর বর্ণিত হাদিস সংখ্যা সাতশ এর অধিক। হাফিজ আবু নু'আইম ইস্পাহানি (র.) তাঁর একাধিক সূত্র বাদ দিয়ে তাঁর বর্ণিত মূল পাঠের সংখ্যা দুই শতের অধিক বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া 'ইজালাতুল খাফাতে' হজরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ (রা.) তাঁর এই বক্তব্য লিখেছেন,

سيأتى اقوام ينكرون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا .

'এমন কতগুলো সম্প্রদায় শীঘ্রই আসবে যারা রজম বা প্রস্তর নিক্ষেপ, দাজ্জাল, শাফা'আত, কবরের আজাব অস্বীকার করবে এবং তারা এ কথাটিও অস্বীকার করবে যে, একটি কওম জাহান্নাম থেকে জ্বলে-পুড়ে বের হবে।'

প্রকাশ থাকে যে, এ বিষয়ের আলোচনা শুধু হাদিসেই রয়েছে। অতএব, শুধু তাঁর হাদিস সংকলনে অপ্রস্তুত থাকা অথবা প্রচুর হাদিস বর্ণনা করতে নিষেধ করার কারণে এই ফল কীভাবে বের করা যায় যে, তিনি ছিলেন হাদিসের প্রামাণিকতার বিরোধী? এরপর হজরত উসমান (রা.)-এর জামানায়ও হাদিস সংকলনের কাজ এই স্তরে রয়েছে, যে স্তরে ছিলো আবু বকর ও উমর (রা.)-এর যুগে।

হজরত আলি (রা.)-এর অবদান

প্রাথমিক যুগে হজরত আলি (রা.) হাদিস বেশি বর্ণনা করার বিরোধী ছিলেন। লোকজনকে নিজের হাদিসের সহিফাটিও খুব কম দেখাতেন। কিন্তু তাঁর যুগে আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার নেতৃত্বে মারাত্মক সাবায়ি ফিতনা প্রকাশ পেলো। যা ছিলো ইসলামের বিরুদ্ধে ইহুদিদের একটি ষড়যন্ত্র। তারা মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে ইসলামকে খতম করার চেষ্টা করেছিলো। আর এই উদ্দেশে দুটি কাজ আরম্ভ করেছিলো একসাথে।

১. জনসাধারণকে সাহাবি বিমুখ করা।

২. জাল হাদিস বানিয়ে একটি নতুন বিশ্বাসগত ব্যবস্থা তৈরি করা। যা করে হজরত আলি (রা.)-কে তো পৌঁছে দেওয়া হয়েছিলো খোদার আসনে। কিন্তু অন্যান্য সাহাবির ঈমান সম্পর্কেও সংশয় সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। হজরত আলি (রা.) এই বিরাট ফিতনা সম্পর্কে তখনই অনুভব করলেন, যখন সাবায়ি দলের লোকগুলো

মুসলমানদের মধ্যে ভালোরূপে মিশে গিয়েছিলো। তখনই হজরত আলি (রা.) এই বাক্যটি বলেছিলেন, যা ইবনে সাদ (র.) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন,

قاتلهم الله عصابة بيضاء سودوا واى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم افسدوا -

'তাদের আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করুন, কিরূপ শ্বেত-শুভ্র, নির্মল একটি দলকে তারা কলঙ্কিত করেছে! আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদিসকে তারা বিনষ্ট কিরূপ করে ফেলেছে!'

তাই হজরত আলি (রা.) এই ফিতনার দ্বার রুদ্ধ করার জন্য একদিকে ফাজায়িলে সাহাবা প্রচার করলেন। অপরদিকে হাদিসের ক্ষেত্রে পাল্টে দিলেন নিজের কর্মপদ্ধতি। এবার কম রেওয়ায়েতের পরিবর্তে হাদিস বেশি বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন। যার পদ্ধতি ছিলো এই যে, ইমাম ইবনে সাদ (র.)-এর উক্তি মতে তিনি মিম্বরে আরোহণ করে ঘোষণা দিতেন,

من يشترى منى علما بدرهم فاشترى الحارث الاعور صحيفة بدرهم فكتب فيها علما كثيرا -

'আমার কাছ থেকে কে এক দেরহামের বিনিময়ে এলেম ক্রয় করবে? অতঃপর হারেস আ'ওয়ার এক দিরহাম দিয়ে একটি সহিফা ক্রয় করলেন। তাতে লিখে রাখলেন প্রচুর এলেম।'

হজরত আলি (রা.) এমনভাবে সহিহ হাদিসগুলো প্রচুর পরিমাণ বর্ণনা করে সাহাবিদের জাল হাদিসের মুকাবিলা করেন। এ কারণে তাঁর শিষ্যদের মধ্য থেকে অনেকের কাছে তাঁর বর্ণিত হাদিসগুলোর সমষ্টি লিপি পাওয়া যায়।

হজরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র.)-এর জামানা

হজরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র.)-এর স্বীয় যুগ পর্যন্ত হাদিস লেখা ছিলো স্বীয় প্রথম দুটি স্তরেই। কিন্তু এবার হাদিস নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংকলনের যুগ এসে গেছে। কারণ, তখন কোরআনে কারিমের সাথে এর সংমিশ্রণ ও বিভ্রান্তির কোনো আশঙ্কা ছিলো না। এ কারণে সহিহ বুখারি : ১/২০, باب كيف يقبض العلم এ প্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণিত আছে যে, হজরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র.) মদিনা তাইয়্যিবার কাজি আবু বকর ইবনে হাজম (র.)-এর নামে একটি চিঠি লিখেছেন। তিনি তাতে তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন,

اُنْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْتُبْهُ فَاِنِّىْ خِفْتُ دُرُوْسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ -

'রাসূল ﷺ -এর হাদিস দেখে তা লিখে ফেলুন। কারণ, আমি আশঙ্কা করছি এলেম মিটে যাওয়ার ও ওলামায়ে কেরাম নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার।'

এই চিঠিটি মুয়াত্তা ইমাম মালেকেও বর্ণিত আছে। এতে হাদিসে নববির সাথে সুন্নাতে খুলাফায়ে রাশিদিন সংকলনের নির্দেশেরও উল্লেখ রয়েছে। অবশ্য এই দুটি গ্রন্থে এই নির্দেশ এসেছিলো শুধু মদিনার বিচারপতির নামে। কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার (র.) ফাতহুল বারিতে হাফেজ আবু নুআয়ম ইস্ফাহানির রেওয়ায়াতে বর্ণনা করেছেন যে, এই চিঠিটি শুধু মদিনার বিচারপতির নামে নয়; বরং প্রেরিত হয়েছিলো রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রদেশের বিচারপতির নামে। তাতে লেখা ছিলো,

فكتب بها الى الافاق - 'এই চিঠি তিনি রাষ্ট্রের দিক-দিগন্তের জন্য লিখেছেন।'

এ থেকে বোঝা যায়, হজরত উমর (রা.) তার পূর্ণ সাম্রাজ্যের বিরাট আকারে হাদিস সংকলনের কাজ আরম্ভ করেছিলেন। এজন্য তাঁর নির্দেশে হিজরি প্রথম শতাব্দির শেষের দিকে বাস্তব অস্তিত্ব লাভ করে হাদিসের নিম্নে বর্ণিত গ্রন্থাবলি।

১. কুতুবু আবি বকর (كتب ابى بكر) : যে নির্দেশ কাজি আবু বকর (র.)-কে দেওয়া হয়েছিলো আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (র.) এ সম্পর্কে নিজ গ্রন্থ 'আত্ তামহিদে' ইমাম মালেক (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হজরত আবু বকর (র.) হাদিসের কয়েকটি গ্রন্থ সংকলন করেন। কিন্তু হজরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র.)-এর একটি প্রেরণের পূর্বেই তিনি পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন।

২. সালেম ইবনে আব্দুল্লাহর সদকা সংক্রান্ত পুস্তিকা (رسالة سالم بن عبد الله فى الصدقات) : 'তারিখুল খুলাফা'য় আল্লামা জালালুদ্দিন (র.) বর্ণনা করেছেন যে, এই পুস্তিকাটি লেখা হয়েছিলো হজরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী।

৩. দাফাতিরুজ্ জুহরি : 'জামিউ বায়ানিল ইলমে' আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (র.) ইমাম জুহরি (র.)-এর এই বক্তব্য বর্ণনা করেছেন যে, উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র.) আমাদের হাদিস অথবা সুন্নত সংকলনের নির্দেশ দিয়েছেন। তখন আমরা বহু ভলিয়ম লিখে ফেলেছি। (বাস্তব ঘটনা ছিলো তৎকালীন যুগে ইমাম জুহরি (র.) অপেক্ষা বেশি হাদিস সংকলনের খেদমত অন্য কেউ খুবই কম আঞ্জাম দিয়েছেন।) সাম্রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চলে হজরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র.) এসব ভলিয়ম থেকে একটি করে প্রেরণ করেছেন।

৪. কিতাবুস্ সুনান লিমাকহুল (كتاب السنن لمكحول) : ইমাম ইবনে মাকহুল (র.) এ কিতাবটি লিখেছিলেন। যেনো এ কিতাব সংকলন দ্বারা হাদিস লেখার কাজ স্বীয় চতুর্থ পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। আল্লামা ইবনে নাদিম (র.) আল-ফিহরিস্তে-এর আলোচনা করেছেন। বাহ্যত এ গ্রন্থটিও লেখা হয়েছিলো হজরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র.)-এর নির্দেশ পালনার্থে। কারণ, হজরত মাকহুলও ছিলেন তৎকালীন সময়ের বিচারপতি।

৫. আবওয়াবুশ্ শা'বি (ابواب الشعبى) : এই সংকলন হজরত আমর ইবনে শুরাহবিলের লেখা। আল্লামা সুয়ুতি (র.) তাদরিবুর রাবিতে হাফেজ ইবনে হাজার (র.)-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন যে এটা হলো, বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত এলমে হাদিসের প্রথম গ্রন্থ। হজরত শা'বি (র.) যেহেতু কুফায় হজরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র.)-এর পক্ষ থেকে বিচারপতি ছিলেন, এজন্য বাহ্যত এই গ্রন্থটিও লেখা হয়েছিলো তাঁরই নির্দেশে। হজরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র.)-এর ওফাত ১০১ হিজরিতে হয়েছিলো। অতএব, এসব কিতাব লেখা হয়েছিলো এর পূর্বে।

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দি

এ বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত হাদিস গ্রন্থাবলির শুধু সূচনা এই ছিলো। হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দিতে হাদিস সংকলনের কাজ আরো অনেক জোরদারভাবে আরম্ভ হয়। এ যুগে যেসব হাদিস গ্রন্থ লেখা হয়েছে সেগুলোর সংখ্যা বিশেরও অধিক। তা থেকে প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থের নাম নিচে তুলে দেওয়া হলো,

১. কিতাবুল আছার লিল ইমাম আবি হানিফা (كتاب الاثار للامام ابى حنيفة) : এ কিতাবটিতেই সর্বপ্রথম হাদিসকে ফেকাহর তারতিবে সংকলন করা হয়। এলমে হাদিসে এ কিতাবটির অবস্থান অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ে। ইমাম আজম (র.) এ কিতাবের হাদিস সমূহকে চল্লিশ হাজার হাদিস হতে বাছাই করেছেন। (আল মানাবিক-মুওফিক) এ কিতাবটির কয়েকটি নুসখা রয়েছে। যথা– ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর নুসখা, ইমাম মুহাম্মাদ (র.)-এর নুসখা ও ইমাম জুফার (র.)-এর নুসখা। এ কিতাবটি মোয়াত্তা ইমাম মালেক (র.)-এর পূর্ব জামানার কিতাব। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, ইমাম মালেক (র.) ইমাম আজম আবু হানিফা (র.)-এর রচনাবলি হতে ফায়দা লাভ করেছেন। অতএব রচনাশৈলির দিক থেকে এ কিতাবটিকে মুয়াত্তায়ে মালেকের আসল তথা মূল বলা যেতে পারে। বহু ওলামায়ে কেরাম এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর বর্ণনাকারি জীবনীগ্রন্থ লিখেছেন। যাঁদের মধ্যে একজন হলেন– হাফেজ ইবনে হাজার (র.)।

এখানে আরেকটি কথা স্মর্তব্য যে, ইমাম আবু হানিফা (র.) কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে বিন্যস্ত গ্রন্থও এই কিতাবুল আছারই। তাছাড়া মুসনাদে ইমাম আবু হানিফা নামে বিভিন্ন ধরনের যেসব কিতাব পাওয়া যায়, সেগুলোও স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর সংকলন নয়; বরং তার অনেক পর মুহাদ্দিসিন, তার মুসনাদসমূহ তৈরি করেছেন। তন্মধ্যে হাফেজ ইবনে ওকবাহ, হাফেজ আবু নুআয়ম ইস্ফাহানি, হাফেজ ইবনে আদি, হাফেজ ইবনে আসাকির (র.) প্রসিদ্ধ। পরবর্তীতে আল্লামা খারিজমি এ সব মুসনাদকে একটি সংকলনে একত্রিত করে দিয়েছেন। তাতো মানুষের কাছে প্রসিদ্ধ 'জামেউ মাসানিদিল ইমামিল আ'জম' নামে।

২. মুয়াত্তা ইমাম মালেক (موطا امام مالك) : তৎকালীন যুগে এ গ্রন্থটিকে কোরআনের পর বিশুদ্ধতম গ্রন্থ বলা হতো। এরপর এই উপাধি পেয়েছে সহিহ বোখারি। কারণ, তাতে বিদ্যমান রয়েছে মুয়াত্তার সমস্ত হাদিসসহ অন্যান্য আরও অগণিত হাদিস।

৩. জামে' সুফিয়ান সাওরি (جامع سفيان ثوری) : এটিও ইমাম মালিক (র.)-এর সমকালীন। তৎকালীন যুগে কিতাবটি খুবই গ্রহণযোগ্য হয়েছিলো। কিন্তু আজকাল দুষ্প্রাপ্য।

৪. জামে' মা'মার ইবনে রাশি (جامع معمر بن رسيد) : এ কিতাবটি দ্বারা ইমাম শাফেয়ি (র.) উপকৃত হয়েছেন।

৫. সুনানে ইবনে জুরাইজ (سنن ابن جريج) : এটাকে সুনানে আবুল ওয়ালিদও বলে।

৬. সুনানে ওকি' ইবনুল জার্রাহ (السنن لوكيع بن الجراح)।

৭. কিতাবুজ্ জুহদ লিআব্দিল্লাহ ইবনে মুবারক (كتاب الزهد لعبد الله بن مبارك)।

তৃতীয় শতাব্দিতে হাদিস সংকলন

হাদিস সংকলনের কাজ এই শতাব্দিতে আপন যৌবনে পদার্পণ করে। সূত্রগুলো দীর্ঘ হয়ে যায়। হাদিস অনেক সূত্রে বর্ণিত হয় এবং এলেম ছড়িয়ে পড়ার কারণে হাদিস শাস্ত্রের ওপর লিখিত কিতাবাদি নতুন নতুন বিন্যাস ও বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্তির সাথে অস্তিত্ব লাভ করতে শুরু করে এবং হাদিস গ্রন্থাবলির বিশেষ অধিক প্রকার তৈরি হয়। রিজাল শাস্ত্র নিয়মতান্ত্রিক রূপ লাভ করে। এর ওপরও অনেক কিতাবাদি লেখা হয়। সিহাহ সিত্তা এ যুগেই সংকলিত হয়। এখানে সিহাহ সিত্তার পরিচয়ের কোনো প্রয়োজন নেই। প্রতিটি কিতাবের সূচনায় এগুলোর পরিচয় এসে যাবে। অবশ্য সেসব কিতাবের পরিচয় প্রদান উদ্দেশ্য যেগুলো পাঠ্যতালিকাতে নেই, কিন্তু এগুলোর বরাত প্রচুর পরিমাণে এলমে হাদিসের আলোচনায় আসে।

১. মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসি (مسند داؤد طيالسى) : ইনি হলেন আবু দাউদ তায়ালিসি। ইনি সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থকার আবু দাউদেরও আগের। কারো কারো বক্তব্য হলো, মুসনাদগুলোর মধ্যে এটিই হলো সর্বপ্রথম। কিন্তু সহিহ হলো, সর্বপ্রথম মুসনাদ 'মুসনাদে উবায়দুল্লাহ ইবনে মূসা'। আবু দাউদ তায়ালিসি যদিও তার আগের কিন্তু তাঁর মুসনাদ তাঁর ওফাতের অনেক পরে কোনো খুরাসানি আলিম বিন্যস্ত করেছেন। আর এটা তখন বিন্যস্ত হয়েছিলো যখন বাস্তাব অস্তিত্ব লাভ করেছিলো 'মুসনাদে উবায়দুল্লাহ ইবনে মুসা'।

২. মুসনাদে আহমদ (مسند احمد) : এটাকে বলা হয় ব্যাপকতম মুসনাদ। এতে প্রায় চল্লিশ হাজার হাদিস রয়েছে। ইমাম আহমদ (র.) যেগুলো চয়ন করেছেন সাড়ে সাত লক্ষ হাদিস থেকে। ইমাম আহমদ (র.) জীবদ্দশায় এ হাদিসগুলো সংকলন করেছিলেন। কিন্তু এগুলোকে অধ্যায় আকারে বিন্যস্ত করে যেতে পারেননি। তার আগেই ওফাত হয়ে গেছে। তারপর তাঁর মহান সাহেবজাদা আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ (র.) এগুলোকে বিন্যস্ত ও এগুলোর সংস্কার করেন এবং তাতে কুতায়ি (র.)ও কিছু সংযুক্ত করেন। যেগুলোকে বলা হয় 'জিয়াদাতুল মুসনাদ'। 'মুসনাদে আহমদে' সহিহ, হাসান এবং দুর্বল সব ধরনের হাদিস আছে। এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে যে, তাতে কোনো মওজু বা জাল হাদিসও আছে কি না। বহুকাল পর কেউ কেউ 'মুসনাদে আহমদকে ফিক্হি

অধ্যায়েও বিন্যস্ত করেছেন। আজকাল পূর্ববর্তীদের এই প্রচেষ্টার ফসল পাওয়া যায় না। অবশ্য 'আল-ফাতহুর রব্বানি' নামে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত 'মুসনাদে আহমদ' অস্তিত্ব এখনও রয়েছে।

৩. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক (مصنف عبد الرزاق) : যার জন্য আজকাল সুনান শব্দ প্রসিদ্ধ পূর্বকালে মুসান্নাফ শব্দটির সেই পারিভাষিক অর্থে প্রয়োগ হত। এই মুসান্নাফ ইমাম আব্দুর রাজ্জাক ইবনুল হাম্মাম আল-ইয়ামানি কর্তৃক বিন্যস্ত এবং কয়েক দিক দিয়ে বিচার করলে এ কিতাবটি অত্যন্ত সুমহান। প্রথমত এজন্য যে, আব্দুর রাজ্জাক ইমাম আবু হানিফা এবং মা'মার ইবনে রশিদের মতো ইমামগণের শিষ্য এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর স্পষ্ট বিবরণ অনুযায়ী এই মুসান্নাফের সবগুলো হাদিস সহিহ।

৪. মুসান্নাফে আবু বকর ইবনে আবু শায়বা (مصنف ابی بكر بن ابی شيبة) : তিনি ছিলেন ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম (র.) প্রমুখের উস্তাদ। তাঁর মুসান্নাফের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাতে শুধু আহকামের হাদিসগুলোকে সংকলন করা হয়েছে ফিকহি তারতিবে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাতে মারফু হাদিসগুলোর সাথে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িনের ফতওয়াগুলোও প্রচুর পরিমাণ বর্ণিত হয়েছে। এর ফলে হানাফিদের মূলনীতি অনুযায়ী হাদিস বোঝা সহজ হয়ে যায়। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাতে ইমাম ইবনে আবু শায়বা প্রতিটি মাজহাবের প্রমাণাদিকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার সাথে সংকলন করেছেন। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ইমাম আবু বকর স্বয়ং কুফার অধিবাসী হওয়ার কারণে ইরাকবাসিদের মাজহাব খুব ভালো করে বুঝে বর্ণনা করেছেন। এ কারণে হানাফিদের প্রমাণাদি এই গ্রন্থে প্রচুর পাওয়া যায়। আল্লামা জাহেদ আল-কাওসারি (র.) লিখেছেন,

احوج ما يكون الفقيه اليه كتاب ابن ابی شيبة . 'যার প্রতি একজন ফকিহ অধিক মুখাপেক্ষী- সেটি হচ্ছে ইবনে আবু শায়বার রচিত কিতাব 'মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা'।

৫. মুসতাদরাকে হাকেম (مستدرك حاكم) : এ কিতাবটি হলো, 'মুসতাদরাক আলাস্ সহিহাইন' বা বোখারি মুসলিমের সম্পূরক। কিন্তু হাদিস পরখ করার ক্ষেত্রে ইমাম হাকেম (র.) খুবই নরম বলে প্রসিদ্ধ। এজন্য তিনি অনেক এমন হাদিসকেও বোখারি, মুসলিম অথবা শুধু এ দুজনের কোনো একজনের শর্ত অনুযায়ী মনে করে নিজের কিতাবে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন, বাস্তবে যেগুলো খুবই জয়িফ। হাফেজ শামসুদ্দিন জাহাবি (র.) এই কিতাবটির একটি টীকা লিখেছেন। যাতে মুসতাদরাককে সংক্ষেপও করেছেন। আবার ইমাম হাকেম (র.)-এর ভ্রমগুলোর ব্যাপারে সতর্কও করেছেন। এই টীকাটিও মুসতাদরাকে হাকেমের সাথে হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য থেকে ছাপা হয়েছে। ইমাম হাকেম (র.) সম্পর্কে এ মত প্রকাশ করেছেন যে, তিনি ছিলেন শিয়া। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ অভিযোগ আমলে না এনে বরং তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

৬. মা'আজিমে তাবারানি (المعاجم للطبرانی) : ইমাম তাবারানির মু'জামগুলো তিন প্রকার। কাবির, আসওয়াত ও সগির। 'মু'জামে কাবির' বস্তুত মুসনাদ। অর্থাৎ, তাতে সাহাবিদের ক্রমানুসারে হাদিসগুলো সংকলন করা হয়েছে। 'মু'জামে আওসাতে' ইমাম তাবারানি (র.) নিজের উস্তাদদের ক্রমানুসারে হাদিসগুলো সংকলন করেছেন এবং তাতে শুধু নিজের উস্তাদদের গারায়িব ও তাফাররুদাত জমা করেছেন। নিজের প্রত্যেক উস্তাদের একেকটি রেওয়ায়াত 'মু'জামে সগিরে' উল্লেখ করেছেন এবং তাতে বেশির ভাগ এমন উস্তাদের রেওয়ায়াত যাঁদের কাছ থেকে ইমাম তাবারানি শুনেছেন মাত্র একটি রেওয়ায়াত।

৭. মুসনাদুল বাজ্জার (مسند البذار) : এই কিতাবটিকে 'আল-মুসনাদুল কাবির'ও বলা হয়। এটি ইমাম আবু বকর বাজ্জার কর্তৃক রচিত এবং মু'আল্লাল। অর্থাৎ, তাতে ইমাম বাজ্জার (র.) রেওয়ায়াতের ত্রুটির কারণগুলোও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। মু'আল্লাল গ্রন্থাবলির মূলনীতি হলো, যে হাদিসের ওপর তারা নিরবতা অবলম্বন করবেন সেগুলো তাদের মতে মনে করা হয় সহিহ অথবা আমলযোগ্য।

৮. মুসনাদে আবু ইয়ালা (مسند ابی يعلی) : যদিও কিতাবটি প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে মুসনাদ নামে, কিন্তু এটি মু'জাম।

৯. মুসনাদে দারেমি (مسند دارمی) : একেও পরিভাষার বিভোর মুসনাদ বলা হয়। মূলত এটি সুনান।

১০. সুনানে কুবরা-বায়হাকি (السنن الكبرى للبيهقى) : এটি ইমাম বায়হাকি (র.) ফিকহে শাফেয়ির প্রসিদ্ধ মূলপাঠ 'মুখতাসারুল মুজানির'র ক্রম বিন্যাসের ওপর সংকলন করেছেন। ছাপা হয়েছে হায়দারাবাদ দাক্ষিণাত্য থেকে।

১১. সুনানে দারাকুতনি (سنن دار قطنى) : (জন্ম : ৩০৬ হিজরি, ওফাত : ৩৮৫ হিজরি) : এই কিতাবটি অন্তর্ভুক্ত ফিকহি অধ্যায়ে। যাতে বর্ণিত হয়েছে প্রতিটি হাদিসের সূত্রগুলো অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে।

হাদিস শাস্ত্রের রচিত বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থ

সর্বোচ্চ পর্যায়ে এলমে হাদিসের সেবা করা হয় এবং এতে বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত হয়েছে বহু গ্রন্থ। এজন্য আলোচ্য বিষয় ও ক্রম বিন্যাসের দিকে লক্ষ্য করলে হাদিস গ্রন্থাবলি অনেক প্রকার হয়। তার মধ্যে প্রতিটি প্রকারের একেকটি বিশেষ পারিভাষিক নাম রয়েছে। হাদিসের ছাত্রদের কোনো কিতাবের শরণাপন্ন হওয়ার জন্য এসব প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ জেনে নেওয়া জরুরি।

১. الجوامع : শব্দটি جامع-র বহুবচন। جامع হাদিসের এমন গ্রন্থকে বলা হয়, যাতে হাদিস সংকলিত হয় আটটি বিষয়ের। এ আটটি বিষয় একটি কাব্যে একত্রে বর্ণিত হয়েছে;

سير اداب وتفسير وعقائد * فتن اشراط واحكام ومناقب ـ

"সিরাত, আদব, তাফসির, আকাইদ, ফিতনা, কিয়ামতের আলামত, আহকাম, ফাজায়িল ও মানাকিব।"

سير শব্দটি سيرة -এর বহুবচন। অর্থাৎ, সেসব বিষয় যেগুলোতে বর্ণিত হয়েছে প্রিয়নবী ﷺ-এর পবিত্র জীবনের ঘটনাবলি।

اداب। শব্দটি ادب-এর বহুবচন। অর্থ, সামাজিক শিষ্টাচার। যেমন, খাওয়া ও পান করার আদব।

تفسير অর্থাৎ, কোরআনের তাফসির সংক্রান্ত হাদিসগুলো।

عقائد অর্থাৎ, ধর্ম বিশ্বাস সংক্রান্ত হাদিসসমূহ।

فتن শব্দটি فتنة এর বহুবচন। অর্থাৎ, সেসব বড় বড় ঘটনা যেগুলো সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

اشراط। তথা কেয়ামতের আলামতসমুহ।

احكام। তথা আমল সংক্রান্ত বিধিবিধান। যেগুলো ফিকহের কিতাবে পাওয়া যায়। এগুলোকে সুনানও বলা হয়।

مناقب এটি منقبة-এর বহুবচন। অর্থাৎ, মহিলা-পুরুষ সাহাবি এবং বিভিন্ন গোত্র ও শ্রেণির ফাজায়িল। মোটকথা, যে কিতাবের মধ্যে এ আটটি বিষয় থাকবে সেটিকে বলে জামে'।

সর্বপ্রথম জামে' হলো জামে' মা'মার ইবনে রাশিদ (ইমাম আবু হানিফা আওর এলমে হাদিস- মাওলানা মুহাম্মদ আলি কান্দলবি) যেটি ইমাম জুহরি (র.)-এর প্রসিদ্ধ শিষ্য হজরত মা'মার (র.)–এর রচিত গ্রন্থ। হিজরি প্রথম শতাব্দিতেই এ গ্রন্থটি বিন্যস্ত হয়েছিলো। কিন্তু এখন আর এটি পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় হলো, জামে' সুফিয়ান সাওরি। এটি থেকে ইমাম শাফেয়ি (র.) উপকৃত হয়েছেন। এ কিতাবটিও পাওয়া যায় না।

তৃতীয় হলো, জামে' আব্দুর রাজ্জাক। এটি ইমাম আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাম সান'আনি কর্তৃক রচিত গ্রন্থ। হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দিতে এটি প্রসিদ্ধ হয়েছিলো। 'মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক' নামে এটি প্রসিদ্ধ। বর্তমানে এটি প্রকাশিত হয়েছে এগারো খণ্ডে। জামে' দারেমিও প্রসিদ্ধ জামে' গুলোর অন্তর্ভুক্ত। (লামিউদ্ দিরারি : ১/৪৪)

তবে জামে' বোখারি সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এরপর জামে' তিরমিযী। সিহাহ সিত্তার মধ্যে বোখারি এবং তিরমিযী জামে' হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। সহিহ মুসলিম সম্পর্কে অবশ্য মতানৈক্য আছে। অনেকে এটাকে জামে' বলেন। কারণ, তাতে ওপরযুক্ত আটটি বিষয়ই বিদ্যমান আছে। আবার অনেকে এটাকে এজন্য জামে' বলতে অস্বীকার করেন যে, তাতে তাফসির পর্ব খুবই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু সহিহ হলো, এটিও জামে'। কারণ, জামে' হওয়ার জন্য কোনো পর্ব বিস্তারিত হওয়া আবশ্যক নয়; বরং তার অস্তিত্বই যথেষ্ট। তাছাড়া সহিহ মুসলিমে তাফসির পর্বে যদিও হাদিস কম, কিন্তু এ পর্বটি অবশ্যই আছে। তাছাড়া তাফসিরের অনেক হাদিস ইমাম মুসলিম (র.) অন্য পর্বে বর্ণনা করে ফেলেছেন। এজন্য 'কামুস' গ্রন্থকার আল্লামা মাজদুদ্দিন ফিরুজাবাদি এটাকে সাব্যস্ত করেছেন জামে' বলে। 'কাশফুজজুনুন' গ্রন্থকারও এটাকে জামে'-এর কাতারে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

২. **السنن** : বলা হয় হাদিসের যে কিতাবটি ফিক্হি অধ্যায়ের তারতিবে বিন্যস্ত। এই প্রকারকে প্রাথমিক দিকে বলা হতো আবওয়াব। পরবর্তীতে এই নাম পরিবর্তিত হয়ে মুসান্নাফ নাম হয়ে যায় এবং অবশেষে এটাকে বলতে আরম্ভ করে 'সুনান'। এই প্রকারের সর্বপ্রথম কিতাব রচনা করেছেন ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর উস্তাদ হজরত আমির ইবনে শারাহিল আশ-শা'বি (র.)। যেটি 'আবওয়াবুশ শা'বি' নামে বিখ্যাত। সিহাহ সিত্তার মধ্যে নাসায়ি, আবু দাউদ, তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ সুনান। এজন্য সুনানে আরবাআ' এই চারটি সুনানকেই বলা হয়। এ চারটি সুনান ছাড়া সুনানে বায়হাকি, সুনানে দারেমি, সুনানে দারাকুতনি, সুনানে সাইদ ইবনে মানসুর এই প্রকারের প্রসিদ্ধ কিতাব। তাছাড়া সুনানে ইবনে জুরাইজ এবং সুনানে ওয়াকি ইবনুল জাররাহ এই প্রকারের প্রাচীন গ্রন্থ। তেমনটি মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা ইত্যাদিও এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ 'কিতাবুস্ সুনান'কেও মাকহুলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

৩. **المسانيد** : মুসনাদের বহুবচন। মুসনাদ হাদিসের এমন কিতাবের নাম যাতে হাদিসসমূহকে সংকলন করা হয় সাহাবায়ে কেরামের তারতিব অনুসারে। অর্থাৎ, একজন সাবাবির সমস্ত রেওয়ায়াত একবারে উল্লেখ করা হবে। চাই যে কোনো অধ্যায়ের সাথে তা সম্পৃক্ত করা হোক। তারপর দ্বিতীয় সাহাবি থেকে বর্ণিত হাদিস।

আর কোনো কোনো সময় ধর্তব্য হয় হরুফে হিজার তারতিব। কোনো সময় আগে ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি ধর্তব্যে এনে এমন সাহাবির হাদিস প্রথমে উল্লেখ করা হয়। আবার কেনো কোনো সময় শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি ধর্তব্য হয়। এমনভাবে মুসনাদগুলো বিন্যস্ত করা হয় মুহাজির ও আনসার শ্রেণির তারতিবেও।

হজরত নু'আয়ম ইবনে হাম্মার (র.) সর্বপ্রথম মুসনাদ[১] লিখেছেন। এরপর অগণিত মুসনাদ লেখা হয়েছে। এমনকি তৎকালীন যুগে এ বিষয়টি প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো যে, কোনো বড় মুহাদ্দিস এমন নেই যিনি মুসনাদ লেখেননি। এ কারণে ইমাম বোখারি (র.)-এর বহু উস্তাদ মুসনাদ গ্রন্থকার তাছাড়া উসমান ইবনে আবু শায়বা, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, আবু বকর ইবনে আবু শায়বাও মুসনাদ লিখেছেন। এসব মুসনাদের মধ্যে মুসনাদে আসাদ ইবনে মুসা, মুসনাদে আবদু ইবনে হুমাইদ, মুসনাদুল বাজ্জার এবং মুসনাদে আবু ইয়ালা সুপ্রসিদ্ধ। আজকাল ছাপা পাওয়া যায় তিনটি মুসনাদ আর এগুলোও বিখ্যাত।

১. মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসি। এটি প্রকাশিত হয়েছে দায়েরাতুল মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য থেকে।

২. মুসনাদে হুমায়দি। এটি প্রকাশ করেছে মজলিসে এলমি। এর লেখক ইমাম বোখারি (র.)-এর উস্তাদ।

৩. মুসনাদে ইমাম আহমদ। যেটি অত্যন্ত ব্যাপক মুসনাদ। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও সাধারণ্যে প্রচলিত।

টীকা. ১. তাদরিবুর রাবি'তে আল্লামা সুয়ুতি (র.) লিখেছেন, আল্লামা দারা কুতনি (র.) বলেছেন, সর্বপ্রথম মুসনাদ লিখেছেন নু'আয়ম ইবনে হাম্মাদ (র.)। খতিব (র.) বলেছেন, আসাদ ইবনে মুসা প্রথমে একটি মুসনাদ লিখেছেন। তিনি ছিলেন নু'আয়মের চেয়ে সাত বছরের বড়। হাকেম (র.) বলেছেন, সর্বপ্রথম মুসনাদ লিখেছেন মুসলিম রিজালের শিরোনাম ভিত্তিক উবায়দুল্লাহ ইবনে মূসা আল-আনাসি ও আবু দাউদ আত্-তায়ালিসি। ইবনে আদি (র.) বলেছেন, বলা হয়– ইয়াহইয়া আল-হিম্মানি সর্বপ্রথম কুফায় মুসনাদ লিখেছেন। আর বসরায় সর্বপ্রথম মুসনাদ লিখেছেন মুসাদ্দাদ (র.)। সর্বপ্রথম আসাদুস *সুন্নাহ মিসরে মুসনাদ লিখেছেন* ।–লামিউদ্ দিরারি : ১/৪৫

পেছনে এর পরিচয় এসেছে। বর্তমানে আল্লামা ইবনুস্ সা'আতি (র.) একটি অধ্যায়ের তারতিবে বিন্যস্ত করে ছেপেছেন। যেটি الفتح الربانى لترتيب مسند الإمام احمد بن حنبل الشيبانى নামে প্রসিদ্ধ। পেছনে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

৪. المعجم : সাধারণত মু'জাম এমন কিতাবকে বলে, যাতে কোনো মুহাদ্দিস তার শায়খ ও উস্তাদদের তারতিবে হাদিস সংকলন করেছেন। অর্থাৎ, এক শায়খের হাদিস এক স্থানে অন্য শায়েখের হাদিস অন্য স্থানে, অনুরূপ। কিন্তু শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া (র.) লিখেছেন এ সংজ্ঞাটি ঠিক না। বাস্তবতা হলো, মু'জাম হাদিসের এমন গ্রন্থ যাতে হরফে হিজার তারতিব কায়েম করা হয়েছে। চাই এ বিন্যাস সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হোক কিংবা শায়খের মধ্যে। এমনভাবে মু'জাম এবং মুসনাদের মাঝে عموم خصوص مطلق-এর সম্পর্ক হয়ে গেছে। এই প্রকারেরও বিভিন্ন কিতাব প্রসিদ্ধ রয়েছে। যেমন মু'জামে ইসমাইলি, মু'জামে ইবনুল গাওতি ইত্যাদি।[১] কিন্তু সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলো, ইমাম তাবারানির মু'জামগুলো। তিনি লিখেছেন তিনটি মু'জাম।

১. المعجم الكبير যেটিতে হাদিস সংকলন করা হয়েছে সাহাবায়ে কেরামের তারতিব হিসেবে।

২. المعجم الاوسط যাতে হাদিস সংকলিত হয়েছে শায়খগণের তারতিব অনুসারে।

৩. المعجم الصغير যাতে ইমাম তাবারানি (র.) নিজের সমস্ত শায়খগণের মধ্য হতে প্রত্যেকের একেকটি হাদিস উল্লেখ করছেন। প্রথমোক্ত দুটি কিতাব পাওয়া যায় না। তবে এগুলোর হাদিসগুলো আল্লামা হায়ছামি (র.)-এর 'মাজমাউজ জাওয়ায়িদে' পাওয়া যায়। অবশ্য 'আল-মু'জামুস সগির' প্রথমে ছাপা হয়েছে ভারতে অতঃপর মিসরে।

৫. المستدرك : বলা হয় সে গ্রন্থকে, যাতে সংকলন করা হাদিসের অন্য কোনো কিতাবের ছুটে যাওয়া হাদিসগুলোকে। যেগুলো ওপরযুক্ত কিতাবের শর্তানুযায়ী হয়। সহিহাইনের ওপর অনেক আলেম মুসতাদরাক লিখেছেন। তার মধ্যে কিতাবুল ইলজামাত লিদ্ 'দারাকুতনি' এবং 'আল-মুস্তাদরাক আলা সহিহাইন লিল হাফেজ আবি জর আবদ' সর্ববিখ্যাত।

(الرسالة المستطرفة - ص۲۲) কিন্তু প্রসিদ্ধতম কিতাব হলো, ইমাম আবু আবদুল্লাহ হাকেম নিশাপুরি (র.)-এর 'আল-মুস্তাদরাক আলাস্ সহিহাইন'। যেটি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত।

তিনি এতে সেসব হাদিস বর্ণনা করেছেন যেগুলো বোখারি-মুসলিমে নেই। কিন্তু তার ধারণা মতে বোখারি-মুসলিমের পরিপূর্ণ শর্তে সেটি উত্তীর্ণ। কিন্তু ইমাম হাকেম (র.) হাদিস সহিহ সাব্যস্ত করার বিষয়ে খুবই নরম ছিলেন। এ কারণে তিনি অনেক হাসান দুর্বল, মুনকার, বরং মওজু হাদিসকেও বোখারি-মুসলিমের শর্তে উন্নীত করে মুস্তাদরাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এজন্য হাফেজ জাহাবি (র.) এটিকে সংক্ষেপ করে ইমাম হাকেম (র.)-এর ভুলগুলো সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থটি হাকেমের মুস্তাদরাকের সাথে প্রকাশিত হয়েছে। হাদিস সম্পর্কে যতোক্ষণ পর্যন্ত তিনি বিশুদ্ধতার সত্যায়ন না করবেন- হাকেমের সহিহ সাব্যস্ত করার বিষয়টি ততোক্ষণ পর্যন্ত ধর্তব্য হবে না।

৬. المستخرج : এমন গ্রন্থকে বলে, যাতে অন্য কোনো কিতাবের হাদিসগুলোকে নিজের এমন সনদে বর্ণনা করা হয়; তাতে মূল গ্রন্থকারের সূত্র আসে না। যেমন, مستخرج ابى عوانة على صحيح مسلم। যাতে তিনি সহিহ মুসলিমের বর্ণনাগুলোকে এমন সনদে বর্ণনা করেছেন যেগুলোতে গ্রন্থকারের সূত্র আসে না। এমনভাবে مستخرج ابى نعيم على صحيح مسلم।

টীকা. ১. ইতহাফ গ্রন্থে অনেক মু'জামের উল্লেখ রয়েছে। তারমধ্যে রয়েছে মু'জামে আবু বকর আল-মুকরি, শিহাবুদ্দিন কাওসি, ইবনে কানে' প্রমুখ। -লামিউদ্ দিরারি : ১/৪৫

৭. **الجزء** : বলা হয় এমন কিতাবকে, যাতে একত্রিত করা হয় কোনো একটি শাখাগত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত হাদিসগুলোকে। যেমন,

جزء القرائة للامام البخارى (رحـ)، وجزء القرائة للبيهقى، وجزء رفع اليدين للبخارى، وجزء الجهر ببسم الله للدار قطنى، وجزء ببسم الله للخطيب البغدادى، وكتاب القراءة للبيهقى

এ কালের হজরত শাহ সাহেব (র.) এবং মুফতি সাহেব (র.)-এর কিতাব التصريح بما تواتر فى نزول المسيح। এবং শায়খুল হাদিস হজরত মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া কান্দলবি (র.)-এর جزء حجة الوداع ও এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। অনেকে এর সাথে হাদিস গ্রন্থের আরেকটি প্রকার الرسالة ও বর্ণনা করেছেন। এর সংজ্ঞা হলো, এটি এমন হাদিস গ্রন্থ, যাতে শুধু কোনো একজন শায়খের হাদিসগুলো একত্রিত করা হয়। কিন্তু সহিহ হলো, এটি স্বতন্ত্র কোনো প্রকার নয়; বরং الجزء এর সমার্থবোধক।

৮. **المشيخة** : বলা হয় এমন কিতাবকে, যাতে কোনো একজন অথবা কয়েকজন শায়খের হাদিসগুলো একত্রিত করা হয়। যেমন, مشيخة ابن البخارى।

৯. **الافراد والغرائب** : বলা হয় এমন কিতাবকে, যেগুলোতে একত্রিত করা হয় কোনো একজনের তাফাররুদাত। যেমন, كتاب الافراد للدار قطنى ।

১০. **التجريد** : কোনো কিতাবের হাদিসের সনদ এবং পুনরাবৃত্তিগুলোকে বাদ দিয়ে শুধু সাহাবির নাম এবং হাদিসের মূলপাঠ বর্ণনা করে দেওয়া। যেমন, تجريد مسلم للقرطبى، تجريد البخارى للزبيدى، تجريد الصحيحين ইত্যাদি।

১১. **التخريج** : হলো এমন গ্রন্থ, যাতে অন্য কোনো কিতাবের মু'আল্লাক অথবা বরাতবিহীন হাদিসগুলোর সনদ ও বরাত বর্ণনা করা হয়। যেমন হিদায়াতে সবগুলো হাদিস বরাতবিহীন এই হাদিসগুলোর সনদ এবং বরাত তালাশ করার উদ্দেশে যেসব কিতাব লেখা হয়েছে সেগুলোকে হিদায়ার তাখরিজ বলে। যেমন, "نصب الراية فى تخريج احاديث الهداية للزيلعى" এবং হাফেজ ইবনে হাজার (র.)-এর "الدراية فى تخريج احاديث الهداية" এভাবে তিনি "التلخيص الحبير فى تخريج احاديث الرافعى الكبير"[১], নামক একটি বিস্তারিত গ্রন্থও লিখেছেন। তাতে শাফেয়ি ফিকহের একটি প্রসিদ্ধ মূলপাঠ রাফেয়ির হাদিসগুলোর তাখরিজ করেছেন। তার এ গ্রন্থটি আহকাম সংক্রান্ত হাদিসের সবচেয়ে ব্যাপক ভাণ্ডার মনে করা হয়। এমনভাবে তার কিতাব الكافى الشافى فى تخريج احاديث الكشاف তদ্রূপ হাফেজ জায়নুদ্দিন ইরাকি (র.)-এর কিতাব تخريج احياء علوم الدين অত্যন্ত উপকারী। এতে হাফেজ ইরাকি (র.) তাখরিজ করেছেন ইমাম গাজালি (র.)-এর احياء العلوم-এর হাদিসগুলোর।

তা হলো, ইমাম রাফেয়ি (র.)-এর শরহুল কাবির আলা ওয়াজিজিল গাজালি ফিল ফিকহিশ শাফেয়ি-এর তাখরিজ। এর হাদিসগুলো সিরাজুদ্দিন উমর ইবনুল মুলাক্কান তাখরিজ করেছেন 'আল-বাদরুল মুনির ফি তাখরিজিল আহাদিস ওয়াল আছার, আল-ওয়াকিয়া ফি শরহিল কাবির' নামক সাত খণ্ড বিশিষ্ট একটি গ্রন্থে।

টীকা. ১. এটা ইমাম রাফেয়ি (রহ)-এর শরহে কাবির এর তাখরিজ যা ওয়াজিজুল গাজালি ফিক্‌হিশ্ শাফেয়ি নামক কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। সিরাজুদ্দিন উমর ইবনে মুলাক্কিনও শরহে কাবিরের তাখরিজ প্রণয়ন করেছে। যার নাম দিয়েছেন كتاب البدر المنير فى تخريج الاحاديث والاثار الواقعة فى الشرح الكبير *কিতাবটি সাত খণ্ডে সমাপ্ত।*
–আর-রিসালাতুল মুসতাতরাফাহ : ১৫৪

১২. كـتـب الـجـمـع : বলা হয় এমন গ্রন্থাবলিকে, যেগুলোতে একত্রিত করা হয় একাধিক হাদিসগ্রন্থের রেওয়ায়াতগুলোকে পুনরাবৃত্তি বাদ দিয়ে। এ প্রকার গ্রন্থের মধ্যে প্রথম হলো, ইমাম হুমায়দি (র.)-এর الجمع بين الصحيحين তারপর হাফেজ রজিন ইবনে মু'আবিয়া (র.) تجريد الصحاح الستة লিখেছেন। তাতে সিহাহ সিত্তার সমস্ত হাদিস একত্রিত করা হয়েছে। অথচ তার ভাষায় ইবনে মাজাহ-এর পরিবর্তে মুয়াত্তা ইমাম মালেক সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তিনি এ কারণে নিজ গ্রন্থে ইবনে মাজাহ-এর পরিবর্তে মুয়াত্তা ইমাম মালিকের সব হাদিস জমা করেছেন। তারপর হাফেজ ইবনে আছির জাজরি (র.) جامع الاصول নামে একটি কিতাব লিখেছেন। তাতে তিনি একত্রিত করেছেন সিহাহ সিত্তার হাদিসগুলোকে। হাফেজ রজিন ইবনে মু'আবিয়া (র.) থেকে যেসব হাদিস ছাড় পড়েছিলো সেগুলোকেও তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু তাঁর পরিভাষায় মুয়াত্তা ইমাম মালেক সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিলো, ইবনে মাজাহ নয়। তারপর আল্লামা নুরুদ্দিন হায়ছামি (র.) তাশরিফ আনেন। তিনি এসে مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 'মাজমাউজ জাওয়ায়িদ ও মামবাউল ফাওয়ায়িদ' নামে একটি বিশাল গ্রন্থ লিখেন এবং তাতে একত্রিত করেছেন মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে বাজজার, মুসনাদে আবু ইয়ালা এবং ইমাম তাবারানির তিন মু'জামের অতিরিক্ত হাদিসগুলোও। সিহাহ সিত্তায় যেগুলো নেই। কিন্তু আল্লামা হায়ছামির পরিভাষায় ইবনে মাজাহ সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিলো, মুয়াত্তা ইমাম মালিক নয়। তিনি মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদে ইবনে মাজাহ-এর হাদিসগুলো নেননি। এর ফল এই হলো যে, ইবনে মাজাহ-এর হাদিসগুলো না 'জামউল উসুলে' জমা হলো, না 'তাজরিদুস্ সিহাহিস্ সিত্তা'তে, না 'মাজমাউজ জাওয়ায়িদে'। তারপর আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুলায়মান 'জামউল ফাওয়ায়িদ মিন জামিইল উসুলি ওয়া মাজমাউজ জাওয়ারিদ' নামে একটি কিতাব লিখেছেন, তাতে একদিকে তো جامع الاصول এবং مجمع الزوائد এর সমস্ত হাদিস পুনরাবৃত্তি বাদ দিয়ে জমা করেছেন। তাছাড়া ইবনে মাজাহ যেটি তাদের দু'জন থেকে ছুটে গিয়েছিলো-এর বর্ণনাগুলোও নিয়ে নিয়েছেন; তাছাড়া সুনানে দারেমির রেওয়ায়াতগুলোও সংকলন করেছেন। এই কিতাবটি এভাবে পরিহিত হয় ১৪টি হাদিস গ্রন্থের বিশাল সমষ্টিতে। নিঃসন্দেহে جمع الفوائد 'জমউল ফাওয়ায়িদ' সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও একটি ব্যাপক ভাণ্ডার। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা হলো এতে ছাড় পড়েছে অনেক হাদিস। যদি কোনো হাদিস এতে না পাওয়া যায় তবে এটা বোঝা ভুল হবে যে, এ হাদিস ১৪টি কিতাবের মধ্যে নেই।

'কিতাবুল জমা' এর আওতায় যেসব কিতাবের আলোচনা এতোক্ষণ পর্যন্ত করলাম, এগুলো সব অধ্যায়ের তারতিবে লিখিত হয়েছে। কেউ কেউ হুরূফে হিজার তারতিবেও হাদিসগুলোকে জমা করেছেন। এ ধরনের সর্বপ্রথম কিতাব হলো, 'ফিরদাউসুদ্ দায়লামি'। কিন্তু এই কিতাবটি পাওয়া যায় না। এরপর 'জমউল জাওয়ামি' নামক একটি কিতাব আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি (র.) রচনা করেছেন। তাতে পুরো হাদিস ভাণ্ডার একত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। তাতে তিনি বাচনিক হাদিসগুলোকে হুরূপে হিজার তারতিবে জমা করেছেন। আর ক্রিয়াবাচক হাদিসগুলোকে সাহাবায়ে কেরামের তারতিবে। অতঃপর আল্লামা সুয়ুতি (র.) এই কিতাবের সারসংক্ষেপ করেন, الجامع الصغير فى احاديث البشير النذير নামে। এই কিতাবটিতে সমস্ত হাদিসের বর্তমান কিতাবগুলো থেকে বাচনিক হাদিসগুলোকে হুরূফে হিজার তারতিবে সংকলন করেছেন। جمع الجوامع আজকাল পাওয়া যায় না। কিন্তু الجامع الصغير প্রচলিত আছে। আর এতে প্রতিটি হাদিসের সাথে এর বরাত ছাড়াও এর সনদগত মর্যাদা এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, সহির জন্য صح, দুর্বলের জন্য ض, আর হাসানের জন্য ح অক্ষর লিখে দিয়েছেন। কিন্তু মাওলানা আব্দুল হাই লাখনবি (র.) الاجوبة الفاضلة صـ١٢٧ গ্রন্থে লিখেছেন যে, এসব আলামত বা চিহ্ন আল্লামা সুয়ুতি (র.) লাগাননি; বরং সংযুক্ত করেছেন তার পরবর্তী কেউ।[১]

টীকা. ১. এজন্য এসব সংকেতের ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। আল্লামা মানাবি (র.) বলেছেন, কোনো কোনো কপিতে যে. ص - ح ও ض -এর মাথা দ্বারা সহিহ, হাসান ও জয়িফের দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সেগুলোর ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। কারণ, এগুলোতে লিপিকারদের পক্ষ থেকে প্রচুর বিকৃতি ঘটেছে। তাছাড়া এগুলো কোনো কোনো হাদিসে দেওয়া হয়েছে আবার কোনো কোনোটিতে দেওয়া হয়নি, আমি তা দেখেছি তার লেখায়।" (فيض القدير : جا ، صـ٤٠ باحالة الفاضلة مع تعليقة : صـ١٢٧)

الجامع الصغير-এর ওপর লেখা হয়েছে বিভিন্ন ব্যাখ্যা গ্রন্থও। তার মধ্যে আল্লামা মানাবি (র.)-এর 'ফয়জুল কাদির' আল্লামা আজিজি (র.)-এর 'আস্ সিরাজুল মুনির' প্রসিদ্ধ এবং প্রচলিত। এ দুজনের মধ্য থেকে আল্লামা মানাবি (র.) হাদিসকে বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে অধিক সতর্কতা অবলম্বনকারি। এর পরিপন্থী কিছুটা ঢিলে আল্লামা আজিজি (র.)।

সবচেয়ে মূল্যবান এবং ব্যাপক কাজ করেছেন এ প্রসঙ্গে আল্লামা আলি আল-মুত্তাকি। তার গ্রন্থ كنز العمال فى سنن الاقوال والافعال (কানজুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফআল) যেটাকে নিঃসন্দেহে হাদিসে নববির ব্যাপকতম গ্রন্থ বলা উচিত। তিনি তার এই গ্রন্থটির ভিত্তি আল্লামা সুয়ুতি (র.)-এর جمع الجوامع-এর ওপর রেখেছেন। অর্থাৎ, প্রথমে জমা করেছেন প্রতিটি অধ্যায়ের সে বাচনিক হাদিসগুলো যেগুলো جمع الجوامع-তে ছিলো। এরপর একত্রিত করেছেন সেসব বাচনিক হাদিস যেগুলো আল্লামা সুয়ুতি (র.) থেকে ছাড় পড়েছিলো। এর নাম রেখেছেন الاكمال فى سنن الاقوال (আল-ইকমাল ফি সুনানিল আকওয়াল) অতঃপর جمع الجوامع এর ক্রিয়া বাবদ যেসব হাদিসগুলো সাহাবার তারতিবে বিন্যস্ত ছিলো সেগুলোকে বিন্যস্ত করেছেন অধ্যায়ের তারতিবে। এর সমষ্টির নাম كنز العمال। এতে প্রত্যেকটি হাদিসের সাথে এর উৎসের বরাত দিয়েছেন নির্ঘণ্টতে। যেমন, বুখারির জন্য خ মুস্তাদরাকে হাকেমের জন্য ك ইত্যাদি। আল্লামা আলি আল মুত্তাকি নিজ গ্রন্থে একত্রিত করে দিয়েছেন প্রায় ৩০টি হাদিসের কিতাব। এভাবে এ গ্রন্থটি অনুপম দিক নির্দেশকের মর্যাদা রাখে কোনো হাদিসের তাহকিকের জন্য।

১৩. الفهارس : হলো এমন হাদিসের কিতাব, যাতে জমা করে দেওয়া হয়েছে এক অথবা একাধিক হাদিসের কিতাবের সূচি। হাদিস বের করা যাতে সহজ হয়। যেমন আল্লামা জাহেদ আল-কাওসারি (র.)-এর এক শিষ্য فهارس البخارى (ফাহারিসুল বোখারি) নামে একটি বড় উপকারী গ্রন্থ লিখেছেন। যার ফলে বোখারি থেকে হাদিস বের করা খুবই সহজ হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে একটি ব্যাপক এবং উপকারী কাজ প্রাচ্যবিদদের একটি দল দ্বারা আল্লাহ তা'আলা নিয়েছেন। যে দলটি ড. উইনসিংকের নেতৃত্বে সাতটি বিশাল খণ্ডে একটি বিস্তারিত কিতাব বিন্যস্ত করেছেন। যার নাম হলো, 'আল-মু'জামুল মুফাহরাস লি আলফাজিল হাদিসুন্ নববি' যাতে তারা সিহাহ সিত্তা, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, সুনানে দারেমি এবং মুসনাদে আহমদের হাদিসগুলোর সূচি বিন্যস্ত করেছেন। এর পদ্ধতি হলো, হরুফে হিজা হিসেবে তাঁরা প্রতিটি শব্দের অধীনে বর্ণনা করেছেন যে, এ শব্দটি কোনো হাদিসে এসেছে এবং এটি উল্লিখিত হয়েছে হাদিসের কোনো কোনো জায়গায়। অবশ্য এই কিতাবে তারা সবগুলো হাদিস আনতে পারেননি; অনেকগুলো হাদিস এর থেকে ছুটে গেছে। অতঃপর এই কিতাবের একটি সারসংক্ষেপ ড. উইনসিংক 'মিফতাহু কুনুজিস্ সুন্নাহ' নামে প্রকাশ করেছেন। সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে যেটি অনেক উপকারী এবং প্রতিটি তালেবে এলমের জন্য এটি খুবই প্রয়োজন।

১৪. الاطراف : হাদিসের সেসব কিতাব যেগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে হাদিসের শুধু প্রথম ও শেষ শব্দ। যার মাধ্যমে পুরো হাদিস চেনা যায় এবং শেষে এ হাদিসের বরাত উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ হাদিসগুলো নেওয়া হয়েছে অমুক অমুক হাদিসের কিতাব থেকে। এর ফায়দা এই হয় যে, অনেক সময় এক ব্যক্তির মনে হাদিসের প্রথম অথবা শেষাংশ স্মরণ থাকে, কিন্তু পরিপূর্ণ হাদিসটি মনে থাকে না, এর সনদগত মর্যাদা স্মরণ থাকে না। اطراف-এর গ্রন্থাবলি এমন স্থানে খুবই উপকারে আসে।

সর্বপ্রথম এ বিষয়ে কিতাব লিখেছেন, আল্লামা হাফেজ ইবনে আসাকির দামেশকি (র.)। যেটি পূর্ণ হয়েছে দুই খণ্ডে। এর নাম 'আল-আশরাফ ফি মা'রিফাতিল আতরাফ'। হাফেজ ইবনে আসাকির (র.) এতে আবু দাউদ, নাসায়ি, তিরমিযীর اطراف উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থটিকে তিনি বিন্যস্ত করেছেন হুরুফে মু'জামের ওপর। এটি দুষ্প্রাপ্য।

এ বিষয়ে হাফেজ আবদুল গনি মাকদামি (র.) একটি গ্রন্থ লিখেছেন 'আতরাফুল কুতুবিস্ সিত্তাহ' নামে। আজকাল এ ধরনের সবচেয়ে বেশি প্রচলিত কিতাব হলো, হাফেজ মিজ্জি (র.)-এর 'তুহফাতুল আশরাফ ফি মা'রিফাতিল আতরাফ'। 'আল ফাহারিস'-এর অধীনে বর্ণিত المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوى এবং এ গ্রন্থের সারনির্যাস مفتاح كنوز السنة এই প্রকারের কটি কিতাব।

১৫. الاربعينات : الأربعين –এর বহুবচন। অর্থাৎ চল্লিশ হাদিসের যেগুলোতে চল্লিশটি হাদিস কোনো এক অধ্যায় অথবা বিষয়ে অথবা বিভিন্ন বিষয়ে সংকলিত হয়েছে। এ বিষয়ে লেখা গ্রন্থাবলি অগণিত। অগণিত মুহাদ্দিস اربعين লিখেছেন। তাদের উদ্দেশ্য ইমাম বায়হাকির লেখা ওই হাদিসের ওপর আমল করা যেটি তিনি شعب الايمان এ হজরত আবুদ দারদা (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন,

قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حد العلم الذى اذا بلغه الرجل كان فقيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على امتى اربعين حديثا فى امر دينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا - (مشكوة جا ص٣٦ كتاب العلم فصل الثالث)

'রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, এলমের যে পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছলে একজন ব্যক্তি ফকিহ্ হয়ে যায়, এর সীমা কতোটুকু? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করলেন, যে আমার উম্মতের জন্য তাদের দীনি ব্যাপারে চল্লিশটি হাদিস মুখস্থ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ফকিহরূপে (পুনরুত্থানকালে) উঠাবেন এবং আমি তার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশকারি ও সাক্ষ্য প্রদানকারি।

সাধারণ মানুষের মধ্যে এ হাদিসটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু ইমাম আহমদ (র.)-এর বক্তব্য রয়েছে,

حديث متنه مشهور فيما بين الناس وليس له اسناد صحيح (كذا فى المشكوة)

'এটি জনসাধারণের মাঝে একটি প্রসিদ্ধ হাদিস, কিন্তু এর কোনো বিশুদ্ধ সনদ নেই।'

ইমাম নববি (র.) এ কারণে স্বীয় اربعين-এর শুরুতে এ হাদিস সম্পর্কে লিখেছেন, اتق الحفاظ على انه حديث ضعيف وان كثرت طرقه 'এ ব্যাপারে হাফেজে হাদিসগণ একমত যে, এ হাদিসটি দুর্বল। এর সূত্র যদিও অনেক।'

হাদিসটি এ কারণে সনদগতভাবে দুর্বল। অবশ্য সূত্রের আধিক্যের কারণে এ হাদিসটিকে বলা যায় হাসান লিগায়রিহি। উম্মতের অনেক আলেম ও মুহাদ্দিস এ কারণে এর ওপর আমল করেছেন। اربعين (চল্লিশ হাদিস বিশিষ্ট গ্রন্থগুলো) লিখেছেন। আমাদের জানা মতে সর্বপ্রথম اربعين লিখেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) অতঃপর মুহাম্মদ ইবনে আসলাম তুসি। পরবর্তীতে অসংখ্য আলেম। যেমন– ইমাম দারাকুতনি, হাকেম আবু নুআইম, আবু আব্দুর রহমান সুলামি, আবু বকর বায়হাকি প্রমুখ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর চল্লিশ হাদিস বিন্যস্ত করেছেন।

১৬. الموضوعات : সেসব কিতাব যেগুলোতে সংকলন করা হয়েছে জাল হাদিস। অথবা সংকলন করা হয়েছে হাদিস যা জাল করার অভিযোগে অভিযুক্ত। অথবা হাদিস জাল করার অভিযোগে অভিযুক্ত হাদিসগুলোর তাত্ত্বিক আলোচনা প্রদান করা হয়েছে। প্রথম দিকে মওজু সংক্রান্ত কিতাবগুলো এভাবে লেখা হতো যে, দুর্বল রাবিদের আলোচনা করা হতো এবং তাদের থেকে যেসব মওজু বা দুর্বল হাদিস বর্ণিত হয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করা হতো। হাফেজ ইবনে আদি (র.)-এর 'আল-কামিল', ইমাম উকায়লি (র.)-এর "الضعفاء" ইমাম জাওজেকানি (র.)-এর 'আল-আবাতিল' এ ধরনের[১]।

টীকা- ১. কিন্তু তার কিতাবকেও কঠোর সাব্যস্ত করা হয়েছে।

তারপর পদ্ধতি পরিবর্তন হলো জাল অথবা জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্তকে অধ্যায়ের তারতিবে অথবা হরূফে হিজার তারতিবে উল্লেখ করে এমন বলা হয় যে, এগুলো কে বর্ণনা করেছেন। এর সূত্রে কি ত্রুটি আছে? এ বিষয়ে সর্বপ্রথম কলম ধরেছেন আল্লামা ইবনুল জাওজি (র.)। এ বিষয়ে তার দুটি গ্রন্থ আছে।

১. العلل المتناهية فى الاخبار الواهية

২. الموضوعات الكبرى

তার মধ্যে দ্বিতীয়টি আজও পাওয়া যায়। কিন্তু ওলামায়ে কেরামের ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, হাদিসগুলোতে মওজুর হুকুম লাগানোর ক্ষেত্রে আল্লামা ইবনুল জাওজি (র.) খুবই কট্টরপন্থী। তিনি বহু সহিহকেও মওজু সাব্যস্ত করেছেন। এজন্য পরবর্তী মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরাম তার কিতাবগুলো নিয়ে তানকিদ তথা যাচাই-বাছাই ও বাছবিচার করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র.) তার বিপরীতে القول المسدد فى الذب عن مسند নামক গ্রন্থে এর খুব ভালো রদ করেছেন। এ কিতাবে হাফেজ (র.) মুসনাদে আহমদের সেসব হাদিস সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন, যেগুলোকে ইবনুল জাওজি (র) মওজু বা জাল সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, ইবনুল জাওজি (র.) যেসব হাদিসকে মওজু সাব্যস্ত করেছেন সেগুলোর মধ্য থেকে একটি হাদিস সহিহ মুসলিমেও আছে। একটি হাদিস বোখারির আহমদ শাকিরের কপিতেও আছে এবং এমন হাদিসতো প্রচুর যেগুলো ইমাম বোখারি (র.) প্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণনা করেছেন, অথচ ইবনুল জাওরি (র.)-এর মওজুআতের ওপর বিস্তারিত একটি তানকিদ লিখেছেন। যার নাম দিয়েছেন– "النكت البديعات على الموضوعات"। পরবর্তীতে এর সারসংক্ষেপও করেছেন এবং তাতে কিছু সংযোগ করেছেন। যেটি "اللا لى المصنوعة فى الاحاديث الموضوعة" নামে প্রসিদ্ধ। এটি ছাপা হয়েছে কয়েক খণ্ডে। কিন্তু আল্লামা সুয়ুতি (র.) হাদিসের ব্যাপারে কিছুটা নরম। এজন্য কোনো কোনো দুর্বল অথবা মুনকার হাদিসকেও তিনি সহিহ সাব্যস্ত করে দেন। আল্লামা ইবনুল জাওজি (র.)-এর পর খুবই মকবুল হয়েছে হাফেজ সান'আনি (র.)-এর 'মওজুআত'। আল্লামা ইবনুল জাওজি এবং সুয়ুতি (র.)-এর পর বহু আলেম মওজুআতের ওপর অনেক কিতাব রচনা করেছেন। তারমধ্যে মোল্লা আলি কারি (র.)-এর "الموضوعات الكبري" নেহায়েত গ্রহণযোগ্য প্রসিদ্ধ। আখেরি যুগে কাজি শওকানি (র.)-এর "الفوائد المجموعة فى الاحاديث الموضوعة" এবং আল্লামা তাহের পাটনি (র.)-এর تذكرة الموضوعات সংক্ষিপ্ত কিন্তু উপকারী কিতাব। এ ধরনের বা এই প্রকারের সর্বজনীন ও ব্যাপকতর কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন আল্লামা ইবনে ইরাক (র.)। তিনি "تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاحاديث الشنية" নামক নিজ গ্রন্থে ইবনুল জাওজি, জাওজেকানি এবং সুয়ুতি (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসগুলোর থেকে শুধু যেগুলো বাস্তবেই মওজু বা জাল সেসব হাদিস সংকলন করেছেন।

১৭. كتب الاحاديث المشتهرة : সেসব কিতাব যেগুলোতে হাদিস সম্পর্কে সাধারণরূপে প্রসিদ্ধ এবং লোকমুখে প্রচলিত তাহকিক করা হয়েছে। তবে সাধারণত এগুলোর সনদ সংক্রান্ত জ্ঞান নেই। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম আল্লামা জারকাশি (র.) "التذكرة فى الاحاديث المشتهرة" নামে একটি গ্রন্থ লিখেছেন। তারপর হাফেজ ইবনে হাজার (র.) "اللالى المنثورة فى الاحاديث المشهورة" পরবর্তীতে আল্লামা সুয়ুতি (র.)-এর "الدرر المنتشرة فى الاحاديث المشتهرة" ('আদ্ দুরারুল মুনতাছিরাহ ফিল আহাদিসিল মুশতাহিরাহ) এবং আল্লামা ইবনে দুরবেশের اثناء المطالب فى احاديث مختلفة المراتب (আস্‌নাল-মাতালিব ফি আহাদিছা মুখতালিফাতিল মারাতিব) ও সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অনেক প্রসিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এ প্রকারের কিতাবগুলো সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ

এবং প্রচলিত গ্রন্থ হলো, হাফেজ শামসুদ্দীন সাখাবি (র.)-এর 'المقاصد الحسنة فى الاحاديث المشتهرة على الالسنة'। এটাকে তিনি বিন্যস্ত করেছেন হুরূফে হিজার তারতিবে এবং 'প্রতিটি হাদিস তাহকিক করেছেন ভালোভাবে।

১৮. غريب الحديث : বলা হয়, ওইসব কিতাবকে যেগুলোতে হাদিসে ব্যবহৃত শব্দগুলোর আভিধানিক ও পারিভাষিক তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম ইমাম নজর ইবনে শুমাইল এবং আবু ওবায়দা মা'মার ইবনে মুসান্না কিতাব লেখেন। পরবর্তীতে এ বিষয়ে ইমাম আসমায়ি, আল্লামা ইবনে কুতাইবা, দাইনুরিও কলম ধরেছেন। এরপর আল্লামা খাত্তাবি (র.) এ সবগুলোকে জমা করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে সর্বপ্রথম ব্যাপক এবং বিস্তারিত গ্রন্থ ইমাম আবু ওবায়দ কাসিম ইবনে সাল্লামের 'গরিবুল হাদিস'। যেটি ছাপা হয়েছে হায়দারাবাদ দাক্ষিণাত্য থেকে। অবশ্য এ থেকে কোনো শব্দের অর্থ তালাশ করা খুবই জটিল। কেননা তাতে হুরূফে হিজার তারতিবের কোনো লক্ষ্য করা হয়নি। এরপর আল্লামা জমখশারি 'আল-ফায়িক' নামে একটি গ্রন্থ লিখেছেন যেটি তারতিবের সৌন্দর্যের দিকে লক্ষ্য করলে পূর্ববর্তী সবগুলো কিতাবের ওপর মর্যাদা রাখে। কিন্তু এই প্রকারের সর্বাধিক সর্বজনীন ও ব্যাপক কাজ করেছেন আল্লামা মাজদুদ্দিন ইবনে আছির আল-জাজরি (র.) তার গ্রন্থ "النهاية فى غريب الحديث والاثر" খুব সুন্দর ও সাজানো গোছানো। এটাকে তিনি হুরূফে হিজার তারতিবে বিন্যস্ত করেছেন। এজন্য এ বিষয়ে এর উপকারিতা সর্বজনীন হয়েছে এবং এটা গণ্য হয়েছে মূল উৎস হিসেবে। এ বিষয়ে আরো অনেক উপকারী গ্রন্থ লেখা হয়েছে। যেমন– আব্দুল গাফির ফারিসি (র.)-এর "مجمع الغرائب" আর কাসিম সিরকিসতি (র.)-এর "غريب الحديث" ইত্যাদি।

আল্লামা তাহের পাটনি (র.) লিখেছেন– "مجمع بحار الانوار فى غرائب التنزيل ولطائف الاخبار"। যা এ শ্রেনির গ্রহণযোগ্য, নির্ভরযোগ্য এবং প্রচলিত গ্রন্থ। এই কিতাবটিকে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (র.) গরিবুল হাদিস সংক্রান্ত সমস্ত কিতাবের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিতেন। যার কারণ ছিলো এই কিতাবটিতে শুধু শব্দের ব্যাখ্যাই করা হয়নি এবং তাতে বিদ্যমান আছে প্রতিটি শব্দ যেসব হাদিসে ব্যবহার হয়েছে সেসব হাদিসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। হজরত শাহ সাহেব (র.) বলতেন যে, গ্রন্থকার শব্দরাজির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অভিধান গ্রন্থাবলি ছাড়াও সামনে রেখেছেন হাদিসের সব ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

১৯. مشكل الحديث : এই প্রকারটিকে 'শরহুল আছার' এবং 'মুখতালাফুল হাদিস'ও বলে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হাদিসের সেসব কিতাব উদ্দেশ্য যেগুলোতে নির্ণয় করা হয়েছে পরস্পর বিরোধী হাদিসগুলোর সামঞ্জস্য বিধান এবং জটিল অর্থ বিশিষ্ট হাদিসগুলোর প্রয়োগক্ষেত্র। এতে কোনো বিশেষ তরতিব হয়নি; বরং গ্রন্থকার যে কোনো ভাবে হাদিসগুলো উল্লেখ করে এগুলোর ব্যাখ্যা করেন। এ প্রকারেরও অনেক কিতাব রচিত হয়েছে। বলা হয় যে, এ প্রকারের সর্বপ্রথম লেখক হলেন ইমাম শাফেয়ি (র.)। তিনি এ কাজটি করেছেন 'কিতাবুল উম্ম'-এর কোনো কোনো অংশে। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিকভাবে এ বিষয়ের ওপর সর্বপ্রথম কলম ধরেছেন ইমাম ইবনে জুরাইজ (র.)। তাছাড়া আবু মুহাম্মদ ইবনে কুতাইবা ও ইমাম ইবনে আব্দুল বার (র.)ও কিতাব লিখেছেন। তবে এসব কিতাব পাওয়া যায় না। বর্তমান যুগে এ বিষয়ে দুটি কিতাব প্রসিদ্ধ এবং প্রচলিত আছে।

১. مشكل الاثار ('মুশকিলুল আছার') : এটি চার খণ্ডে সমাপ্ত ইমাম আবু জা'ফর তাহাবির বিখ্যাত গ্রন্থ।

২. আল্লামা আবু বকর ইবনুল ফোরক-এর 'মুশকিলুল হাদিস'।

এ দু'টি কিতাব ছাপা হয়েছে হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য থেকে।

২০. اسباب الحديث : তাফসির শাস্ত্রে শানে নুযুলের যে মর্যাদা হাদিসে এগুলোরও সে মর্যাদা। অর্থাৎ, এতে বাচনিক হাদিসগুলোর শানে উরূদ বর্ণনা করা হয় যে, রাসূল ﷺ কোন্ এরশাদটি করেছিলেন কোন্ অবস্থায়। এই

প্রকারের গ্রন্থ রচিত হয়েছে খুব কম। এতে সর্বপ্রথম কিতাব হলো, ইমাম আবু হাফস আল-আকবারির। এরপর হামিদ ইবনে কুজানি (র.) এবং আল্লামা সুয়ুতি (র.) কলম ধরেছেন। 'কাশফুজ্ জুনুন' গ্রন্থকার লেখেন, আমাদের যুগে এ বিষয়ে শুধু একটি কিতাব অবশিষ্ট রয়েছে এর নাম হলো, "البيان والتعريف فى اسباب ورود الحديث الشريف"। এবং এটি হচ্ছে আল্লামা ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মদ (র)-এর কিতাব। ইনি প্রসিদ্ধ ইবনে হামজা আল হুসাইনি আদ-দিমাশকি আল-হানাফি নামে। গ্রন্থটি ছাপা হয়ে এখন বাজারে চলছে।

২১. الترتيب : যেটিতে অন্য কোনো অবিন্যস্ত কিতাবের হাদিসগুলোকে একত্রিত করা হয়েছে কোনো বিশেষ তারতিবে। যেমন- "ترتيب مسند احمد على الحروف لابن الكثير" এবং "ترتيب مسند احمد على الحروف لابن المجيب"। তেমনিভাবে শেষযুগে আল্লামা ইবনুস্ সা'আতি (র.) মুসনাদে আহমদকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন "الفتح الربانى" নামে।

২২. الزوائد : বলা হয়, এমন কিতাবকে যাতে জমা করা হয়েছে অন্য কোনো কিতাবের শুধু সেসব হাদিস যেগুলো সহিহ বোখারি-মুসলিমে নেই। যেমন- আল্লামা নুরুদ্দিন হায়ছামি (র.)-এর "موارد الظمأن الى زوائد ابن حبان"। তাতে সহিহ ইবনে হাব্বানের শুধু সেসব হাদিস একত্রিত করা হয়েছে যেগুলো সহিহ বুখারি-মুসলিমে নেই। এমনভাবে "زوائد ابن حبان على الصحيحين للحافظ مغلطائى" কোনো কোনো সময় زوائد শব্দটি মুস্তাদরাকের সমার্থবোধক মনে করা হয়। যেমন زوائد مسند احمد لعبد الله بن احمد এই একটি কিতাব।

২৩. العلل : হাদিসের এমন কিতাবকে علل বলা হয়, যার মধ্যে এমন সব হাদিস উল্লেখ করা হয় যেগুলোর সনদে সমালোচনা বা আপত্তি আছে। যেমন- كتاب العلل الصغير والكبير للترمذى ـ كتاب العلل لمسلم ـ كتاب العلل للبخارى رحـ এমনিভাবে ইমাম দারাকুতনি (র.) এবং ইমাম ইবনে আবি হাতেমের "كتاب العلل" ও প্রশিদ্ধ রয়েছে।

২৪. الامالى : আগের জামানায় দরসের পদ্ধতি ছিলো নিজের মুখস্থ হাদিসগুলো উস্তাদ ছাত্রদের লেখাতেন। এমনভাবে ছাত্রদের নিকট যে সংকলন তৈরি হতো সেটাকে বলতো শায়খের امالى। হাফেজ ইবনে হাজার (র.)-এর امالى প্রসিদ্ধ। ছাপার প্রচলন যখন ব্যাপক হয়ে যায়, তখন হাদিস শিক্ষাদানের জন্য লেখানোর প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু হাদিসের ব্যাখ্যা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট উস্তাদের পক্ষ থেকে তাকরির লেখার নিয়ম এখন পর্যন্ত অব্যাহত আছে। আর আজকাল এসব তাকরিরকে আমালি বলে। এই ধরনের বহু তাকরির ছাপা হয়েছে। তারমধ্যে 'ফয়জুল বারি' সবচেয়ে বিস্তারিত তাকরির। এটি সহিহ বোখারির ওপর আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (র.)-এর তাকবিরের সমষ্টি। হজরত মাওলানা বদরে আলম মিরাঠি (র.) এটি বিন্যস্ত করেছেন। অনুরূপভাবে আল্লামা কাশ্মীরি (র.)-এরই তাকরিরে তিরমিযী। এটি العرف الشذى নামে ছাপা হয়েছে। অনুরূপভাবে তিরমিযী শরিফের ওপর হজরত গাঙ্গুহি (র.)-এর আমলি 'আল-কাওকাবুদ্ দুররি' এবং বোখারির ওপর তারই আমালি 'লামিউদ্ দিরারি'। এটি বিন্যস্ত করেছেন হজরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহইয়া সাহারানপুরি (র.)। এর ওপর হজরত শায়খুল হাদিস মাওলানা জাকারিয়া (র.)-এর টীকা রয়েছে।

২৫. التراجم : ওই সব হাদিস গ্রন্থকে বলে, যেগুলোতে এক সূত্রের সমস্ত হাদিস এক অধ্যায়ে জমা করা হয়েছে। যেমন এতে এ ধরনের অধ্যায় কায়েম করা হয়, ذكر ما روى مالك عن نافع عن ابن عمر (رضـ) এবং এর অধীনে সেসব হাদিস বর্ণনা করা হয় যেগুলো এই সনদে বর্ণিত। এই প্রকারে সেসব কিতাবও অন্তর্ভুক্ত যেগুলোকে من روى عن ابيه عن جده বলে।

২৬. **الثلاثيات** : হাদিসের সেসব কিতাব যেগুলোতে শুধু সেসব হাদিস উল্লেখ করা হয় যেগুলো গ্রন্থকার পর্যন্ত শুধু তিন সূত্রে পৌঁছেছে। অর্থাৎ, যেগুলোর সনদে গ্রন্থকার থেকে রাসূল ﷺ পর্যন্ত শুধু তিনটি সূত্র। যেমন, ثلاثيات البخاری - ثلاثيات الدارمی - ثلاثيات عبد ابن حميد ইত্যাদি।

২৭. **الوحدان** : সেসব রাবির হাদিসগুলোর সমষ্টি, যাদের থেকে শুধু একটি করে হাদিস বর্ণিত।

২৮. **شروح الحديث** : সেসব কিতাব, যেগুলোতে কোনো হাদিসের কিতাবের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন, فتح البارى - عمدة القارى ইত্যাদি।

২৯. **الاذكار** : ওইসব গ্রন্থকে বলা হয়, যেগুলোতে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত দোয়াগুলো সংকলন করা হয়েছে الحصن الحصين عن كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم আল্লামা ইবনুল জাজরি (র.)-এর এবং كتاب الاذكار

৩০. **الترغيب والترهيب** : সেসব হাদিস গ্রন্থ যেগুলোতে জমা করা হয়েছে শুধু তারগিব-তারহিব তথা উৎসাহ প্রদান ও ভীতিপ্রদর্শন সংক্রান্ত হাদিসগুলো। এ বিষয়ের সবচেয়ে ব্যাপক গ্রন্থ হাফেজ মুনজিরি (র.)-এর الترغيب والترهيب ।

৩১. **كتب المصاحف** : বলা হয়, সেসব হাদিসের কিতাবকে যেগুলোতে বর্ণনা করা হয় কোরআনে কারিম সংকলন ও বিন্যাস বিভিন্ন ধরনের কেরাত এবং নসখ সংক্রান্ত ইখতেলাফের ইতিহাস। যেমন, ইবনে আমিরের "كتاب المصاحف"। তাছাড়া অনেক আলেম "كتاب المصاحف" নামে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তা থেকে "كتاب المصاحف لابن ابى داود - كتاب المصاحف لابن الانبارى" এবং "المصاحف لابن اشته" অধিক প্রসিদ্ধ; কিন্তু বর্তমানে এগুলোর মধ্য হতে শুধু একটি কিতাব আছে। সেটি হচ্ছে "كتاب المصاحف لابن ابى داود" এটি সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থকারের ছেলে কর্তৃক লিখিত। কিছুদিন আগে একজন ইংরেজ প্রাচ্যবিদ এটি ছাপিয়েছেন।

৩২. **المسلسلات** : বলা হয়, সেসব গ্রন্থকে যেগুলোতে এমন হাদিস উল্লেখ করা হয়, যার রেওয়ায়াতে সমস্ত রাবি একমত হয়ে গেছেন কোনো একটি বিশেষ গুণ কিংবা বিশেষ শব্দ কিংবা বিশেষ কর্মের ওপর। যেমন কোনো হাদিসের সমস্ত রাবি ফকিহ অথবা মুহাদ্দিস, অথবা এর প্রতিটি রাবি হাদিস বর্ণনার সময় কোনো বিশেষ কাজ করেছেন। যেমন প্রতিটি রাবি হাদিস বর্ণনাকালে মুসাফাহা করেছেন ইত্যাদি।

বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে হাদিস গ্রন্থাবলির স্তরবিন্যাস

এটাও হাদিসের ছাত্রদের জানা প্রয়োজন যে, বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে হাদিসের কোনো কিতাব কোনো স্তরের অধিকারী। হজরত শাহ আব্দুল আজিজ (র.) নিজে এক শিষ্যকে একটি চিঠি লিখেছিলেন যেটি মর্যাদা রাখে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকার। এর নাম হলো, "ما يجب حفظه للناظر"। এতে হজরত শাহ আব্দুল আজিজ (র.) হাদিসের কিতাবগুলোকে ভাগ করেছেন পাঁচটি স্তরে। আমরা এখানে পেশ করছি সে পাঁচটি স্তর সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় জ্ঞান।

প্রথম স্তর : যেগুলোর লেখকগণ আবশ্যক করে নিয়েছেন যে, তাদের কিতাবে সমস্ত হাদিস সহিহের শর্তগুলোর আওতায়। এমন কিতাবগুলোকে صحاح مجرده বলা হয়। এই স্তরে কিতাবগুলোর প্রতিটি হাদিস সম্পর্কে বলা যায় এর গ্রন্থকারের মতে এটি সহিহ। এই শ্রেনিতে নিম্নোক্ত কিতাবগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়,

صحيح بخارى - صحيح مسلم - مؤطا - مستدرك حاكم - صحيح ابن حبان - صحيح ابن خزيمة - المنتقى لابى عبد الله ابن الجارود - المنتقى للقاسم بن اصبغ - المختارة لضياء الدين المقدسى - صحيح ابن السكن - صحيح ابن العوانة -

মনে রাখতে হবে, এসব কিতাবকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সিহাহে মুজার্‌রাদার শুধু এ হিসেবে যে, এগুলোর লেখকগণ শুধু সেসব হাদিস নিয়েছেন তাদের ধারণা মুতাবেক যেগুলো বিশুদ্ধ ছিলো। বাস্তবেও বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক নয়। সহিহ বোখারি-মুসলিম ও মুয়াত্তা সম্পর্কে সবাই একমত যে, এগুলোর সব হাদিস বাস্তবেও সহিহ। শুধু ইমাম দারাকুতনি (র.) এ ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন এবং স্বীয় গ্রন্থ كتاب التتبع على الصحيحين (কিতাবুত্ তাতাব্বু' আলাস্ সহিহাইন) এ সহিহ বোখারি-মুসলিমের অনেক হাদিস বাছবিচার ও পরখ করে অশুদ্ধ সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার (র.) 'হুদাস্ সারি মুকাদ্দিমাতু ফাতহিল বারি'তে এসব হাদিস উল্লেখ করেছেন, যেগুলো ইমাম দারাকুতনি (র.) প্রশ্নের জন্য বাছাই করেছিলেন। অতঃপর জবাব দিয়েছেন ইমাম দারাকুতনির সমস্ত প্রশ্নের যথেষ্ট ও প্রশান্তিদায়ক। তাঁর পরবর্তী সমস্ত আলেম এ কারণে সহিহ বোখারি-মুসলিমের সমস্ত হাদিসের বিশুদ্ধতার বেলায় ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

'মুস্‌তাদরাকে হাকেম' সম্পর্কে এই বক্তব্য অবশ্য ঠিক যে, এর হাদিসগুলো বাস্তবেও সবগুলো সহিহ মুজার্‌রাদ নয়। এজন্য প্রায় সমস্ত আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, বস্তুত 'মুসতাদরাকে হাকেম' তৃতীয় শ্রেনির অন্তর্ভুক্ত। কারণ হাদিস বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে ইমাম হাকেম (র.) হাদিস খুবই নরম। তিনি শুধু দুর্বল আর মুনকার নয় এবং মওজু হাদিসগুলোকে পর্যন্ত বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করেছেন। বাকি তাকে প্রথম শ্রেনিতে গণ্য করার কারণ হলো, তার গ্রন্থটিতে তার নিজের ধারণা অনুযায়ী সমস্ত হাদিস বোখারি অথবা মুসলিমের শর্ত-শরায়েত মুতাবিক সহিহ জমা করেছেন। যদিও তিনি তার চেষ্টায় নিশ্চিতরূপে সফলতা লাভে সক্ষম হননি। এজন্য ইমাম হাকেম (র.)-এর নম্রতা এতটাই প্রসিদ্ধ যে, আবু সায়িদ আল-মালিনি (র.) তো এ পর্যন্ত বলেছেন যে, 'মুসতাদরাকে'র একটি হাদিসও বিশুদ্ধ নয়। তবে বাস্তবতা হলো, এতে অনেক সহিহ হাদিস রয়েছে। হাকেম (র.)-এর সবচেয়ে কট্টর সমালোচক, হাফেজ শামসুদ্দিন জাহাবি (র.)-এর বক্তব্য আল্লামা সুয়ুতি (র.) 'তাদরিবুর রাবি'তে বর্ণনা করেছেন যে, 'মুসতাদরাকে হাকিমে'র প্রায় অর্ধেক হাদিসতো নিঃসন্দেহে বোখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী। আর এক-চতুর্থাংশের রাবি প্রমাণযোগ্য কিন্তু যেগুলোতে কোনো ইল্লত বা ত্রুটি পাওয়া যায়, এমন হাদিসের সংখ্যা দুই শ' বা তার চেয়ে কিছু বেশি। এগুলোর ওপর আমল করা সমীচীন নয়। আর বাকি এক-চতুর্থাংশ চরম দুর্বল, মুনকার এবং জাল হাদিস। হাফেজ জাহাবি (র.) 'মুসতাদরাকে'র সারসংক্ষেপে যেটি মুসতাদরাকের সাথে ছাপা হয়েছে প্রতিটি হাদিসের পর্যালোচনা করেছেন আলাদা আলাদা।

ইমাম হাকেমের শিথিলতার কারণগুলো

এ বিষয়টি নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে গবেষণা হয় যে, ইমাম হাকেম (র.)-এর ন্যায় হাফেজে হাদিস থেকে এ ধরনের নম্রতা হলো কেনো? এর বহু কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। অনেকে তার ওপর শীয়া মতবাদের অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। তবে এটি বিশুদ্ধ নয়। অনেকে বলেছেন, রাফেজিদের সাথে মেলামেশার ফলে বহু হাদিসের দুর্বলতা সম্পর্কে তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি[১]। তবে এই প্রশ্নের সর্বোত্তম এবং আলেম সুলভ জবাব হাফিজ জামালুদ্দিন জায়লায়ি (র.) 'নসবুর রায়া'তে বিসমিল্লাহ জোরে পড়ার আলোচনায় দিয়েছেন। হাকেমের নম্রতার কয়েকটি কারণ রয়েছে।

টীকা-১. আল্লামা ইমাম আল-কাশ্মীরি (র.) বলেছেন, (মুকাদ্দামা ফয়জুল বারি : ১/৩৬) আমার জানা নেই, ইমাম হাকেমের কী হয়েছে? কী কারণে তিনি মওজু হাদিসগুলোকে তার কিতাবে স্থান দিয়েছেন? এবং কীভাবে তা তার জন্য জায়েজ হলো? লোকজন এ ব্যাপারে অনেক জবাব দিয়েছেন, এই প্রশ্ন থেকে পরিত্রাণের বিভিন্ন পন্থা উল্লেখ করেছেন। যেগুলোতে তেমন কোনো ফায়দা নেই। মনে রাখবেন, আমি তাতে এমন অনেক হাদিস দেখতে পাই, যেগুলোর সনদে বোখারির রাবিগণ রয়েছেন উপরের দিকে, অপরদিকে রয়েছেন হাদিস জালকারি ও মিথ্যুকরা। তা সত্ত্বেও হাকেম যেসব হাদিস সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেন যে, এগুলো বোখারির শর্তে উন্নীত। অতঃপর আমার নিকট এ বিষয়টি স্পষ্ট হলো যে, এই হুকুমটি হাদিসের কোনো কোনো টুকরার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্য অংশের ক্ষেত্রে নয়। যেন এটি তার পক্ষ থেকে নতুন একটি পরিভাষা। তাছাড়া স্পষ্ট হলো, পূর্ণাঙ্গ সনদের দিকে লক্ষ্য করে হুকুম লাগানো যে, এর কোনো একটি অংশের দিকে লক্ষ্য করে নয়।

১. ইমাম হাকেমের নম্রতার কারণ হচ্ছে, ইমাম বোখারি ও মুসলিম (র.) কোনো কোনো সময় সমালোচিত কোনো রাবির হাদিসও বর্ণনা করেন। কিন্তু তখন, যখন এর বহু মুতাবে' ও শাহেদ মওজুদ থাকে। যেমন– আবু ওয়াইস একজন সমালোচিত রাবি। কিন্তু ইমাম মুসলিম (র.) তার হাদিস[১] قسمت الصلوة بيني وبين عبدى نصفين বর্ণনা করেছেন, এ হাদিসটি অন্যান্য শক্তিশালী রাবি যেমন ইমাম মালেক, শু'বা, ইবনে উয়াইনা প্রমুখ থেকেও বর্ণিত আছে। এমন স্থানে হাকেম শুধু এটা দেখেন যে, আবু উয়াইস মুসলিমের রাবি এবং তার সেসব হাদিসও বর্ণনা করেন যেগুলোর মুতাবে' উপস্থিত নেই। তা সত্ত্বেও তিনি বলেন هذا صحيح على شرط مسلم 'মুসলিমের শর্তানুযায়ী এটি সহিহ হাদিস।

২. এমন অনেক সময় হয় যে, এক বর্ণনাকারি হাদিসগুলো একজন উস্তাদ থেকে শক্তিশালী এবং বিশুদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু অন্য উস্তাদ থেকে শক্তিশালী হয় না। এমন স্থানে বোখারি ও মুসলিম (র.) তার হতে শুধু সেসব হাদিস গ্রহণ করেন যেগুলো প্রথম উস্তাদ থেকে বর্ণিত। যেমন– বোখারি ও মুসলিম উভয়েই খালেদ ইবনে মাখলাদ কুতওয়ানি (র.)-এর সেসব হাদিস বর্ণনা করেছেন যেগুলো সুলায়মান ইবনে বিলাল থেকে বর্ণিত। হাকেম শুধু দেখেছেন খালেদ ইবনে মাখলাদের নাম এবং তাদেরকে বোখারি-মুসলিমের বর্ণনাকারি মনে করে তাদের প্রত্যেকটি হাদিসকে صحيح على شرط الشيخين (বোখারি-মুসলিমের শর্তে উন্নীত) করেছেন। অথচ অন্য উস্তাদগণ থেকে তার বর্ণনা এই পর্যায়ের ছিলো না যে পর্যায়ের সুলায়মান ইবনে বিলাল থেকে ছিলো। যদি কেউ এ কারণে অন্য কোনো রেওয়ায়াতে খালিদ ইবনে মাখলাদ-আব্দুল্লাহ ইবনুল মুসান্না সূত্র দেখে মনে করেন যে, খালেদ এবং আব্দুল্লাহ উভয়েই বোখারির রাবি, অতএব এ হাদিসটিও বোখারির শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ, তবে এটি চরম ভুল। কেননা খালেদ ইবনে মাখলাদের হাদিসগুলো আব্দুল্লাহ ইবনুল মুসান্না থেকে অগ্রহণযোগ্য।

৩. ইমাম হাকেমের নম্রতার তৃতীয় কারণ, কোনো কোনো সময় একজন বর্ণনাকারির হাদিসগুলো একটি সীমিত সময় পর্যন্ত বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হয়। এর পরবর্তী বর্ণনাগুলো দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। ইমাম বোখারি (র.) এমন স্থানে এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেন যাতে এমন রাবির শুধু প্রথম যুগের হাদিসগুলো নেওয়া হয়। মারওয়ান ইবনুল হাকাম সম্পর্কে যেমন রিজাল শাস্ত্রবিদদের সমালোচনা প্রসিদ্ধ। কিন্তু তার সম্পর্কে সিদ্ধান্তমূলক উক্তি এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার শাসক হওয়ার আগের বর্ণনাগুলো গ্রহণযোগ্য। শাসক হওয়ার পরে তার আদালত ও নির্ভরযোগ্যতা সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে। ইমাম বোখারি (র.) তার হতে যেসব বর্ণনা গ্রহণ করেছেন সেগুলো শাসক হওয়ার আগের। এখন যদি কেউ শুধু মারওয়ান ইবনুল হাকামের নাম দেখে মনে করে যে, তিনি বোখারির রাবি। অতএব, তার সব হাদিস সহিহ্, তবে তা ভুল হবে। এ ধরনের বিভ্রান্তি ইমাম হাকেম (র.) থেকে।

৪. ইমাম মুসলিম (র.) কোনো কোনো সময় কোনো দুর্বল রাবিকে নির্ভরযোগ্য রাবির সাথে মিলিয়ে উল্লেখ করেন। যেমন, ইমাম মুসলিম (র.) আবদুল্লাহ ইবনে লাহি'আহকে উল্লেখ করেছেন আমর ইবনুল হারেসের সাথে মিলিয়ে। عن عمرو بن الحارث وعبد الله بن لهيعة। এর অর্থ আব্দুল্লাহ ইবনে লাহি'আকে নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করা নয়; বরং মূলত তিনি রেওয়ায়াতের মূল কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছেন আমর ইবনুল হারেসকে, আর আব্দুল্লাহ ইবনে লাহি'আকে উল্লেখ করেছেন প্রসঙ্গত। এখন যদি কেউ ইবনে লাহিআকে এর ভিত্তিতে মুসলিমের রাবি সাব্যস্ত করে তার প্রতিটি হাদিসকে মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহিহ বলে, তাহলে এটি হবে নিকৃষ্ট ধরনের নম্রতা।

৫. হাকেমের নম্রতার আরেকটি কারণ হলো যে, ইমাম হাকেম এক সনদের কোনো বর্ণনাকারিকে যদি দেখেন তিনি বোখারির রাবি, আর দ্বিতীয়জনকে দেখেন তিনি মুসলিমের রাবি। তখন এ সনদটিকে তিনি সহিহ সাব্যস্ত করেন বোখারি-মুসলিমের শর্তানুযায়ী। কিন্তু এটি ভুল।

টীকা-১. সহিহ মুসলিম : ১/১৬৯-১৭০. كتاب الصلوة باب وجوب قرائة الفاتحة فى كل ركعة وانه لم يحسن الفاتحة ولا امكنة تعلمها قرأ من تيسر له غيرها

৬. কোনো কোনো সময় ইমাম হাকেম একটি সনদের অধিকাংশ রাবির দিকে লক্ষ্য করে দেখলেন, তাঁরা সহিহ বোখারি-মুসলিমের রাবি। তবে তাদের মধ্যে কোনো এক বা দু'জন দুর্বল। তাঁর দৃষ্টি তাদের দুর্বলতার দিকে পড়ে না।

'আর্-রিসালাতুল মুসতাতরাফাহ' নামক পুস্তিকায় আল্লামা কাত্তানি মাগরিবি (র.) ইমাম হাকেম (র.)-এর নম্রতার আরেকটি কারণ বর্ণনা করেছেন। সেটি হলো, ইমাম হাকেম (র)-এর কিতাবের পাণ্ডুলিপি তৈরি কর্‌ার পর তিনি দ্বিতীয়বার নজর দিতে পারেননি। তাঁর ওফাত হয়ে গেছে সম্পাদনা, বিশুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্ন করার পূর্বেই। কিতাবের প্রথম পঞ্চমাংশে তাই খুবই কম ভুল হয়েছে, যার ওপর তিনি দ্বিতীয়বার নজর দিতে পেরেছেন।

মূলকথা, ওপরযুক্ত কারণে ইমাম হাকেম (র.)কে হাদিস বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে খুবই নরম মনে করা হয়। এরই ভিত্তিতে 'তালখিলুল মুস্তাদরাক'-এর কোনো কোনো স্থানে হাফেজ জাহাবি (র.) তার মতের ওপর অত্যন্ত কঠিন মন্তব্য করেছেন।

এই স্তরের দ্বিতীয় কিতাব হচ্ছে সহিহ ইবনে হাব্বান। কেউ কেউ বলেছেন, এই কিতাটিও 'মুস্তাদরাকে'র ন্যায় বিশুদ্ধতার স্তরে পৌঁছেনি। কারণ ইবনে হাব্বানও হাদিস বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে হাকেমের ন্যায় নরম। কিন্তু আল্লামা সুয়ুতি তাদরিবুর রাবি : ৫৩ তে লিখেন যে, 'সহিহ ইবনে হাব্বান' এ হিসাবে 'মুস্তাদরাকে'র ঊর্ধ্বে যে, ইবনে হাব্বান যেসব শরায়েত নির্ধারণ করেছেন সেগুলোর পাবন্দি তিনি পুরোপুরিভাবে করেছিলেন। অবশ্য এটা ঠিক যে, হাদিস বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে ইবনে হাব্বানের শরায়েত অন্যান্য মুহাদ্দিসিনের তুলনায় নরম। এর কারণ দুটি,

১. হাসান হাদিসগুলোকেও ইবনে হাব্বান সহিহ সাব্যস্ত করেন। তার মতে হাসান ভিন্ন কোনো প্রকার নয়; বরং সহিহেরই একটি অংশ। তাই তিনি তাঁর গ্রন্থে যেগুলো অন্য মুহাদ্দিসিনের মতে সহিহ এর স্তরে উন্নীত হয়নি এমন বহু হাদিস বর্ণনা করেছেন । কিন্তু ইবনে হাব্বান এগুলোকে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন হাসান হওয়ার ভিত্তিতে।

২. একজন অজ্ঞাত রাবির উস্তাদ এবং ছাত্র দু'জনই যদি প্রসিদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য হন, তাহলে ইবনে হাব্বানের মতে অজ্ঞাত হলে তা কোনো ক্ষতিকর নয়; বরং তার হাদিস তার মতে সহিহ সাব্যস্ত হয়। কিন্তু অন্যান্য মুহাদ্দিসিন এ হাদিসটিকে রাবি সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকার কারণে প্রত্যাখ্যান করে দেন। ইবনে হাব্বানের এই নিয়ম তার 'কিতাবুস্ সিকাতে'ও অব্যাহত রয়েছে। কেননা তার মতে সিকাহর সংজ্ঞা হলো, যার ব্যাপারে সমালোচনার কোনো কারণ প্রমাণিত হয়নি। তাই, তিনি নির্ভরযোগ্যদের তালিকাভুক্ত করেছেন অনেক অজ্ঞাত রাবিকেও। এজন্য সাধারণ মুহাদ্দিসিন কোনো রাবিকে শুধু একারণে নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করেন না যে, ইবনে হাব্বান তাকে নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যতোক্ষণ না তার গাইরে মাজহুল হওয়া প্রমাণিত না হবে। মোট কথা, নিঃসন্দেহে সহিহ ইবনে হাব্বান এদিক দিয়ে তো মুস্তাদরাকের ঊর্ধ্বে যে, ইবনে হাব্বান তার শর্ত শরায়েতগুলোর পাবন্দি করেছেন। কিন্তু এসব শর্তও এতো নরম যে, হাসান বরং দুর্বল হাদিসও এর আওতায় সহীহের সংজ্ঞায় পড়ে যায়। তাই এ কিতাবটির শ্রেষ্ঠত্ব যদিও মুসতাদরাকের ওপর অর্জিত হয়েছে, কিন্তু এটি অন্যান্য সিহাহ মুজার্‌রদার স্থান পায়নি।

তৃতীয় গ্রন্থ হলো, সহিহ ইবনে খুজায়মা। এটাকে সহিহ ইবনে হাব্বানের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে বিশুদ্ধতার দিকে লক্ষ্য করে। তা সত্ত্বেও 'ফাতহুল মুগিছে' হাফেজ সাখাবি (র.) লিখেছেন যে, 'সহিহ ইবনে খুজায়মা'তে সবগুলো হাদিস সহিহ নয়; বরং দুর্বল হাদিসও তাতে লেখা হয়েছে। যেমন–

عن كثير بن عبد الله المزنى عن ابيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الاية : قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال انزلت فى زكوة الفطر .

'কাছির ইবনে আব্দুল্লাহ আল মুজানি তাঁর পিতা হতে, তিনি তার পিতা হতে হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হলে তিনি এর জবাবে বললেন, এটি সাদাকাতুল ফিতর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।'

কিন্তু হাফেজ মুনজিরি (র.) الترغيب والترهيب : ٢/ ١٠٠ - الترغيب في صدقة الفطر وبيان تاكيدها হাদিস নং ৪-এ এ হাদিসটিকে সহিহ ইবনে খুজায়মার বরাতে উল্লেখ করার পর বলেছেন, كثير بن عبد الله واه তথা কাছির ইবনে আব্দুল্লাহ দুর্বল। এ ধরনের আরো কিছু উদাহরণ হাফেজ সাখাবি (র.) দিয়েছেন। অতএব, এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, সহিহ ইবনে খুজায়মাকে সহিহ মুজার্‌রাদ সাব্যস্ত করা শুধু এর গ্রন্থকারের ধারণা অনুযায়ী। কিন্তু বাস্তবে এর কোনো কোনো হাদিস দুর্বল। "لفظ الألحاظ في طبقات الحفاظ" গ্রন্থে হাফেজ ইবনে ফাহাদ মালিকি (র.), হাফেজ ইবনে হাজার (র.)-এর আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, হাফেজ ইবনে হাজার (র.)-এর সময়ের পূর্বেই সহিহ ইবনে খুজায়মার তিন-চতুর্থাংশ পাওয়া যায়নি, পাওয়া যেত শুধু এক-চতুর্থাংশ। 'ফাতহুল মুগিছে' হাফেজ সাখাবি (র.) লিখেছেন যে, এই চতুর্থাংশ আমাদের এই যুগে একেবারেই পাওয়া যায় না। তারপরও বছরের পর বছর ধরে কিতাবটির কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছিলো না। বর্তমানে ইস্তাম্বুলের একটি কুতুবখানায় একটি কলমি কপি পাওয়া যায়। মদিনার কোনো অধিবাসী তা থেকে কপি করে দুই খণ্ডে তা ছাপিয়ে দিয়েছেন।

চতুর্থ গ্রন্থ হচ্ছে, "المنتقى لأبي عبد الله ابن الجارود"। এটি হিজরি চতুর্থ শতাব্দির লেখা। হুরূফে হিজা হিসেবে সাহাবার তারতিবে বিন্যস্ত এবং বিশাল গ্রন্থ এটি। কিন্তু বাস্তব হিসেবে এটাকেও সহিহ মুজার্‌রাদ বলা মুশকিল। কারণ এতেও অনেক দুর্বল হাদিস এসে গেছে। এগুলোর সংখ্যা যদিও খুবই স্বল্প।

পঞ্চম কিতাব, সহিহ ইবনুস সাকান। দীর্ঘকাল পর্যন্ত যেহেতু পাওয়া যায়নি, এজন্য পর্যালোচনা-পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অন্তর্দৃষ্টির সাথে কিছু বলা জটিল।

ওপরযুক্ত বিস্তারিত বিবরণ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, প্রথম স্তরের কিতাবগুলোতে শুধু বোখারি-মুসলিমই এমন, যেগুলোকে বাস্তবতার নিরিখেও সহিহ মুজার্‌রাদ আখ্যায়িত করা যায়। আর যেসব হাদিস এগুলোতে নজরে আসবে, সেগুলোকে বিনা দ্বিধায় সহিহ বলা যায়। আর কিতাব এই স্তরের নয়। তবে অবশিষ্ট কিতাবগুলোর হাদিসের তুলনায় অবশ্যই বলা যায় যে, গ্রন্থকারগণের মতে এগুলো সহিহ। কোনো হাদিসকে সহিহ এবং দুর্বল সাব্যস্ত করার ব্যাপারে অনেক সময় মুহাদ্দিসিনের মতবিরোধ হয়। তখন তাদের বিশুদ্ধ সাব্যস্তকরণ ধর্তব্য নয়।

দ্বিতীয় স্তর

সব কিতাব এই স্তরে আসে যেগুলোর লেখকগণ এই বাধ্যবাধকতা অবলম্বন করেছেন, যাতে হাসানের চেয়ে নিম্নস্তরের কোনো হাদিস না আসে। আর যদি কোনো দুর্বল হাদিস এসে যায়, তাহলে এর দুর্বলতার ব্যাপারে সতর্ক করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। অতএব, তারা নীরবতা অবলম্বন করবেন সেসব হাদিসের ব্যাপারে, যেগুলো তাদের মতে কমপক্ষে হাসান হবে।

০ সুনানে নাসায়ির মর্যাদা এই স্তরে সর্বোচ্চ। এজন্য এমন কোনো হাদিস নেই তাতে, যেটি ইমাম নাসায়ি (র.)-এর মতে হাসান অপেক্ষা নিম্নস্তরের। শুধুমাত্র সেসব হাদিস ছাড়া যেগুলো সম্পর্কে স্বয়ং নাসায়ি স্পষ্ট ভাষায় দুর্বল বলেছেন।

০ দ্বিতীয় স্তরের দ্বিতীয় গ্রন্থ হলো سنن ابي داؤد। ইমাম আবু দাউদ (র.) যে হাদিসের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেন সেটা তার মতে প্রমাণযোগ্য হয়। হাদিসের সনদে অবশ্য কোনো কোনো সময় মামুলি দুর্বলতা থাকে। এতটুকু ইমাম আবু দাউদ (র.) সহ্য করে নেন এবং এর ওপরও নীরবতা অবলম্বন করেন। আবু দাউদের যে হাদিসের ওপর ইমাম আবু দাউদ (র.) ছাড়া হাফেজ মুনজিরি (র.)ও নীরবতা অবলম্বন করেছেন সেটার শক্তির স্তর বেড়ে যায়।

হাফেজ জাহাবি (র.) লেখেন, বোখারি-মুসলিমও তো আবু দাউদের প্রায় অর্ধেক হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর কিছু সংখ্যক হাদিস ও বোখারি-মুসলিম কিংবা তাদের কোনো একজনের শর্তানুযায়ী। আবার কিছু কিছু হাদিসে

স্মরণশক্তিতে কমতি পাওয়া যায় তাতে এমন বর্ণনাকারিও রয়েছেন। যার ফলে সেসব হাদিস সহিহের স্তর থেকে নেমে হাসানের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। ইমাম আবু দাউদ সাধারণত এই তিন প্রকারের ক্ষেত্রে নীরবতা অবলম্বন করেন। অবশ্য চতুর্থ প্রকার হাদিসগুলোতে দুর্বলতা ও মুনকার হওয়া পাওয়া যায়। তথা দুর্বল ও মুনকার হাদিস। ইমাম আবু দাউদ (র.) এসব হাদিসে সাধারণত নীরবতা অবলম্বন করেন না। অবশ্য একেবারে কম ও নগণ্য কোনো স্থানে কোনো প্রকার সমালোচনা ব্যতীত এমন হাদিস এ জন্য বর্ণনা করেন যে, এগুলো মুনকার হিসেবে খুবই প্রসিদ্ধ।

প্রশ্ন : ফিকহি ইখতেলাফসমূহের আলোচনায় কোনো কোনো সময় এমন পরিলক্ষিত হয় যে, কোনো ইমাম এসব হাদিসের সনদে সমালোচনা করে এগুলো বর্জন করেন, সেগুলো ইমাম আবু দাউদ (র.) নীরবতার সাথে বর্ণনা করেন।

জবাব : আবু দাউদের নীরবতা শুধু এর নিদর্শন যে, এ হাদিসটি আবু দাউদের নিকট প্রমাণযোগ্য। কিন্তু কোনো মুহাদ্দিস যিনি উলুমে হাদিসে ইজতিহাদের স্তরে উন্নীত তিনি ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন ইমাম আবু দাউদের রায়ের সাথে।

০ তৃতীয় গ্রন্থ হলো, جامع ترمذى। সমস্ত হাদিস গ্রন্থের মধ্যে এ কিতাবটি এই হিসেবে অনন্য যে, তাতে প্রতিটি হাদিসের সাথে এর বিশুদ্ধতার স্তরও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র.) কোনো দুর্বল হাদিসের দুর্বলতার ব্যাপারে সতর্ক করা ব্যতিত উল্লেখ করেন না। অবশ্য কোনো কোনো আলেম তাকে হাসান এবং সহিহ সাব্যস্ত করার মুকাবিলায় তুলনামূলক নরম সাব্যস্ত করেছেন। এর কারণ হলো, এমন কোনো কোনো হাদিসকেও তিনি হাসান সহিহ বলেছেন, যেগুলো অন্যদের মতে দুর্বল। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে এ বিষয়ে পূর্ণ আলোচনা আসবে।

সর্বসম্মতিক্রমে এ তিনটি গ্রন্থ দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত। 'সুনানে দারেমি'কেও অনেকে এতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু অনেকে এটাকে তৃতীয় স্তরের গণ্য করেছেন। শাহ ওয়ালি উল্লাহ (র)-এর এ উক্তি ঠিক নয়। বাস্তবতা হলো, মুসনাদে আহমদের অনেক বর্ণনা দুর্বল এবং মুনকার। এজন্য কোনো কোনো আলেম এটাকে তৃতীয় স্তরে গণ্য করেছেন। বাস্তবতাও এটাই। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এই মতানৈক্য আসল মুসনাদে আহমদ সম্পর্কে। মুসনাদে আহমদের একটি অংশ জিয়াদাতও যেটুকু তার ওফাতের পর তার সাহেবযাদা আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ (র.) সংকলন করেছেন এবং মুসনাদের সাথে সংযুক্ত করেছেন– এই অংশ সম্পর্কে সবাই একমত যে, এটি তৃতীয় স্তরে শামিল। অর্থাৎ, তাতে বহু দুর্বল হাদিসও আছে।

তৃতীয় স্তর

সেসব কিতাব এই স্তরে আসে যেগুলোতে সব ধরনের হাদিস বিদ্যমান। সহিহ, হাসান, দুর্বল, মুনকার ও মওজু সবই। এই স্তরের গ্রন্থগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রয়োজন।

১. সুনানে ইবনে মাজাহ : যদিও এটি সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু তাতে রয়েছে বহু দুর্বল এবং মুনকার হাদিস। এমনকি তাতে কমপক্ষে ১৯টি মওজু হাদিসও আছে। এর ওপর ভিত্তি করে ওলামায়ে কেরামের একটি বিরাট দল এটিকে সিহাহের অন্তর্ভুক্ত করেন না। এর স্থলে কেউ কেউ মুয়াত্তা ইমাম মালিককে রাখেন আর কেউ কেউ সুনানে দারেমিকে।

২. সুনানে দারাকুতনি : এটি হলো, ইমাম আবু আব্দুল্লাহ দারাকুতনি (র.)-এর লেখা। তিনি অনেক উঁচু পর্যায়ের হাফেজে হাদিস। এই গ্রন্থে তিনি গুরুত্বারোপ করেছেন প্রতিটি ফিকহি অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট সব হাদিস মতন ও সনদের ইখতিলাফসহ সংকলনের প্রতি। তাই কিতাবটি আহকাম সংক্রান্ত হাদিসের একটি ব্যাপক ভাণ্ডার। ইমাম দারাকুতনি (র.) প্রতিটি হাদিস উল্লেখ করে এর সনদ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনাও করেন। এতেও ভালোমন্দ সব ধরনের হাদিস আছে। কিন্তু সাধারণত ইমাম দারাকুতনি (র.) হাদিসগুলোর দুর্বলতার ব্যাপারে

সতর্ক করে দেন। এ কিতাবের ওপর প্রসিদ্ধ আহলে হাদিস আলিম মাওলানা শামসুল হক আজিমাবাদি (র.) এ কিতাবের ওপর একটি টীকাগ্রন্থ লিখেছেন। এর নাম হলো, التعليق المغنى على سنن الدار قطنى (আত্ তা'লিকুল মুগনি আলা সুনানিদ্ দারাকুতনি) ইমাম দারাকুতনি (র.)-এর পক্ষ থেকে হাদিসের সনদ সংক্রান্ত আলোচনায় যে কমতি থেকে যায়, সাধারণত তিনি তা পূর্ণ করে দেন। মূল কিতাবের সাথে এই টীকাটি ছাপা হয়েছে।

৩. **'সুনানে কুবরা'-বায়হাকি :** ইমাম বায়হাকি (র.) ইমাম দারাকুতনি (র.)-এর শিষ্য। তিনি এই গ্রন্থটি ফিকহে শাফেয়ির প্রসিদ্ধ মূলপাঠ المزنى। مختصر-এর তারতিবে লিখেছেন। তার আসল উদ্দেশ্য ফিকহে শাফেয়ির প্রমাণাদি বর্ণনা করা। তাই তিনি নিজের প্রমাণাদির নির্ভরযোগ্যতা এবং বিরোধীদের প্রমাণাদির দুর্বলতা বর্ণনা করেন এবং সেগুলোকে হেয় প্রতিপন্ন করে থাকেন। এর ওপর ইবনুত্ তারকুমানি নামে প্রসিদ্ধ হাফেজ আলাউদ্দিন আল-মারদিনি (র.) একটি টীকা লিখেছেন। এর নাম হলো, (আল-জাওহারুন্ নাকি ফির্ রদ্দি আলাল বায়হাকি)। তিনি হানাফি মাজহাবের লোক এবং এলমে হাদিসে উঁচু মর্যাদার অধিকারী। ইমাম বায়হাকির প্রমাণাদির তার ওপর দূর সমালোচনা করেন এটি হানাফিদের প্রমাণাদির অনন্য এক ভাণ্ডার।

৪. **'মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক' :** ইমাম আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাম আস্-সানআনির লিখিত গ্রন্থ। তিনি ইমাম আবু হানিফা (র)-এর শিষ্য। ইমাম বুখারি প্রমুখের উস্তাদের উস্তাদ। এতে তিনি মারফু' হাদিসগুলো ছাড়াও সাহাবা ও তাবেয়িনের ফতওয়ায়ও প্রচুর পরিমাণ বর্ণনা করেন। সব ধরনের হাদিস এতেও পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত এ কিতাবটি পাওয়া যেতো না। তবে বর্তমানে ছাপা হয়েছে।

৫. **'মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা' :** এটা হলো, আবু দাউদ তায়ালিসি (র.)-এর লেখা গ্রন্থ। তিনি ইমাম আবু দাউদ সিজিস্তানির পূর্বেকার। কেউ কেউ বলেছেন, মুসনাদ সংকলনের প্রথমত্বের মর্যাদা তিনি লাভ করেছেন। এ কথাটি বিশুদ্ধ না। এ কিতাবটি ছাপা হয়েছে হায়দারাবাদ দাক্ষিণাত্য থেকে।

৭. **'সুনানে সায়িদ ইবনে মানসুর' :** এ গ্রন্থটিতে রয়েছে মু'দাল, মুনকাতি এবং মুরসাল হাদিস প্রচুর। এটি ছাপিয়েছে মজলিসে এলমি।

৮. **'মুসনাদে হুমায়দি' :** ইমাম বোখারির উস্তাদ এর লেখক। ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর কট্টর বিরোধীদের একজন। তার মজলিসে ইলমি এ কিতাবটিও দু'খণ্ডে ছাপিয়েছে।

৯. **'মা'আজিমে তাবারানি' :** এর পরিচয় পূর্বে এসেছে।

এ সকল গ্রন্থের বরাত প্রচুর আসে। এগুলো ছাড়াও আরো অনেক কিতাব এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। তার মধ্যে মুসনাদে বাজ্জার, মুসনাদে আবু ইয়ালা আল-মাওসিলি, মুসনাদে আবদ ইবনে হুমাইদ, মুসনাদে আহমদ ইবনে মানি', হিলইয়াতুল আওলিয়া-আবু নুআয়িম, দালাইলুন্ নুবুওয়া-আবু নুআয়িম ও বায়হাকি, মুসনাদে ইবনে জারির এবং তাঁর তাহজিবুল আছার, তাফসিরুল কোরআন এবং আত্ তারিখ, তাফসিরে ইবনে মারদুবিয়্যাহ এমনভাবে তাফসিরে অনেক কিতাবও এ স্তরের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য তাফসিরে ইবনে কাসির এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, হাফেজ ইবনে কাসির (র.) হাদিসের একজন মুহাক্কিক বর্ণনাকারি। তিনি সাধারণত দুর্বল হাদিসগুলোর ব্যাপারে সতর্ক করতে অভ্যস্ত।

তৃতীয় স্তরের এই কিতাবগুলোতে ততোক্ষণ পর্যন্ত কোনো হাদিস দেখে প্রশান্ত না হওয়া উচিত, যতোক্ষণ পর্যন্ত এর সনদ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তাহকিক না হয়। এর লেখক যতো বড়ই বিখ্যাত আর মহান হোক না কেনো।

চতুর্থ স্তর

চতুর্থ স্তরের কিতাব যেগুলোর অধিকাংশ হাদিস দুর্বল। বরং হজরত শাহ আব্দুল আজিজ (র.) তো এ পর্যন্ত লিখেছেন যে, এগুলোর প্রতিটি হাদিস দুর্বল। যেমন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলি ইবনে আলি ইবনুল হাসান ইবনুল বিশর (যিনি হাকেম তিরমিযী নামে প্রসিদ্ধ) এর গ্রন্থ নাওয়াদিরুল উসুল ফী আহাদিসির রাসূল ﷺ এবং ইবনে আদি (র.)-এর আল-কামিল ৬০ অংশে বিভক্ত এবং ১২ খণ্ডে প্রকাশিত। 'মুরতাজা শরহে কামুসে' আছে

যে, এটি আট খণ্ডবিশিষ্ট। জারহ বিষয়ক গ্রন্থে কামিল ইবনে আদির স্থান অনেক উর্ধ্বে এবং এটাকে ব্যাপকতার গ্রন্থ মনে করা হয়। ইবনে তাহের (র.)-এর হাদিসগুলো সংকলন করে মু'জামের তারতিবে বিন্যস্ত করেছেন। আল-কামিলের ওপর টীকাও লিখেছেন, ইবনুর রূমিয়া আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুফাররাজ আল-উমাবি আল-আন্দালুসি আল-ইশবিলি। যেটি 'আল-হাফেল ফি তাকমিলাতিল কামেল নামে প্রসিদ্ধ এবং এক বিশাল ভলিয়মবিশিষ্ট। এমনভাবে 'কিতাবুজ্ জুআফা লিল উকায়লি' এবং আল্লামা দায়লামি (র.)-এর 'মুসনাদুল ফিরদাউস' যাতে তিনি দশ হাজার সংক্ষিপ্ত বাচনিক হাদিস হুরূফে হিজার তারতিবে সংকলন করেছেন। আল্লামা সুয়ুতি (র.)-এর 'তারিখুল খুলাফা', হাফেজ ইবনে আসাকিরের 'তারিখে দিমাশক' যেটি ৮০ খণ্ডবিশিষ্ট, আর খতিব বাগদাদির 'তারিখে বাগদাদ' যেটি প্রায় ২০ খণ্ডবিশিষ্ট– এসব কিতাব এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

كتاب الضعفاء للعقيلى এবং الكامل لابن عدى : نوادر الاصول للحكيم الترمذى (رح) সম্পর্কে হজরত শাহ আব্দুল আজিজ (র.)-এর এই উক্তি বিরাট অংশেই সঠিক যে, এগুলোর সব হাদিস দুর্বল। এর কারণ হলো, তাঁরা এসব কিতাব লিখেছেন দুর্বল রাবিদের আলোচনায় এবং তাদের হাদিসও বর্ণনা করেছেন। এজন্য স্পষ্ট হলো, তাদের প্রতিটি হাদিস দুর্বল হবে। যতোক্ষণ পর্যন্ত এর বিশুদ্ধতা শক্তিশালী প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্ত না হবে। কিন্তু অবশিষ্ট কিতাবগুলো সম্পর্কে হজরত শাহ সাহেব (র.)-এর উক্তির উদ্দেশ্য প্রবল ধারণা মুতাবিক এই যে, এসব কিতাবের সেসব বর্ণনা দুর্বল এসব কিতাব ছাড়া অন্য কিতাবে যেগুলো বর্ণিত হয়নি। অন্যথায় এগুলোর মধ্যে এমন কিছু কিছু হাদিসও আছে যেগুলো সিহাহ সিত্তায় বর্ণিত। ব্যাপক আকারে এসব হাদিসকে দুর্বল সাব্যস্ত করা যায় না।

পঞ্চম স্তর

পঞ্চম স্তরের কিতাব যেগুলো রচিত হয়েছে মওজু হাদিসগুলো সম্পর্কে। যেমন-موضوعات كبرى لابن الجوزى موضوعات للصنعانى - اللالى المصنوعة للسيوطى - এগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট এটাই যে, এসব মওজু হাদিসের সমষ্টি।

হাদিস শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ প্রণেতাদের পরিচিতি

সেসব উলামা ও মুহাদ্দিসিনের জীবনীও হাদিস গ্রন্থাবলির এসব স্তরের সাথে জানা আবশ্যক যারা নিজ লেখাগুলোতে প্রচুর পরিমাণে প্রাসঙ্গিকভাবে হাদিস উল্লেখ করেন। যেমন, ইমাম গাজালি (র.), ইবনুল জাওজি (র.), হাফেজ মুনজিরি (র.), হাফিজ ইবনে হাজার (র.), হাফেজ জাহাবি (র.), আল্লামা সুয়ুতি (র.), আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র.), আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (র.), আল্লামা কুরতুবি (র.), আল্লামা নববী (র.) প্রমুখ অন্যতম।

০ ইমাম গাজালি (র.) ইলমুল কালাম, তাসাওউফ, যুক্তি এবং উসুলে ফিকহের ইমাম। কিন্তু এলমে হাদিসের সাথে তার ব্যস্ততা ছিলো কম। স্বয়ং তিনি তাঁর এক গ্রন্থে এর স্বীকারোক্তি এভাবে করেছেন بضاعتى فى الحديث مزجاة তথা ইলমে হাদিসে আমার পুঁজি কম। এ কারণে ইমাম গাজালি (র.) স্বীয় গ্রন্থাবলিতে প্রচুর দুর্বল, মুনকার ও মওজু হাদিস উল্লেখ করেন। বিশেষ করে তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইহইয়াউ উলুমিদ্দিনে' এমন প্রচুর হাদিস আছে যেগুলো মুহাদ্দিসিনের মানদণ্ডে বহু নিম্নমানের। তাই অনেক মুহাদ্দিস احياء علوم الدين এর তাখরিজও করেছেন। তারমধ্যে হাফেজ জায়নুদ্দিন ইরাকি (র.)-এর তাখরিজ প্রসিদ্ধ। যাতে এমন হাদিসগুলোর সনদ নিয়ে কালাম করা হয়েছে। তাছাড়া আল্লামা মুরতাজা জুবায়দি 'ইতহাফুস্ সাদাতিল মুত্তাকিন বিশরহি ইয়াহয়ায়ে উলুমিদ্দিনে' ও এসব হাদিসের তাখরিজ করে এসব হাদিসের ওপর কালাম করেছেন মুহাদ্দিস সুলভ।

০ দ্বিতীয় বহু গ্রন্থ প্রণেতা আলেম আল্লামা ইবনুল জাওজি (র.)। তিনি হাদিস পরখ করার ব্যাপারে খুবই সাবধানি এবং কট্টরপন্থী। তাই তার গ্রন্থাবলি এলমে হাদিসে প্রয়োজনাতিরিক্ত কঠোর। তিনি বহু সহিহ

হাদিসকেও মওজু সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু এটা আশ্চর্যের বিষয় যে, নিজের কঠোরতা সত্ত্বেও স্বয়ং তিনি ওয়াজ-নসিহতের জন্য যেসব কিতাব রচনা করেছেন যেমন, 'তালবিসে ইবলিস', 'জম্মুল হাওয়া', 'আত্ তাবসিরাহ' ইত্যাদিতে হাদিস পরখের সেসব মানদণ্ড অবশিষ্ট নেই; বরং এগুলোতে কোনো সতর্কবাণী ছাড়াই প্রচুর পরিমাণ দুর্বল, মওজু, মুনকার হাদিস উল্লেখ করেছেন। অতএব, তার কিতাবগুলোর ওপর নির্ভর করা যায় না।

০ তৃতীয় বহু গ্রন্থ প্রণেতা আলেম হাফেজ মুনজিরি (র.)। তিনি বহু সম্মানিত মুহাদ্দিস এবং হাদিসের মুহাক্কিক। তাই তিনি সতর্কবাণী ছাড়া কোনো দুর্বল হাদিস বর্ণনা করেন না। এ কারণে তার কোনো হাদিস সমালোচনা ব্যতীত বর্ণনা করে দেওয়া এ কথার প্রমাণ যে, তার নিকট সে হাদিস প্রমাণযোগ্য। কিন্তু তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আত্ তারগিব ওয়াত্ তারহিব'-এর একটি খাস পরিভাষা নির্ধারণ করেছেন, অধিকাংশ মানুষ যে সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে ধোঁকায় পতিত হয়। সে পরিভাষাটি হলো, যে রেওয়ায়াত তার মতে সহিহ অথবা হাসান হয়, সেটিকে তিনি বর্ণনা করেন عن শব্দ দ্বারা। যেমন- عن ابى هريرة । কিন্তু তাঁর মতে যে হাদিসটি দুর্বল হয়, সেটিকে তিনি روى عن বলে বর্ণনা করেন। যেমন- روى عن ابن عمر (رضـ) كذا এবং সনদের ওপর কোনো কালাম করেন না। যারা এ পরিভাষা সম্পর্কে না ওয়াকিফহাল থাকে, তারা দ্বিতীয় প্রকার হাদিসগুলোকেও এই বিশ্বাসে প্রমাণযোগ্য মনে করে যে, এগুলোকে হাফেজ মুনজিরি (র.)-ও কোনো প্রকার সমালোচনা না করে উল্লেখ করেছেন। এগুলো সহিহ নয়।

০ চতুর্থ বহু গ্রন্থ প্রণেতা আলেম হলেন হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি (র.)। তিনি হাদিসের প্রসিদ্ধ ইমাম। হাফেজ এবং পরখকারি। ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, তার কিতাব 'ফাতহুল বারি' এবং 'তালখিসুল হাবিরে' যেসব হাদিস কোনো কালাম বা সমালোচনা ব্যতীত উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো কমপক্ষে হাসানের স্তরে উন্নীত।

০ পঞ্চম বহু গ্রন্থ প্রণেতা আলিম হাফিজ শামসুদ্দিন জাহাবি (র.)। তিনি নিঃসন্দেহে এলমে হাদিসের উত্তম পরখকারি। অতএব, তার গ্রন্থগুলোতে দুর্বল হাদিস কোনো কালাম ছাড়া আসার সম্ভাবনা খুবই কম। অবশ্য তার 'কিতাবুল কাবায়িরে' অনেক দুর্বল হাদিসও এসে গেছে।

০ ষষ্ঠ আলেম আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি (র.)। যদিও তিনি প্রতিটি শাস্ত্রে মুজতাহিদের ন্যায় মাকামের অধিকারী; কিন্তু হাদিস বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে খুবই নরম। এ কারণে ইলমে হাদিসে তার উপাধি حاطب ليل তথা 'রাত্রে কাঠ সংগ্রহকারি' (অবিবেচক) প্রসিদ্ধ। এ কারণে তিনি যখন কোনো বিষয়ের ওপর হাদিস বর্ণনা করেন তখন নির্ভরযোগ্য অনির্ভরযোগ্য সব ধরনের হাদিস উপস্থাপন করেন এবং এগুলোর ওপর কোনো সমালোচনা করেন না। তাঁর গ্রন্থ 'আল-খাসায়িলুল কুবরা' 'তাফসির আদ্ দুররুল মানসুর' এবং 'আল-ইতকান' নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য সর্বপ্রকার হাদিসের সমষ্টি। তিনি কিতাবের শুরুতে الجامع الصغير সম্পর্কে যদিও স্বয়ং লিখেছেন যে, আমি এ কিতাবে কোনো মিথ্যুক অথবা হাদিস জালকারির হাদিস বর্ণনা করবো না; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি 'আল-জামিউস্ সগিরে' অনেক মওজু হাদিসও উল্লেখ করেছেন। এমনকি এগুলোর কোনো কোনো হাদিস এমনও রয়েছে যেগুলোতে স্বয়ং আল্লামা সুয়ুতি اللالى المصنوعة 'আল-লাআলিল মাসনুআহ' গ্রন্থে মওজু সাব্যস্ত করেছেন। এর কারণ, হয়তো তার ভুল হয়ে গেছে অথবা পরবর্তীতে তার মত পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'আল-জামিউস্ সগির' গ্রন্থে প্রতিটি হাদিসের সাথে ح، ص অথবা ض যেসব ইঙ্গিত থাকে সেগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ আল্লামা আব্দুর রব মানাবি (র.) فيض القدير شرح الجامع الصغير 'ফয়জুল কাদির শরহুল জামিইস্ সগিরে' লিখেছেন যে, এগুলোর মধ্য হতে অনেক ইঙ্গিত পরবর্তীগণ লিখেছেন। যেগুলো আল্লামা সুয়ুতি (র.) লিখেছেন তাতে অনেক বিকৃতি ঘটেছে।

০ সপ্তম বহু গ্রন্থ প্রণেতা আলেম হলেন, আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা (র.)। হাদিসের ব্যাপারে তিনি প্রয়োজনাতিরিক্ত কঠোর। সহিহ. হাসান হাদিসগুলোকেও কোনো কোনো সময় দুর্বল বলে দিয়েছেন। 'লিসানুল

মিজান' এ হাফেজ ইবনে হাজার (র.) ইউসুফ ইবনে হোসাইন ইবনে মুতাহ্হার আল-হিল্লির জীবনীতে লিখেন যে, আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা (র.) 'মিনহাজুস সুন্নাহ' নামক কিতাবে অনেক সহিহ হাদিসকেও অগ্রহণযোগ্য বলেছেন।

০ অষ্টম আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (র.)। আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা (র.)-এর শিষ্য। এলমে হাদিসে তিনি অনেক উঁচু মাকামের অধিকারী। অধিকাংশ হাদিস বর্ণনা করার সময় বিশুদ্ধতার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন; কিন্তু কোনো কোনো সময় দুর্বল হাদিসগুলো সম্পর্কে শুধু নির্ভরযোগ্য না, বরং এগুলোকে মুতাওয়াতিরের ন্যায় অকাট্য সাব্যস্ত করেন। আবার কোনো কোনো সময় নির্ভরযোগ্য হাদিসগুলোকে দুর্বল বলেছেন।

০ নবম আল্লামা কুরতুবি (র.)। তার সম্পর্কে 'আল-আজবিবাতুল ফাজিলা'-এর টীকায় লিখেছেন আমাদের উস্তাদ শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দা আল-হালাবি (র.) তার পদ্ধতি হলো, তিনি যে হাদিসকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন, সেটিকে উল্লেখ করেন বরাতসহ। আর যেটি সম্পর্কে তার সন্দেহ হয় সেটিকে বরাতবিহীন বর্ণনা করেন। অতএব, দ্বিতীয় প্রকার হাদিসের ওপর তাহকিক ছাড়া নির্ভর করা উচিত।

০ দশম আল্লামা নববী (র.)। হাদিসের ব্যাপারে তিনি খুবই সাবধানী। সাধারণত দুর্বল এবং মওজু হাদিসগুলো সতর্কবাণী ছাড়া উল্লেখ করেন না। তাই হাদিসের ব্যাপারে তার কিতাবাদির ওপর নির্ভর করা যায়। অবশ্য 'কিতাবুল আজকার' এর থেকে ব্যতিক্রম। কারণ, তাতে এসে গেছে অনেক দুর্বল হাদিস।

সর্বশেষ মনে রাখতে হবে যে, ওয়াজ, তাসাওউফ, ইতিহাস, সিরাত, কিয়ামতের আলামত, সৃষ্টির সূচনা, তাফসির ইত্যাদির রেওয়ায়াতে সাধারণত দুর্বল ও জাল হাদিসের প্রাচুর্য থাকে। সুতরাং এসব ব্যাপারে উচিত পূর্ণ সতর্কতা এবং তাহকিক অবলম্বন করা।

রাবিদের স্তর

হাদিস বর্ণনাকারিদের স্তর দু'টি বর্ণনা করা হয়েছে ভিন্ন হিসেবে।

১. বর্ণনাকারিদের স্মরণশক্তি এবং উস্তাদের সংসর্গ হিসেবে।

২. তাদের কাল এবং ইতিহাস হিসেবে। প্রথম হিসেবে বর্ণনাকারিদের পাঁচটি স্তর রয়েছে। আমাদের জানামতে এই পাঁচটি স্তর সর্বপ্রথম আল্লামা আবু বকর হাজেমি (র.) নিজ গ্রন্থ شروط الائمة الخمسة [১] পৃষ্ঠা : ৪৩ এ উল্লেখ করেছেন। সেই পাঁচটি স্তর নিম্নেযুক্ত :

১. قوى الضبط، كثير الملازمة তথা যার স্মরণশক্তিও শক্তিশালী এবং তিনি উস্তাদের সোহবতও বেশি অর্জন করেছেন।

২. قوى الضبط، قليل الملازمة তথা যার স্মরণশক্তি শক্তিশালী কিন্তু উস্তাদের সোহবত বেশি অর্জন করেননি।

৩. قليل الضبط، كثير الملازمة তথা যার স্মরণশক্তি দুর্বল, উস্তাদদের সোহবত বেশি লাভ করেছেন।

৪. قليل الضبط، قليل الملازمة তথা যার স্মরণশক্তি কম আবার উস্তাদের সংসর্গও কম লাভ করেছেন।

৫. الضعفاء، والمجاهيل তথা দুর্বল ও অজ্ঞাত বর্ণনাকারিগণ। সিহাহ সিত্তার সনদের স্তর নির্ধারণ করা হয়েছে এই পাঁচটি স্তর হিসেবে। ইমাম বোখারি (র.) এর নিয়ম হলো, তিনি স্বতন্ত্রভাবে শুধু প্রথম স্তরের হাদিসগুলো গ্রহণ করেন। অবশ্য কখনো কখনো প্রমাণ স্বরূপ দ্বিতীয় স্তরকেও নিয়ে আসেন। এজন্য বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে তার جامع بخارى সবার ওপরে।

প্রথম দুই স্তরকে ইমাম মুসলিম (র.) অকৃত্রিমভাবে নিয়ে আসেন। অবশ্য তিনি কখনও কখনও একেবারে নগণ্য ইসতিশহাদ প্রমাণরূপে তৃতীয় স্তরকেও নিয়ে আসেন। বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে এজন্য তার গ্রন্থটি দ্বিতীয় নম্বরে।

প্রথম তিন স্তরকে ইমাম নাসায়ি (র.) স্বতন্ত্রভাবে এনেছেন তাই তার গ্রন্থটি তৃতীয় নম্বরে।

টীকা. ১. এ গ্রন্থটি ১৩৫৭ হিজরিতে শায়খ কাওসারি (র.)-এর টীকা সহকারে কায়রো থেকে ছাপা হয়েছে এবং কুতুবখানা দারুল উলুম করাচিতে ৮২৬৮নং-এর অধীনে বিদ্যমান রয়েছে। গ্রন্থটি নেহায়েত উপকারী এবং অবশ্যই পাঠ্য।

তিন স্তরের সাথে সহযোগী প্রমাণ স্বরূপ চতুর্থ স্তরের বর্ণনাও নিয়েছেন ইমাম আবু দাউদ (র.) তাই তার সুনান চতুর্থ নম্বরে।

চতুর্থ স্তরকে স্বতন্ত্রভাবে, কোনো কোনো স্থানে পঞ্চম স্তরকেও ইমাম তিরমিযী (র.) নিয়ে এসেছেন। তাই তার জামে পঞ্চম নম্বরে।

পাঁচটি স্তরের বর্ণনা স্বাভাবিক ও অকৃত্রিমভাবে স্বতন্ত্ররূপে উল্লেখ করেছেন ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) তাই তার গ্রন্থটি ছয় নম্বরে।

সুতরাং, সনদের শক্তির দিক দিয়ে লক্ষ্য করলে সিহাহ সিত্তার ক্রমবিন্যাস নিম্নযুক্ত :

১. বুখারি, ২. মুসলিম, ৩. নাসায়ি, ৪. আবু দাউদ, ৫. তিরমিযী, ৬. ইবনে মাজাহ।

দুর্বল এবং মুনকার রেওয়ায়াতের বিরাট সমাবেশ ইবনে মাজাহতে ঘটেছে; বরং তাতে কোনো কোনো রেওয়ায়াত জালও এসে গেছে। যার সংখ্যা কেউ ১৭, কেউ ১৯, কেউ ২১, কেউ ২৫টি উল্লেখ করেছেন। এ কারণেই মুহাদ্দিসিনের একটি দল এটিকে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেন না। বরং এর স্থলে কেউ রেখেছেন মুয়াত্তা ইমাম মালিককে আর কেউ মুসনাদে দারেমিকে। কিন্তু জমহুরের ঝোঁক হলো ইবনে মাজাহর সুন্দর তারতিবের ভিত্তিতে এটাকে সিহাহ সিত্তার পর্যায়ভুক্ত করা।

০ বর্ণনাকারিদের এই স্তরগুলো ছিলো সনদের মানদণ্ড হিসেবে। ঐতিহাসিকভাবে হাদিসের রাবিদের বারটি স্তর নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যখন রিজাল শাস্ত্রের কিতাবগুলোতে কোনো রাবির কোনো স্তর বর্ণনা করা হয়, তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই ঐতিহাসিক স্তরগুলোই হয়ে থাকে। এই ঐতিহাসিক স্তরগুলোকে সর্বপ্রথম 'তাকরিবুত্ তাহজিবে হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীগণ তারই অনুসরণ করেছেন। সে স্তরগুলো নিম্নযুক্ত :

১. সাহাবিগণের স্তর। এতে নির্বিশেষে কোনো মরতবার ব্যবধান ছাড়াই সমস্ত সাহাবি অন্তর্ভুক্ত।

২. বড় বড় তাবেয়িনের স্তর। যেমন, হজরত সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব।

৩. মধ্যম পর্যায়ের তাবেয়িনের স্তর। যেমন– হাসান বসরি, মুহাম্মদ ইবনে সিরিন।

৪. মধ্যম পর্যায় পরবর্তী স্তর, যাদের বর্ণনা সাহাবিদের চেয়ে কম এবং বড় বড় তাবেয়িদের চেয়ে বেশি। যেমন– ইমাম জুহরি, কাতাদা অনেক।

৫. তাবেয়িনের ছোট স্তর। তাঁরা হলেন যাঁদের সাক্ষাৎ ঘটেছে একজন অথবা দু'জন সাহাবির সাথে; কিন্তু তাদের কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করেননি। যেমন, সোলায়মান আল-আ'মাশ।

৬. তাবেয়িনের শেষ স্তর। তারা পঞ্চম স্তরের সমকালীন; কিন্তু কোনো সাহাবির সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়নি। যেমন– ইবনে জুরাইজ। বস্তুত তিনি তাবেয়ি নন। কিন্তু তাবেয়িনের সমকালীন হওয়ার কারণে তাঁকে গণ্য করা হয় তাবেয়িনের স্তরে।

৭. বড় তাবে তাবেয়িন। যেমন– ইমাম মালেক, সুফিয়ান সাওরি (র.)।

৮. তাবে তাবেয়িনের মধ্যম স্তর। যেমন– সুফিয়ান ইবনে উলাইয়্যাহ, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা।

৯. তাবে তাবেয়িনের ছোট স্তর যেমন– ইমাম শাফেয়ি, ইমাম আব্দুর রাজ্জাক।

১০. তাবে তাবেয়িন থেকে হাদিস গ্রহণকারি বড় স্তর এমন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল প্রমুখ।

১১. তাঁদের মধ্যম স্তর। যেমন, ইমাম বোখারি, ইমাম জুহলি, আলি ইবনুল মাদিনি প্রমুখ।

১২. তাঁদের ছোট স্তর। যেমন– ইমাম তিরমিযী এবং তাঁর সমকালীনগণ।

এই বারটি স্তরের মধ্য থেকে প্রথম দুটি স্তরের বেশির ভাগ রাবি হিজরি প্রথম শতাব্দির। তৃতীয় স্তর থেকে অষ্টম স্তর পর্যন্ত অধিকাংশ রাবি হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দির। আর নবম স্তর থেকে দ্বাদশ স্তর পর্যন্ত বর্ণনাকারিগণ হিজরি তৃতীয় শতাব্দির।

এই স্তরগুলো নির্ধারণ করার ফলে রিজাল শাস্ত্রের লেখকগণের জন্য খুবই সহজ হয়ে গেছে। কেননা, রিজাল

শাস্ত্রে গ্রন্থকারদের নিয়ম হলো, তাঁরা প্রতিটি বর্ণনাকারি সাথে তাঁদের উস্তাদ এবং শিষ্যদের একটি বিরাট তালিকা বর্ণনা করেন। উস্তাদদের আলোচনা করতে গিয়ে তাদের ইবারত হয় নিম্নরূপ : روى عن فلان و عن فلان আর শিষ্যদের আলোচনা করতে গিয়ে তাদের বর্ণনা হয় এমন روى عنه فلان وفلان । সংক্ষিপ্ত রিজালের গ্রন্থাবলি যখন লেখা হয়েছে, তখন সেগুলোতে উস্তাদ এবং ছাত্রদের লম্বা তালিকা লেখার পরিবর্তে বর্ণনাকারির শুধু ঐতিহাসিক স্তর বর্ণনা করে ক্ষান্ত করা হয়। এই পদ্ধতি সর্বপ্রথম 'তাকরিবুত্ তাহজিবে' হাফেজ ইবনে হাজার (র.) শুরু করেছেন। অন্যরা পরবর্তীতে তাকে অনুসরণ করেছেন। সুতরাং এখন রাবির সাথে শুধু এতোটুকু লেখা যথেষ্ট হয়ে যায় যে, ثقة من الثالثة ইত্যাদি। অর্থাৎ, তিনি মধ্যম স্তরের তাবেয়িদের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে উস্তাদ এবং ছাত্রদের দীর্ঘ তালিকা লিখতে হয় না।

হাদিস গ্রহণের বিভিন্ন শ্রেনি-বিন্যাস

উস্তাদ থেকে হাদিস নেওয়ার পারিভাষিক নাম تحمل । এর প্রকার পাঁচটি। এগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নেযুক্ত :

১. **السماع :** এর অর্থ হলো উস্তাদ হাদিস পড়বেন আর ছাত্র হাদিস শুনবেন। এমতাবস্থায় শিষ্যের জন্য سمعت فلانا يقول - اخبرني - حدثني শব্দ ব্যবহার করার অনুমতি আছে। অতঃপর তাতে মতানৈক্য রয়েছে যে, এগুলোর মধ্যে কোনো শব্দটি উত্তম। কেউ প্রাধান্য দেন سمعت শব্দটিকে আর কেউ حدثني শব্দকে।

২. **القرائة على الشيخ :** তথা শিষ্য হাদিস পড়বে আর উস্তাদ শুনবেন। এ অবস্থায়ও শিষ্যের জন্য উস্তাদ থেকে হাদিস বর্ণনা জায়েজ। এই প্রকারের قرأت عليه - انبأني - اخبرني শব্দ ব্যবহার হয়। যদি একাধিক রাবির একটি দল হয় তাহলে اخبرنا - انبأنا বলা হয়। এ দুটিতেও কেউ কেউ পার্থক্য করেছেন যে, জামাতের মধ্য থেকে যে শিষ্য পড়বে সে اخبرنا বলবে। আর যেসব শিষ্য শুনবে তারা বলবে انبأنا । انبأنا-এর পদ্ধতিতে قرأت عليه এবং وانا اسمع শব্দ বাড়িয়ে দেয়া উত্তম। অতঃপর তাতে মতানৈক্য আছে যে, سماع এবং قرأت على الشيخ এ দুটির মধ্য হতে কোনো পদ্ধতিটি উত্তম। ইমাম মালেক ও শাফেয়ি (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা বলেন سماع উত্তম। ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে قرأت على الشيخ উত্তম। কেননা এই পদ্ধতিতে সতর্কতা ও তাহকিক বেশি। এতে যদি শিষ্যের কোনো ভুল হয় তখন উস্তাদ এর সংশোধন করতে পারেন। হাফেজ সাখাবি (র.) সিদ্ধান্তমূলক এ উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, মূল বিষয় হলো, ভুলের সম্ভাবনা থেকে বাঁচা। আর এ জিনিসটি যে পদ্ধতিতে বেশি অর্জিত হবে সেটি উত্তম। অবস্থার পরিবর্তনের কারণে কখনও এটি অর্জিত হয় سماع এর মধ্যে আর কখনো قراءة এর মধ্যে।

৩. **المراسلة با المكاتبة :** অর্থাৎ, চিঠি লিখে কারো নিকট রেওয়ায়াত প্রেরণ করা। এতে মতপার্থক্য রয়েছে যে, এ অবস্থায় ছাত্রের জন্য বর্ণনা করা জায়েজ হয় কখন? কারো কারো মতে যতোক্ষণ পর্যন্ত উস্তাদের পক্ষ থেকে বর্ণনা করার সুস্পষ্ট অনুমতি না হবে ততোক্ষণ পর্যন্ত শিষ্যের জন্য বর্ণনা করা জায়েজ নেই। কিন্তু নির্ভরযোগ্য উক্তি হলো, যদি শিষ্য উস্তাদের চিঠি চিনতে পারে তবে বর্ণনা জায়েজ। যদিও সুস্পষ্ট অনুমতি না থাকে। অবশ্য এ পদ্ধতিতে حدثني অথবা اخبرني শব্দ ব্যবহার করা যায় না; বরং كاتبني অথবা كتب الى অথবা ব্যবহার হবে ارسل الى শব্দ।

৪. **المناولة :** তথা, উস্তাদ নিজের বর্ণিত হাদিসগুলোর কোনো সমষ্টি অর্পণ করবেন শিষ্যের নিকট। অনেকে বলেছেন এই সমষ্টি থেকে বর্ণনা করার জন্যও উস্তাদের সুস্পষ্ট অনুমতি প্রয়োজন। কিন্তু সিদ্ধান্তমূলক উক্তি হলো, স্পষ্ট অনুমতির প্রয়োজন নেই। যদি শিষ্যের এই বিশ্বাস হয় যে, উস্তাদ এই সমষ্টি রেওয়ায়াত করার জন্য দিয়েছেন তবে সে বর্ণনা করতে পারে। অবশ্য এখানেও حدثني বা اخبرني বলা জায়েজ নেই; বরং বলা উচিত ناولني

৫. الوجادة : তথা, কোনো শায়খের বর্ণিত হাদিসগুলোর সমষ্টি শায়খ ব্যতিত অর্জিত হওয়া অন্য কোনো পদ্ধতিতে। এ সম্পর্কে অধিকাংশ মুহাদ্দিসিনের মত হলো, তার থেকে হাদিস বর্ণনা করা জায়েজ নেই। কারণ, হতে পারে শায়খ এই সমষ্টি মওজুআত তথা মা'লুলাতকে স্মরণ রাখার জন্য তৈরি করেছেন। কেউ কেউ এর থেকে হাদিস বর্ণনা করা জায়েজ সাব্যস্ত করেন। তারা বলেন, এই পদ্ধতিতে শায়খের চিঠির ওপর বিশ্বাস থাকলে وجدت بخط فلان শব্দে হাদিস বর্ণনা করাতে কোনো সমস্যা নেই।

হাদিস বিশুদ্ধ কিংবা দুর্বল সাব্যস্ত করার উসুল

হাদিসকে বিশুদ্ধ ও দুর্বল সাব্যস্ত করা যদিও একটি ভিন্ন শাস্ত্র। যেটি এলমে উসুলে হাদিস ও এলমে জারহ ও তা'দিলে সংকলিত হয়েছে এবং এখানে এর সমস্ত বিস্তারিত বিবরণসহ আলোচনা করা অসম্ভব। কিন্তু এ সম্পর্কে এমন কয়েকটি উসুল বর্ণিত হচ্ছে, যেগুলো সাধারণত মানুষের দৃষ্টির বাইরে থাকে এবং এগুলোর প্রয়োজন হয় হাদিসের আলোচনায়। যেগুলোকে দৃষ্টির বাইরে রাখার কারণে লোকজন হানাফিদের ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, হানাফিদের অধিকাংশ দলিল জয়িফ।

প্রথম উসুল

অনেকে মনে করেন সহিহ হাদিস সীমাবদ্ধ শুধু সহিহ বোখারি কিংবা সহিহ মুসলিমে। আবার অনেকের ধারণা হলো, যেসব হাদিস সহিহ বোখারি ও মুসলিমে নেই, সেগুলো অবশ্যই দুর্বল হবে এবং সেটি কোনো অবস্থাতেই সহিহ বোখারি ও মুসলিমের হাদিসের মুকাবেলা করতে পারে না। অথচ এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, কোনো হাদিসের বিশুদ্ধতা বোখারি অথবা মুসলিমে হওয়ার ওপর নির্ভর করে না; বরং এর নিজস্ব সনদের ওপর নির্ভর করে। স্বয়ং ইমাম বোখারি (র.) বলেছেন, আমি নিজ গ্রন্থে সমস্ত সহিহ হাদিস আনিনি। সুতরাং এটা সম্ভব যে, কোনো হাদিস সহিহ বোখারি মুসলিমে নেই তা সত্ত্বেও তার মর্তবা সনদগতভাবে সহিহ বোখারি মুসলিমের কোনো কোনো হাদিস থেকেও উঁচু পর্যায়ের। যেমন, মাওলানা আব্দুর রশিদ নু'মানি 'মা তামাস্সু ইলাইহিল হাজাহ' নামক গ্রন্থে ইবনে মাজাহর এমন কিছু কিছু হাদিস বর্ণনা করেছেন যেগুলো সম্পর্কে মুহাদ্দিসিনের সিদ্ধান্ত হলো, এগুলোর সনদ বোখারির সনদ থেকেও উত্তম। অতএব, সহিহ বোখারি ও মুসলিমকে যে اصح الكتب بعد كتاب الله তথা কোরআনের পর বিশুদ্ধতম গ্রন্থ বলা হয়, সেটি সমষ্টিগতভাবে প্রতিটি হাদিসের দিকে লক্ষ্য করে নয়। এ বিষয়ে অতিরিক্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য মাওলানা জাফর আহমদ উসমানি (র)-এর 'ইনহাউস্ সাকান ইলা মাইয়ুতালিউ' ই'লাউস্ সুনান'।

দ্বিতীয় উসুল

হাদিস সহিহ ও জয়িফ সাব্যস্ত করা খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। যার জন্য অনেক সুপ্রশস্ত ও সুগভীর জ্ঞানের প্রয়োজন। এর যোগ্য শুধু তাঁরাই যাঁরা এই বিদ্যায় ইজতেহাদের পর্যায়ে উন্নীত। এ কারণে হাফেজ ইবনে সালাহ (র.) স্বীয় মুকাদ্দামায় এই মত প্রকাশ করেছেন যে, হিজরি পঞ্চম শতাব্দির পর কারো এই অধিকার নেই যে, কোনো হাদিসকে নতুনভাবে সহিহ অথবা দুর্বল সাব্যস্ত করবে। তবে জমহুর এ মতের বিরোধিতা করেছেন। তাহকিকি বিষয় হলো, বিশুদ্ধ এবং দুর্বল সাব্যস্ত করার পদ মর্যাদা কোনো যুগের সাথে বিশেষিত নয়; বরং বিদ্যা ও অনুধাবনের কাম্য শর্ত-শরায়েত যার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, তিনি বিশুদ্ধ ও দুর্বল সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন। এ কারণে হিজরি পঞ্চম শতাব্দির পর বহু আলিম বিশুদ্ধ ও দুর্বল সাব্যস্ত করার কাজ করেছেন এবং এটাকে উম্মত নির্ভরযোগ্য মনে করেছে। যেমন– হাফেজ জাহাবি, হাফেজ ইবনে হাজার, আল্লামা আইনি, আল্লামা সাখাবি, হাফেজ জায়লায়ি এবং হাফেজ ইরাকি (র.)-এর ন্যায় মুহাদ্দিসিন হিজরি পঞ্চম শতাব্দির পরবর্তীকালের লোক। কিন্তু তাদের সহিহ ও জয়িফ সাব্যস্ত করার বিষয়টি উম্মত নির্ভরযোগ্য মনে করেছে। শেষ যুগে হজরত আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (র.)-ও প্রবল ধারণা মোতাবিক এই পদমর্যাদার অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় উসুল

একই হাদিস অথবা একই রাবি সম্পর্কে কোনো কোনো সময় ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়। কেউ এটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করেন, কেউ নির্ভরযোগ্য। প্রশ্ন হলো, এমন স্থানে কার উক্তি অবলম্বন করা হবে? এই প্রশ্নের জবাবে হজরত মাওলানা আব্দুল হাই (র.) الاجوبة الفاضلة। পৃষ্ঠা ১৬১-১৮০তে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এর সারনির্যাস হলো, এমন উক্তিগুলোতে প্রাধান্য প্রদানের পদ্ধতি আছে তিনটি।

১. প্রথম পদ্ধতি হলো, যদি দু'জন আলেমের মধ্যে কোনো একজন বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে নরম হন আর দ্বিতীয়জন সাবধানী, তাহলে আমল করা হবে দ্বিতীয় জনের উক্তির ওপর। যেমন, একটি হাদিস হাকেম (র.) বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করেন। হাফেজ জাহাবি (র.) এটাকে দুর্বল সাব্যস্ত করেন। তাহলে ধর্তব্য হবে হাফেজ জাহাবি (র.)-এর উক্তি। কেননা, হাকেম নরম। এমনভাবে যদি একজন রাবিকে ইবনে হাব্বান নির্ভরযোগ্য বলেন, আর অন্যরা অনির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করেন, তাহলে ইবনে হাব্বানের উক্তি ধর্তব্য হবে না। কারণ, তিনি অজ্ঞাত রাবিদেরকেও নির্ভরযোগ্য গণ্য করেন তা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

২. দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, যদি দু'জন মুহাদ্দিসের মধ্য হতে একজন কট্টর হন অপরজন মধ্যপন্থী, তবে দ্বিতীয় জনের উক্তি ধর্তব্য হবে। যেমন ইবনুল জাওজি (র.) খুবই কট্টর, আর হাফেজ ইবনে হাজার (র.) অথবা হাফেজ জাহাবি (র.) মধ্যপন্থী। সুতরাং, **ইবনুল জাওজির বিপরীতে ধর্তব্য হবে তাদের দু'জনের উক্তি।**

হাফেজ ইবনে হাজার (র.) থেকে মাওলানা আব্দুল হাই লাখনবি (র.) বর্ণনা করেছেন যে, جرح وتعديل এর ইমামগণের মধ্যে কাল হিসেবে চারটি স্তর রয়েছে। সেসব স্তর সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেছেন, তাদের মধ্যে কারা কট্টর আর কারা মধ্যপন্থী।

এক. প্রথম স্তর শু'বা ও সুফিয়ান সাওরির। এ দুজনের মধ্যে কট্টরতম শু'বা।

দুই. দ্বিতীয় স্তর, ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল-কাত্তান ও আব্দুর রহমান ইবনে মাহদির। এ দু'জনের মধ্যে অধিক কঠোর ইয়াহইয়া।

তিন. তৃতীয় স্তর, ইয়াহইয়া ইবনে মাইন এবং আলি ইবনুল মাদিনির। এ দু'জনের মাঝে বেশি কঠোর ইয়াহইয়া ইবনে মাইন।

চার. চতুর্থ স্তর, ইবনে আবু হাতেম ও ইমাম বোখারির। এ দুজনের মধ্যে ইবনে আবু হাতেম বেশি কঠোর। অতএব, যেখানে তাদের মধ্যে পরস্পরে বিরোধ হবে সেখানে কঠোরতমের উক্তি বাদ দিয়ে অবলম্বন করা হবে মধ্যপন্থীর উক্তি।

মাওলানা লাখনবি (র.) বলেন, তাদের পরবর্তী আলেমদের মাঝে কট্টরদের অন্তর্ভুক্ত আল্লামা ইবনুল জাওজি[১] উমর ইবনে বদর আল-মাওসিল্লি, আল্লামা জাওজেকানি, হাফেজ সান'আনি, 'সিফরুস্ সা'আদত' গ্রন্থকার এবং

টীকা-১. ফাতহুল মুগিসে আল্লামা সাখাভি (র.) (পৃষ্ঠা : ১০৯) বলেন,ইবনুল জাওজির (র.) এই কঠোরতা আরোপের কারণ হলো, মিথ্যুক বলে অভিযুক্ত অর্ধেক রাবির ওপর বেশির ভাগ নির্ভরতাসহ অন্য সনদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা উদাসীনতা। অনেক সময় তাফাররুদের ব্যাপারে তিনি অন্যের কথার ওপর নির্ভর করেন, যার কথা রাসূল (সা.)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। অথচ, কোনো মিথ্যুক বরং জাল হাদিস বর্ণনাকারি যদি এককভাবে কোনো হাদিস বর্ণনা করে, তবুও তার জাল হওয়াকে আবশ্যক করে না। যদিও কোনো বড় হাফেজ পূর্ণাঙ্গরূপে হাদিস তালাশ করার পরই তার এই তাফাররুদ হোক না কেনো। এজন্যই পরবর্তীগণের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত দেওয়া অবশ্যই জটিল। সাখাবি (র.) এর উক্তি এখানে সমাপ্ত হয়েছে। আল্-লা'আলিল মাসনুআ' (১/১১৪-১১৭) নামক গ্রন্থে আল্লামা সুয়ুতি (র.) লেখেন– মনে রাখবেন, হাফেজদের অভ্যাস চলে আসছে– যেমন, হাকেম, ইবনে হাব্বান, উকায়লি প্রমুখ– তাঁরা কোনো হাদিসকে কোনো বিশেষ সনদের দিকে লক্ষ্য করে বাতিল বলে সিদ্ধান্ত দেন। কারণ, এর বর্ণনাকারি এই মূল পাঠটির জন্য এই সনদ জাল তৈরি করেছেন। অথচ এই মূল পাঠটিই অন্য সনদে প্রসিদ্ধ হয়ে থাকে। আর এটি বর্ণনাকারির জীবনীতে তারা উল্লেখ করেন এবং তার সমালোচনা করেন। এর ফলেই ইবনুল জাওজি (র.) ধোঁকায় পড়ে যান। তিনি একটি মূলপাঠের ক্ষেত্রে ব্যাপক আকারে মওজু বলে সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন এবং এটিকে তার 'কিতাবুল মওজুআতে' উল্লেখ করেন। অথচ এটি তার জন্য উচিত ছিলো না। (সুয়ুতির বক্তব্য এখানে শেষ।)

ইমাম জাহাবি (র.) বলেন, জাওজি (র.) কোনো কোনো হাদিসের কোনো রাবি সম্পর্কে কারো কারো সমালোচনার ফলে (যেমন কেউ বললো, অমুক দুর্বল অথবা শক্তিশালী নয় অথবা নরম।) অনেক হাদিসকে মওজু বলে উল্লেখ করার বিষয়টি তিনি ঠিক করেননি। অথচ অন্তর এ হাদিসটি বাতিল বলে সাক্ষ্য দেয় না। আল্লামা সুয়ুতি (র.) অনুরূপ বিবরণ দিয়েছেন। –তাদরিবুর রাবি : ১৮১

আবুল ফাতাহ আজদি এবং আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা (র.)। অতএব, হাফেজ ইবনে হাজার, হাফেজ জাহাবি, হাফেজ ইরাকি এবং হাফেজ জায়লায়ি প্রমুখ মধ্যপন্থী ওলামার বিপরীতে বর্জন করা হবে ওপরযুক্তদের বক্তব্য।

৩. তৃতীয় পদ্ধতি, দুই পক্ষের প্রমাণাদি দিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা। যার প্রমাণাদি শক্তিশালী মনে হবে করা হবে, তার উক্তি গ্রহণ। যার এলমে হাদিস সংক্রান্ত বিষয়াবলিতে পূর্ণ দক্ষতা অর্জিত হবে এ কাজটি তিনিই করতে পারেন। মধ্যপন্থী ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্যের সুরতে এই তৃতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে। অর্থাৎ, যদি কোনো ব্যক্তির মাঝে উভয় পক্ষের প্রমাণাদি তুলনা করার যোগ্যতা অর্জিত হয়, তাহলে তিনি তুলনা করে কোনো একটি উক্তিকে প্রাধান্য দিতে পারেন। অন্যথায় যার উক্তির ওপর বেশি নির্ভর হবে সেটিই অবলম্বন করতে হবে।

চতুর্থ উসুল

হাদিস সহিহ ও জয়িফ সাব্যস্ত করার বিষয়টি একটি ইজতিহাদি ব্যাপার। মুহাক্কিক ইবনে হুমাম (র.) এ বিষয়ে স্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন। যাতে মুজতাহিদদের মতো বিভিন্ন রকম হতে পারে এবং এমন অবস্থায় কোনো মুজতাহিদের কোনোরূপ নিন্দা করা হবে না। তাছাড়া কোনো মুজতাহিদ কর্তৃক কোনো হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা এর প্রমাণ যে, সে হাদিসটি তার নিকট প্রমাণযোগ্য। সুতরাং এর বিপরীতে অন্য কোনো মুজতাহিদের উক্তি পেশ করা ঠিক নয় যে, হাদিসটি প্রমাণযোগ্য নয়। কেননা, এক মুজতাহিদের উক্তি প্রমাণ হয় না দ্বিতীয় মুজতাহিদের বিরুদ্ধে।

পঞ্চম উসুল

অনেক সময় এমন হয় যে, কোনো পূর্ববর্তী মনীষী যেমন ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর নিকট একটি হাদিস সম্পূর্ণ সহিহ সনদে পৌঁছেছে; কিন্তু তার পরে এই হাদিসের সনদে এসে গেছে কোনো দুর্বল রাবি। যে কারণে পরবর্তী লোকজন এটাকে দুর্বল সাব্যস্ত করেন। স্পষ্ট বিষয় হলো, পরবর্তী লোকদের এই দুর্বল সাব্যস্ত করা ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর বিরুদ্ধে প্রমাণ হতে পারে না। হানাফিদের ছাড়া অন্যান্য আলেম এই উসুল সম্পর্কে স্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন। এ কারণে ইমাম বোখারি (র.)-এর যুগে যে হাদিসটি দুর্বল সাব্যস্ত করা হয়েছে, পূর্বযুগেও সেটি জয়িফ থাকতে হবে এটা প্রয়োজন পড়ে না।

ষষ্ঠ উসুল

'মুকাদ্দামাতে' হাফেজ ইবনুস সালাহ (র.) লিখেছেন, আমরা যখন কোনো হাদিসকে বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করি, তখন এর এ অর্থ হয় না যে, বাস্তবেও এটি সুনিশ্চিতরূপে বিশুদ্ধ; বরং এর অর্থ এই হয় যে, এতে সহিহের সেসব শাস্ত্রগত শর্ত-শরায়েত বিদ্যমান, যেগুলো মুহাদ্দিসিনে কেরাম নির্ণয় করেছেন সহিহের জন্য। অতএব, প্রবল ধারণা হয় যে, বাস্তবেও এটি বিশুদ্ধ হবে। কারণ, বাস্তবে বিশুদ্ধতার নিশ্চিত জ্ঞান মুতাওয়াতির হওয়া ব্যতিত হয় না। অতএব, সহিহতেও এই সম্ভাবনা থাকে যে, বাস্তবে তাতে কোনো ভুল রয়ে গেছে। কারণ, ভুল-বিস্মৃতি নির্ভরযোগ্য লোক থেকেও হওয়া সম্ভব এবং কোনো রাবি থেকে কোনো ভ্রম হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা আছে। অবশ্য এ সম্ভাবনার ওপর আমল ততোক্ষণ পর্যন্ত বৈধ নয়, যতোক্ষণ পর্যন্ত এই সম্ভাবনার বাস্তবতা অন্য শক্তিশালী নিদর্শনাবলি ও প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণিত না হয়। অতএব, যদি অন্য শক্তিশালী প্রমাণাদি প্রমাণ করে যে, এই সহিহ হাদিসটিতে কোনো রাবির কোনো ভ্রম হয়ে গেছে। তবে এই হাদিসটি বর্জন করা যেতে পারে। যেমন এর চেয়ে বিশুদ্ধতম হাদিস-এর পরিপন্থী ও সাংঘর্ষিক অথবা সে হাদিসটি কোরআনে কারিমের স্পষ্ট কোনো আয়াতের বাহ্যিক বিপরীত।

এমন করে আমরা যখন বলি অমুক হাদিসটি জয়িফ। তখন এর এ অর্থ হয় না যে, বাস্তবেও এটি মিথ্যা; বরং এ অর্থ হয় যে, এতে সহিহ কিংবা হাসানের শাস্ত্রগত শর্ত-শরায়েত বিদ্যমান নেই। যেগুলোর কারণে এটি

এতোটা নির্ভরযোগ্য নয় যে, এর ওপর কোনো শরয়ি মাসআলার ভিত্তি স্থাপন করা যায়। অন্যথায় এই সম্ভাবনা বিদ্যমান আছে যে, দুর্বল রাবি সম্পূর্ণ সত্য কথা বর্ণনা করেছেন। কেননা, দুর্বল রাবি সর্বদা ভুল করেন না। এ সম্ভাবনার ওপর কিন্তু ততোক্ষণ পর্যন্ত আমল করা বৈধ নয়, যতোক্ষণ না অন্য শক্তিশালী প্রমাণাদি দ্বারা তা প্রমাণিত করবে।

কোনো কোনো সময় এমন হয় যে, কোনো মুজতাহিদের নিকট এমন শক্তিশালী প্রমাণাদি থাকে যেগুলোর ভিত্তিতে তিনি সেই দুর্বল সম্ভাবনাকে প্রধান সাব্যস্ত করে কোনো সহিহ হাদিসকে বর্জন করে দেন। অথবা দুর্বল হাদিস অবলম্বন করেন। এমতাবস্থায় তাকে সহিহ হাদিস বর্জনকারি অথবা দুর্বল হাদিসের ওপর আমলকারি বলা যায় না। একটি দৃষ্টান্ত দেখুন।

'কিতাবুল ইলালে' ইমাম তিরমিযী (র.) লিখেছেন যে, আমার কিতাবে এমন দুটি হাদিস আছে যেগুলোর ওপর কোনো ফকিহের আমল নেই। একটি হলো, হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদিস,

قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر (ترمذی ج۱، ص۴۷ باب ما جاء فی الجمع بين الصلوتين)

'তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো শঙ্কা ও বৃষ্টি ব্যতীত মদিনা মুনাওয়ারায় জোহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশার নামাজ একত্রে আদায় করেছেন।'

সনদগতভাবে অথচ এই হাদিসটি প্রমাণযোগ্য। দ্বিতীয় হাদিসটি বর্ণিত হজরত আমির মু'আবিয়া (রা.) থেকে,

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فى الرابعة فاقتلوه (ترمذی ص۲۰۹، ج۱، ابواب الحدود باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فى الرابعة فاقتلوه.

'তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে মদ পান করবে তাকে বেত্রাঘাত করো। যদি চতুর্থবার পুনরায় পান করে তবে তাকে হত্যা করো।'

(অথচ এ হাদিসটিও প্রমাণযোগ্য।) এই দুটো হাদিসের বাহ্যিক ইজমায়ে উম্মত অনুযায়ী অর্থ পরিত্যাগ করা হয়েছে। কারণ, অন্যান্য শক্তিশালী অনেক প্রমাণ এর পরিপন্থী বিদ্যমান। কিন্তু এই হাদিসগুলোর তরককারিকে সুন্নত তরককারি হিসেবে সাব্যস্ত করা যায় না।

এমন করে ইমাম তিরমিযী (র.) ابواب النكاح باب ما جاء فى الزوجين المشركين يسلم احدهما তে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদিস বর্ণনা করেছেন,

رد النبى صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابى العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا.

'রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কন্যা জায়নাব (রা.)-কে আবুল আস ইবনুর্ রবি'র নিকট ছয় বছর পর প্রথম বিয়ের ভিত্তিতে ফিরিয়ে দিয়েছেন। বিয়ে নবায়ন করেননি।'

এই হাদিসের স্পষ্ট দাবি, পৌত্তলিক স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণের ছয় বছর পরও যদি তার পুরনো স্বামী মুসলমান হয়, তাহলে নতুন বিয়ের প্রয়োজন নেই। অথচ এর ওপর কোনো ফকিহের আমল নেই। এজন্য ইমাম তিরমিযী (র.) এ হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন,

هذا حديث ليس باسناده بأس ولكن لا نعرف وجه الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن الحصين من قبل حفظه .

'এ হাদিসটির সনদে কোনো অসুবিধা নেই; কিন্তু এ হাদিসটির ব্যাখ্যা জানি না। হতে পারে দাউদ ইবনে হোসাইন এর পক্ষ থেকে এটি এসে গেছে তার স্মরণশক্তির (দুর্বলতার) কারণে।'

ইমাম তিরমিযী (র.) এখানে একটি সহিহ হাদিসে রাবির ভুলে সম্ভাবনাকে অন্য প্রমাণাদির কারণে প্রধান সাব্যস্ত করেছেন।

এর বিপরীত দুর্বল হাদিসের ওপর অনেক সময় অন্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে আমল করা হয়। তাই এ অধ্যায়ে ইমাম তিরমিযী (র.) আমর ইবনে শো'আইবের হাদিস বর্ণনা করেছেন,

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابى العاص بن الربيع جديد ونكاح جديد .

'আমর ইবনে শো'আইব তার পিতা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কন্যা জায়নাবকে (রা.) আবুল আস ইবনুর রাবি'র নিকট ফিরিয়ে দেন নতুন মোহর ও নতুন বিয়ের মাধ্যমে।'

ইমাম তিরমিযী (র.) এ হাদিসটি সম্পর্কে লিখেছেন,

هذا حديث فى اسناده مقال والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم الخ (ثم قال) وهو قول مالك بن انس والاوزاعى والشافعى واحمد واسحاق .

এই হাদিসটির সনদে কালাম রয়েছে। ওলামায়ে কেরামের নিকট এ হাদিসটির ওপর আমল চলে। অতঃপর তিনি বলেন, এটাই হলো, মালেক ইবনে আনাস, আওজায়ি, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর বক্তব্য।'

এসব ইমাম সম্পর্কে তাহলে কি বলা যায় যে, তাঁরা ছিলেন দুর্বল হাদিসের ওপর আমলকারি? স্পষ্ট বিষয় হলো, তাঁরা এ হাদিসটি এজন্য অবলম্বন করেছেন যে, অন্য প্রমাণাদির কারণে এর সহায়তা হচ্ছিলো। অতএব, যদি ইমাম আবু হানিফা (র.) কোনো স্থানে কোনো দুর্বল হাদিসকে অন্য প্রমাণাদির[১] কারণে অবলম্বন করেন তাহলে তিনি একা নিন্দনীয় হবে না কেনো? মাওলানা জাফর আহমদ উসমানি (র.)-এর গ্রন্থ 'ইনহাউস্ সাকানে' এই আলোচ্য বিষয়টি সবিস্তারে দেখা যেতে পারে।

সপ্তম উসুল

কোনো দুর্বল হাদিস যদি তা'আমুল দ্বারা সহযোগিতাপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ, সাহাবি ও তাবেয়িনের আমল এর মুতাবিক সাব্যস্ত হয় তবে সেটি দুর্বলতা সত্ত্বেও গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। (এ বিষয়ে 'আহকামুল কোরআনে' ইমাম জাস্‌সাস, তাছাড়া আরো অনেক মুহাদ্দিস ও উসুলি সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন।) যেমন– طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان (বাঁদির তালাক দুটি এবং তার ইদ্দত দুই মাসিক) হাদিসটি জয়িফ। কিন্তু তা'আমুলের কারণে এটি প্রমাণযোগ্য। তাই এর অধীনে ইমাম তিরমিযী (র.) লিখেন,

حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا الا من حديث مظاهر بن اسلم ومظاهر لا يعرف له فى العلم غير هذا الحديث . والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم (ترمذى جلد اول ابواب الطلاق باب ما جاء ان طلاق الامة تطليقتان)

টীকা. ১. সপ্তম মূলনীতিতে এসব প্রমাণাদির বিস্তারিত আসছে।

হজরত আয়েশা (রা.)-এর হাদিসটি গরিব। মারফূ হিসেবে মুজাহির ইবনে আসলামের হাদিস ছাড়া আর কোনোটি জানি না। আর মুজাহির এ হাদিস ছাড়া এলেমের ক্ষেত্রে পরিজ্ঞাত নন। এ হাদিসটির ওপর আমল চলে রাসূল ﷺ-এর সাহাবী প্রমুখ উলামায়ে কেরামের মতে।'

এমন করে لا وصية لوارث[১] (উত্তরাধিকারির জন্য ওসিয়্যত নেই।) এবং القاتل لا يرث[২] (ঘাতক উত্তরাধিকারি হবে না) হাদিস দুটির সনদ জয়িফ। কিন্তু প্রমাণযোগ্য মনে করা হয়েছে (উম্মত) এ দুটোকে গ্রহণ করার কারণে।

এমন করে هو الطهور مائه والحل ميتته[৪] 'সমুদ্রের পানি পবিত্র। এর মৃত জন্তু হালাল বা পাক।' হাদিসটিকে বহু মুহাদ্দিস দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন; কিন্তু উম্মত গ্রহণ করার কারণে এটাকে প্রমাণযোগ্য মনে করা হয়েছে। এই মূলনীতি অনুযায়ী ইমাম আবু হানিফা এবং অন্যান্য হানাফিগণ কোনো কোনো সময় এমন দুর্বল হাদিস অবলম্বন করেন, যেগুলো তা'আমুল দ্বারা সহযোগিতাপ্রাপ্ত। দুর্বল হাদিস যদি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়, তাহলে এটাকে প্রমাণযোগ্য মনে করা হয় حسن لغيره বলে।

অষ্টম উসুল

দুটি প্রমাণযোগ্য হাদিসের মধ্যে পরস্পর যদি বিরোধী হয়ে যায়, তাহলে ফুকাহা ও মুহাদ্দিসিনের একটি দল, সাধারণভাবে প্রাধান্যের কারণ সাব্যস্ত করেন সনদের শক্তিকে এবং কোনো বিষয়ে বিশুদ্ধতম হাদিসকে গ্রহণ করেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মাযহাব এমন ক্ষেত্রে এই হয় যে, তিনি সে হাদিসটিকে প্রাধান্য দেন যেটি কোরআনে কারিম কিংবা শরি'য়াতের মৌলিক বিষয় অনুযায়ী হয়। চাই সনদের শক্তির দিক দিয়ে প্রধান হোক বা না হোক।

এসব মূলনীতি যদি মনে থাকে তাহলে এমন বহু প্রশ্নের জবাব জানা যেতে পারে, হানাফিদের বিরুদ্ধে যেগুলো সাধারণত উত্থাপন করা হয়।

আসহাবুল হাদিস ও আসহাবুর রায়

মুতাকাদ্দিমিনের যুগ হতে তাদের এক শ্রেণীকে 'আসহাবুল হাদিস' অপর শ্রেণীকে 'আসহাবুর রায়' বলা ওলামায়ে কেরামের জন্য দুটি আলাদা দলের এই পরিভাষা প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। কোনো শত্রু এই ইখতিলাফকে এমন প্রচার ও প্রসিদ্ধ করেছে যেনো 'আসহাবুল হাদিস' তাঁরা যাঁরা শুধু হাদিসের অনুসরণ করেন এবং কিয়াস ও রায়কে প্রমাণ মানেন না, আর 'আসহাবুর রায়' তাঁরা যাঁরা শুধু কিয়াস ও রায়ের অনুসরণ করেন– এর বিপরীতে হাদিস বর্জন করেন। এ মতটিকে বর্তমান যুগের কোনো কোনো প্রাচ্যবিদও প্রসিদ্ধ করেছেন। অথচ এ বিষয়টি সম্পূর্ণ বাস্তবতা পরিপন্থী। এই দুটি শ্রেণী মৌলিকভাবে বড় কোনো মতবিরোধ রাখেন না। না 'আসহাবুল হাদিস' কিয়াস অস্বীকারকারি, আর না 'আসহাবুর রায়' হাদিসের গুরুত্বকে প্রত্যাখ্যানকারি; বরং এ ব্যাপারে উভয়েই একমত যে, কেয়াসের ওপর নস অগ্রাধিকারী, আর যেখানে নস থাকবে না সেখানে কাজে লাগানো যেতে পারে কিয়াসকে।

০ এখানে প্রশ্ন করা হয়, যদি এ দুটি দলে কোনো মতবিরোধই না থাকে তাহলে এ দুটি পরিভাষা আলাদা আলাদা কেন? এর জবাব হলো, প্রথম যুগে এ দুটি পরিভাষার প্রকৃত অর্থ শুধু এই ছিলো যে, হাদিস নিয়ে গবেষণারত মনীষীদেরকে বলা হতো 'আসহাবুল হাদিস', আর ফিক্হ নিয়ে গবেষণারতদের বলা হতো 'আসহাবুর রায়'। এরা দুটি দল বা দুটি গবেষণা কেন্দ্রের লোক নন; বরং এ হলো উলুমে দীনের দু'টি আলাদা আলাদা শাখার নাম। মুহাদ্দিসিনকে 'আসহাবুল হাদিস' বলা হতো এজন্য যে, তাঁরা হাদিস মুখস্থ ও বর্ণনা করার কাজটিকে

টীকা- ১. তিরমিযী : ২/৪২, ابواب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث في حديث ابي امامة الباهلي (رض)

টীকা- ২. তিরমিযী : ২/৪০, ابواب الفرائض، باب ما جاء في ابطال ميراث القاتل عن ابي هريرة (رض) مرفوعا

টীকা- ৩. তিরমিযী : ১/২৯. ابواب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر انه طهور في حديث ابي هريرة (رض)

তাদের ওড়না বিছানা বানিয়ে নিয়েছেন (ওতপ্রোতভাবে জড়িত)। আর তাঁদের পুরো শক্তি ব্যবহার করতেন এ কাজে। হাদিসগুলো থেকে বিধিবিধান উৎসারণ করার প্রতি তাদের মনোযোগ কম ছিলো। আর 'আসহাবুর রায়' এজন্য বলা হতো যে, তাঁরা আহকাম উৎসারণের বিষয়টিকে নিজেদের শোগল বানিয়ে নিয়েছিলেন এবং তাদের মনোযোগ হাদিসের কিতাব লেখা এবং হাদিস প্রচার-প্রসারের দিকে হওয়ার পরিবর্তে এসব হাদিস থেকে উৎসারিত বিধিবিধান প্রচার-প্রসারের প্রতি ছিলো বেশি। আহকাম উৎসারণে তাঁরা যেহেতু কেয়াস দ্বারা প্রচুর পরিমাণ কাজ নিতেন, তাই তাঁদেরকে 'আসহাবুর রায়' বলা আরম্ভ হলো। মোটকথা, এ হলো এলমের দুটি আলাদা আলাদা শাখা, যেগুলোতে মূলত কোনো সংঘর্ষ ও বিরোধ নেই।

এ কথাটি প্রচার করা হয় যে, 'আসহাবুর রায়' ছিলো শুধু হানাফি এবং কুফাবাসীদের উপাধি। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হলো, এই উপাধিটি সমস্ত ফুকাহায়ে কেরামের জন্য ব্যবহার করা হতো। এজন্য ইবনে কুতায়বা (র.) নিজ গ্রন্থ আল-মা'আরিফে সমস্ত ফুকাহায়ে কেরামের আলোচনা করেছেন 'আসহাবুর রায়' শিরোনামে। তাতে তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ি, ইমাম আওজায়ি এবং সুফিয়ান সাওরির ন্যায় মুহাদ্দিসিনকেও। এমন করে আল্লামা মুহাম্মদ ইবনুল হারেস আল-খুশানি (র.) নিজ গ্রন্থ قضاة القرطبة তে মালেকি ওলামায়ে কেরামের আলোচনা করেছেন 'আসহাবুর রায়' নামের দ্বারা। এমনিভাবে হাফেজ আবুল ওয়ালিদ আল-ফারজি আল-মালেকি স্বীয় গ্রন্থ تاريخ علماء الاندلس এ মালেকি ফুকাহায়ে কেরামের আলোচনা করতে গিয়ে তাদেরকে 'আসহাবুর রায়' বলেন। আল্লামা আবুল ওয়ালিদ বাজি মালেকি মুয়াত্তার ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'মুনতাকা'য় সমস্ত ফুকাহায়ে কেরামের জন্য 'আসহাবুর রায়' শব্দটি ব্যবহার করেন। হাফেজ ইবনে আব্দুল বার (র.) ও মালেকি ওলামায়ে কেরামের জন্য এই শব্দটি প্রচুর ব্যবহার করেছেন। এমনকি তিনি মুয়াত্তার যে ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন তার নাম হলো, الاستذكار لمذاهب الامصار فى ما تضمنه الموطأ من معانى الرائ والاثار। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, 'আসহাবুর রায়' উপাধি ব্যবহার হতো সমস্ত ফুকাহার জন্য। অবশ্য এটা ঠিক যে, পরবর্তীতে ধীরে ধীরে এই শব্দটি ইরাক ও কুফাবাসীর জন্য ব্যবহার হতে আরম্ভ হয়। এরপর বিশেষিত হতে থাকে ইমাম আবু হানিফা (র.) এবং তাঁর অনুসারীদের জন্য। এর কারণ এটা ছিলো না যে, তাঁরা কেয়াস ও রায়কে নসের ওপর অগ্রাধিকার দিতেন; বরং এর কারণ ছিলো অন্যান্য আলেমের তুলনায় কুফাবাসী বিশেষত ইমাম আবু হানিফা (র.) এবং তাঁর অনুসারীরা আহকাম উৎসারণের বিষয়টিকে খুব বেশি এবং নিজেদের বিশেষ শোগল বানিয়ে নিয়েছিলেন। অন্যান্যের ব্যাপার তো ছিলো দৈনন্দিনের যেসব বিষয়াবলি সামনে আসতো তাঁরা শুধু সেগুলোকে কোরআন ও হাদিস থেকে উৎসারণ করতেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (র.) শুধু দৈনন্দিনের বিষয়াবলির ওপর ক্ষান্ত হতেন না; বরং কোনো মাসআলার যতোগুলো পদ্ধতি যৌক্তিকভাবে সম্ভব ছিলো সেগুলোর আহকাম লিপিবদ্ধ করেছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, এ কাজের জন্য কেয়াসের ব্যবহার হয়েছিলো ব্যাপক আকারে। এজন্য তাদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপাধি দেয়া হয় 'আসহাবুর রায়' এবং হানাফিদের ক্ষেত্রে এটা কোনো দূষণীয় বিষয় ছিলো না; বরং তাঁদের জন্য এটি একটি গর্বের বিষয় ছিলো যে, তাঁরা এটাকে সংকলন করেছেন প্রথমবার।

'আসহাবুর রায়' শব্দটি বেশির ভাগ যেহেতু হানাফিদের ক্ষেত্রে বলা হতো তাই হানাফিদের কোনো কোনো শত্রু এই অপপ্রচারের সুযোগ পেয়ে যায় যে, এঁরা রায়কে নসের ওপর প্রাধান্য দেন। এই প্রোপাগাণ্ডা থেকে কোনো কোনো মুখলিস আলেমও প্রভাবিত হন এবং তাদের অন্তরেও এই ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় যে, হানাফিদের 'আসহাবুর রায়' হওয়ার অর্থ হলো, তাঁরা রায়কে নসের ওপর অগ্রাধিকারী মনে করেন। তাই অনেক আলেম থেকে হানাফিদের বিরুদ্ধে কঠোর বাক্য বর্ণিত আছে। অন্যথায় বাস্তবতা ছিলো শুধু এতোটুকু, যতোটুকু ওপরে বর্ণিত হয়েছে। কারণ, হানাফিগণতো শুধু মারফু হাদিসগুলোকেই নয়; বরং সাহাবি ও তাবেয়িনের আছরকেও স্বীয় কিয়াসের ওপর অগ্রাধিকারী সাব্যস্ত করতেন। এর বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে আসবে। এজন্য

অগণিত বিরোধী মনীষীও এই উপাধিটি কোনো ত্রুটি সাব্যস্ত করা বা নিন্দার জন্য ব্যবহার করতেন না। আর যেসব আলেম এর বাস্তবতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন তাঁরা হানাফিদের বিরুদ্ধে এ বিষয়টির পরিপূর্ণ খণ্ডন করেছেন। এজন্য শাফেয়ি মাজহাবপন্থী আল্লামা ইবনে হাজার মক্কিও নিজ গ্রন্থ الخيرات الحسان فى مناقب ابى حنيفة النعمان এ স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যে, হানাফিদেরকে যারা 'আসহাবুর রায়' সাব্যস্ত করেছেন তাদের উদ্দেশে তাদের দোষ বর্ণনা করা ছিলো না; বরং এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য ছিলো যে, তারা আহকাম উৎসারণের প্রতি ছিলেন বিশেষ মনোযোগী।

সুতরাং এর এই ফল বের করা মারাত্মক অজ্ঞতা যে, ইমাম আজম (র.) নসের ওপর কিয়াসকে প্রাধান্য দিতেন। অথবা তিনি ও তাঁর শিষ্য সাথিগণ এলমে হাদিসে জয়িফ ছিলেন। কিংবা তাঁদের নিকট হাদিসের বিবরণ ছিলো খুবই সামান্য। বাস্তবতা হলো, স্বয়ং ইমাম আজম (র.) একজন সুমহান মুহাদ্দিস ছিলেন। এলমে হাদিসে তার স্তর বড় বড় মুহাদ্দিসিন থেকে অনেক উঁচু পর্যায়ে। কিন্তু যেহেতু তিনি নিজের ব্যস্ততা হাদিস বর্ণনাকে বানিয়ে নেননি, এজন্য হাদিসের প্রসিদ্ধ কিতাবগুলোতে তার হাদিস কম। হাদিসের ক্ষেত্রে অন্যথায় তার দক্ষতা-পারদর্শিতা একটি সর্বজন স্বীকৃত বিষয়। আর এটা অনুমান করার জন্য সমীচীন হবে যে, সর্বপ্রথম ইমাম সাহেবের নিবাস কুফার এলমি অবস্থা সম্পর্কে একটু নজর দেওয়া।

কুফানগর ও এলমে হাদিস

সাহাবি ও তাবেয়িন যুগে কুফা ছিলো হাদিস ও ফিক্হ শাস্ত্রের সবচেয়ে বড় মারকাজ। এই শহরটি আবাদ করেছিলেন হজরত উমর (রা.)। যেহেতু এটি নওমুসলিম লোকজনের আবাস ছিলো, তাই তিনি এতে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন তা'লিম-তরবিয়ত তথা শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি। এখানে তিনি সাহাবায়ে কেরামের বিরাট একটি অংশকে পুনর্বাসিত করেছিলেন। এমনকি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকিহ সাহাবি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে সেখানে শিক্ষক বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। কুফাবাসীদেরকে তিনি বলেছিলেন, اثرتكم بعبد الله على نفسى। 'আমি আবদুল্লাহকে দিয়ে আমার ওপর তোমাদের জন্য প্রাধান্য দিলাম।

হজরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা.)-এর এ বাণী হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সম্পর্কে প্রসিদ্ধ,

ما كان رجل اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا ودلا وسمتا من عبد الله بن مسعود (رض).

'আখলাক-সিরাত ও উত্তম আচার-আচরণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এত সামঞ্জস্যপূর্ণ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) অপেক্ষা আর কেউ ছিলেন না।'

হজরত উমর (রা.) হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সম্পর্কে বলেছিলেন, كيف ملئ علما 'এলমে টইটম্বুর ব্যক্তিত্ব'। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এজন্য শেষ জীবন পর্যন্ত কুফায় অবস্থান করেন এবং এই শহরটিকে এলমে হাদিস ও এলমে ফিক্হ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন এবং অত্যন্ত জোরালোভাবে নবুওয়াতের জ্যোতির প্রচার-প্রসার করেছিলেন। এখানে নিজ শিষ্যদের বিরাট একটি দল তৈরি করেন, যাঁরা দিবা-রাত্রি এলেম অর্জন ও শিক্ষদানে রত থাকতেন। তাঁর এমন শিষ্যের সংখ্যা ৭৪ বলে বর্ণনা করা হয়। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর শিক্ষা-দীক্ষায় যেসব আলেম তৈরি হয়েছিলেন তাদের সংখ্যা 'নসবুর রায়া'র ভূমিকায় আল্লামা জাহেদ আল-কাওছারি (র.) চার হাজার উল্লেখ করেছেন। অতঃপর হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ছাড়াও আরো কিছু ফকিহ সাহাবি সেখানে এসে অবস্থান নিয়েছেন। তন্মধ্যে হজরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, হজরত আবু মুসা আশআরি, হজরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান, হজরত সালমান ফারেসি, হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসির, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনুল হারেস ইবনুল জাজ (রা.) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও আরো শত শত সাহাবি এসে কুফার অধিবাসী হন। এমনকি কুফার অধিবাসী সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা ইমাম আজালি (র.) ১৫০০ বলেছেন। এই সংখ্যায় সেসব সাহাবি অন্তর্ভুক্ত নন, যাঁরা সাময়িকভাবে কুফায় এসে তারপর অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হয়ে যান। স্পষ্ট বিষয় যে, সাহাবিদের এই বিরাট সংখ্যার বর্তমানে এই শহরে জ্ঞান-গরিমার কতই না চর্চা হয়ে থাকবে! হজরত আলি (রা.) যখন কুফাকে নিজের রাজধানী বানিয়ে নেন তখন সেখানকার জ্ঞান-গরিমার চর্চা দেখে খুবই আনন্দিত হন এবং বলেন, رحم الله ابن ام عبد قد ملأ هذه القرية علما 'আল্লাহ তা'আলা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের প্রতি রহম করুন, তিনি এই জনপদকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এলেম দ্বারা।'

আরও বলেছেন– اصحاب ابن مسعود سرج هذه الامة 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের শিষ্যগণ এই উম্মতের সূর্য।'

হজরত আলি (রা.)-এর আগমনের পর কুফার এলমি উন্নয়ন এবং প্রসিদ্ধি আরো বৃদ্ধি পায়। কেননা, তিনি স্বয়ং ছিলেন মহান সাহাবায়ে কেরামের একজন। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সাহাবায়ে কেরামের মাঝে এলেম ও ফিকহের দিক দিয়ে সীমাহীন প্রসিদ্ধ ছিলেন। যার অনুমান এর দ্বারা করা যায় যে, হজরত মু'আজ ইবনে জাবাল (রা.)-এর ন্যায় ফকিহ সাহাবি স্বীয় হজরত আমর ইবনে মায়মুন (র.)কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তুমি গিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর নিকট এলমে অর্জন কর। হজরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর সাথে হজরত আলি (রা.) যখন মিলে গেলেন তখন এর ফলে কুফার এলমি মর্যাদা অন্যান্য শহর থেকে অনেক ওপরে উঠে যায়। হজরত মাসরূক ইবনে আজদা (র) তাই বলেন,

درت فى الصحابة فوجدت علمهم ينتهى الى ستة ثم نظرت فوجدت علمهم ينتهى الى اثنين على و عبد الله (رض) ـ

'সাহাবিদের মাঝে আমি ঘুরেছি। দেখলাম তাদের এলেম সমাপ্ত হয়েছে ছয়জনের মধ্যে, তারপর দেখলাম এই ছয়জনের এলেম সমাপ্ত হয়েছে আলি ও আব্দুল্লাহ (রা.) এ দুজনের মধ্যে।'

হজরত মাসরূকের এই বক্তব্য অনুযায়ী হজরত আলি এবং হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সাহাবায়ে কেরামের উলুমের সমন্বয়কারি। আর তাঁরা দু'জন ছিলেন কুফায়। বলা যেতে পারে, কুফাতে জমা হয়েছিলো উলুমে সাহাবার সারনির্যাস।

কুফাতে এলমে হাদিসের বাজার গরম হওয়ার ফল ছিলো এই যে, সেখানে প্রতিটি ঘরে এলমে হাদিসের চর্চা হতো। সেখানকার প্রতিটি মহল্লায় তৈরি হয়েছিলো এলমে হাদিসের দরসগাহ। এজন্য আল্লামা আবু মুহাম্মদ রামাহুরমুজি (র.) المحدث الفاضل নামক গ্রন্থে হজরত আনাস ইবনে সিরিন (র.)-এর বক্তব্য বর্ণনা করেছেন,

اتيت الكوفة فوجدت بها اربعة الاف يطلبون الحديث واربع مائة قد فقهوا ـ

'আমি কুফায় এসে সেখানে পেলাম চার হাজার মনীষী তাঁরা হাদিস অন্বেষণ করছেন। আর চারশত পেলাম তাঁরা ফকিহ হয়ে গেছেন।'

তাছাড়া "طبقات الشافية الكبرى" তে আল্লামা তাজুদ্দিন সুবকি (র.) হাফেজ আবু বকর ইবনে দাউদের বক্তব্য বর্ণনা করেছেন, 'আমি যখন কুফা পৌছি, তখন আমার কাছে ছিলো একটি দিরহাম। এটি দিয়ে আমি ত্রিশ মুদ লুবিয়া (তরকারি বিশেষ) ক্রয় করলাম। প্রতিদিন আমি এক মুদ লুবিয়া খেতাম এবং হজরত আশাজ্জ-এর কাছ থেকে এক হাজার হাদিস লিখতাম। এমনকি এক মাসে ত্রিশ হাজার হাদিসের একটি সংকলন তৈরি হয়। আন্দাজ করুন, যে শহরে এক মাসে শুধু একজন উস্তাদের নিকট ত্রিশ হাজার হাদিস লেখা হয়, সেখানে এলমের প্রাচুর্য কিরূপ হবে! এ কারণেই যদি শুধু এক ইমাম বোখারি (র)-এর রাবিদের দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়, তখন তাদের মধ্যে তিনশ পাওয়া যায় শুধু কুফার। তাই বারবার ইমাম বোখারি (র.) কূফা নগরিতে গিয়েছেন।

ইমাম আ'জম (র.) ও ইলমে হাদিস

এই কুফা শহরেই ইমাম আ'জম আবু হানিফা (র.) জন্মগ্রহণ করেছেন। যেটি তৎকালীন যুগে ছিলো এলমে হাদিস ও ফিক্হের মারকাজ। তিনি প্রতিপালিত হয়েছেন এখানেই। এখানকার উস্তাদদের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেছেন। যেহেতু সিহাহ সিত্তায় ইমাম আবু হানিফা (র)-এর কোনো হাদিস বর্ণিত হয়নি, সেহেতু কোনো কোনো সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন লোক মনে করেছেন, ইমাম আবু হানিফা (র.) এলমে হাদিসে দুর্বল ছিলেন। কিন্তু এটি চরম মূর্খতাসুলভ বক্তব্য এবং ভিত্তিহীন অপবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। বাস্তব ঘটনা হলো, সিহাহ সিত্তায় শুধু ইমাম আবু হানিফা (র.)-এরই নয়, বরং ইমাম শাফেয়ি (র.)-এরও কোনো হাদিস বর্ণিত হয়নি; বরং ইমাম আহমদ (র.) যিনি ইমাম বোখারি (র.)-এর বিশিষ্ট উস্তাদ, তাঁর হাদিসগুলো বোখারিতে শুধু তিন চারটি স্থানে এসেছে। আর ইমাম মালেক (র)-এর রেওয়ায়াতও এসেছে হাতে গণা কয়েকটি। এর কারণ এই নয় যে, নাউজুবিল্লাহ তাঁরা ইলমে হাদিসে দুর্বল ছিলেন; বরং এর কারণ এই যে, প্রথমতো তারা ছিলেন ফকিহ, তাই তাঁদের মূল ব্যস্ততা ছিলো আহকাম ও মাসায়িল বর্ণনা করা নিয়ে। দ্বিতীয়তো তাঁরা ছিলেন আয়িম্মায়ে মুজতাহিদিন। তাঁদের শত শত শিষ্য এবং অনুসারী ছিলো। অতএব, সিহাহ সিত্তা সংকলকগণ মনে করেছেন তাদের উলুম তাঁদের শিষ্যদের দ্বারা সংরক্ষিত থাকবে। এ কারণে তাঁরা সেসব মনীষীর উলুমের হিফাজত করেছেন যেগুলো আশঙ্কা ছিলো ধ্বংস হয়ে যাওয়ার। অন্যথায় ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মাহাত্ম্য একটি সর্বজন স্বীকৃত ও অনস্বীকার্য বিষয়। কেননা, সর্বসম্মতিক্রমে তিনি ইমাম মুজতাহিদ। আর মুজতাহিদের জন্য একটি আবশ্যকীয় শর্ত হলো, ইলমে হাদিস সম্পর্কে তার পুরো অন্তর্দৃষ্টি থাকতে হবে। যদি এদিক দিয়ে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মধ্যে কোনো দুর্বলতা থাকতো তবে তাঁকে উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যদি তাঁদের বক্তব্যগুলো বর্ণনা করা হয়, তবে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ তৈরি হতে পারে এবং ইমাম আবু হানিফা (র)-এর ফজিলত ও মানাকিবের কিতাবগুলোতে এ সমস্ত বক্তব্য দেখা যেতে পারে।

কয়েকটি বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন হজরত মক্কি ইবনে ইবরাহিম। তিনি ইমাম বোখারি (র.)-এর সুমহান উস্তাদ। ইমাম বোখারি (র.)-এর অধিকাংশ সুলাসি (তিন সূত্রবিশিষ্ট হাদিস) বর্ণিত যাঁর সূত্রে। তিনি ইমাম আবু হানিফা (র)-এর ছাত্র। 'তাহজিবুত্ তাহজিবে' তাঁর এই বক্তব্য ইমাম আবু হানিফা (র) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, كان اعلم اهل زمانه[১] 'সমকালীনদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বড় আলেম।

মনে রাখতে হবে যে, তৎকালীন যুগে এলমের প্রয়োগ হতো হাদিস শাস্ত্রের ওপরই। সুতরাং এই বক্তব্যর অর্থ হলো, ইমাম আবু হানিফা (র.) ছিলেন তাঁর যুগে এলমে হাদিসের সবচেয়ে বড় আলেম।

দ্বিতীয় বক্তব্য প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হজরত ইয়াজিদ ইবনে হারুনের। তিনি বলেন,

ادركت الفا من الشيوخ وكتبت منهم فما وجدت افقه ولا اورع ولا اعلم من خمسة اولهم ابو حنيفة - (ذكرهما الذهبى فى تذكرة الحفاظ)

টীকা- ১. মুয়াফফাক মক্কি তাঁর সূত্রে ইসমাইল ইবনে বিশর থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমরা একদিন মক্কির মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন– حدثنا ابو حنيفة তথা ইমাম আবু হানিফা (র.) আমাদের নিকট হাদিস বর্ণনা করেছেন। তখন এক মুসাফির ব্যক্তি চিৎকার করে বলে উঠলো– ইবনে জুরাইজ থেকে আমাদের নিকট হাদিস বর্ণনা করুন, আবু হানিফা থেকে আমাদের নিকট হাদিস বর্ণনা করবেন না। এতদশ্রবণে মক্কি বললেন, আমরা বেওকুফদের নিকট হাদিস বর্ণনা করবো না। আমি তোমার ওপর আমার কাছ থেকে হাদিস লেখা হারাম করে দিলাম। আমার মজলিস থেকে উঠে যাও। তারপর সে লোককে উঠিয়ে দেয়ার আগ পর্যন্ত সত্যিই তিনি হাদিস বর্ণনা করলেন না। অতঃপর তিনি বললেন, ...حدثنا ابوحنيفة এবং তা বর্ণনা করলেন। আর ইবরাহিম ইবনে আবু বকর আল-মুরাবিতির বর্ণনায় আছে, তখন মাক্কি মারাত্মক ক্রুদ্ধ হলেন এবং তা তার চেহারায় প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো। তখন সে লোকটি বললো, আমি তওবা করলাম, আমি ভুল করেছি। তার পরেও তিনি তাদের নিকট হাদিস বর্ণনা করতে সম্মত হলেন না। –মানাকিবুল ইমামিল আ'জম-মুয়াফ্ফাক : ১/২০৪

'আমি এক হাজার উস্তাদ পেয়েছি। তাঁদের কাছ থেকে (হাদিস) লিখেছি। কিন্তু পাঁচ হাজার অপেক্ষা বড় ফকিহ, বড় পরহেজগার, বড় আলেম কাউকে পাইনি। তাঁদের শীর্ষ ব্যক্তি হলেন আবু হানিফা (র.)।'

(জাহাবি, তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ)

তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ : ১/১৯৫ তে হাফেজ জাহাবি (র.) নিজ সনদে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন,

لم يكن في زمان ابى حنيفة بالكوفة رجل افضل منه واورع ولا افقه عنه ـ

'ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর যুগে কুফায় তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও বড় পরহেজগার, বড় ফকিহ আর কেউ ছিলেন না।'

হাফেজ জাহাবি (র.) ১৬০ পৃষ্ঠায় ইমাম আবু দাউদ (র)-এর বক্তব্য বর্ণনা করেছেন– ان ابا حنيفة كان اماما তথা ইমাম আবু হানিফা (র) ছিলেন ইমাম।

ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর এলেমের আন্দাজ করা যায় তাঁর উস্তাদ ও ছাত্রদের ওপর এক নজর দেয়ার মাধ্যমে। হাফেজ আবুল হাজ্জাজ মিজ্জি (র.) 'তাহজিবুল কালাম' গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর ৭৪ জন উস্তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। হাফেজ সুয়ুতি (র.) 'তাবয়িজুস্ সহিফা লি মানাবিকি আবি হানিফা' নামক গ্রন্থে সেসব উস্তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। ওলামায়ে কেরাম জানেন, হাফেজ মিজ্জি (র.) কোনো হাদিস বর্ণনাকারির সমস্ত উস্তাদের নাম পরিপূর্ণরূপে উল্লেখ করেন না; বরং শুধু উদাহরণস্বরূপ কয়েক জনের নাম উল্লেখ করেন। এ কারণেই মোল্লা আলি কারি (র.) 'মুসনাদে আবু হানিফা'র ব্যাখ্যা গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর উস্তাদের সংখ্যা ৪০০০ উল্লেখ করেছেন। আবার এসব উস্তাদও সে শ্রেনির যে পর্যায়ের উস্তাদ পরবর্তী প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসিনের মধ্য থেকে কারো অর্জিত হয়নি। কারণ ইমাম সাহেবের উস্তাদগণের মধ্যে হয়তো সাহাবি অথবা তাবেয়িন অথবা তাবে তাবেয়িন, এর নিচের কোনো উস্তাদ নেই।

ইমাম আ'জম (র.) ছিলেন তাবেয়ি

যে সাহাবিদের সংসর্গ ইমাম সাহেব (র.) পেয়েছেন এবং তিনি যে একজন তাবেয়ি– এটি একটি স্বীকৃত ও অনস্বীকার্য সত্য। হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর জন্ম হয়েছে ৮০ হিজরিতে। তখন কুফাতে হজরত আব্দুল্লাহ ইবন আবু আওফা (র.) বিদ্যমান ছিলেন। এটা অসম্ভব যে, ইমাম আবু হানিফা (র.) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবেন না। তাছাড়া 'তাবাকাতে' ইমাম ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবু হানিফা (র.) হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। আল্লামা সুয়ুতি (র.) تبييض الصحيفة لمناقب ابى حنيفة নামক গ্রন্থে একাধিক রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। যা থেকে বোঝা যায়, ইমাম আবু হানিফা (র.) হাদিস শুনেছে, হজরত আনাস (রা.), হজরত আব্দুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা.) হজরত আব্দুল্লাহ ইবনুল হারেস ইবনুল জায্ (রা.), হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা.), হজরত ওয়াছিলা ইবনে আসকা (রা.) এবং হজরত আয়েশা বিনতে আজরাদ (রা.) থেকে। এ বিষয়ে হাফেজ আবু মা'শার আব্দুল কারিম ইবনে আব্দুস্ সামাদ আত্-তাবারি একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করেছেন। এতে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর সেসব হাদিস সংকলন করেছেন, যেগুলো তিনি প্রত্যক্ষভাবে সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুনেছেন। এই গ্রন্থে অন্যান্য সাহাবি ছাড়া হজরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হজরত মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রা.) থেকেও ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর শ্রবণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার (র.) যদিও লিখেছেন যে, এসব বর্ণনার সনদ দুর্বল। কিন্তু এগুলো নিশ্চিতরূপে বাতিল হওয়ার সিদ্ধান্ত কেউ দেননি। যদি ফাজায়িল ও মানাকিবের ক্ষেত্রে দুর্বল বর্ণনা গ্রহণ করা যায়, তাহলে এসব বর্ণনা দ্বারা ইমাম সাহেব (র.)-এর এলমি শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ না পাওয়ার কোনো কারণ নেই। তাছাড়া 'তাবয়িজু সহিফা' নামক গ্রন্থে আল্লামা সুয়ুতি (র.) একটি হাদিস হাফেজ আবু মা'শার সূত্রে বর্ণনা করেছেন,

ابو حنيفة عن انس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم -

'আবু হানিফা (র.) আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলে আকরাম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, এলেম অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ।'

আল্লামা সুয়ুতি (র.) এই বর্ণনা সম্পর্কে বলেন, এটি সহিহের সমপর্যায়ের। হাফেজ মিজ্জি (র.)-এর মত হলো, এই হাদিসটি একাধিক সূত্রের কারণে হাসানের পর্যায়ভুক্ত। যদি এটা ঠিক হয়, তাহলে এতে সন্দেহ থাকে না যে, ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর শ্রবণ সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত। আর যদি মনে নেই, শ্রবণ সাব্যস্ত নয়, তাহলে সাক্ষাৎ প্রমাণ সুনিশ্চিত। এজন্য তিনি যে তাবেয়ি এ বিষয়টি তত্ত্বজ্ঞানীদের নিকট স্বীকৃত। এ কারণেই ইমাম আবু হানিফা (র.) যে তাবেয়ি– এ বিষয়ে সুস্পষ্ট স্বীকৃতি দিয়েছেন ইমাম ইবনে সা'দ (র.) 'তাবাকাতে', হাফেজ জাহাবি (র.) 'তাজকিরাতুল হুফ্‌ফাজে', হাফেজ ইবনে হাজার (র.) আল্লামা সুয়ুতি (র.)-এর বক্তব্য অনুসারে একটি প্রশ্নের উত্তরে হাফেজ মিজ্জি (র.) 'তাহজিবুল কামালে', আল্লামা কাসতাল্লানি (র.) শরহে বোখারিতে, আল্লামা নববি (র.) "تهذيب الاسماء واللغات" তে, আল্লামা সুয়ুতি (র.) "تبييض الصحيفة" তে।

ইমাম আ'জম আবু হানিফা (র.)-এর শীর্ষস্থানীয় উস্তাদদের পরিচয়

ইমাম সাহেব (র.)-এর বিশিষ্ট উস্তাদগণের মধ্যে যাদের তাবেয়িনের যুগে এলমে হাদিসের স্তম্ভ মনে করা হতো। কয়েকজনের নাম নিম্নেযুক্ত,

হজরত আমির ইবনে শারাহিল (শা'বি) (র.) থেকে ইমাম সাহেব (র.) ইলমে হাদিস অর্জন করেছেন। হাফেজ জাহাবি (র.) লিখেছেন, هو اكبر شيوخ ابى حنيفة অর্থাৎ, তিনি ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর সবচেয়ে বড় উস্তাদ। ইমাম শা'বি (র.) ৫০০ সাহাবি থেকে এলেম অর্জন করেছেন। তাঁর স্মরণশক্তির অবস্থা ছিলো এই যে, কখনও একটি হাদিসও লিখে মুখস্থ করেননি। তিনি বলতেন, কাব্যের সাথে আমার বেশি সম্পর্ক নেই। কিন্তু لو اردت لانشدت شهرا وما اعدت অর্থাৎ, আমি ইচ্ছে করলে এক মাস পর্যন্ত কাব্য আবৃত্তি করতে পারবো, সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি ছাড়া। একবার তিনি হজরত রাসূলে আকরাম ﷺ-এর যুদ্ধগুলোর বিবরণ দিচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। ইমাম শা'বি (র.)-এর কথা শুনে তিনি বললেন, রাসূলে আকরাম ﷺ এর সাথে আমি বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। কিন্তু যুদ্ধ সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশি জ্ঞান শা'বির রয়েছে।

খতিব বাগদাদি (র.) হজরত আলি ইবনুল মাদিনি (র.)-এর বক্তব্য বর্ণনা করেছেন যে, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উলুম সমাপ্ত হয়েছে আলকামা, আসওয়াদ, হারেস, আমর এবং উবায়দা ইবনে কায়সের ওপর। তাঁদের সবার বিদ্যা দু'জনের মধ্যে একত্রিত হয়েছে। একজন ইবরাহিম নাখয়ি, অপরজন আমির শা'বি (র.)। তাঁরা দু'জনই ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর শিক্ষক।

ইমাম সাহেব (র)-এর দ্বিতীয় বিশিষ্ট উস্তাদ হলেন, হজরত হাম্মাদ ইবনে সোলায়মান (র.)। সর্বসম্মতিক্রমে যিনি হাদিস ও ফিকহের ইমাম হিসেবে স্বীকৃত। তাঁকে মনে করা হয় হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর উলুমের হাফেজ। সহিহ মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযীতে তাঁর অনেক রেওয়ায়াত বিদ্যমান আছে। তিনি হজরত আনাস (রা.), হজরত জায়দ ইবনে আওহাব, সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব, ইকরিমা, আবু ওয়াইল, ইবরাহিম নাখয়ি, এবং আব্দুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (র.)-এর উলুম অর্জন করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (র.) তাঁর সূত্রে দু'হাজার হাদিস বর্ণনা করতেন। তাঁর প্রতি এতোটা সম্মান প্রদর্শন করতেন যে, ইমাম আ'জম (র.) তাঁর বাড়ির দিকে কখনও পা প্রসারিত করে শুইতেন না।

ইমাম সাহেব (র.)-এর তৃতীয় বিশিষ্ট উস্তাদ হলেন, আবু ইসহাক সাবেয়ি (র.)। তিনি আটত্রিশ জন সাহাবি থেকে এলেম অর্জন করেছেন। আবু দাউদ তায়ালিসি (র.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী তিনি ছিলেন, اعلم الناس بحديث ابن مسعود وعلى (رض) অর্থাৎ, তিনি ছিলেন হজরত ইবনে মাসউদ (রা.) ও আলি (রা.)-এর হাদিস সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি পরিজ্ঞাত। তিনি সিহাহ সিত্তারও রাবি।

ইমাম আ'জম (র.)-এর উস্তাদগণের মধ্যে ইবরাহিম নাখয়ি (র.), কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (র.), কাতাদা (র.), নাফে (র.), তাউস ইবনে কায়সান (র.), ইকরামা (র.), আতা ইবনে আবু রাবাহ (র.), আমর ইবনে দিনার (র.), আব্দুল্লাহ ইবনে দিনার (র.), হাসান বসরি (র.), ইমাম শায়বান সুলায়মান আল-আ'মাশ (র.)-এর মতো মহান তাবেয়িন এবং উম্মতের স্তম্ভগুলো অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম সাহেব (র.)-এর ছাত্রদের পরিচয়

তাঁর শিষ্যগণের দিকে এলে তাদের তালিকায় হাদিসের বড় বড় ইমামগণের নাম পরিলক্ষিত হয়। তাঁর বিশিষ্ট শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.)। যার বক্তব্য রয়েছে–

لولا اعانني الله بابى حنيفة وسفيان لكنت كسائر الناس -

'আল্লাহ তা'আলা আমাকে যদি আবু হানিফা ও সুফিয়ানের মাধ্যমে সাহায্য না করতেন, তাহলে আমি থেকে যেতাম অন্য সাধারণ লোকদের মতোই।'

জারাহ ও তা'দিলের প্রখ্যাত ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ আল-কাত্তান (র.) ইমাম সাহেবের ছাত্র। হাফেজ জাহাবি (র.) প্রমুখ লিখেছেন, তিনি ফতওয়া দিতেন ইমাম সাহেব (র.)-এর বক্তব্যর ওপরই। 'তাহজিবে' হাফেজ ইবনে হাজার (র.) ইয়াহইয়া আল-কাত্তান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, قد اخذنا باكثر اقواله অর্থাৎ, তাঁর অধিকাংশ বক্তব্য আমরা গ্রহণ করেছি। ইয়াহইয়া ইবনে মাইন (র.) الجواهر المضية فى طبقات الحنيفة। নামক গ্রন্থে এবং মুয়াফ্‌ফাক (র.) مناقب الامام (১/১৯১) ইয়াহইয়া ইবনে মাইন (র.) থেকে ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ আল-কাত্তানের এই বক্তব্য বর্ণনা করেছেন,

جالسنا والله ابا حنيفة وسمعنا منه وكنت والله اذا نظرت اليه عرفت فى وجهه انه يتقى الله عزو جل -

'আল্লাহর কসম, আমরা আবু হানিফার মজলিসে বসেছি, তাঁর কথা শুনেছি। আল্লাহর কসম, যখন আমি তাঁর দিকে তাকাতাম, তখন তাঁর চেহারার দিকে তাকিয়ে আমি বুঝতে পারি যে, তিনি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করেন।' –তারিখে বাগদাদ : ১৩/৩৫২

ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর বিশিষ্ট উস্তাদ হজরত ওয়াকি ইবনুল জার্‌রাহও ইমাম সাহেবের ছাত্র। ইমাম সাহেব (র.) থেকে তিনি ৯০০ হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্দুল বার (র.) আল-ইনতিকাতে ইয়াহইয়া ইবনে মাইন (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনিও ফতওয়া দিতেন ইমাম সাহেব (র.)-এর বক্তব্যর ওপর। প্রকাশ থাকে যে, ইমাম সাহেব (র.)-এর বক্তব্যর ওপর ফতওয়া প্রদান সাধারণ মুকাল্লিদের মতো ছিলো না; বরং ছিলো মুজতাহিদ ফিল মাজহাবের মতো। যেমন, ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) কোনো কোনো মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর সাথে মতবিরোধ করতেন। অনুরূপভাবে তিনিও কোনো কোনো মাসআলায় মতবিরোধী করতেন। এজন্য হজে ইশআরের (হজের সময় কোরবানির উটের সামনের উত্থিত অংশের (চুটের) ডান পাশে জখম করা যাতে ডাকাতরা তা লুট না করে।) মাসআলায় অনুরূপ হয়েছে। ইনশাআল্লাহ কিতাবুল হজ্জে আসবে।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিসিনের মধ্যে মক্কি ইবনে ইবরাহিম, জায়দ ইবনে হারুন, হাফস ইবনে গিয়াস আন্ নাখয়ি, ইয়াহইয়া ইবনে জাকারিয়া ইবনে আবু জায়েদা, মিসআর ইবনে কুদাম, আবু আসেম আন্ নাবিল, কাসিম ইবনে মা'ন, আলি ইবনুল মুসহির, ফজল ইবনে দুকাইন, আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাম-এর মতো সুমহান মুহাদ্দিসিন ইমাম আবু হানিফা (র)-এর সামনে বিনয়ের সাথে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। যে মুহাদ্দিসের উস্তাদ এবং ছাত্রদের মধ্যে এই শ্রেনির মনীষীগণ বিদ্যমান তাঁর সম্পর্কে এই বক্তব্য যে, 'এলমে হাদিসে তাঁর স্তর উঁচু ছিলো না' এটা কতবড় অত্যাচার!

ইতিহাস ও সিরাত গ্রন্থাবলিতে বর্ণিত আছে, ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর হাদিস মুখস্থ সংক্রান্ত বিস্ময়কর বহু ঘটনা। উদাহরণস্বরূপ এখানে দুটি ঘটনা বর্ণনা করা হলো,

"مناقب الامام الاعظم" নামক গ্রন্থে মোল্লা আলি কারি (র.) বর্ণনা করেছেন যে, একবার তিনি ও ইমাম আ'মাশ (র.) এক মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। কেউ ইমাম আবু হানিফা (র.)কে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জবাব দিয়ে দিলেন। ইমাম আ'মাশ (র.) জবাব শুনে বললেন– من اين اخذت هذا এ বিষয়টি উৎসারণ করলেন কোত্থেকে ? ইমাম আবু হানিফা (র.) জবাবে বললেন,

انت حدثتنا عن ابى صالح عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وانت حدثتنا عن ابى اياس عن ابى مسعود الانصارى (رضـ) وانت حدثتنا عن ابى وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وانت حدثتنا عن ابى مجلز عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وانت حدثتنا عن ابى الزبير عن جابر (رضـ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ـ

'আমাকে আপনি আবু সালেহ কর্তৃক আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনটি বলেছেন। আপনি আমাকে আবু আয়াস থেকে আবু মাসউদ আনসারি (রা.) সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আপনি আমাকে আবু ওয়ায়েল হতে আব্দুল্লাহ সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন এরশাদ করেছেন। আপনি আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু মিজলাজ সূত্রে হুজাফা ইবনুল ইয়ামান হতে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন এরশাদ করেছেন। আপনি আমাকে আবু জুবায়র সূত্রে জাবির (রা.) হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূল (স.) এমনটি বলেছেন।

এটি শোনে ইমাম আ'মাশ (র.) বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বললেন,

حسبك ما حدثتك به فى مائة يوم حدثتنى به فى ساعة واحدة ـ

'ব্যাস, ব্যাস, যথেষ্ট, শত দিন বসে আমি আপনার নিকট যে হাদিস বর্ণনা করলাম, ক্ষণিকের মধ্যে আপনি তা আমার নিকট বর্ণনা করে দিয়েছেন।'

এরপর তিনি বললেন,

يا معشر الفقهاء! انتم الاطباء ونحن الصيادلة وانت ايها الرجل اخذت بكلا الطرفين ـ

'হে ফকিহ সম্প্রদায়! আপনারা ডাক্তার আর আমরা ঔষধ বিক্রেতা, আর হে মনীষী! আপনি গ্রহণ করেছেন উভয় দিক।'

ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর দ্বিতীয় ঘটনা। তিনি বলেন, যখন ইমাম আবু হানিফা (র.) কোনো শরয়ি মাসআলা বর্ণনা করতেন, তখন আমি কুফার সমস্ত মুহাদ্দিসিনের কাছে যেতাম এবং তাঁদের কাছ থেকে সেসব হাদিস সংকলন করে নিতাম, যেগুলো ইমাম আবু হানিফা (র)-এর বক্তব্যর সহায়ক এবং এই ধারণা নিয়ে ইমাম

আ'জম (র.)-কে শুনাতাম যে, তিনি শুনে খুশি হবেন। কিন্তু যখন আমি সেসব হাদিস শুনিয়ে অবসর হতাম তখন ইমাম সাহেব বলতেন– এগুলোর মধ্য হতে অমুক হাদিসে অমুক ভুল রয়েছে, অমুক হাদিসে অমুক রাবি দুর্বল এবং অমুক ত্রুটি পাওয়া যায় এবং সেটি প্রমাণযোগ্য নয়। তারপর ইমাম আ'জম আবু হানিফা (র.) বলতেন, انا عالم بعلم اهل الكوفة 'কুফাবাসীর এলেম সম্পর্কে আমি অবগত।'

কিতাবুল আছার (كتاب الاثار)

ইমাম আ'জম (র.) জ্ঞানগত নিদর্শনাবলির মধ্য থেকে তাঁর 'কিতাবুল আছার' এলমে হাদিসে তাঁর উচ্চ মর্যাদার প্রমাণ। এই কিতাবটি ফিকহি অধ্যায়ের ওপর বিন্যস্ত হাদিসের সর্বপ্রথম গ্রন্থ। এ জন্য "تبييض الصحيفة" নামক গ্রন্থে আল্লামা সুয়ুতী (র.) লিখেছেন যে, ইলমে হাদিসে ইমাম আ'জম আবু হানিফা (র.)-এর এই ফজিলত কম নয় যে, তিনি সর্বপ্রথম ফিক্‌হি অধ্যায়ের ওপর বিন্যস্ত গ্রন্থ সংকলন করেছেন। এই মর্যাদা অন্য কেউ অর্জন করতে পারেননি। ইমাম আ'জম (র.)-এর এই 'কিতাবুল আছার' মর্যাদা রাখে 'মুয়াত্তা ইমাম মালিকে'র উৎসের। কারণ হাফেজ জাহাবি (র.) 'মানাবিকে' কাজি আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবিল আওয়াম-এর "اخبار ابى حنيفة" সূত্রে মুত্তাসিল সনদে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুল আজিজ দারাওয়ারদি (র.)-এর এই বক্তব্য বর্ণনা করেছেন,

"اخبار مالك ينظر فى كتب ابى حنيفة و ينتفع بها .

'ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর কিতাব ইমাম মালিক (র.) গভীরভাবে দেখতেন এবং তা থেকে উপকৃত হতেন।'

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এতে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর কিতাবের স্থান মুয়াত্তা ইমাম মালিকের তুলনায় এমন যেমন, মুয়াত্তার স্থান সহিহ বোখারি ও মুসলিমের তুলনায়।

হাদিসের অন্যান্য গ্রন্থের মতো 'কিতাবুল আছারে'রও অনেক বর্ণনাকারি আছেন। তার মধ্যে চার জন বিখ্যাত, ১. ইমাম আবু ইউসুফ ২. ইমাম মুহাম্মদ ৩. ইমাম জুফার ৪. ইমাম হাসান ইবনে জিয়াদ (র.)।

ইমাম বোখারি (র.) যেমনভাবে সহিহ বোখারি ছয় লাখ হাদিস থেকে বাছাই করে বিন্যস্ত করেছেন, এমনভাবে ইমাম আবু হানিফা (র.)ও 'কিতাবুল আছার'কে বহু হাদিস থেকে বাছাই করে বিন্যস্ত করেছেন। তারপর যেহেতু ইমাম আবু হানিফা ইমাম বোখারি (র.) প্রমুখ থেকে অনেক আগেকার এবং তাদের জামানায় সনদ সূত্রাবলির এতো আধিক্য-প্রাচুর্য ছিলো না, এজন্য ইমাম আজম (র.)-এর এ বাছাই ছিলো চল্লিশ হাজার হাদিস থেকে। এ কারণে আল্লামা মুয়াফফাক (র.) "مناقب الامام الاعظم" (১/৯৫ ছাপা দাক্ষিণাত্য ১৩২১ হিজরি)। গ্রন্থে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ আয্ জারনাজরি (র.)-এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যে, انتخب ابو حنيفة الاثار من اربعين الف حديث তথা ইমাম আবু হানিফা (র.) 'কিতাবুল আছাব' চল্লিশ হাজার হাদিস থেকে বাছাই করেছেন। আল্লামা মুয়াফফাক (র.) হাফেজ আবু ইয়াহইয়া জাকারিয়া (র.)-এর "مناقب ابى حنيفة" -এর বরাতে তাঁর সনদে ইয়াহইয়া ইবনে নসর ইবনে হাজেব (র.) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন,

سمعت ابا حنيفة (رحـ) يقول عندى صناديق من الحديث ما اخرجت منها الا الشئ اليسير الذى ينتفع به .

'আমি আবু হানিফা (র.)কে বলতে শুনেছি, আমার কাছে হাদিসের বহু সিন্দুক রয়েছে। সেগুলো থেকে সামান্য কিছু উপকারী এলেম ছাড়া অবশিষ্টগুলো বের করিনি।'

"عقود الجواهر المنيفة" নামক গ্রন্থে আল্লামা জুবায়দি (র.) হাফেজ আবু নু'আয়িম ইসফাহানি (র.) সূত্রে ইয়াহইয়া ইবনে নসরের এ বক্তব্যই বর্ণনা করেছেন যে, একবার আমি ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর নিকট

প্রবেশ করে দেখলাম তাঁর কক্ষ কিতাবাদিতে পরিপূর্ণ। আমি জিজ্ঞেস করলাম এগুলোতে কি? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, হাদিস গ্রন্থাবলি। এসব ঘটনা দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, 'কিতাবুল আছারে' যতোগুলো হাদিস আছে এগুলো ইমাম সাহেবের সব হাদিস নয়; বরং এগুলোর সার সংক্ষেপ ও বাছাইকৃত।

সুতরাং ইমাম আজম (র.)-এর ফযিলত হলো, হাদিসের যতো গ্রন্থ তখন প্রচলিত ছিলো তারমধ্যে সর্বপ্রথম অধ্যায় আকারে বিন্যস্ত কিতাবটি তাঁর লেখা।

এই কিতাবটির স্থান এলমে হাদিসে কেমন ছিলো? এর অনুমান সে যুগের মুহাদ্দিসিনের বক্তব্যগুলো দ্বারা হয়, যারা নিজ ছাত্রদেরকে শুধু এটি অধ্যয়নের পরামর্শই দেননি, বরং তাকিদও দিয়েছেন এবং বলেছেন, এছাড়া এলমে ফিক্হ অর্জিত হতে পারে না। এসব বক্তব্য মানাবিক গ্রন্থাবলিতে সবিস্তারে রয়েছে।

'কিতাবুল আছারে'র যে মুহাদ্দিসিন খিদমত করেছেন এর ফলে অনুমিত হয় যে, এ গ্রন্থটি তাঁদের কাছে কতো গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিলো। এ কিতাবটির অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে। এজন্য আল্লামা ইবনে হুমাম (র.)-এর শিষ্য হাফেজ জায়নুদ্দিন কাসিম ইবনে কাতলুবুগা كتاب الاثار-এর ব্যাখ্যা লিখেছেন এবং এর রাবিগণের ওপর স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাছাড়া হাফেজ ইবনে হাজার (র.) কিতাবুল আছারের রাবিগণের ওপর একটি গ্রন্থ লিখেছেন, যার নাম হলো, 'আল ইছার লি-জিকরি রুয়াতিল আছার।

হাফেজ (র.) "تعجيل المنفعة بزوائد رجال الاربعة" নামক গ্রন্থে এই কিতাবের আলোচনা করেছেন। তারপর হাফেজ ইবনে হাজার (র.)ই স্বীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "تعجيل المنفعة بزوائد رجال الاربعة" এর মধ্যে كتاب الاثار এর সমস্ত রাবিদের একত্রিত করেছেন। কেনোনা, এই কিতাবটি হাফেজ (র.), ইমাম চতুষ্টয় তথা ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ি এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর রাবিগণের আলোচনায় লিখেছিলেন।

কিন্তু নবাব সিদ্দিক হাসান খান (র.) اتحاف النبلاء গ্রন্থে এ কথাটি সম্পূর্ণ ভুল লিখেছেন যে, হাফেজ ইবনে হাজার (র.)-এর গ্রন্থ "تعجيل المنفعة" লিখেছেন এ সুনান চতুষ্টয়ের রাবিদের বিষয়। মনে হয়, নবাব সাহেব নিজে تعجيل المنفعة অধ্যয়ন করেননি। অন্যথায় এমন ভুল বক্তব্য করতেন না। কারণ, হাফেজ ইবনে হাজার (র.) এ বিষয়টি কিতাবের ভূমিকায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তার উদ্দেশ্য ইমাম চতুষ্টয়ের অতিরিক্ত রাবিগণের আলোচনা করা। এমনভাবে "التذكرة لرجال العشرة" নামে একটি গ্রন্থে হাফেজ আবু বকর ইবনে হামজা আল হুসাইনি লিখেছেন, যাতে সিহাহ সিত্তা এবং ইমাম চতুষ্টয়ের রাবিগণকে একত্রিত করেছেন। তাতে কিতাবুল আছারের সমস্ত বর্ণনাকারিগণও বিদ্যমান রয়েছে।

এতো ছিলো 'কিতাবুল আছার' ইমাম সাহেব (র.)-এর নিজের লেখা। তাছাড়া বড় বড় মুহাদ্দিসিন ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর হাদিসগুলো সংকলন করে বিন্যস্ত করেছেন 'মুসনাদে আবু হানিফা' নামে। এমন মুসনাদের সংখ্যা বিশের কাছাকাছি। মুসনাদ লেখকগণের মাঝে আবু নুআয়িম ইস্ফাহানি, হাফেজ ইবনে আসাকির, হাফেজ আবুল আব্বাস আদ্ দুরি, হাফেজ ইবনে মাদ্দাহ, এমনকি হাফেজ ইবনে আদি (র.)ও অন্তর্ভুক্ত, যিনি প্রথমে ইমাম সাহেব (র.)-এর প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন। পরবর্তীতে ইমাম তাহাবি (র.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে যখন ইমাম সাহেব (র.)-এর মাহাত্ম্য সম্পর্কে আন্দাজ হলো, তিনি তখন আগের ধারণার ক্ষতিপূরণের জন্য মুসনাদে আবু হানিফা বিন্যস্ত করেছেন। এভাবে 'মুসনাদে ইমাম আবু হানিফা' নামে সতেরো কিংবা তার চেয়ে বেশি কিতাব লেখা হয়েছে। যেগুলোকে পরবর্তীতে আল্লামা ইবনে খসরু (র.) সংকলন করেছেন "جامع مسانيد الامام الاعظم" নামে।

ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর ওপর এই আপত্তি যে, তিনি হাদিস জানতেন কম অথবা তাঁর কাছে সর্বমোট হাদিস ছিলো সতেরোটি। যেমন– ইবনে খালদুন (র.) কোনো কোনো মনীষী থেকে বর্ণনা করেছেন, এটি এমন

ইলজাম এবং নির্জলা মিথ্যা যার পক্ষপাতিত্ব অথবা অজ্ঞতা ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। আল্লাহ জানেন, ইবনে খালদুন (র.) লিখে দিয়েছেন যে, ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর নিকট হাদিস বিশুদ্ধতার শর্ত-শরায়েত যেহেতু খুবই শক্ত ও কঠোর ছিলো, এজন্য তাঁর মতে হাদিস সহিহ ছিলো শুধু সতেরোটি। মূলত ইবনে খালদুন ইমাম আবু হানিফা (র.) থেকে এতো দূরে ছিলেন যে, তিনি বাস্তব অবস্থা জানতে পারেননি। বাস্তব অবস্থা সেটি যেটি আল্লামা জাহেদ কাওসারি (র.) "شروط الائمة الخمسة للحازمي" -এর টীকার ৫০নং পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেছেন যে, আসলে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর প্রচলিত হাদিসগুলো এমন সতেরটি ভলিউমে আছে যেগুলোর মধ্য থেকে সবচেয়ে ছোট ভলিয়মও سنن شافعی بروایة الطحاوی এবং مسند شافعی بروایة ابی العباس الاصم থেকে বড়। অথচ ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর হাদিসগুলো এ দুটি কিতাবের ওপরই নির্ভরশীল।

ইমাম সাহেবের এক শিষ্যের বক্তব্য হলো, তাঁর লেখাগুলোতে ৭০ হাজার হাদিস পাওয়া যায়। অনেকে এর ওপর বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং এটাকে অতিরঞ্জন মনে করেন। কারণ ইমাম সাহেবের রচনাবলিতে বাহ্যত এতোগুলো হাদিস পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু মুতাকাদ্দিমিনের কর্মপদ্ধতি যদি মনে থাকে, তাহলে এই বক্তব্যটির সত্যতা পরিষ্কার হয়ে যায়। বস্তুত মুহাদ্দিসিনের নিকট হাদিস বর্ণনা করার পদ্ধতি ছিলো দুটি– কোনো কোনো সময় তাঁরা হাদিসকে রাসূল ﷺ-এর দিকে সম্বোধন করে মারফু রূপে বর্ণনা করেন। আবার কোনো সময় সতর্কতামূলক এটাকে রাসূল ﷺ-এর দিকে সম্বোধন না করে নিজের বক্তব্য সাব্যস্ত করে ফিকহি মাসআলারূপে বর্ণনা করতেন। এটা তাদের চূড়ান্ত সতর্কতা ছিলো, যাতে তাদের হাদিস বর্ণনায় কোনো কিছু ছুটে গেলে বা ভুল হলেও সেটি রাসূল ﷺ-এর দিকে সম্বোধিত না হয়। সাহাবি ও তাবেয়িনের মধ্যে যারা হাদিসের ব্যাপারে অধিক সতর্ক ছিলেন, তারা সাধারণত এই দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। এজন্য হজরত উমর (রা.)-এর বেশির ভাগ বর্ণনা এ ধরনের। যার প্রমাণ হলো, হজরত উমর (রা.) থেকে যেসব মারফু' হাদিস বর্ণিত সেগুলোর সংখ্যা ৫০০ থেকে বেশি, এক হাজার থেকে কম। যার দাবি হলো, মুহাদ্দিসিনের পরিভাষা অনুযায়ী তাঁকে গণ্য করা হয় মধ্যম ধরনের রাবিদের মধ্যে। মুহাদ্দিসিন তাঁকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ধরেছেন। কিন্তু "ازالة الخلفاء" নামক গ্রন্থে হজরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ (র.) লিখেছেন যে, তাঁকে উচিত অধিক সংখ্যক হাদিস বর্ণনাকারিদের অন্তর্ভুক্ত করা।

মুহাদ্দিসিনের পরিভাষায় 'বেশি সংখ্যক হাদিস বর্ণনাকারি' তাঁদেরকে বলে যাঁদের বর্ণনা সংখ্যা এক হাজারের অধিক। শাহ সাহেব (র.) হজরত উমর (রা.)কে অধিক হাদিস বর্ণনাকারিদের মধ্যে গণ্য করার কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর বেশির ভাগ বর্ণনা স্বয়ং তাঁর নিজস্ব বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এমনভাবে কোনো কোনো তাবেয়িনের প্রসিদ্ধ বক্তব্য রয়েছে,

لان نقول قال علقمة قال عبد الله احب الينا من ان نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -

"আলকামা বলেছেন, 'আব্দুল্লাহ বলেছেন', এমন বলার চেয়ে আমাদের নিকট 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন' এ কথা বলাই অধিক উত্তম।"

এমন আরো অনেক ঘটনা আছে, যেগুলো হজরত মাওলানা জাফর আহমদ উসমানি (র.) "انجاء الوطن عن الازدراء بامام الزمن" নামক গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়টি এর ফলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুতাকাদ্দিমিন বহু মারফু হাদিসকে স্বয়ং নিজের বক্তব্য সাব্যস্ত করে ফিক্হি মাসআলারূপে উল্লেখ করতেন। যদি এই হিসেবে দেখা হয়, তাহলে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর বর্ণনা সত্তর হাজার পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া কোনো অযৌক্তিক নয়। কেননা, ইমাম আবু হানিফা (র.)ও এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন।

ইমাম মুহাম্মদ প্রমুখ ইমাম আবু হানিফা (র.) থেকে যেসব মাসায়েল বর্ণনা করেছেন সেগুলো যদি অধ্যয়ন করা হয়, তবে এগুলোর মধ্যে এমন মাসায়েলের সংখ্যা অগণিত পরিলক্ষিত হয়, যেগুলো সরাসরি হাদিস থেকে

বর্ণিত। এমতাবস্থায় ইমাম আ'জম (র.)-এর রেওয়ায়াতের সংখ্যা ৭০ হাজারের অধিক হওয়া কোনো যুক্তি পরিপন্থী নয়। তাছাড়া মূলত বিষয় এটি নয় যে, ইমাম আবু হানিফা (র.) কতোগুলো রেওয়ায়াত অন্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন, বরং বিষয় হলো, কতোগুলো রেওয়ায়াত তাঁর নিকটে পৌঁছেছে। বাস্তব ঘটনা হলো, ইমাম সাহেব (র.) যেহেতু নিজের ব্যস্ততা হাদিস রেওয়ায়াতকে বানানোর স্থলে আহকাম উৎসারণকে বানিয়েছেন, এজন্য তাঁর বহু হাদিস হাদিস হিসেবে বাকি থাকেনি; বরং বাকি আছে ফিক্‌হি মাসায়েলরূপে।

ইমাম আজম আবু হানিফা (র.)-এর ওপর উত্থাপিত আপত্তিগুলোর ইনসাফভিত্তিক যাচাই

সেসব আপত্তিগুলোর ওপর এবার একটু নজর বুলানো উচিত, যেগুলো সাধারণত ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর ওপর উত্থাপন করা হয়।

১. সর্ব প্রথম আপত্তি হলো ইমাম নাসায়ি (র.) স্বীয় গ্রন্থ الضعفاء তে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর আলোচনা করতে গিয়ে লেখেন,

نعمان بن ثابت ابو حنيفة ليس بالقوى فى الحديث .

"নু'মান ইবনে সাবেত আবু হানিফা (র.) হাদিসের ক্ষেত্রে শক্তিশালী নন।

এর উত্তর, ওলামায়ে কেরাম جرح وتعديل -এর কিছু উসুল নির্ধারণ করেছেন। কোনো রাবি সম্পর্কে جرح وتعديل -এর সিদ্ধান্ত করার সময় সেসব উসুলের প্রতি লক্ষ্য রাখা খুবই জরুরি। তাছাড়া বড় কোনো মুহাদ্দিসেরও আদালত-নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত হবে না। কেননা, সমস্ত বড় ইমামগণের বিরুদ্ধে অবশ্যই কারো না কারো সমালোচনা রয়েছে। ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর বিরুদ্ধে ইয়াহইয়া ইবনে মাইন (র.), ইমাম আহমদ (র)-এর বিরুদ্ধে ইমাম কারাবিসি (র.), ইমাম বোখারি (র.)-এর বিরুদ্ধে ইমাম জুহলি (র.), ইমাম আওজায়ি (র.)-এর বিরুদ্ধে ইমাম আহমদ (র.) সমালোচনা করেছেন। যদি এসব বক্তব্য ধর্তব্য হয়, তবে তাঁদের একজনও নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত হতে পারবেন না। বিস্ময়ের ব্যাপার! ইবন হাজম (র.) ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (র.)কে অজ্ঞাত বলেছেন। স্বয়ং ইমাম নাসায়ি (র.)-এর বিরুদ্ধে বহু আলেম অভিযোগ করেছেন শিয়া মতাবলম্বী হওয়ার এবং এ কারণে তাঁকে বলেছেন সমালোচিত।

মূলকথা, ওলামায়ে কেরাম جرح وتعديل -এর কিছু উসুল নির্ধারণ করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম উসুল হলো, যে মনীষীর ইমামত ও আদালত মুতাওয়াতিরের সীমায় পৌঁছেছে তাঁর সম্পর্কে দু'এক জনের সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর আদালত ও ইমামতও মুতাওয়াতিরের সীমায় পৌঁছেছে। হাদিসের বড় বড় ইমামগণ তাঁর এলেম ও তাকওয়ার প্রশংসা করেছেন। এজন্য ইমাম সাহেবের বিরুদ্ধে দু'একজনের সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়।

সমকালীন কোনো কোনো অজ্ঞ লোক এই জবাবের ওপর প্রশ্ন করে যে, মুহাদ্দিসিনের প্রসিদ্ধ উসুল হলো, الجرح مقدم على التعديل (সমালোচনা সদালোচনার ওপর প্রাধান্যপ্রাপ্ত) অতএব, ইমাম সাহেব সম্পর্কে যখন جرح وتعديل উভয়টি বর্ণিত আছে কাজেই جرح তথা প্রধান হবে সমালোচনাই। কিন্তু এই প্রশ্নটি جرح وتعديل-এর কিছু মূলনীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রসূত। কেনোনা, হাদিসের ইমামগণ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, الجرح مقدم على التعديل মূলনীতিটি ব্যাপক নয়; বরং কিছু শর্ত-শরায়েতের সাথে শর্তায়িত। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, যদি কোনো রাবি সম্পর্কে جرح و تعديل এর বক্তব্য পরস্পর বিরোধী হয়, তাহলে প্রাধান্যের জন্য ওলামায়ে কেরাম প্রথমতো অবলম্বন করেছেন দুটি পদ্ধতি।

এক. جرح و تعديل -এর দ্বিতীয় মূলনীতির মর্যাদা রাখে সেটি খতিব বাগদাদি (র.) "الكفاية في اصول الحديث والرواية" নামক গ্রন্থে এই বর্ণনা করেছেন যে, এমন স্থানে দেখতে হবে যে, সমালোচকদের সংখ্যা বেশি না সদালোচকদের (নির্ভরযোগ্য সাব্যস্তকারিদের), যেদিকটি সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে অবলম্বন করা হবে সেই দিকটি।

শাফেয়ি মাজহাবের আল্লামা তাজুদ্দিন সুবকি (র.)ও এর প্রবক্তা। এই পদ্ধতি যদি অবলম্বন করা হয়, তাহলেও ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর নির্ভরযোগ্যতায় কোনো সন্দেহ থাকে না। কারণ, ইমাম সাহেবের বিরুদ্ধে সমালোচক হাতে গণা কয়েকজন। অর্থাৎ, ইমাম নাসায়ি, ইমাম বোখারি, ইমাম দারাকুতনি, হাফেজ ইবনে আদি (র.)। আমরা পেছনে বলে এসেছি যে, ইবনে আদি (র.) ইমাম তাহাবির (র.) শিষ্যত্ব গ্রহণের পর ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মাহাত্ম্যের প্রবক্তা হয়ে যান। অপরদিকে ইমাম সাহেবের প্রশংসাকারীদের সংখ্যা এতো বিশাল যে, এগুলো গণনা করা যায় না। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা কয়েকটি বক্তব্য তুলে ধরছি।

جرح وتعديل : এ শাস্ত্রের সর্বপ্রথম আলেম যিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে সর্বাগ্রে রিজালের ওপর আলোচনা করেছেন, তিনি হলেন ইমাম শু'বা ইবনে হাজ্জাজ (র.)। যিনি আমিরুল মু'মিনিন ফিল হাদিস উপাধিতে প্রসিদ্ধ। তিনি ইমাম আবু হানিফা (র.) সম্পর্কে বলেন, كان والله ثقة ثقة আল্লাহর শপথ, তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য নির্ভরযোগ্যই।

جرح وتعديل : এর দ্বিতীয় বড় ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল-কাত্তান তিনি ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর ছাত্র। হাফেজ জাহাবি (র.) "تذكرة الحفاظ" এ এবং হাফেজ ইবনে আব্দুল বার "الانتقاء" তে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ফতওয়া দিতেন ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর বক্তব্যর ওপর। তাঁর বক্তব্যে[১] আছে,

جالسنا والله ابا حنيفة وسمعنا منه فكنت كلما نظرت اليه عرفت في وجهه انه يتقي الله عز و جل .

'কসম আল্লাহর, আবু হানিফার মজলিসে আমরা বসেছি, তাঁর কথা শুনেছি, যখনই তাঁর দিকে তাকাতাম তাঁর চেহারায় অনুভব করতে পারতাম যে, আল্লাহকে তিনি ভয় করেন।

ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ আল-কাত্তানেরই দ্বিতীয় আরেকটি বক্তব্য كتاب التعليم -এর ভূমিকায় আল্লামা সিন্ধি (র.) লিখেছেন,

انه لاعلم هذه الامة بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .

'যা কিছু রাসূল ﷺ থেকে এসেছে এ উম্মতের মাঝে সেগুলো সম্পর্কে তিনি সবচেয়ে বড় জ্ঞানী।'

جرح وتعديل : এর তৃতীয় বড় ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ আল-কাত্তানের ছাত্র ইয়াহইয়া ইবনে মাইন (র.)। ইমাম আবু হানিফা (র.) সম্পর্কে তিনি বলেন,

كان ثقة حافظا لا يحدث الا بما يحفظ ما سمعت احدا يجرحه .

'তিনি নির্ভরযোগ্য হাফেজ ছিলেন। কেবল তাই বর্ণনা করতেন যা মুখস্থ করতেন। তাঁর সমালোচনা করেছেন আমি এমন কথা শুনিনি।'

অন্য স্থানে তাঁর কাছে ইমাম সাহেব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, اثقة هو তিনি নির্ভরযোগ্য কি? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন,

نعم ثقة ثقة هو اورع من ان يكذب واجل قدرا من ذلك . كذا في مناقب الامام الاعظم للكردي .

হ্যাঁ, নির্ভরযোগ্য, অবশ্য নির্ভরযোগ্য। মিথ্যাচার হতে তিনি অনেক দূরে। মর্যাদাগতভাবে এর চেয়ে অনেক উর্ধ্বে।'

টীকা-১. এই বক্তব্যটি তারিখে বাগদাদ : ১৩/৩৫২-এর বরাতে পেছনে উল্লেখ করা হয়েছে।

جرح وتعديل : এর চতুর্থ বড় ইমাম হজরত আলি ইবনুল মাদিনি (র.)। যিনি ইমাম বোখারি (র.)-এর উস্তাদ এবং 'ফাতহুল বারি'র ভূমিকায় হাফেজ ইবনে হাজার (র.)-এর সুস্পষ্ট বিবরণ মুতাবিক রাবি পরখের ব্যাপারে খুবই কঠোর। তিনি বলেন,

ابو حنيفة روى عنه الثورى وابن المبارك وهشام و وكيع وعباد بن العوام وجعفر بن عون وهو ثقة لا بأس به ـ

'ইমাম আবু হানিফা (র.) থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন সাওরি, ইবনে মুবারক, হিশাম, ওয়াকি' আব্বাদ ইবনুল আওয়াম ও জা'ফর ইবনে আওন (র.)। তিনি নির্ভরযোগ্য। তাঁর মধ্যে কোনো সমস্যা নেই।'

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) বলেন,

لولا اعانني الله بابى حنيفة وسفيان لكنت كسائر الناس ـ

'আল্লাহ তা'আলা যদি আবু হানিফা ও সুফিয়ান (র.) দ্বারা আমার সাহায্য না করতেন, তাহলে আমি অন্যান্য সাধারণ লোকের মতোই থাকতাম।'

মক্কি ইবনে ইবরাহিমের বক্তব্য পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, كان اعلم اهل زمانه তাছাড়া ইয়াজিদ ইবনে হারুন, সুফিয়ান সাওরি, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, ইসরাইল ইবনে ইউনুস, ইয়াহইয়া ইবনে আদম, ওকি' ইবনুল জার্‌রাহ, ইমাম শাফেয়ি, ফজল ইবনে দুকাইন (র.)-এর ন্যায় হাদিসের ইমামগণ থেকেও ইমাম আবু হানিফা (র.) সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করা সংক্রান্ত বক্তব্য বর্ণিত আছে। এলমে হাদিসের এসব বড় বড় স্তম্ভের বক্তব্যগুলোর বিপরীতে দু'তিন জনের সমালোচনা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহলেও ইমাম সাহেবের নির্ভরযোগ্যতার পাল্লা থাকে ভারি।

جرح وتعديل : এর বিরোধ অবসানের দ্বিতীয় পদ্ধতি যেটি এর তৃতীয় উসুলের মর্যাদা রাখে, সেটি হাফেজ ইবনুস সালাহ (র.) মুকাদ্দামায় বর্ণনা করেছেন এবং এটাকে সাব্যস্ত করেছেন অধিকাংশ মুহাদ্দিসিনের মত, সেটি হলো, যদি সমালোচনা সবিস্তারে বর্ণিত না হয় অর্থাৎ, সমালোচনার কারণ বর্ণনা করা না হয়, তাহলে সদালোচনা সব সময় এর ওপর প্রাধান্য পায়। চাই সদালোচনার বিশদ বিবরণ থাকুক অথবা অস্পষ্ট থাকুক। এই মূলনীতির ভিত্তিতে দৃষ্টিপাত করলে ইমাম আবু হানিফা (র)-এর বিরুদ্ধে যতো সমালোচনা হয়েছে সবগুলো অস্পষ্ট, একটিতেও বিশদ বিবরণ দেয়া হয়নি। অতএব, এগুলো ধর্তব্য নয়। আর সদালোচনার সবগুলোর বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। কারণ তাতে তাক্ওয়া, পরহেজগারি, স্মরণশক্তি সব কিছু প্রমাণ করা হয়েছে। বিশেষত যদি সদালোচনায় সমালোচনার কারণ প্রত্যাখ্যান করা হয় তবে সেটি সবগুলোর ওপর অগ্রাধিকার পায়। আর ইমাম সাহেব (র.) সম্পর্কে এমন সদালোচনাও বিদ্যমান আছে। যেমন– الانتقاء فى فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء নামক গ্রন্থে হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র.) লিখেছেন,

اكثر ما عابوا عليه الاغراق فى الرائ والقياس و ليس ذلك بعيب ـ

'সবচেয়ে বেশি তাঁর যে দোষটি বর্ণনা করা হয়, সেটি হচ্ছে রায় ও কিয়াসে নিমগ্নতা। অথচ এটি কোনো দোষের বিষয় নয়।'

মূলকথা الجرح مقدم على التعديل মূলনীতিটি তখন ধর্তব্য হয়, যখন সমালোচনার বিশদ বিবরণ থাকে এবং এর কারণও যৌক্তিক হয়। কোনো কোনো আলেমের মতে এই শর্তও আছে যে, সমালোচকদের সংখ্যা সমালোচিতদের তুলনায় কম হতে হবে।

২. ইমাম সাহেবের ওপর দ্বিতীয় আপত্তি করা হয় যে, 'মিজানুল ই'তিদাল' নামক গ্রন্থে হাফেজ শামসুদ্দিন জাহাবি (র.) ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর আলোচনা নিম্নোক্ত ভাষায় করেছেন,

النعمان ابن ثابت الكوفى امام اهل الرائ ضعفه النسائى وابن عدى والدار قطنى واخرون ـ

'নু'মান ইবনে সাবেত আল-কুফি (র.)-কে ইমাম নাসায়ি, ইবনে আদি, দারাকুতনি ও অন্যরা দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন।'

এর জবাব হলো, 'মিজানুল ই'তিদাল'এ এই উদাহরণটি নিঃসন্দেহে পরবর্তীতে সংযুক্ত। অর্থাৎ, গ্রন্থকার এটি লিখেননি; বরং অন্য কোনো ব্যক্তি এটা লিখেছেন টীকায় এবং পরবর্তীতে মূল ইবারতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। হয়তো কোনো লিপিকারের ভুলে না হয় জেনে বুঝে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর প্রমাণাদি নিম্নেযুক্ত,

১. হাফেজ জাহাবি (র.) 'মিজানুল ই'তিদাল'-এর ভূমিকায় স্পষ্ট করে লিখেছেন, আমি এই গ্রন্থে সেসব বড় বড় ইমামগণের আলোচনা করবো না, যাদের সুমহান মর্যাদা মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। চাই তাঁদের সম্পর্কে কেউ কোনো কালামই করুক না কেনো। তারপর সেসব বড় বড় ইমামগণের উদাহরণে স্পষ্ট ভাষায় ইমাম আবু হানিফার নামও তিনি উল্লেখ করেছেন। অতঃপর সে গ্রন্থে নিজেই আবার ইমাম সাহেবের আলোচনা করবেন তা হয় কী করে?

২. হাফেজ জাহাবি (র.) যেসব বড় বড় ইমামগণের আলোচনা 'মিজানুল ই'তিদাল'-এ করেননি তাদের আলোচনার জন্য তিনি 'তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ' নামে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সে কিতাবে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর শুধু আলোচনাই নয়; বরং তাঁর প্রশংসায় ইমাম জাহাবি ছিলেন উচ্ছ্বাসিত।

৩. গ্রন্থ 'লিসানুল মিজানে' হাফেজ ইবনে হাজার (র.) ভিত্তি রেখেছেন 'মিজানুল ই'তিদাল'-এর ওপর। অর্থাৎ, যেসব রাবির আলোচনা 'মিজানুল ই'তিদাল'এ নেই তাদের আলোচনা 'লিসানুল মিজানে'ও নেই, শুধুমাত্র কয়েকজন ব্যতিত। আর 'লিসানুল মিজানে' এ ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর আলোচনা নেই এটা এর সুস্পষ্ট প্রমাণ, যে ইমাম আ'জম আবু হানিফা (র.) সম্পর্কে এই ইবারতটি 'মিজানুল ই'তিদাল'-এও ছিলো না, সংযুক্ত করা হয়েছে পরবর্তীতে।

৪. 'আর-রাফউ ওয়াত্ তাকমিল'-এর হাশিয়ায় আমাদের উস্তাদ শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দা আল-হালবি (র.) (পৃষ্ঠা : ১০১) লিখেছেন যে, আমি দাশেমকের জাহিরিয়া লাইব্রেরিতে 'মিজানুল ই'তিদাল'-এর একটি কপি দেখেছি। (২৬৮ নং হাদিসের আওতায়) যেটি সম্পূর্ণ লেখা হাফেজ জাহাবি (র.)-এর একজন ছাত্র আল্লামা শরফুদ্দিন (র.)-এর কলমে। তাতে সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে, 'আমি এই কপিটি উস্তাদ হাফেজ জাহাবি (র.)-এর সামনে পড়েছি তিনবার এবং এগুলোর পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়েছি।' এই কপিতে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর আলোচনা নেই। এমনভাবে আমি মরক্কোর রাজধানী রাবাতের প্রসিদ্ধ কুতুবখানা الخزانة العامرة তে ১৩৯ নং হাদিসের আওতায় 'মিজানুল ই'তিদাল'-এর একটি কলমে লেখা কপি দেখেছি। যাতে লেখা আছে হাফেজ জাহাবি (র.)-এর বহু শিষ্যের অধ্যয়নের তারিখ। তাতে এ বিষয়েও সুস্পষ্ট বিবরণ আছে যে, হাফেজ জাহাবি (র.)-এর এক ছাত্র তাঁর সামনে তাঁর ওফাতের শুধু এক বছর আগে পড়েছিলেন। ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর আলোচনা এই কপিতে নেই। এটি এ কথার সুস্পষ্ট দালিলিক প্রমাণ যে, ইমাম আবু হানিফা (র.) সম্পর্কে এই ইবারতটি পরবর্তীতে কেউ বাড়িয়ে দিয়েছেন, এটি আসল কপিতে ছিলো না। অতএব, প্রমাণিত হলো যে, হাফেজ জাহাবি (র.) কর্তৃক ইমাম আবু হানিফা (র.)-কে দুর্বল সাব্যস্ত করা ও দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করার ইলজাম থেকে পবিত্র। আর হাফেজ জাহাবি (র.) এমন কথা লিখেনও বা কিভাবে? তিনি নিজেই তো ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর ফাজায়িল-মানাকিবের ওপর স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ লিখেছেন।

হাফেজ ইবনে আদি (র.)-এর প্রসঙ্গে পূর্বে লেখা হয়েছে যে, তিনি প্রথম দিকে ছিলেন ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর বিরোধী। তৎকালীন সময় তিনি ইমাম সাহেবের সমালোচনাও করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে যখন ইমাম তাহাবি (র.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন তখন ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর আজমত-মাহাত্ম্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন। এজন্য তিনি তার আগের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মুসনাদ বিন্যস্ত করেছেন। সুতরাং তার পূর্ববর্তী বক্তব্যকে ইমাম সাহেবের বিরুদ্ধে প্রমাণরূপে পেশ করা যায় না।

আর ইমাম নাসায়ি (র.)-এর সমালোচনার জবাব ওপরে উল্লিখিত হয়েছে।

৩. তৃতীয় প্রশ্ন এই করা হয় যে, ইমাম দারাকতুনি (র.) সুনানে দারাকুতনিতে[১] হাদিসে নববি من كان له امام فقرائة الامام له قرائة এর অধীনে লিখেছেন,

لم يسنده عن موسى بن ابى عائشة غير ابى حنيفة والحسين بن عمارة وهما ضعيفان .

আবু হানিফা ও হুসাইন ইবনে উমারাহ ব্যতিত মুসা ইবন আবু আয়েশা থেকে আর কেউ এ সূত্রে এটি বর্ণনা করেননি আর তারা দু'জন দুর্বল।'

এর উত্তর : কোনো সন্দেহ নেই, ইমাম আবু হানিফা সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনি (র.)-এর সমালোচনা প্রমাণিত। কিন্তু এর জবাব সেটিই যেটি ইমাম নাসায়ি (র.)-এর সমালোচনার জবাব। লক্ষণীয় বিষয় হলো, ইমাম আবু হানিফা (র.) সম্পর্কে ইমাম শো'বা, ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ আল-কাত্তান, ইয়াহইয়া ইবনে মাইন, আলি ইবনুল মাদিনি, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, সুফিয়ান সাওরি, ওয়াকি' ইবনুল জার্রাহ্, মক্কি ইবনে ইবরাহিম, ইসরাইল ইবনে ইউনুস এবং ইয়াহইয়া ইবনে আদমের ন্যায় হাদিসের ইমামগণের বক্তব্য ধর্তব্য হবে? যাঁরা ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর সমকালীন, অথবা তাঁর যুগের নিকটবর্তী, নাকি ইমাম দারাকুতনির বক্তব্য ধর্তব্য হবে, যিনি জন্মলাভ করেছেন ইমাম সাহেবের দুই শ' বছর পর? বরং ইয়াহইয়া ইবনে মাইনের বক্তব্য দ্বারা তো বোঝা যায় যে, তাঁর যুগ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিই ইমাম সাহেবের সমালোচনা করেননি। তিনি বলেন– ما سمعت احدا يجرحه ' আমি কাউকে তাঁর সমালোচনা করতে শুনিনি।'

০ এখন প্রশ্ন থেকে যায়, ইমাম নাসায়ি, ইমাম দারাকুতনি (র.)-এর মতো হাদিসের ইমামগণ কীভাবে ইমাম সাহেব সম্পর্কে এমন ভিত্তিহীন কথা বলে ফেললেন? এর জবাব, আমাদের এসব মহান ব্যক্তিদের ইখলাস ও আন্তরিকতা সম্পর্কে কোনো কুধারণা নেই। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হলো, ইমাম আ'জম আবু হানিফা (র.)কে আল্লাহ তা'আলা যে মাকাম ও মর্যাদা দান করেছেন, তাই তাঁর হিংসুকদের সংখ্যা ছিলো অগণিত। তারা ইমাম সাহেব সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের কথা ছড়িয়ে রেখেছিলেন। যেমন, এই অপপ্রচার তো ব্যাপক ছিলো যে, ইমাম সাহেব (র.) কিয়াসকে প্রধান্য দেন হাদিসের ওপর। এই প্রোপাগাণ্ডা এতো জোরদারভাবে চালানো হয়েছিলো যে, কোনো কোনো আলেমও এর ফলে প্রভাবিত হয়েছিলো, যাঁরা ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর জীবন সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে ওয়াকিফহাল ছিলেন না। এসব আলেমের মধ্য হতে যাঁদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়েছিলো, তাঁরা পরবর্তীতে ইমাম সাহেবের বিরোধিতা থেকে ফিরে এসেছেন। যেমন হাফেজ ইবনে আদি (র.)-এর দৃষ্টান্ত ওপরে উল্লেখ হয়েছে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ইমাম আওজায়ি (র.)।

সিমরি (র.) থেকে আল্লামা কারদারি (র.) নিজ সনদে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.)-এর বক্তব্য 'মানাকিবুল ইমামিল আ'জম : ১/৩৯ এ বর্ণনা করেছেন যে, আমি শামে এসে ইমাম আওজায়ি (র.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি যখন শুনলেন আমি কুফা থেকে এসেছি, আমাকে তখন জিজ্ঞেস করলেন, من هذا المبتدع الخارج بالكوفة يكنى بابى حنيفة আবু হানিফা উপনামে কুফায় বেরিয়েছে এক বিদআতি, কে সে?

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) বলেন, তখন আমি তাকে বিস্তারিত কোনো জবাব দেওয়া সংগত মনে করলাম না; বরং আপন ঠিকানায় ফিরে এলাম। পরবর্তীতে আমি ইমাম আবু হানিফা কর্তৃক উৎসারিত ফিক্হি মাসায়েল যেগুলো আমার কাছে সংরক্ষিত ছিলো– তিন দিনে এগুলোর একটি সংকলন তৈরি করলাম। এগুলোর শুরুতে قال ابو حنيفة -এর পরিবর্তে লিখে দিলাম قال النعمان بن ثابت। এটা নিয়ে ইমাম তৃতীয় দিন আওজায়ি (র.)-এর নিকট গেলাম। তিনি এটা অধ্যয়ন করলেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, من النعمان নো'মান কে? قلت ابو حنيفة الذى ذكرته তথা আমি বললাম, আবু হানিফা, যার আলোচনা আপনি করেছেন। এরপর আমি দেখেছি, ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর সাথে ইমাম আওজায়ি (র.)-এর সাক্ষাৎ হয়েছে। উভয়ের মাঝে সেসব

টীকা- ১. ১/৩২৩ : باب ذكر قوله (ص) من كان له امام فقراءة الامام له قرائة واختلاف الروايات .

মাসায়েল নিয়ে আলোচনা হলো, যেগুলো আমি লিখে ইমাম আওজায়ি (র.)-এর নিকট পেশ করেছিলাম। ইমাম আ'জম (র.) সেসব মাসায়েল সম্পর্কে আমার চেয়ে আরো বেশি বিশদ বিবরণ দিলেন। ইমাম আবু হানিফা (র.) চলে গেলেন আমি ইমাম আওজায়ি (র.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তাঁকে কেমন দেখলেন? তিনি জবাবে বললেন,

غبطت الرجل لكثرة علمه ووفور عقله ـ استغفر الله لقد كنت فى غلط ظاهر الزمه فانه بخلاف ما بلغنى عنه ـ

"আমি ঈর্ষান্বিত হয়েছি এই মনীষীর এলমের প্রাচুর্য ও বুদ্ধির পরিপূর্ণতা দেখে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমি ছিলাম সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে। আমি তাঁর ওপর এলজাম দিয়েছিলাম। বাস্তবে আমার কাছে যা পৌঁছেছে তা ছিলো তার সম্পূর্ণ বিপরীত।"

ইমাম সাহেব সম্পর্কে যেসব আলিম বাস্তবতা জানতে পারেননি, তাঁরা অটল ছিলেন পূর্বেকার অবস্থানে। তাদের ইখলাসের কারণে আল্লাহ চাহেতো তারা মাজুর। কিন্তু তাঁদের বক্তব্যগুলো এমন মনীষীদের বিপরীতে প্রমাণ বানানো যায় না, যাঁরা ইমাম সাহেব (র.) সম্পর্কে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবগত।

মূলকথা, ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মর্যাদা এলমে হাদিসে অনেক উর্ধ্বে। আর তাঁর সম্পর্কে যাদের মনোমালিন্য হয়েছে সেগুলো ভুল সংবাদের ভিত্তিতে হয়েছে। তাই যাঁরা ইনসাফের সাথে ইমাম সাহেব (র.)-এর জীবনী অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা এই সারনির্যাস পর্যন্ত পৌঁছেছেন যে, এলমে হাদিসে ইমাম আবু হানিফা (র.) উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাঁর বিরুদ্ধে এসব প্রশ্ন ঠিক নয়। এ কারণে "التاج المقلل" নামক গ্রন্থে নবাব সিদ্দিক হাসান খান সাহেব (র.) ইমাম আবু হানিফা (র.) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর ফিক্হ ও পরহেজগারির প্রশংসা করেন। তিনি শেষে লিখেন,

ولم يكن يعاب بشئ سوى قلة العربية ـ

"আরবি কম জানা ছাড়া তাঁর আর অন্য কোনো দোষ বর্ণনা করা হয় না।" নবাব সিদ্দিক হাসান খান সাহেব এখানে হাদিস শাস্ত্রগতভাবে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর ওপর কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। অবশ্য আরবি কম জানার অভিযোগ তুলেছেন। এই এলজামটিও কোনো ক্রমেই ঠিক নয়। মূলত এই বাক্যটি নবাব সাহেব কাজি ইবনে খাল্লিকানের وفيات الاعيان থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে কাজি ইবনে খাল্লিকান যে রদ করেছেন তা নবাব সাহেব বর্ণনা করেননি। কাজি ইবনে খাল্লিকান (র.) লিখেছেন যে, ইমাম সাহেবের ওপর আরবি কম জানার যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে এর ভিত্তি শুধু একটি ঘটনা। সেটি হলো, ইমাম আবু হানিফা (র.) একবার মসজিদে হারামে তশরিফ রাখছিলেন, একজন প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদ সেখানে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে পাথর দ্বারা হত্যা করে ফেলে তাহলে তার ওপর কিসাস আসবে কী না? ইমাম সাহেব বললেন, না। এ শুনে ব্যাকরণবিদ বিস্ময়াভিভূত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ولو رماه بصخرة একটি বড় পাথর নিক্ষেপ করলেও? এ শুনে ইমাম সাহেব বললেন, نعم ولو رماه بابا قبيس হ্যাঁ, আবু কুবাইস পাহাড় নিক্ষেপ করলেও। তাই এই ব্যাকরণবিদ ছড়িয়ে দিলেন যে, ইমাম সাহেব আরবিতে দক্ষতা রাখেন না। কেননা, উচিত ছিলো এখানে بابى قبيس বলা। কিন্তু কাজি ইবনে খাল্লিকান (র.) লিখেন যে, ইমাম সাহেবের ওপর এই প্রশ্ন ভুল। কেননা, কোনো কোনো আরব গোত্রের ভাষায় اسماء ستة مكبرة -এর আলিফ দ্বারা হয়। যেমন, একজন কবির বিখ্যাত কবিতা আছে,

ان اباها وابا اباها * قد بلغنا فى المجد غايتاها

এখানে উসুলের আলোকে ابا ابيها হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু কবি যের অবস্থায়ও আলিফ দ্বারা اعراب প্রকাশ করেছেন। অতএব, ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর ওপরযুক্ত বাক্য ছিলো সেই আরব গোত্রের ভাষা অনুযায়ী।

শুধু এই ঘটনার ওপর ভিত্তি করে ইমাম আ'জম আবু হানিফার ন্যায় ব্যক্তিত্বের ওপর আরবি কম জানার অভিযোগ বে ইনসাফি ছাড়া আর কিছু নয়। এখানে এই আলোচনার সংক্ষিপ্ত সারনির্যাস উল্লেখ করা হলো। বিস্তারিত বিবরণ দেখা যেতে পারে আল্লামা জা'ফর আহমদ উসমানি (র.)-এর গ্রন্থ 'ইনজাউল ওয়াতান মিনাল ইজদিরাই বিইমামিজ জামান'এ।

৪. চতুর্থ আপত্তি তোলা হয় যে, 'তারিখে সগিরে'[১] ইমাম বোখারি (র.) নুআয়িম ইবনে হাম্মাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মৃত্যুর সংবাদ যখন সুফিয়ান সাওরির মজলিসে পৌঁছলো তিনি তখন বললেন,

الحمد لله كان ينقض الاسلام عروة ما ولد فى الاسلام اشئم منه ۔

'আলহামদুলিল্লাহ! লোকটি ইসলামের প্রচুর ক্ষতি করতো। তাঁর চেয়ে অশুভ আর কেউ ইসলামে জন্ম নেয়নি।'

জবাব হলো, এই বিবরণটি অবশ্য ভুল। এ সম্পর্কে ইমাম বোখারি (র.)-কে অভিযুক্ত করা যায় না। তিনি যা শুনেছেন তা লিখেছেন। ইমাম আব হানিফা (র.) সম্পর্কে এই নুআয়িম ইবনে হাম্মাদ ছিলেন পক্ষপাত দোষে মারাত্মক দুষ্ট। এজন্য এ বিবরণটির মিথ্যার জন্য শুধু এতোটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এটি নুআয়িম ইবনে হাম্মাদ থেকে বর্ণিত। কেননা 'তাহজিবুত্ তাহজিবে' হাফেজ ইবনে হাজার (র.) হাদিসের কয়েকজন ইমাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যদিও কেউ কেউ নুআয়িমকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। কিন্তু তিনি ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর ব্যাপারে মিথ্যা বিবরণ দিতেন। তিনি লিখেছেন,

يروى حكايات فى ثلب ابى حنيفة (رح) كلها كذب ..

'তিনি ইমাম আবু হানিফার সমালোচনায় বহু উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন। যার সবগুলো মিথ্যা।'

এরপর এই ঘটনার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন থাকে না। চিন্তার বিষয় হলো, সুফিয়ান সাওরি এমন কথা কিভাবে বলতে পারেন? অথচ তিনি ইমাম সাহেবের ছাত্র এবং শতকরা প্রায় ৯০টি ফিক্হি মাসায়েলে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর পক্ষে থাকেন। স্বয়ং তাঁর ঘটনা যেটি প্রবল ধারণা অনুযায়ী হাফেজ ইবনে হাজার (র.)-ই বর্ণনা করেছেন যে, যখন ইমাম আবু হানিফা (র.) তাঁর ভাইয়ের শোক প্রকাশের জন্য তাঁর কাছে এলেন তখন সুফিয়ান সাওরি (র.) তাঁর দরসের হালকা থেকে দাঁড়িয়ে তাঁকে ইসতিকবাল করেন। উপস্থিত অনেকে এই তা'জিমের ফলে প্রশ্ন করেন। তখন ইমাম সুফিয়ান (র.) জবাব দিলেন,

هذا رجل من العلم بمكان فان لم اقم لعلمه قمت لسنه وان لم اقم لسنه قمت لفقهه وان لم اقم لفقهه قمت لورعه ۔

"এলমের এতো উঁচু পর্যায়ে তিনি অবস্থান করছেন আমি যদি তাঁর এলমের কারণে না দাঁড়াই তাহলে দাঁড়াবো তাঁর বয়সের খাতিরে। আর বয়সের খাতিরে না দাঁড়ালে তাঁর ফিক্হের খাতিরে দাঁড়াবো। আর যদি ফিক্হের দিকে লক্ষ্য করে না দাঁড়াই, তবে তাঁর পরহেজগারির ভিত্তিতে দাঁড়াবো।" এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সুফিয়ান সাওরি (র.) ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর প্রতি কতোটা সম্মান প্রদর্শন করতেন।

অনেকে বলতে পারেন যে, ইমাম বোখারি (র.)-এর মতো মর্যাদাসম্পন্ন একজন মুহাদ্দিস এমন মিথ্যা ঘটনা বর্ণনা করলেন কিভাবে? এর উত্তর হলো, ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর বিরুদ্ধে গোড়া লোকগুলো ইমাম বোখারি (র.)-এর মন খুবই খারাপ করে রেখেছিলো। নুআয়িম ইবনে আবু হাম্মাদের বিবরণগুলোতে এজন্য কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি। হিংসুকদের ষড়যন্ত্র ছাড়া ইমাম বোখারি (র.)-এর মন খারাপ করার আরেকটি কারণ ছিলো যে, ইমাম বোখারি (র.)-এর উস্তাদ হুমায়দি (র.) জাহেরি মাজহাবের লোক ছিলেন। আর জাহেরিদের গোসসা

টীকা- ১. ইমাম বোখারি (র.) তাঁর আলোচনা করেছেন ১৪০ হিজরি থেকে ১৫০ হিজরি পর্যন্ত যারা ইন্তেকাল করেছেন তাদের মধ্যে। —তারিখে সগির : ১৭১, ছাপা, আল-মাকতাবুল আছারিয়্যা, শায়খুপুরা।

হানাফিদের বিরুদ্ধে সর্বদাই ছিলো। ফলে ইমাম বোখারি (র.)ও তাঁর উস্তাদের প্রভাবশূন্য থাকতে পারেননি। 'আল-মিজানুল কুবরা'-তে শায়খ আব্দুল ওয়াহ্হাব শে'রানি (র.) বর্ণনা করেছেন যে, শুরুর দিকে সুফিয়ান সাওরি (র.)ও কোনো কোনো লোকের এই মতের কারণে প্রভাবিত হয়ে গিয়েছিলেন যে, ইমাম সাহেব (র.) নসের ওপর কিয়াসের প্রাধান্য দেন। তাই একদিন সুফিয়ান সাওরি (র.), মুকাতিল ইবনে হাইয়ান, হাম্মাদ ইবনে সালামা, জা'ফর সাদেক (র.) তাঁর কাছে গেলেন এবং অনেক বিষয়ে সকাল থেকে জোহর পর্যন্ত আলোচনা হলো, যাতে ইমাম সাহেব (র.) তার মাজহাবের প্রমাণাদি পেশ করেন। অতঃপর শেষে সবাই হজরত ইমাম সাহেব (র.)-এর হাত চুম্বন করেন এবং তাঁকে বলেন,

انت سيد العلماء فاعف عنا فيما مضى منا من وقيعتنا فيك بغير علم -

'ওলামায়ে কেরামের নেতা আপনি, অজানাবশত আপনার সম্পর্কে পেছনের যেসব সমালোচনা আমাদের থেকে হয়েছে আপনি সেগুলো আমাদের ক্ষমা করুন।'

৫. আরেকটি প্রশ্ন করা হয় যে, ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম বলেছেন,

قال مالك بن انس ايذكر ابو حنيفة فى بلاد كم قلت نعم فقال ما ينبغى لبلادكم ان تسكن -

'হজরত মালেক ইবনে আনাস বললেন, তোমাদের দেশে কী আবু হানিফার আলোচনা হয়? আমি বললাম হ্যাঁ, তিনি জবাবে বললেন, তোমাদের দেশে বসবাস করা উচিত না।'

এর জবাবে الميزان الكبرى তে শায়খ আব্দুল ওয়াহ্হাব শে'রানি (র.) লিখেন যে, হাফেজ মুজানি (র.) বলেছেন যে, এই রেওয়ায়াতের রাবি ওয়ালিদ ইবন মুসলিম দুর্বল। আর যদি মেনে নই, ইমাম মালিক (র.)-এর এই বক্তব্য প্রমাণিত। তাহলে এর অর্থ হবে, যে শহরে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতো আলেম আছেন সেখানে অন্য কোনো আলেমের থাকার প্রয়োজন নেই।

৬. আরেকটি প্রশ্ন করা হয় যে, সিহাহ সিত্তায় ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর হাদিসগুলো নেই। এ থেকে বোঝা যায়, সিহাহ সিত্তার লেখকগণের মতে তিনি গ্রহণযোগ্য ছিলেন না।

এর জবাব হলো, এটি অত্যন্ত সাধারণ প্রশ্ন। এসব গ্রন্থকার কর্তৃক কোনো মহান ইমামদের বর্ণনাগুলো তাদের গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত না করা তাঁকে আবশ্যকীয়ভাবে দুর্বল সাব্যস্ত করে না। স্পষ্ট বিষয় হলো, ইমাম শাফেয়ি (র.)-এরও কোনো বর্ণনা ইমাম বোখারি (র.) নেননি; বরং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল যিনি ইমাম বোখারি (র.)-এর উস্তাদ, যাঁর সংসর্গে তিনি দীর্ঘ সময় অবলম্বন করেছেন তাঁরও বর্ণনা পুরো সহিহ বোখারিতে শুধুমাত্র দুটি। একটি প্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণিত আর অপরটি ইমাম বোখারি (র.) কোনো সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এমনভাবে ইমাম মুসলিম (র.) সহিহ মুসলিমে ইমাম বোখারি (র.) থেকে কোনো হাদিস বর্ণনা করেননি। অথচ তিনি তাঁর উস্তাদ। ইমাম আহমদ (র.) স্বীয় মুসনাদে ইমাম মালেক (র.)-এর শুধু তিনটি রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। অথচ ইমাম মালেক (র.)-এর সনদ বিশুদ্ধতম সূত্ররূপে গণ্য হয়। এ থেকে কি এ ফল বের করা যায় যে, ইমাম শাফেয়ি, মালেক, আহমদ (র.) এঁরা তিন জন দুর্বল? এ ব্যাপারে বাস্তবতা হলো সেটি, যা 'শুরুতুল আয়িম্মাতিল খমসা লিল হাজেমি'-এর টীকায় আল্লামা জাহেদ আল-কাওসারি (র.) লিখেছেন যে, আসলে হাদিসের ইমামদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিলো, সেসব হাদিস তাঁরা সবচেয়ে বেশি সংরক্ষণ করবেন যেগুলো ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিলো। এর পরিপন্থী ইমাম শাফেয়ি, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ (র.)-এর ন্যায় মনীষীগণ। তাঁদের শিষ্য এবং অনুসারীদের সংখ্যা ছিলো এতো অধিক যে, তাঁদের বর্ণনা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা ছিলো না। এজন্য তাঁরা এর হেফাজতের খুব জরুরি মনে করেননি।

ইমাম সাহেবের ওপর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন করা হয় যে, তিনি কিয়াসকে প্রাধান্য দেন নসের ওপর।

জবাব এ বিষয়টি বাস্তবতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এর পরিপন্থী ইমাম সাহেব (র.) কোনো কোনো সময় সমালোচিত হাদিসের কারণেও কিয়াসকে বর্জন করেন। যেমন– অট্টহাসি দ্বারা ওজু ভাঙার মাসআলায় তিনি

কিয়াস বর্জন করেছেন, অথচ এই অধ্যায়ের হাদিসগুলো সমালোচিত; অন্যান্য ইমাম এগুলো বর্জন করে কিয়াসের ওপর আমল করেছেন। এই মাসআলাতে الميزان الكبرى তে শাফেয়ি মাজহাবপন্থী শায়খ আব্দুল ওয়াহ্হাব শে'রানি (র.) একটি স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন,

فصل فی بیان ضعف قول من نسب الامام ابا حنیفة الی انه یقدم القیاس علی حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ۔

তিনি এই অনুচ্ছেদে লিখেন,

اعلم ان هذا الكلام صدر من متعصب على الامام متهور فی دینه غیر متورع فی مقاله غافلا عن قوله تعالى "ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤلا"

وعن قوله تعالى "ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد"

وقد روى الامام ابو جعفر الشيزامارى (نسبة الى قرية من قرى بلخ) بالسند المتصل الى الامام ابى حنيفة رضى الله عنه كذب والله وافترى علينا من يقول عنا اننا نقدم القياس على النص وهل يحتاج بعد النص الى قياس وكان رضى الله عنه يقول نحن لا نقيس الا عند الضرورة الشديدة وذلك اننا ننظر اولا فى دليل تلك المسئلة من الكتاب والسنة واقضية الصحابة فان لم نجد دليلا قسنا حينئذ ۔ وفى رواية اخرى كان يقول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين بابى هو وامى وليس لنا مخالفة وما جاءنا عن اصحابه تخيرنا وما جاءنا عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال ۔

"জেনে রেখো, ইমাম সাহেব (র.)-এর বিরুদ্ধে এমন বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তি, দীনি ব্যাপারে বেপরোয়া-উদাসীন ও কথাবার্তায় অপরহেজগার ব্যক্তি থেকে। সে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– 'কান, চোখ, অন্তর সবকিছু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।' – সূরা বনি ইসরাইল : ৩৬ এবং আল্লাহর বাণী– 'সে যে কথাই উচ্চারণ করে তাই গ্রহণ করার জন্য সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।' – সূরা ক্বাফ : ১৮ থেকে উদাসীন। ইমাম আবু জা'ফর শায়জামারি (বলখের গ্রামসমূহ হতে একটি গ্রামের দিকে সম্বন্ধযুক্ত।) ইমাম আবু হানিফা (র.) পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কসম! সে মিথ্যা বলেছে এবং আমাদের বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়েছে যে, আমাদের সম্পর্কে বলে– আমরা নাকি কিয়াসকে নসের ওপর প্রাধান্য দেই। নসের পর কি কিয়াসের কোনো প্রয়োজন থাকে? ইমাম আবু হানিফা (র.) বলতেন, আমরা ভীষণ প্রয়োজন ব্যতিত কিয়াস করি না। কারণ, আমরা প্রথমতো সে মাসআলাটির দলিলে কিতাব সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের ফয়সালাতে চিন্তা করি। এগুলোতে যদি প্রমাণ না মিলে, তখন কিয়াস করি।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ (স.) সূত্রে যা কিছু আমাদের কাছে এসেছে, সেসব আমরা চোখে ও মাথার ওপর রাখি। আমার পিতা-মাতা তাঁর ওপর উৎসর্গিত হোন। এ ব্যাপারে আমাদের কোনো বিরোধিতা নেই। আর যা কিছু আমাদের কাছে পৌঁছবে, সাহাবায়ে কেরাম থেকে হলে আমরা সেগুলো গ্রহণ করি। এছাড়া অন্যদের কাছ থেকে এলে তবে তারাও পুরুষ আমরাও পুরুষ। তথা, আমাদেরও মতের অধিকার আছে।"

শায়খ শে'রানি (র.) লিখেন,

اعلم يا اخى انى لم اجب على الامام بالصدر واحسان الظن فقط كما يفعل بعض وانما اجبت عنه بعد التتبع والفحص فى كتب الادلة ومذهبه اول المذهب تدوينا واخرها انقراضا كما قال بعض اهل الكشف .

'হে ভাই জেনো! আমি শুধু ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর পক্ষে প্রথমেই এবং সুধারণাবশত জবাব দিই না। অনেকে যেমনটি করে থাকে। প্রামাণ্য কিতাবাদি ঘাটাঘাটি ও তালাশ করার পর আমি তাঁর পক্ষ থেকে জবাব দিয়েছি। কোনো কোনো কাশফ বিশিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য অনুযায়ী তাঁর মাজহাব সর্বপথম সংকলিত এবং এর ইতি ঘটবে সর্বশেষে।'

এই প্রশ্নও ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর ওপর করা হয় যে, এলমে হাদিসের আলোকে তাঁর অধিকাংশ প্রমাণ দুর্বল হয়ে থাকে।

প্রতিটি মাসআলার অধীনে এর বিস্তারিত জবাব তো ইনশাআল্লাহ আসবেই। তাছাড়া এর সামগ্রিক জবাব শায়খ আব্দুল ওয়াহ্হাব শে'রানি (র.) দিয়েছেন। তিনি লিখেন, আমি ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর প্রমাণাদি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছি এবং এই ফলে উপনীত হয়েছি যে, ইমাম সাহেব (র.)-এর প্রমাণাদি হয়তো কোরআন-হাদিস থেকে গৃহীত অথবা সহিহ হাদিস থেকে বা হাসান হাদিস থেকে অথবা এমন দুর্বল হাদিস থেকে যেগুলো সূত্রাধিক্যের কারণে হাসান পর্যায়ে উন্নীত। কোনো প্রমাণ এর চেয়ে নিম্নস্তরের নেই।

তাছাড়া হাদিসগুলো সহিহ ও দুর্বল সাব্যস্ত করার যেসব উসুল শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে, যদি সেগুলো মনে রাখা হয় তাহলে এই প্রশ্নসহ হানাফিদের ওপর উত্থাপিত অন্য প্রশ্নগুলোরও জবাব সহজেই জানা যেতে পারে।

ইমাম আ'জম আবু হানিফা (র.) সম্পর্কে এতোটুকু আলোচনা একজন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট হতে পারে। অতিরিক্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নেযুক্ত কিতাবাদি উপকারী হবে।

١۔ انجاء الوطن عن الازدراء بامام الزمن، مولانا الشيخ ظفر احمد العثمانى

٢۔ الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل - للامام عبد الحى اللكهنوى مع تعليقه للشيخ عبد الفتاح ابى غدة الحلبى (رح)

٣۔ مقدمة التعليق الممجد على المؤطأ للامام محمد (رح) للشيخ اللكهنوى (رح)

٤۔ الانتقاء فى فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء للحافظ ابن عبد البر الاندلسى (رح)

٥۔ تبييض الصحيفة فى مناقب الامام ابى حنيفة (رح) لجلال الدين السيوطى (رح)

والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب .

ইমামগণের তাকলিদ প্রসঙ্গে

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ; বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্যও এজন্য করা হয় যে, তিনি আল্লাহর বিধিবিধানের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অন্যথায় সত্তাগতভাবে আনুগত্যের যোগ্য আল্লাহ তা'আলা ব্যতিত আর কেউ নেই। কিন্তু প্রকাশ থাকে যে, একজন সাধারণ মানুষের জন্য তো এটা সম্ভব না যে, সে আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রত্যক্ষভাবে পারস্পরিক কথাবার্তা বলে তাঁর মর্জি জেনে নিবে, আর না এটা সম্ভব

যে, সরাসরি রাসূলে কারিম ﷺ-এর শরণাপন্ন হয়ে আল্লাহর বিধি-বিধানের জ্ঞান অর্জন করে নেবে। অতএব, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পথ এখন কোরআনে কারিম এবং রাসূলে কারিম ﷺ-এর বাণী ও কর্ম বা সুন্নতের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কিছু নেই।

কোরআন ও সুন্নতের অনেক আহকাম তো অকাট্যভাবে প্রমাণিত, আবার এগুলোর অর্থও অকাট্য। এগুলোতে অস্পষ্টতা বা প্রমাণগত কোনো বিরোধও নেই। যেমন– যেনা হারাম, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ, রোজা, জাকাত, হজ ফরজ, মাহরামকে বিয়ে করা নাজায়েজ ইত্যাদি। এ ধরনের বিধি-বিধান প্রতিটি ব্যক্তি কোরআন ও সুন্নত থেকে অনুধাবন করতে পারে। অতএব, এসব মাসায়িল না তো ইজতিহাদের ক্ষেত্র, না তাকলিদের। অবশ্য কোরআন ও সুন্নাহর আহকামের দ্বিতীয় প্রকার হলো, যেগুলোতে কোনো অস্পষ্টতা বা সংক্ষেপ অথবা প্রমাণগত বিরোধ পাওয়া যায়। যেমন– কোরআনে রয়েছে, المطلقات يتربصن। এতে قروء শব্দটি আভিধানিকভাবে মুশতারাক। যার অর্থ মাসিকও হয়, আবার পবিত্রতাও। এখানে প্রশ্ন হয়, এই স্থানে আমল করা হবে কোন অর্থের ওপর? এমনভাবে হাদিসে রয়েছে,

من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله[১]

এতে নিষেধ করা হয়েছে مخابرة তথা বর্গাচাষ। এখন বর্গা চাষের কয়েকটি পদ্ধতি হতে পারে। এর বিবরণ হাদিসে নেই যে, কোন পদ্ধতিটি জায়েজ আর কোনটি নাজায়েজ। অথবা দৃষ্টান্ত, একদিকে হাদিস রয়েছে– لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 'যে সূরা ফাতেহা পড়ে না তার কোনো নামাজ হয় না।'

এ হাদিসের বাহ্যিক দাবি হলো, সূরা ফাতেহা পাঠ করা ইমাম, মুক্তাদি, মুনফারিদ সবার ওপর ফরজ। কিন্তু অন্য হাদিসে এরশাদ রয়েছে,

من كان له امام فقراءة الامام له قرائة[৩] 'যার ইমাম রয়েছে ইমামের কেরাতই তার জন্য যথেষ্ট।'

এ হাদিসের দাবি হলো, কোনো প্রকার কেরাত মুক্তাদির ওপর ওয়াজিব নয়। এই বাহ্যিক বিরোধ অবসানের জন্য একটি পদ্ধতি হলো, এমন বলা যে, প্রথম হাদিসটি মূল, আর দ্বিতীয় হাদিসে কেরাত দ্বারা উদ্দেশ্য সূরা ফাতেহা পড়া নয়; বরং অন্য সূরা পাঠ করা। আর দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো এমন বলা যে, দ্বিতীয় হাদিসটি আসল আর প্রথম হাদিসে সম্বোধন করা হয়েছে শুধু ইমাম ও মুনফারিদদকে, মুক্তাদিকে নয়।

এখন দুটি পদ্ধতির কোনটি অবলম্বন করা হবে? এ ধরনের মাসায়েল কোরআন ও সুন্নতের ব্যাখ্যায় প্রচুর তৈরি হতে থাকে। এমন স্থানে যৌক্তিকভাবে দু'টি পদ্ধতি সম্ভব। প্রথম পদ্ধতি হলো, এমন বিষয়ে আমরা নিজেরাই স্বীয় বিবেক এবং জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে কোনো একটি দিক নির্ণয় করবো এবং এর ওপর আমল করবো। আর দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, আমরা স্বীয় বুদ্ধি এবং জ্ঞানের ওপর নির্ভরের স্থলে দেখবো, আমাদের মহান পূর্ববর্তীগণ এসব ব্যাপারে কি কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। সলফে সালেহিনের মধ্য থেকে যে মুজতাহিদ আলেমের ইলমের ওপর আমাদের নির্ভরতা বেশি হবে তাদের বক্তব্যর ওপর আমল করা। এই দ্বিতীয় কর্মপদ্ধতিটির পারিভাষিক নাম তাকলিদ।

যদি ইনসাফের সাথে গভীরভাবে দেখা যায়, তাহলে এতে কোনো সন্দেহ থাকে না যে, এ দুটি পদ্ধতির প্রথমটি মারাত্মক ভয়ঙ্কর। এতে পথভ্রষ্টতার বেশি সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ এই বাস্তবতা কোনো নিকৃষ্ট অজ্ঞ লোকই অস্বীকার করতে পারে যে, পূর্ববর্তী মহামনীষীগণের সাথে আমাদের এলেম ও তাকওয়ার কোনো তুলনা হতে পারে না।

টীকা- ১. হাদিসের শব্দ আবু দাউদের : ২/৪৮৩ باب فى المخابرة। এটি ইমাম তাহাবি (র.)-ও বর্ণনা করেছেন, শরহে মা'আনিল আছারে : ২/২১৩, كتاب المزارعة والمساقات।

টীকা- ২. বোখারি : ১/১০৪, كتاب الصلوة، باب وجوب القراة للامام والماموم فى الصلوات كلها فى الحضر والسفر وما يجهر فيها ويخافت

টীকা- ৩. হাদিসটি ইমাম তাহাবি (র.) বর্ণনা করেছেন শরহে মা'আনিল আছারে : ১/১০৬ باب القرائة خلف الامام

০ **প্রথমতো :** আয়িম্মায়ে মুজতাহিদিন তো আমাদের চেয়ে রিসালাত যুগের অনেক বেশি নিকটবর্তী ছিলেন, এ কারণে তাঁদের জন্য কোরআন নাযিলের পরিবেশ, কোরআন-সুন্নাহর বাণীগুলোর পরিপূর্ণ প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সহজ ছিলো।

০ **দ্বিতীয়তো :** আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁদেরকে যে স্মরণশক্তি ও জ্ঞান-গরিমা দান করেছিলেন, তার সাথে আমাদের কোনো জ্ঞান ও স্মরণশক্তির তুলনা হতে পারে না। যার পরীক্ষা সর্বদা করা যায়।

০ **তৃতীয়তো :** আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় এবং তদীয় রাসূলের বাণীর হাকিকত এবং জ্ঞাতব্য বিষয় এমন ব্যক্তির নিকট উন্মুক্ত করে দেন না যে, তাঁর অবাধ্যতার জন্য পূর্ণ প্রস্তুত। অতএব, কোরআন ও সুন্নাহর বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য অনুধাবনের জন্য ইলমের সাথে সাথে তাকওয়ার ভীষণ প্রয়োজন। এদিক দিয়েও যখন আমরা নিজেদের অবস্থা আয়িম্মায়ে মুজতাহিদিনের সাথে তুলনা করি, তখন নিঃসন্দেহে মাটি আর পবিত্র জগতের সম্পর্কে পরিলক্ষিত হয়। অতএব, প্রতিটি ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ওপরযুক্ত দু'টি পথ থেকে অবশ্যই সতর্কতামূলক পথ, স্বীয় বিবেক ও জ্ঞানের ওপর নির্ভরতার পরিবর্তে আয়িম্মায়ে মুজতাহিদিন থেকে কারো বিবেক ও জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে তদনুযায়ী আমল করাকেই সাব্যস্ত করবে। এটাকেই পরিভাষায় বলে তাকলিদ।

তাকলিদের সংজ্ঞা উসুলিয়্যিন এমনভাবে করেছেন– العمل بقول امام مجتهد من غير مطالبة دليل

'তথা, দলিল তলব ছাড়া কোনো মুজতাহিদ ইমামের বক্তব্যের ওপর আমল করা।'

এই সংজ্ঞার দিকে লক্ষ্য করে কেউ কেউ বলতে আরম্ভ করেছেন– প্রমাণবিহীন কারো কথা মেনে নেওয়া এবং এর বক্তব্যকে প্রমাণ মনে করা শিরক। কিন্তু তাকলিদের যে হাকিকত ওপরে বর্ণিত হয়েছে এটির আলোকে এই প্রশ্ন স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেষ হয়ে যায়। কারণ, মুজতাহিদের বক্তব্য তাকে বিধান প্রবর্তক অথবা আনুগত্যযোগ্য মনে করে অবলম্বন করা হয় না; বরং ব্যাখ্যাতা মনে করে তার ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করা হয়। এর স্পষ্ট প্রমাণ হলো যে, কোরআন ও সুন্নাহর যেসব আহকাম অকাট্যভাবে প্রমাণিত এবং এগুলোর অর্থও অকাট্য, এগুলোতে আমরা কোনো মুজতাহিদ ইমামের শরণাপন্ন হই না। বরং মুজতাহিদের শরণাপন্ন শুধু সেসব ব্যাপারে হয়, যেখানে ইজমাল, অস্পষ্টতা অথবা বিরোধের কারণে কোরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যায় কোনো জটিলতার সম্মুখীন হয়।

আর তাকলিদের সংজ্ঞায় من غير مطالبة دليل শব্দ দ্বারা এই বিভ্রান্তি যেনো না হয় যে, সত্তাগতভাবে মুজতাহিদের আনুগত্য করা হচ্ছে; বরং বাস্তবতা হলো, মুজতাহিদের শরণাপন্ন হয়ই এজন্য যে, তাদের প্রতি আমাদের আস্থা হয় যে, তাঁদের নিকট নিজ বক্তব্যর স্বপক্ষে কোরআন অথবা হাদিসের প্রমাণ বিদ্যমান আছে। অবশ্য আমরা তাদের নিকট সেসব দলিল বর্ণনার দাবি এজন্য করি না যে, প্রমাণাদিতে সিদ্ধান্ত দেওয়ার যে ইজতিহাদি শক্তির প্রয়োজন সেটি আমাদের মধ্যে অবিদ্যমান। এজন্য আমরা মুজতাহিদের বক্তব্য গ্রহণ করার জন্য তার দলিল ভালোরূপে বুঝে নেওয়াকে শর্ত সাব্যস্ত করিনি। এ কারণে, বহু ব্যাপারে মুজতাহিদের প্রমাণ আমাদের বুঝে আসে, আবার অনেক বিষয়ে বুঝে আসে না। এখান থেকে গাইরে মুকাল্লিদদের এই প্রশ্নও খতম হয়ে যায় যে, যখন তাকলিদ দলিল ব্যতিত আমলের নাম তাহলে মুকাল্লিদিন স্বীয় গ্রন্থাবলিতে এবং বক্তৃতায় দলিলগুলো নিয়ে আলোচনা কেনো করে। উক্ত জবাবের সারনির্যাস হলো, মুজতাহিদের প্রমাণাদির জ্ঞান তাকলিদের পরিপন্থী নয়। অবশ্য দলিল তলব করার ওপর ইমামের আনুগত্যকে স্থগিত রাখা তাকলিদের পরিপন্থী। অতএব, প্রমাণাদির জ্ঞানার্জনের যতই চেষ্টা করা হোক এর ফলে তাকলিদের বিরোধিতা আবশ্যক হবে না।

তাকলিদ দুই প্রকার– এক পদ্ধতি হলো, তাকলিদের জন্য কোনো ইমাম ও মুজতাহিদ নির্দিষ্ট না করা, বরং কোনো বিষয়ে এক ইমামের বক্তব্যের তাকলিদ করা হবে, অন্য বিষয়ে অন্য কোনো ইমামের বক্তব্যের। এটাকে বলে তাকলিদে মুতলাক বা তাকলিদে গায়রে শখসি। আর দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, তাকলিদের জন্য কোনো ইমাম নির্দিষ্ট করা এবং প্রতিটি বিষয়ে তাঁর শরণাপন্ন হওয়া, এটাকে বলে তাকলিদে শখসি। এ দু'প্রকারের হাকিকত এর চেয়ে বেশি কিছু নয়– যে ব্যক্তি সরাসরি কোরআন ও সুন্নত থেকে আহকাম উৎসারণের যোগ্যতা রাখে না, সে এমন কোনো বক্তব্যের ওপর আস্থা পোষণ করে নির্ভর করে তার দৃষ্টিতে যিনি এলেম ও তাকওয়াগতভাবে নির্ভরযোগ্য। আর এটাই হলো সে বিষয় যার বৈধতা এবং অস্তিত্ব প্রমাণিত কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারা।

কোরআনের ভাষায় তাকলিদ

স্বয়ং কুরআনে কারিমে ইমামগণের তাকলিদের মৌলিক দিকনির্দেশনা রয়েছে।

১. সূরা নিসাতে রয়েছে, يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা বিশ্বাস কর আল্লাহ ও পরকালে। আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী তাদের।' –সূরা নিসা : ৫৯

اولى الامر -এর আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এই আয়াতে। اولى الامر -এর ব্যাখ্যা অনেকে এই করেছেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য উমারা এবং শাসক। কিন্তু মুফাস্‌সিরিনের একটি বড় দল বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য ওলামায়ে মুজতাহিদিন। এজন্য হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ, হাসান বসরি, আতা ইবনে আবু রাবাহ, আতা ইবনুস্ সায়িব, আবুল আলিয়া প্রমুখ থেকে এই ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। যেমন প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এটাকেই তাফসিরে ইবনে জারির ও ইমাম রাজির তাফসিরে কাবিরে। এই তাফসির অনুযায়ী এই আয়াতটি তাকলিদের স্পষ্ট প্রমাণ। কারণ, এতে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ওলামায়ে মুজতাহিদিনের আনুগত্যেরও। তাহলে যেনো আয়াতের অর্থ হলো, ওলামায়ে কেরামের আনুগত্য করা, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের পদ্ধতি।

এর ওপর কোনো কোনো গায়রে মুকাল্লিদ এর ওপর এ প্রশ্ন করেন যে, এ আয়াতের পরবর্তীতে বলা হয়েছে,

فان تنازعتم فى شئ فردوه الى الله والرسول

'কোনো বিষয়ে যদি তোমাদের মতভেদ ঘটে তবে তা উপস্থিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট।' –সূরা নিসা : ৫৯

যার দাবি হলো, যেখানে ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধ হবে সেখানে কোনো একজনের তাকলিদ বা অনুসরণের পরিবর্তে আল্লাহ ও রাসূলের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। অতএব, দেখতে হবে, কোনো বক্তব্যটি কোরআন ও সুন্নাহর অধিক মুতাবিক এবং এই দেখাটাই তাকলিদের বিপরীত।

জবাব এই– فان تنازعتم আয়াতে মুজতাহিদিনকে সম্বোধন করা হয়েছে, জনসাধারণকে নয়। অর্থাৎ, মুজতাহিদদের কাজ হচ্ছে বিতর্কিত মাসায়িলে এ বিষয়টি দেখা যে, কোন হুকুমটি কিতাব ও সুন্নাহর সাথে বেশি সামঞ্জস্যশীল। এজন্য প্রখ্যাত আহলে হাদিস আলেম নবাব সিদ্দিক হাসান খান ফাতহুল বয়ানে এই আয়াতের অধীনে লিখেন,

والظاهر انه خطاب مستانف موجه للمجتهدين .

'স্পষ্ট হলো, এটি নতুন সম্বোধন, তা করা হয়েছে মুজতাহিদিনের প্রতি।'

এই সম্বোধনটি যখন মুজতাহিদগণের ক্ষেত্রে হয়েছে তাই এর সাথে তাকলিদের কোনো বিরোধ রইলো না।

২. সূরা নিসাতে বলা হয়েছে,

واذا جاء هُم امر من الامن او الخوف اذاعوا به . ولو ردوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم .

'তাদের নিকট যখন শান্তি অথবা শঙ্কার কোনো বিষয় আসে তখন তারা তা প্রচার করে থাকে। যদি তারা তা রাসূল কিংবা তাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী তাদের গোচরে আনতো তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা এর যথার্থতা নির্ণয় করতে পারতো।' –সূরা নিসা : ৮৩

যুদ্ধকালীন সময়ে অনেক মুনাফিক বিভিন্ন রকমের অপপ্রচার ছড়িয়ে দিতো এবং কোনো কোনো সহজ সরল মুসলমান তাদের অপপ্রচারে বিশ্বাস করে পরবর্তীতে তারাও এগুলো বর্ণনা করতো, এ হলো আয়াতের প্রেক্ষাপট। এভাবে ভ্রান্ত অপপ্রচার শহরে ছড়াতো। ফলে বিশৃঙ্খলা ও বিষাদ সৃষ্টি হতো। কোরআনে কারিমে এরশাদ করা

হয়েছে যে, মুসলমানদের উচিত যখনই কোনো অপপ্রচার শুনবে তখন এর প্রচারের পূর্বে ফকিহ সাহাবিগণের শরণাপন্ন হয়ে তাদের বলবে, যাতে তাঁরা ব্যাপারটি গভীরে পৌছে যথার্থ কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

এ আয়াতটি যদিও সংশ্লিষ্ট একটি বিশেষ ঘটনার সাথে। কিন্তু উসূলে তাফসিরদের স্বীকৃত মূলনীতি হলো, العبرة بعموم اللفظ لا لخصوص السبب ـ 'ধর্তব্য শব্দের ব্যাপকতা, বিশেষ কারণ নয়।'

সুতরাং তাকলিদের মৌলিক বৈধতা এই আয়াতে বিদ্যমান রয়েছে। এজন্য 'তাফসিরে কাবিরে' ইমাম রাজি (র.) এবং 'আহকামুল কোরআনে' ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস (র.) এই আয়াত দ্বারা তাকলিদের বিধিবদ্ধতার ওপর প্রমাণ পেশ করেছেন। কোনো কোনো গাইরে মুকাল্লিদ এটাকে দূরবর্তী প্রমাণ সাব্যস্ত করেন। কিন্তু স্বয়ং নবাব সিদ্দিক হাসান খান 'তাফসিরে ফাতহুল বায়ানে' এই আয়াত দ্বারা কিয়াসের প্রামাণিকতার ওপর প্রমাণ পেশ করেন। আর এর দ্বারা যদি কেয়াসের প্রামাণিকতার ওপর প্রমাণ পেশ করা অযৌক্তিক না হয়, তাহলে তাকলিদের ওপর প্রমাণ পেশ করা অবশ্য যৌক্তিক।

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ـ

'তোমাদের প্রতিটি সম্প্রদায় হতে কেনো ছোট্ট একটি দল বের হয় না ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করার উদ্দেশে এবং তাদের সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদানের উদ্দেশে যখন তারা ফিরে আসবে, তারা যেনো বাঁচতে পারে।' –সূরা তাওবা : ১২২

বলা হয়েছে যে, সমস্ত লোকের একই কাজে রত না হওয়া উচিত; বরং কিছু সংখ্যক লোক জিহাদ করবে, আর কিছু এলেম অর্জন করবে। তারপর এলেম অর্জনকারিরা প্রথম প্রকারের লোকদেরকে দীনের মাসায়েল বর্ণনা করবে। প্রকাশ থাকে যে, প্রথম সূরাতে প্রথম প্রকারের লোকদের ওপর ওয়াজিব হবে দ্বিতীয় প্রকারের লোকদের কথা মান্য করা। তাকলিদ এটাই।

৪. فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون 'তবে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞেস কর তোমরা যদি না জান। –সূরা নাহল : ৪৩

এই আয়াতে এই মৌলিক দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, যারা না ওয়াকিফ তাদের কর্তব্য যারা ওয়াকিফহাল তাদের শরণাপন্ন হও। এখানে যদিও আয়াতটি আহলে কিতাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে; কিন্তু 'ধর্তব্য হয় শব্দের ব্যাপকতা' মূলনীতি অনুসারে এখান থেকে একটি মূলনীতি বের হয় যে, যারা আলেম নয় তাদের কর্তব্য হলো, আলেমের শরণাপন্ন হওয়া। একেই বলা হয় তাকলিদ।

হাদিসের ভাষায় তাকলিদ

১. জামে তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ ইত্যাদিতে রয়েছে,

عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى لا ادرى ما بقائى فيكم فاقتدوا بالذين من بعدى ابى بكر و عمر رضى الله عنهما ـ

'হজরত হুজায়ফা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি কতদিন পর্যন্ত তোমাদের মাঝে বেঁচে থাকবো তা জানি না। অতএব তোমরা আমার পরবর্তীতে অনুসরণ কর আবু বকর ও উমরের।'

এতে অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর اقتداء প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আনুগত্য নয়, বরং দীনি ব্যাপারে আনুগত্যের হুকুম।

২. সহিহ বোখারি : كتاب الصلوة، باب الرجم يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم এর অধীনে বর্ণিত আছে যে, কোনো কোনো সাহাবি জামা'তে দেরিতে আসতে আরম্ভ করেন। তখন রাসূলে আকরাম ﷺ তাদেরকে তাড়াতাড়ি আসার এবং প্রথম কাতারে নামাজ আদায় করার তাকিদ দেন। সাথে সাথে এটাও বলেন, ائتموا بى وليأتم بكم من بعدكم 'তোমরা আমার অনুসরণ কর। তোমাদের পরবর্তীরা অনুসরণ করবে তোমাদের।'

এর এক অর্থ হলো, প্রথম কাতারের লোকজন রাসূলে আকরাম ﷺ-কে দেখে দেখে তাঁর অনুসরণ করবে। কিন্তু এর আরেকটি অর্থ হলো, সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ-এর নামাজ ভালো করে দেখবে। কারণ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সাহাবিগণের অনুসরণ এবং তাদের অনুসরণ করবে। ফাতহুল বারিতে হাফেজ ইবনে হাজার (র.) এই হাদিসটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন,

وقيل معناه تعلموا منى احكام الشريعة وليتعلم منكم التابعون بعد كم وكذالك اتباعهم الى انقراض الدنيا ـ

'অনেকে বলেছেন, এর অর্থ হলো তোমরা আমার কাছ থেকে শরি'য়তের বিধিবিধান শিখো। আর তোমাদের কাছ থেকে শিখবে তোমাদের পরবর্তীরা, তারপর তাদের পরবর্তীরা পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত।'

৩. ইমাম বায়হাকির আল-মাদখালের বরাতে মিশকাতুল মাসাবিহ : ১/৩৬ এলেম পর্বের তৃতীয় অনুচ্ছেদে হজরত ইবরাহিম ইবনে আব্দুর রহমান আল-আজরি (র.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলে আকরাম ﷺ বলেছেন,

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ـ

'এই দীনি এলেম গ্রহণ করবে প্রতিটি পরবর্তী থেকে শরি'য়তের অনুসারীরা। তারা এলেম থেকে প্রতিহত করবে চরমপন্থীদের বিকৃতি ও বাতিলপন্থীদের চুরি এবং মূর্খদের ব্যাখ্যা।'

মূর্খদের ব্যাখ্যা প্রদানের নিন্দা এ হাদিসে করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তাদের ব্যাখ্যার রদ করা ওলামায়ে কেরামের অবশ্য কর্তব্য। এতে বোঝা যায়, যারা কোরআন ও সুন্নতের বিদ্যায় মুজতাহিদ সুলভ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী নন, তাদের জন্য নিজের বুঝের ওপর নির্ভর করে কোরআন ও সুন্নাহতে তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা দেয়া উচিত নয়; বরং ওলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হয়ে তাদের উচিত দীনি মাসায়েল জেনে নেওয়া, তাকলিদ একেই বলা হয়।

এ বিষয়টিও এখানে গভীরভাবে লক্ষণীয় যে, কোরআন ও সুন্নাহতে তা'বিল বা ব্যাখ্যা করতে পারেন তিনিই, যার কোরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে কিছু জ্ঞান রয়েছে। কিন্তু হাদিসে এমন ব্যক্তিকেও মূর্খ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতে বোঝা গেলো যে, কোরআন ও সুন্নাহ থেকে সাধারণ জ্ঞান বিধিবিধান উৎসারণ করার জন্য যথেষ্ট নয়।

সাহাবিদের আমলে সাধারণ তাকলিদ

সাহাবায়ে কেরামের যুগে তাই যেখানে ইজতিহাদের বহু উদাহরণ পাওয়া যায়, সেখানে তাকলিদেরও বহু দৃষ্টান্ত তাতে রয়েছে। অর্থাৎ, যেসব সাহাবায়ে কেরাম সরাসরি কোরআন ও সুন্নাহ থেকে আহকাম উৎসারণ করতে পারতেন না, তাঁরা ফকিহ সাহাবায়ে কেরামের শরণাপন্ন হয়ে তাদের নিকট থেকে মাসায়েল জেনে নিতেন। আর ফুকাহায়ে সাহাবা সেসব প্রশ্নের জবাব দুভাবে দিতেন– কখনো প্রমাণ বর্ণনা করে, কখনো প্রমাণ বিহীন। অবশ্য সাহাবায়ে কেরামের যুগে ব্যক্তি বিশেষের অনুসরণকে আবশ্যক মনে করা হতো না; বরং সাধারণ তাকলিদ এবং তাকলিদে শখসি উভয়টির প্রচলন ছিলো। তাকলিদের মুতলাক তথা সাধারণ তাকলিদের উদাহরণ সাহাবায়ে কেরামের যুগে অগণিত। কারণ প্রতিটি ফকিহ সাহাবি স্বীয় প্রভাবাধীন শ্রেণীতে ফতওয়া দিতেন, আর অন্যরা এর তাকলিদ করতেন। এজন্য 'আ'লামুল মুয়াক্কাইন' নামক গ্রন্থে আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (র.) লিখেছেন,

والذين حفظت عنهم الفتوى من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مأة ونيف و ثلثون نفسا ما بين رجل وامرأة ـ

'ফতওয়া রাসূল ﷺ-এর যেসব সাহাবি থেকে সংরক্ষিত হয়েছে নারী পুরুষ মিলিয়ে, তাদের সংখ্যা তিনশরও বেশি।'

তাদের সমস্ত ফতওয়া সাধারণ তাকলিদের দৃষ্টান্ত।

বরং অনেক বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, সাহাবায়ে কেরামের শুধু বক্তব্য নয়; বরং তাদের কর্মেরও তাকলিদ বা অনুসরণ করা হতো। যেমন, মুয়াত্তা ইমাম মালেকে বর্ণিত আছে যে, হজরত উমর (রা.) হজরত তালহা (রা.)কে ইহরাম অবস্থায় রঙিন কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখে তাঁর ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি জবাব দিলেন– এই রং-এ সুগন্ধি নেই। ফলে হজরত উমর (রা.) বললেন,

انكم ايها الرهط ائمة يقتدى بكم الناس فلو ان رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال ان طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثياب المصبغة فى الاحرام فلا تلبسوا ايها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة اخرجه المؤطا فى الحج فى باب لبس الثياب المصبغة فى الاحرام واحمد فى مسنده ـ جـ١ ، صـ١٩٢ فى احاديث عبد الرحمن بن عوف ـ

'হে সম্প্রদায়! তোমরা অনুসরণীয় ব্যক্তি। লোকজন তোমাদের অনুসরণ করবে। যদি কোনো অজ্ঞ এ কাপড়টি দেখে তাহলে বলবে, ইহরামকালে তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রঙিন কাপড় পরতেন। সুতরাং হে সম্প্রদায়! এ ধরনের কোনো রঙিন পোশাক তোমরা পরিধান করবে না।'

সাহাবিদের আমলে ব্যক্তি বিশেষের অনুসরণ

সাহাবায়ে কেরামের মাঝে তাকলিদে শখসির এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নিচে তা থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো,

১. সহিহ বোখারি : ১/২৩৭ كتاب الحج باب اذا حاضت المرأة بعد ما افاضت এর অধীনে হজরত ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত আছে,

ان اهل المدينة سألوا ابن عباس (رضـ) عن امرأة طافت ثم حاضت قال تنفر قالوا لا نأخذ بقولك ندع قول زيد ـ

'হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট মদিনাবাসী এমন এক মহিলা সম্পর্কে মাসআলা জিজ্ঞেস করলো, যার তওয়াফের পর মাসিক হয়ে গেছে। তিনি এর জবাবে বললেন, সে চলে যাবে মিনা থেকে মক্কার দিকে। মদিনাবাসীরা তখন বললো, আমরা জায়েদের বক্তব্য ছেড়ে আপনার বক্তব্য গ্রহণ করবো না।'

এই বর্ণনাটি মু'জামে ইসমাইলিতে আব্দুল ওয়াহ্হাব আস্-সাকাফিতে বর্ণিত আছে। এতে মদিনাবাসীর এই বক্তব্যটি বর্ণিত আছে– لا نبالى افتيتنا او لم تفتنا زيد بن ثابت يقول لا تنفر

'আমাদের আপনি ফতওয়া দেন বা না দেন আমরা তার কোনো পরোয়া করি না। জায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) বলেন, সে মিনা থেকে চলে যাবে না।'

আর মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসিতে তাদের নিম্নেযুক্ত বাণী বর্ণিত আছে,

لا نتابعك يا ابن عباس وانت تخالف زيدا ـ

'আপনি জায়েদের বিরোধিতা করছেন ইবনে আব্বাস!। আপনার অনুসরণ আমরা করব না।'

স্পষ্টাভাবে এ থেকে বোঝা গেলো যে, তাঁরা জায়েদ ইবনে সাবেত (রা.)-এর তাকলিদে শখসি করতেন। তাই তাঁরা এ বিষয়ে হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ন্যায় সাহাবির ফতওয়া গ্রহণ করেননি এবং তাঁর বক্তব্য

প্রত্যাখ্যানের কারণ এ ছাড়া আর কিছু বলেননি যে, তাঁর এ বক্তব্য জায়েদ ইবনে সাবেত (রা.)-এর ফতওয়া পরিপন্থী। হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করেননি যে, তোমরা তাকলিদে শখসি করে গুনাহ অথবা শিরকে লিপ্ত হচ্ছো; বরং তাদেরকে এই দিকনির্দেশনা দিলেন, যাতে তারা হজরত উম্মে সুলায়ম (রা.) থেকে বিষয়টি তাহকিক করে পুনরায় হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত (রা.)-এর শরণাপন্ন হন। তাই হজরত জায়েদ (রা.) হাদিস তাহকিক করে নিজের পূর্বের ফতওয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। মুসলিম ইত্যাদির হাদিসে বিষয়টি স্পষ্টাকারে রয়েছে।

এ ঘটনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মদিনাবাসী হজরত জায়েদ (রা.)-এর তাকলিদে শখসি করতেন।

২. সহিহ বোখারি : ২/৯৯৭, كتاب الفرائض باب ميراث ابنة ابن مع ابنة এর অধীনে হজরত হুজাইল ইবনে শুরাহবিল থেকে বর্ণিত আছে যে, হজরত আবু মুসা আশআরি (রা.)-এর নিকট কিছু সংখ্যক লোক একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করে। তিনি উত্তর তো দিয়ে দিয়েছেন, তবে সাথে সাথে এটিও বলে দিয়েছেন যে, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর নিকট জিজ্ঞেস করে নিও। তাঁরা হজরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কাছে গেলো। হজরত আবু মুসা আশআরি (রা.)-এর রায়ের কথাও আলোচনা করলো। হজরত ইবনে মাসউদ (রা.) যে ফতওয়া দিয়েছেন সেটি ছিলো হজরত আবু মুসা আশআরি (রা.)-এর ফতওয়ার বিপরীত। লোকজন হজরত আবু মুসা আশআরি (রা.)-এর নিকট হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ফতওয়ার কথা উল্লেখ করলে তিনি বললেন, لا تسئلوني ما دام هذا الحبر فيكم 'তোমাদের মাঝে যতোদিন পর্যন্ত এই মহাজ্ঞানী থাকবেন তোমরা ততোদিন আমাকে জিজ্ঞেস করবে না।'

মুসনাদে আহমদের (১/৪৬৪, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর হাদিসে) বর্ণনার শব্দগুলো নিম্নরূপ,

لا تسئلوني عن شئ ما دام هذا الحبر بين اظهركم .

'তোমাদের মাঝে যতোদিন এই মহাজ্ঞানী বিদ্যমান থাকবেন তোমরা ততোদিন আমাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে না।'

হজরত আবু মুসা আশআরি (রা.) এখানে তাঁদেরকে এই পরামর্শ দিয়েছেন যে, প্রতিটি মাসআলা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে জিজ্ঞেস করো। তাকলিদে শখসি বলা হয় এটাকেই।

৩. আবু দাউদ, তিরমিযী ইত্যাদিতে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজরত মু'আজ (রা.)কে ইয়েমেন প্রেরণ করেন এবং তাঁকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন শরি'য়াতের উৎস সম্পর্কে। এ ঘটনায় হজরত মু'আজ (রা.) ইয়েমেনবাসীদের জন্য শুধু গভর্নর হিসেবেই যাননি, বরং গিয়েছিলেন বিচারপতি ও মুফতী হিসেবেও। অতএব, ইয়েমেনবাসীদের জন্য শুধু তাঁর তাকলিদ করা ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিলো না। এ কারণে ইয়ামেনবাসী শুধু তাঁরই তাকলিদে শখসি করতেন। এর ওপর অনেক গায়রে মুকাল্লিদ বলেন, হজরত মু'আজ (রা.) ছিলেন বিচারপতি, মুফতি ছিলেন না। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। সহিহ বোখারি : ১/২৯৭ كتاب الفرائض، باب ميراث البنات-এ হজরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ (রা.)-এর বর্ণনায় আছে,

اتانا معاذ بن جبل باليمن معلما او اميرا فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته واخته فاعطى الابنة النصف والاخت النصف .

'আমাদের মাঝে হজরত মুআজ ইবনে জাবাল (রা.) আগমন করলেন শিক্ষক বা শাসকরূপে। তখন আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এক ব্যক্তি মারা গেছে আর দুনিয়াতে রেখে গেছে তার একটি মেয়ে ও এক বোন (এর মিরাস বণ্টন কিভাবে হবে?)। হজরত মু'আজ ইবনে জাবাল (রা.) তখন কন্যাকে সম্পদের অর্ধেক আর বোনকে দিয়ে দেন বাকি অর্ধেক।

বোঝা যায় যে, তিনি মুফতিরূপে ফতওয়া দিতেন এবং আলোচ্য বিষয়ে তিনি স্বীয় ফতওয়ার কোনো প্রমাণও পেশ করেননি। এটাকে ইয়েমেনবাসী শুধু তাকলিদরূপে গ্রহণ করেছেন।

মূলকথা, তাকলিদে মুতলাক ও তাকলিদে শখসি উভয়টি প্রচুর নজির সাহাবিগণের যুগে বিদ্যমান আছে। বাস্তব ঘটনাও এটাই যে, মূলত এ দুটোই জায়েয। প্রথম যুগে কোনো প্রকার প্রত্যাখ্যান ব্যতিত এই দুটো পদ্ধতির ওপর আমল হতো। কিন্তু পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম একটি বিরাট প্রশাসনিক উপকারিতার ফলে তাকলিদে মুতলাকের পরিবর্তে আবশ্যক করে নিয়েছেন তাকলিদে শখসি।

এই উপকারিতা বুঝতে হলে প্রথমে মনে রাখা আবশ্যক যে, কোরআনে কারিমের অগণিত স্পষ্ট বিবরণ মুতাবিক খাহেশাতে নফসানির অনুসরণ করা নেহায়েত মারাত্মক রোগ। অতঃপর খাহেশাতে নফসানির আনুগত্য এক তো হলো, মানুষ হালালকে হারাম মনে করে লিপ্ত হবে। আর এরচেয়েও মারাত্মক পদ্ধতি হলো, মানুষ কুপ্রবৃত্তির আনুগত্য করে হারামের হারাম হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করবে। এই পদ্ধতিটি এ জন্য মারাত্মক খারাপ যে, তাতে মানুষের নিজ কৃতকর্মের ওপর অনুশোচনা ও লজ্জা হয় না। ফুকাহায়ে কেরাম চিন্তা করেছেন যে, প্রথম যুগে দীনদারি ছিলো ব্যাপক। এজন্য তাকলিদে মুতলাকে খাহেশাতে নফসানির আনুগত্যের আশঙ্কা ছিলো না। কিন্তু পরবর্তীতে দীনদারির সে মানদণ্ড আর অবশিষ্ট থাকেনি। অতএব, যদি তাকলিদে মুতলাকের দ্বারা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখা হয়, তাহলে লোকজন স্বীয় খাহেশাতে নফসানি অনুযায়ী যে ইমামের বক্তব্য সহজ দেখবে, অবলম্বন করবে সেটি। আর এটা হলো, মারাত্মক বিভ্রান্তি যা নিঃসন্দেহে ইসলাম পরিপন্থী। কুপ্রবৃত্তির আনুগত্য করে কখনো কোনো ইমামের অনুসরণ করবে আর অন্য সময় অন্য কোনো ইমামের। স্বয়ং আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ (র.) নিজ ফতওয়া গ্রন্থে এই কর্মপদ্ধতিকে চরম নিন্দনীয় সাব্যস্ত করেছেন।

এ বিষয়ে যদি উন্মুক্ত স্বাধীনতা দেওয়া হয়, যে মুজতাহিদের বক্তব্য ইচ্ছা গ্রহণ কর, তাহলে দীন খেলার বস্তুতে পরিণত হয়ে যাবে। কেনোনা অধিকাংশ মুজতাহিদিনের নিকট কিছু না কিছু স্বতন্ত্র এমন বক্তব্য পাওয়া যায়, যেগুলো খাহেশাতে নফসানির অনুকূল হয়ে থাকে। যেমন ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মতে দাবা খেলা বৈধ। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফরের দিকে বাদ্যযন্ত্রের বৈধতা সম্বন্ধযুক্ত। হজরত কাসিম ইবনে মুহাম্মদের দিকে সম্বোধিত বক্তব্য হলো যে, তিনি ছায়াহীন ছবিকে বৈধ বলতেন। ইমাম সাহনুন মালেকি (র.)-এর দিকে স্বীয় স্ত্রীর সাথে পায়ুপথে সঙ্গমের বৈধতা সম্বোধিত। ইমাম আ'মাশ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁর নিকট রোজা শুরু হয় সূর্যোদয় থেকে। ইবনে হাজম জাহেরির মাজহাব হলো, যে মহিলাকে বিয়ে করতে মনস্থ করবে তাকে বিবস্ত্র অবস্থায়ও দেখা বৈধ। তাছাড়া তারই মাজহাব হলো, যদি কোনো মহিলার জন্য কোনো পুরুষ থেকে পর্দা করা মুশকিল হয় তাহলে তার জন্য সে বালেগ পুরুষকে নিজের স্তনের দুধ পান করিয়ে দেয়া বৈধ। তার জন্য আর পর্দার হুকুম থাকবে না, দুধপান সংক্রান্ত হুরমত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। হজরত আতা ইবনে আবু রাবাহের মাজহাব, ঈদের দিন যদি শুক্রবার হয় তাহলে সেদিন জোহর এবং জুম'আ বাদ হয়ে যায়।

এজন্য কোনো ব্যক্তি যদি এমন বক্তব্যগুলো তালাশ করে এগুলোর ওপর আমল করতে আরম্ভ করে দেয়, তাহলে এমন একটি দীন তৈরি হবে যার প্রতিষ্ঠাতা শয়তান এবং নফস ছাড়া অন্য কেউ নয়। তাই কোনো কোনো পূর্ববর্তী মনীষী বলেছেন, من اخذ بنوادر العلماء خرج من الاسلام 'যে ওলামায়ে কেরামের নগণ্য বক্তব্যগুলো গ্রহণ করবে সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে।' 'তালখিসুল হাবিরে' হাফেজ ইবনে হাজার (র.) হজরত মা'মার (রা.)-এর বক্তব্য বর্ণনা করেছেন যে,

لو ان رجلا اخذ بقول اهل المدينة فى استماع الغناء واتيان النساء فى ادبارهن وبقول اهل مكة فى المتعة والصرف وبقول فى المسكر كان شر الرجال .

'কোনো ব্যক্তি যদি মদিনাবাসীর গ্রহণ করে গান-বাদ্য শোনা এবং স্ত্রীদের সাথে পায়ুপথে সঙ্গমের ব্যাপারে এবং মক্কাবাসীদের বক্তব্য গ্রহণ করে মুত'আ বিয়ে ও খালেস শরাব বা লাল রং সম্পর্কে এবং নেশাজাত দ্রব্য সম্পর্কে একটি বক্তব্য গ্রহণ করে তবে সে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হবে।'

সারকথা হলো, সাধারণ তাকলিদের উন্মুক্ত অনুমতির ফলে এই ধরনের খাহেশাতে নফসানির অনুসরণ করার মারাত্মক আশঙ্কা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। এজন্য হিজরি ৪র্থ শতাব্দিতে ওলামায়ে কেরাম তাকলিদে শখসিকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেন। 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' নামক গ্রন্থে হজরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ (র.) ওলামায়ে কেরামের এই সিদ্ধান্তের আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন, وكان هذا هو الواجب فى ذلك الزمان "তৎকালে এটাই ওয়াজিব ছিলো।"

○ প্রশ্ন হয়, সাহাবি যুগে যে বিষয়টি ওয়াজিব ছিলো না সেটা পরবর্তী যুগে ওয়াজিব কিভাবে হয়?

'আল-ইনসাফ ফি বায়ানি সাবাবিল ইখতিলাফ' নামক গ্রন্থে হজরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ (র.) এর জবাব দিতে গিয়ে লিখেছিন যে, ওয়াজিব দুই প্রকার : ১) ওয়াজিব লিআইনিহি, ২) ওয়াজিব লিগাইরিহি।

ওয়াজিব লিআইনিহি : সেসব বিষয় যেগুলো রিসালত যুগে ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছে। এরপর এগুলোতে বৃদ্ধি হতে পারে না। কিন্তু ওয়াজিব লিগাইরিহিতে সংযোগ হতে পারে। সেটি এভাবে যে, মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তো হয় একটি ওয়াজিব আদায় করা। কিন্তু যদি কোনো যুগে এই ওয়াজিব আদায়ের শুধু একটি পদ্ধতিই থেকে যায় তাহলে সে পদ্ধতিটিও ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন, রিসালত যুগে হাদিস সংরক্ষণ ওয়াজিব ছিলো; কিন্তু লেখা ওয়াজিব ছিলো না। কারণ, হাদিস সংরক্ষণের ফরজ বা দায়িত্ব শুধু স্মরণশক্তি দ্বারা আদায় হয়ে যেতো। কিন্তু পরবর্তীতে যখন স্মরণশক্তির ওপর নির্ভরতা থাকলো না তখন লেখা ছাড়া হাদিস সংরক্ষণের আর কোনো পদ্ধতি ছিলো না। এজন্য লেখা ওয়াজিব হয়ে যায়। অনুরূপভাবে সাহাবি তাবেয়িনের যুগে অমুজতাহিদের জন্য সাধারণ তাকলিদ ওয়াজিব ছিলো। কিন্তু যখন সাধারণ তাকলিদের পথ আশঙ্কাপূর্ণ হয়ে গেলো, তখন শুধু তাকলিদে শখসিই ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে। এটিই সে বিষয় যার দিকে হজরত শায়খুল হাদিস (র.) এই ভাষায় ইঙ্গিত করেছেন যে, তাকলিদে শখসির আবশ্যিকতা কোনো শরয়ি হুকুম নয় এবং এটি একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত।

একটি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত হলো, হজরত উসমান (রা.)-এর পূর্বে কোরআনে কারিম যে কোনো লিপি পদ্ধতিতে লেখা বৈধ ছিলো। কিন্তু হজরত উসমান (রা.) একটি মারাত্মক ফিতনার দ্বার রুদ্ধ করার লক্ষ্যে গোটা উম্মতকে একটি লিপি পদ্ধতির ওপর একত্রিত করে দিয়েছেন এবং অন্যান্য লিপি পদ্ধতি লেখা না জায়েয সাব্যস্ত করেছেন। উম্মতের ইজমা যার ওপর সংঘটিত হয়েছে। কেউ এ সম্পর্কে এ প্রশ্ন করতে পারে যে, ওয়াজিব নয় এমন একটি বিষয়কে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হলো কিভাবে? সম্পূর্ণ এ ব্যাপারই তাকলিদে শখসির যে, একটি বিরাট ফিতনার দ্বার রুদ্ধ করার জন্য এটাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে।

তাকলিদের বিভিন্ন স্তরসমূহ

এই পর্যন্ত সাধারণ তাকলিদ প্রমাণ করা হয়েছে। মুকাল্লিদ বা অনুসারীর এলমি যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য করলে অবশ্য তাকলিদের বিভিন্ন স্তর হয়ে থাকে। এসব স্তর সম্পর্কে অনুধাবন না থাকার কারণে কোনো কোনো সময় চরমপন্থা ও শিথিলপন্থা অবলম্বন করা হয়। এই স্তর পার্থক্য সংক্রান্ত জ্ঞান না থাকার ফল গায়রে মুকাল্লিদদের বেশির ভাগ প্রশ্ন। এজন্য স্মরণ রাখা চাই যে, তাকলিদের রয়েছে চারটি স্তর। যেগুলোর বিধিবিধান ভিন্ন ভিন্ন।

১. সাধারণ লোকের তাকলিদ : সর্বপ্রথম স্তর সাধারণ লোকের তাকলিদের। সাধারণ লোক দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য তিন ধরনের লোক।

এক. যারা আরবি ও ইসলামি জ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। চাই অন্য কোনো বিদ্যায় যতোই পারদর্শী হোক না কেনো।

দুই. যারা আরবি ভাষা ভালো জানেন। কিন্তু তারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইসলামি শিক্ষা গ্রহণ করেননি।

তিন. প্রথাগতভাবে যারা এলেম অর্জন করে অবসর হয়েছেন। কিন্তু ইসলামি বিদ্যায় তাদের অন্তর্দৃষ্টি, পারদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়নি। এই তিনটি দলের হুকুম হলো, তাদের ওপর সর্বাবস্থায় তাকলিদই ওয়াজিব। নিজ ইমাম অথবা মুফতির বক্তব্য থেকে তাদের বেরিয়ে আসা বৈধ নেই। চাই তাঁর কোনো বক্তব্য

তাদের নিকট বাহ্যত হাদিসের পরিপন্থীই মনে হোক না কেনো। বাহ্যত এ বিষয়টি বিস্ময়কর মনে হয় যে, মানুষের সামনে একটি হাদিস থাকবে আর সে একটি বর্জন করে নিজ ইমাম অথবা মুফতির বক্তব্যের ওপর আমল করবে। কিন্তু যে জনসাধারণের কথা আমরা আলোচনা করছি তাদের জন্য এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কেনোনা, তারা কোরআন হাদিসের প্রমাণাদি নিয়ে গভীর চিন্তা ও সিদ্ধান্তের যোগ্য নয়। অনেক সময় কোরআন ও হাদিসের বাহ্যিক অর্থ একটি হয়ে থাকে, সেদিকে বিবেক দ্রুত ধাবমান।

কিন্তু এর প্রয়োগ ক্ষেত্র অন্যান্য প্রমাণের আলোকে অন্য কিছু হয়ে থাকে। তখন এ ধরনের জনসাধারণকে যদি এর অনুমতি দেওয়া হয় যে, সে কোনো হাদিস নিজ ইমামের বক্তব্যের পরিপন্থী পেলে ইমামের বক্তব্য বর্জন করবে, তাহলে এর ফল বেশির ভাগ সময় মারাত্মক গোমরাহি ছাড়া আর কিছু হবে না। এজন্য এভাবে অসংখ্য লোক পথভ্রষ্ট হয়েছে। যেমন, কেউ কেউ কোরআনের আয়াত ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله (পূর্ব পশ্চিম আল্লাহরই। অতএব, যেদিকে তোমরা মুখ ফেরাও সেখানে আল্লাহ রয়েছেন।) দ্বারা প্রমাণ পেশ করে নামাজের মধ্যে কেবলা রুখ হওয়া ফরজ– এ বিষয়টিকেই অস্বীকার করে বসে, অথবা যেমন হাদিসে لا وضوء الا من صوت او ريح (আওয়াজ অথবা দুর্গন্ধ অনুভব করা ছাড়া ওজুর প্রয়োজন নেই।) একজন সাধারণ ব্যক্তি এর স্বতঃসিদ্ধ অর্থের ওপর আমল করে যদি ইমামগণের বক্তব্য বর্জন করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। এজন্য ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি রোজা অবস্থায় সিংগা লাগায় এবং افطر الحاجم والمحجوم (যে ডুস গ্রহণ করবে ও ডুস লাগাবে তাদের উভয়েরই রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়।) হাদিস দেখে রোজা ভেঙে ফেলে তাহলে তার ওপর কাফ্ফারা ওয়াজিব। আর যদি কোনো মুফতি তাকে ভুল মাসআলা বলেন যে, সিংগা লাগানোর ফলে রোজা ভেঙে যায়, আর এ কারণে সে খাওয়া-দাওয়া করে, পান করে তাহলে তার ওপর কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়। তিনি এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন,

لان على العامى الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء فى حقه الى معرفة الاحاديث كذا فى الهداية (ج١، ص٢٢٦ باب مايوجب القضاء والكفارة)

কেননা ফুকাহায়ে কেরামের ইকতিদা করা একজন সাধারণ ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব। কারণ, হাদিস সম্পর্কে তার জ্ঞান নেই।'

২. বড় আলেমের তাকলিদ : দ্বিতীয় স্তর, বড় আলেমের তাকলিদ। বড় আলেম দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য এমন ব্যক্তি ইজতিহাদের স্তরে যিনি পৌঁছেননি, কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহর বিদ্যায় তাঁর পারদর্শিতা ও প্রচুর অন্তর্দৃষ্টি অর্জিত হয়েছে এবং কমপক্ষে নিজ মাজহাবের মাসয়ালাগুলো তার অন্তরে হাজির এবং এ সংক্রান্ত যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। এমন ব্যক্তির তাকলিদ জনসাধারণের তাকলিদ থেকে ভিন্নতর হয়ে থাকে। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি নিম্নেযুক্ত বিষয়াবলিতে স্বতন্ত্র থাকে,

এক. নিজ ইমামের মাজহাবে যদি বক্তব্য থাকে একাধিক তাহলে সেগুলোতে সামঞ্জস্য বিধানের অধিকারী হন।

দুই. ইমাম থেকে যেসব মাসায়িলে কোনো বক্তব্য স্পষ্টাকারে বর্ণিত নেই সেগুলোতে ইমামের মূলনীতি অনুসারে আহকাম উৎসারণ করেন।

তিন. কোনো কোনো সময় সাধারণ ও ব্যাপক লিপ্ততা এবং ভীষণ প্রয়োজনের অবস্থায় অন্য কোনো মুজতাহিদের বক্তব্যের ওপর ফতওয়া দেন, যার শরায়েত উসুলে ফতওয়ার কিতাবাদিতে রয়েছে।

ইমামের কোনো বক্তব্য এমন ব্যক্তির নিকট যদি কোনো সহিহ এবং স্পষ্ট হাদিসের পরিপন্থী মনে হয় এবং এর বিরোধী অন্য কোনো হাদিসও না থাকে এবং ইমামের বক্তব্যের ওপর তাঁর অন্তর উন্মুক্ত না হয় (প্রশান্ত না হয়) তবে এমতাবস্থায় তিনি ইমামের বক্তব্য ছেড়ে হাদিসের ওপর আমল করেন। যেমন, বর্গাচাষের মাসআলায় হানাফি মাশায়েখে কেরাম ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর বক্তব্য বর্জন করেছেন। এমনভাবে চার প্রকার শরাব ছাড়া

অন্যান্য শরাবের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে নেশা সৃষ্টিকারক পরিমাণ থেকে কম পান করা শক্তি অর্জনের উদ্দেশে জায়েজ। কিন্তু তাঁর বক্তব্য বর্জন করেছেন হানাফি মাশায়েখে কেরাম সুস্পষ্ট হাদিসসমূহের ভিত্তিতে।

৩. মুজতাহিদ ফিল মাজহাবের তাকলিদ প্রসঙ্গে : তৃতীয় পর্যায় হলো মুজতাহিদ ফিল মাজহাবের তাকলিদ। মুজতাহিদ ফিল মাজহাব তাঁকেই বলা হয়, যিনি সাধারণ ইজতেহাদের পর্যায়ে উপনীত নন। অর্থাৎ, প্রমাণ পেশের মূলনীতি নিজে তৈরি করতে পারেন না, কিন্তু প্রমাণের মূলনীতির আলোকে আহকাম উৎসারণ করতে সক্ষম। এমন ব্যক্তি মূলনীতিতে মুকাল্লিদ হন, আর শাখাগত বিষয়ে হন মুজতাহিদ। যেমন, ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, জুফার, শাফেয়িদের মধ্যে ইমাম আবু সাউর, মুজানি, মালেকিদের মধ্যে সাহনুন ইবনুল কাসিম, হাম্বলিদের মধ্যে খরকি, আবু বকর আল-আছরাম প্রমুখ।

৪. সাধারণ মুজতাহিদের তাকলিদ প্রসঙ্গে : সাধারণ মুজতাহিদকেও তাকলিদের সর্বশেষ স্তর অবলম্বন করতে হয়। যদিও তিনি মুজতাহিদ হন, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাকেও তাকলিদ করতে হয়। অর্থাৎ যেসব স্থানে কোরআনের স্পষ্ট কোনো বিবরণ না থাকে সেখানে মুজতাহিদ ইমামগণ সাধারণত এমন করে থাকেন যে, নিজের রায় ও কিয়াসের ওপর আমলের পরিবর্তে স্বীয় পূর্ববর্তীগণের মধ্য হতে কারো বক্তব্য অবলম্বন করেন। যেমন, ইমাম আবু হানিফা (র.) সাধারণত ইমাম ইবরাহিম নাসায়ি (র.)-এর বক্তব্যের অনুসরণ করেন। ইমাম শাফেয়ি (র.) অধিকাংশ সময় ইবনে জুরাইজের বক্তব্যের ওপর আমল করেন। ইমাম মালেক (র.) ফুকাহায়ে মদিনার কারো অনুসরণ করেন।

তাকলিদের ওপর উত্থাপিত আপত্তিসমূহ

াকলিদকে কেউ কেউ নিম্নেযুক্ত আয়াতের সংগে মিলিয়ে দেন,

واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا .

'আর তাদের যখন বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ কর। তখন তারা বলে,'বরং আমরা অনুসরণ করবো আমাদের পিতা-প্রপিতাদের যার ওপর পেয়েছি তার।' –সূরা বাকারা : ১৬৯

এর জবাব কিন্তু স্পষ্ট। প্রথমত এ জন্য যে, এই আয়াতে কোরআনে কারিম যার অনুসরণের নিন্দা করেছে সেটি ছিলো, ঈমান সংক্রান্ত বিষয়াবলিতে। পূর্বে বলা হয়েছে, ঈমান সংক্রান্ত বিষয় এবং অকাট্য বিষয়াবলি তাকলিদের স্থান নয়। দ্বিতীয়ত তারা ما انزل الله তথা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নাজিলকৃত বিষয় থেকে বিমুখ হয়ে নিজের পিতা-প্রপিতাদের আমলকে এর মুকাবিলায় প্রমাণ স্বরূপ পেশ করতো। আর ইমামের মুকাল্লিদ যারা, তারা আল্লাহ কর্তৃক নাজিলকৃত বিষয় থেকে বিমুখ হয় না; বরং এর ব্যাখ্যার জন্য মুজতাহিদের বক্তব্যের ওপর নির্ভর করে– মুজতাহিদের বক্তব্যকে স্বতন্ত্র প্রমাণ মনে করে না। আল্লামা ইবনে নুজাইম প্রমুখ এজন্য তাকলিদের সংজ্ঞা দিয়েছেন নিম্নেযুক্ত ভাষায়,

العمل بقول من ليس قوله من احدى الحجج بلا حجة .

'প্রমাণ ছাড়া যার বক্তব্য কোনো দলিল নয় তার কথা মতো আমল করা।'

তৃতীয়ত : কোরআনে কারিম পিতা-প্রপিতাদের অনুসরণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণও পরবর্তীতে বর্ণনা করেছে। সেটি হলো,

او لو كان اباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون .

'তাহলে কী তাদের পিতা-প্রপিতা কিছু না বুঝলেও এবং সুপথ প্রাপ্ত না হলেও? (তাদের অনুসরণ করবে?)
–সূরা বাকারা : ১৬৯

এ থেকে বোঝা গেলো যে, মূল কারণ, তাদের বিবেকসম্পন্ন ও হিদায়াতপ্রাপ্ত না হওয়া। আর চার ইমাম সম্পর্কে স্বয়ং গায়রে মুকাল্লিদও স্বীকার করে যে, তারা ছিলেন জ্ঞানী এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত।

২. জামে তিরমিযী : (২/১৫৮, ابواب التفسير، سورة التوبة)-তে হজরত আদি ইবনে হাতেম (রা.)-এর বর্ণনা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোরআনের আয়াত اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله এর ব্যাখ্যায় বলেছেন,

اما انهم لم يكونوا يعبدونهم لكنهم كانوا اذا احلولهم شيئا استحلوه واذا حرموا عليهم شيئا حرموه ـ

'মনে রেখ, তারা তাদের এবাদত করতো না। কিন্তু তারা যখন কোনো কিছুকে হালাল করে দিতো তারা সেটাকে মনে করতো হালাল। আর যখন তাদের কোনো জিনিস হারাম করে দিতো তখন তারা সেটাকে মনে করতো হারাম।'

এর জবাব হলো, কিতাব স্বীয় ওলামাকে শুধু ব্যাখ্যাতাই নয়; বরং আইন বা বিধানদাতা তথা শরিয়ত প্রবর্তক এবং কানুন প্রবর্তক সাব্যস্ত করেছে। এজন্য আজকেও রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের গ্রন্থরাজিতে এসব সুস্পষ্ট বিবরণ আছে যে, পোপের জন্য আইন প্রণয়ন ও শরিয়ত প্রণয়নের পূর্ণ এখতিয়ার আছে। তাছাড়া সে শরিয়ত সম্পর্কে যখন কোনো আইন বাস্তবায়ন করে, তখন অপরাধ থেকে নিষ্পাপ থাকে। এর পরিপন্থী আয়িম্মায়ে মুজতাহিদিনকে না কেউ নিষ্পাপ মনে করে, না তাদেরকে আইন প্রণেতা সাব্যস্ত করে। তাইতো বড় আলেমগণ তাদের বক্তব্যকে কোনো কোনো সময় বর্জনও করেন। যেমনটি আলোচিত হয়েছে পূর্বে।

৩. তাকলিদের বিরুদ্ধে কেউ কেউ এই প্রমাণ পেশ করেন যে, কোরআনে কারিমে রয়েছে, ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر (আমি কোরআনকে উপদেশের জন্য সহজ করে দিয়েছি। আছে কি কেউ স্মরণকারি? –সূরা কামার : ১৮ যা থেকে বোঝা যায়, কোরআনে কারিম সম্পূর্ণ সহজ। অতএব, এটার বিধিবিধান বোঝার জন্য কোনো মুজতাহিদের তাকলিদের প্রয়োজন নেই।

জবাব সম্পূর্ণ স্পষ্ট। সেটি হচ্ছে, কোরআনের আয়াত দুই প্রকার–

এক. আহকাম সম্বলিত। দুই. সেসব আয়াত যেগুলোর উদ্দেশ্য নসিহত ও উপদেশ। এই দ্বিতীয় প্রকার আয়াতগুলো সম্পূর্ণ সহজ। প্রতিটি ব্যক্তি এগুলো থেকে উপদেশ অর্জন করতে পারে। অতএব, ওপরযুক্ত আয়াতে এই দ্বিতীয় প্রকারের বিবরণ রয়েছে। যার প্রমাণ, সেখানে কোরআনে কারিমে স্বয়ং للذكر-এর শর্ত আরোপ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতেও আল্লাহ তা'আলা فهل من مدكر (আছে কি কেউ উপদেশ গ্রহণকারি?) বলেছেন فهل من مستنبط (আছে কি কেউ মাসআলা উৎসারণকারী?) নয়।

এতোটুকু আলোচনা যথেষ্ট যে, এই মাসআলার অতিরিক্ত বিস্তারিত ও তাত্ত্বিক বিবরণের জন্য নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলির শরনাপন্ন হলে এখানে উপকার হবে।

১. الاقتصاد فى التقليد والاجتهاد। হাকিমুল উম্মত হজরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি (র.)।

২. الاقتصاد فى التقليد والاجتهاد। হজরত মাওলানা খায়র মুহাম্মদ (র.)।

৩. انهاء السكن। ২য় খণ্ড– হজরত মাওলানা হাবিব আহমদ কিরানভি (র.)।

৪. سبيل الرشاد হজরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি (র.)।

৫. تقليد شخصى হজরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফি (র.)।

৬. এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলির সারনির্যাস এবং তুলনামূলক অধিক তাফসিল ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাথে অধমও একটি গ্রন্থ বিন্যস্ত করেছে। এটি মাকতাবা দারুল উলুম করাচি ১৪নং থেকে تقليد كى شرعى حيثيت নামে ছাপা হয়েছে।

সিহাহ সিত্তাহ সংকলনের উদ্দেশ্য ও শর্তাবলি

হাদিসের অগণিত কিতাব এমনিতে লেখা হয়েছে। কিন্তু ছয়টি গ্রন্থগুলোর মাঝে উৎসের মর্যাদা রাখে। যেগুলোকে 'আল-উম্মাহাতুস্ সিত্তা' অথবা 'আল-উসুলুস্ সিত্তা' কিংবা বলা হয় صحاح ستة। 'সিহাহ সিত্তাহ' নামে কেউ কেউ মনে করেন এগুলোর প্রত্যেকটি হাদিস সহিহ! আর কেউ মনে করেন যে, এগুলো ছাড়া কোনো হাদিস সহিহ নয়। কিন্তু এ দুটি বক্তব্যই ভুল। বাস্তব ঘটনা হলো, না 'সিহাহ সিত্তাহ'-এর প্রতিটি হাদিস বিশুদ্ধ আর না এগুলোর বাইরে প্রতিটি হাদিস জয়িফ; বরং صحاح ستة পরিভাষার অর্থ হলো, যে ব্যক্তি এই ছয়টি কিতাব পড়ে নিবে তাঁর সামনে দীনের মৌলিক বিষয় সংক্রান্ত সহিহ বর্ণনাগুলোর একটি বিশাল ভাণ্ডার এসে যাবে। দীনি ব্যাপারে যেগুলো যথেষ্ট।

প্রথম দিকে পরিভাষা প্রসিদ্ধ ছিলো صحاح خمسة বা পঞ্চ সহিহ-এর। ইবনে মাজাহকে সিহাহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এ কারণে ইমাম আবু বকর হাজেমি (র.) شروط الائمة الخمسة (শুরূতুল আয়িম্মাতিল খামসা) রচনা করেছেন। এ কারণে আল্লামা ইবনে আছির জাজরি (র.) জামিউল উসুলে ইবনে মাজাহকে অন্তর্ভুক্ত করেননি। কিন্তু পরবর্তীতে অধিকাংশ আলেম ইবনে মাজাহকে এর সুন্দর বিন্যাসের ভিত্তিতে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইবনে মাজাহ-এর পরিবর্তে কেউ কেউ মুয়াত্তা ইমাম মালেককে, আর কেউ কেউ 'সুনানে দারেমি'কে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে অবশেষে গ্রহণযোগ্যতা ইবনে মাজাহই লাভ করেছে। এজন্য এখন সিহাহ সিত্তাতে এটাকেই শামিল মনে করা হয়।

সিহাহ সিত্তার লেখকদের লেখার উদ্দেশ্য একেকজনের একেক ধরনের। ইমাম বোখারি (র.)-এর সংকলনের উদ্দেশ্য হলো, সেসব সহিহ হাদিস থেকে ফিক্‌হি আহকাম, আকাইদ, সিরাত এবং তাফসির উৎসারণ করেন সেটিকে উল্লেখ করে দেন শিরোনামে। কোনো কোনো সময় তাঁর উৎসারণ এতো সূক্ষ্ম হয় যে, হাদিস এবং শিরোনামে সামঞ্জস্য বোঝা যায় না। এ কারণেই তিনি অনেক সময় এমন করে থাকেন যে, একটি দীর্ঘ হাদিসের বিভিন্ন টুকরো করে উল্লেখ করেন বিভিন্ন ধরনের শিরোনামের অধীনে। তাছাড়া তাঁর নিকট হাদিসের সবগুলো সূত্র এক স্থানে হয় না; বরং বিভিন্ন অধ্যায়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। এ কারণেই বোখারি থেকে কোনো হাদিস খোঁজ করা খুবই জটিল হয়ে থাকে। এর পরিপন্থী ইমাম মুসলিম (র.)-এর সংকলনের উদ্দেশ্য, এক বিষয়ের হাদিস সমস্ত সহিহ সূত্রগুলোর সাথে বিন্যস্ত আকারে একত্রিত করা। তাই কিতাবে এক বিষয়ের হাদিসগুলো একই স্থানে পাওয়া যায়। তার উদ্দেশ্য আহকাম উৎসারণের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।

কেনোনা তার গ্রন্থের শিরোনামগুলোও তিনি নিজে কায়েম করেননি; বরং পরবর্তীগণ তাতে বৃদ্ধি করেছেন। সুন্দর বিন্যাসের দিক দিয়ে ইমাম মুসলিম (র.)-এর গ্রন্থ অনুপম-বেনজির। হাদিস তালাশ করা এতে খুবই সহজতম।

বেশির ভাগ সনদের ত্রুটি বর্ণনা করা ইমাম নাসায়ি (র.)-এর সংকলনের উদ্দেশ্য। এজন্য তাঁর পদ্ধতি হলো, সাধারণত প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে এমন হাদিস উল্লেখ করেন যাতে তার মতে কোনো ত্রুটি থাকে। সেসব ত্রুটি বর্ণনা করার পর সেসব হাদিস উল্লেখ করেন যেগুলো তাঁর মতে বিশুদ্ধ; সাথে সাথে তাঁর সামান্য মনোযোগ আহকাম উৎসারণের দিকে থাকে। এ কারণে তাঁর শিরোনামগুলো বোখারির পর দ্বিতীয় নম্বরে, সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করলে এটা বোঝা যায়।

যেগুলো কোনো ফকিহ কোনো ফিকহি মাসআলার ক্ষেত্রে প্রমাণরূপে পেশ করেছেন তিনি এমন হাদিসগুলো সমস্ত সূত্রসহকারে একত্র করে দেন। ইমাম আবু দাউদ (র.)-এর সংকলনের উদ্দেশ্য সেসব হাদিস জমা করা। এ হিসেবে তাঁর পদ্ধতি ইমাম মুসলিম (র.)-এর মতোই। কিন্তু যেহেতু তিনি সমস্ত ফুকাহার প্রমাণগুলো উল্লেখ করেন, এজন্য ইমাম মুসলিম (র.)-এর ন্যায় সহিহ হাদিসের পাবন্দি করতে পারেননি; বরং তাঁর কিতাবে হাসান এবং জয়িফ হাদিসও এসে গেছে। অবশ্য তিনি দুর্বল ও মুজতারিব হাদিসের ওপর কালাম করার ব্যাপারেও অভ্যস্ত। তবে শর্ত হলো, দুর্বলতা বেশি হওয়া। তাই যে হাদিসে তিনি নীরবতা অবলম্বন করেন এর অর্থ হলো, সে

হাদিসটি তাঁর মতে প্রমাণযোগ্য। অবশ্য যদি কোনো সময় সামান্য দুর্বলতা থাকে তাহলে এটার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না; এর ওপর কালামও করেন না। ইমাম আবু দাউদ ইমাম নাসায়ি (র.)-এর পরিপন্থী বিশুদ্ধতম হয়ে থাকে। পরবর্তীতে সেসব বর্ণনা উল্লেখ করেন তাঁর মতে যেগুলো প্রাধান্য প্রাপ্ত নয়।

ইমাম নাসায়ি ও ইমাম আবু দাউদের পদ্ধতিগুলোকে একত্রিত করেছেন তিরমিযী (র.)। তাঁর সংকলনের উদ্দেশ্য প্রত্যেক ফকিহের দলিল স্বতন্ত্র অধ্যায়ে উল্লেখ করা। কিন্তু তিনি একটি আলোচ্য বিষয়ের সবগুলো হাদিস উল্লেখ করেন না; বরং প্রতিটি অধ্যায়ে সাধারণত শুধু একটি হাদিস নেন এবং হাদিসও যথাসম্ভব সেটি নির্বাচন করেন যেটি অন্য ইমামগণ বর্ণনা করেননি এবং এ আলোচ্য বিষয়ের অন্য হাদিসগুলোর দিকে وفى الباب عن فلان و فلان (এ অনুচ্ছেদে অমুক অমুক থেকে হাদিস রয়েছে।) লিখে বুঝিয়ে দেন।

তিনি ইমাম নাসায়ি (র.)-এর ন্যায় সনদের ত্রুটিগুলোর ব্যাপারে সতর্ক করে দেন। তাছাড়া ফুকাহায়ে কেরামের মাজহাব স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেন। তিরমিযীর অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যাবলির বিবরণ পরবর্তীতে আসবে স্বতন্ত্র আকারে। ইমাম ইবনে মাজাহ (র.)-এর পদ্ধতি ইমাম আবু দাউদের মতোই। পার্থক্য হলো, তাঁর নিকট সহিহ অথবা হাসান হওয়ার প্রতি এতোটা গুরুত্বারোপ হয় না, ইমাম আবু দাউদের নিকট যতোটা হয়ে থাকে।

সিহাহ সিত্তা সংকলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এটাই ছিলো, যা ওপরে বর্ণনা করা হলো। এবার দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, সিহাহ সিত্তার শর্তাবলি কী? অর্থাৎ, তাঁর নিজ গ্রন্থে কোনো হাদিস অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সামনে রেখেছেন কি কি শর্ত। একটি বড় জটিল প্রশ্ন এটি। কেনোনা, তাঁরা কোথাও তাঁদের শর্তাবলি স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেননি। অবশ্য পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম তাঁদের কিতাবাদি তালাশ করার পর তাদের কর্মপদ্ধতি থেকে সেসব শর্ত-শরায়েত উৎসারণ করেছেন এবং এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে দুটি পুস্তিকা প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত। ইমাম আবু বকর হাজেমি شروط الائمة الخمسة (শুরূতুল আয়িম্মাতিল খামসা) এবং হাফেজ আবুল ফজল মুকাদ্দাসির شروط الائمة الستة (শুরূতুল আয়িম্মাতিল সিত্তা)। আল্লামা জাহেদ আল-কাওসারি (র)-এ দু'টি পুস্তিকা স্বীয় টীকাসহ ছেপে দিয়েছেন। এ বিষয়ে এই পুস্তিকাগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পাঠক সমীপে এগুলোর সারনির্যাস পেশ করা হলো।

ইমাম বোখারি (র)-এর শরায়েত সবচেয়ে কঠোর। তাঁর মৌলিক শর্ত হলো, তিনি শুধু এমন হাদিস নিবেন যেগুলো সহিহের শরায়েতে উন্নীত পরিপূর্ণরূপে। আর তিনি রাবিদের পাঁচ তবকা বা শ্রেনি থেকে শুধু প্রথম শ্রেনির হাদিসগুলো স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেন। দ্বিতীয় শ্রেনির হাদিসগুলো কখনও কখনো শুধু সহায়ক প্রমাণ হিসেবে এনে থাকেন। ইমাম হাকেম (র.) বর্ণনা করেনে যে, ইমাম বোখারি (র.)-এর একটি শর্ত এটিও যে, সে হাদিসটি গরিব হবে না। অর্থাৎ, প্রতিটি শ্রেনিতে এর বর্ণনাকারি কমপক্ষে দু'জন থাকবেন। কিন্তু হাফেজ মুকাদ্দাসি ও ইমাম হাজেমি (র.) দু'জনই এ মত কঠোরভাবে রদ করেছেন। কারণ অনেক গরিব হাদিস সহিহ বোখারিতে রয়েছে; বরং বোখারির সর্বপ্রথম হাদিস انما الاعمال بالنيات ও গরিব। কারণ হজরত উমর (রা.) থেকে নিয়ে ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ আনসারি (র.) পর্যন্ত এর সবগুলো সূত্র মুতাফাররিদ বা একক। এমনভাবে كلمتان حبيبتان الى الرحمن -টিও বোখারির সর্বশেষ হাদিস গরিব।

ইমাম বোখারি (র.) এর একটি শর্ত হাফেজ মুকাদ্দাসি (র.) এই বর্ণনা করেছেন যে, তিনি শুধু সেসব রাবির হাদিস নেন যাদের নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে পুরো উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে। কিন্তু এ কথাটিও ঠিক নয়। এজন্য ইমাম হাজেমি (র.) এটিও প্রত্যাখ্যান করেছেন। বরং বাস্তব ঘটনা হলো, বোখারিতে ৮০ জন রাবি এমন রয়েছেন, যাদের ব্যাপারে কেউ না কেউ কালাম করেছেন। বিশেষত, ইমাম নাসায়ি (র.)। যেমন, খালেদ ইবনে মাখলাদ আল-কুতওয়ানি, আবু ইদরিস প্রমুখ। হ্যাঁ, এটি ঠিক যে, এই সমালোচনা ইমাম বোখারি (র.)-এর দৃষ্টিতে সঠিক নয়। অথবা সঠিক ছিলো, কিন্তু ইমাম বোখারি (র.) তাঁদের থেকে শুধু সে হাদিসগুলো নিয়েছেন যেগুলোতে সমালোচনার কারণ পাওয়া যায় না। যার বিস্তারিত বিবরণ হাকেমের নম্রতার কারণসমূহে পেছনে বর্ণিত হয়েছে 'নসবুর রায়াহ' সূত্রে।

সহিহের ব্যাপারে ইমাম মুসলিম (র.) যদিও বাধ্যবাধকতা রাখেন অর্থাৎ, কোনো হাদিসকে তাঁর গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এর বিশুদ্ধতাকে আবশ্যক সাব্যস্ত করেন, কিন্তু তাঁর শর্তগুলো ইমাম বোখারির তুলনায় নরম, যা স্পষ্ট হতে পারে তিনটি কারণে।

১. রাবিদের পাঁচ শ্রেনি হতে শুধু প্রথম শ্রেনি (যাদের স্মরণশক্তি শক্তিশালী, উস্তাদের সংসর্গ বেশি লাভ করেছেন তাঁদেরকে নিয়ে আসেন।) কখনও সহযোগিতার জন্য দ্বিতীয় শ্রেনিকেও ইমাম বোখারি (র.) উল্লেখ করেছেন। এর বিপরীতে ইমাম মুসলিম (র.) প্রথম দু'টি শ্রেনি অকৃত্রিমভাবে স্বভাবত নিয়ে আসেন। সহযোগিতার উদ্দেশে তৃতীয় শ্রেনিকেও গ্রহণ করেন। شروط الائمة الخمسة (শুরূতুল আয়িম্মাতিল খামসা) নামক গ্রন্থে আল্লামা হাজেমি (র.) এ প্রসঙ্গে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দিয়েছেন।

২. হাদিসে معنعن -এর বিশুদ্ধতার জন্য راوى এবং مروى عنه -এর সমকালীনতা যথেষ্ট, সাক্ষাৎ ও শ্রবণ প্রমাণিত হওয়া ইমাম মুসলিম (র.)-এর মতে আবশ্যক নয়। কিন্তু ইমাম বোখারি (র.) সাক্ষাৎ ও শ্রবণ প্রমাণিত হওয়াকে আবশ্যক সাব্যস্ত করেন।

৩. ইমাম বোখারি (র.) অপেক্ষা ইমাম মুসলিম (র.) রাবিদের পরখ করার ক্ষেত্রে নরম। তাই তিনি এমন বহু প্রশ্নসাপেক্ষ রাবিদের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যাদেরকে ইমাম বোখারি (র.) বর্জন করেছেন। যেমন, হাম্মাদ ইবনে সালামা, হাসান ইবনে সালেহ, আব্দুর রহমান ইবনুল আ'লা, আবু জুবায়র প্রমুখ। এর কারণ, হাফেজ মুকাদ্দাসি (র.) এই বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম মুসলিম (র.) এসব রাবিদের সম্পর্কে ভালোরূপে তাহকিক করার পর এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, তাদের ব্যাপারে সমালোচনা সঠিক নয়। মোটকথা, সহিহ বোখারির তুলনায় সহিহ মুসলিমে কালামকৃত রাবিদের সংখ্যা দ্বিগুণ, তথা একশ ষাট জন।

সহিহ বোখারি-মুসলিমের সমস্ত হাদিস বাস্তবেও সঠিক কি না? এ ব্যাপারেও আলোচনা হয়েছে, ইমাম দারাকুতনি (র.) একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করেছেন, যাতে সহিহ বোখারি-মুসলিমের হাদিসগুলোর ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, বোখারি-মুসলিমের ২১০টি হাদিস বিশুদ্ধ নয়। তা থেকে ৩২টি হাদিসের ব্যাপারে সবাই একমত। আর ৭৮টি শুধু বোখারির, আর ১০০টি মুসলিমের। এমনভাবে সহিহ বোখারি, মুসলিমের কোনো কোনো হাদিস সম্পর্কে ইমাম ত্বাহাবি (র.)-ও প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। যেমন, تورك অধ্যায়ে হজরত আবু হুমাইদ সাইদি (রা.)-এর হাদিসটিকে ইমাম ত্বাহাবি (র.) দুর্বল বলেছেন। অথচ এটি সহিহ মুসলিমে বিদ্যমান আছে। তাছাড়া হাফেজ আব্দুল কাদির আল-কুরাইশি (র.) স্বীয় গ্রন্থ 'তাবাকাতে' এই মূলনীতিটি মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন যে, বোখারি-মুসলিমের প্রত্যেকটি হাদিস সহিহ। কিন্তু هدى السارى مقدمة فتح البارى গ্রন্থে হাফেজ ইবনে হাজার (র.) দারাকুতনি (র.)-এর এক একটি প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব দিয়ে সেসব হাদিসকে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন, যেগুলো বোখারি অথবা মুসলিমে এসেছে। মুহাদ্দিসিনে কেরামের ঝোঁকও এদিকে যে, সহিহ বোখারি-মুসলিমের প্রতিটি হাদিস সহিহ। অবশ্য এতোটুকু অবশ্যই যে, ইমাম দারাকুতনি (র.) কর্তৃক এসব হাদিসের ক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপনের কারণে এই হাদিসগুলো প্রশ্নসাপেক্ষ রয়েছে। সিহাহ সিত্তার অন্যান্য ইমামের শর্ত-শরায়েত সেগুলো, যেগুলো রাবিদের পঞ্চম শ্রেনির বিবরণে প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে। তাই রিজাল সম্পর্কে ইমাম অধিক কঠোর নাসায়ি ইমাম আবু দাউদ থেকে, ইমাম আবু দাউদ ইমাম তিরমিযী থেকে, ইমাম তিরমিযী ইবনে মাজাহ থেকে।

ইমাম তিরমিযী (র.)-এর পরিচয়

পূর্ণ নাম মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা ইবনে মুসা। আবু ঈসা তার উপাধি। দেশের সম্বন্ধে বুগী এবং তিরমিযী। আল্লামা বুকায়ি (র.) বলেন, তাঁর পিতা-প্রপিতাগণ মারভ শহরের অধিবাসী ছিলেন। তারপর খুরাসানের তিরমিয শহরে স্থানান্তরিত হয়ে যান। এটি ছিলো জায়হুনের তীরে একটি প্রসিদ্ধ শহর। এই শহরে বড় বড় ওলামা-মুহাদ্দিসিন জন্মলাভ করেছেন। এজন্য এটিকে مدينة الرجال (মদিনাতুর রিজাল) বা বহু মনীষীর

শহর বলা হতো। এই শহর থেকে কয়েক ফরসখ (তিন মাইল বা ১৮ হাজার মিটার দূরত্বকে এক ফরসখ বলে।) দূরে বূগ নামক একটি এলাকা আবাদ ছিলো। ইমাম তিরমিযী (র.) এই অঞ্চলেই জন্মগ্রহণ করেছেন। এজন্য তাঁকে বূগীও বলে আবার তিরমিযীও। কিন্তু যেহেতু বূগ তিরমিয অঞ্চলে অবস্থিত ছিলো এজন্য বেশি প্রসিদ্ধ হয়েছে তিরমিযী সম্বন্ধটি।

তিরমিয শব্দটির উচ্চারণে কয়েকটি বক্তব্য রয়েছে, এক) তুরমুজ, অর্থাৎ, ت এবং م-এ পেশ সহকারে। দুই) তারমিজ, ت-তে যবর م-এ জের সহকারে। তিন) তারমাজ, তথা ت এবং م-এ যবর সহকারে। চার) তিরমিজ, ت এবং م-এ যের সহকারে। এই সর্বশেষ বক্তব্যটি বেশি প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য।

ইমাম তিরমিযী (র.)-এর জন্ম ২০৯ হিজরি। কেউ বলেছেন ২০০ হিজরি। কিন্তু প্রথম বক্তব্যটি অধিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত। সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর ওফাত হয়েছে ২৮৯ হিজরিতে। হজরত শাহ সাহেব (র.) তাঁর জন্ম ও ওফাত তারিখ একত্রিত করেছেন কাব্যের একটি ছন্দে।

عطر مداه وعمره فى عين (ع)

এতে عطر শব্দের সংখ্যা হয় ২৭৯। এটি হলো তাঁর ওফাতের তারিখ। আর ع-এর মূল্যায়ন সংখ্যা হলো, ৭০। এটি তাঁর মোট বয়স।

প্রথমে নিজের দেশে থেকেই ইমাম তিরমিযী (র.) এলেম অর্জন করেছেন। তারপর হিজাজ, মিসর, শাম, কূফা, বসরা, খুরাসান এবং বাগদাদ ইত্যাদি স্থানে এলেম অন্বেষণের উদ্দেশে সফর করেছেন। সমকালীন হাদিসের বড় বড় উস্তাদদের নিকট থেকে তিনি এলেম অর্জন করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম বোখারি, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ সিজিস্তানি, আহমদ ইবনে মানি', মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার, হান্নাদ ইবনুস্‌ সারি', কুতাইবা ইবনে সায়িদ, মাহমুদ ইবনে গায়লান, ইসহাক ইবনে মুসা আল-আনসারির ন্যায় বড় বড় মুহাদ্দিসিনও রয়েছেন। তাছাড়া ইমাম তিরমিযী (র.) আরও শত শত মুহাদ্দিসিন থেকে এলেম অর্জন করেছেন।

ওস্তাদ সবাই ইমাম তিরমিযী (র.)-এর খুব কদর করতেন। তাঁর খুবই বেশি সম্পর্ক ছিলো ইমাম বোখারি (র.)-এর সাথে। কোনো কোনো বর্ণনাতে আছে, এক জায়গায় ইমাম বোখারি (র.) ইমাম তিরমিযী (র.)কে লক্ষ্য করে বললেন, ما انتفعت بك اكثر مما انتفعت بى.... তথা, তুমি আমার দ্বারা যতোটুকু উপকৃত হয়েছো, তার চেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছি তোমার দ্বারা আমি। হজরত শাহ সাহেব (র.)-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এই বাক্যটির অর্থ হলো, যদি ছাত্র মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন হয়, তাহলে উস্তাদ তাকে পড়ানোর জন্য পরিশ্রম বেশি করেন, যার ফলে উস্তাদের ফায়দা হয় অনেক।

ইমাম তিরমিযী (র.) এই গর্বেরও অধিকারী ছিলেন যে, কোনো কোনো হাদিসে তিনি তার উস্তাদ ইমাম বোখারি (র.)-এরও উস্তাদ। অর্থাৎ, কয়েকটি হাদিস স্বয়ং ইমাম বোখারি (র.) তাঁর কাছ থেকে শুনেছেন। ইমাম তিরমিযী (র.) জামে' তিরমিযীতে এমন দুটি হাদিসের কথা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম বোখারি (র.) এগুলো শুনেছেন আমার কাছ থেকে। একটি হাদিস غيرى وغيرك, হজরত আলি (রা.)-কে রাসূলে আকরাম ﷺ বললেন,

لا يحل لاحد ان يجنب فى هذا الحديث واستغربه .

'এ মসজিদে আমি আর তুমি ছাড়া অপবিত্র অবস্থায় অবস্থান করা অন্য কারো জন্য জায়েজ নেই।'

ইমাম তিরমিযী (র.) এই হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেছেন,

وقد سمع محمد بن اسمعيل منى هذا الحديث واستغربه .

"মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল অর্থাৎ, ইমাম বোখারি (র.) এ হাদিসটি আমার কাছ থেকে শুনেছেন এবং এটিকে মনে করেছেন গরিব।" এমনভাবে তাফসির পর্বে সূরা হাশরের ব্যাখ্যায় একটি হাদিস এসেছে, সেখানে ইমাম তিরমিযী (র.) এ ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযী (র.) ছিলেন অসাধারণ স্মরণশক্তির অধিকারী। এ প্রসঙ্গে তাঁর কয়েকটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। হজরত শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলবি (র.) 'বুস্‌তানুল মুহাদ্দিসিন' নামক গ্রন্থে তার এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর নিকট কোনো উস্তাদের দু'টি সহিফা তথা গ্রন্থ এসে পৌঁছেছিলো ইজাজতরূপে। একবার তিনি সফরে ছিলেন। পথিমধ্যে কোনো স্থানে সেই শায়খের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। ইমাম তিরমিযী (র.) ভাবলেন, যে সহিফা দুটি ইজাজতরূপে তাঁর কাছে পৌঁছেছে সেগুলো উস্তাদের কাছে থেকে অর্জন করবেন কেরাতরূপে। ফলে তিনি উস্তাদের নিকট সে অংশগুলো পাঠ করার দরখাস্ত করলেন। শায়খ দরখাস্ত মঞ্জুর করলেন। বললেন, সে অংশগুলো নিয়ে এসো। ইমাম তিরমিযী (র.) নিজের হাওদায় গিয়ে সে সব অংশ নিজের আসবাবপত্রে তালাশ করে পেলেন না। জানতে পারলেন, সে অংশ রয়ে গেছে বাড়িতে। সেগুলোর স্থলে রেখে দেয়া হয়েছে সাদা কাগজ। তিনি খুব পেরেশান হলেন। অতঃপর বুদ্ধি করে সেই সাদা কাগজগুলো নিয়ে শায়খের খেদমতে পৌঁছে গেলেন। শায়খ হাদিসগুলো পড়তে আরম্ভ করলেন। ইমাম তিরমিযী (র.) সাদা কাগজের ওপর গভীর দৃষ্টি জমিয়ে ভাব প্রকাশ করেছিলেন যে, লিখিত অংশগুলোর সাথে শায়খের কেরাত মিলাচ্ছেন। হঠাৎ সাদা কাগজের ওপর শায়খের দৃষ্টি পড়লো। তখন তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, اما تستحي مني - তুমি আমাকে লজ্জা করো না। তখন ইমাম তিরমিযী (র.) বিস্তারিত ঘটনা শুনিয়ে বললেন, আপনি যতোগুলো হাদিস শুনিয়েছেন সবগুলো আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। শায়খ শুনাতে বললেন। ইমাম তিরমিযী (র.) তখন শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সবগুলো হাদিস পরিপূর্ণ শুনালেন।

উস্তাদ বললেন, لعلك استظهرتها من قبل সম্ভবত তুমি এগুলো মুখস্থ করে রেখেছো পূর্বেই। ইমাম তিরমিযী (র.) বললেন, আপনি আমাকে এগুলো ছাড়া আরো কিছু হাদিস শুনান। শায়খ অতিরিক্ত চল্লিশটি হাদিস শুনালেন। ইমাম তিরমিযী (র.) তৎক্ষণাত শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সবগুলো হাদিস পরিপূর্ণরূপে পুনরাবৃত্তি করলেন। উস্তাদ এ অবস্থা দেখে একেবারে থ হয়ে গেলেন। বললেন, ما رأيت مثلك 'তোমার মতো মনীষী আমি আর দেখিনি।'

তাঁর আরেকটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে, এখনও পর্যন্ত যেটি কোনো কিতাবে নজরে পড়েনি। কিন্তু আমার অনেক উস্তাদ থেকে শুনেছি। সেটি হলো, ইমাম তিরমিযী (র.) অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর একবার উটের ওপর আরোহণ করে হজে তাশরিফ নিচ্ছেলেন। পথিমধ্যে এক জায়গায় চলতে চলতে তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে ফেললেন এবং অন্যান্য সাথিকেও এমন করার জন্য দিক নির্দেশনা দিলেন। সফর সঙ্গীগণ বিস্ময়াভিভূত হয়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন, ইমাম তিরমিযী (র.) বললেন, এখানে কি কোনো বৃক্ষ নেই? সঙ্গীগণ অস্বীকার করলেন। তখন ইমাম তিরমিযী (র.) ভীত হয়ে কাফেলাকে থামার নির্দেশ দিলেন। বললেন, বিষয়টির তত্ত্বানুসন্ধান করো। আমার স্মরণ আছে, দীর্ঘদিন পূর্বে যখন আমি এদিক দিয়ে গিয়েছিলাম, তখন এখানে একটি গাছ ছিলো, যার ডালগুলো বেশ ঝুলন্ত ছিলো এবং পথিকদের জন্য খুবই পেরেশানির কারণ ছিলো। মাথা ঝুঁকানো ব্যতিত এদিক দিয়ে অতিক্রম করা সম্ভব ছিলো না। সম্ভবত সে গাছটি কেউ কেটে ফেলেছে। যদি তা না হয় এবং প্রমাণিত হয়ে যায় যে, এখানে গাছ ছিলো না, তবে এর অর্থ হবে আমার স্মরণশক্তি দুর্বল হয়ে গেছে। অতএব আমি হাদিস বর্ণনা পরিহার করবো। লোকজন নিচে নেমে আশেপাশের লোকজনের নিকট তত্ত্বানুসন্ধান করলেন। লোকজন বললো, বাস্তবেই এখানে একটি গাছ ছিলো। গাছটি কেটে ফেলা হয়েছে পথিকদের পেরেশানির কারণ ছিলো বলে।

হজরত গাঙ্গুহি (র.) বলেছেন, ইমাম তিরমিযী (র.) মাতৃগর্ভ থেকে অন্ধ ছিলেন। কিন্তু হজরত শাহ সাহেব (র.) প্রমুখ বলেছেন, এই বক্তব্যটি ঠিক নয়; বরং তিনি শুরুতে অন্ধ ছিলেন না। তাঁর কোনো কোনো ঘটনা দ্বারা তা বোঝা যায়। হ্যাঁ, শেষ জীবনে আল্লাহর ভয়ের প্রবলতার কারণে বেশি কান্নাকাটি করতেন, যার ফলে চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে যায়, ইমাম তিরমিযী (র.)-এর উপনাম আবু ঈসা। এই উপনামে জামে' তিরমিযীতে নিজ বক্তব্যগুলো উল্লেখ করেন। কিন্তু এতে প্রশ্ন হয়েছে যে, এই উপনাম রাখা বৈধ কতোটুকু। মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বায় একটি বর্ণনা আছে, তাতে রাসূল (স.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আবু ঈসা উপনাম রাখতে নিষেধ

করেছেন। এর কারণে তিনি এই বর্ণনা করেছেন যে, ঈসা (আ.)-এর কোনো পিতা ছিলেন না। আর এই উপনাম দ্বারা ধর্ম বিশ্বাস নষ্ট হওয়ার সন্দেহ হয়। এখানে প্রশ্ন হয়, এই উপনাম কেনো অবলম্বন করলেন ইমাম তিরমিযী (র.)?

এই প্রশ্নের অনেক জবাব দেয়া হয়েছে। কেউ বলেছেন, ইমাম তিরমিযী (র.)-এর নিকট নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদিস পৌঁছেনি। কিন্তু এটি খুবই অযৌক্তিক যে, ইমাম তিরমিযী (র.)-এর ন্যায় হাফেজে হাদিসের নিকট এমন প্রসিদ্ধ হাদিস গোপন থেকে যাবে। এজন্য কেউ কেউ বলেছেন যে, এ হাদিস প্রযোজ্য অনুত্তমের ক্ষেত্রে, হারামের ক্ষেত্রে নয়। কিন্তু এ ব্যাপারেও সন্দেহ হয়, মুত্তাকিদের নিকট নাজায়েয এবং অনুত্তম উভয় প্রকার কাজ বর্জনীয় হয়ে থাকে সমানভাবে। ইমাম তিরমিযী (র.) তাকওয়া-পরহেজগারির যে স্তরে পৌঁছেছেন, সেখানে পৌঁছে বিনা কারণে এই অনুত্তম কাজে লিপ্ত হওয়া তাঁর জন্য অযৌক্তিক।

অনেকে জবাব দিয়েছেন, এই নিষেধ প্রযোজ্য মাকরূহে তানযিহীর ক্ষেত্রে। এজন্য ইমাম তিরমিযী (র.) এটাকে অসুবিধা মনে করেননি। কিন্তু ইমাম তিরমিযী (র.)-এর তাকওয়া পরহেজগারির কারণে এটাও অযৌক্তিক। অতএব উত্তম জবাব হলো, এ বিষয়ে ইমাম আবু দাউদ (র.) নিজ সুনানে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় কায়েম করেছেন। তাতে হজরত মুগিরা ইবনে শো'বা (রা.)-এর হাদিস উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর উপনাম রেখেছিলেন আবু ঈসা। হজরত উমর (রা.) এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করলে হজরত মুগিরা (রা.) বললেন, আমি এই উপনাম অবলম্বন করেছি রাসূল (স)-এর জীবদ্দশায়। তিনি তা জানতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি প্রত্যাখ্যান করেননি।

ইমাম তিরমিযী (র.)-এর মাজহাব এ হাদিসের ভিত্তিতে এটি হবে যে, এই উপনাম রাখা ইসলামের প্রাথমিক যুগে নিষিদ্ধ ছিলো আকিদা নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচার জন্য। যেনো 'মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা'র নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদিস ইসলামের প্রাথমিক যুগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তারপর ইসলামি বিশ্বাস মজবুত হয়ে যাওয়ার পর এই নিষেধাজ্ঞাও শেষ হয়ে যায়। বৈধতার হুকুম জানা যায় হজরত মুগিরা (রা.)-এর হাদিস দ্বারা।

সমকালীন ও পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম ইমাম তিরমিযী (র.) সম্পর্কে অনেক প্রশংসামূলক বক্তব্য করেছেন। যেগুলো 'তুহফাতুল আহওয়াজি' গ্রন্থকার স্বীয় কিতাবের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।

তিনটি গ্রন্থ আজ পর্যন্ত ইমাম তিরমিযী (র.)-এর স্মারক রূপে চলে আসছে।

১. তিরমিযী, ২. শামায়িল, ৩. কিতাবুল ইলাল।

তাছাড়া ফিহরিস্তে ইবনে নাদিম বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একটি ইতিহাস গ্রন্থও লিখেছেন। আল-বিদায়া ওয়ান্ নিহায়ায় হাফেজ ইবনে কাছির (র.) তাঁর জীবনীতে তাঁর একটি তাফসিরেরও উল্লেখ করেছেন। তবে বর্তমান তাঁর সে তাফসির ও তারিখ বর্তমানে পাওয়া যায় না।

মনে রাখতে হবে যে, তিন মহান ব্যক্তি তিরমিযী নামে প্রসিদ্ধ। ১. পূর্বে উল্লেখিত জামে' তিরমিযী গ্রন্থকার আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত্-তিরমিযী, ২. আবুল হোসাইন মুহাম্মদ ইবনুল হোসাইন আত-তিরমিযী। তিনিও মহান মুহাদ্দিসীনের অন্তর্ভুক্ত। বোখারিতে তাঁর একটি হাদিস বিদ্যমান রয়েছে, ৩. ইমাম হাকেম তিরমিযী (র.)। যিনি ছিলেন সুফি এবং মুয়াজ্জিন। যাঁর কিতাব নাওয়াদিরুল উসূলের আলোচনা পূর্বে এসেছে যে, এটি বেশির ভাগ জয়িফ হাদিস সম্বলিত।

جامع ترمذى ও তার বৈশিষ্ট্যাবলি

ইমাম তিরমিযীর جامع ترمذى প্রসিদ্ধ একটি গ্রন্থ। গোটা উম্মত সর্বসম্মতিক্রমে এটিকে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত মনে করেছেন। হাফেজ শামসুদ্দিন জাহাবি (র.) লিখেছেন যে, ইমাম তিরমিযী জামে' তিরমিযী সংকলনের পর তা খুরাসান, হিজাজ, মিসর ও শামের ওলামায়ে কেরামের নিকট পেশ করেন। যখন সেসব

ওলামায়ে কেরাম এটাকে পছন্দ করলেন ও এর প্রশংসা করলেন, তখন এর ব্যাপক প্রচার প্রসার করলেন। স্বয়ং ইমাম তিরমিযী (র.)-এর বক্তব্য রয়েছে,

من كان عنده هذا الكتاب الجامع فكأن عنده نبيا يتكلم .

'এই সার্বজনীন গ্রন্থটি যার কাছে থাকবে তার কাছে যেনো নবী ﷺ কথা বলছেন।'

এই কিতাবে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় যা অন্যান্য কিতাবে নেই।

১. এই গ্রন্থটি একই সময় জামে'ও এবং সুনানও। কারণ, এটি ফিকহি তারতিবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

২. এই কিতাবে হাদিসের পুনরাবৃত্তি নেই।

৩. এতে ইমাম তিরমিযী (র.) সমস্ত ফুকাহার মৌলিক প্রমাণাদি সংকলন করেছেন এবং প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র অধ্যায় কায়েম করেছেন।

৪. প্রতিট অধ্যায়ে ইমাম তিরমিযী (র.) ফুকাহায়ে কেরামের মাযহাব বাধ্যতামূলক বর্ণনা করেছেন। যার ফলে এ কিতাবটি হাদিসের সাথে সাথে ফিক্‌হেরও উল্লেখযোগ্য একটি ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে।

৫. ইমাম তিরমিযী (র.) প্রতিটি হাদিস সম্পর্কে এর সনদের স্তরও উল্লেখ করেন। সনদের দুর্বলতা বিস্তারিতভাবে চিহ্নিত করেন।

৬. প্রতিটি অধ্যায়ে এক অথবা দু'তিনটি হাদিস উল্লেখ করেন এবং সেসব হাদিস মনোনীত করেন, যেগুলো সাধারণত অন্যান্য ইমাম বর্ণনা করেননি। কিন্তু সাথে সাথে وفى الباب عن فلان و فلان বলে সেসব হাদিসের দিকে ইঙ্গিত করেন যেগুলো এ অধ্যায়ে আসতে পারে। এ তাই অনেক আলেম শুধু ইমাম তিরমিযীর وفى الباب-এর হাদিসগুলো সনদ-বরাতসহ বর্ণনা করার জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন।

৭. হাদিস দীর্ঘ হয়, ইমাম তিরমিযী তাহলে সাধারণত উল্লেখ করেন শুধু সে অংশ যেটি অনুচ্ছেদের সাথে সংশ্লিষ্ট। তিরমিযীর হাদিসগুলো তাই সংক্ষিপ্ত ও ছোট। এগুলো রাখাও সহজ।

৮. কোনো হাদিসের সনদে যদি কোনো ত্রুটি বা ইজতেরাব (গড়মিল-গোলমাল) থাকে, ইমাম তিরমিযী (র.) তাহলে সবিস্তারে এর বিশ্লেষণ বর্ণনা করেন।

৯. তিনি অস্পষ্ট রাবিদের পরিচয়ও করিয়ে দেন। বিশেষত যে রাবি নামে প্রসিদ্ধ তাঁর উপনাম, আর যিনি উপনামে প্রসিদ্ধ তাঁর নাম বর্ণনা করেন যাতে অস্পষ্টতা না থাকে। কোনো কোনো সময় এর ওপরও আলোচনা করেন যে, ছাত্র রাবি কর্তৃক উস্তাদ বর্ণনাকারির কাছ থেকে শ্রবণ প্রমাণিত কী না?

১০. জামে' তিরমিযীর তারতিব খুবই সহজ। এর শিরোনামগুলোও অনেক সহজ। তিরমিযী থেকে হাদিস তালাশ করাও খুবই সহজ।

১১. এর সমস্ত হাদিস কোনো না কোনো ফকিহের নিকট আমলের বিষয় এই গ্রন্থের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। শুধু দুটি হাদিস সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন যে, এগুলোর ওপর কারো মতে আমল হয় না। একটি হলো, বিনা ওজরে দুই নামাজ একত্রিতকরণ প্রসঙ্গে[১]। অপরটি হলো, মদ্যপায়ীকে হত্যা করা প্রসঙ্গে[২]। কিন্তু বাস্তবতা হলো, হানাফিদের নিকট এ দুটি হাদিসের ওপর আমল করা হয়। কেনোনা হানাফিগণ প্রথম হাদিসটিকে বাহ্যত প্রয়োগ করেন একত্রে আদায়ের ক্ষেত্রে, আর দ্বিতীয়টি শাসনের ক্ষেত্রে।

১২. যদিও সাধারণত জামে' তিরমিযীকে বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে নাসায়ি ও আবু দাউদের পর মনে করা হয়, কিন্তু হাজি খলিফা 'কাশফুজ্ জুনুনে' এটাকে সিহাহ সিত্তার মধ্যে সহিহ বোখারি-মুসলিমের পর সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। তাছাড়া হাফেজ ইবনে হাজার (র.) 'তাকরিবুত্ তাহজিবে' সিহাহ সিত্তার যেসব নির্ঘণ্ট নির্ধারণ

টীকা- ১. তিরমিযী : ১/৪৭. باب ماجاء فى الجمع بين الصلوتين

টীকা- ২. তিরমিযী : ১/২০৯, ابواب الحدود . باب ما جاء فى شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فى الرابعة فاقتلوه .

করেছেন, সেখানে এটাকে আবু দাউদ ও নাসায়ির মধ্যখানে রেখেছেন। হাফেজ জাহাবি (র.) লিখেছেন, সহিহ বোখারি ও মুসলিমের পর সর্বোচ্চ স্থান পাওয়া দরকার ছিলো জামে' তিরমিযীর। কিন্তু এর মর্তবা এজন্য হ্রাস পেয়েছে যে, তাতে মাসলুব এবং কালবির ন্যায় রাবিদের রেওয়ায়াত এসে গেছে। কিন্তু ইমাম তিরমিযী (র.)-এর কর্মপদ্ধতি দেখলে 'কাশফুজ জুনুন' গ্রন্থকারের মতোই অধিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত মনে হয়। এর কারণ হলো, জামে' তিরমিযীতে দুর্বল রাবিদের হাদিস যদিও এসেছে, কিন্তু এমন স্থানে ইমাম তিরমিযী (র.) সেসব বর্ণনার দুর্বলতা সম্পর্কে সতর্কও করে দিয়েছেন। এজন্য তিরমিযীতে যেসব দুর্বল বর্ণনা এসেছে সেগুলো আশঙ্কামুক্ত পদ্ধতিতে এসেছে। ফলে এটি একটি আশঙ্কামুক্ত গ্রন্থ। এজন্য شروط الائمة الخمسة নামক গ্রন্থে ইমাম আবু বকর হাজেমি (র.) লিখেছেন, ইমাম তিরমিযী (র.)-এর শর্ত ইমাম আবু দাউদের তুলনায় আরও বেশি মজবুত চূড়ান্ত পর্যায়ের। কারণ, তিনি হাদিসের দুর্বলতা সম্পর্কে সতর্ক করেন। সুতরাং হাদিস তাঁর মতে শাহেদ ও মুতাবে'-এর অন্তর্ভুক্ত। আর আবু দাউদ ইত্যাদিতে এই পর্যায়ের বাধ্যবাধকতা নেই।[১]

১৩. সিহাহ সিত্তার পাঠদান হিসেবে এই কিতাবটির উল্লেখযোগ্য মর্যাদা রয়েছে যে, বড় বড় ওলামা বিশেষত ওলামায়ে দেওবন্দ ফিক্‌হ ও হাদিসের বিস্তারিত আলোচনা সবচেয়ে বেশি এই কিতাবে করেন এবং এই বৈশিষ্ট্যে এই গ্রন্থটি সহিহ বোখারির সমপর্যায়ের। হাদিসের কোনো কোনো উস্তাদের পাঠদান পদ্ধতিতে এর চেয়েও বেশি গুরুত্ব রাখে। নিঃসন্দেহে এসব বৈশিষ্ট্য প্রচলিত হাদিস গ্রন্থাবলিতে কোনো কিতাব جامع ترمذى সমকক্ষ না।

ইমাম তিরমিযীর হাদিসকে সহিহ ও হাসান বলা

হাদিস সহিহ ও হাসান সাব্যস্ত করার ব্যাপারে অনেক ইমাম তিরমিযী (র.)-কে হাকেমের মতো নরম সাব্যস্ত করেছেন। এজন্য তিরমিযী কর্তৃক হাসান ও সহিহ সাব্যস্ত করার কোনো মূল্য নেই। এর কারণ হাফেজ জাহাবি (র.) এই বর্ণনা করেন যে, ইমাম তিরমিযী (র.) এমন কোনো কোনো হাদিসকেও সহিহ সাব্যস্ত করেছেন যেগুলোর রাবি দুর্বল। আবার এমন কোনো কোনো হাদিসকে হাসানও সাব্যস্ত করেছেন, যেগুলোর রাবি অজ্ঞাত। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এমন স্থান খুবই কম। অধম তালাশ করেছে। গোটা জামে' তিরমিযীতে দশ/বারটি স্থান এমন আছে ইমাম তিরমিযী (র.) যেখানে হাদিস সহিহ সাব্যস্ত করেছেন; কিন্তু অন্যদের মতে সেটি দুর্বল। বাকি রইলো অজ্ঞাত রাবিদের হাদিসকে হাসান সাব্যস্ত করার ব্যাপার হতে পারে ইমাম তিরমিযী (র.)-এর নিকট সে বর্ণনাকারি অজ্ঞাত নন। সেসব রাবি সম্পর্কে তাঁর তাহকিক হয়ে গেছে। তাছাড়া ইমাম তিরমিযী (র.)-এর নিয়ম হলো, তিনি এমন হাদিসকে একাধিক সূত্রের কারণে হাসান সাব্যস্ত করেন যাতে কোনো রাবি দুর্বল অথবা এ হাদিসে সূত্রগত বিচ্ছিন্নতা বিদ্যমান। ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, একাধিক সূত্রের কারণে দুর্বল হাদিস হাসান লিগাইরিহিতে পরিণত হয়। অতএব, ইমাম তিরমিযী কর্তৃক হাসান সাব্যস্তকৃত প্রশ্নসাপেক্ষ হাদিস হাতে গণা কয়েকটি। এ কারণে ইমাম তিরমিযী (র.)-কে ঢালাওভাবে নরম সাব্যস্ত করা এবং হাকিমের কাতারে দাঁড় করানো ইনসাফ পরিপন্থী কাজ। বিশেষত যখন সেসব স্থানেও ব্যাখ্যা প্রদান সম্ভব। যেহেতু সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, হাদিস সহিহ অথবা জয়িফ সাব্যস্ত করার বিষয়টি একটি ইজতেহাদি ব্যাপার, যাতে মুহাদ্দিসিনের মতপার্থক্য হতে পারে। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, যদি কোনো হাদিস বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে ইমাম তিরমিযী (র.) একা হন, অন্য সব ইমাম জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন বলে বর্ণিত হয়, তাহলে এমতাবস্থায় উচিত অধিকাংশের বক্তব্য গ্রহণ করা।

টীকা- ১. আল্লামা কাওছারি (র.) শুরুতে হাজেমির ওপর হাশিয়ায় বলেন, ইমাম তিরমিযী (র.)-এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে যে, তিনি অধিকাংশ অধ্যায় শুরু করেন গরিব সনদবিশিষ্ট হাদিস দ্বারা। এটা কোনো দূষণীয় বিষয় নয়। কারণ, ইমাম তিরমিযী (র.) হাদিসে অবস্থিত ক্রটির বিশদ বিবরণ দিয়ে দেন। এজন্যই আপনি ইমাম নাসায়ি (র.) পাবেন, তিনি যখন হাদিসের সবগুলো সূত্র বর্ণনা করেন তখন প্রথমে ভুলটি দ্বারা সূচনা করেন। তারপর এর বিপরীত সঠিকটি উল্লেখ করেন। কিন্তু ইমাম আবু দাউদ (র.)-এর নজর মূলপাঠের দিকে বেশি থাকে। এজন্য তিনি সূত্রসমূহ এবং শব্দের পার্থক্য ও কোনো কোনো হাদিসে বিদ্যমান অতিরিক্ত বিষয় আর কোনোটিতে অবিদ্যমান এগুলো উল্লেখ করেন। অতএব, তাঁর দৃষ্টি ফিক্‌হি হাদিসের প্রতি বেশি। এজন্য সর্বপ্রথম সহিহ সনদ দ্বারা শুরু করেন। আবার বেশিরভাগ সময় ক্রটিযুক্ত সনদ পরিপূর্ণভাবেই বাদ দিয়ে দেন। -তা'লিকু শুরূতিল আয়িম্মাতিল খামসা : ৪৪

جامع ترمذی এবং موضوع হাদিস

এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে যে, جامع ترمذی -তে কোনো মওজু হাদিস আছে কি না। আল্লামা ইবনুল জাওজি (র.) 'মওজুআতে কুবরা'য় তিরমিযীর ২৩টি হাদিস সম্পর্কে জাল বলেছেন। কিন্তু পূর্বে জানা গেছে যে, ইবনুল জাওজি এ ব্যাপারে প্রয়োজনাতিরিক্ত কঠোর। তিনি সহিহ মুসলিম ও বোখারির হাম্মাদ শাকিরের একটি করে হাদিসকেও মওজু বলে ফেলেছেন। অতএব, তাহকিকি বক্তব্য হলো, জামে' তিরমিযীতে কোনো জাল হাদিস جامع ترمذی -তে নেই।

"القول الحسن فی الذب عن السنن" নামক গ্রন্থে আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি (র.) সেসব বর্ণনা সম্পর্কে তাহকিক করেছেন, যেগুলো সিহাহ সিত্তায় বিদ্যমান এবং ইবনুল জাওজি সেগুলোকে মওজু সাব্যস্ত করেছেন। সে গ্রন্থে তিনি তিরমিযীর সে ২৩টি হাদিস সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, এগুলোর একটিও সঠিক নয়। –'মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াজি' পৃষ্ঠা নং ১৮০-১৮১ থেকে সংক্ষেপিত।

جامع ترمذی ব্যাখ্যাগ্রন্থ

আল্লাহ তা'আলা جامع ترمذی অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন। ফলে এর বহু তাজরিদ ও মুস্তাখরাজ এবং টীকা লিপিবদ্ধ হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. عارضة الاحوذی بشرح جامع الترمذی : এটি হলো, কাজি আবু বকর ইবনুল আরাবি (র.) কর্তৃক লিখিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ। তিনি মালেকি মাযহাবের সুমহান ফকিহ ও মুহাদ্দিসগণের অন্তর্ভুক্ত। 'আহকামুল কোরআন' ও 'আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম' ইত্যাদির লেখক। এই ব্যাখ্যাটি মুতাকাদ্দিমীনের পদ্ধতি অনুসারে সংক্ষিপ্ত, তবে বহু এলমি ফায়দা সংবলিত। তিরমিযীর পরবর্তী শরাহ-শুরূহাতের উৎসের মর্যাদা রাখে। প্রমুখ প্রচুর পরিমাণে হাফেজ ইবনে হাজার (র.)-এর বরাত উল্লেখ করেন।

২. شرح ابن سید الناس : আল্লামা ইবনে সায়্যিদুন্ নাস অষ্টম শতাব্দির লেখক। তাঁর কিতাব "عیون الاثر" সীরাতে তায়্যিবা বিষয়ক উৎসের মর্যাদা রাখে। কাজি শাওকানি (র.) তাঁর সম্পর্কে "البدر الطالع فی اعیان القرن التاسع" নামক গ্রন্থে এবং الدرر الكامنة فی رجال المأة الثامنة নামক গ্রন্থে এবং হাফেজ ইবনে হাজার (র.) হাজি খলিফা 'কাশফুজ্ জুনুনে' বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তিরমিযীর একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু প্রায় দশ খণ্ডের মতো লিখেছিলেন এবং এক-তৃতীয়াংশ বাকি থাকা অবস্থায় তাঁর ওফাত হয়ে যায়। হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, তিনি যদি এই ব্যাখ্যা গ্রন্থটিকে উলুমে হাদিস পর্যন্ত সীমিত রাখতেন তাহলে এটি পূর্ণাঙ্গ হয়ে যেতো। কিন্তু তিনি বহু বিদ্যা তাতে সংকলন করতে আরম্ভ করেন। এজন্য আর বয়সে কুলিয়ে উঠেনি। পরবর্তীতে হাফেজ ইবনে হাজার (র.)-এর উস্তাদ হাফেজ জায়নুদ্দিন ইরাকি এই ব্যাখ্যা গ্রন্থটি সমাপ্ত করার কাজে হাত দেন। কিন্তু আল্লামা সুয়ুতি (র.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী তিনিও সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। অতএব, কখনো মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতে পারেনি এ বিস্তারিত ব্যাখ্যা গ্রন্থটি।

৩. شرح ابن الملقن : এটি আল্লামা সিরাজুদ্দিন ইবনুল মুলাক্কানের লেখা তিনি শাফেয়ি মতাবলম্বী আলেমদের অন্তর্ভুক্ত। সপ্তম শতাব্দির মহামনীষী এই ব্যাখ্যাটির আলোচনা কাজি "البدر الطالع فی اعیان القرن السابع" নামক গ্রন্থে কাজি শাওকানি (র.) করেছেন। এই শরাহটির মূল নাম نفع الشذی علی جامع الترمذی। এতে শুধু ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেসব হাদিসের, যেগুলো তিরমিযীতে সহিহ বোখারি ও মুসলিম এবং আবু দাউদ থেকে অতিরিক্ত।

৪. شرح الحافظ ابن حجر : হাফেজ ইবনে হাজার (র.) ও তিরমিযীর একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। ফাতহুল বারিতে হজরত মুগিরা ইবনে শো'বা (রা.)-এর প্রসিদ্ধ হাদিস اتى النبى صلى الله عليه وسلم سباطة قوم الخ এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, আমি جامع ترمذى একটি ব্যাখ্যা লিখেছি। যাতে প্রমাণ করেছি যে, দাঁড়িয়ে পেশাব সংক্রান্ত কোনো হাদিস সহিহ নেই। তবে হাফেজ ইবনে হাজার (র.)-এর এই শরাহটি পাওয়া যায় না।

৫. شرح البلقينى : এর নাম হলো, العرف الشذى على جامع الترمذى । এটি আল্লামা উমর ইবনে রিসলান আল-বালকিনি (র.)-এর লেখা। তিনি ফুকাহায়ে শাফেয়িয়্যার প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। হাফেজ ইবনে হাজার (র.)-এর প্রসিদ্ধ শিক্ষক।

৬. شرح الحافظ ابن رجب البغدادى الحنبلى : তিনি প্রসিদ্ধ হাম্বলি মুহাদ্দিস ও ফকিহ। طبقات الحنابلة লেখক।

৭. قوت المغتذى : এটি আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি (র.)-এর নেহায়েত সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা যা তিরমিযীর টীকায় লেখা হয়েছে।

৮. شرح العلامة طاهر پتنى الگجراتى : তিনি 'মাজমাউ বিহারিল আ-নওয়ারে'[১] اللهم انى اعوذ بك من الخبث والخبائث হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, আমি তিরমিযীর একটি টীকা গ্রন্থ রচনা করেছি।

৯. شرح السندهى : এটি আল্লামা আবু তায়্যিব সিন্দির লেখা। প্রকাশিত হয়েছে মিসর থেকে।

১০. شرح العلامة سراج الدين السرهندى : তার ব্যাখ্যা গ্রন্থটিও মিসর থেকেই প্রকাশিত হয়েছে।

১১. تحفة الاحوذى : এটি কাজি আব্দুর রহমান মুবারকপুরি (র.)-এর লেখা। যিনি আহলে হাদিসের উঁচু স্তরের আলেম। তিনি একটি মোটা ভলিয়মে এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন। যেটি ইলমে হাদিসের জবাব আলোচ্য বিষয়াবলি সংবলিত। এই শরাহতে তিনি হানাফিদের খুব রদ করেছেন। অনেক সময় ইনসাফের সীমালঙ্ঘন করেছেন। তাঁর উৎস বেশির ভাগ শাওকানি (র.)-এর 'নাইলুল আওতার'। এ ব্যাখ্যাটিকে যদি হানাফিদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব মুক্ত করা হয় তাহলে গ্রন্থ বোঝার দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই উত্তম ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

১২. الكوكب الدرى على جامع الترمذى : এটি হজরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি (র.)-এর তিরমিযীর তাকরির। এটি লিখেছিলেন তাঁর শিষ্য হজরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহইয়া কান্দলভি (র.)। তাঁর সাহেবযাদা শায়খুল হাদিস হজরত মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া (র.)এর ওপর উপকারী টীকা লিখেছেন। নিঃসন্দেহে তিরমিযী বোঝার দৃষ্টিকোণ থেকে এই গ্রন্থটি পেয়ালার মধ্যে সমুদ্রের বাস্তব উদাহরণ। এতে সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক এবং প্রশান্তিদায়ক ব্যাখ্যাও রয়েছে। এলেম ও মা'রিফাত তাহকিক ও তাদকিকের ভাণ্ডারও। এটি তিরমিযী শরিফের নেহায়েত শ্রেষ্ঠতম এবং সংক্ষিপ্ত শরাহ। এর যথার্থ আন্দাজ তখন হবে যখন কেউ দীর্ঘ রচিত কিতাবাদি অধ্যয়নের পর তা অধ্যয়ন করবে। বিশেষ করে এর ফায়দা দ্বিগুণ করে দিয়েছে হজরত মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া (র.)-এর টীকাগুলো।

১৩. الورد الشذى : এটি শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদুল হাসান (র.)-এর তিরমিযীর তাকরির, কিন্তু সংক্ষিপ্ততম।

১৪. اللباب فى شرح قول الترمذى وفى الباب : এটি হাফেজ ইবনে হাজার (র.)-এর লেখা। এতে তিনি সেসব হাদিস সূত্র ও বরাত সহকারে উল্লেখ করেছেন যেগুলোর দিকে وفى الباب বলে ইমাম তিরমিযী (র.) ইঙ্গিত করেছেন।

টীকা-১. ২ খণ্ড, ছাপা, হায়দারাবাদ দাক্ষিণাত্য, পৃষ্ঠা : ৪ خبث শব্দের ব্যাখ্যার আওতায়।

১৫. العرف الشذى تقرير جامع الترمذى : এটি হজরত আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (র.)-এর তিরমিযীর তাকরিরি। মাওলানা চেরাগ মুহাম্মদ (র.) এটি ক্লাসে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। যদিও এটি বিশেষভাবে ব্যাপক তাকরির, কিন্তু এর লেখায় অনেক ভুল রয়ে গেছে। কারণ, হজরত শাহ সাহেব (র.) এতে নজর দিতে পারেননি। অতএব, হজরত শাহ সাহেব (র.)-এর উলুম এখানে পুরোপুরি আসেনি।

১৬. معارف السنن : হজরত কাশ্মীরি (র.)-এর বিশিষ্ট ছাত্র হজরত মাওলানা ইউসুফ বিন্নুরি (র.) কর্তৃক লিখিত এটি। মূলত তিনি 'আল-আরফুশ্ শাজি'র সম্পাদনা ও এর ভুলত্রুটি ঠিক করার জন্য এ গ্রন্থটি লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে এটি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ ও ব্যাখ্যার রূপ ধারণ করে। এতে তিনি হজরত শাহ সাহেব (র.)-এর তাকরিরকে ভিত্তি বানিয়েছেন। কিন্তু এর সাথে স্বীয় তাহকিক এবং অধ্যয়ন থেকে অগণিত বিষয় সংযুক্ত করেছেন। এর এবারত নেহায়েত সুসজ্জিত এবং কথাগুলো অনেকটা সাজানো গোছানো। যা অন্যান্য হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থে খুবই দুষ্প্রাপ্য। আজকাল তিরমিযীর যতোগুলো শরাহ পাওয়া যায়– তন্মধ্যে এটি সবচেয়ে বিস্তারিত এবং ব্যাপক-সার্বজনীন শরাহ। কিন্তু এটি ছয় খণ্ডে শুধুমাত্র 'কিতাবুল হজ্জ' পর্যন্ত পৌঁছেছে। এসব ব্যাখ্যাগ্রন্থ ছাড়া তিরমিযীর ওপর অনেক তাজরিদ ও মুস্তাখরাজ লিপিবদ্ধ হয়েছে। যেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন[১] 'তুহফাতুল আহওয়াজি'র মুকাদ্দামায় মাওলানা মুবারকপুরি (র.)।

বর্তমান আমলে হাদিসের সনদ

সিহাহ সিত্তাহ এবং হাদিসের অন্যান্য সংকলন তৈরি হয়ে যখন থেকে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং গ্রন্থকারদের দিকে এগুলোর সম্বোধন মুতাওয়াতিরের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তখন থেকে হাদিস বর্ণনার এই পদ্ধতি যে, হাদিস বর্ণনাকারি নিজ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত সবগুলো সূত্র বর্ণনা করবেন, তা বর্জিত হয়েছে এবং এখন এর বেশি প্রয়োজনও নেই। শুধু হাদিসগ্রন্থের বরাত দেয়াই যথেষ্ট হয়ে যায়। কারণ, সে কিতাবগুলো মুতাওয়াতির পর্যায়ে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। কিন্তু সনদের ধারা অবশিষ্ট রাখা এবং তাবারুকের খাতিরে বড়দের মাঝে এই মা'মুল চলে আসছে যে, তাঁরা সেসব হাদিসগ্রন্থের সনদও সংরক্ষিত রাখেন। এই পদ্ধতিটি অধিক নির্ভরযোগ্যও বটে, আবার বরকতেরও কারণ। এজন্য সর্বযুগের হাদিসের উস্তাদগণ সেসব কিতাব লেখকগণ পর্যন্ত স্বীয় সনদের ধারা সংরক্ষিত রাখেন। সাথে সাথে এরও চেষ্টা করেন যাতে সেসব গ্রন্থকার পর্যন্ত সূত্র সংখ্যা সবচেয়ে কম হয়, যাতে স্বীয় সনদ সর্বাধিক উঁচু পর্যায়ের হয়। তারপর বড় বড় মাশায়িখের কাছে এই মা'মুলও আছে যে, হাদিসগ্রন্থ লেখকগণ পর্যন্ত তাঁরা স্বীয় সনদের বিভিন্ন সূত্র একটি পুস্তিকা আকারে বিন্যস্ত করেন, যেটাকে পরিভাষায় বলা হয় ثبت । তারপর সংক্ষেপের খাতিরে শায়খ যদি শিষ্যকে শুধু ثبت -এর অনুমতি দেন, তাহলে হাদিসের সমস্ত কিতাবের অনুমতি তার অর্জিত হয়ে যায়। আমাদের যুগে সিহাহ সিত্তা সংকলকগণ পর্যন্ত আমাদের সদনগুলোর কেন্দ্রবিন্দু হলেন হজরত শাহ আব্দুল গনি মুজাদ্দেদি (র.)। তিনি হাদিসগ্রন্থকারগণ পর্যন্ত স্বীয় সনদের সবগুলো সূত্র একটি পুস্তিকায় একত্র করে দিয়েছেন। যেটি ছাপা হয়েছে "اليانع الجنى" নামে। তারপর হজরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফি (র.) একটি পুস্তিকায় সমস্ত আকাবিরে দেওবন্দের সনদগুলো হজরত শাহ আব্দুল গনি (র.) পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে সংকলন করেছেন। যার নাম الازدياد السنى على اليانع الجنى। যেটি মুদ্রিত হয়েছে মাকতাবা দারুল উলুম করাচি থেকে।

টীকা- ১. 'কাশফুজ্জুনুন' গ্রন্থকার জামে তিরমিযীর তিনটি মুখতাসার তথা সারসংক্ষেপের কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো, মুখতাসারুল জামে'-কৃত নাজমুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আকিল আল-বাসি আশ্-শাফেয়ি, ওফাত ৭২৯ হিজরি। আরেকটি হলো, মুখতাসার-কৃত নাজমুদ্দিন সুলায়মান ইবনে আব্দুল কভি আত্ তুফি আল-হাম্বলি, ওফাত : ৭১০ হিজরি। আরেকটি হলো, মি'আতু হাদীসিন মুনতাকাত-কৃত হাফেজ সালাহুদ্দিন খলিল ইবনে কিকলায়ি আল-আলায়ি।

'তাদরিবে' আল্লামা সুয়ুতি (র.) উল্লেখ করেছেন যে, মুসতাখরাজ শুধু সহিহ বোখারি ও মুসলিমের সাথে বিশেষিত নয়। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল মালেক ইবনে আইমান সুনানে আবু দাউদের মুস্তাখরাজ লিখেছেন। আর আবু আতি আত্-তুসি মুস্তাখরাজ লিখেছেন তিরমিযীর। মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াজি, পৃষ্ঠা : ১৭০।

আমাদের সনদ সিলসিলা

জামে' তিরমিযী এবং অন্যান্য হাদিসগ্রন্থের অনুমতি আমি কয়েকজন শায়খ থেকে অর্জন করেছি। এসব সূত্রের সর্বশেষ কেন্দ্রবিন্দু হজরত শাহ মুহাম্মদ ইসহাক (র.)। হজরত শাহ ইসহাক (র.)-এর পরবর্তী সূত্র কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। এজন্য শুধু হজরত শাহ ইসহাক (র.) পর্যন্ত স্বীয় সনদের কয়েকটি সূত্র নিম্নেযুক্ত,

১. অধমের সর্বোচ্চ সূত্র হলো,

اجازنی الشیخ محمد حسن محمد المشاط بالاجازة العامة عن السید محمد بن جعفر القطانی عن الاستاذ ابی العباس احمد بن احمد البنانی الفاسی والشیخ ابو جیدة ابن الکبیر بن المجذوب الفاسی الفهروی والشیخ حبیب الرحمن الکاظمی الهندی نزیل المدینة المنورة والشیخ عبد الحق بن الشاه محمد الهندی نزیل مکة والشیخ ابی الحسن علی بن ظاهر الوتری کلهم یروون عن الشیخ عبد الغنی المجددی الدهلوی صاحب الیانع الجنی -

সনদ দ্বারা স্পষ্ট যে, শায়খ মুহাম্মদ হাসান আল-মাশ্‌শাত আল-মালেকি হজরত শাহ আবদুল গনি (র.)-এর শিষ্য শুধু দুই সূত্রে। অধম অন্যান্য হাদিস গ্রন্থের ইজাযত অর্জন করার সাথে সাথে তাঁর নিকট হেরেমে মক্কায় সুনানে নাসায়ির কিছু অংশ দরসে পড়েছে। শায়খ মাশ্‌শাতের সনদগুলো তাঁর মুদ্রিত ثبت (সাবাত) الارشاد الی معرفة الثبت এ রয়েছে।

২. জামে' তিরমিযী অধ্যয়ন করেছি হজরত মাওলানা সালিমুল্লাহ খান সাহেব (র.)-এর নিকট। তিনি হজরত হোসাইন আহমদ মাদানি (র.) থেকে, তিনি হজরত শায়খুল হিন্দ (র.) থেকে। তিনি সাধারণ হাদিস গ্রন্থগুলোর অনুমতি সরাসরিও লাভ করেছেন হজরত শাহ আব্দুল গনি মুজাদ্দেদি (র.) থেকে এবং হজরত মাওলানা গাঙ্গুহি, হজরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানুতবি (র.) সূত্রেও।

তাছাড়া হজরত শায়খুল হিন্দ (র.) হজরত আহমদ আলি সাহারানপুরি, হজরত মাওলানা মুহাম্মদ মাজহার নানতুবি (র.), হজরত মাওলানা ক্বারি আব্দুর রহমান (র.) থেকেও ইজাযত পেয়েছে। তাঁরা তিনজন হাদিস বর্ণনা করেন হজরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসহাক (র.) থেকে।

৩. পূর্ণাঙ্গ শামায়েলে তিরমিযী, মুয়াত্তা ইমাম মালেকের কিছু অংশ পাঠরূপে আমি আর অবশিষ্ট হাদিস গ্রন্থগুলো অনুমতিরূপে অর্জন করেছি স্বীয় বুজুর্গ পিতা হজরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফি (র.) থেকে। তিনি হজরত আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (র.) থেকে জামে' তিরমিযী এবং শামায়েলে তিরমিযী দরসে পড়েছেন। তিনি হজরত শায়খুল হিন্দু (র.)-এর ছাত্র। তাছাড়া হজরত শাহ সাহেব (র.) 'হুজুনে হামিদিয়্যাহ' গ্রন্থকার আল্লামা হোসাইন আর-জিস্‌র আত্‌ত তারাবলুসি থেকেও ইজাযত লাভ করেছেন। ইমাম আবু জা'ফর তাহাবি (র.) পর্যন্ত তার সনদ স্বীয় ثبت এ রয়েছে।

৪. সমস্ত কিতাবের সাধারণ অনুমতি আমি হজরত মাওলানা জা'ফর আহমদ উসমানি (র.) থেকে সরাসরিও লাভ করেছে। যার সনদগুলোর তাঁর ثبت এ রয়েছে।

৫. সমস্ত হাদিসের কিতাবের সাধারণ আমি অনুমতি হলবের অধিবাসী আল্লামা শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ হলোবি (র.) থেকেও লাভ করেছে। তিনি শামের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুহাম্মদ জাহেদ আল কাওছারির শিষ্য। আল্লামা কাওছারি (র.)-এর সূত্রগুলো তাঁর ثبت এ রয়েছে।

৬. সমস্ত হাদিস গ্রন্থের সাধারণ অনুমতি আমি হজরত শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া (র.) থেকেও অর্জন করেছি। তিনি হলেন মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরি (র.)-এর ছাত্র।

দরস সূচনায় মুসালসাল হাদিস

পূর্ববর্তী আলেমগণের নিকট এই আমল ছিলো এবং আরব রাষ্ট্রগুলোতে এখনো আছে যে, হাদিসের উস্তাদগণ শিষ্যগণকে হাদিসের দরস শুরু করানোর সময় প্রথমে একটি বিশেষ হাদিস পড়ান। যাকে বলা হয় حديث مسلسل بالاولية। কারণ, আমাদের থেকে নিয়ে ইমাম জুহরি (র.) পর্যন্ত প্রত্যেক উস্তাদ নিম্নেযুক্ত হাদিসটি স্বীয় শিষ্যকে সর্বপ্রথম পড়িয়েছেন। যদিও এই হাদিসটি বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে বিদ্যমান আছে এবং সেসব কিতাবের সনদের সাথে এই হাদিসের সনদটিও সংশ্লিষ্ট আছে, কিন্তু তাবার্‌রুকের ক্ষেত্রে এটাকে স্বতন্ত্র মুত্তাসিল সনদে পড়া হয়। এই হাদিসটি আমি শায়খ হাসান আল-মাশ্‌শাত মালেকি থেকে হেরেমে মক্কা মুকার্‌রামায় সূচনার বাধ্যবাধকতার সাথে অর্জন করেছি। এজন্য বরকতের উদ্দেশে স্বীয় দরসের সূচনা আমিও এই হাদিস দ্বারা করে থাকি।

এই হাদিসের সাথে সংশ্লিষ্ট আমার সনদটি নিম্নোক্ত,

اخبرنى به الشيخ محمد حسن المشاط المالكى عن الشيخ حمدان عن الشيخ محمد هاشم وغير واحد قال هو اول حديث سمعته منهم عن الشيخ محمد فالح المهنوى وهو اول قال المهنوى انبأنا به السيد محمد على انبأنا به ابو حفص العطار وهو اول انا ابو الحسن على بن عبد البر الونانى الشافعى وهو اول، انا البرهان ابراهيم بن محمد النمروسى وهو اول، عن الامام عيد بن على النمروسى وهو اول، عن الامام عبد الله بن سالم البصرى وهو اول عن الشمس البابلى وهو اول، عن الشهاب احمد بن محمد الشلوى وهو اول، انا الجمال يوسف بن زكريا وهو اول، انا البرهان ابراهيم القلقشندى وهو اول، انا العباس احمد بن محمد المقدسى الشهير بالواسطى وهو اول، انا الخطيب صدر الدين محمد بن محمد الميدومى وهو اول، انا النجيب عبد اللطيف بن عبد المنعم الحرانى وهو اول قال اخبرنا الحافظ ابو الفرج عبد الرحمن بن على الجوزى وهو اول انا ابو سعيد اسماعيل بن ابى صالح وهو اول، انا والدى ابو صالح احمد بن عبد الملك المؤذن وهو اول، انا محمد بن زيان بن محمش وهو اول، انا ابو حامد احمد بن محمد بن يحى بن بلال البزاز وهو اول، عن عبد الرحمن بن بشر وهو اول، انا سفيان بن عيينة وهو اول واليه انتهى التسلسل عن عمرو بن دينار عن ابى قاموس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء -

و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

ضبطها ورتبها احقر تلامذة الشيخ ادام الله اقباله رشيد اشرف عفى عنه ٧/ من شعبان المعظم سـ١٣٩٨ هجرى بيوم الجمعة المبارك،

বিখ্যাত বুজুর্গ শায়খ মরহুম মাগফুর মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক (র.) বলেছেন, আমি ইজাযত, কেরাত এবং শ্রবণ লাভ করেছি মহান শায়খ বুজুর্গ মহাজ্ঞানী সমকালীনদের মাঝে অন্যতম ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ, শায়খ আব্দুল আজিজ (র.) থেকে এবং তিনি অনুমতি কেরাত এবং শ্রবণ লাভ করেছেন তাঁর পিতা শায়খ ওয়ালি উল্লাহ ইবনে আব্দুর রহিম দেহলবি (র.) থেকে। শায়খ ওয়ালি উল্লাহ (র.) বলেন, আমাকে এর খবর দিয়েছেন শায়খ আবু তাহের আল-মাদানি (র.) তাঁর পিতা শায়খ ইবরাহিম ইবনে আল-কুরদি (র.) থেকে, তিনি শায়খ আল-মাজজাহি (র.) থেকে, তিনি শেহাব আহমদ আস্ সুবকি (র.) থেকে, তিনি শায়খ আন্ নাজমুল গাইতি (র.) থেকে, তিনি শায়খ জায়ন জাকারিয়া (র.) থেকে, তিনি ইজজ আব্দুর রহিম (র.) থেকে, তিনি শায়খ উমর আল মারাগি (র.) থেকে, তিনি ফখর ইবনুল বোখারি (র.) থেকে, তিনি উমর ইবনে তাবারজাদ আল-বাগদাদি (র.) থেকে...।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ [১]

اخبرنا الشيخ ابو الفتح عبد الملك بن ابى القاسم عبد الله بن ابى سهل الهروى الكروخى فى العشر الأول من ذى الحجة سنة سبع وأربعين وخمس مأة بمكة شرفها الله وانا اسمع قال أنا القاضى الزاهد أبو عامر محمود بن قاسم بن محمد الأزدى قرائة عليه وانا اسمع فى ربيع الأول من سنة اثنين وثمانين واربع مأة قال الكروخى وأخبرنا الشيخ أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن على بن ابراهيم الترياقى والشيخ ابو بكر أحمد بن عبد الصمد بن على بن ابراهيم الترياقى والشيخ ابو بكر أحمد بن عبد الصمد بن ابى الفضل بن ابى حامد الغورجى رحمهما الله قرائة عليهما وانا اسمع فى ربيع الاخر من سنة احدى وثمانين واربعين واربعمأة قالوا انا ابو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن ابى الجراح الجراحى المروزى المرزبانى قرائة عليه انا ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب بن فضيل المحبوبى المروزى فاقر به الشيخ الثقة الأمين (فى نسخة بيروت قال:) انا ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذى الحافظ قال۔

আমাকে 'শায়খ আবুল ফাতহ আবদুল মালেক ইবনে আবুল কাসেম আব্দুল্লাহ ইবনে আবু সাহ্ল আল হিরবি আল কারুখি (র.) সনদ দিয়েছেন– জিলহজ্জের প্রথম দশকে সন ৫৪৭ হিজরিতে মক্কা মুকার্‌রামায়। (আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত রাখুন।) তাঁর সম্মুখে পাঠ করা হচ্ছিলো আর তখন আমি শুনছিলাম। তিনি বলেন, আমাকে কাজি জাহেদ আবু আমের মাহমুদ ইবনে কাসেম ইবনে মুহাম্মদ আল-আজদি (র.) খবর দিয়েছেন, তার নিকট পড়া হচ্ছিলো আর আমি শুনছিলাম রবিউল আওয়াল সন ৪৮২ হিজরিতে। কারুখি (র.) বলেন, আর

টীকা- ১. ইবনে কুতায়বা (র.) বলেন, যখন বিসমিল্লাহ দ্বারা কিতাব আরম্ভ করা হয় অথবা কথা শুরু করা হয় তখন بسم الله লিখবে আলিফ ছাড়া। কেনোনা এমন প্রচলন অধিক। সহজের জন্য আলিফটিকে রাখা হবে গোপন। কিন্তু যখন কোনো বাক্যের মাঝে উল্লেখ করবে তখন সেখানে আলিফ উল্লেখ করবে। যেমন– أبدأ باسم الله واختم باسم الله । আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, فسبح باسم ربك العظيم এবং إقرأ باسم ربك এমনভাবে মুসহাফ শরিফেও ওপরযুক্ত দুই অবস্থা তথা শুরুতে ও মধ্যখানে লিখা হয়েছে অনুরূপ। –আদাবুল কাতেব : ইবনে কুতায়বা-১৮৪, বাবু আলিফিল ওয়াসলি ফিল আসমা, ছাপা : মিসর ১৩৭৭ হিজরি।

আমাকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবু নসর আব্দুল আজিজ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলি ইবনে ইবরাহিম আত্‌ত-তিরয়াকি (র.) এবং শায়খ আবু বকর আহমদ ইবনে আব্দুস্ সামাদ ইবনে আবুল ফজল ইবনে আবু হামিদ আল-গুরাজি (র.), তাঁদের সামনে পাঠ করা হচ্ছিলো আর আমি শুনছিলাম রবিউস্ সানি, সন ৪৮১ হিজরিতে। তাঁরা বলেছেন, আমাদেরকে সনদ দিয়েছেন আবু মুহাম্মদ আব্দুল জাব্বার ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবুল জার্‌রাহ আল-জার্‌রাহি আল-মারওয়াজি আল-মারজুবানি (র.), তাঁর সামনে পাঠ করা হচ্ছিলো আর আমি শুনছিলাম। আবু মুহাম্মদ আব্‌দুল জব্বার (র.) বলেন, আমাদের সংবাদ দিয়েছেন আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মাহবুবি ইবনে ফুজাইল আল-মাহবুবি আল-মারওয়াজি (র.)।

তারপর জামে' তিরমিযী সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত শায়খ তথা আবুল আব্বাস (র.) স্বীকারোক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন, আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা ইবনে মুসা আত্‌-তিরমিযী আল-হাফেজ (র.) আমাদের সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, بسم الله الرحمن الرحيم।

দরসে তিরমিযী

ইমাম তিরমিযী (র.) হামদ সালাত উল্লেখ করেননি, বিসমিল্লাহ দ্বারা স্বীয় কিতাবের সূচনা করেছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য নবী করিম (স)-এর পত্রাবলির অনুসরণ। কেনোনা, সেসব পত্রও শুধু বিসমিল্লাহ দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। এমনভাবে কোরআনে বর্ণিত হজরত সুলায়মান (আ.)-এর চিঠিও শুধু বিসমিল্লাহ দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। এমনিভাবে এতে নিম্নোক্ত হাদিসের ওপরও আমল হয়ে যায়। হাদিসে রয়েছে,

كل امر ذى بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو اقطع .

'বিসমিল্লাহ দ্বারা যতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শুরু করা হয় না সেগুলো সব বরকত শূন্য।'

বিসমিল্লাহ এবং হামদ বিষয়ক হাদিস সম্পর্কে আলোচনা

সাধারণভাবে এ হাদিসটি মানুষের মধ্যে খুবই প্রসিদ্ধ, কিন্তু এর সনদপগত মর্যাদা সম্পর্কে মুহাদ্দিসিনে কেরাম অনেক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। শুধু এই হাদিসটির তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য হাফেজ শামসুদ্দিন সাখাবি (র.) স্বতন্ত্র একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। এখানে এই হাদিসটি সম্পর্কে কয়েকটি জরুরি বিষয় বুঝে নেয়া আবশ্যক। এই হাদিসটি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে দু'হিসেবে। এক. বর্ণনাগতভাবে। দুই. অর্থগতভাবে। যতোটুকু পর্যন্ত এর বর্ণনাগত সম্পর্ক রয়েছে তাতে এর সনদ ও মতন তথা সূত্র ও মূলপাঠে ইজতেরাব (বিভিন্নতা-পার্থক্য) রয়েছে। মতনের ইখতেলাফ হলো, হাফেজ আব্দুল কাদির রাহাবি (র.) স্বীয় আরবাইনে বর্ণনা করেছেন নিম্নোক্ত শব্দে,

كل امر ذى بال لم يبدأ فيه ببسم الله وبذكر الله فهو اقطع .

ইমাম আবু দাউদ (র.) 'সুনানে' এবং ইবনুস সুন্নি 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাতে' বর্ণনা করেছেন নিম্নোক্ত শব্দে,

كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم .

অন্য আরেকটি সূত্রে এ হাদিসটি লিখতে গিয়ে হাফেজ ইবনে হাজার (র.) নিম্নোক্ত শব্দও বর্ণনা করেছেন,

كل كلام لا يبدأ فيه بالشهادة فهو أجذم .[১]

নিজ সুনানে ইবনে মাজাহ আবওয়াবুন নিকাহ বাবু খুতবাতিন নিকাহ, পৃষ্ঠা : ১৩৬-এ, ইবনে হাব্বান এবং আবু আওয়ানা নিজ নিজ সহিহে নিম্নোক্ত শব্দ বর্ণনা করেছেন,

---

টীকা- ১. কিতাবুল আজকার : নববি পৃষ্ঠা : ৩৫৭. كتاب اذكار النكاح باب ما يقول من جاء يخطب إمرأة من اهلها لنفسها وغيره .

كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع ـ

(ইবনে মাজাহ-এর শব্দ) এবং মুসনাদে আহমদ ২/২৫৯ গ্রন্থে হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে,

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام او امر ذى بال لا يفتح بذكر الله عز و جل فهو أبتر او أقطع ـ

মূলকথা, কোনো রেওয়ায়াতে বিসমিল্লাহ দ্বারা, কোনো রেওয়ায়াতে জিকরুল্লাহ দ্বারা, কোনো রেওয়ায়াতে হামদ দ্বারা, আর কোনো রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে শাহাদাত দ্বারা শুরুর কথা।

সূত্রগত দিক দিয়ে ইজতেরাব তথা বিভিন্নতা হলো কোনো কোনো সূত্রে এটি মুত্তাসিলরূপে আর কোনোটিতে মুরসালরূপে বর্ণিত। অবিচ্ছিন্নরূপে যেসব সূত্রে বর্ণিত আছে সেগুলোর কোনো কোনো সূত্র যেমন হাফেজ আব্দুল কাদির রাহাবি (র.) এটাকে বর্ণনা করেন হজরত কা'ব (রা.) থেকে, আর অন্য সব মুহাদ্দিস বর্ণনা করেন হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে। অর্থগত দিক দিয়ে আলোচনা হয়েছে যে, যদি বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু হয় তবে হামদ দ্বারা শুরু করা সম্ভব নয়। আর যদি হামদ দ্বারা শুরু হয় বিসমিল্লাহ দ্বারা সূচনা সম্ভব নয়। তাহলে এ বর্ণনার সমস্ত শব্দের ওপর আমল সম্ভব কিভাবে?

তেমনি ওলামায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে এই হাদিসটির সনদগত মর্যাদা সম্পর্কেও যে, এটিকে বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করা হবে, না দুর্বল। একদল আলেম এ হাদিসটিকে সহিহ হাসান সাব্যস্ত করেছেন। 'শরহুল মুহাজজাবে' আল্লামা নববি (র.) এটাকে সহিহ বলে উল্লেখ করেছেন। আবার কোনো কোনো মুহাদ্দিস এটাকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। যারা দুর্বল সাব্যস্ত করেন তাদের প্রমাণ হলো, প্রথমত এ হাদিসটিতে ইজতেরাব বা বিভিন্নতা পাওয়া যায়, শব্দগতভাবেও অর্থগত ভাবেও। যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পূর্বে প্রদত্ত হয়েছে। দ্বিতীয়ত এই হাদিসটির সমস্ত সনদের কেন্দ্রবিন্দু-নির্ভরস্থল কুররা ইবনে আব্দুর রহমান, যাকে দুর্বল বলা হয়েছে। কিন্তু যারা হাসান সহিহ বলেন, তাদের বক্তব্য হলো যে, কুররা ইবনে আব্দুর রহমান একজন বিতর্কিত রাবি। কেউ কেউ অবশ্যই তাকে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু কোনো কোনো মুহাদ্দিস তাকে নির্ভরযোগ্যও বলেছেন। বরং বলা হয়েছে اثبت الناس فى الزهرى।

অবশিষ্ট আছে, সূত্রগত ইজতেরাবের ব্যাপারটি। এখানেও সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব। অর্থাৎ, এই হাদিসটি হজরত কা'ব (রা.) এবং হজরত আবু হুরায়রা (রা.) উভয় থেকে বর্ণিত হওয়া সম্ভব এবং মুত্তাসিল ও মুরসাল উভয় প্রকার বর্ণিত হওয়া সম্ভব। অধিকাংশের মতে যেহেতু মুরসাল হাদিস প্রমাণ তাই এ হাদসটিকে জয়িফের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

বাকি আছে শুধু মূলপাঠ এবং অর্থগত দিক দিয়ে ইজতেরাবের বিষয়টি। এটার সমাধানের জন্য বিভিন্ন রকমের চেষ্টা করা হয়েছে। সাধারণত এর জবাব প্রদান করা হয় যে, ইবতেদা তথা সূচনা তিন প্রকার হাকিকি, উরফি, ইজাফি তথা প্রকৃত, পারিভাষিক ও আপেক্ষিক। যে বর্ণনার বিসমিল্লাহ শব্দ রয়েছে তাতে উদ্দেশ্য প্রকৃত ইবতিদা । আর যাতে হামদ অথবা শাহাদতের শব্দ এসেছে তাতে পারিভাষিক কিংবা আপেক্ষিক সূচনা উদ্দেশ্য। এই জবাবটি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। কিন্তু সঠিক নয় এবং এটি দেওয়া হয়েছে এলমে হাদিস সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার কারণে। কেননা, এই সামঞ্জস্য বিধান তখন বিশুদ্ধ হতে পারে যদি প্রকৃত অর্থে হাদিসগুলোতে বিভিন্নতা থাকত এবং রাসূল ﷺ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে এরশাদ করতেন, কিন্তু বিষয়টি এমন নয়; বরং এটি একটিই হাদিস অর্থাৎ, সবাই একটিই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হজরত শাহ সাহেব (র.) বলেছেন, এই শাব্দিক বিভিন্নতা হয়েছে রাবিদের পক্ষ থেকে।

সুতরাং বিশুদ্ধ জবাব হলো, নবী করিম ﷺ ব্যবহার করেছিলেন শুধু একটি শব্দ। প্রবল ধারণা হলো, সেই শব্দটি ছিলো ইসমুল্লাহ কিংবা জিকরুল্লাহ ব্যাপক শব্দ ছিলো। যাতে হামদ ও শাহাদতও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কারণ, আল্লাহর জিকির দ্বারা সূচনা রাসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্য ছিলো। অতএব, কোনো কোনো বর্ণনাকারি এটাকে হামদ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন, আবার কেউ কেউ শাহাদত দিয়ে। এবার মূল বিষয় হলো, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের

সূচনা জিকরুল্লাহ দ্বারা হওয়া উচিত। চাই সেই জিকিরটি যে কোনো ভাবেই হোক না কেনো। অবশ্য মাসনুন হলো, খুৎবার শুরু হামদ দ্বারা এবং চিঠিপত্র লেখার সূচনা বিসমিল্লাহ দ্বারা করা। কেননা, এটাই ছিলো প্রিয়নবী (স)-এর সাধারণ নিয়ম।

সারকথা, ওপরযুক্ত পদ্ধতিতে মতন এবং সনদ উভয়ের ইজতেরাব দূরীভূত হয়ে যায়। এজন্য বিশুদ্ধ হলো, এই হাদিসটি ন্যূনতম পক্ষে হাসান অবশ্যই। এ কারণে আল্লামা নববি[১] (র.) 'কিতাবুল আজকার', 'কিতাবুল হামদি লিল্লাহি'তে এটাকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন এবং 'আসনাল মাতালিবে' (পৃষ্ঠা ১৬৭) আল্লামা ইবনে দরবেশ বর্ণনা করেছেন যে, হাফেজ ইবনুস সালাহ (র.)ও এটাকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন। এ ছাড়া 'তাবাকাতুশ শাফিইয়্যা'তে হাফেজ তাজুদ্দিন সুবকি (র.) ও এই হাদিসটিকে সাব্যস্ত করেছেন হাসান।

أخبرنا الشيخ الثقة الامين : জামে তিরমিযীর ভারতীয় কপিগুলোতেও এ বাক্যটি রয়েছে। কিন্তু এটা অন্যান্য অনেক কপিতে নেই। কোনো কোনো কপিতে রয়েছে- اخبرنا الشيخ الثقة الامين ابو العباس .

আবার কোনোটিতে রয়েছে,

اخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل المحبوبى المروزى الشيخ الثقة الامين .

"فأقر به" শব্দটি এতে নেই। মুতাআখ্‌খিরিনের অধিকাংশ কপিতেও এ বাক্যটি নেই। এ জন্য কেউ কেউ বলেছেন, এ বাক্যটি লিপিকারের ভ্রান্তির কারণে এখানে লেখা হয়েছে। অন্যথায় মূলত এখানে এর কোনো যোগসূত্র নেই এবং না কোনো বিশুদ্ধ অর্থ হতে পারে। তবে যেসব কপিতে এ বাক্যটি রয়েছে সেগুলোর আধিক্যের কারণে এটাকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়াও ঠিক নয়। এ জন্য এর বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। মূল বিষয়টি হলো, এখানে أقر শব্দটির প্রবক্তা কে এবং এ শব্দটির ফায়েল বা কর্তা বাস্তবে কে? এর জবাবে এসেছে বিভিন্ন প্রকার বক্তব্য।

১. অনেকে বলেছেন, এ বাক্যটির প্রবক্তা উমর ইবনে তাবারজাদ আল-বাগদাদি। আর الشيخ الثقة الامين হলেন তাঁর উস্তাদ আবুল ফাতাহ। এর অর্থ হলো, উমর ইবনে তাবারজাদ আল-বাগদাদি শায়খ আবুল ফাতাহ-এর সামনে পাঠ করতঃ তার নিকট সত্যায়ন কামনা করেছেন। الشيخ الثقة الامين তারপর তিনি তা স্বীকার করেছেন। তবে এই বক্তব্যটি দুর্বল। কারণ, আবুল ফাতাহর নামের এ বাক্যটি এসেছে অনেক পরে।

২. শায়খ আবুল ফাতাহ اقر শব্দটির প্রবক্তা এবং তাঁর তিন উস্তাদের মধ্য থেকে কোনো একজন এর فاعل। এর অর্থ হলো, শায়খ আবুল ফাতাহ বলেন যে, আমার উস্তাদ আমাকে সনদ দেওয়ার পর এর বিশুদ্ধতার স্বীকারোক্তি করেছেন। কিন্তু এ ব্যাখ্যাটিও দুর্বল। কেনোনা, এ বাক্যটি আবুল ফাতাহ'র অনেক পরে এসেছে। তাছাড়া আবুল ফাতাহ'র কোনো একজন উস্তাদ সুনির্দিষ্ট নন, যাকে বাস্তবে নির্দিষ্ট করা যায় الشيخ الثقة الامين বলে।

৩. আবুল ফাতাহ'র তিন উস্তাদের মধ্য হতে কোনো একজন اقر-এর প্রবক্তা এবং الشيخ الثقة الامين দ্বারা বাস্তবে উদ্দেশ্য আবুল আব্বাস মারওয়াজি। অর্থ হলো, কাজি জাহেদ, আবু নসর তিরইয়াকি এবং আবু বকর রাজি

টীকা- ১. ইমাম নববি (র.) বলেছেন, সুনানে আবু দাউদ ইবনে মাজাহ ইত্যাদিতে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে মারফূ আকারের বর্ণিত হয়েছে- كل امر ذى بال لايبدأ فيه بالحمد لله فهو اقطع আরেক বর্ণনায় بالحمد لله শব্দের স্থলে بحمد الله শব্দ আছে। আরেক বর্ণনায় আছে- بالحمد فهو اقطع আরেক বর্ণনায় আছে, كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اجزم। (যতো কথা আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা আরম্ভ না করা হয় সেটি হয় অসম্পূর্ণ-স্বল্প বরকত সম্পন্ন। অথবা বরকতহীন।) আরেক বর্ণনায় আছে- كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اجزم এসব শব্দ হাফেজ আব্দুল কাদির রাহাবি (র.)-এর 'কিতাবুল আরবাইনে' বর্ণনা করা হয়েছে। এই হাদিসটি হাসান। এটি মুত্তাসিল আকারেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন আমরা উল্লেখ করেছি। আবার মুরসালরূপেও বর্ণিত হয়েছে। মুত্তাসিল বর্ণনাটির সনদ উত্তম। হাদিস মুত্তাসিল এবং মুরসাল উভয়রূপে বর্ণিত হলে অধিকাংশ আলেমের মতে ইত্তিসালের হুকুম হয়। কারণ, এটি এক এজন নির্ভরযোগ্য রাবির অতিরিক্ত বিবরণ হয়ে থাকে। অধিকাংশের মতে এটা গ্রহণযোগ্য। (كتاب الأذكار للنووى، صـ ١٠٣ طبع مصر سـ ١٣٧٥ هجرى كتاب حمد الله تعالى)

আব্দুল জব্বারের নিকট শিক্ষা গ্রহণের পর তাঁর উস্তাদ আবুল আব্বাস মারওয়াজির সাথে সরাসরি সাক্ষাত করে তাঁর নিকট সত্যায়ন কামনা করেন এবং জিজ্ঞেস করেন أخبرت عبد الجبار فاقر به الشيخ الثقة الامين এ ব্যাখ্যাটি শাব্দিকভাবে উত্তম ছিলো, কিন্তু এর বিশুদ্ধতা নির্ভর করছে কাজি জাহেদ প্রমুখের সাক্ষাৎ আবুল আব্বাস মারওয়াজির সাথে প্রমাণিত হওয়ার ওপর। অথচ বাস্তবতা এর পরিপন্থী। কারণ, কাজি জাহেদের জন্ম হয়েছে ৪০০ হিজরিতে এবং আবুল আব্বাস মারওয়াজির ওফাত হয়েছে ৫৪ বছর পূর্বে ৩৪৬ হিজরিতে। যার ফলে ধূলিসাৎ হয়ে যায় সাক্ষাতের সম্ভাবনাই।

৪. চতুর্থ ব্যাখ্যাটি অবলম্বন করেছেন 'তুহফাতুল আহওয়াজি'তে মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরি (র.)। তিনি বলেছেন, اقر এর প্রবক্তা আবুল ফাতাহ'র তিনজন উস্তাদ এবং এর কর্তা হলেন আব্দুল জব্বার। অর্থ হলো তাঁর তিন উস্তাদ নিজ নিজ উস্তাদের নিকট হাদিস পড়ার পর অতিরিক্ত সত্যায়নের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করেছেন– أخبرك ابو العباس فاقر به الشيخ الثقة الامين কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি এজন্য যুক্তি বহির্ভূত যে, বাক্যটি এ অবস্থায় উচিত ছিলো আব্দুল জব্বারের নামের তৎক্ষণাত পরে হওয়া, আবুল আব্বাস মারওয়াজির নামের পরে নয়।

৫. পঞ্চম ব্যাখ্যাটি সর্বোত্তম। এ ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছেন হজরত শাহ সাহেব (র.), হজরত শায়খুল হিন্দ (র.) ও হজরত গাঙ্গুহি (র.)। সেটি হলো اقر-এর প্রবক্তা আব্দুল জব্বার এবং এর فاعل আবুল আব্বাস অর্থাৎ, আব্দুল জব্বার আবুল আব্বাসের সামনে পাঠের পর তাঁর নিকট সত্যায়ন কামনা করেছেন। أأخبرك الشيخ الترمذى فأقر به الشيخ الثقة الأمين এই ব্যাখ্যাটি দুই কারণে উত্তম। ১. এ কারণে যে, এতে কোনো প্রকার দূরবর্তী ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না এবং যেহেতু এ বাক্যটি আবুল আব্বাসের নামের তৎক্ষণাত পরে এসেছে এজন্য বিবেক দ্রুত এদিকেই চলে যায় যে, এখানে الشيخ الثقة দ্বারা উদ্দেশ্য আবুল আব্বাস। ২. এ কারণে যে, জামে' তিরমিযীর কোনো কোনো কপি এবং আল্লামা ইবরাহিম কুরানি ও আল্লামা ফালিহ হিজাজির কপিতে রয়েছে اخبرنا الشيخ الثقة الأمين أبو العباس এতে বোঝা যায়, الشيخ الثقة الأمين আবুল আব্বাসের একটি উপাধিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। এজন্য এর দ্বারা আবুল আব্বাস উদ্দেশ্য করাটাই অধিক গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন : এখন প্রশ্ন হয় যে, কি প্রয়োজন ছিলো এ বাক্যটির? এর জবাব হলো, 'আল-কিফায়াহ' নামক গ্রন্থে খতিব বাগদাদি (র.) লিখেছেন, যদি শিষ্য উস্তাদের সামনে হাদিস পড়েন এবং উস্তাদ পূর্ণ সচেতনতার সাথে শুনেন তখন তাতে মতানৈক্য রয়েছে যে, ছাত্রের জন্য হাদিস বর্ণনার বৈধতা শায়খের স্বীকারোক্তির ওপর মাওকুফ কি না?

জবাব : কেউ কেউ এটাকে জরুরি বলেন। আবার কেউ কেউ জরুরি সাব্যস্ত করেন না। অবশ্য সবার মতে উত্তম হলো, শায়খের শ্রবণের পর সত্যায়ন বা স্বীকারোক্তির জন্য কোনো বাক্য জবানে নিঃসৃত করা। এই উত্তমতার ওপর আমল করার উদ্দেশে আবুল আব্বাস স্বীকারোক্তি করেছেন এবং এটার বিবরণ দিয়েছেন আব্দুল জাব্বার فأقر به الشيخ الثقة الأمين বলে।

قوله الحافظ : সাধারণ্যে প্রসিদ্ধ হলো মুহাদ্দিস, হাফেজ, হুজ্জত, হাকেম, কতগুলো বিশেষ পরিভাষা। যেগুলোর প্রয়োগ হাদিসের সুনির্দিষ্ট কিছু সংখ্যা মুখস্থ করার ফলে হয়ে থাকে। মুহাক্কিকিনের মতে কিন্তু এটা ঠিক নয়। এজন্য আল্লামা জাহেদ কাওসারি (র.) এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। যেমন এ সম্পর্কে তাঁর শিষ্য শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দা 'ইনহাউস সাকানে'র টীকায় স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন। বাস্তব ঘটনা হলো, এসব তা'জিমের শব্দ, যেগুলো বিভিন্ন মুহাদ্দিসকে প্রদান করা হয়। বিশেষত এমন বলা যে, হাকেম ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার পূর্ণ হাদিস ভাণ্ডার মুখস্থ। এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বক্তব্য। কেনোনা, এমন কোনো মুহাদ্দিসের জন্ম আজ পর্যন্ত হয়নি। সর্বোচ্চ বলা যায়, এসব সম্মানের জন্য ব্যবহৃত উপাধি। বিভিন্ন স্তরের জন্য সর্বনিম্ন স্তর মুহাদ্দিস, তারপর হাফেজ, তারপর হুজ্জত, সুনির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা যার জন্য নির্ধারিত নেই।

أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢)

রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত পবিত্রতা অধ্যায় (মতন ২)

দরসে তিরমিযী

الطهارة এবং الطهور মাসদার। অর্থ–পবিত্রতা। প্রকৃত নাপাক এবং হুকমি নাপাক উভয়টি থেকে পবিত্রতার ওপর এর প্রয়োগ করা হয়।

قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ইমাম তিরমিযী (র.) কর্তৃক এই শব্দটি বাড়িয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে এদিকে যে, এ কিতাবে উল্লেখ করা হবে শুধু মারফু' হাদিসগুলোই। এমন সুস্পষ্ট বিবরণের প্রয়োজন এজন্য হয়েছে যে, মুতাকাদ্দিমিনের গ্রন্থাবলিতে মারফু' হাদিস মাওকুফ বর্ণনা এবং মাকতু বিবরণ সবগুলোর সংমিশ্রণ থাকতো। কেনোনা ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর কিতাবুল আছার, ইমাম মালেক (র.)-এর মুয়াত্তা, মুসান্নাফে আব্দুল রাজ্জাক এবং মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা ইত্যাদিতে এই পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে মুহাদ্দিসিনে কেরাম নিজেদের গ্রন্থাবলি বিশেষিত করে দেন মারফু' হাদিসগুলোর জন্যই। এ পদ্ধতিতে সর্বপ্রথম গ্রন্থ সংকলন করেছেন মুসাদ্দাদ ইবনে মুসারহাদ এবং এরপর অধিকাংশ কিতাব লেখা হয়েছে শুধু মারফু হাদিস সংকলনের উদ্দেশেই।

بَابُ مَا جَاءَ لَا تُقْبَلُ صَلٰوةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ (٢)

অনুচ্ছেদ- ১ : পবিত্রতা ছাড়া নামাজ কবুল হয় না (মতন ২)

ইমাম তিরমিযী (র.) হাদিসের শব্দ দ্বারাই শিরোনাম তৈরি করতে চেষ্টা করেন। তাই এ অনুচ্ছেদে তেমনটি করা হয়েছে। কিন্তু যেখানে এমন সম্ভব নয় সেখানে নিজের পক্ষ থেকে শব্দ চয়ন করে শিরোনাম কায়েম করেন। সিহাহ সিত্তায় ইমাম তিরমিযীর শিরোনামগুলো অধিক বিশুদ্ধতম ও সুন্দর।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تُقْبَلُ صَلٰوةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ قَالَ هَنَّادٌ فِيْ حَدِيْثِهٖ اِلَّا بِطُهُوْرٍ -

১. অর্থ : ইবনে উমর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, পবিত্রতা ছাড়া কোনো নামাজ কবুল হয় না এবং খেয়ানতকৃত মাল দ্বারা সদকাও কবুল হয় না। হান্নাদ 'বিগাইরি তুহুর' শব্দটির স্থলে 'ইল্লা বি-তুহুর' শব্দ বলেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এই হাদিসটি এই অনুচ্ছেদে বিশুদ্ধতম ও সর্বোত্তম। আবুল মালিহ তাঁর পিতা থেকে এবং আবু হুরায়রা (রা.) ও আনাস (রা.) সূত্রে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। আবুল মালিহ ইবনে উসামার নাম আমির। আবার তাঁকে জায়দ ইবনে উসামা ইবনে উমায়র আলহুজালিও বলা হয়।

দরসে তিরমিযী

قوله حدثنا : এই শব্দটি পড়ার নিয়ম হলো, তার আগে পাঠ করা হয় بالسند المتصل به قال। যেটি بالسند المتصل ما إلى الإمام الترمذى قال منا إلى এর সংক্ষিপ্তরূপ। উত্তম পদ্ধতি হলো, দরসের শুরুতে الإمام الترمذى الحافظ أبى عيسى قال به وبه পূর্ণ এবারত পাঠ করে তারপর প্রতিটি হাদিসে পড়া শুধুমাত্র قال। এ শব্দগুলো বৃদ্ধি করা হয় এজন্য যে, হাদিসে যাতে কোনো প্রকার ভুল বর্ণনার লেশও না থাকে। এখানে

অপর আরেকটি বিষয় স্মর্তব্য যে, হাদিসগুলোর সনদে সাধারণত সনদের প্রাথমিক দুই তিনজন বর্ণনাকারি পর্যন্ত حدثنا এবং أخبرنا ব্যবহৃত হয়। অত:পর তার পরবর্তী বর্ণনাকারিগণ সাধারণত عن عن করে হাদিস বর্ণনা করেন। হজরত শাহ সাহেব (র.)-এর কারণ বর্ণনা করেছেন যে, মূলত মুতাকাদ্দিমিনের মধ্যে তাদলিসের প্রচলন ছিলো কম, পরবর্তীদের মাঝে এটি বৃদ্ধি পেয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার (র.) তাবেয়ি যুগের মুদাল্লিসগণের কথা আলোচনা করেছেন যে, তাদের সংখ্যা ৩৫-এর উর্ধ্বে নয়। এর পরিপন্থী নিচের রাবিদের মাঝে মুদাল্লিসের সংখ্যা শতাধিক। পরবর্তীতে তো মুদাল্লিসদের সংখ্যা বর্ণনা করা খুবই মুশকিল। মোটকথা, পূর্ববর্তীগণের মাঝে তাদলিস যেহেতু কম ছিলো তাই عن عنه-এর পদ্ধতিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হতো না। পরবর্তীতে এর প্রচলন বৃদ্ধি পাওয়ায় أخبرنا ،حدثنا বলার সুস্পষ্ট শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

ابن শব্দের همزه প্রসঙ্গে আলোচনা

قوله قتيبة بن سعيد : 'আদাবুল কাতেব' নামক গ্রন্থে আল্লামা ইবনে কুতায়বা[১] (র.) এ মূলনীতিগুলো বর্ণনা করেছেন যে, باب ألف الوصل فى الأسماء-এর همزه কোথায় লিখতে হবে আর কোথায় লিখতে হবে না। এসব মূলনীতির সারনির্যাস হলো, ابن -এর همزة তখন লেখায় উহ্য হয়ে যাবে যখন এটি দুটি পরস্পর বংশের নামের মাঝে হয় এবং ابن শব্দটি প্রথম নামের সিফত ও مفرد হয়। এর একটি শর্তও বাদ পড়লে همزه লিখতে হবে। অতএব الحسن والحسين ابنا فاطمة، حسن ابن فاطمة এবং إن زيدا ابن على এ همزه লিখতে হবে।

খুরাসানের মুহাদ্দিস কুতাইবা ইবনে সাইদ, ইমাম মালেক (র.)-আর ছাত্র। ইবনে মাজাহ ছাড়া সিহাহ সিত্তার অন্যান্য গ্রন্থকার তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর নিভরযোগ্যতার ব্যাপারে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম একমত রয়েছে।

قوله اخبرنا : অর্থাৎ انا । মুহাদ্দিসিনের নিয়ম হলো, তাঁরা সনদের মাঝে حدثنا কে ثنا এবং أخبرنا কে انا এবং انبانا কে نبا লেখেন। কিন্তু পঠনকালে قال انبأنا، قال اخبرنا، قال حدثنا পড়া উচিত।

قوله أبو عوانة : একজন মশহুর মুহাদ্দিস। তাঁর নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। অবশ্য ইকরিমা হতে বর্ণিত তাঁর বর্ণনাগুলো সন্দেহযুক্ত। তাকে যাঁরা مضطرب الحديث সাব্যস্ত করেছেন তাঁদের

টীকা- ১. কোতায়বা বলেছেন, ابن শব্দটি যদি মিলিত হয় নামের সাথে এবং একটি সিফত হয় তাহলে আলিফ ছাড়া লিখবেন। যেমন আপনি বলবেন, هذا محمد بن عبد الله ورأيت محمد بن عبد الله । যদি অন্য কিছুর দিকে এটাকে اضافت করা হয়, তবে আলিফ ঠিক রাখবেন। যেমন هذا زيد ابنك । এমন করে যদি ابن শব্দটি খবর হয়, তবুও আলিফ ঠিক থাকবে। যেমন আপনার বক্তব্য اظن محمد ابن عبد الله । কোরআন শরিফে আছে قالت اليهود غزير ابن الله কেনোনা এটি খবর। আর যদি ابن শব্দটি উল্লেখ করেন, তবে তাতে আলিফ সংযুক্ত করবেন। চাই সিফত হোক বা খবর। তখন বলবেন قال عبد الله وزيد ابنا محمد । আর যদি আপনি নাম ছাড়া শুধু ابن শব্দ উল্লেখ করেন, বলেন جائنا ابن عبد الله তাহলে আলিফসহ লিখবেন। আর যদি তাঁর পিতা ছাড়া অন্য কারো দিকে সম্বোধন করে বলেন, هذا محمد ابن اخى عبد الله তখন তাতে আলিফ সংযুক্ত করবেন আলিফ। আর যদি এটাকে কোনো উপাধির দিকে সম্বোধন করেন, যে উপাধিটি তার পিতার নামের ওপর প্রবলতা অর্জন করেছে, অথবা কোনো প্রসিদ্ধ শিল্পের দিকে সম্বোধন করেন, যা দ্বারা তিনি পরিচিত, যেমন, আপনার বক্তব্য زيد بن القاضى ومحمد بن الامير তবে আলিফ সংযুক্ত করবেন না। কারণ, এটা পিতার নামের স্থলাভিষিক্ত হয়। যদি ابن শব্দে আলিফ সংযুক্ত না করেন তবে তাতে তানভিন দিবেন না। আর যদি তাতে আলিফ সংযুক্ত করেন, তাহলে নামের মধ্যে তানভিন দিবেন। (ادب الكاتب لابن قتيبة صـ١٨٤ و ١٨٥ باب الف الوصل فى الاسماء)

এর সারসংক্ষেপ আল্লামা বোস্তানি (র.) এই লিখেছেন যে, ابن শব্দটি যদি দুটি আলম বা নামের মাঝে সিফতরূপে পতিত হয় তবে আলিফ উহ্য রাখা হবে। যদি সিফাত ছাড়া পতিত হয় তবে তা উহ্য করা হবে না অনুরূপভাবে যদি এটি পিতা ছাড়া অন্যের দিকে مضاف হয় অথবা দ্বিবচন হয় তখনও আলিফ উহ্য করা হবে না। (قطر المحيط للبستانى صـ١٤٥ .جـ١)

উদ্দেশ্যও এটাই যে, তাঁর বর্ণনা যেগুলো ইকরিমা থেকে বর্ণিত সেগুলো সন্দেহ রয়েছে।

قوله حا : সনদ পরিবর্তনের আলামত এটি। এর অর্থ হলো, সনদের একটি অংশ পরিবর্তিত হয়ে যায়। পঠন পদ্ধতি সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। পশ্চিমা ওলামায়ে কেরাম পাঠকালে এটাকে تحويل পড়েন এবং প্রাচ্যের ওলামায়ে কেরাম শুধু ح তারপর প্রাচ্যের কোনো কোনো আলেম এটাকে কসরসহ ح পড়েন। আবার কেউ মদ সহকারে حا পড়েন। হজরত শাহ সাহেব (র.) বলেছেন, কসর করে পড়া উত্তম। এর প্রমাণ হলো, সিবওয়াই লিখেছেন, হুরুফে হিজা এবং প্রতিটি দুই অক্ষরের শব্দ যার শেষে আলিফ হয়, যদি বাক্যের তারকিবে আনা হয় সেখানে মদসহকারে পড়া হবে। আর যদি উল্লেখ করা হয় তারকিব ছাড়া, তবে পড়া হবে কসর সহকারে। এর প্রমাণে ফারাজদাকের নিম্নোক্ত কাব্যটি পেশ করেছেন, ইমাম জয়নুল আবেদিনের প্রশংসায় যেটি রচনা করা হয়েছে।

ولو لا التشهد لكان لائه نعم * ما قال لا قط الا بتشهده

تحويل দু' প্রকার : ১. দুটি সনদ গ্রন্থকার থেকে স্বতন্ত্র চলবে এবং সামনের গিয়ে একত্রিত হয়ে যাবে কোনো এক বর্ণনাকারির ওপর। যে রাবির ওপর একত্রিত হবে সেটাকে 'মাদারুল ইসনাদ' অথবা 'মাখরাজুল ইসনাদ' বলা হয়। যেমন এখানে কুতায়বা এবং হান্নাদ উভয়টি আলাদা আলাদা সনদ এক ইবনে হারবের ওপর একত্রিত হয়েছ। অতএব, ইবনে হারব 'মাদারে ইসনাদ' বা সূত্রের কেন্দ্রবিন্দু। দ্বিতীয় প্রকার হলো, গ্রন্থকার থেকে একটি সনদ চলবে কিন্তু সামনে গিয়ে সূত্র আলাদা আলাদা হয়ে যাবে। সিহাহ সিত্তায় تحويل এর দ্বিতীয় প্রকার খুবই কম। আর প্রথম প্রকার অনেক।

মুহাদ্দিসিনের সাধারণ রীতি হলো, تحويل -এর সময় তাঁরা সে সূত্রের মূলপাঠটি উল্লেখ করেন যেটি আলি বা উঁচু পর্যায়ের তথা যাতে সূত্র কম হয়। এ কারণে কুতায়বার সনদ উঁচু পর্যায়ের। কারণ, এতে সিমাক পর্যন্ত দুটি সূত্র রয়েছে। কিন্তু হান্নাদের সনদ ব্যতিক্রম। সেখানে তিন সনদ রয়েছে। এজন্য ইমাম তিরমিযী (র.) কুতায়বার এই সনদের মূলপাঠ উল্লেখ করেছেন এবং হান্নাদের মূলপাঠে ভিন্নতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করে দিয়েছেন قال هناد فى حديثه الا بطهور বলে।

قال حدثنا هناد : ইনি হলেন ইবনুস সারি। কুফার বিখ্যাত মুহাদ্দিস। সারা জীবন না বিয়ে করেছেন, না তাঁর কোনো দাসি ছিলো। তিনি এজন্য 'রাহিবুল কুফা' উপাধিতে। ইমাম বোখারি (র.) ছাড়া সিহাহ সিত্তার অন্যান্য সংকলক তাঁর হাদিস বর্ণনা করেছেন।

وقيع بن الجراح : তিনি তাঁর যুগের সবচেয়ে বড় আলেম ও হাফেজ মুহাদ্দিস। ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর ছাত্র। ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর শিক্ষক।

قوله عن إسرائيل : তিনি ইসরাইল ইবনে ইউনুস। তিনি খ্যাতনামা মুহাদ্দিস আবু ইসহাক সাবেয়ির ছেলে। তিনি মুহাদ্দিস হওয়ার সাথে সাথে জারহ ও তা'দিলেরও ইমাম। কেউ কেউ তাঁর নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে প্রশ্নোত্থাপন করেছেন। কিন্তু মুহাক্কিকিনের মতে এ বক্তব্য কম।

مصعب بن سعد : মহান তাবেয়িগণের একজন। সর্বসম্মতিক্রমে তিনি নির্ভরযোগ্য।

قوله لا تقبل : কবুল দুটি অর্থে ব্যবহৃত। এক. কবুলে ইসাবাত। দুই. কবুলে ইজাবাত। প্রথমটির অর্থ হলো كون الشئ مستجمعا لجميع الشرائط والاركان অর্থাৎ, কোনো কিছু সমস্ত শর্ত ও রোকনের সমন্বয়কারি হওয়া। এই অর্থ হিসেবে এটি বিশুদ্ধতার সমার্থবোধক। পার্থিব হিসেবে এর ফল দায়মুক্তি। আর কবুলে ইজাবাতের অর্থ হলো وقوع الشئ فى حيز مرضاة الرب سبحانه وتعالى তথা কোনো কিছু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার সন্তুষ্টির যোগ্য হওয়া। এর ফল হলো, পরকালীন সওয়াব। কোরআন ও হাদিসের কবুল শব্দটি

ব্যবহৃত হয়েছে উভয় অর্থে। যেমন, একটি প্রসিদ্ধ হাদিস–

لايقبل الله الصلوة حائض الا بخمار، ابو داود ج١ ص٩٤ كتاب الصلوة باب المرأة تصلى بغير خمار

এখানে কবুল দ্বারা উদ্দেশ্য কবুলে ইসাবাত। অন্যদিকে من شرب الخمر لم تقبل له صلوة اربعين صباحا، হাদিসে কবুলে ترمذى ج٢ ص١٦ ابواب الأشربة باب ما جاء فى شارب الخمر او كما قال صلى الله عليه وسلم ইজাবাত উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন : কবুল শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি? হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেছেন যে, কবুল শব্দটি ইজাবাতের অর্থে হাকিকত, আর ইসাবাতের অর্থে রূপক। কিন্তু 'ফাতহুল মুলহিমে' আল্লামা উসমানি (র.) এটাকে এর বিপরীত ইসাবাতের অর্থে হাকিকত (প্রকৃত অর্থ) এবং ইজাবাতের অর্থে রূপক সাব্যস্ত করেছেন।

জবাব : দেখার বিষয় হলো, এই হাদিসে কবুল দ্বারা কোন অর্থ উদ্দেশ্য? আল্লামা তাক্বিউদ্দিন ইবনে দাকিকুল ঈদ বলেছেন, এ শব্দটি মূলত উভয় অর্থে মুশতারাক এবং কোনো একটি অর্থের কোনো প্রমাণ নেই। অতএব, আমাদের উচিত এ হাদিসের ব্যাখ্যায় নীরব থাকা। কিন্তু অধিকাংশের মতে এখানে কবুলে ইসাবাত উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায় আল্লামা উসমানির বক্তব্য মতে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না; বরং তাঁর মতে এটাই এ শব্দের প্রকৃত অর্থ। অবশ্য হাফেজ ইবনে হাজার (র.)-এর বক্তব্যের ওপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, প্রকৃত অর্থ কেনো বর্জন করা হলো? এর প্রমাণ সমস্ত উম্মতের এ কথার ওপর ঐকমত্য যে, নামাজ পবিত্রতা ব্যতিত বিশুদ্ধ ও ধর্তব্য হয় না। কিন্তু ইমাম তিরমিযী (র.)-এর আচরণ দ্বারা মনে হয় যে, তিনি এখানে কবুল দ্বারা কবুলে ইজাবাত উদ্দেশ্য করেন। কারণ, যতোটুকু পর্যন্ত কবুলে ইসাবাতের সম্পর্ক– তিনি তার পবিত্রতার ওপর স্থগিত হওয়ার জন্য স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় কায়েম করেছেন باب مفتاح الصلوة الطهور নামে। প্রকাশ থাকে যে, এখানে ইসাবাতে সালাতই উদ্দেশ্য। এবার যদি ওপরযুক্ত অধ্যায়ের হাদিসেও তাঁর মতে কবুলে ইসাবাত উদ্দেশ্য হতো তবে তিনি পুনরায় আরেকটি অধ্যায় কায়েম করতেন না। মোটকথা, অধিকাংশের মতে কবুল উদ্দেশ্য ইসাবাতই।

قوله صلوة : নফির আওতায় এটি নাকেরা। অতএব, ফায়দা দিচ্ছে ব্যাপকতার। হজরত শাহ সাহেব (র.) বলেছেন, এটি ما من رجل فى الدار এর পর্যায়ভুক্ত। অতএব, এর অর্থ হলো, কোনো নামাজ চাই যে কোনো প্রকারের হোক পবিত্রতা ব্যতিত বিশুদ্ধ হয় না। এজন্য এ হাদিসটি জমহুর এবং হানাফিদের দলিল। ইমাম মালেক (র.) থেকে একটি বর্ণনা এমনও আছে যে, তিনি পবিত্রতা ব্যতিতও দায়মুক্তির প্রবক্তা। অবশ্য নামাজ পুনরায় পড়া ওয়াজিব থেকে যায়। তবে মূলত তাঁর এই বক্তব্য প্রকৃত পবিত্রতা সংক্রান্ত, হুকমি তাহারাত সংক্রান্ত নয়। এতে বোঝা গেলো, নামাজের জন্য হুকমি পবিত্রতা ইজমায়ে উম্মত দ্বারা শর্ত। মোটকথা, এই হাদিসটি তাদের বিরুদ্ধে দলিল।

কিন্তু জানাজা নামাজ এবং সেজদায়ে তেলাওয়াত সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। ইমাম ইবনে জারির তাবারি, 'আমির শা'বি এবং ইবনে উলাইয়্যার মত হলো, জানাজা নামাজ ওজু ছাড়াও দুরুস্ত হতে পারে। এই মতটি ইমাম বোখারি (র.)-এর বলেও উল্লেখ করা হয়। কিন্তু ইমাম বোখারি (র.)-এর প্রতি এ বক্তব্য সম্বোধন করা দুরস্ত নয়। মূলত লোকজনের বিভ্রান্তি হয়েছে, এ কারণে যে, ইমাম বোখারি (র.) জানাজা নামাজ সম্পর্কে এক স্থানে লিখেছেন– إنما هو دعاء كسائر الادعية অর্থাৎ, এটি অন্যান্য দোয়া ন্যায় একটি দোয়া। এর ফলে লোকজনের বিভ্রান্তি হয়েছে যে, জানাজা নামাজও অন্যান্য দোয়ার ন্যায় ওজু ছাড়া আদায় করা যায়। অথচ ইমাম বোখারি (র.)-এর উদ্দেশ্য এটি ছিলো না; বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো জানাজা নামাজের বাস্তবতা বর্ণনা করা।

তবে সেজদায়ে তেলাওয়াত সম্পর্কে ইবনে জারির তাবারি, আমির শা'বি এবং ইবনে উলাইয়্যার ন্যায় ইমাম বোখারি (র.)-এর মত। অর্থাৎ, তাঁরা এখানে সেজদায়ে তেলাওয়াতের জন্য পবিত্রতাকে শর্ত বলেন না। তাদের প্রমাণ সহিহ বোখারিরই হজরতে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর একটি বক্তব্য দ্বারা করা হয়। যেটি প্রাসঙ্গিকভাবে

বর্ণিত হয়েছে, سجد على غير وضوء কিন্তু এর জবাব, বোখারি শরিফের উসাইলির কপিতে سجد على غير وضوء-এর স্থলে এসেছে سجد على وضوء যেটি অধিকাংশের মতের স্বপক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ। তাছাড়া ওপরযুক্ত অধ্যায়ের হাদিসটিও জমহুরের প্রমাণ। কেননা সেজদায়ে তেলাওয়াতও এক ধরনের নামাজ। যেমন এর প্রমাণ কোরআনে হাকিমে সেজদা বলে পূর্ণ নামাজ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেমন– ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا (এবং রাতে সেজদা করুন এবং দীর্ঘ রাত পর্যন্ত আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করুন।)

قوله بغير طهور : طهور শব্দটি মাসদার। আর طهور অর্থ পবিত্রতার উপকরণ। এখানে طهور এসেছে। অতএব, অর্থ হবে পবিত্রতা। যেটি প্রকৃত ও হুমকি উভয় প্রকার পবিত্রতাকে শামিল করে। এই হাদিসের আওতায় হাদিসের ব্যাখ্যাকারগণ দুটি ফিক্‌হি মাসআলা উল্লেখ করেন।

প্রথম মাসআলা فاقد الطهورين -এর মাসআলা। অর্থাৎ, যার নিকট না পানি আছে না মাটি, সে কি করবে? এই পদ্ধতি প্রাচীন যুগে তো খুবই কম ছিলো। কিন্তু বর্তমানে উড়োজাহাজে এ অবস্থার সম্মুখীন প্রচুর হতে হয়। মোটকথা, এ বিষয়টিতে ভীষণ মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মত হলো, এমতাবস্থায় নামাজ পড়বে না, পরবর্তীতে কাজা করবে। ইমাম আহমদ (র.)-এর মত হলো তখন নামাজ পড়বে। পরবর্তীতে কাজাও ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক (র.)-এর মত হলো, এমন ব্যক্তি থেকে নামাজ বাদ হয়ে যায়। তার ওপর তখনও নামাজ পড়া জরুরি নয় এবং পরেও কাজা করবে না। এ ব্যাপারে চারটি বক্তব্য ইমাম শাফেয়ি (র.) থেকে বর্ণিত আছে। এক. ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মত। দুই. ইমাম আহমদ (র.)-এর ন্যায়। এই বক্তব্য অবলম্বন করেছেন আল্লামা মুজানি (র.)। তৃতীয় বক্তব্য হলো, নামাজ পড়ে নিবে মোস্তাহাবরূপে, আর নামাজ কাজা করে নিবে ওয়াজিবরূপে। চতুর্থ বক্তব্য হলো, নামাজও পড়বে আবার কাজাও করবে। তাঁর বিশুদ্ধতম বক্তব্য এটাই।

ইমাম আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ (র.)-এর মত হচ্ছে, এ ব্যক্তি তখন শুধু মুসল্লিদের সাথে সামঞ্জস্য অবলম্বন করবে অর্থাৎ, নামাজের রূপ ধারণ করবে, কেরাত পাঠ করবে না। পরবর্তীতে তার ওপর কাজা আবশ্যক। ইমাম আবু হানিফা (র.)-এরও এই বক্তব্যের দিকে প্রত্যাবর্তন প্রমাণিত আছে। হানাফিদের নিকট এর ওপরই ফতওয়া। এ বক্তব্যট ফিক্‌হিভাবে অধিক যুক্তিসম্মত। কারণ, শরি'য়তে এর বিভিন্ন নজির পাওয়া যায়। যখন কোনো ব্যক্তি প্রকৃতভাবে কোনো ইবাদাত সক্ষম না হয় তখন তাকে সামঞ্জস্য অবলম্বনের হুকুম দেয়া হয়েছে। যেমন, কোনো শিশু যদি রমজানের দিনে বালেগ হয়ে যায়, অথবা কাফের মুসলমান হয়ে যায়, অথবা ঋতুবতী মহিলা পবিত্র হয়ে যায় তবে তাদেরকে অবশিষ্ট দিন (খানাপিনা, সহবাস) থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা রোজাদারদের সাথে সামঞ্জস্যের নামান্তর। এমনভাবে কারো হজ্জ ফাসেদ হয়ে গেলে তাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে হজ্জের অবশিষ্ট কাজগুলো যেনো সে অন্যান্য হাজির ন্যায় আদায় করে, যা হাজিদের সাথে সামঞ্জস্যের অন্তর্ভুক্ত। এরই ওপর কিয়াস করে فاقد الطهورين কে নামাজিদের সাথে সামঞ্জস্য অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা শরি'য়াতের মূলনীতি মুতাবিক। আর ওপরযুক্ত অধ্যায়ের হাদিসটিও হানাফিদের সহায়তা করে। কারণ, এ হাদিসের আলোকে কোনো প্রকার নামাজ পবিত্রতা ছাড়া বিশুদ্ধ হয় না। এতে অন্তর্ভুক্ত فاقد الطهورين -এর নামাজও।

بناء-এর মাসআলা

প্রশ্ন : এ হাদিসের আওতায় দ্বিতীয় যে ফিক্‌হি বিষয়টি বর্ণনা করা হয় সেটি হচ্ছে, بناء-এর মাসআলা। হানাফিদের মতে যদি নামাজের মধ্যখানে কোনো মুসল্লি অপবিত্র হয়ে যায়, তাহলে তার জন্য নামাজ থেকে গিয়ে ওজু করে ফিরে এসে পূর্ববর্তী কাজের ওপর নামাজের বিনা করা জায়েজ আছে। শাফেয়ি মতাবলম্বী ও অন্যান্যদের নিকট এই পদ্ধতি জায়েজ নেই। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি (র.) শাফেয়ি মতাবলম্বীদের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে উক্ত হাদিস দ্বারা হানাফিদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করেছেন। কারণ, যতোটুকু পর্যন্ত পবিত্রতাহীন

অবস্থায় অতিক্রম করবে ততোটুকু হবে পবিত্রতাহীন নামাজ, উক্ত অধ্যায়ের হাদিসের আলোকে নাজায়েজ।

জবাব : ওজুর জন্য যাওয়া নামাজের অংশ নয়। তাই বিনাকারিকে নামাজ আরম্ভ করতে হয় সেখান থেকেই যেখান থেকে সে অপবিত্র হয়েছিলো। যদি যাতায়াত নামাজের অংশ হতো তবে এতোটুকু সময়ে ইমাম যতোটুকু নামাজ পড়েছেন বিনাকারির জন্য কথা ছিলো তা পুনরায় পড়ার প্রয়োজন না হবার।

প্রশ্ন : যদি যাতায়াত নামাজের অংশ না হয় সেটি তাহলে আমলে কাসির হবে। আর নামাজের মাঝে আমলে কাসির হয়ে নামাজ ফাসেদ হয়ে যায়। তাছাড়া যদি এটি নামাজ না হয় তবে তাতে উচিত ছিলো কথাবার্তা বলার অনুমতি হওয়া।

জবাব : এ আমলে কাসির দ্বারা নামাজ ফাসেদ না হওয়া এবং এর মাঝে কথাবার্তা নিষিদ্ধ হওয়া সবই কিয়াস পরিপন্থীভাবে সে হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যেটি ইবনে মাজাহ এবং আবদুর রাজ্জাক হজরত আয়েশা (র.) থেকে মারফু' সূত্রে এবং দারাকুতনি হজরত আবু সায়িদ খুদরি (রা.) থেকে এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيئ او رعاف او قلس او مذى فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلوته وهو فى ذلك لا يتكلم، لفظه ـ لابن ماجة صـ٨٥

(كتاب الصلوة باب ماجاء فى البناء على الصلوة)

'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে বমি করেছে অথবা তার নাক দিয়ে রক্ত ঝরেছে অথবা তার মুখে বমির পানি এসেছে অথবা মজি বেরিয়েছে সে যেনো অবশ্যই ফিরে গিয়ে ওজু করে। তারপর তার নামাজের ওপর অনুসরণ করে। তথা আগে নামাজ যেখানে ছেড়ে গেছে সেখান থেকে আরম্ভ করে, মধ্যখানে যদি কথা না বলে।'

প্রশ্ন : এখন প্রশ্ন, সবগুলো সূত্র এ হাদিসের দুর্বল। ইবনে মাজার বর্ণনা ইসমাইল ইবনে আইয়াশ ইবনে জুরাইজ সূত্রে বর্ণিত। ইসমাইল ইবনে আইয়াশের বর্ণনা শামি ছাড়া অন্যদের নিকট থেকে গ্রহণযোগ্য নয় এবং ইবনে জুরাইজ হলেন হিজাজের অধিবাসী[১] এবং আব্দুর রাজ্জাকের বর্ণনা সুলায়মান ইবনে আরকাম নামক একজন অপাংক্তেয় বর্ণনাকারি রয়েছেন। 'সুনানে দারাকুতনি'তে আবু সায়িদ খুদরি (রা.)-এর বর্ণনায় আবু বকর আদ্-দাহেরি একজন দুর্বল রাবি। ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় উমর ইবনে রিয়াহ দুর্বল। এজন্য এ হাদিসটি নির্ভরযোগ্য নয়।

জবাব : এই প্রশ্নের তিনটি জবাব রয়েছে। ১. অনেক সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণিত। একটি হাদিস যদি অনেক সূত্রে বর্ণিত হয় তবে সেটি হয়ে যায় হাসান লিগাইরিহি। যা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা জায়েজ।

২. যদিও এই হাদিসের মুত্তাসিল সূত্রগুলো দুর্বল কিন্তু মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক সুনানে দারাকুতনি এবং ইবনে আকি হাতেমের ইলালুল হাদিসে এই হাদিসটি ইবনে আবু মুলায়িকা থেকে মুরসালরূপেও বর্ণিত আছে। আর এ সূত্রটি সনদগতভাবেও বিশুদ্ধ।[২] এ কারণে ইবনে আবি হাতেম ইলালে[৩] দাকোতনি সুনানে এই মুরসাল সূত্রটিকে বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করেছেন। তাছাড়া ইমাম বায়হাকি (র.) এ হাদিসটিকে ইবনে জুরাইজ-জুরাইজ সূত্রে

টীকা- ১. 'আন্-নাসিখ ওয়াল-মানসূখ' গ্রন্থে হাজেমি (র.) বলেছেন, ইসমাইল ইবনে আইয়্যাশকে শুধু শামি রাবিদের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে, অন্যদের ব্যাপারে নয়। কারণ, তিনি ছিলেন শামের অধিবাসী। কারণ, প্রতিটি শহরের অধিবাসীর একটি পরিভাষা আছে হাদিস গ্রহণের ধরনের ক্ষেত্রে, নম্রতা ও কঠোরতা ইত্যাদি বিষয়ে। আর একজন ব্যক্তি তার শহরের লোকদের পরিভাষা সম্পর্কে অধিক জ্ঞানবান হয়। এমনভাবে তার অপরিচিতদের হাদিসগুলোর মধ্যে মুনকার পাওয়া যায়। কাজেই শামিদের থেকে মুহাদ্দিসিন যেসব হাদিস পেয়েছেন সেগুলো দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। আর হিজাজ, কুফা ইত্যাদি এলাকার অধিবাসীদের থেকে যেসব বর্ণনা পেয়েছেন সেগুলো তারা বর্জন করেছেন। –আত্ তা'লিকুল মুগনি : ১/১৫৪; নসবুর রায়াহ : ১/৩৮

টীকা- ২. ইমাম দারাকুতনি (র.) ও এই হাদিসটি ইবনে জুরাইজের সনদে তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন মুরসালরূপে। ইবনে জুরাইজের শিষ্যগণ বলেছেন, হাফেজে হাদিসগণ ইবনে জুরাইজ সূত্রে তাঁর পিতা হতে মুরসালরূপে হাদিস বর্ণনা করেন– ১/১৫৪।

টীকা- ৩. ইলালুল হাদিস-ইবনে আকি হাতেম, ছাপা বাগদাদ : ১৩৪৩।।

মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন এবং এটাকে বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করেছেন। আমাদের মতে এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে মুরসাল হাদিস দলিল।

৩. এ হাদিসের এ বিষয়টি মওকুফরূপে প্রমাণিত হয়েছে। তাই দারাকুতনি হজরত আলি (রা.)-এর বক্তব্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

حدثنا يزيد بن الحسين بن يزيد البزاز نا محمد بن اسماعيل الحسانى نا وكيع نا على بن صالح وإسرائيل عن أبى اسحاق عن عاصم بن على قال صلوته ما لم يتكلم .

(دار قطنى جـ١، صـ١٥٦، كتاب الطهارة باب فى الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقئ والحجامة ونحوه)

'আসেম ইবনে আলি বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার পেটে বমি অনুভব করে কিংবা নাক দিয়ে রক্ত ঝরবে মনে করে, তাহলে সে গিয়ে ওজু করবে (বমি বা রক্ত ঝরার পর)। তারপর তার পূর্ব নামাজের ওপর ভিত্তি করে নামাজ পড়বে, যতোক্ষণ না সে কথা বলে। এখানে নীরবতা অবলম্বন করেছেন দারাকুতনি (র.) এবং দারাকুতনির টীকাকার আল্লামা আজিমাবাদি। ইমাম বায়হাকি[১] (র.)-এ এ বর্ণনাটি তিনটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারি আমির ইবনে জামুরাকে নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, কিন্তু হাফেজ মারদিনি (র.) 'আল-জাওয়াহারুন্নাকি ফির রদ্দি আলাল বায়হাকি'তে লিখেছেন, এই বর্ণনাটিই মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে বর্ণিত হয়েছে সহিহ[২] হাদিসের শর্তে উন্নীত সনদে।

তাছাড়া : سنن بيهقى[৩] ابواب الصلوة باب من قال يبنى من سبقه الحديث على ما مضى من صلوته তে হজরত ইবনে উমর (রা.)-এর আছর বর্ণিত হয়েছে।

نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه كان اذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى على ما صلى ولم يتكلم .

'যখন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর নাক দিয়ে রক্ত ঝরতো তখন তিনি ফিরে গিয়ে ওজু করতেন। তারপর ফিরে এসে নামাজ পড়তে আরম্ভ করতেন। পূর্বে যতোটুকু নামাজ পড়েছেন সেখান থেকে মাঝখানে কথাবার্তা বলতেন না।

ইমাম বায়হাকি (র.)-এর বিবরণের পর বলেন, এ হাদিসটি ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বিশুদ্ধ। তাছাড়া ইমাম বায়হাকি (র.) হজরত সালমান ফারসি (রা.) এবং ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এ ধরনের আছর বর্ণনা করেছেন। এসব আছর যদিও মওকুফ কিন্তু যেহেতু বিষয়টি যুক্তির আলোকে অনুধাবনযোগ্য নয়, বরং যুক্তি পরিপন্থী। এ কারণে এসব আছর মারফু'-এর পর্যায়ভুক্ত এবং ওপরযুক্ত মারফু' হাদিসটিকেও এসবের আলোকে সহিহ বলা যায়।

قوله ولا صدقة من غلول : غلول শব্দটি باب نصر-এর মাসদার। এর অর্থ গনিমতের মালে খেয়ানত করা। তারপর প্রতিটি আমানত খেয়ানত করাকে গুলুল বলা হয় ব্যাপক আকারে। কোনো কোনো হানাফি ফকিহ বলেছেন, এ হাদিসে গুলুল দ্বারা উদ্দেশ্য সেসব কামাই যা অবৈধ পন্থায় অর্জিত হয়েছে। আর হাদিসের অর্থ হলো অবৈধ আয় থেকে কোনো সদকা কবুল হয় না। যদি এখানে কবুল দ্বারা কবুলে ইসাবাত উদ্দেশ্য হয়, তবে এ হাদিসটি সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যখন অবৈধ আয়ের আসল মালেক জানা থাকে। কারণ, এমতাবস্থায় সদকা

টীকা- ১. বায়হাকি ২/২৫৬।

টীকা- ২. ইবনে আবু হাতেম এটাকে বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন ইলালে : ১/৩১০।

সম্পূর্ণ অবৈধ; বরং মূল মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। আর যদি কবুল দ্বারা কবুলে ইজাবাত উদ্দেশ্য হয়, তবে তাতে সে পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত হবে যখন মালিক অজানা থাকে। হানাফিদের মতে এমন ব্যক্তির ওপর সদকা করা ওয়াজিব; কিন্তু সদকা করার সময় তাকে সওয়াবের নিয়ত না রাখা উচিত; বরং দায়মুক্তির নিয়ত করতে হবে।

যার মূল মালিক অজানা সেই সম্পদ বা আয় সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মত এটাই। সুনানে দারাকুতনিতে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবু হানিফা (র.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, আপনি এ হুকুম কোত্থেকে উৎসারণ করেছেন? প্রতিউত্তরে ইমাম সাহেব বললেন, আসেম ইবনে কুলাইবের হাদিস থেকে। আসেম ইবনে কুলাইবের হাদিস ইমাম আবু দাউদ সুনানে আবি দাউদে বর্ণনা করেছেন যে, এক মহিলা রাসূল ﷺ-কে দাওয়াত করেছিলো। রাসূল ﷺ গোশত ভক্ষণের সময় বললেন, মনে হচ্ছে বকরি গ্রহণ করা হয়েছে মালিকের অনুমতি ব্যতিত। যাচাই করার পর মহিলা বললো, আমি বকরি ক্রয়ের জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠিয়েছিলাম; কিন্তু বকরি পাওয়া যায়নি। অত:পর আমি আমার প্রতিবেশীর নিকট থেকে বকরি কিনতে চাইলাম। ঘটনাক্রমে তিনিও উপস্থিত ছিলেন না। তার অনুমতি ব্যতিত তার স্ত্রী এ বকরি আমার নিকট পাঠিয়ে দেন। এ শুনে প্রিয়নবী ﷺ বললেন, এটা কয়েদিদেরকে খাইয়ে দাও। এতে বোঝা যায়, নাজায়েজ মালিকানা সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। অবশ্য তাতে সওয়াবের নিয়ত না হওয়া চাই; বরং নিয়ত রাখবে দায় মুক্তির।

আল্লামা ইবনে কাইয়িম (র.) বলেন, আল্লাহর রহমতে সওয়াবের আশা করলেও কোনো ক্ষতি নেই। আমাদের মাশায়েখ বলেছেন, মূলত সওয়াবের দিক রয়েছে দুটি। এক) সদকার সওয়াব। দুই) আল্লাহর আনুগত্যের সওয়াব। এখানে সদকার সওয়াব তো পাওয়া যাবে না। কিন্তু আনুগত্যের সওয়াব অবশ্য পাবে। কারণ, সে আল্লাহর নির্দেশ মান্য করার জন্য এটাকে নিজে ব্যবহার করার পরিবর্তে অন্যকে দান করে দিয়েছে। এটা হলো ওলামায়ে কিরামের বিভিন্ন বক্তব্যর মাঝে উত্তম সামঞ্জস্য বিধান।

قوله هذا الحديث اصح فى هذا الباب : বিভিন্ন হাদিসের ক্ষেত্রে এ শব্দটি ইমাম তিরমিযী (র) ব্যবহার করেন। এর অর্থ হয় এই অধ্যায়ের এ হাদিসটি সর্বোৎকৃষ্ট সনদে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর ফলে এটা জরুরি নয় যে, এ হাদিসটি মূলগতভাবেও সহিহ অথবা হাসান হবে; বরং কোনো কোনো সময় হাদিস দুর্বল হয়। কিন্তু যেহেতু এ অধ্যায়ে এর চেয়ে উত্তম সনদযুক্ত কোনো হাদিস থাকে না এ জন্য এটাকে বলে দেওয়া হয় اصح অথবা احسن। অবশ্য ওপরযুক্ত হাদিসটি সত্তাগতভাবেও সহিহ।

قوله وفى الباب : আমরা মুকাদ্দামায় লিখেছি ইমাম তিরমিযী (র.)-এর নিয়ম হলো, তিনি সাধারণত একটি অধ্যায়ে শুধুমাত্র একটি হাদিস উল্লেখ করেন। আর এ অধ্যায়ের অবশিষ্ট হাদিসগুলোর و فى الباب... শিরোনামে ইঙ্গিতে উল্লেখ করেন। হাফেজ ইরাকি (র.) লিখেছেন, ইমাম তিরমিযী (র.) যেসব সাহাবির নামে বরাত দেন এর দ্বারা ইমাম তিরমিযীর উদ্দেশ্য এটা হয় না যে, উপরিউক্ত হাদিসের এ মূল পাঠটিই এ সমস্ত সাহাবি থেকে বর্ণিত; বরং এর উদ্দেশ্য হয়, এসব সাহাবি থেকে এমন এমন হাদিস বর্ণিত আছে যেগুলো এ অধ্যায়ের আওতায় আসতে পারে, এগুলোর শব্দ যাই হোক না কেনো।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ فَضْلِ الطُّهُوْرِ (٣)

অনুচ্ছেদ- ২ : পবিত্রতা অর্জনের ফজিলত (মতন ৩)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهٗ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهٖ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ

قَطْرِ الْمَاءِ اَوْ نَحْوَ هٰذَا وَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِّنَ الذُّنُوْبِ .

২. অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কোনো মুসলিম অথবা মুমিন বান্দা ওজু করে, তার চেহারা ধৌত করে, তার চেহারা থেকে সেসব গোনাহ পানির সাথে অথবা পানির সর্বশেষ ফোঁটার সাথে অথবা অনুরূপ (সমার্থবোধক শব্দ) দূর হয়ে যায়, তার দুই চোখে যেগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করেছে। আর যখন তার হস্তদ্বয় ধৌত করে তখন তার দু'হাত থেকে পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে সেসব গোনাহ বের হয়ে যায়, যেগুলো তার হস্ত দ্বারা সম্পাদন করেছে। অবশেষে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় সে গোনাহ থেকে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি হাসান সহিহ। এটি হলো মালেক-সুহাইল-তাঁর পিতা-আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস। সুহাইলের পিতা আবু সালেহ বলেন, আবু সালেহ আস্-সাম্মান, তাঁর নাম জাকওয়ান।

০ হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর নামের ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। অনেকে বলেছেন, আব্দ শামস, আবার অনেকে বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর।

মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল তাই বলেছেন। আর এটাই বিশুদ্ধতম বক্তব্য। এ অনুচ্ছেদে উসমান, সাওবান, সুনাবিহি, আমর ইবনে আম্বাসা, সালমান ও আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে হাদিস বর্ণিত আছে। আর এই সুনাবিহি যিনি পবিত্রতা অর্জনের ফজিলত সম্পর্কে নবী করিম ﷺ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি হলেন, আব্দুল্লাহ সুনাবিহি। যিনি আবু বকর সিদ্দিক (রা.) থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন সে সুনাবিহি নবী করিম ﷺ থেকে (হাদিস) শ্রবণ করেননি। তাঁর নাম আব্দুর রহমান ইবনে উসাইলা। তাঁর উপনাম আবু আব্দুল্লাহ। তিনি রাসূলে আকরাম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য রওয়ানা হয়েছিলেন। তিনি পথিমধ্যে থাকা অবস্থায়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত হয়ে যায়। (বিভিন্ন সূত্রে) তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হজরত সুনাবিহ ইবনুল আ'সার আল-আহমাসি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবি। তাঁকে সুনাবিহিও বলা হয়। তাঁর হাদিস হলো, তিনি বলেছেন, 'আমি রাসূলে আকরাম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমি অন্যান্য উম্মতের ওপর গর্ব করবো তোমাদের আধিক্য নিয়ে। অতএব, আমার পর তোমরা মারামারি-খুনাখুনি করবে না।'

দরসে তিরমিযী

قوله اسحاق بن موسى الانصار : ইমাম তিরমিযী (র.)-এর একজন বিশিষ্ট উস্তাদ। ইমাম তিরমিযী (র.) যখন حدثنا الانصارى বলেন, তখন এই ইসহাক ইবনে মুসা আল-আনসারিই উদ্দেশ্য হয়। সর্বসম্মতিক্রমে ثقة।

قوله معن بن عيسى : ইমাম মালেক (র.)-এর বিশিষ্ট ছাত্র । ইমাম মালেক (র.)-এর বর্ণনার ব্যাপারে 'সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বলা হয়েছে তাঁকে।'

قوله سهيل بن أبى صالح : তাঁর পিতার নাম জাকওয়ান। উপাধি সাম্মান। সুহাইল নির্ভরযোগ্য; কিন্তু শেষযুগে তাঁর স্মরণশক্তিতে গোলমাল দেখা দিয়েছে। আল্লামা ইবনে মাইন (র.) বলেছেন, ইমাম মালেক (র.) তাঁর থেকে যেসব বর্ণনা গ্রহণ করেছেন সেগুলো ছিলো গোলমালের পূর্বেকার। এজন্য ওপরযুক্ত অধ্যায়ের হাদিসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে এর ফলে কোনো পার্থক্য হবে না এর দ্বারা।

عن أبى هريرة رضى الله عنه : সুবিখ্যাত সাহাবি। ৭ম হিজরিতে খায়বারের যুদ্ধের সময় তিনি ঈমান এনেছেন। সকাল-বিকাল নবী করিম ﷺ-এর খেদমত ও সোহবতে থেকে ধারাবাহিকভাবে ফয়েজ লাভ করেছেন।

এ কারণেই তাঁর হাদিস সংখ্যা ৫৩৬৪। যা অন্য সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনা অপেক্ষা অধিক এবং এর কারণ বর্ণনা করা হয় যে, তিনি নিজেকে বিশেষিত করে নিয়েছিলেন অন্য সমস্ত ব্যস্ততা থেকে অবসর করে হাদিস শিক্ষা ও শিখানোর কাজে।

০ ভীষণ মতপার্থক্য রয়েছে তাঁর নাম সম্পর্কে। এমন ভীষণ ইখতেলাফ অন্য কোনো বর্ণনাকারির নাম নিরূপণে হয়নি। এমনকি কেউ কেউ তাঁর নাম সম্পর্কে ২০টি, কেউ ৩০টি, কেউ ৪০টি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। তার মধ্য হতে ২০টি বক্তব্য 'তাদরিবুর রাবি'তে আল্লামা সুয়ুতি (র.) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনটি বক্তব্য এগুলোর মধ্য হতে অধিক মশহুর।

১. আব্দুশ্ শামস ইবনে সখর, ২. আব্দুর রহমান[১] ইবনে সখর, ৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর।

মুহাক্কিকিন প্রাধান্য দিয়েছেন যে, তাঁর জাহেলি নাম আব্দুশ্ শামস এবং ইসলামি নাম আব্দুর রহমান। ইমাম বোখারি এবং ইমাম তিরমিযীও প্রাধান্য দিয়েছেন আব্দুল্লাহ ইবনে আমরকে। এ কারণে মুসতাদরাকে হাকেম (র.) ইবনে ইসহাকের সূত্রে স্বয়ং হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে,

حدثنى بعض أصحابى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال كان اسمى فى الجاهلية عبد الشمس بن صخر فسميت فى الإسلام عبد الرحمن .

'আমার নিকট আমার কোনো কোনো সঙ্গী আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, বর্বরতার যুগে আমার নাম ছিলো আব্দুশ্ শামস ইবনে সখর, তারপর ইসলাম যুগে আমার নাম রাখা হয় আব্দুর রহমান।'

যদিও এই বর্ণনার সনদে এক ব্যক্তি অজ্ঞাত রয়েছেন, কিন্তু এই বর্ণনাটি অন্যান্য বর্ণনা অপেক্ষা প্রধান। যাই হোক, আবু হুরায়রা নিজ উপনামে এতোটা প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন যে, মানুষের মন থেকে যেনো মুছে গেছে তাঁর আসল নাম।

আবু হুরায়রা উপনাম হওয়ার কারণ, তাবাকাতে ইবনে সা'দের একটি বর্ণানায় হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে,

قال كانت هريرة صغيرة فكنت اذا كان فى الليل وضعتها فى شجرة فاذا اصحبت اخذتها فلعبت بها فكنونى ابا هريرة .

'আমার একটি ছোট বিড়াল ছানা ছিলো। আমি এটিকে রাত হলে গাছে রেখে দিতাম, সকাল হলে সেটি নিয়ে খেলা করতাম। এজন্য লোকেরা আবু হুরায়রা আমার উপনাম দিয়েছে।'

ইমাম তিরমিযী (র.)ও আবওয়াবুল মানাকিবে হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন,

كنت ارعى غنم اهلى وكانت لى هريرة صغيرة اضعها بالليل فى شجرة فاذا كان النهار ذهبت بها معى فلعبت بها فكنونى ابا هريرة .

'আমার পরিবারের ছাগল আমি চরাতাম। আমার একটি ছোট বিড়াল ছানা ছিলো। এটিকে আমি রাতের বেলায় কোনো গাছে রেখে দিতাম। দিন হলে আমি এটি নিয়ে খেলা করতাম। ফলে লোকজন আমায় আবু হুরায়রা উপনাম দেয়।'

'আল-ইস্তি'য়াবে' আল্লামা ইবনে আব্দুল বার বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর উপনাম রেখেছিলেন রাসূল ﷺ এতে

টীকা- ১. এ বক্তব্যটিকে ইমাম নববি (র.) 'তাকরিবে' প্রধান্য দিয়েছেন। ইমাম সুয়ুতি (র.) বলেছেন– এটা হলো ইবনে ইসহাকের বক্তব্য। ইমাম আবু আহমদ আল হাকেম 'কুনায়' এবং ইমাম রাফেঈ 'তাদরিবে' এটাকে বিশুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে অন্যরাও সহিহ বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম নববি (র.) 'তাহজিবুল আসমা' গ্রন্থে ইমাম বোখারি, মুহাক্কিকিন ও অধিকাংশ ওলামা থেকে বর্ণনা করেছেন। –তাদরিবুর রাবি : ৪৫৪

কোনো বিরোধ নেই। কারণ, হয়তো প্রিয়নবী ﷺ তাঁর পুরনো উপনামটি ঠিক রেখেছিলেন। আল্লামা সুয়ুতি (র.) 'তাদরিবুর রাবিতে (৫০নং প্রকারে) বর্ণনা করেছেন যে, প্রথমে হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর উপনাম আবুল আসওয়াদ ছিলো।

আবু হুরায়রা (রা.) সম্পর্কে দ্বিতীয় আরেকটি আলোচ্য বিষয় হলো, এ শব্দটি মুনসারিফ না গায়রে মুনসারিফ। ওলামায়ে কেরামের জবানে গায়রে মুনসারিফ হওয়ার বিষয়টি প্রসিদ্ধ। কেউ কেউ বলেছেন– গায়রে মুনসারিফ হওয়ার বিষয়টি শুধুমাত্র মুখে মুখে প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণেই হয়েছে। অন্যথায় কিয়াসের দাবি ছিলো মুনসারিফ হওয়া। কারণ, এতে শুধু تانيث রয়েছে, علميت নেই। কিন্তু হজরত শাহ সাহেব (র.) এই বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেছেন, যদিও হুরায়রা শব্দটি সত্তাগতভাবে নাম নয়, কিন্তু আবু শব্দের মুজাফ ইলাইহ হওয়ার পর তাতে আলামিয়্যাত সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায় শব্দটি গায়রে মুনসারিফ হওয়া কিয়াস পরিপন্থী নয়; বরং যুক্তিযুক্ত। আরবদের নিয়ম হলো, যখন কোনো স্ত্রীলিঙ্গ শব্দকে اب অথবা ابن -এর مضاف اليه বানিয়ে তাতে বিশেষত্ব সৃষ্টি করা হয় তখন সেটাকে পড়েন গায়রে মুনসারিফই। এজন্য কায়স ইবনে মালুহের কাব্য রয়েছে,

قول وقد صاح ابن داية غدوة * ببعد النوى لا اخطأتك الشبائب

ইবনে দায়াহ এখানে কাফের উপনাম এবং এটাকে গায়রে মুনসারিফ (অপরিবর্তনশীল শব্দ) পড়া হয়েছে। এমভিাবে আবু সফরা শব্দটিকেও আরবগণ গায়রে মুনসারিফ পড়ে থাকেন।

قوله المسلمون او المؤمن : কোনো কোনো সময় او শব্দটি প্রকরণ অথবা তারদিদের জন্য হয়ে থাকে। আবার কোনো কোনো সময় বর্ণনাকারির সন্দেহের বিবরণের জন্য হয়ে থাকে। উভয়ের মাঝে পার্থক্য মূল পাঠের পূর্বাপরের নিদর্শন এবং স্বভাব দ্বারা নির্ণয় হয়ে থাকে। আল্লামা নববি (র.) বলেছেন, যেখানে او শব্দটি সন্দেহের জন্য হয়ে থাকে, সেখানে এরপর قال শব্দও পড়া উচিত। او শব্দটি এখানে সন্দেহের জন্যই।

প্রশ্ন : قوله خرجت من وجهه كل خطيئة : এখানে একটি বিষয় আল্লামা সুয়ুতি প্রমুখ আলোচনা করেছেন যে, বের হওয়ার ক্রিয়াটিতো স্বাধিষ্ট ও দেহের আবশ্যকীয় বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত। অথচ গোনাহসমূহ তো যৌগিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। গোনাহের ক্ষেত্রে বের হওয়ার প্রয়োগ হতে পারে কিভাবে? এর অনেক জবাব দেওয়া হয়েছে।

জবাব : ১. ইমাম সুয়ুতি (র.) বলেছেন, মূলত গুনাহের দিকে বের হওয়ার সম্বোধন রূপকার্থে হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য হলো, তার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

২. কাজি আবু বকর ইবনে আরাবি (র.) লেখেছেন, আসলে এখানে كل خطيئة -এর আগে একটি مضاف উহ্য রয়েছে। মূল ইবারত হলো خرجت من وجهه اثر كل خطيئة । এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, এক হাদিসে আছে, যখন বান্দা কোনো গোনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালোবিন্দু পড়ে যায়। এরপর সে যতো গোনাহ করতে থাকে ততোই এমন বিন্দু আরও সংযোগ হতে থাকে। এমনকি এক পর্যায়ে এই কালো বিন্দু রান বা মরিচার রূপ ধারণ করে। এই হাদিস থেকে জানা গেলো যে, গোনাহের কিছু চিহ্ন পরিদৃষ্টও হয়। এই হাদিসে এমন চিহ্ন বের হয়ে যাওয়ার কথাই বলা হয়েছে ওজু দ্বারা।

৩. তবে এ ব্যাপারে সর্বোত্তম জবাব দিয়েছেন হজরত শাহ সাহেব (র.)। তিনি বলেন, মূলত জগত দু'প্রকার– একটি হলো দৃশ্যমান জগৎ, যা আমাদের চোখে সচেতন অবস্থায় পরিদৃষ্ট হয়। আরেকটি হলো মিসালি জগত। পরিদৃষ্ট জগতে যেসব জিনিস যৌগিক হয়ে থাকে, সেগুলো অনেক সময় স্বাধিষ্ট ও দেহের রূপ ধারণ করে মিসাল জগতে । দৃষ্টান্ত হিসেবে, কেউ যদি স্বপ্নযোগে দুধ দেখে তবে তার ব্যাখ্যা হলো এলেম, যা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। অতএব, এলেম যেটি পরিদৃষ্ট জগতে যৌগিক বিষয় ছিলো, সেটি মিসালের জগতে একটি স্বাধিষ্ট দ্রব্য হয়ে গেছে। অনুরূপ অবস্থা সমস্ত গোনাহের। যদিও পরিদৃষ্ট জগতে সেগুলো যৌগিক; কিন্তু মিসালের জগতে এগুলোর প্রত্যেকটির দেহ এবং বিশেষ রূপ বিদ্যমান। হাদিস শরিফে বের হওয়ার প্রয়োগ সে মিসাল জগতের দিকে লক্ষ্য

করেই করা হয়েছে। এর সহায়তা বুজুর্গানে দীনের ঘটনাবলি ও কাশফসমূহ দ্বারাও হয়। যেগুলোতে তারা গোনাহসমূহকে বিভিন্ন দৈহিক আকারে দর্শন করেছেন। 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'তে হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) মিসাল জগতের হাকিকত সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

প্রশ্ন : আরেকটি আলোচ্য বিষয় হলো, এই হাদিসে ওজুর ফলে যেসব গুনাহ মাফ হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো দ্বারা কোন গোনাহ উদ্দেশ্য? সগিরা না কবিরা?

উত্তর : অধিকাংশ আলেম বলেছেন, এর দ্বারা সগিরা গুনাহ উদ্দেশ্য। কারণ, কবিরা গোনাহ তো তওবা ছাড়া মাফ হয় না। এমনভাবে যেখানে গোনাহ মাফের কথা আলোচনা করা হয়েছে সেখানে সগিরা গোনাহই উদ্দেশ্য। কোনো কোনো হাদিস দ্বারা এর সহায়তা হয়। যেমন এক হাদিসে আছে, الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة مكفرات لما بينهم ما لم تغش الكبائر 'পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং এক জুম'আ থেকে অপর জুম'আ মধ্যবর্তী সময়ের গোনাহের কাফ্ফারা, যতোক্ষণ না কবিরা গোনাহে লিপ্ত না হবে।'

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন হয়, যদি শুধু সগিরা গোনাহ মাফ হয় কবিরা গোনাহ মাফ না হয় তবে حتى يخرج نقيا من الذنوب বলার কি অর্থ?

জবাব : ১. 'আল-কাওকাবুদ্ দুররিতে এর একটি জবাব তো হজরত গাঙ্গুহি (র.) দিয়েছেন যে, এখানে সগিরা এবং কবিরা উভয় প্রকার গুনাহ উদ্দেশ্য। সেটি এমনভাবে যে, একটি প্রসিদ্ধ মূলনীতি হলো, যখন اسم مشتق (নিষ্পন্ন ইসম)-এর ওপর কোনো হুকুম লাগানো হয় তখন مادة اشتقاق (ক্রিয়ামূল) এ হুকুমের কারণ হয়ে থাকে। এখানে ওজুর হুকুম আল-মুসলিম অথবা আল-মু'মিনের ওপর লাগানো হয়েছে। যা দ্বারা বোঝা গেলো, গোনাহ মাফ তখন হবে যখন মানুষ ইসলাম এবং ঈমানের সাথে অর্থাৎ, নিজ সমস্ত অপরাধ ও গোনাহের ওপর লজ্জা প্রকাশ এবং তওবার সাথে ওজু করতে আসে। প্রকাশ থাকে যে, এমন সময় মাফ হয়ে যাবে তার সগিরা ও কবিরা সব গোনাহই।

২. কিন্তু এই জবাবেও প্রশ্ন হয় যে, তবে তো কবিরা গোনাহগুলো তওবার কারণে মাফ হলো, ওজুর কারণে নয়। অতএব, এর দ্বারা ওজুর মাহাত্ম্য ও ফজিলত কিভাবে প্রমাণিত হলো? এজন্য 'আল-কাওকাবুদ্ দুররি'র সংকলক হজরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহইয়া (র.) বলেছেন যে, এখানে শুধু সগিরা গোনাহই উদ্দেশ্য। আর حتى يخرج نقيا من الذنوب এজন্য বলা হয়েছে যে, কবিরা গোনাহে লিপ্ততা একজন মুসলমানের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। 'আল-ওয়ারদুশ্‌শাজি'তে হজরত শায়খুল হিন্দ (র.)-ও প্রায় এ ধরনের জবাব দিয়েছেন।

৩. অনেকে এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন যথার্থ সাব্যস্ত করেছেন।

৪. হজরত শাহ সাহেব (র.) বলেছেন, মূলত এখানে রয়েছে চারটি শব্দ; এগুলোর স্তরও বিভিন্ন রকম। ১. ذنب ২. خطيئة ৩. سيئة ৪. معصية। এগুলোতে মারাত্মকতার দিকে লক্ষ্য করলে ধারাবাহিকতাও অনুরূপই। অর্থাৎ, সবচেয়ে হালকা স্তর হলো প্রথমটির, তারপর দ্বিতীয়টির, তারপর তৃতীয়টির, সর্বশেষ হলো চতুর্থটির। এগুলোর মধ্য থেকে শুধু চতুর্থটি কবিরা গোনাহ হয়ে থাকে। অবশিষ্টগুলো সগিরার অন্তর্ভুক্ত। এ হাদিসে ব্যবহৃত হয়েছে خطيئة এবং ذنب শব্দ। দ্বিতীয় দুটির আলোচনা এখানে হয়নি। এগুলো সম্পর্কে এখানে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। অতএব, কবিরা গোনাহ মাফ হওয়ার কথা এখানে আলোচিত হয়নি। আর نقيا من الذنوب-এর অর্থ এটাই যে, একজন মানুষ পাক-পবিত্র হয়ে যায় সগিরা গোনাহগুলো থেকে।

قوله نظر إليها بعينيه : এই বর্ণনায় শুধু আলোচিত হয়েছে দুচোখের কথা। কিন্তু অন্যান্য বর্ণনায় নাক এবং মুখের কথাও আলোচনায় এসেছে। যা থেকে বোঝা যায়, ওজু দ্বারা নাক এবং মুখের গোনাহও মাফ হয়ে যায়।

قوله مع الماء او مع اخر قطر الماء : এখানেও أو শব্দটি সংশয়ের জন্য ব্যবহার হয়েছে। অতএব, এখানেও এরপর قال পড়তে হবে।

قوله قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح : এ হাদিসটির ক্ষেত্রে ইমাম তিরমিযী (র.) একই সময়ে এ হাদিসটির ক্ষেত্রে হাসান এবং সহিহ উভয় শব্দ প্রয়োগ করেছেন। এছাড়াও ইমাম তিরমিযী (র.) অনেক হাদিসে এমনটি করেছেন।

প্রশ্ন : একটি প্রশ্ন হলো, এলমে উসুলে হাদিসের আলোকে হাসান এবং সহিহ উভয়ের মাঝে বৈপরীত্য রয়েছে। কারণ, সহিহ-এর সংজ্ঞা হলো– ما رواه العادل التام الضبط من غير انقطاع فى الإسناد ولا علة ولا شذوذ (যেটি বর্ণনা করবেন একজন আদিল, পূর্ণাঙ্গ হাফেজ, সনদে বিচ্ছিন্নতা ব্যতিত এবং তাতে কোনো ত্রুটিও থাকবে না এবং হাদিসটি শাজও হবে না।) আর হাদিসে হাসান বলা হয়, যার মধ্যে সহিহ-এর অন্যান্য সমস্ত শর্ত বিদ্যমান। কিন্তু তাতে কোনো একজন রাবি পূর্ণাঙ্গ হিফজের অধিকারী হবে না। এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কোনো হাদিস একই সময়ে হাসান এবং সহিহ হতে পারে না। তাহলে ইমাম তিরমিযী (র.) উভয় শব্দ একত্রে প্রয়োগ করলেন কিভাবে?

জবাব : ওলামায়ে কেরাম এই প্রশ্নটির বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন, যার সংখ্যা দাঁড়ায় তেরো।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জবাব নিম্নেযুক্ত

১. 'শরহে নুখবাতুল ফিকারে' হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি (র.) লিখেছেন যে, এখানে উহ্য রয়েছে হরফে আত্ফ। তারপর এর ব্যাখ্যায়ও মতানৈক্য রয়েছে। অনেকে বলেছেন, এখানে হরফে আতফ او উহ্য রয়েছে। যেনো ইমাম তিরমিযী (র.)-এর সন্দেহ হয়েছে যে, এ হাদিসটিকে সহিহ বা হাসান কোনো প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। কিন্তু এই জবাবটি এ জন্য দুর্বল যে, ইমাম তিরমিযী (র.) শত শত হাদিস সম্পর্কে এ শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতো সুমহান মুহাদ্দিসের মাহাত্ম্যপূর্ণ শানের পরিপন্থী হলো এতোগুলো হাদিসের ব্যাপারে সন্দেহ ও দোদুল্যমানতার শিকার হওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে و উহ্য রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র.)-এর উদ্দেশ্য হলো– هذا الحديث حسن من طريق وصحيح بطريق اخر (এই হাদিসটি এক সূত্রে হাসান আরেক সূত্রে সহিহ)। কিন্তু এই জবাবটির বিশুদ্ধতা এ কথার ওপর নির্ভর করে– যে হাদিস সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী (র.) হাসান সহিহ বলেছেন, সে হাদিসের একাধিক সূত্র থাকা চাই। অথচ ইমাম তিরমিযী (র.) এমন অনেক হাদিস সম্পর্কেও 'حسن صحيح' বলেছেন, যেটি শুধু একই সূত্রে বর্ণিত। অনেকে বলেছেন মূল ইবারত এমন, هذا الحديث حسن من طريق وصحيح بطريق اخر (এ হাদিসটি এক সূত্রে হাসান অন্য সূত্রে সহিহ)। কিন্তু এসব ব্যাখ্যা প্রশান্তিদায়ক নয়। কারণ, এ ধরনের শব্দ উহ্য থাকা মশহুর নয়।

২. কেউ কেউ জবাব দিয়েছেন যে, হাসান দ্বারা হাসান লিজাতিহি এবং সহিহ দ্বারা সহিহ লিগাইরিহি উদ্দেশ্য। আর এ দুটি বিষয় একত্রিত হতে পারে। কারণ, যে বর্ণনাটি কোনো রাবির হিফজের ত্রুটির কারণে হাসান লিজাতিহি হয়েছে, সেটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে সহিহ লিগাইরিহিতে পরিণত হয়ে যায়। এ জবাবটি উত্তম ছিলো কিন্তু এখানেও সে প্রশ্ন অবশিষ্ট থেকে যায় যে, ইমাম তিরমিযী (র.) এরূপ অনেক হাদিস সম্পর্কে حسن صحيح বলে মন্তব্য করেছেন, যেগুলো শুধু একই সূত্রে বর্ণিত। তাছাড়া ইমাম তিরমিযী (র.) এমন হাদিসগুলোকেও প্রচুর পরিমাণে حسن صحيح সাব্যস্ত করেছেন, যেগুলো ইমাম বোখারি ও মুসলিম (র.) বর্ণনা করেছেন। তাঁদের হাদিসকেও হাসান সাব্যস্ত করা জটিল বিষয়।

৩. আল্লামা ইবনে কাসির (র.) বলেছেন, ইমাম তিরমিযী (র.) حسن صحيح একটি স্বতন্ত্র পরিভাষা নিরূপণ করেছেন, যেটি منزلة بين المنزلتين পর্যায়ের। এর দ্বারা উদ্দেশ্য সে হাদিস যেটি সহিহ থেকে নিম্ন পর্যায়ের এবং হাসান অপেক্ষা উচ্চ পর্যায়ের। এ জবাবটি তুলনামূলক উত্তম মনে হয়। কিন্তু এখানেও সেই প্রশ্ন

আসে যে, ইমাম তিরমিযী (র.) এমন বহু হাদিসকে حسن صحيح সাব্যস্ত করেছেন যেগুলো সহিহ বোখারি-মুসলিমে বিদ্যমান রয়েছে। বস্তুত সহিহ বোখারি-মুসলিমে কোনো হাদিসের বিদ্যমানতা এর সুস্পষ্ট নিদর্শন যে, সহিহের মাপকাঠিতে এটি পুরোপুরি উত্তীর্ণ। অতএব, এটাকে সহিহ অপেক্ষা নিম্নস্তরের হাসান সহিহ সাব্যস্ত করা কিভাবে বৈধ হতে পারে? তাছাড়া ইমাম তিরমিযী (র.) সর্বত্র হাসানের শর্তায়ন করেছেন সহিহের সাথে। এই জবাব যদি সঠিক মেনে নেওয়া হয় তাহলে এর ফল এই দাঁড়াবে যে, কোনো হাদিসই ইমাম তিরমিযী (র.)-এর মতে সহিহ নেই। কিন্তু একথাটি তো যৌক্তিক নয়।

৪. 'আল-ইকতিরাহে' এসব জবাব অপেক্ষা উত্তম একটি জবাব আল্লামা ইবনে দাকিকুল ঈদ (র.) দিয়েছেন। তিনি বলেন, মূলত হাসান এবং সহিহের পরিভাষায় বৈপরীত্য নেই। কারণ, এ দুটি আলাদা প্রকার নয়; বরং উচ্চ এবং নিচু পর্যায়ের নাম। নিম্নস্তর হলো হাসান, উঁচু স্তর হলো সহিহ এবং প্রতিটি উঁচু স্তর নিচু স্তরকে অন্তর্ভুক্ত করে। যদি হাদিস দুর্বল না হয় তাহলে সেটি হাসান। আর যদি সহিহের শর্ত-শরায়েতেও বিদ্যমান থাকে, তবে সাথে সাথে সেটি সহিহও। এমনভাবে এ দু'টির মাঝখানে সম্পর্ক عموم خصوص مطلق এর। অতএব, প্রতিটি সহিহ হাসান, এর বিপরীত নয়। যেনো হাসান এবং সহিহের মাঝে সেই সম্পর্ক যেটি উসুলে ফিকহে জাহের এবং নস-এর মাঝে হয়ে থাকে। অর্থাৎ عموم خصوص مطلق । প্রতিটি নস জাহের, এর বিপরীত নয়। হজরত শাহ সাহেব (র.)-ও পছন্দ করেছেন এবং অবলম্বন করেছেন এ জবাবটিকে।

এ ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমি বলতে চাই এই জবাবটিকে তখন বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করা যায় যখন বলা হবে যে, حسن صحيح সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী (র.)-এর এটি স্বতন্ত্র নিজস্ব পরিভাষা। অন্যথায় যতোটুকু পর্যন্ত উসুলে হাদিসের সাধারণ ওলামার সম্পর্ক রয়েছে, যদি তাদের পরিভাষা গ্রহণ করা হয়, তাহলে এ জবাবটি বিশুদ্ধ হয় না। কারণ, তাদের মতে হাসানের সংজ্ঞায় বর্ণনাকারির হিফজে ক্রুটি থাকা আবশ্যকীয় শর্ত। এর বিদ্যমানতায় কোনো হাদিস সহিহ হতে পারবে না। অতএব, উভয়ের মাঝে বৈপরীত্যের সম্পর্ক রয়েছে। জাহের এবং নস এর উদাহরণও তাদের মতোই বিশুদ্ধ হতে পারে, যারা এতদুভয়ের মাঝে عموم خصوص مطلق -এর সম্পর্ক সাব্যস্ত করেন। এ মাজহাবটি কিন্তু মুহাক্কিকিনের মতে সঠিক নয়। তাহকিকি বক্তব্য হলো– জাহের এবং নস উভয়ের মাঝে বৈপরীত্যের সম্পর্ক। কারণ, নসের ক্ষেত্রে বাক্য এর চালানো আবশ্যক। আর জাহেরের ক্ষেত্রে আবশ্যক বাক্য এর জন্য না চালানো।

সুতরাং বিশুদ্ধ বক্তব্য হলো, ইমাম তিরমিযী (র.) হাসানের সংজ্ঞায় জমহুর থেকে আলাদা স্বতন্ত্র একটি পরিভাষা নির্ধারণ করেছেন। যদি ওলামায়ে কেরাম ইমাম তিরমিযী (র.)-এর নিম্নেযুক্ত ইবারতটির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করতেন, যেটি তিনি হাসানের সংজ্ঞায় লিখেছেন, তবে বোধ হয় এই প্রশ্নই আসে না।

'কিতাবুল ইলালে'র ৫৬৫ পৃষ্ঠায় ইমাম তিরমিযী (র.) লিখেছেন,

وما قلنا في كتابنا هذا حديث حسن فكل حديث يروى ولا يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهذا عندنا حديث حسن .

'আমার এই কিতাবে যেখানে আমি বলেছি, হাদিসটি হাসান দ্বারা উদ্দেশ্য সেসব হাদিস, যেসব হাদিস এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তার সনদে কোনো মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত বর্ণনাকারি নেই এবং হাদিসটি শাজও নয়, একাধিক সূত্রে অনুরূপভাবে বর্ণিত। তাহলে আমার মতে এটি حسن হাদিস।'

এই সংজ্ঞার আলোকে ইমাম তিরমিযী (র.)-এর হাসান সে হাদিসটি, যার সনদে কোনো বর্ণনাকারি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত নন এবং হাদিসটি শাজও নয়। জমহুরের মতো তিনি রাবির স্মরণশক্তির ক্রুটিকে হাসানের জন্য শর্ত সাব্যস্ত করেন না। অতএব, এই সংজ্ঞার আলোকে হাসান ও সহিহের মাঝে আম-খাসের সম্পর্কে,

বৈপরীত্যের নয়। হাসান আম, আর সহিহ খাস। অর্থাৎ, যে বর্ণনায় ইমাম তিরমিযী (র.)-এর হাদিসে হাসানের সংজ্ঞা প্রযোজ্য হয়, যদি সেটি সাথে সাথে পূর্ণাঙ্গ স্মৃতির অধিকারী বর্ণনাকারিদের সূত্রেও বর্ণিত হয় এবং তাতে কোনো প্রকার ত্রুটিও না থাকে, তাহলে এটি একই সাথে সহিহও হবে। আর যদি বর্ণনাকারি পূর্ণাঙ্গ হিফজের অধিকারী না হয়, অথবা এই বর্ণনায় কোনো ত্রুটি পাওয়া যায় তবে সেটি সহিহ নয়, শুধু হাসান হবে।

والصنابحى هذا الذى روى عن النبى صلى الله عليه وسلم الخ : আমাদের সামনে জামে তিরমিযীর যে কপি বিদ্যমান সে মুতাবেক এই ইবারত দ্বারা ইমাম তিরমিযী (র.)-এর উদ্দেশ্য হলো, ওজুর ফজিলত সম্পর্কে একটি হাদিস, হজরত সুনাবিহি থেকে বর্ণিত আছে তাঁর নির্ধারণে সামান্য মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, হাদিস বর্ণনাকারিদের মধ্যে সুনাবিহি নামে রয়েছেন তিন মনীষী।

এক. عبد الله الصنابحى। সর্বসম্মতিক্রমে ইনি সাহাবি। প্রধান বক্তব্য মুতাবিক ওজুর ফজিলত সংক্রান্ত হাদিসটি তাঁর বর্ণিত সূত্রেই।

দুই. ابو عبد الله الصنابحى। তাঁর নাম আব্দুর রহমান ইবনে উসায়লা। ইনি মুখাজরামিনের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, ইনি রাসূল ﷺ এর সমকালীন। কিন্তু তিনি যখন প্রিয়নবী ﷺ এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে মদিনা তইয়্যিবা অভিমুখে রওয়ানা দেন, তখন জুলহুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছার পর জানতে পেলেন যে, কেবলমাত্র পাঁচ দিন আগে রাসূল ﷺ ওফাত বরণ করেছেন, সুতরাং প্রিয়নবী ﷺ থেকে তিনি সরাসরি শ্রবণ করেননি এবং তিনি যতো মারফূ হাদিস বর্ণনা করেছেন, সবগুলো মুরসাল। অবশ্য হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) থেকে তিনি হাদিস শুনেছেন।

তিন. الصنابح بن الاعصر الاحمسى। সর্বসম্মতিক্রমে ইনিও সাহাবি। তাঁকেও অনেক সময় সুনাবিহি বলা হয়। ইমাম তিরমিযী (র.)-এর এই ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য হলো, ওজুর ফজিলত সংক্রান্ত হাদিসে যার বরাত দেওয়া হয়েছে তিনি হলেন প্রথমোক্ত ব্যক্তি। অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ আস্-সুনাবিহি থেকে এ হাদিসটি বর্ণিত। ইমাম মালেক (র.)ও স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, ওজুর ফজিলত সংক্রান্ত হাদিসটির রাবি আব্দুল্লাহ আস্ সুনাবিহি।

কিন্তু ইমাম বোখারি (র.) এবং আলি ইবনুল মাদিনি (র.) এ ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য হলো, আব্দুল্লাহ আস্-সুনাবিহি নামক কোনো সাহাবি নেই। সুনাবিহি প্রয়োগ শুধুমাত্র দু'ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। একজন আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবনে উসায়লা, দ্বিতীয়জন হলেন সুনাবিহ ইবনুল আ'সার আহমাসি। তাঁরা বলেন, মূলত ওজুর ফজিলত সংক্রান্ত হাদিসের বর্ণনাকারি হলেন আবু আব্দুল্লাহ সুনাহিবি, আব্দুল্লাহ নন। এজন্য এ হাদিসটি মুরসাল। ইমাম বোখারি (র.) বলেন, মূলত ইমাম মালেক (র.)-এর ওয়াহাম বা ভুল হয়েছে। তিনি আবু আব্দুল্লাহর স্থলে আব্দুল্লাহ সুনাবিহি উল্লেখ করে ফেলেছেন। যেনো তাদের নিকট না আব্দুল্লাহ সুনাবিহি নামের রাবি আছেন এবং না এ হাদিসটি তাঁর মুসনাদাতের অন্তর্ভুক্ত।

জামে' তিরমিযীর কোনো কোনো মিসরি কপিতে ইবারত এমন লেখা হয়েছে, যা দ্বারা বোঝা যায় যে, ইমাম তিরমিযী (র.)ও ইমাম বোখারি এবং আলি ইবনুল মাদিনির সমমতধারী। মিসরি কপিগুলোতে এখানে আব্দুল্লাহ সুনাবিহির কোনো আলোচনাই নেই। হজরত গাঙ্গুহি (র.) এই মিসরি কপিটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, যাতে এটি ইমাম বোখারি প্রমুখের অনুকূল হয়ে যায়। কিন্তু অন্যান্য ব্যাখ্যাতা যাঁদের মধ্যে হজরত শাহ সাহেব প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত, এই ভারতীয় কপিটিকেই প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন যে, মিসরি কপিতে লিপিকার থেকে ইবারত ছুটে গেছে এবং এই মূলনীতিটি প্রসিদ্ধ যে, المثبت مقدم على النافى। এ কারণে বাস্তব সত্য হলো, ইমাম তিরমিযী (র.) ইমাম বোখারি (র.)-এর দৃষ্টিকোণকে প্রত্যাখ্যান করতে চাচ্ছেন। হাফেজ ইবনে হাজার প্রমুখ প্রমাণাদির আলোকে সাব্যস্ত করেছেন যে, ইমাম বোখারি (র.) কর্তৃক এ ব্যাপারে ইমাম মালেক (র.)-এর প্রতি ওয়াহাম বা ভুলের সম্বোধন সঠিক নয়। কারণ, তাঁর বুনিয়াদ এ কথার ওপর যে, আব্দুল্লাহ সুনাবিহি নামক কোনো সাহাবি

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ مِفْتَاحَ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ (٥)

অনুচ্ছেদ- ৩ : পবিত্রতা নামাজের চাবি (মতন ৫)

عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَ تَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ ـ

৩. **অর্থ :** হজরত আলি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নামাজের চাবি হলো পবিত্রতা। আর তাকবির (নামাজের বাইরের যাবতীয় কাজ) হারামকারি। আর সালাম (নামাজের বাইরের যাবতীয় কাজ) হালালকারি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'এ হাদিসটি এ অনুচ্ছেদে বিশুদ্ধতম ও সর্বোত্তম। আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আকিল সত্যবাদী। তাঁর স্মরণশক্তির ব্যাপারে কোনো কোনো আলেম কথা (আপত্তি) তুলেছেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইলকে আমি বলতে শুনেছি, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে ইবরাহিম এবং হুমায়দি, আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আকিলের হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করতেন। মুহাম্মদ বলেন, তিনি মুকারিবুল হাদিস। জাবের ও আবু সায়িদ (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।'

দরসে তিরমিযী

محمود بن غيلان : হিজরি তৃতীয় শতাব্দির প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইনি। ইমাম আবু দাউদ (র.) ছাড়া সিহাহ সিত্তার সব সংকলকই তাঁর সূত্রে হাদিস গ্রহণ করেছেন। সর্বসম্মতিক্রমে তিনি ثقة ।

سفيان : দুই বুজুর্গ এই নামে প্রসিদ্ধ। সুফিয়ান সাওরি ও সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা। ঘটনাক্রমে এঁরা দু'জন সমকালীন ও এবং উস্তাদ ও ছাত্রদের ক্ষেত্রেও সাধারণত উভয়কেই অংশীদার দেখা যায়। অতএব, উভয়ের মাঝে পার্থক্য শুধু বংশ অথবা নিসবতের কারণে হয়। যেখানে বংশ অথবা নিসবত বিদ্যমান নেই সেখানে এই পার্থক্য করা জটিলতর হয়ে দাঁড়ায় যে, ইনি কে? এ কারণে এখানেও ব্যাখ্যাতাগণ এর নির্ধারণে হয়রান-কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কিন্তু হজরত শাহ সাহেব (র.) বলেছেন, তাহকিক দ্বারা জানা যায় যে, এখানে সুফিয়ান সাওরি উদ্দেশ্য। এর সন্ধান পাওয়া গেছে হাফেজ জামালুদ্দিন জায়লায়ি (র.)-এর গ্রন্থ نصب الراية فى تخريج احاديث الهداية দ্বারা। কারণ, তিনি 'মু'জামে তাবারানি' সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে الثورى। শব্দও সুফিয়ানের সাথে স্পষ্টাকারে লেখা রয়েছে।

এখানে সুফিয়ানের পরেও تحويل হয়েছে। কিন্তু লিখিত নেই। হয়তো জামে' তিরমিযীর প্রথমদিকের কোনো লিপিকার তা ছেড়ে দিয়েছেন। এখানে সুফিয়ানই হাদিসের সনদের মূল।

محمد بن بشار : বুনদার তাঁর উপাধি। ইমাম তিরমিযী (র) কোথাও তাঁর নাম কোথাও উপাধি উল্লেখ করেছেন। তিনি মশহুর মুহাদ্দিস। কেউ কেউ তাঁকে দুর্বল বলেছেন; কিন্তু তা সঠিক নয়।

عبد الرحمن : এর দ্বারা উদ্দেশ্য আব্দুর রহমান ইবনে মাহদি, যিনি হাদিসের ইমাম। ইমাম আহমদ (র.) তাঁর সম্পর্কে এ বক্তব্য করেছেন যে, আব্দুর রহমান কর্তৃক কোনো রাবি থেকে হাদিস বর্ণনা করা সে রাবির নির্ভরযোগ্যতার দলিল।

محمد بن الحنيفة : হজরত আলি (রা)-এর সন্তান। তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে তাঁর মায়ের দিকে। সর্বসম্মতিক্রমে তিনি ثقة।

عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق : صدوق শব্দটি মুহাদ্দিসিনের পরিভাষায় তা'দিলের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এটা এর নিম্নস্তর। যার অর্থ হয় এ রাবি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত নন। অর্থাৎ, বাচনিক ও কর্মগতভাবে তো আদালতের অধিকারী, অবশ্য তার স্মরণশক্তিতে কিছু ত্রুটি রয়েছে। তাই কোনো কোনো রাবি সম্পর্কে এ ধরনের প্রচুর শব্দ পাওয়া যায়। صدوق له اوهام (সত্যবাদী, তবে তাঁর অনেক ভুল হয়) অথবা صدوق له سوء الحفظ (সত্যবাদী, স্মরণশক্তি মন্দ বা জয়িফ) অথবা صدوق له اوهام (সত্যবাদী, তবে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন) এছাড়া এর সাথে لين الحديث (তার হাদিস জয়িফ) অথবা فيه لين (তার মধ্যে কিছুটা নম্রতা তা দুর্বলতা আছে)-এর মতো শব্দও যোগ হয়। তা'দিলের এসব শব্দ দ্বারা হাদিসে বিশুদ্ধতার স্তর থেকে নিচে নেমে যায়। অবশ্য স্মরণশক্তির দুর্বলতা যদি মারাত্মক না হয়, তাহলে হাসান হতে পারে।

قال محمد وهو مقارب الحديث[১] : এটাকে কোনো কোনো অজ্ঞ লোক সমালোচনার শব্দ মনে করেছেন। কিন্তু বস্তুত এটা তা'দিলের শব্দের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য তা'দিল হিসেবে হালকা শব্দ। হাফেজ ইরাকি (র.) এ শব্দটিকে তা'দিলের ষষ্ঠ স্তরে গণ্য করেছেন। এ শব্দটির অর্থ হলো মধ্যম ধরনের হাদিসের অধিকারী। এ শব্দটিকে অনেকে ر-এ যের সহকারে লিখেছেন। অর্থাৎ مقارِب الحديث। এই সুরতে অর্থ হলো, يقارب حديثه حديث غيره (তার হাদিস অন্যের হাদিসের নিকটবর্তী) আর কেউ কেউ مقارَب الحديث রা'-এ যবর সহকারে লিখেছেন। এর অর্থ হলো حديث (অন্যের হাদিস তার হাদিসের নিকটবর্তী) কিন্তু প্রথম বক্তব্যটি বিশুদ্ধতম। হাফেজ ইরাকি (র.) রা'-এর যবর এবং যেরসহ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ধরেছেন। তাই 'আলফিয়াতে' তিনি লিখেছেন,

صالح الحديث او مقاربه * جيده حسنه مقاربه .

এই হাদিসের মূলপাঠের ওপর বিস্তারিত আলোচনা আসবে নামাজ পর্বে।

بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ (صـ٧)

অনুচ্ছেদ- ৪ : বায়তুল খালায় প্রবেশকালে যা পড়বে (মতন ৫)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ قَالَ شُعْبَةُ وَقَدْ قَالَ مَرَّةً اُخْرٰى اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبِيْثِ اَوِ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ .

৫. অর্থ : হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন তখন বলতেন, 'আয় আল্লাহ! তোমার কাছে আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি'। শো'বা বলেন, আরেকবার তিনি বলেছেন, আউজুবিল্লাহি মিনাল খুব্ছি ওয়াল খবিছ অথবা আল-খুবুছি ওয়াল খাবায়িছ। তথা, আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করছি নিকৃষ্ট পুরুষ ও নারী জিন (এর অনিষ্ট থেকে)।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আলি জায়দ ইবনে আরকাম, জাবের এবং ইবনে মাসউদ (রা.) থেকেও এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

টীকা- ১. ইমাম সাখাবি (র) এর অধীনে লিখেছেন, এটি নির্ভরযোগ্য বক্তব্য মুতাবিক রা'-এর যের ও যবরবিশিষ্ট। মধ্যম ধরনের রাবি। যিনি একেবারে অপাংক্তেয় পর্যায়েও পৌছেননি, আবার মহান পর্যায়েও নয়। এটিও এক প্রকার প্রশংসা। এ শব্দটির রা' এ যের যবর দুটোই যারা লিখেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন ইবনুল গারবি, ইবনু দিহইয়া, বাতলিউসি, ইবনে রুশাইদ (রিহলাতে) তিনি বলেন, এ শব্দটির অর্থ হলো, সেও এ হাদিসটির ব্যাপারে লোকজনের নিকটবর্তী হয় (হিফজের দিক দিয়ে) লোকজনও তার হাদিসের নিকটবর্তী হয়। অর্থাৎ, তার এ হাদিসটি শাজ ও মুনকার নয়। তিনি বলেন, মুহাদ্দিসিনে কেরাম এ শব্দ দ্বারা যে, এ অর্থ উদ্দেশ্য করেন, এর প্রমাণ হলো, জামে' তিরমিযীর 'ফাজায়িলুল জিহাদ' অনুচ্ছেদে ইমাম তিরমিযী (র.)-এর বক্তব্য। সেখানে তিনি ইসমাইল ইবনে রাফে'-এর আলোচনা করছিলেন। তারপর তিনি বলেন, কোনো কোনো মুহাদ্দিস তাঁকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। আমি মুহাম্মদ তথা, ইমাম বোখারি (র.)-কে বলতে শুনেছি, 'তিনি নির্ভরযোগ্য, মুকারিবুল হাদিস।' –ফাতহুল মুগিছ, সাখাবি : ১/৩৩৯, আল-মদিনাতুল মুনাওয়ারা, ১৩৮৮ হিজরি।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'আনাস (রা.)-এর হাদিসটি এ অনুচ্ছেদে বিশুদ্ধতম ও সর্বোত্তম। যায়দ ইবনে আরকামের হাদিসের সনদে ইজতেরাব তথা বিভিন্নতা ও গোলমাল রয়েছে। হিশাম আদ্-দাসতাওয়ায়ি ও সায়িদ ইবনে আবু আরূবা কাতাদা থেকে বর্ণনা করেন, আর সায়িদ বলেন, কাসেম ইবনে আউফ আশ্ শায়বানি জায়দ ইবনে আরকাম সূত্রে, হিশাম বলেন, কাতাদা হতে জায়দ ইবনে আরকাম সূত্রে বর্ণিত। শো'বা ও মা'মার এটি বর্ণনা করেছেন কাতাদা সূত্রে নজর ইবনে আনাস হতে। শো'বা বলেন, জায়দ ইবনে আরকাম সূত্রে। আর মা'মার বলেন, নজর ইবনে আনাস হতে তিনি তার পিতা সূত্রে। ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী বলেন, আমি মুহাম্মদ (ইবনে ইসমাইল বোখারি)কে এই ইজতেরাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তখন তিনি বলেন, সম্ভাবনা রয়েছে কাতাদা কর্তৃক জায়দ ও নজর উভয় থেকে বর্ণনা করার।'

حدثنا احمد بن عبدة الضبى نا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس ابن مالك (رض) ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم انى اعوذ بك من الخبث والخبائث .

৬. অর্থ : আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন তখন বলতেন, আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবায়িছ। এ হাদিসটি حسن صحيح।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

عن شعبة : ইনি হলো শো'বা ইবনুল হাজ্জাজ। স্বীয় জামানায় তাঁকে আমিরুল মু'মিনিন ফিল হাদিস বলা হতো। জারহ ও তা'দিল সম্পর্কে ইনিই সর্বপ্রথম আলোচনা করেছেন। ইমাম বোখারি (র) বলেন– لولا شعبة لما عرف الحديث فى العراق অর্থাৎ যদি শো'বা না হতেন, তাহলে ইরাকে হাদিস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন হতো না।

عبد العزيز بن صهيب : ইনি একজন তাবেয়ি। সর্বসম্মতিক্রমে নির্ভরযোগ্য।

اذا دخل الخلاء : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো بيت الخلاء তথা শৌচাগার। خلاء -এর শাব্দিক অর্থ একাকিত্বের স্থান বা নির্জন স্থান। যেহেতু পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন পূরণ করার জন্য এমন জায়গাই ব্যবহার হত, এজন্য এ শব্দটির অর্থ হয়ে গেলো পেশাব-পায়খানার স্থান। আরবি ভাষায় এই অর্থে অনেক শব্দ ব্যবহার হয়। হাদিসগুলোতেও الخلاء শব্দ ব্যতিত كنيف، حش، مذهب، منصع শব্দাবলি ব্যবহার হয়েছে। মূলত: এগুলো সব ইঙ্গিতমূলক শব্দ। বর্তমান যুগে মিসরবাসী এটাকে بيت الادب (বায়তুল আদব) এবং بيت الطهارة বলেন। আর হিজাজবাসী এটাকে مستراح বলেন।

اعوذ بالله من الخبث والخبيث او الخبث والخبائث : বর্ণনাকারির এখানে সন্দেহ হয়ে গেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ الخبث, শব্দ ব্যবহার করেছেন না خبائث শব্দ। কিন্তু হজরত শাহ সাহেব (র.) বলেছেন যে, রাবির এ সন্দেহ বেঠিক। বিশুদ্ধ বর্ণনা হলো الخبائث, পরবর্তী বর্ণনায় যেমন হাম্মাদ ইবনে জায়দ সূত্রে সুস্পষ্ট ভাষায় আছে। সুতরাং মাসনুন দোয়া হলো اللهم انى اعوذ بك من الخبث والخبائث।

টীকা- ১. 'ইসলাহু খাতাইল মুহাদ্দিসিন' গ্রন্থে আল্লামা খাত্তাবি (র.) বলেন, ইবনুল আরাবি বলেছেন, আরবদের ভাষায় খুবছুন শব্দের আসল অর্থ হলো, অপছন্দনীয় বস্তু। যদি এটি বাক্য হয়, তবে গালি আর ধর্ম হলে কুফর, খাদ্য হলে হারাম, পানীয় হলো ক্ষতিকর। ইসলাহু খাতাইল মুহাদ্দিসিন, খাত্তাবি : ৯, লাজনাতুশ্ শায়বাতিস সূরিয়া, কায়রো, ১৩৫৫ হিজরি।

خبائث শব্দ সম্পর্কে সবাই একমত যে, এটি خبيثة -এর বহুবচন। এর দ্বারা স্ত্রী শয়তানগুলো উদ্দেশ্য। তবে الخبث। সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। 'ইসলাহু খাতাইল মুহাদ্দিসিন' নামক গ্রন্থে আল্লামা খাত্তাবি (র.) বলেছেন যে, মুহাদ্দিসিন خبث শব্দটিকে বা' এর সাকিন সহকারে বর্ণনা করেন। আল্লামা আবু উবাইদ (র.)ও এ শব্দটিকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মূলত এ শব্দটির বা'-এ রয়েছে পেশ। অর্থাৎ, খুবুস যেটি خبيث -এর বহুবচন এবং خبث শব্দটি বা'-এর জযম সহকারে মাসদার (ক্রিয়ামূল)। কিন্তু অধমের মতে বাস্তব সত্য হলো, এ শব্দটিকে উভয় পদ্ধতিতে পড়া সঠিক। যদি এ শব্দটিকে বা' এর জযম সহকারে পড়া হয় তখনও এটি خبيث শব্দের বহুবচন হবে। কারণ, আরবগণ فعل-এর ওজনের বহুবচনগুলোকে প্রচুর পরিমাণে আইনে জযম সহকারে পড়েন। মোটকথা خبث এবং خبائث দ্বারা শয়তানগুলো উদ্দেশ্য। প্রথমটি দ্বারা উদ্দেশ্য নর আর দ্বিতীয়টি দ্বারা স্ত্রী শয়তান।

বায়তুল খালায় প্রবেশ করার সময় শয়তানগুলো থেকে আশ্রয় প্রার্থনার কারণ হলো যে, এই ধরনের অন্যান্য ময়লা স্থানগুলো শয়তানের কেন্দ্র হয়ে থাকে। এগুলো প্রস্রাব-পায়খানার সময় মানুষকে কষ্ট দিয়ে থাকে। কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, শয়তানগুলো সতর খোলার সময় মানুষগুলোকে নিয়ে খেলতে আরম্ভ করে। হজরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা.)-এর মৃত্যু[১] ঘটেছিলো এভাবেই। তিনি প্রস্রাব-পায়খানার কাজে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে সেখানেই তাঁর লাশ পাওয়া গেছে। তখন একটি রহস্যজনক আওয়াজও শুনতে পাওয়া গেছে। যেনো কেউ কাব্য পাঠ করছে–

قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة * رميناه بسهمين فلم نخط فؤاده

এ থেকে বোঝা গেল, এটি ছিলো একটি জিনের কণ্ঠ যে হজরত সা'দ (রা.)-কে হত্যা করেছিলো।

০ এই দোয়াটি কোন সময়ে পড়া উচিত, এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। অনেকে এ প্রসঙ্গে বলেছেন, যখন শৌচাগারে প্রবেশ করার ইচ্ছে হবে তখন পড়বে। এ ব্যাপারে তাহকিকি বক্তব্য হলো, যদি মানুষ ঘরে থাকে তখন বায়তুল খালায় প্রবেশ করার পূর্বে, আর যদি জঙ্গলে বা ময়দানে থাকে, তাহলে সতর খোলার পূর্বে দোয়া পড়ে নিবে। অধিকাংশের মত হলো, যদি বায়তুল খালায় প্রবেশ করে ফেলে এবং পূর্বে দোয়া না পড়ে তাহলে দোয়া পড়বে না; বরং মনে মনে তা স্মরণ করবে। কিন্তু ইমাম মালিক (র.) বলেন যে, সতর খোলার পূর্বে বায়তুল খালায় প্রবেশ করার পরেও দু'আ পড়ে নেয়া উচিত। ইমাম মালেক (র.) এ অধ্যায়ের হাদিসটি দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন যে, তাতে اذا دخل الخلاء শব্দ এসেছে। যা দ্বারা এদিকেই মন দ্রুত চলে যায় যে, বায়তুল খালায় প্রবেশ করার পরও দোয়া পড়া যায়। অধিকাংশের মতে اذا دخل الخلاء এটি اذا اراد ان يدخل الخلاء -এর অর্থে ব্যবহৃত। এর প্রমাণ হলো, এ হাদিসটি আল-আদাবুল মুফরাদে ইমাম বোখারি (র.) বর্ণনা করেছেন নিম্নেযুক্ত ভাষায়।

قال حدثنا ابو النعمان ثنا سعيد بن زيد ثنا عبد العزيز ابن صهيب فى انس رضى الله تعالى عنه قال النبى صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء قال اللهم انى اعوذ بك الخ ـ

'হজরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বায়তুল খালায় প্রবেশ করার ইচ্ছা করতেন, তখন পড়তেন আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজুবিকা...।'

তাছাড়া মূলনীতি হলো, যখন কোনো আদিষ্ট বিষয় اذا এর সাথে সংশ্লিষ্ট করা হবে, তখন তার পদ্ধতি হয় তিনটি,

১. اذا-এর প্রবিষ্ট বিষয়ের পূর্বে আদিষ্ট বিষয়টি আদায় করা ওয়াজিব হবে। যেমন,

---

টীকা- ১. মুহাম্মদ ইবনে সিরিন (র.) বলেন, সা'দ ইবনে উবাদা (রা.) দাঁড়িয়ে পেশাব করছিলেন। এমন সময় তাঁর মৃত্যু হয়, তখন তাঁর জন্য জিনগুলো বিলাপ করে (কোনো কোনো কপিতে আছে জিনগুলো তাকে হত্যা করে।)

قتلنا سيد الخزرج ...

হারেস ইবনে আবু উসামা এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। -আল-মাতালিবুল আলিয়া ১/১৮। এর টীকায় আছে হায়ছামী (র.) এটিকে সম্বোধন করেছেন তাবারানীর দিকে এবং তিনি বলেছেন, ইবনে সিরিন সা'দ ইবনে উবাদা (রা.)কে পাননি। ১/৬০৬।

اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم 'নামাজের জন্য যখন প্রস্তুত হও তখন তোমাদের চেহারা ধৌত করো।'

২. اذا -এর প্রবিষ্ট বিষয়ের সাথে সাথে আদিষ্ট বিষয়টি আদায় করা ওয়াজিব হবে। যেমন,

اذا قرئ القران فاستمعوا له অথবা اذا قرأت فترسل 'যখন কোরআন তেলাওয়াত করা হবে তখন তা মনোযোগ সহকারে শুনো। অথবা যখন তেলাওয়াত করো ধীরে ধীরে ওয়াক্ফ করে পড়ো।'

৩. اذا-এর প্রবিষ্ট বিষয়ের পরে আদিষ্ট বিষয়টি আদায় করা হবে। যেমন : حللتم فاصطادوا 'যখন তোমরা (ইহরাম থেকে) হালাল হয়ে যাও তখন শিকার করো।'

এখানে ইমাম মালেক (র.) যদিও তৃতীয় অর্থটি গ্রহণ করেন; কিন্তু অধিকাংশ আলেম গ্রহণ করেন প্রথম অর্থ। এর প্রাধান্যের কারণ, বায়তুল খালায় ময়লা এবং নাপাকির জায়গা। সেখানে গিয়ে জিকির, দোয়া ও আশ্রয় প্রার্থনা ঠিক না।

হজরত আয়েশা (রা.)-এর একটি বর্ণনা দ্বারাও ইমাম মালেক (র.) প্রমাণ পেশ করেন যে,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل احيانه (ابو داود كتاب الطهارة باب فى الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر) .

সর্বদা 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর জিকির করতেন।'

এই প্রমাণটি কিন্তু খুবই দুর্বল। কারণ, যদি এ হাদিসের জাহেরের ওপর আমল করা হয়, তাহলে সতর খোলার পরেও উচিত দোয়া পড়া জায়েজ হওয়া। অথচ ইমাম মালেক (র.)ও এর প্রবক্তা নন। এতে বোঝা গেলো, এই বর্ণনাটি স্বীয় বাহ্যিক অর্থে প্রযোজ্য নয়। অথবা এতে كل শব্দটি واوتيت من كل شيء (আমাকে সবকিছু থেকে দেওয়া হয়েছে)-এর অন্তর্ভুক্ত এবং كل শব্দটি অধিকাংশের অর্থে ব্যবহার হয়েছে, কিংবা জিকির দ্বারা উদ্দেশ্য আন্তরিক জিকির। আর জিকির শব্দটি মৌখিক জিকিরের পরিবর্তে প্রচুর ব্যবহৃত হয় শুধু স্মরণ করার অর্থেও। জনৈক কবির ভাষায়,

ذكرتك والخطى يخطر بيننا * وقد نهلت منا المثقفة السمر .

হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি (র.) বলেছেন যে, এই হাদিসটি প্রযোজ্য মুতাওয়ারিদ জিকির সম্পর্কে। অর্থাৎ, সেসব জিকির যেগুলো বিশেষ বিশেষ স্থানে ও সময়ে রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত। অতএব, হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, প্রিয়নবী ﷺ রাত দিনের বিভিন্ন কাজে রত হওয়ার সময় অবশ্যই কোনো না কোনো জিকির করতেন।

وحديث زيد بن ارقم فى اسناده اضطراب : اضطراب-এর শাব্দিক অর্থ হলো নড়াচড়া করা। তারপর এ শব্দটি ইখতেলাফ ও গরমিলের অর্থেও ব্যবহার হয়। উসুলে হাদিসের পরিভাষায় ইজতেরাবের অর্থ হলো, কোনো হাদিসের বর্ণনায় বর্ণনাকারিদের ইখতেলাফ ও গরমিল হয়ে যাওয়া। এ বিষয়টি হাদিসকে জয়িফ করে দেয়। যদি রাবিদের মতানৈক্য সনদের মধ্যে হয়, তাহলে এটাকে বলে ইজতেরাব ফিল ইসনাদ। আর যদি এই ইজতেরাব মূল পাঠে হয় তবে এটাকে বলে ইজতেরাব ফিল মতন। এর হুকুম হলো যদি এই ইজতেরাব দূর করা যায় তবে এর পর মুজতারিব হাদিস বিশুদ্ধ হয়ে যায়, আর যদি ইজতেরাব দূরীভূত না হয়, তবে হাদিসটি দুর্বল এবং অপ্রামাণ্য হয়ে যায়।

ইজতেরাব দূর করার পদ্ধতি হতে পারে দুটি,

১. সামঞ্জস্য বিধান করা হবে বর্ণনাগুলোতে।

২. কোনো একটি বর্ণনাকে বিশুদ্ধ অথবা প্রধান সাব্যস্ত করে অন্য বর্ণনাগুলোকে ভুল অথবা ত্রুটিযুক্ত সাব্যস্ত করে দেয়া। 'তাদরিবুর রাবি' পৃষ্ঠা ১৬৯-তে আল্লামা সুয়ুতি (র.) এবং 'ফাতহুল মুগিস' ১/২২৩-এ হাফেজ ইবনে

সালাহ (র.) লিখেছেন যে, ইজতেরাব অবস্থায় কোনো এক বর্ণনাকে তার বর্ণনাকারি অধিক স্মরণশক্তি সম্পন্ন হওয়া অথবা যার কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন তার সাথে দীর্ঘ সুহবতের অধিকারী হওয়ার ভিত্তিতে প্রাধান্য দেয়া হলে ইজতেরাব থাকে না।

وفى الباب দ্বারা ইমাম তিরমিযী (র.) হজরত জায়দ ইবনে আরকাম (রা.)-এর যে হাদিসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং তাতে ইজতেরাবের কথা আলোচনা করেছেন সেটি আবু দাউদ ইত্যাদিতে বর্ণিত হয়েছে। সে হাদিসের শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত,

ان هذه الحشوش محتضرة . فاذا أتى احدكم الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث، (ابو داود، خ١ كتاب الطهارة باب ما يقول الرجل اذا دخل الخلاء)

'এসব বায়তুল খালায় (খারাপ জিনগুলোর) উপস্থিতি ছিলো। যখন তোমাদের কেউ গমন করবে তখন অবশ্যই পড়বে– আউজুবিল্লাহি মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবায়িছ।'

হজরত জায়দ ইবনে আরকাম (রা)-এর ওপরযুক্ত হাদিসে ইমাম তিরমিযী (র.) যে ইজতেরাবে সনদের আলোচনা করেছেন সেটা বোঝার জন্য পূর্বেই মনে রাখতে হবে যে, হজরত কাতাদা (র.) এই হাদিসের মাদারুল ইসনাদ (কেন্দ্রবিন্দু) তাঁর থেকে তাঁর চারজন শিষ্য এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং চারটি সূত্রেই ইখতেলাফ রয়েছে। সেই চারটি সূত্র এই,

১. হিশাম দাসতাওয়ায়ি-কাতাদা-জায়দ ইবনে আরকাম (রা.),

২. সাইদ ইবনে আবু আরূবা-কাতাদা-কাসেম ইবনে আউফ শাইবানি-জায়দ ইবনে আরকাম (রা.),

৩. শো'বা-কাতাদা-নজর ইবনে আনাস-জায়দ ইবনে আরকাম (রা.),

৪. মা'মার-কাতাদা-নজর ইবনে আনাস-আনাস (রা.)।

এই বর্ণনার সনদে পাওয়া যায় তিনটি ইজতেরাব।

০ প্রথম ইজতেরাব, কাতাদা এবং সাহাবির মাঝে কোনো সূত্র মধ্যখানে আছে কি নেই? এখানে হিশামের বর্ণনায় মধ্যখানে কোনো সূত্র নেই। অবশিষ্ট সূত্র রয়েছে তিনজনের বর্ণনায় মাঝখানে।

০ দ্বিতীয় ইজতেরাব, কাতাদা এবং সাহাবির মাঝে কোনো সূত্র থাকে তবে তিনি কে? সায়িদ ইবনে আবু আরূবার মতে সেই সূত্র হলো কাসেম ইবনে আউফ শাইবানি। আর নজর ইবনে আনাস শো'বা ও মা'মারের বর্ণনার মাঝখানে সূত্র।

০ তৃতীয় ইজতেরাব হলো, সাহাবি কে? মা'মারের বর্ণনায় সাহাবি হজরত আনাস (রা.) আর অবশিষ্ট তিনজনের বর্ণনায় হজরত জায়দ ইবনে আরকাম (রা.)। এভাবে মোট হলো তিনটি ইজতেরাব।

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, আমি ইমাম বোখারি (র.)-এর নিকট এসব ইজতেরাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে তিনি বলেছেন, হতে পারে কাতাদা তাদের দু'জন থেকে বর্ণনা করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, ইমাম বোখারি স্বীয় এই বক্তব্য দ্বারা এই ইজতেরাব দূর করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এর দ্বারা কোনো কোনো ইজতেরাব দূর হলো কিভাবে, এ ব্যাপারে ব্যাখ্যাতাগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

টীকাকার এই জমির দ্বারা ইঙ্গিত হজরত জায়দ ইবনে আরকাম এবং নজর ইবনে আনাস (রা)-কে সাব্যস্ত করেছেন এবং তিনি এই চেষ্টা করেছেন যাতে ইমাম বোখারির এই বক্তব্য দ্বারা তিন প্রকার ইজতেরাব দূরীভূত হয়ে যায়। এভাবে যে, ইমাম বোখারি (র.) এসব বর্ণনাকে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন এবং এগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে বলেছেন যে, হতে পারে– এই হাদিসটি কাতাদা হজরত জায়দ ইবনে আরকাম (রা.) থেকেও বর্ণনা করেছেন। চাই প্রত্যক্ষভাবে; যেমন, হিশামের বর্ণনায় রয়েছে অথবা পরোক্ষভাবে সূত্রসহকারে; যেমন,

সায়িদ ও শো'বার বর্ণনায় রয়েছে এবং হজরত নজর ইবনে আনাস (রা.) থেকেও বর্ণনা করেছেন। চাই জায়দ ইবনে আরকাম (রা.) থেকে হোক। যেমন, শো'বার বর্ণনায় রয়েছে। অথবা তাঁর পিতা আনাস (রা.) থেকেও। যেমন, মা'মারের বর্ণনায় রয়েছে। হজরত গাঙ্গুহি (র.)-এর ঝোঁকও এই ব্যাখ্যার প্রতিই। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী চারটি বর্ণনাই সহিহ হয়ে যায় এবং তিনটি ইজতেরাবে বিধান হয়ে যায় সামঞ্জস্য।

হজরত ইমাম বোখারি (র.)-এর এই বক্তব্যর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনেক করেছেন এভাবে যে, عنهما -এর দ্বারা ইবনে আউফ এবং জায়দ ইবনে আরকামের প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে কাসেম। এ ব্যাখ্যার সারনির্যাস হলো, ইমাম বোখারি (র.) স্বীয় এই বক্তব্য দ্বারা প্রথম ইজতেরাবই কেবল দূর করেছেন, যেটি হিশাম এবং সায়িদের মাঝে হয়েছে। কারণ, এমতাবস্থায় উদ্দেশ্য এই হবে যে, কাতাদা এ বর্ণনাটি সরাসরি হজরত জায়দ (রা.) হতে শুনেছেন যেটি হিশামের সামনে বর্ণনা করেছেন। আর কাতাদ এই বর্ণনা কাসেম ইবনে আউফের সূত্রেও শুনেছেন, যেটি সায়িদের সামনে বর্ণনা করেছেন। অবশিষ্ট দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ইজতেরাবের জবাব ইমাম বোখারি (র.) দেননি। কেনোনা, তখন তাঁর মনে এগুলোর সামঞ্জস্য বিধান ছিলো না।

হজরত শাহ সাহেব (র.) ইমাম বোখারি (র.)-এর এই বক্তব্যর তৃতীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেটি হলো عنهما দ্বারা কাসেম ইবনে আউফ এবং নজর ইবনে আনাস এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইমাম বোখারি (র.) স্বীয় এই বক্তব্য দ্বারা শুধু এই দ্বিতীয় ইখতেলাফের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন, যেটি হয়েছে সাঈদ এবং শো'বার মাঝে। অর্থাৎ, কাতাদা এবং জায়দ ইবনে আরকামের মাঝে সূত্র কে? ইমাম বোখারি বলেন, হতে পারে কাতাদা হজরত জায়দ ইবনে আরকামের এই হাদিস কাসিম ইবনে আউফ থেকে শুনেছেন, যেটি সায়িদ বর্ণনা করেছেন। আরেকবার শুনেছেন নজর ইবনে আনাস থেকে, যেটি শো'বা বর্ণনা করেছেন। বাকি রইল প্রথম ইজতেরাব। সেটার মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজন এজন্য ছিলো না যে, তাতে হিশামের বর্ণনাটি ভুল। কারণ, হজরত কাতাদার শ্রবণ হজরত আনাস (রা.) ছাড়া অন্য কারো নিকট থেকে প্রমাণিত নয়। এ ব্যাপারে ইমাম হাকেম (র.) মা'রিফাতু উলুমিল হাদিসে স্পষ্ট ভাষায় বিবরণ দিয়েছেন। যেহেতু তাঁর শ্রবণ প্রমাণিত নয়, অতএব প্রত্যক্ষভাবে বর্ণনা করার সম্ভাবনাও নেই।

অবশিষ্ট আছে তৃতীয় ইজতেরাব। মা'মারের বর্ণনাটি এখানে ভুল এবং তার থেকে ভ্রম হয়ে গেছে। এ কারণে ইমাম বায়হাকি (র.) স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, حديث معمر عن النضر بن انس فى هذا وهم যখন হিশাম এবং মা'মার উভয়ের বর্ণনা গলদ, তখন প্রথম এবং তৃতীয় ইজতেরাব এমনিতেই খতম হয়ে গেছে। কারণ, কোনো একটি দিককে প্রাধান্য দেওয়া হলে আর ইজতেরাব অবশিষ্ট থাকে না। এবার শুধু দ্বিতীয় ইজতেরাব অবশিষ্ট রয়ে গেছে। ইমাম বোখারি (র.) এটা দূর করেছেন ।

কয়েকটি দিকে লক্ষ করলে এই তৃতীয় ব্যাখ্যাটি প্রধান মনে হতো। কিন্তু পরবর্তীতে অধম একটি প্রমাণ পেয়ে গেছে। যার ফলে এই ব্যাখ্যাটি প্রায় সুনিশ্চিতরূপে নির্ধারিত হয়ে যায় এবং প্রথম দুটি ব্যাখ্যা গলদ প্রমাণিত হয়। সেটি হলো এই বর্ণনাটি ইবনে হাব্বান সহিহ ইবনে হাব্বানে স্বয়ং বর্ণনা করেছেন শো'বা থেকে দুটি সূত্রে,

قال أخبرنا محمد بن اسحاق بن سعيد السعدى نا على بن خشرم انبأنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة عن القاسم الشيبانى عن زيد بن ارقم رضى الله تعالى عنه الخ

'তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে সায়িদ আস্ সা'দি আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের কাছে আলি ইবনে খাশরাম হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ঈসা ইবনে ইউনুস আমাদের নিকট হাদিস বর্ণনা করেছেন শো'বা থেকে, তিনি কাতাদা থেকে, তিনি কাসেম শায়বানি থেকে, তিনি জায়দ ইবনে আরকাম (রা.) থেকে... ।'

তারপরে অন্য একটি সূত্র ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেন,

انا عمر بن محمد الهمدانى نا محمد بن عبد الاعلى نا خالد بن الحارث عن شعبة عن قتادة قال سمعت النضر بن انس يحدث عن زيد بن ارقم رضى الله تعالى عنه فذكر نحوه،

(ذكرهما الهيثمى فى موارد الظمان الى زوائد ابن حبان ص٦٢٩٦١ الروضة سـ١٣٥١ هجرى)

'তিনি বলেন, আমাদেরকে উমর ইবনে মুহাম্মদ আলি-হামদানি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আ'লা আমাদেরকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, খালেদ ইবনুল হারেস আমাদেরকে হাদিস বর্ণনা করেছেন শো'বা থেকে, তিনি কাতাদা সূত্রে। কাতাদা বলেন, আমি নজর ইবনে আনাসকে জায়দ ইবনে আরকাম (রা.) থেকে হাদিস বর্ণনা করতে শুনেছি। তারপর উল্লেখ করেন।'

এ থেকে বোঝা গেলো যে, মূলত শো'বা এবং সায়িদের সাথে কোনো মতপার্থক্য নেই। কেনোনা, স্বয়ং শো'বাও সায়িদের ন্যায় কাসেম এবং আউফ.থেকে বর্ণনা করেছেন।

হজরত শাহ সাহেব (র.)-এর ওপরযুক্ত ব্যাখ্যা এবং সবগুলো কথা বিশুদ্ধ এবং অনুধাবনযোগ্য। তবে একটি বিষয় প্রশ্নসাপেক্ষ্য। সেটি হচ্ছে হিশামের প্রতি সুনিশ্চিতরূপে গলদের সম্বোধন জটিল। কারণ, হতে পারে কোনো সময় স্বয়ং কাতাদা এই বর্ণনাটি জায়দ ইবনে আরকাম (রা.) থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যেটি হিশাম শুনে বর্ণনা করে দিয়েছেন। অবশ্য এটা বলা যেতে পারে যে, হিশামের বর্ণনা সায়িদ এবং শো'বার তুলনায় প্রধান নয়। মোটকথা, এ তিনটি ইজতেরাব দূরীভূত হয়েছে। প্রথম ইজতেরাব হিশামের বর্ণনাকে গলদ অথবা প্রধান নয় সাব্যস্ত করে, দ্বিতীয় ইজতেরাব সামঞ্জস্য বিধান করে. আর তৃতীয় ইজতেরাব মা'মারের বর্ণনাকে গলদ সাব্যস্ত করে। এ বর্ণনাটি এবার প্রমাণযোগ্য হয়ে গেলো।

بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ (صـ٧)

অনুচ্ছেদ- ৫ : বায়তুল খালা থেকে বের হয়ে যা পড়বে (মতন ৭)

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانَكَ ـ

৭. **অর্থ :** হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বায়তুল খালা হতে বের হতেন তখন বলতেন, গুফরানাকা তথা আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'এই হাদিসটি حسن غريب। এটি ইসরাইল-ইউসুফ ইবনে আবু বুরদা ও আবু বুরদা ইবনে আবু মূসা তথা আমির ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে কায়স আল-আশআরির হাদিস ব্যতিত অন্য কোনোভাবে আমরা জানি না। এ অনুচ্ছেদে আয়েশা (রা.)-এর হাদিস ব্যতিত অন্য কোনো হাদিস জানা নেই।'

দরসে তিরমিযী

حدثنا محمد بن حميد بن اسماعيل : এই সনদের বর্ণনায় জামে' তিরমিযীর কপিগুলো বিভিন্ন প্রকার। আমাদের সমস্ত ভারতীয় কপিগুলোতে সনদ অনুরূপই লিখিত হয়েছে। কিন্তু কাজি আবু বকর ইবনুল আরাবি (র.) 'আরিজাতুল আহওয়াজি'র মূলপাঠে এই সনদটি এভাবে বর্ণনা করেছেন।

"محمد بن اسماعيل قال حدثنا حميد قال حدثنا مالك" অধিকাংশ মিসরি কপিতেও অনুরূপই রয়েছে। আর أحمد بن محمد بن اسمعيل قال حدثنا مالك কোনো কোনো হাতে লেখা কপিতে এমন রয়েছে-

কোনো কোনো কপিতে রয়েছে নিম্নেরূপ– محمد بن اسماعيل قال حدثنا مالك بن اسماعيل عن اسرائيل এই শেষোক্ত কপিটিই বিশুদ্ধ; অবশিষ্টগুলো ভুল। আমাদের কপি এজন্য ভুল যে, ইমাম তিরমিযীর উস্তাদ এবং মালেক ইবনে ইসমাইলের শিষ্যদের মাঝে মুহাম্মদ ইবনে হুমাইদ ইবনে ইসমাইল নামক কোনো রাবিই নেই। কাজি আবু বকর ইবনে আরাবির কপি এজন্য ভুল যে, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল এর উস্তাদগণের মধ্যে হুমাইদ নামের কেউ নেই। হুমাইদি অবশ্য আছেন। আর লেখা এজন্য গলদ যে, ইমাম তিরমিযীর উস্তাদদের মধ্যে আহমদ ইবনে ইসমাইল নামক কোনো রাবির আলোচনা রিজাল শাস্ত্রের কোনো গ্রন্থে মওজুদ নেই। অতএব, শেষোক্ত কপিটিই বিশুদ্ধ। আর মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল দ্বারা উদ্দেশ্য ইমাম বোখারি (র.)। এর বিশুদ্ধতার একটি প্রমাণ এটাও যে, ইমাম বায়হাকি (র) এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন حدثنا بن اسمعيل قال حدثنا مالك بن اسماعيل -এর সনদে। 'আল-আদাবুল মুফরাদে' তাছাড়া ইমাম বোখারি (র.) এই হাদিসটি নিম্নেযুক্ত সনদে حدثنا مالك بن اسماعيل عن اسرائيل عن يوسف। এ দ্বারা বোঝা গেলো যে, তিরমিযী এর প্রথম তিন কপিতে লিপিকার থেকে ভুল হয়েছিলো।

حدثنا مالك بن اسماعيل الكوفى : তৃতীয় হিজরি শতাব্দির সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস তিনি। ইমাম বোখারি (র.)-এর উস্তাদ। ইবনে মাইন (র.) বলেন, ليس بالكوفة اتقن منه অর্থাৎ, তাঁর চেয়ে বেশি মজবুত হাফেজ কুফায় অন্য কেউ নেই।

عن يوسف بن ابى بردة : হজরত আবু মুসা আশ'আরি (রা.)-এর নাতি এবং সর্বসম্মতিক্রমে তিনি ثقة।

غفرانك : অনেক বলেছেন যে, এটা مفعول به আর তার আমেল اطلب বা اسئل উহ্য। কেউ কেউ বলেছেন এটি مفعول مطلق তার আমেল اغفر উহ্য। দ্বিতীয় বক্তব্যটি বিশুদ্ধতম। প্রখ্যাত নাহবি ফাজেল রাজি (র.) লিখেছেন যে, مفعول مطلق -এর আমেল চার জায়গায় কিয়াস মুতাবেক উহ্য রাখা আবশ্যক,

১. মাসদার তার فاعل তথা কর্তার দিকে হরফে জরের মাধ্যম ব্যতিত যেখানে মুজাফ হবে। যেমন : "تبالك، سحقا لك، بعدا لك، بؤسا لك"

২. মাসদার স্বীয় فاعل -এর দিকে হরফে জরের মাধ্যম ছাড়া মুজাফ হবে। যেমন : غفرانك।

৩. মাসদার স্বীয় মাফউলের দিকে হরফে জরের মাধ্যমে মুজাফ হবে। যেমন : شكرالله، حمد لله।

৪. মাসদার স্বীয় মাফউলের দিকে হরফে জরের মাধ্যম ব্যতিত মুজাফ হবে। যেমন : معاذ الله، سبحان الله। বোঝা গেলো যে, غفرانك -এর আমেলও আবশ্যকীয়ভাবে উহ্য রাখা হয়েছে। কারণ, এটাও দ্বিতীয় সুরতের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন : তারপর এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে যে, বায়তুল খালা থেকে বের হওয়ার সময় মাগফেরাতের কি সুযোগ রয়েছে?

জবাব : এর অনেক জবাব দেওয়া হয়েছে। সর্বোত্তম ও প্রসিদ্ধ জবাব হলো নিম্নেযুক্ত,

১. রাসূলে আকরাম ﷺ সর্বদা জিকির করতেন। কিন্তু বায়তুল খালায় জবানি জিকিরের ধারা বন্ধ থাকতো। এই মৌখিক জিকির বন্ধ থাকার কারণে তিনি ইস্তেগফার করেছেন।

২. দ্বিতীয় জবাব হজরত গাঙ্গুহি (র.) দিয়েছেন যে, প্রস্রাব-পায়খানার সময় মানুষ স্বীয় মল-মূত্র তথা নাপাকগুলো প্রত্যক্ষ করে। ইসলামের শিক্ষা হলো, এসব জাহেরি নাপাক দেখে মানুষের উচিত স্বীয় বাতেনি নাপাকগুলোর কথা স্মরণ করা। প্রকাশ থাকে যে, মনে মনে এই স্মরণ করাটাই ইস্তেগফারের কারণ হবে। এজন্য তা'লিম দিয়েছেন غفرانك বলার জন্য।

৩. হজরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরি (র.) তৃতীয় জবাব 'বজলুল মাজহুদ' : '১/২০-পৃষ্ঠায় দিয়েছেন যে, পেশাব-পায়খানা, মল-মূত্র মানুষের দেহ থেকে বেরিয়ে যাওয়া তার সুস্থতা ও জীবনের জন্য

আল্লাহ তা'য়ালার অনেক বড় নেয়ামত। এই ইস্তেগফার এ জন্য রাখা হয়েছে, যাতে নেয়ামতের শোকরিয়ার হক মানুষ আদায় করতে পারে না।

৪. চতুর্থ জবাব আল্লামা মাগরিবি (র.) আবু দাউদের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, দুনিয়াতে হজরত আদম (আ.)-এর সর্বপ্রথম মল-মূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হয়েছিলো। তখন এর দুর্গন্ধে তিনি নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার কুফল এবং স্বীয় ত্রুটির কথা স্মরণ করেছিলেন। তারপর এই ধারা তাঁর সন্তানদের মধ্যেও অব্যাহত থাকে। তবে হজরত শাহ সাহেব (র.) বলেছেন, আল্লামা মাগরিবির বিবরণের ওপর নির্ভর করা যায় না। কারণ, তিনি তাহকিক-অনুসন্ধান ব্যতীত সব ধরনের কথাই সংকলন করেন।

৫. সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হজরত মাওলানা বিন্নৌরি (র.) মা'রিফুস্ সুনানে দিয়েছেন। তিনি বলেন, এখানে غفرانك শব্দটি মূলত ব্যবহার হয়েছে শোকরের অর্থে। সিবওয়াইহ স্বীয় গ্রন্থে লিখেছেন যে, আরবদের নিকট غفرانك لا كفرانك এই বাগধারা প্রসিদ্ধ। এতে غفرانك শব্দটি কৃতজ্ঞতার অর্থে এসেছে। যেমন– كفرانك -এর বিপরীতে ব্যবহার করার দ্বারা বোঝা গেছে। এজন্য এখানেও এ অর্থটি উদ্দিষ্ট হবে। তাহলে কথা স্পষ্ট হয়ে যায়। এই জবাবটির সহায়তা এ কারণেও হয় যে, ইবনে মাজাহ পৃষ্ঠা : ২২ ابواب الطهارة وسننها باب ما يقول اذا خرج من الخلاء)-তে হজরত আনাস (রা.) থেকে এবং নাসায়িতে হজরত আবু জর (রা.) থেকে শৌচাগার থেকে বের হওয়ার পর এ দোয়া বর্ণিত হয়েছে, الحمد لله الذى اذهب عنى الاذى وعافانى।

প্রশ্ন : এখানে হাফেজ ইবনে হাজার প্রমুখ আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ ছিলেন নিষ্পাপ। তাঁর পূর্বাপরের সমস্ত ত্রুটি ক্ষমা করার ঘোষণা করা হয়েছে। অতএব, তাঁর ক্ষমা প্রার্থনার কি প্রয়োজন?

জবাব : যদি غفرانك শব্দটিকে শোকরিয়ার অর্থে গ্রহণ করা হয়, তবে এ প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকে না। আর যারা এটাকে ইস্তেগফারের অর্থেই প্রযোজ্য ধরেন তাঁরা বলেন– প্রিয়নবী ﷺ-এর ইস্তেগফার মাগফিরাতের সাধারণ ঘোষণার পূর্বে ছিলো। কিংবা তিনি উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য এমন করতেন। আর কেউ কেউ এটাও বলেছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ-এর কামালাত ও পরিপূর্ণতায় প্রতিটি মুহূর্তে তারাক্কি হতো। যখন তিনি তারাক্কির কোনো নতুন ধাপ অতিক্রম করতেন তখন পূর্ববর্তী ধাপগুলোর ত্রুটি অনুভব করতেন। এ জন্যে তিনি তা থেকে ক্ষমা চাইতেন।

মূলকথা বায়তুল খালা থেকে বের হওয়ার সময় غفرانك বলা সুন্নত। আর ইবনে মাজাহ ইত্যাদির বর্ণনায় الحمد لله الذى اذهب عنى الاذى وعافانى শব্দ এসেছে। যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের পদ্ধতি হলো– প্রিয়নবী ﷺ কখনো এ দোয়া পড়তেন, আর কখনো পড়তেন উপরিউক্ত দোয়াটি। ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, উভয় দোয়া পড়ে নেওয়াই উত্তম।

○ এ বিষয়টিও এখানে স্মর্তব্য যে, শরিয়াতের বিশেষ বিশেষ স্থানে যেসব দোয়া ও জিকির বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে পরিভাষায় احوال متوارده এর জিকির-আজকার বলা হয়। 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'য় হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) লিখেছেন, মূলত মানুষের দায়িত্ব হলো প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর জিকিরে রত থাকা। কিন্তু মানুষ এটা থেকে অক্ষম। এজন্য কখনো কখনো জিকির এই দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারে। কিন্তু সাধারণত এ থেকে গাফিলতি হয়ে যায়। শরিয়াত বিভিন্ন অবস্থায় দোয়াগুলো এজন্য নির্ধারণ করেছে যাতে এর দ্বারা গাফলতির দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

আরেকটি বিষয় এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, বিভিন্ন সময় এসব দোয়া করা কালে হাত উঠানো সুন্নতের বিপরীত। দোয়াসমূহে হাত উত্তোলন শুধুমাত্র সুনির্দিষ্ট অবস্থা ও সময়ের সাথে বিশেষিত।

قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب : অনেক সময় ইমাম তিরমিযী (র.) হাসান এবং غريب দুটি শব্দ উল্লেখ করেন একত্রে। জমহুরের মতে হাসান এবং গরিবের যে সংজ্ঞা প্রসিদ্ধ, এর আলোকে এতে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না। কারণ, অধিকাংশের মতে উভয়ের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। কারণ, হাদিস হাসান

হওয়ার সম্পর্ক বর্ণনাকারির হিফজ ও আদালতের সাথে, আর গরিবের সম্পর্ক রাবির একাকিত্বের সাথে। অতএব, দুটি একত্রিত হতে পারে। কিন্তু ইমাম তিরমিযী (র.)-এর বক্তব্যে প্রশ্ন এজন্য উত্থাপিত হয়েছে যে, তিনি হাদিসে হাসানের যে সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন 'কিতাবুল ইলালে' সেটি জমহুরের সংজ্ঞা থেকে ভিন্ন রকম। ইমাম তিরমিযী (র.) হাসানের সংজ্ঞা দিয়েছেন,

كل حديث يروى لا يكون فى اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن .

'যেগুলোর সনদে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত কোনো বর্ণনাকারি নেই। আবার হাদিসটি শাজও নয় এবং বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত, সেসব হাদিস আমাদের মতে হাসান।'

প্রশ্ন : এ থেকে বোঝা গেলো যে, ইমাম তিরমিযী (র.)-এর মতে হাদিস হাসান হওয়ার জন্য একাধিক সূত্র থাকা জরুরি। অপরদিকে গরিবের সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন এভাবে, كل حديث يروى ولا يروى الا من وجه واحد (যেসব হাদিস বর্ণিত হয় কেবলমাত্র এক সূত্রে বর্ণিত হয়)। এর দাবি হলো, ইমাম তিরমিযী (র)-এর নিকট হাসান এবং গরিবের মাঝে বৈপরীত্য রয়েছে। এজন্য এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে, ইমাম তিরমিযী (র.) هذا حديث حسن غريب কেনো বলেন?

জবাব : এই প্রশ্নের জবাব অনেক দেওয়া হয়েছে– ১. অনেক আলেম জবাব দিয়েছেন, অনেক সময় পূর্ণ সনদে কোনো একজন রাবির মধ্যে তাফারুরুদ তথা একা হয়ে থাকেন, যাকে মাদারে ইসনাদ (সনদের কেন্দ্রবিন্দু) বলা হয়। যেহেতু মাদারে ইসনাদ একজন রাবি, এজন্য এ হাদিসটিকে গরিব বলা হয়েছে। আর মাদারে ইসনাদের পূর্বে যেহেতু এটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত, এজন্য এটাকে হাসান বলা হয়েছে। কিন্তু এ জবাবটি দুর্বল। কারণ, এভাবে তো প্রতিটি গরিব হাদিসই হাসান হতে পারে। কেনোনা কোথাও না কোথাও তো একাধিক সূত্র হয়েই যায়।

২. তাই 'শরহে নুখবা'য় হাফেজ ইবনে হাজার (র.) দ্বিতীয় আরেকটি জবাব দিয়েছেন যে, ইমাম তিরমিযী (র.) 'কিতাবুল ইলালে' হাসানের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটি শুধু সেই হাদিসের সংজ্ঞা, যার মধ্যে গরিব শব্দ সংযুক্ত নেই। আর যেখানে ইমাম তিরমিযী হাসান গরিব বলেন সেখানে জমহুরের পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য করেন; স্বীয় পারিভাষিক অর্থ নয়। আর জমহুরের পরিভাষায় হাসান একত্রিত হতে পারে না গরিবের সাথে।

৩. হাফেজ ইবনে সালাহ (র.) স্বীয় মুকাদ্দামায় তৃতীয় একটি জবাব দিয়েছেন। সেটি হলো ইমাম 'কিতাবুল ইলালে' তিরমিযী (র.) হাসান লিগাইরিহির সংজ্ঞা দিয়েছেন। আর যেখানে তিনি হাসানের সাথে গরিবকে একত্র করেছেন সেখানে হাসান দ্বারা হাসান লিজাতিহি উদ্দেশ্য হয়।

৪. কিন্তু এসব জবাব মনে হচ্ছে অযৌক্তিক। সর্বোত্তম জবাব হজরত শাহ সাহেব (র.) দিয়েছেন। তিনি বলেন, যদি ইমাম তিরমিযী (র.)-এর 'কিতাবুল ইলালে'র মূল পাঠ গভীরভাবে পড়া হয়, তাহলে এই প্রশ্নের জবাব স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বেরিয়ে আসে। কারণ, 'কিতাবুল ইলালে' ইমাম তিরমিযী (র.) লিখেছেন,

وما ذكرنا فى هذا الكتاب حديث غريب فان اهل الحديث يستغربون الحديث لمعنى، رب حديث يكون غريبا لا يروى الا من وجه احد .

'এই কিতাবে আমি যে গরিব হাদিসের কথা বলেছি, তো মুহাদ্দেসিনে কেরাম একটি হাদিসকে বিভিন্ন কারণে গরিব মনে করেন। অনেক হাদিস গরিব হয়, কারণ এটি এক সূত্র ছাড়া অন্য কোনো সূত্রে বর্ণিত হয় না।'

এর উদাহরণ দেওয়ার পর বলেন, ورب حديث انما يستغرب لزيادة تكون فى الحديث (অনেক হাদিস গরিব মনে করা হয় বর্ণনায় অতিরিক্ত অংশ থাকার কারণে) তারপর এর উদাহরণ দেওয়ার পর বলেছেন, ورب

حديث يروى من اوجه كثيرة وانما يستغرب لحال الإسناد (অনেক হাদিস বহু সূত্রে বর্ণিত হয়, কিন্তু এটিকে শুধু সনদের অবস্থার কারণে গরিব মনে করা হয়।)

এ থেকে বোঝা গেলো যে, হাদিস গরিব হওয়ার সুরত রয়েছে তিনটি,

১. এ থেকে এর নির্ভরতা বাস্তবেই একজন রাবির ওপরে। এ রাবি ছাড়া অন্য কেউ তা বর্ণনা করেন না। এ প্রকারটি ইমাম তিরমিযী (র.)-এর পরিভাষা মুতাবেক হাসানের সাথে একত্রিত হতে পারে না।

২. হাদিস সামগ্রিকভাবে তো অনেক রাবি থেকে এবং বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত। কিন্তু এগুলোর মধ্য থেকে কোনো সূত্রে মূলপাঠে এমন কোনো অতিরিক্ত কিছু পাওয়া যায় যা অন্য সূত্রে নেই। এমতাবস্থায় মূল হাদিস তো গরিব হয় না, তবে যে সূত্রে অতিরিক্ত অংশ পাওয়া যায় সেটাকে এই অতিরিক্ততার কারণে গরিব বলে।

৩. মূল হাদিস একাধিক সূত্রে বর্ণিত; কিন্তু কোনো এক সূত্রে সনদের মধ্যে কোনো অতিরিক্ত অংশ পাওয়া যায়, তাহলে সে সূত্রটি গরিব হয়ে যায় এবং ইসনাদের পরিবর্তনের কারণে এই হাদিসটিকে গরিব বলে দেন।

এ বিষয়টি এই ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ইমাম তিরমিযী (র.) যেখানে হাসানকে গরিবের সাথে একত্র করেন সেখানে গরিব দ্বারা উদ্দেশ্য হয় শেষযুক্ত দুটি পদ্ধতি। অর্থাৎ, মূল হাদিস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে হাসান হয়। কিন্তু সনদ অথবা মূল পাঠে কোনো প্রকার তাফাররুদ আসার কারণে সাথে সাথে ইমাম তিরমিযী (র.) গরিবও বলেছেন।

ولا يعرف هذا الباب الا حديث عائشة (رض) : ইমাম তিরমিযী (র.)-এর এ বক্তব্য প্রশ্নসাপেক্ষ। কারণ, এ অনুচ্ছেদে আরও পাঁচটি[১] হাদিস বর্ণিত আছে হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর হাদিস ছাড়াও।

১. ইবনে মাজায় হজরত আনাস (রা.)-এর হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় পড়তেন এ দোয়া,

الحمد لله الذى اذهب عنى الاذى وعافنى ـ (ص٢٦ ابواب الطهارة باب ما يقول اذا خرج من الخلاء)

'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করেছেন এবং আমাকে সুস্থতা দান করেছেন।'

২. ইবনুস সুন্নির عمل اليوم والليلة ص٧، باب ما يقول اذا خرج الخلاء-তে হজরত আবু জর (রা.)-এর বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে নিম্নেযুক্ত ভাষায়–

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذى اذهب عنى الحزن والاذى وعافانى ـ

'রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পায়খানা থেকে বের হতেন, তখন পড়তেন এই দু'আ– 'আলহামদু লিল্লাহি...। তথা সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমা হতে চিন্তা-পেরেশানি-উদ্বেগ, কষ্টদায়ক বস্তু দূরীভূত করেছেন এবং আমাকে সুস্থ রেখেছেন।'

৩. সুনানে দারাকুতনি : ১/৫৭.তে হজরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিম্নেযুক্ত দোয়া পাঠের কথা বর্ণিত হয়েছে–

টীকা- ১. বরং পাঁচটিরও বেশি। এ কারণেই ইবনুস্ সুন্নি (র.) 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা' : পৃষ্ঠা ৭ باب ما يقول اذا خرج من الخلاء -এর হাদিস বর্ণনা করেছেন– كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الغائط قال الحمد لله الذى أحسن إلى فى أوله واخره 'রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন শৌচাগার থেকে বের হতেন তখন এই দু'আ পড়তেন– আলহামদুলিল্লাহ অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর, যিনি এর শুরু ও শেষে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।'

ওপরে যদিও ইবনে মাজাহ সূত্রে হজরত আনাস (রা.)-এরই আরেকটি বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে আসছে, কিন্তু যেহেতু এর শব্দাবলিতে এবং এই হাদিসের শব্দগুলোতে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে, এজন্য ওপরযুক্ত হাদিসটিকে স্বতন্ত্র গণ্য করা যেতে পারে। –সংকলক।

الحمد لله الذى اخرج عنى ما يؤذينى وامسك على ما ينفعنى (كتاب الطهارة، باب الاستنجاء)

'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাকে কষ্টদায়ক বস্তু হতে মুক্ত করেছেন এবং উপকারী বস্তুর ওপর জমিয়ে রেখেছেন।'

৪. ইবনুল জাওজি (র.) 'কিতাবুল ইলালে' ইবনুল এই শব্দগুলো হজরত সাহল ইবনে খায়সামা (রা.)-এর বর্ণনা থেকে বর্ণনা করেছেন।

৫. عمل اليوم والليلة ص٨ باب ما يقول اذا خرج الخلاء তে হজরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে–

ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم انى اعوذ بك من الرجس والنجس والخبيث والمخبث الشيطان الرجيم واذا خرج قال الحمد لله الذى اذاقنى لذته وابقى فى قوته واذهب عنى اذاه ـ

'রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পায়খানায় প্রবেশ (-এর ইচ্ছা) করতেন তখন এই দু'আ পড়তেন আল্লাহুম্মা... অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি নাপাক, অপবিত্র, খবিস ও ফাসাদের কারণ বিতাড়িত শয়তান থেকে। আর যখন বের হতেন তখন পড়তেন– আলহামদুলিল্লাহি... তথা সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাকে তাঁর (রিজিকের) স্বাদ গ্রহণ করিয়েছেন এবং আমার মধ্যে তাঁর সৃষ্টশক্তি অবশিষ্ট রেখেছেন, কষ্টদায়ক বস্তু আমা হতে দূরীভূত করেছেন।'

অতএব, এ সমস্ত হাদিসের বর্তমানে ইমাম তিরমিযী কর্তৃক এ বক্তব্য করা কিভাবে সঠিক হতে পারে যে, এ অধ্যায়ে হজরত আয়েশা (রা.)-এর হাদিস ছাড়া কোনো মা'রূফ হাদিস নেই?

০ কেউ কেউ জবাব দিয়েছেন- উক্ত পাঁচটি হাদিস সূত্রগতভাবে দুর্বল। আর ইমাম তিরমিযী (র.)-এর উদ্দেশ্য হলো, এই অধ্যায়ে হজরত আয়েশা (রা.)-এর হাদিস ছাড়া কোনো হাদিস শক্তিশালী সনদে প্রমাণিত নয়। কিন্তু এ জবাবটি এজন্য ঠিক নয় যে, ইমাম তিরমিযী (র.) وفى الباب عن فلان وفلان বলে যেসব হাদিসের বরাত দিয়েছেন সেগুলোতে সহিহ ও জয়িফ সব ধরনের বর্ণনা হয়ে থাকে। অতএব, এসব বর্ণনার দুর্বলতা এগুলোর বরাতের জন্য প্রতিবন্ধক হতে পারে না। অতএব, বাহ্যত এ রকম মনে হয় যে, ইমাম তিরমিযী (র.)-এর নিকট এসব হাদিস পৌঁছেনি। তিনি নিজের জ্ঞান মুতাবেক ওপরযুক্ত মন্তব্য করেছেন।

بَابٌ فِى النَّهْىِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ

অনুচ্ছেদ- ৬ : পেশাব-পায়খানাকালে কেবলামুখী হওয়া নিষেধ প্রসঙ্গে (মতন ৮)

حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا قَالَ (وفى نسخة بيروت "فقال") اَبُوْ اَيُّوْبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ قَدْ بُنِيَتْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَ نَسْتَغْفِرُاللّٰهَ ـ

৮. **অর্থ :** আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, যখন তোমরা শৌচাগারে যাও, তখন পেশাব-পায়খানাকালে কেবলার দিকে মুখ করো না এবং কেবলাকে পেছনে রেখো না; বরং পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাও। আবু আইয়ুব (রা.) বলেন, তারপর আমরা শামে (সিরিয়ায়) এলাম। সেখানে আমরা পায়খানাগুলো কেবলার দিক করে বানানো পেলাম। ফলে সেগুলোতে আমরা কেবলার দিকে থেকে চেহারা ফিরিয়ে বসতাম এবং আল্লাহর কাছে মাগফেরাত কামনা করতাম।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এই অনুচ্ছেদে আব্দুল্লাহ ইবনুল হারেস ও মাকিল ইবনে আবুল হায়ছাম (মা'কিল ইবনে আবু মা'কিলও বলা হয়) এবং আবু উমামা, আবু হুরায়রা ও সাহল ইবনে হুনায়ফ (রা.) হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা তিরমিযী বলেছেন, আবু আইয়ুব (রা.)-এর হাদিসটি এ পরিচ্ছেদে সর্বোত্তম ও বিশুদ্ধতম। আর আবু আইয়ুবের নাম হলো, খালেদ ইবনে জায়দ। জুহরির নাম হলো, মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে শিহাব আজ-জুহরি। তাঁর উপনাম আবু বকর। আবুল ওয়ালিদ মক্কি বলেন, আবু আব্দুল্লাহ শাফেয়ি (র.) বলেছেন– রাসূল ﷺ-এর বাণী, পেশাব-পায়খানার সময় কেবলার দিকে মুখ করো না এবং পিঠ করো না–দ্বারা উদ্দেশ্য ময়দানে তা না করা। কিন্তু তৈরি শৌচাগারে কেবলার দিকে মুখ ফেরানোর অনুমতি আছে। ইসহাক (র.)ও অনুরূপ বলেছেন। আর আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেছেন, রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে শুধু পেশাব-পায়খানাকালে কেবলার দিকে পিঠ করার অনুমতি আছে; কিন্তু কেবলার দিকে মুখ করতে পারবে না। তাহলে যেনো ময়দানে এবং তৈরি শৌচাগারে কেবলার দিকে মুখ করার রায় তিনি পোষণ করেন না।'

দরসে তিরমিযী

سعد بن عبد الرحمن المخزومي : ইনি হচ্ছেন সায়িদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হাসসান। তৃতীয় শতাব্দির মুহাদ্দিস। ইমাম তিরমিযী এবং নাসায়ির উস্তাদ। ইমাম নাসায়ি তাঁকে নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন।

سفيان بن عيينة : মশহুর মুহাদ্দিস। সবাই তাঁর মাহাত্ম্যের ব্যাপারে একমত। বিশেষকরে তাঁকে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করা হয় আমর ইবনে দিনারের হাদিসগুলোর ব্যাপারে। শেষ বয়সে তাঁর স্মরণশক্তিতে কিছুটা পরিবর্তন এসে গিয়েছিলো। তিনি তাদলিসও করতেন। (তাদলিস মানে হাদিস বর্ণনাকারি কর্তৃক নিজের প্রকৃত উস্তাদের নামোল্লেখ না করে তার ওপরস্থ উস্তাদের নামোল্লেখ করা বা উস্তাদের প্রসিদ্ধ নাম বা উপনাম উল্লেখ না করা। যা দ্বারা মনে হয় তিনি ওপরের শায়খ থেকে হাদিস শুনেছেন, অথচ তিনি কেবল তাঁর উস্তাদ থেকে শুনেছেন, ওপরের শায়খ থেকে নয়। কিন্তু যেহেতু সাধারণত তাঁর তাদলিস হতো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারিদের থেকে, এজন্য তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করা হয়েছে।

عن الزهري : মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে শিহাব জুহরি তাঁর নাম। হাদিসের প্রাথমিক সংকলকদের একজন। অনেক তাঁর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ বক্তব্য হলো, তিনি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারি।

عن عطاء بن يزيد الليثي : মদিনা তাইয়িবার তাবেয়িদের অন্তর্ভুক্ত। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি (র.) ঐতিহাসিকভাবে তাঁকে তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সর্বসম্মতিক্রমে তিনি ثقة।

الغائط : অভিধানে غائط বলা হয় নিচু জমিনকে। যেহেতু আরবগণ মল-মূত্র ত্যাগের জন্য সাধারণত নিচু জমিন ব্যবহার করতেন, এজন্য শৌচাগারের ক্ষেত্রে এ শব্দটির প্রয়োগ আরম্ভ হয়। কোনো কোনো সময় নাপাকির ক্ষেত্রেও এটি ব্যবহার হয়। এজন্য উক্ত হাদিসে প্রথম غائط শব্দটি শৌচাগার এবং দ্বিতীয় غائط শব্দটি (বাহ্যিক) নাপাকির অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

ولكن شرقوا او غربوا : অর্থাৎ, পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফিরো। এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মদিনা তাইয়িবার দিকে লক্ষ্য করে। কারণ, সেখান থেকে কেবলা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। যেসব স্থানে কেবলা পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে সেখানে দক্ষিণ অথবা উত্তর দিকে হওয়ার নির্দেশ হবে। কারণ এর মূল কারণ হলো কেবলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

مراحيض : مرحاض -এর বহুবচন। এটি পায়খানার অর্থে ব্যবহৃত। এ শব্দটি উৎপন্ন رحض يرحض থেকে। যার অর্থ হলো, ধৌত করা। এ শব্দটি অনেক সময় গোসলখানার অর্থেও ব্যবহার হয়।

فننحرف عنها ونستغفر الله : এখানে عنها -এর জমির দ্বারা বাহ্যত ইঙ্গিত করা হয়েছে কেবলার দিকে।

০ এর অর্থ এই যে, কেবলার দিকে করে তৈরি পায়খানাগুলোতে আমরা কেবলার দিক থেকে সরে বসতাম। কিন্তু যেহেতু পায়খানাগুলোতে পূর্ণাঙ্গরূপে সরে বসা কঠিন ছিলো এজন্য আমরা ইস্তেগফারও করতাম।

০ অনেকে বলেছেন, জমিরটি ফিরেছে مراحيض -এর দিকে। অর্থ হলো, সেসব কেবলার দিকে করে তৈরি পায়খানাগুলো থেকে আমরা সরে থাকতাম। এগুলোর পরিবর্তে অন্যত্র মল-মূত্র ত্যাগ করতাম এবং ইস্তেগফার করতাম এগুলোর স্থপতিদের জন্য।

০ 'বজলুল মাজহুদ' ১/৭-এ আল্লামা সাহারানপুর (র.) এই ব্যাখ্যাটিকে অযৌক্তিক সাব্যস্ত করেছেন। কেনোনা, এসব শৌচাগারের স্থপতি ছিলো কাফেররা এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার কোনো অর্থ নেই।

০ তুহফাতুল আহওয়াজির লেখক এ জবাব দিয়েছেন, হতে পারে এসব শৌচাগার এমন মুসলমানরা তৈরি করেছিলেন যারা আবাদির ভেতরে কেবলার দিকে মুখ করাকে মাকরূহ মনে করতেন না।

০ স্বয়ং আল্লামা সাহারানপুরি (র.) এই অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, আমরা শুরুতে এসব শৌচাগারগুলোতে কেবলার দিকে মুখ করে বসে যেতাম। কিন্তু পরবর্তীতে যখন খেয়াল আসতো তখন রুখ পরিবর্তন করে ফেলতাম এবং প্রথম দিকে যে কেবলামুখী হয়ে বসতাম ক্ষমা প্রার্থনা করতাম এর জন্য।

انما معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم الخ : এখান থেকে ইমাম তিরমিযী (র.) স্বীয় স্বভাব মুতাবেক কেবলার দিকে মুখ করা এবং কেবলাকে পেছনে ফেলার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য ও মাজহাবগুলো বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এখানে ইমাম তিরমিযী (র.) সংক্ষেপ করে ফেলেছেন। তিনি শুধু কয়েকটি মাজহাব বর্ণনা করেছেন। অথচ এ মাসআলাটিতে রয়েছে নয়টি মাজহাব ফুকাহায়ে কেরামের।

১. কেবলার দিকে মুখ করা এবং পিঠ দেওয়া উভয়টি সাধারণভাবে অবৈধ। চাই খোলা ময়দানে হোক কিংবা আবাদিতে। এ মতটি হলো হজরত আবু হুরায়রা (রা.) ইবনে মাসউদ (রা.) আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) সুরাকা ইবনে মালেক (রা.), মুজাহিদ, ইবরাহিম নাখয়ি, তাউস ইবনে কায়সান, আ'তা, আবু সাউর, ইমাম আওজায়ি সুফিয়ান সাওরি, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মুহাম্মদ, ইবনে হাজম জাহেরি, ইবনে কাইয়িম (র)-এর এবং ইমাম আহমদ (র.)-এরও একটি বর্ণনা অনুরূপ। হানাফিদের মতে এটার ওপরেই ফতওয়াও।

২. কেবলার দিকে মুখ করা ও পিঠ দেওয়া উভয়টি সাধারণভাবেই জায়েজ, চাই আবাদিতে হোক কিংবা ময়দানে। এই মাজহাবটি বর্ণিত হজরত আয়েশা, উরওয়া ইবনে জুবায়ের, ইমাম মালেক (র.)-এর উস্তাদ রবি'আ আর-রায়ি, দাউদ জাহেরি থেকে।

৩. কেবলার দিকে মুখ করা ও পিঠ দেওয়া ময়দানে উভয়টি অবৈধ, আবাদিতে উভয়টি জায়েজ। এ মতটি হলো হজরত ইবনে আব্বাস (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.), আমির শা'বি (র.), ইমাম মালেক (র.), ইমাম শাফেয়ি (র.), ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (র.) এর। ইমাম আহমদ (র.)-এর একটি বর্ণনাও এমন।

৪. কেবলার দিকে মুখ করা উভয় অবস্থাতে নাজায়েজ। কেবলার দিকে পিঠ দেওয়া উভয় অবস্থাতে জায়েজ। এটি ইমাম আহমদ (র)-এর একটি বর্ণনা। কোনো কোনো আহলে জাহের-এর প্রবক্তা এবং ইমাম আবু হানিফা[১] (র.)-এর একটি বর্ণনাও এমন।

টীকা- ১. যেমন : বজলুল মাজহুদে আইনির সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে ১/২।

৫. কেবলার দিকে মুখ করা সর্বাবস্থায় অবৈধ। আর কেবলার দিকে পিঠ দেওয়া আবাদিতে জায়েজ ময়দানে অবৈধ। এই মতটি হলো ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর। ইমাম আ'জম (র.)-এর একটি বর্ণনাও এমন।

৬. কা'বার দিকে মুখ করা ও পিঠ দেওয়ার সাথে সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করা ও পিঠ দেওয়াও ব্যাপক আকারে অবৈধ। এ বক্তব্যটি হলো মুহাম্মদ ইবনে সিরিনের। এক বর্ণনা মতে ইবরাহিম নাখয়ি (র.) ও এই বলে।

৭. কেবলার দিকে মুখ করা ও পিঠ দেওয়া উভয়টির নিষিদ্ধতা মদিনাবাসীর সাথে বিশেষিত। অন্যদের জন্য উভয়টি জায়েজ। হাফিজ আবু আওয়ানার বক্তব্য এটি।

৮. কেবলার দিকে মুখ করা ও পিঠ দেওয়া সাধারণভাবে মাকরূহে তানজিহি। এটি হলো ইমাম আবু হানিফা (র.) থেকে একটি বর্ণনা। যেটি বর্ণনা করেছেন, 'আন্ নাহরুল ফায়েক শরহে কানজুদ দাকায়েক' গ্রন্থকার হজরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ (র.) 'মুসাফ্‌ফা ও মুসাওয়ায়' এবং প্রসিদ্ধ হানাফি আলেম আল্লামা শাওক নিমভি (র.) আছারুস সুনান পৃষ্ঠা ২৩ বাবু আদাবিল খালাতে এটাই গ্রহণ করেছেন।

মূলত: এই ইখতেলাফটি বর্ণনার বিভিন্নতার ওপর। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা রয়েছে। প্রথম বর্ণনা হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত। এ অধ্যায়ের হাদিসটি নিম্নেযুক্ত,

اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها [১]

সর্বসম্মতিক্রমে এ হাদিসটি এ অধ্যায়ের মধ্যে বিশুদ্ধতম। এর দ্বারা হানাফিগণ এবং প্রথম মাজহাবের সমস্ত ওলামায়ে কেরাম ব্যাপক নিষিদ্ধতার ওপর প্রমাণ পেশ করেন। কারণ, এতে রয়েছে ব্যাপক হুকুম। ময়দান ও আবাদির কোনো পার্থক্য করা হয়নি।

দ্বিতীয় বর্ণনাটি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর। ইমাম তিরমিযী (র.) যেটা বর্ণনা করেছেন,

"قال رقيت يوما على بيت حفصة (رض) فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة."

'ইবনে উমর (রা.) বলেন, আমি একদিন হাফসা (রা.)-এর ঘরের ছাদে আরোহণ করলাম। দেখলাম, নবী করিম ﷺ নিজের হাজত পূর্ণ করছেন কা'বার দিকে পিঠ দিয়েও শামের দিকে মুখ করে।'

দ্বিতীয় মাজহাবপন্থিগণ ব্যাপক আকারে বৈধতার ওপর প্রমাণ পেশ করেন এ হাদিসটি দ্বারা, তৃতীয় মাজহাবপন্থিগণ শুধু আবাদিতে বৈধতার ওপর, চতুর্থ মাজহাবপন্থিগণ[২] কেবলার দিকে পিঠ করা ব্যাপক আকারে বৈধ হওয়ার ওপর, পঞ্চম মাযহাবপন্থিগণ আবাদিতে ইস্তিদবারের বৈধতার ওপর, অষ্টম মাজহাবপন্থিগণ প্রমাণ পেশ করেন কেবলার দিকে পিঠ দেওয়া মাকরূহে তানজিহি হওয়ার ওপর।

তৃতীয় বর্ণনাটি হজরত জাবের (রা.)-এর। তিরমিযী এবং আবু দাউদে রয়েছে,

"قال نهى النبى صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها"

'তিনি বলেন, পেশাবকালে কা'বার দিকে মুখ করতে নবী করিম ﷺ নিষেধ করেছেন। তারপর তাঁর ওফাতের এক বছর পূর্বে আমি দেখেছি তাঁকে কা'বার দিকে মুখ করতে।'

টীকা- ১. এ হাদিসটি তিরমিযী ছাড়া বোখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ি এবং মুয়াত্তা ইমাম মালেকেও রয়েছে।
-জামি'উল উসূল ৭/১২০, তৃতীয় অধ্যায়, কিতাবুত তাহারাত, হাদিস নং ৫০৭৮।

টীকা- ২. আল্লামা শাওকানি (র.) বলেন, চতুর্থ মাজহাবপন্থিগণ সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হজরত সালমান (রা.)-এর হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। সেখানে কেবলার দিকে মুখ করা ছাড়া অন্য কিছু সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু এটা বাতিল। কারণ, কেবলার দিকে পিঠ দেওয়া সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা অনেক সহিহ হাদিসে বিদ্যমান রয়েছে। এটি এমন অতিরিক্ত বিষয় যা গ্রহণ করাই সুনির্ধারিত।
-নাইলুল আওতার : ১/৬৯।

দ্বিতীয় মাজহাবপন্থিগণ ব্যাপক আকারে বৈধতার ওপর প্রমাণ পেশ করেছেন এ হাদিসটি দ্বারা এবং তৃতীয় মাজহাবপন্থিগণ শুধু আবাদিতে জায়েজ হওয়ার ওপর দলিল পেশ করেছেন।

চতুর্থ বর্ণনাটি ইবনে মাজায় হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে,

"ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون ان يستقبلوا بفروجهم القبلة"

(ابن ماجة، كتاب الطهارة باب الرخصة فى ذلك فى الكنيف واباحته دون الصارى)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একবার এমন একটি সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা হলো, যারা তাদের লজ্জাস্থান কেবলামুখী করতে অপছন্দ করতো। তখন তিনি বললেন, আমি দেখছি তারা এমন করছে। তোমরা আমার বায়তুল খালা কেবলামুখী করে দাও।'

এ হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন হজরত আয়েশা (রা.) কেবলার দিকে মুখ করা ও পিঠ দেওয়া ব্যাপক আকারে বৈধ হবার ওপর এবং শাফেয়ি ও মালেকি মতাবলম্বীগণ শুধু আবাদিতে বৈধতার ওপর।

পঞ্চম বর্ণনাটি হলো আবু দাউদ শরিফে كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة এ হজরত মা'কিল ইবনে আবি মা'কিল আসাদি (রা) থেকে বর্ণিত,

"قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلتين ببول أو غائط"

'তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন পেশাব-পায়খানাকালে কেবলাদ্বয়ের দিকে মুখ ফিরাতে।'

মুহাম্মদ ইবনে সিরিন এবং এক বর্ণনা মতে ইবরাহিম নাখয়ি (র.) এ বিষয়ে এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন যে, কা'বা ছাড়া বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকেও মুখ করা ও পিঠ দেওয়া মাকরূহ।

হানাফি মাজহাবের প্রাধান্যতার কারণগুলো

ওপরযুক্ত সবগুলো বর্ণনা থেকে হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (রা.)-এর বর্ণনাটিকে হানাফিগণ প্রাধান্য দিয়ে এর ওপর স্বীয় মাজহাবের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। অবশিষ্ট সবগুলো বর্ণনার ব্যাখ্যা দিয়ে সেগুলোকে এই বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করেছেন। হজরত আবু আইয়ুব (রা.)-এর বর্ণনার প্রাধান্যের কারণ নিম্নেযুক্ত,

১. সমস্ত মুহাদ্দেসিনের সর্বসম্মতিক্রমে এ হাদিসটি সনদগত দিক দিয়ে এ অধ্যায়ে বিশুদ্ধতম এবং এ অধ্যায়ে অন্য কোনো হাদিস সূত্রগত দিক দিয়ে এর মুকাবেলা করতে পারে না।

২. একটি মৌলিক আইনের মর্যাদা রাখে হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (রা.)-এর বর্ণনা। এর মুকাবেলায় অন্যসব বর্ণনা শাখাগত ঘটনা। হানাফিদের মূলনীতি হলো, তারা বিপরীতধর্মী বর্ণনাগুলোর মধ্য হতে সে বর্ণনাটি গ্রহণ করেন যাতে মৌলিক আইন বর্ণনা করা হয়েছে। এমন স্থানে হানাফিগণ শাখাগত ঘটনাবলিতে তাবিল বা ব্যাখ্যা দেন।

৩. হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (রা.)-এর বর্ণনা কওলি, আর বিরোধী বর্ণনা ফে'লি। নিয়ম হলো, বিরোধের সময় সর্বসম্মতিক্রমে প্রাধান্য হয় কওলি হাদিসেরই।

৪. হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (রা.)-এর বর্ণনা হারামকারক। বিরোধী বর্ণনাগুলো বৈধকারি। এটিও একটি মূলনীতি যে, পরস্পর বিরোধের সময় বৈধকারির ওপর হারামকারকের প্রাধান্য হয়।

৫. হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (রা.)-এর বর্ণনা স্পষ্ট এবং কারণও বিদিত। অন্যান্য বর্ণনা অস্পষ্ট– কারণ অবিদিত। কেনোনা, এগুলোতে অনেক সম্ভাবনা রয়েছে যেমন পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ আসবে।

৬. হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (রা.)-এর হাদিস কোরআনের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, কোরআনে কারিমের অনেকগুলো আয়াত আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের গুরুত্ব প্রমাণ করে। এ

কারণে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন– ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب (যে আল্লাহর নির্দেশনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সেটি তার আন্তরিকতার পরিচায়ক।) তাছাড়া বিশেষভাবে কা'বা শরিফের তা'জিম একটি সর্বসম্মত বিষয়।

৭. প্রচুর হাদিস দ্বারা এই হাদিসটি সহায়তাপ্রাপ্ত। তাই তিরমিযীতে[২] বর্ণিত হজরত সালমান ফারেসির বর্ণনা আবু দাউদ[৩] ও ইবনে মাজাহতে[৪] বর্ণিত হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনার সহায়তা করছে। এ দুটি বর্ণনা সূত্রগতভাবে বিশুদ্ধ। তাছাড়া হজরত আবু আওয়ানা (রা.) হজরত সাহল ইবনে হুনায়ফ (রা.), হজরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) থেকেও এ ধরনের বর্ণনা বর্ণিত আছে। যেগুলো দ্রষ্টব্য মাজমাউজ জাওয়ায়েদ ইত্যাদি।

যদিও এসব হাদিসের সনদ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে; কিন্তু এগুলো সহায়ক হওয়ার ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার হাদিসের কিতাবাদিতে আরো অনেক হাদিস এ ধরনের বর্ণিত আছে। সহায়ক হিসেবে পেশ করা যেতে পারে যেগুলো।

৮. হজরত আবু আইয়ুব (রা.)-এর হাদিস কিয়াস দ্বারাও সহায়তাপ্রাপ্ত। কেনোনা, সহিহ ইবনে খুজায়মা ও সহিহ ইবনে হাব্বানে একটি বিশুদ্ধ মারফু বর্ণনা রয়েছে,

من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه .

(معارف السنن جا، صـ٩٥ بحواله صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان)

'কেবলার দিকে যে থুতু নিক্ষেপ করবে সে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে তার এই থুতু চোখের সামনে নিয়ে।'

সুতরাং থুতু ফেলতেই যেহেতু নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অতএব, মল-মূত্র ত্যাগের সময় কেবলার দিকে মুখ করার নিষেধাজ্ঞাতো হয়ে থাকবে উত্তমরূপেই।

বিপরীত বর্ণনাগুলোর জবাব

এবার পাঠকের খেদমতে পেশ করছি অন্যান্য বর্ণনার জবাব। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর বর্ণনাটি হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (রা.)-এর বর্ণনা অপেক্ষা নিম্ন মর্যাদার হওয়া সত্ত্বেও বিশুদ্ধ। কিন্তু এর ব্যাখ্যায় কয়েকটি সম্ভাবনা রয়েছে। কেনোনা, একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা এটি। তাছাড়া প্রকাশ থাকে যে, এমন ঘটনায় ইবনে উমর (রা.) ইচ্ছাকৃতভাবে প্রিয়নবী ﷺ-এর দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না; বরং ঘটনাক্রমে হয়তো নজর পড়ে গিয়েছিলো। আর এমতাবস্থায় ভ্রান্তির সম্ভাবনা প্রচুর।

০ প্রথম সম্ভাবনা, রাসূল ﷺ আসলে কেবলার দিকে পিঠ দেননি; কিন্তু হজরত ইবনে উমর (রা.)কে দেখে লজ্জায় তাঁর অবস্থা পরিবর্তন করে ফেলেছিলেন। কা'বার দিকে পিঠ দেওয়া হয়ে গেছে এই পরিবর্তনের কারণে।

০ দ্বিতীয় সম্ভাবনা, পুরোপুরিভাবে তিনি পিঠ দেননি; বরং কা'বা থেকে সামান্য সরে গিয়েছিলেন। হজরত ইবনে উমর (রা.) দূর থেকে এই সামান্য সরে যাওয়ার বিষয়টি অনুভব করতে পারেননি। এর বিস্তারিত বিবরণ হল, এ বিষয়ে কা'বার দিকে মুখ ও পিঠ করার অর্থ নামাজের মধ্যে কা'বার দিকে মুখ ও পিঠ করা থেকে ভিন্ন। ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন যে, নামাজে হুবহু কেবলাকে সামনে রাখা জরুরি নয়, বরং কেবলার দিককে সামনে রাখা যথেষ্ট। এজন্য আল্লামা শামি (র.) লিখেছেন, নামাজের মধ্যে যদি ৪৫ ডিগ্রী ডান দিকে এবং ৪৫ ডিগ্রী বাম দিকে সরে যায় তবুও নামাজ হয়ে যায়। এর পরিপন্থি এ বিষয়ে (মল-মূত্র ত্যাগে) হুবহু কেবলাকে সামনে রাখা এবং পিঠ দেওয়া উদ্দেশ্য। অতএব, যদি কেবলা থেকে সামান্যও সরে যায় তবুও মাকরূহ খতম হয়ে যাবে। এমনকি ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, যদি কোনো ব্যক্তির চেহারা কা'বার দিকে থাকে এবং লজ্জাস্থান অন্যদিকে

টীকা- ১. باب الإستنجاء بالحجارة

২. باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، جا

৩. باب الإستنجاء بالحجارة والنهى عن الروث والرمة صـ٢٧

৪. كتاب الطهارة باب استقبال القبلة عند الحاجة، جا ، صـ٢٠٥

ফিরে থাকে তবুও মাকরূহ থাকে না। এবার সম্ভাবনা আছে যে, রাসূল ﷺ-এর এই কা'বার দিক থেকে সরে আসা সাধারণ প্রকারের হয়ে থাকবে। হজরত ইবনে উমর (রা.) নামাজের মধ্যে কেবলারুখ হওয়ার ওপর কিয়াস করে বুঝে নিয়েছেন যে, এখানেও কা'বা শরিফকে সামনে রাখা এবং পেছন দেওয়ার অর্থ তাই।

০ তৃতীয় সম্ভাবনা এটাও আছে যে, এটা রাসূল ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য। এর সহায়তা এ দ্বারাও হয় যে, ওলামায়ে কেরামের একটি দলের নিকট যাঁদের অন্তর্ভুক্ত আল্লামা শামি (র.) এবং হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি (র.)-ও প্রিয়নবী ﷺ-এর মল-মূত্র পবিত্র। অতএব, রাসূল ﷺ এ হুকুম থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত হওয়াও বিচিত্র নয়। তারপর চিন্তার বিষয় হলো, যদি এই আমল দ্বারা প্রিয়নবী ﷺ-এর উদ্দেশ্য কা'বার দিকে পিঠ দেওয়ার অনুমতি প্রদান হতো, তাহলে একটি গোপন আমলের মাধ্যমে এর তা'লিম দেওয়ার পরিবর্তে স্পষ্ট ভাষায় সমস্ত উম্মতের সামনে এই হুকুম বর্ণনা করতেন। যেমন, আবু আইয়ুব আনসারি (রা.)-এর বর্ণনায় করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, এই আমল দ্বারা হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (রা.)-এর বর্ণনার পরিপন্থি কোনো বিধিবদ্ধ হুকুম দেওয়া উদ্দেশ্য নয়।

আরেকটি জিনিস এখানে লক্ষণীয় যে, হজরত ইবনে উমর (রা.)-এর বর্ণনা দ্বারা আবাদি ও ময়দানের কোনো পার্থক্য বোঝা যায় না। অতএব, এর দ্বারা শাফেয়ি এবং মালেকি মতাবলম্বীদের প্রমাণ অসম্পূর্ণ। তাঁরা এই পার্থক্যের দলিল হিসেবে হজরত ইবনে উমর (রা.)-এর আমল পেশ করেন,

عن مروان الاصفر قال رايت ابن عمر رضى الله تعالى عنه انا خ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا ابا عبد الرحمن اليس قد نهى عن هذا قال بلى انما نهى عن ذلك فى الفضاء فاذا كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس" ـ

(ابو داود ، كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة)

'মারওয়ান আসফার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে উমর (রা.)-কে আমি দেখেছি তিনি তার সওয়ারি কেবলামুখী করে বসিয়ে তারপর তার দিকে মুখ করে বসে প্রস্রাব করছেন। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, আবু আব্দুর রহমান! এ থেকে কি নিষেধ করা হয়নি? তখন তিনি বললেন, এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে ময়দানে। যখন তোমার ও কেবলার মাঝে কোনো আড়াল থাকবে তখন তাতে কোনো অসুবিধা নেই।'

এই বর্ণনার বিভিন্ন জবাব হানাফিদের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। 'বজলুল মাজহুদে' আল্লামা সাহারানপুর (র.) এর জবাব দিয়েছেন যে, এ জবাবটি দুর্বল[১]। কারণ, এটি নির্ভর করে হাসান ইবনে জাকওয়ানের ওপর। যাঁকে ইয়াহইয়া ইবনে মাইন (র.), ইমাম নাসায়ি (র.), ইবনে আদি (র.) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) প্রমুখ দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। অতএব, এ বর্ণনাটি প্রমাণযোগ্য নয়। তবে এ জবাবটি সন্তোষজনক নয়। কারণ, হাসান ইবনে জাকওয়ান একজন বিতর্কিত রাবি। যার সম্পর্কে জারহ ও তা'দিলের রায় বিভিন্ন প্রকার এবং কেউ কেউ তাকে নির্ভরযোগ্যও বলেছেন। হাফেজ জাহাবি (র.) 'মিজানুল ই'তিদালে' তাঁর সম্পর্কে বক্তব্য বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীতে এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, انه صالح الحديث وارجو انه لا باس به (তাঁর হাদিস ভালো। আশা করি এই রাবির মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই।) হাফেজ জাহাবি (র.) রাবিদের সম্পর্কে সমালোচনার ক্ষেত্রে অনেক অভিজ্ঞতা রাখেন। এ কারণে তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। এর ওপর ভিত্তি করেই 'তালখিসুল হাবিরে' হাফেজ ইবনে হাজার (র.) এটাকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন এবং 'সুনানে দারাকুতনি' ১/৫৮-তে ইমাম আবু দাউদ (র.)

টীকা- ১. এই হাদিসটি হাসান ইবনে জাকওয়ানের ওপর নির্ভর করে। তার সম্পর্কে ইবনে মাইন ও আবু হাতেম বলেছেন, 'তিনি জয়িফ'। আবু হাতেম ও নাসায়ি (র.) বলেছেন– "তিনি শক্তিশালী নন।" ইয়াহইয়া ইবনে মাইন (র.) বলেছেন, 'তাঁর হাদিস মুনকার' এবং তিনি তাঁকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে আবিদ্ দুনইয়া বলেন, 'তিনি আমার মতে শক্তিশালী নন'। ইমাম আহমদ (র.) বলেন, তাঁর হাদিসগুলো বাতিল। আমর ইবনে আলি বলেন, 'ইয়াহইয়া (র.) তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করতেন; কিন্তু আব্দুর রহমানকে দেখিনি তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করতে।' –বজলুল মাজহুদ : ৮/১।

এটাকে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, هذا صحيح كلهم ثقات । অর্থাৎ, হাদিসটি সহিহ। এর সমস্ত রাবি নির্ভরযোগ্য। 'আল-মুনতাকা'য় ইবনুল জারুদ (র.) করেছেন এ হাদিসটি তাখরিজ।

তাঁর সম্পর্কে অথচ প্রসিদ্ধ আছে, তিনি শুধু বর্ণনা করেন সহিহ হাদিসই। তাছাড়া স্বয়ং হানাফিদের মধ্য থেকে আল্লামা নিমবি (র.) 'আছারুস্ সুনান'-এর ২৩ পৃষ্ঠায় এটিকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন এবং এই ধরনের হাদিস দ্বারা হানাফিগণ প্রচুর প্রমাণ পেশ করেন। অতএব, এ স্তরের বর্ণনাকে ব্যাপক আকারে অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করা কঠিন। অতএব, এর বিশুদ্ধ জবাব হলো, এটি হজরত ইবনে উমর (রা.)-এর নিজস্ব আমল ও ইজতেহাদ। মারফু হাদিসগুলোতে এই পার্থক্যের কোনো ভিত্তি বর্ণিত হয়নি। তাছাড়া সাহাবির ইজতেহাদ প্রমাণ নয়। বিশেষত যখন এর বিপরীতে অন্যান্য সাহাবির আছার বিদ্যমান থাকে। তাছাড়া হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর এই ইজতেহাদ ফিক্‌হি দৃষ্টিকোণ থেকে অপ্রধান মনে হয়। কারণ, যদি কেবলাকে সামনে রাখার নিষিদ্ধতা এ কথার ওপর স্থগিত থাকে যে, মল-মূত্র ত্যাগকারি এবং কা'বার মাঝে কোনো অন্তরায় না থাকতে হবে, তবে এ ধরনের ইস্তেকবাল কথা কা'বা শরিফের দিকে মুখ করা শুধু হেরেম শরিফে বসেই হতে পারে, অন্য কোথাও নয়। কারণ, কোনো না কোনো বিল্ডিং বা পাহাড় মাঝখানে অবশ্যই প্রতিবন্ধক হয়। অতএব, এর আবেদন হলো ময়দান ইত্যাদিতেও কা'বার দিকে মুখ করা জায়েজ হবে এবং কা'বার দিকে মুখ করা ও পিঠ দেওয়া মাকরূহ হবে না। অথচ এ কথাটি স্বয়ং শাফেয়ি মতাবলম্বীদেরও মতের পরিপন্থি।

০ ইমাম শাফেয়ি (র.) বলেন, কাবা শরিফের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এই হুকুমের কারণ নয়; বরং মুসল্লিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। কিন্তু এ কথাটি ঠিক নয় এবং এ কারণটিও প্রশ্নসাপেক্ষ। কারণ, সমস্ত হাদিসে নিষিদ্ধতায় কেবলার শব্দটি এসেছে। যা দ্বারা স্পষ্ট এটাই যে, এ হুকুমটি দেওয়া হচ্ছে কেবলার প্রতি ইহতেরামের ভিত্তিতেই।

০ দ্বিতীয়তো মুসল্লিদের প্রতি সম্মানের কথাই যদি ধর্তব্য হয়। তাহলে কোনো দিকেই মল-মূত্র ত্যাগ করার অনুমতি না হওয়া উচিত। কারণ, সর্বদিকেই মুসল্লিদের অস্তিত্বের সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া যদি এ হুকুমটিকে সহিহ মেনে নেওয়া হয়, তখনো ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মাজহাব মতে এই কারণটি মিলানো যায় না। কারণ, আবাদিতে মুসল্লিদের অস্তিত্ব ময়দানের তুলনায় অধিক সম্ভাব্য। অতএব, উচিত আবাদিতেও কা'বার দিকে মুখ ও পিঠ করা জায়েজ না হওয়া।

০ দ্বিতীয় হাদিসটি, হযরত জাবের (রা.)-এর। অনেকে এর জবাবও দিয়েছেন যে, এর সনদে দু'জন বর্ণনাকারি রয়েছেন সমালোচিত। একজন আবান ইবনে সালেহ, আরেকজন মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক। এই জবাব তবে যথেষ্ট হবে না। কেনোনা, এ দু'জন রাবি বিতর্কিত। আবান ইবনে সালেহকে জয়িফ সাব্যস্তকারি কেবল দু'জন। একজন হাফেজ ইবনে আব্দুল বার, যিনি 'আত্-তামহিদে' তার বর্ণনাকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন এবং দ্বিতীয়জন হচ্ছেন ইবনে হাজম। যিনি 'আল-মুহাল্লা' নামক গ্রন্থে আবান ইবনে সালেহের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু মুহাক্কিকগণ বলেছেন, আবানের বিরুদ্ধে সমালোচনা তাদের দু'জনের উদাসীনতার পরিচয়। তাঁদের পূর্বে কেউ তাঁর সমালোচনা করেনি। যেমন, এ সম্পর্কিত আলোচনা 'বজলুল মাজহুদে' হয়েছে। যতোটুকু পর্যন্ত মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বিষয়টি সম্পৃক্ত স্বয়ং হানাফিগণ এমন বহু বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন যেগুলো বর্ণিত মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক[১] থেকে।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক এমন তবকার রাবি, যাঁর সম্পর্কে আয়িম্মায়ে হাদিসের এতো প্রচণ্ড মতবিরোধ হয়েছে সম্ভবত অন্য কোনো রাবি সম্পর্কে এতো মারাত্মক মতবিরোধ হয়নি। তার সম্পর্কে ইমাম মালেক (র.) বলেছেন,

لئن أقمت فيما بين وباب بيت الله لقلت انه دجال كذاب وقال : "دجال من الدجالة"

'আমাকে যদি হিজর এবং বায়তুল্লাহ শরিফের দরজায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় তবে আমি বলবো, সে দাজ্জাল -মিথ্যুক এবং বলেছেন দাজ্জালদের একজন।'

টীকা- ১. তাকে ইবনে মুবারক, ইবনে সা'দ, ইবনে মাইন, বোখারি, আজালি নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইমাম বায়হাকি (র.) কিতাবুল আসমা ওয়াস্ সিফাতে তাঁর সমালোচনা করেছেন অথচ কিতাবুল কেরাতে তাঁর ওপর নির্ভর করেছেন। সেখানে কোনো সমালোচনা করেননি, তাঁর বর্ণনা দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেছেন। এ হলো তাঁর বিস্ময়কর বিচার। -মা'আরিফুস সুনান : ১/৯১

তাঁর সম্পর্কে শো'বা বলেছেন, 'আমিরুল মু'মিনিন ফিল হাদিস' অন্যান্য ওলামায়ে জারহ-তা'দিলের রায়ও তাঁর সম্পর্কে বিচিত্র ধরনের। কেউ কেউ তাঁর সম্পর্কে ফয়সালা করেছেন যে, তাঁর যেসব বর্ণনা حدثنا শব্দে বর্ণিত হয়েছে সেটি গ্রহণযোগ্য; আর যেটি عن সহকারে বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ হাদিসটি معنعن সেটি গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে মধ্যপন্থি সিদ্ধান্ত যেটি হযরত শাহ সাহেব (র.) গ্রহণ করেছেন, সেটি হলো তাঁর স্মরণশক্তিতে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আদালতের প্রতি লক্ষ্য করলে তিনি নির্ভরযোগ্য। অতএব, তিনি হাসানের রাবিদের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য তিনি তাদলিসে অভ্যস্ত। কাজেই তার عنعن সংশয়যুক্ত। হযরত জাবের (রা.)-এর এই বর্ণনাটি যদিও তিরমিযী ইত্যাদিতে عنعنه -এর পদ্ধতিতে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত, কিন্তু দারাকুতনি : ১/৮৫তে এই বর্ণনাটি বর্ণিত হয়েছে حدثنا শব্দে। এ কারণেই এই হাদিসটিকে ইমাম তিরমিযী (র.) হাসান সাব্যস্ত করেছেন। 'ফাতহুল কাদিরে' আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) ইমাম তিরমিযী (র.)-এর 'ইলালে কাবির' থেকে বর্ণনা করেছেন, سألت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال صحيح অর্থাৎ, আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল তথা ইমাম বোখারিকে এই হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে তিনি সহিহ বলে মন্তব্য করেছিলেন। 'তালখিসুল হাবিরে' হাফেজ ইবনে হাজার (র.) সবিস্তারে এ হাদিসটি তাখরিজ (সূত্র ও বরাতসহ উল্লেখ) করেছেন এবং এটাকে প্রামাণ্য বলেছেন।[১]

সুতরাং সনদগত দিক দিয়ে লক্ষ্য করলেও এ হাদিসটিকে সম্পূর্ণ রদ করা ঠিক নয়। কিন্তু তারপরও রাবিদের সম্পর্কে সমালোচনার ভিত্তিতে সনদের ব্যাপারে এক ধরনের দুর্বলতা অবশ্যই সৃষ্টি হয়ে গেছে। আর রহিতকারি বিষয়ের জন্য জরুরি হলো, শক্তির বিচারে রহিতের সমান বা তার চেয়ে অগ্রগামী হওয়া। হযরত আবু আইয়ুব আনসারি (রা.)-এর হাদিস এর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। অতএব, এ হাদিসটি আবু আইয়ুব আনসারির হাদিসকে রহিত করতে পারে না। তাছাড়া এখানেও সেসব সম্ভাবনা বিদ্যমান, যেগুলো বর্ণনা করা হয়েছে ইবনে উমর (রা.)-এর হাদিসে।

বাকি আছে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর হাদিস। এর জবাব দেওয়া হয়েছে যে, এর সনদ ও মূলপাঠ সম্পর্কে কালাম রয়েছে। হাফেজ জাহাবি (র.) এটাকে মুনকার সাব্যস্ত করেছেন সনদগতভাবে। যার কয়েকটি কারণ রয়েছে,

১. এক বর্ণনায় সনদ বর্ণিত হয়েছে, খালেদ আল-হাজ্জা-ইরাক ইবনে মালেক–আয়েশা (রা.)।

২. দ্বিতীয় সনদ এমন, খালেদ আল-হাজ্জা-জনৈক ব্যক্তি ইরাক-আয়েশা।

৩. তৃতীয় সনদ নিম্নেযুক্ত, খালেদ আল-হাজ্জা-খালেদ ইবনে আবুস সাল্‌ত-ইরাক-আয়েশা (রা.)।

৪. খালেদ ইবনে আবুস সালতকে ইবনে হাজম (র.) মাজহুল সাব্যস্ত করেছেন।

৫. হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) থেকে ইরাক ইবনে মালেক এর শ্রবণ প্রমাণিত নয়; ইমাম বোখারি (র.) এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন।

তবে বাস্তবতা ভালোরূপ, এই তিনটি প্রশ্ন সঠিক নয়। এখানে যে ইজতেরাবের বিষয়টি রয়েছে মুহাদ্দিসিনে কেরাম তা দূর করেছেন। ওপরযুক্ত তিনটি সূত্রের সর্বশেষ সূত্রটিকে বিশুদ্ধ, অবশিষ্টগুলোকে ভুল সাব্যস্ত করেছেন। রইলো খালেদ ইবনে আবুস্ সালতের ব্যাপারটি। তো অনেক মুহাদ্দিস ইবনে হাজম (র.)-এর এ ধারণা খণ্ডন করেছেন যে, তিনি অজ্ঞাত। ইবনে হাজম (র.) সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে, তিনি রাবিদের ক্ষেত্রেও অজ্ঞাত হওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে খুবই ত্বরাপ্রিয়। এমনকি তিনি ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজাহকেও অজ্ঞাত সাব্যস্ত করেছেন। অতএব, তাঁর অজ্ঞাত সাব্যস্ত করার বিষয়টি ধর্তব্য নয়। অবশিষ্ট রইলো তৃতীয় প্রশ্ন। যদিও ইমাম

টীকা- ১. হাফেজ (র.) তালখিসে বলেছেন, এ হাদিসটি ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনুল জারূদ, ইবনে খুজায়মা, ইবনে হাব্বান ও হাকেম বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাব্বান ويستدبرها শব্দ সংযুক্ত করেছেন। ইমাম বোখারি (র.) এটাকে সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন তিরমিযী (র.)-এর উদ্ধৃতি মুতাবেক। ইমাম তিরমিযী (র.) এটাকে হাসান বলেছেন এবং ইমাম বাজ্জারও এটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন। এমনিভাবে ইবনুস সাকানও এটাকে সহিহ বলেছেন। –আত্ তা'লিকুল মুগনি ১/৫৭।

বোখারি (র.) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, ইরাকের শ্রবণ আয়েশা (রা.) থেকে প্রমাণিত নয়। কিন্তু এ বিষয়টিও সঠিক নয়। কারণ, ইরাক ইবনে মালেক হজরত আয়েশা (রা.)-এর সমকালীন। ইমাম বোখারি (র.) তাঁর অশ্রবণের কথা স্বীয় মূলনীতি মুতাবেক বলেছেন। কিন্তু ইমাম মুসলিম (র.)-এর মূলনীতি অনুসারে হজরত আয়েশা (রা.) সহিহ মুসলিমে এই সূত্রে একাধিক হাদিস উল্লেখ করেছেন। অতএব, এসব প্রশ্ন সঠিক নয়। অবশ্য খালেদ ইবনে আবুস সালত ইরাক থেকে শুনেনি।

হাদিসটিকে অনেক মুহাদ্দিসও হযরত আয়েশা (রা.)-এর ওপর মওকুফ সাব্যস্ত করেছেন। তাই ইবনে আবু হাতেম-জা'ফর ইবনে রবি'আ-ইরাক-আয়েশা (রা.) সূত্রে এ হাদিসটি মওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন। আর এ বিষয়টি সিদ্ধান্তকৃত যে, ইরাকের শিষ্যদের মাঝে জা'ফর ইবনে রবি'আ সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। অতএব, তাঁর বর্ণনাটির প্রাধান্য হবে।

মোটকথা, এ বর্ণনাটি হয়তো মুনকাতে' অথবা মওকুফ। প্রকাশ থাকে যে, উভয় অবস্থাতেই এই বর্ণনাটি হযরত আবু আইয়ুব (রা.)-এর মুত্তাসিল, সহিহ কখনো মারফু বর্ণনার মুকাবেলা করতে পারে না।

০ আর যদি মতন বা মূল পাঠের দিকে লক্ষ্য করা হয়, তাহলে এর পূর্বাপর স্পষ্ট বলে দিচ্ছে যে, এ হাদিসটি হযরত আবু আইয়ুব (রা.)-এর হাদিসের আগের। কারণ, এ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যখন আলোচিত হলো যে, সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের লজ্জাস্থানকে কেবলার দিকে ফেরানো মাকরূহ মনে করেন, তখন প্রিয়নবী ﷺ এর ওপর বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। যদি নিষেধাজ্ঞার হুকুম প্রথমেই এসে থাকতো তাহলে বিস্ময় প্রকাশের কোনো বিষয় হতো না। অতএব, এ হাদিসটি মনসুখ তো হতে পারে, কিন্তু নাসেখ হতে পারে না।

০ অনেকে হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদিসের এ জবাব দিয়েছেন যে, এ হাদিসে মল-মূত্র ত্যাগের সময়ের কোনো আলোচনা নেই; বরং রয়েছে সাধারণ মজলিসের বিবরণ এবং استقبلوا بمقعدتى القبلة তে مقعدة দ্বারা উদ্দেশ্য ছিলো রাসূল ﷺ-এর সাধারণ বৈঠকের আসন, মল-মূত্র ত্যাগের স্থান নয়। এর ব্যাখ্যা এই যে, হযরত আবু আইয়ুব আনসারি (রা)-এর হাদিসের পর সাহাবায়ে কেরাম স্বীয় সাধারণ মজলিসগুলোতেও কেবলার দিকে মুখ এবং পিঠ করা থেকে পরহেজ করেন। এই বাড়াবাড়ি থেকে বাঁচানোর উদ্দেশে তিনি স্বীয় সাধারণ মজলিসের রুখ কেবলার দিকে করার নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে সাহাবায়ে কেরাম জেনে যান যে, কেবলার দিকে মুখ অথবা পিঠ করার নিষেধাজ্ঞা শুধু মল-মূত্র ত্যাগ করার সাথে বিশেষিত, সাধারণ মজলিসের এ হুকুম নয়। কিন্তু এ জবাবটি এজন্য ঠিক নয় যে, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বার একটি বর্ণনায় এই হাদিসে স্পষ্টভাবে শৌচাগারের রুখ পরিবর্তনের আলোচনা রয়েছে। যদিও এ বর্ণনা কিয়াসি ব্যাখ্যাগুলো অপেক্ষা অগ্রগামী (প্রধান) থাকবে। তাছাড়া দারাকুতনি ঃ ১/৫৯, কিতাবুত্ তাহারাত, বাবু ইস্তেকবালিল কেবলাতি ফিল খালা এর এই বর্ণনা দ্বারাও এই জবাবে ওপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, যেটি ইমাম দারাকুতনি (র.) ইয়াহইয়া ইবনে মাতার সূত্রে উল্লেখ করেছেন এবং তাতে পেশাব-পায়খানার স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। এর শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত,

سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم يكرهون يستقبلوا القبلة بغائط او بول ـ

'এমন এক সম্প্রদায়ের কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ শুনলেন, যারা পায়খানা-প্রসাবকালে কেবলামুখী হতে অপছন্দ করে।'

সুতরাং, এ হাদিসের প্রথম জবাবটিই ঠিক।

০ হযরত মা'কিল ইবনে আবু মা'কিলের সে বর্ণনাটির জবাবে জমহুরের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কেবলাতাইন দ্বারা উদ্দেশ্য বদল হিসেবে উভয় কেবলা, একত্রিত আকারে নয়। অর্থাৎ, উভয়টির দিকে মুখ করা ও পিঠ করা একই সময়ে নাজায়েজ হয়নি কখনো। যখন বায়তুল মুকাদ্দাস কেবলা ছিলো তখন তার প্রতি মুখ ও পিঠ করার নিষিদ্ধতা ছিলো। যখন কাবা শরিফ কেবলা হলো, তখন তার দিকে মুখ করা নিষিদ্ধ হয়। এটাকে বর্ণনাকারি কেবলাতাইন শব্দ ব্যাখ্যা করেছেন। এর প্রমাণ হলো, কেবলাতাইন শব্দটি দ্বিবচন এবং একই সময়ে দুটি কেবলা কখনো ছিলো না। অতএব, অবশ্যই এখানে কেবলাতাইন দ্বারা একটির স্থলে অপরটির কেবলা হওয়া উদ্দেশ্য হবে।

০ দ্বিতীয় জবাব হলো, এ হাদিসটি বিশেষভাবে প্রয়োজন ছিলো মদিনাবাসীদের জন্য। কারণ, সেখানে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে পিঠ করলে অবশ্যম্ভাবীরূপে কা'বার দিকে মুখ করা এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে চেহারা ফেরালে কা'বা শরিফের দিকে পিঠ করা সাব্যস্ত হয়। কারণ, সেখানে কা'বা শরিফ দক্ষিণ দিকে অবস্থিত, আর বায়তুল মুকাদ্দাস জবাব দিকে। অতএব, যদি মদিনা শরিফেও বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করা ও পিঠ করার অনুমতি দেওয়া হতো তাহলে কা'বা শরিফের দিকে মুখ ও পিঠ করা আবশ্যক হতো। অতএব, যেখানে এমন সুরত হবে না, সেখানে শুধু কা'বা শরিফের দিকে মুখ এবং পিঠ করা মাকরূহ হবে। কারণ এটাই, নিষিদ্ধতার আসল উদ্দেশ্য। মোটকথা, হযরত আবু আইয়ুব আনসারি (রা.)-এর ওপরযুক্ত বর্ণনা সমস্ত বর্ণনার তুলনায় অনেক বেশি বিশুদ্ধ, স্পষ্ট ও এর কারণ বিদিত। এর মুকাবিলায় বিরোধী বর্ণনাগুলো এর তুলনায় সনদগতভাবে নিম্নস্তরের এবং সেগুলোতে তা'বিলের সম্ভাবনাযুক্ত।

بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِىْ ذٰلِكَ (صـ ٨)

অনুচ্ছেদ- ৭ : এ ব্যাপারে অনুমতি প্রসঙ্গে (মতন ৮)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُّقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا ـ

৯. **অর্থ :** হজরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রস্রাবকালে কেবলামুখী হতে নিষেধ করেছেন। তারপর আমি তাঁকে তাঁর মৃত্যুর এক বছর পূর্বে কেবলামুখী হতে দেখেছি। (সনদ শক্তিশালী)

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এই অনুচ্ছেদে আবু কাতাদা, আয়েশা ও আম্মার (রা.) থেকে হাদিস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে জাবের (রা.)-এর হাদিসটি حسن غريب।

وَ قَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ (رض) عَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ : (أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَبُوْلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ) ـ

১০. **অর্থ :** 'ইবনে লাহি'আহ এ হাদিসটি আবু জুবাইর, জাবের-আবু কাতাদা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কেবলামুখী হয়ে প্রস্রাব করতে দেখেছেন।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এ হাদিসটি আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন কুতায়বা। তিনি বলেন, এ হাদিসটি আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন ইবনে লাহি'আহ। পক্ষান্তরে নবী করিম ﷺ থেকে জাবের (রা.)-এর হাদিসটি ইবনে লাহি'আর হাদিস অপেক্ষা বিশুদ্ধতম। মুহাদ্দিসিনের নিকট ইবনে লাহি'আহ জয়িফ। ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ আল-কাত্তান প্রমুখ তাকে জয়িফ বলেছেন।'

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ رَقِيْتُ يَوْمًا عَلٰى بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَلٰى حَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ ـ

১১. **অর্থ :** 'হজরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, আমি একদিন হাফসা (রা.)-এর ঘরের ওপর আরোহণ করলাম, আমি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম কা'বার দিকে পিঠ দিয়ে শামের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাজত পূরণ করেছেন। এ হাদিসটি حسن صحيح।'

দরসে তিরমিযী

ابن لهيعة ضعيف عند اهل الحديث : তাঁর পূর্ণ নাম আবু আব্দুর রহমান ইবনে লাহি'আহ আল-হাজরামি আল-গাফিকি আল-মিসরি। ১৭৪ হিজরিতে তাঁর ওফাত হয়। তিনি সেসব রাবির অন্তর্ভুক্ত যারা দুর্বলতার কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। বোখারি এবং নাসায়ি ছাড়া সিহাহ সিত্তার অন্যান্য কিতাবে তাঁর বর্ণনা রয়েছে।

'ওয়াফায়াতুল আ'য়ান' : ১/২৪৯-২৫০-তে আল্লামা ইবনে খাল্লিকান (র.) লিখেছেন যে, তিনি মিসরের বিচারপতি ছিলেন। ইনিই হলো সর্বপ্রথম কাজি যাকে খলিফা মানসুর মিসরে নিয়োগ দান করেছিলেন। এর পূর্বে বিচারপতি নিয়োগ করতেন শহরের গভর্নরগণ। তিনি সর্বপ্রথম বিচারপতি যিনি রমজানের চাঁদ দেখার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন।

মুহাদ্দিসিনের রায় তাঁর সম্পর্কে বিচিত্রধর্মী। আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব (র.) তাকে সাধারণভাবে নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করেন। ইমাম আহমদ (র.)-এরও একটি বক্তব্যে তাঁর সম্পর্কে ব্যাপক নির্ভরযোগ্যতা বর্ণিত আছে। কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাঁকে জয়িফ সাব্যস্ত করেন। ইয়াহইয়া ইবনে মাইন, ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ আল-কাত্তান, আবু জুরআ, ইমাম নাসায়ি (র.) ব্যাপক আকারে তাঁকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন।

০ সমালোচকরা তাঁর দুর্বলতার বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ একটি কারণ হচ্ছে ১৭০ হিজরিতে তাঁর বাড়িতে আগুন লেগেছিলো। ফলে তার সমস্ত কিতাব জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। এর পরে তিনি স্মরণশক্তি থেকে হাদিস বর্ণনা করতে আরম্ভ করেন। তাতে ভুল হয় অনেক ধরনের।

০ তবে 'মিজানুল ই'তিদালে' হাফেজ জাহাবি (র.) উসমান ইবনে সালেহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর সমস্ত কিতাব জ্বলে যায়নি; বরং একটি অংশ পুড়ে গিয়েছিলো। আর তাঁর দুর্বলতার আসল কারণ হলো, একবার তিনি গাধার ওপর থেকে পড়ে গিয়েছিলেন, ফলে আঘাত লেগেছিলো। তাঁর স্মরণশক্তি জয়িফ হয়ে গিয়েছিলো এ আহত হওয়ার পরে।

০ 'তাহজিবুত্ তাহজিবে' হাফেজ ইবনে হাজার (র.) এবং 'ওয়াফায়াতুল আ'য়ানে' ইবনে খাল্লিকান তাঁর দুর্বলতার একটি কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, লোকজন তাঁর নিকটে এসে এমন বহু হাদিস বর্ণনা করতো, যা তিনি বর্ণনা করেননি। তিনি সেসব বর্ণনার ব্যাপারে নীরব থাকতেন। বর্ণনাকারিরা তাঁর নীরবতাকে অনুমতি মনে করে তাঁর সনদে সেসব হাদিস বর্ণনা করতেন এবং তিনি এর কোনো প্রতিবাদ করেননি। যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, তখন তিনি জবাব দিলেন- ما ذنبی؛ انما يجيئونی بكتاب يقرئونه علی ويقومون ولو سألونی لاخبرتهم أنه ليس من حديثی "আমার কি অপরাধ! আমার কাছে তারা কিতাব নিয়ে আসে, আমার সামনে সে কিতাব পাঠ করে এবং চলে যায় এখান থেকে। তারা যদি আমাকে জিজ্ঞেস করতো, তবে আমি তাদের বলতাম, এটা আমার হাদিস নয়।"

০ চতুর্থ কারণ, ইমাম আহমদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আমর ইবনে শু'আদিবের অনেক হাদিস শুনেছিলেন মুসান্না ইবনে সাব্বাহ সূত্রে। পরবর্তীতে এসব হাদিস মুসান্নার সূত্র ছাড়া সরাসরি বর্ণনা করতে আরম্ভ করেন। তাছাড়া ইবনে হাব্বান (র.) বলেছেন- كان صالحا لكنه يدلس عن الضعفاء "তিনি নেক্‌কার ছিলেন, তবে তাদলিস করতেন জয়িফদের থেকেও।"

হাদিসের ইমামগণের মধ্য থেকে ইমাম ফাল্লাস এবং ইবনে হাব্বানের মত হলো, তাঁর যেসব হাদিস তাঁর ঘর পুড়ে যাওয়ার আগে লোকজন অর্জন করেছে সেগুলো গ্রহণযোগ্য। তাই আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ আল-মুকরি, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা আল-কা'নাবি, আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব (র.) তাঁর থেকে যেসব বর্ণনা গ্রহণ করেছেন সেগুলো ছিলো প্রাথমিক যুগের। অতএব, সেগুলোও গ্রহণযোগ্য। আর যারা তাঁর নিকট থেকে ঘর পুড়ে যাওয়ার পর হাদিস গ্রহণ করেছেন সেগুলো সহিহ নয়। এজন্য মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (র.) ও তাঁর

সম্পর্কে বলেছেন, انه كان ضعيفا ومن سمع منه فى أول امره أقرب حالا ممن سمع منه فى اخره অর্থাৎ, তিনি ছিলেন জয়িফ। যারা প্রথম দিকে তাঁর কাছ থেকে হাদিস শুনেছেন, তাদের সেসব হাদিসের অবস্থা ভালো তাদের তুলনায় যারা শেষে শ্রবণ করেছেন।

সুতরাং তাঁর সম্পর্কে সমস্ত মতামত দেখার পর সারনির্যাস বোঝা যায় যে, তাঁর আদালত সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর স্মরণশক্তি অবশ্য সমালোচিত। ইবনে মাইন, ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ আল-কাত্তান এবং আবু জুর'আর মতে তার স্মরণশক্তি কোনো কালেই নির্ভরযোগ্য ছিলো না এবং অন্যরা তাঁর প্রাথমিক যুগের হাদিসগুলোকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন ও সামগ্রিকভাবে যে বর্ণনায় তিনি একা সেটাকে জয়িফ মনে করা হয়েছে।

'মিজানুল ই'তিদালে' হাফেজ জাহাবি (র.) লিখেছেন, আমি ইবনে লাহি'আর সমস্ত বর্ণনা গণনা করেছি। দেখলাম তাঁর শেষকালের বর্ণনাগুলোতে স্মরণশক্তির কমজোরি রয়েছে। ফলে বর্ণনাগুলোতে গড়বড় বেশি হয়েছে। প্রথম জামানার বর্ণনাগুলোতে স্মরণশক্তির সমস্যা বেশি মনে হয়নি; কিন্তু তাদলিসের রোগ সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। সেটা এভাবে যে, তিনি কিছু বর্ণনা জয়িফদের নিকট থেকে শুনেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি এসব জয়িফ সূত্রগুলো উহ্য করে দিয়েছেন। আর যেসব লোককে নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন তাদের দিকে সম্বোধন করে দিয়েছেন সেসব বর্ণনা।

আল্লামা হাফেজ জাহাবি (র.)-এর এই বক্তব্যের সারনির্যাস হলো, ইবনে লাহি'আহ ব্যাপক আকারে অগ্রহণযোগ্য এবং তাঁর প্রাথমিক ও শেষকালের স্মরণশক্তির কমজোরির দিকে লক্ষ্য করলে কোনো পার্থক্য নেই; বরং প্রাথমিক যুগের বর্ণনাগুলো বেশি আশঙ্কাজনক।

'তাহজিবুত্ তাহজিবে' হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম মুসলিম (র.) তাঁর একটি হাদিস আমর ইবনুল হারেসের সাথে মিলিয়ে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বোখারি (র.) ও আবওয়াবুল ফিতান ও আবওয়াবুল ই'তিসামে ও সূরা নিসা, সূরা তালাকের তাফসিরের আওতায় এবং অন্যান্য স্থানে তাঁর বর্ণনাগুলো উল্লেখ করেছেন হায়ওয়াহ-এর সাথে মিলিয়ে। কিন্তু তাঁর নাম উল্লেখ করেননি; বরং বলেছেন, عن حيوة وذكر اخر، عن حيوة ورجل اخر ইমাম নাসায়ি (র.)-ও এই পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন। অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, اخر দ্বারা উদ্দেশ্য ইবনে লাহি'আই। এ পদ্ধতি দ্বারা বোঝা যায় যে, ইবনে লাহিআহ যদিও জয়িফ তা সত্ত্বেও তার হাদিসগুলোকে পেশ করা যায় শাহেদ তথা সাক্ষী-সহযোগী হিসেবে।

بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْبَوْلِ قَائِمًا (صـ ٩)

অনুচ্ছেদ- ৮ : দাঁড়িয়ে পেশাব করা নিষেধ প্রসঙ্গে (মতন ১০)

حَدَّثَنَا عَائِشَةُ (رضـ) قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُوْلُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوْهُ مَا كَانَ يَبُوْلُ اِلَّا قَاعِدًا ـ

১২. অর্থ : হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে তোমাদের কাছে বর্ণনা করবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে প্রসাব করতেন, তোমরা তার কথা বিশ্বাস করবে না। তিনি প্রস্রাব করতেন কেবল বসেই।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এ অনুচ্ছেদে উমর ও বুরায়দা (রা.) থেকে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে সর্বোত্তম ও বিশুদ্ধতম আয়েশা (রা.)-এর হাদিসটি। উমর (রা.)-এর হাদিসটি বর্ণিত কেবল আব্দুল কারিম ইবনে আবুল মুখারিক-নাফে'-ইবনে উমর-উমর (রা.) থেকে। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে দেখে বললেন, উমর দাঁড়িয়ে প্রস্রাব

করো না। এরপর আমি আর দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করিনি। এ হাদিসটিকে শুধু আব্দুল কারিম ইবনে আবুল মুখারিক মারফুরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি মুহাদ্দিসিনের মতে জয়িফ। আইয়ুব সাখতিয়ানি তাঁকে জয়িফ বলেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে কথা তুলেছেন। উবায়দুল্লাহ নাফে' থেকে ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, উমর (রা.) বলেছেন, যখন থেকে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি তখন থেকে আমি দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করিনি। এ হাদিসটি আব্দুল কারিমের হাদিস অপেক্ষা আসাহ। এ প্রসঙ্গে বুরায়দার হাদিসটি অসংরক্ষিত। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার নিষেধাজ্ঞা শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, হারামের ক্ষেত্রে নয়। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা শিষ্টাচার বিরোধী।

দরসে তিরমিযী

بـه قـال حدثـنـا عـلـى بـن حـجـر : আলি ইবনে হুজর হিজরি তৃতীয় শতাব্দির প্রখ্যাত মুহাদ্দিস। বোখারি, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ির উস্তাদ। সর্বসম্মতিক্রমে ثقة।

قال اخبرنا شريخ : কাজি শরিফ ইবনে আব্দুল্লাহ। তাঁর আদালত সম্পর্কে কোনো অভিযোগ নেই। কিন্তু কুফার বিচারপতি হওয়ার পর তাঁর স্মরণশক্তিতে পরিবর্তন এসে গিয়েছিলো। এজন্য তাঁকে সাব্যস্ত করা হয়েছে জয়িফ হিসেবে।

عن المقدام بن شريح : তিনি সর্বসম্মতিক্রমে ثقة।

عن ابيه : দ্বারা উদ্দেশ্য শুরাইহ ইবনে হানি। তিনি জাহেলি ও ইসলাম উভয় যুগ লাভ করেছেন। ফলে তিনি মুখাজরামি। তিনি নির্ভরযোগ্য রাবি।

ما كان يبول الا قاعدا : হযরত আয়েশা (রা.)-এর এ বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, প্রিয়নবী ﷺ কখনো দাঁড়িয়ে পেশাব করেননি। কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়ে উল্লেখিত হযরত হুজায়ফা (রা.)-এর হাদিসে তাঁর দাঁড়িয়ে প্রস্রাবের কথা রয়েছে। তা সত্ত্বেও উভয় হাদিসে কোনো বৈপরীত্ব নেই। কেনোনা, হযরত আয়েশা (রা.) সাধারণ অভ্যাসের বিবরণ দিয়েছেন। আর হযরত হুজায়ফা (রা.) একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে পারে এ ঘটনা সম্পর্কে।

بول قائما : দাঁড়িয়ে পেশাব সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের সামান্য মতবিরোধ রয়েছে। (১) হযরত সায়িদ ইবনে মুসাইয়িব, উরওয়া ইবনে জুবাইর এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল প্রমুখ ব্যাপক আকারে এটাকে জায়েজ বলেন। (২) এর পরপন্থী অনেক আহলে জাহের এর হারামের প্রবক্তা। (৩) ইমাম মালেক (র.)-এর মতে ছিটা উড়ে আসার আশঙ্কা না হওয়ার শর্তে জায়েজ, অন্যথায় মাকরূহ। (৪) জমহুরের মত হলো, ওজর ছাড়া এমন করা মাকরূহে তানজিহি। কারণ, নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত কোনো হাদিস সহিহ হাদিসে প্রমাণিত নেই। হযরত আয়েশা (রা.)-এর এ অধ্যায়ের হাদিসটি যদিও প্রামাণ্য; কিন্তু এতে প্রিয়নবী ﷺ-এর সাধারণ অভ্যাসের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, নিষেধাজ্ঞার নয়। অতএব, সর্বোচ্চ মাকরূহে তানজিহিই প্রমাণিত হবে। অবশ্য হযরত শাহ সাহেব (র.) বলেছেন, যেহেতু আমাদের জামানায় দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা অমুসলিমদের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, এজন্য এর মন্দ হওয়ার বিষয়টি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। 'তুহফাতুল আহওয়াজির' লেখক এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, আমলের অনুমতি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত– যদি অমুসলিমরা এর ওপর আমল করতে আরম্ভ করে তাহলে সেটা নিষিদ্ধ এবং না জায়েজ হয়ে যায় না। তবে এ প্রশ্ন তাঁর ভুল বোঝাবুঝির ওপর নির্ভরশীল। কারণ, এখানে শুধু আমল অবলম্বনের বিষয় নয়, বরং বৈশিষ্ট্যের ব্যাপার। মাকরূহ হওয়ার বিষয়টি এসেছে (ধর্মীয়) বৈশিষ্ট্য হওয়ার কারণে। আর যে মাকরূহে তানজিহি কাফেরদের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে যায় সেটির মন্দত্ব বেড়ে যায়। কারণ, রাসূল ﷺ বলেছেন, من تشبه بقوم فهو منهم অর্থাৎ, যে যেই জাতির সামঞ্জস্য অবলম্বন করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।

–আবু দাউদ ২/৫৫৯

حديث عائشة (رضـ) احسن شئ فى هذا الباب : এর অর্থ এ হাদিসের সনদগত জয়িফতা অন্যান্য বর্ণনার তুলনায় কম। অন্যথায় কাজি শরিফের কারণে এ হাদিসটি মুহাদ্দিসিনে কেরামের সুস্পষ্ট বিবরণ মুতাবেক জয়িফ। হাফেজ ইবনে হাজার প্রমুখের বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায়, দাঁড়িয়ে পেশাব না করা অথবা দাঁড়িয়ে পেশাব নিষিদ্ধ সংক্রান্ত যতোগুলো হাদিস এসেছে এগুলো সব জয়িফ।

عبد الكريم بن ابى المخارق وهو ضعيف : তাঁর নাম আব্দুল কারিম ইবনে আবুল মুখারিক। উপনাম আবু উমাইয়্যা। হাফেজ ইবনে আব্দুল বার (র.) লিখেছেন, মুহাদ্দিসিনে কেরাম তাঁর জয়িফতার ব্যাপারে একমত। অবশ্য কারো কারো এ ব্যাপারে প্রশ্ন হয়েছে যে, 'মুয়াত্তায়' ইমাম মালেক (র.) তাঁর হাদিস বর্ণনা করেছেন। যা থেকে বোঝা যায়, তিনি ইমাম মালেক (র.)-এর মতে নির্ভরযোগ্য। 'তাহজিবুত্ তাহজিবে' হাফেজ ইবনে হাজার (র.) লিখেছেন। মূলত আব্দুল করিম তাকওয়া-পরহেজগারি ও আদালতের দিক দিয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন; কিন্তু স্মরণশক্তির জয়িফতার কারণে হাদিসের ক্ষেত্রে জয়িফ ছিলেন। ইনি ইমাম মালেক (র.)-এর শহরের লোক ছিলেন না। তিনি থাকতেন বসরায়। ইমাম মালেক (র.) তাঁর দীনি অবস্থা শুনে এবং তার সচ্চরিত্রের কারণে তাঁর সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়েছিলেন। এজন্য তিনি তাঁর সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তা সত্ত্বেও ইমাম মালেক (র.) তাঁর থেকে আহকাম সংক্রান্ত কোনো হাদিস বর্ণনা করেননি; বরং ফাজায়িল ও তারগিব সংক্রান্ত হাদিস বর্ণনা করেছেন। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, আব্দুল করিমকে আল্লামা সুয়ুতি(র.) মুয়াত্তার রাবিদের অন্তর্ভুক্ত করেননি। অথচ ইমাম মালেক (র.) কর্তৃক তাঁর সূত্রে হাদিস বর্ণনা প্রমাণিত সুনিশ্চিতরূপে।

প্রশ্ন : وحديث بريدة غير محفوظ : আল্লামা আইনি (র.)-এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, হজরত বুরায়দা (রা.)-এর এ হাদিস 'মুসনাদে বাজ্জারে' বর্ণিত হয়েছে বিশুদ্ধ সূত্রে। এজন্য ইমাম তিরমিযী (র.) কর্তৃক এর সম্পর্কে গায়রে মাহফুজ বা অরক্ষিত বলা যথার্থ নয়।

জবাব : 'তুহফাতুল আহওয়াজি'র লেখক বলেছেন, এ বিষয়ে ইমাম তিরমিযী (র) বিশেষজ্ঞ। নিশ্চয় এতে এমন কোনো ত্রুটি রয়েছে যেটি এ হাদিস বানিয়ে দিয়েছে অরক্ষিত।

بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي ذٰلِكَ (صـ ٩)

অনুচ্ছেদ ৯ : দাঁড়িয়ে পেশাব সংক্রান্ত অনুমতি প্রসঙ্গে (মতন ১০)

عَنْ حُذَيْفَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ (وفى نسخة بيروت "النبى") اَتٰى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ عَلَيْهَا قَائِمًا فَاَتَيْتُهُ بِوَضُوْءٍ فَذَهَبْتُ لِاَتَاَخَّرَ عَنْهُ فَدَعَانِيْ حَتّٰى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ

১৩. অর্থ : হযরত হুজায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূল ﷺ এক সম্প্রদায়ের আবর্জনা ফেলার স্থানে আগমন করলেন। সেখানে এসে তিনি এর ওপর দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। আমি তাঁর কাছে ওজুর পানি আনতে গিয়ে তাঁর থেকে পেছনে সরে গেলাম। ফলে তিনি আমাকে ডাকলেন, আমি তাঁর পায়ের গোড়ালিদ্বয়ের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেলাম। তারপর তিনি ওজু করলেন ও মাসেহ করলেন চামড়ার মোজাদ্বয়ের ওপর।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, মানসুর ও উবায়দা আজ-জব্বি (র.) আবু ওয়ায়িল থেকে হুজায়ফা (রা.) সূত্রে এমনিভাবে আ'মাশের বর্ণনার মতে হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইবনে আবু সুলায়মান ও আসেম ইবনে বাহদালা আবু ওয়ায়িল থেকে মুগিরা ইবনে শো'বা (রা.) সূত্রে নবী করিম ﷺ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আবু ওয়ায়িল হতে হুজায়ফা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি আসাহ। একদল আলেম দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার অনুমতি দিয়েছেন।'

দরসে তিরমিযী

عن الاعمش : তাঁর নাম সুলায়মান ইবনে মিহরান। তিনি পঞ্চম স্তরের রাবি। অর্থাৎ, দু'একজন সাহাবিকে দেখছেন; কিন্তু তাঁদের থেকে হাদিস বর্ণনা করেননি। সর্বসম্মতিক্রমে তিনি নির্ভরযোগ্য। কিন্তু কখনও কখনও তাদলিস করেন। তাঁকে সে সব মুদাল্লিসিনের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে, যাঁদের বর্ণনা মকবুল।

عن ابى وائل : মুখাজরামিনের অন্তর্ভুক্ত। নির্ভরযোগ্য রাবি।

اتى سباطة قوم : سباطة বলা হয় এমন স্থানকে যেখানে ময়লা ফেলা হয়। এমন স্থান চয়ন করার কারণ এমন জায়গা নরম হয়ে থাকে, ছিটা উড়ে আসার আশঙ্কা হয় না। এখানে কোনো কোনো আলেম এ আলোচনা করেছেন যে, যেহেতু এই ময়লা স্থানটি কোনো লোকের মালিকানাধীন ছিলো, সেহেতু অনুমতি ছাড়া নবীজি ﷺ এটা ব্যবহার করলেন কিভাবে? কিন্তু এর জবাব স্পষ্ট। প্রথমত سباطة قوم -এর মধ্যে اضافت মালিকানা বুঝানোর জন্য নয়; বরং তাদের সাথে বিশেষিত বা اضافت হয়েছে সাধারণ সংশ্লিষ্টতার কারণে। যার প্রমাণ হলো ময়লা ফেলার স্থানগুলো সাধারণত কোনো ব্যক্তি মালিকানা হয় না; বরং জনকল্যাণমূলক হয়ে থাকে। আর যদি মেনে নেওয়া হয় এটা কারো মালিকানা ছিলো, তাহলেও ওরফি অনুমতি এমন স্থানে যথেষ্ট হয়ে থাকে। এজন্য ফুকাহায়ে কেরাম এ থেকে অনেক শাখা মাসায়িল উৎসারণ করেছেন। যেমন ক্ষেতের মধ্যে পড়ে থাকা ফল ইত্যাদিতেও সাধারণ অনুমতি যথেষ্ট।

فبال عليها قائما : এখানে ওলামায়ে কেরাম অনেক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ-এর দাঁড়িয়ে পেশাবের কারণ কি ছিলো। এর অনেক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। অনেকে বলেছেন, প্রিয়নবী ﷺ এজন্য সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন যে, সেখানে নাপাকির কারণে বসা সম্ভব ছিলো না। অনেকে বলেছেন, ডাক্তারদের মতে দাঁড়িয়ে পেশাব করা কখনো কখনো স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। আরবে বিশেষভাবে এ বিষয়টি অনেক প্রসিদ্ধ ছিলো। এ কারণে প্রিয়নবী ﷺ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছিলেন। তাছাড়া আরো অনেক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঐসব ব্যাখ্যা জয়িফ এবং যুক্তি বহির্ভূত। শুধুমাত্র দুটি ব্যাখ্যা উত্তম।

১. প্রিয়নবী ﷺ-এর হাঁটুতে ব্যথা ছিলো, যার ফলে বসা ছিলো কষ্টকর। এর সহায়তা হাকেম এবং বায়হাকির একটি বর্ণনা দ্বারা হয়। তাতে بال قائما (দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন)-এর সাথে বিদ্যমান আছে لوجع كان فى مأبضه (তাঁর হাঁটুতে ব্যথা থাকার কারণে) শব্দ। এই বর্ণনাটি যদিও সূত্রগতভাবে জয়িফ কিন্তু কিয়াসি ব্যাখ্যাগুলো অপেক্ষা সর্বাবস্থায় প্রধান।

২. প্রিয়নবী ﷺ দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন বৈধতার জন্য। কেনোনা, মাকরূহে তানজিহিও বৈধতার একটি শাখা।

ومسح على خفيه : এই বর্ণনাটি 'মুখতাসারে' ইমাম কুদুরি (র.)-ও উল্লেখ করেছেন। এর ওপর হাফেজ আলাউদ্দিন মারদিনি (র.) প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, ইমাম কুদুরি (র.) হজরত হুজায়ফা (রা.) এবং হজরত মুগিরা ইবনে শো'বা (রা.)-এর বর্ণনাগুলোতে সংমিশ্রণ করে গুলিয়ে ফেলেছেন। তিনি এ বর্ণনা হজরত মুগিরা ইবনে শো'বা (রা.)-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন এবং তাতে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব ও কপালে মাসেহ এ দুটি বিষয় আলোচনা করেছেন। অথচ হজরত মুগিরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে যে বর্ণনাটি বর্ণিত তাতে শুধু মাথার সামনের অংশে মাসেহের কথা বিদ্যমান। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার কথা নেই। যেমন সহিহ মুসলিমে[১] রয়েছে এবং হজরত হুজায়ফা (রা.)-এর বর্ণনায়[২] দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার কথা রয়েছে; কিন্তু কপালের ওপরের অংশে মাসেহের কথা নেই। যেমন ইমাম তিরমিযীর মতে এখানে রয়েছে। যেনো ইমাম কুদুরি (র.) সংমিশ্রণ ঘটিয়ে হজরত হুজায়ফা (রা.)-এর হাদিসের কিছু শব্দ এবং হজরত মুগিরা ইবনে শো'বা (রা.)-এর হাদিসের কিছু শব্দ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু 'নসবুর রায়াহ'তে হাফেজ জায়লায়ি (র.) এর জবাব দিয়েছেন যে, ইবনে মাজাহ এবং ইমাম আহমদ (র.)

টীকা– ১. ১/১৩৪, বাবুল মাসহি আলাল খুফফাইন।
টীকা– ২. মুসলিম ১/১৩৩, বাবুল মাসহি আলাল খুফফাইন।

হযরত মুগিরা ইবনে শো'বা (রা.)-এর যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, তাতে দাঁড়িয়ে পেশাব ও কপালের উপরের অংশে মাসেহ উভয়টির আলোচনা রয়েছে। সুতরাং হাফেজ মারদিনি (র.)-এর প্রশ্ন ঠিক নয়।

وحديث ابى وائل عن حذيفة اصح : এর সারমর্ম হলো, এ হাদিসটি হজরত হুজায়ফা (রা.)-এর মুসনাদাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অপেক্ষা বিশুদ্ধতম হজরত মুগিরা (রা.)-এর মুসনাদাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। প্রবল ধারণা, এর কারণ এই যে, হজরত মুগিরা (রা.)-এর হাদিসের রাবি হাম্মাদ ইবনে আবু সালমান এবং আসেম ইবনে বাহদালাহ। আর হযরত হুজায়ফা (রা.)-এর হাদিস আ'মাশ থেকে বর্ণিত। আর আ'মাশ এ দু'জনের তুলনায় অধিক নির্ভরযোগ্য। স্মরণশক্তির দিক দিয়েও তাদের চেয়ে স্বতন্ত্র। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, হজরত মুগিরা (রা.)-এর হাদিস জয়িফ। কারণ, সেটিও বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত। এজন্য ইমাম মুসলিম (র.) এটি বর্ণনা করেছেন। বাস্তব ঘটনা হলো, এ দুটি হাদিস স্বতন্ত্র। আবু ওয়ায়েল এই ঘটনা একবার হজরত হুজায়ফা (রা.) থেকে শুনেছেন, আরেকবার হজরত মুগিরা (রা.) থেকে। বরং উভয় হাদিসের ঘটনাদ্বয়ও মনে হচ্ছে আলাদা।

بَابٌ فِى الِاسْتِتَارِ عِنْدَ الْحَاجَةِ (ص-١٠)

অনুচ্ছেদ- ১০ : পেশাবের সময় পর্দা অবলম্বন করা প্রসঙ্গে (মতন ১০)

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتّٰى يَدْنُوَ مِنَ الْاَرْضِ ـ

১৪. অর্থ : হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ যখন পেশাব-পায়খানার হাজত পূরণ করার মনস্থ করতেন, তখন জমিনের নিকটবর্তী হওয়া পর্যন্ত কাপড় উঠাতেন না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আ'মাশ সূত্রে 'মুহাম্মদ ইবনে রবি'আ আনাস (রা.) থেকে এ হাদিসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ওয়াকি' এবং হিম্মানি আ'মাশ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ইবনে উমর (রা.) বলেছেন, রাসূল ﷺ যখন হাজত পূর্ণ করার ইচ্ছা করতেন, কাপড় জমিনের নিকটবর্তী হওয়া পর্যন্ত উঠাতেন না। এ দুটি হাদিসই মুরসাল। বলা হয়, আ'মাস আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে কোনো কোনো হাদিস শ্রবণ করেননি, না রাসূল ﷺ-এর অন্য কোনো সাহাবি থেকে। তিনি আনাস ইবনে মালেক (রা.)-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। তিনি বলেন, আমি তাকে নামাজ পড়তে দেখেছি। তারপর তাঁর থেকে নামাজ সংক্রান্ত একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। বস্তুত আ'মাশের নাম হলো সুলায়মান ইবনে মিহরান আবু মুহাম্মদ আল-কাহেলি। তিনি কাহেলিদের আজাদকৃত দাস। আ'মাশ বলেন, আমার পিতা হামিল (অর্থাৎ, যাকে শৈশবে অন্য শহর থেকে তুলে নিয়ে আসা হয়েছে, ইসলাম যুগে তার জন্মগ্রহণ হয়নি, তথা মুসলিম ঘরে জন্ম হয়নি।) ছিলেন। হযরত মাসরূক (র.) তাকে উত্তরাধিকারী বানিয়েছিলেন।'

দরসে তিরমিযী

عبد السلام بن حرب : তিনি কুফার অধিবাসী এবং সেকাহ।

لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض : এর উদ্দেশ্য যথাসম্ভব পর্দা করা। পর্দা করা জরুরতের স্থানসমূহ ব্যতিত প্রতিটি মুহূর্তে ফরজে আইন। এমনকি নির্জনেও। এ হাদিস থেকে ফুকাহায়ে কেরাম উৎসারণ করেছেন দু'টি মূলনীতি, (١) الضرورات تبيح المحظورات (٢) الضرورة يتقدر بقدر الضرورة তথা- ১) প্রয়োজন নিষিদ্ধ জিনিসকে বৈধ করে দেয়। ২) জরুরি জিনিস জরুরত পরিমাণে সীমিত থাকে। প্রমাণের ইল্লত সুস্পষ্ট।

وكلا الحديثين مرسل : আব্দুস সালাম এবং মুহাম্মদ ইবনে রবি'আ এ বর্ণনাটিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত বর্ণনার। ওকি' এবং হিম্মানি ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু উভয় বর্ণনায় আ'মাশ এবং সাহাবির মাঝে কোনো মাধ্যম নেই। এজন্য এ দুটি হাদিসই মুরসাল। তথা সূত্র পরম্পরায় বিচ্ছিন্ন। কারণ, কোনো সাহাবি থেকে আ'মাশের শ্রবণ প্রমাণিত নয়।

لم يسمع الاعمش من انس بن مالك : 'তুহফাতুল আহওয়াজি' গ্রন্থকার বলেছেন, আ'মাশ যেসব হাদিস প্রত্যক্ষভাবে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন সেগুলো ইয়াজিদ আর্-রুকাশি থেকে শ্রুত[১] হয়ে থাকে। যদি এই মূলনীতিটি বিশুদ্ধ হয় তবে এ হাদিসের সূত্রগত বিচ্ছিন্নতা দূর হয়।

এ দুটি হাদিস বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু দাউদ (র.) এবং আব্দুস সালামের বর্ণনাকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। এর বিপরীত ওকি'-এর বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ, এর কোনো কোনো সূত্রে রয়েছে عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر। এতে যদিও رجل তথা জনৈক ব্যক্তি অজ্ঞাত কিন্তু এমন মনে হয় যে, ইমাম আবু দাউদের মতে এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, আ'মাশ সর্বদা নির্ভরযোগ্য রাবিদের থেকে হাদিস বর্ণনা করেন। এজন্য হাদিসের বিশুদ্ধতার জন্য এ অজ্ঞতা ক্ষতিকর নয়।

هو مولى لهم : অর্থাৎ, বনু কাহেলের দিকে ইমাম আ'মাশের সম্বোধন বংশীয় কারণে নয়; বরং তাদের আজাদকৃত হওয়ার কারণে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, রাবিদের আলোচনার সময় সাধারণত নিসবতের সাথে رجل শব্দ থাকে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য কোনো কোনো জায়গায় আজাদকৃত, আর কোনো কোনো স্থানে মুসলমান হওয়া অর্থাৎ, একথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয় যে, তিনি নওমুসলিম।

كان ابى حميلا فورثه مسروق : হামেল বলা হয়, সে শিশুকে যে নিজ মায়ের সঙ্গে গ্রেফতারকৃত অবস্থায় দারুল ইসলামে আনীত হয়। ইমাম আ'মাশের পিতা মিহরান ছিলেন তেমন শিশু। এ বক্তব্যটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমার দাদীর ইন্তেকালের পর হযরত মাসরূক (র.) আমার পিতাকে তার উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করেছেন। এ কথাটি এজন্য বলার প্রয়োজন হলো যে, এ বিষয়টি ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে বিতর্কিত যে, হামিল শিশু স্বীয় মাতাপিতার ওয়ারিস হবে কি না? এ প্রসঙ্গে হানাফিদের মত হলো, যদি ইসলামি রাষ্ট্রে আসার পর এমন শিশুর মা প্রমাণের আলোকে তার বংশ তার বাপ থেকে প্রমাণ করে, তবে তাকে মহিলার আইনগত ছেলে মনে করা হবে এবং সে তার মায়ের উত্তরাধিকারী হবে। আর যদি সে প্রমাণ দ্বারা বংশ প্রমাণ করতে না পারে কিন্তু সে শুধু স্বীকার করে– সে আমার ছেলে, তাহলে তার বাপ থেকে তার বংশ প্রমাণিত হবে না। কারণ, এটাতো অন্যের প্রতি বংশ আরোপ করা হয়। অতএব, এমতাবস্থায় ছেলে ওয়ারিস হবে না। অবশ্য যদি মায়ের জবিল ফুরূজ (কোরআনে যাদের হক নির্দিষ্ট আছে) এবং আসাবার (কোরআনে যাদের হক নির্দিষ্ট নেই) মধ্য থেকে কোনো আত্মীয় বিদ্যমান না থাকে, তাহলে এই মায়ের উত্তরাধিকারী হবে স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে। এর পরিপন্থি শাফেয়ি মতাবলম্বীগণ এবং অন্যান্য কোনো কোনো মুজতাহিদ যাদের অন্তর্ভুক্ত ইমাম তিরমিযী (র.)-ও, তাঁরা এমন শিশুকে ব্যাপক আকারে ওয়ারিস সাব্যস্ত করেন। তাই এখানে ইমাম তিরমিযী (র.) হজরত মাসরূকের ফতওয়া নিজের মতের সহায়তায় পেশ করেছেন যে, তিনি হজরত আ'মাশের পিতা মিহরানকে হামিল হওয়া সত্ত্বেও তার মায়ের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করেছেন।

এর জবাব হানাফিদের পক্ষ থেকে এই যে, মিহরানের মা হয়তো দলিল পেশ করেছেন তার বংশের ওপর। তাছাড়া এটাও সম্ভব যে তিনি দলিল পেশ করেননি; কিন্তু তার মায়ের অন্য কোনো ওয়ারিস ছিলো না। এই দুই সুরতে হজরত মাসরূকের এই ফতওয়া হানাফিদের পরিপন্থি নয়। আর যদি মেনে নেওয়া হয় যে, তিনি প্রমাণ পেশ করেননি এবং অন্যান্য ওয়ারিসও বিদ্যমান ছিলো, তা সত্ত্বেও মাসরূক তার ওয়ারিস হওয়ার ফতওয়া

টীকা– ১. কিতাবুল মারাসিল– ইবনে আবু হাতেম (তুহফাতুল আহওয়াজি : ১/২৫)

দিয়েছেন, তাহলে নিঃসন্দেহে তাঁর ফতওয়া হানাফিদের পরিপন্থি হবে। এমতাবস্থায় আমাদের জবাব হলো– এটা তাঁর নিজস্ব ইজতেহাদ ও ফতওয়া, যা হানাফিদের বিরুদ্ধে প্রমাণ নয়। কারণ, হানাফিদের প্রমাণ হজরত উমর (রা.)-এর আছর দ্বারা যেটি মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি প্রমাণ ছাড়া হামিলের বংশ প্রমাণকে নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, হজরত উমর (রা.)-এর আছর হজরত মাসরূকের আছর অপেক্ষা প্রধান। স্পষ্ট বিষয় যে, মাসরূক ইবনুল আজদা' তাবেয়ি এবং আল্লামা আবু সাইদ সামআনি (র.) লিখেছেন– শৈশবে কেউ তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিলো। তাই তাঁর উপাধি হয়েছে মাসরূক।

بَابُ كَرَاهِيَةِ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِيْنِ (ص۔ ١٠)

অনুচ্ছেদ- ১১ : ডান হাত দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা মাকরূহ প্রসঙ্গে (মতন ১০)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهٰى اَنْ يَّمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ ۔

১৫. অর্থ : হযরত আবু কাতাদা সূত্রে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তিকে নবী করিম ﷺ ডান হাতে নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হযরত আয়েশা, সালমান, আবু হুরায়রা ও সাহল ইবনে হুনায়ফ (রা.) থেকেও এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। আবু কাতাদার নাম হারেস ইবনে রিবয়ি। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা ডান হাতে ইস্তেঞ্জা করা মাকরূহ মনে করেন।

দরসে তিরমিযী

محمد بن ابى عمر المكى : মশহুর মুহাদ্দিস এবং নির্ভরযোগ্য রাবি।

معمر : দ্বারা উদ্দেশ্য মা'মার ইবনে রশিদ। যিনি জামে'-এর রচয়িতা।

نهى ان يمس الرجل ذكره بيمينه : এ হাদিসটি সাব্যস্ত করে ব্যাপক আকারে ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। তবে শিরোনামে ইমাম তিরমিযী (র.)-এই মাকরূহকে ইস্তেঞ্জার সময়ের সাথে সীমিত করে দিয়েছেন। যেনো ইমাম তিরমিযীর মতে এই ব্যাপক হাদিসটি ইস্তেঞ্জার সময়ের সাথে শর্তযুক্ত। এর কারণ, এ হাদিস আরেকটি সূত্রে– যেটি আবু দাউদ কিতাবুত্ তাহারাত, বাবু কারাহিয়াতি মাস্সিজ জাকার বিল ইয়ামিন ফিল ইস্তিবরা-এর আওতায় উল্লিখিত হয়েছে যে, اذا بال احدكم فلا يمس ذكره بيمينه (তোমাদের কেউ যখন পেশাব করে তখন যেনো ডান হাতে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ না করে।) এবং ইমাম বোখারি (র.) উভয় সূত্রে এ বর্ণনাটি সহিহ বোখারিতে উল্লেখ করেছেন।

তিনি শর্তহীনভাবে এবং ইস্তেঞ্জার সময়ের সাথে শর্তায়িতভাবে উভয়টির জন্য স্বতন্ত্র অধ্যায় কায়েম করেছেন। তাঁর আচরণ দ্বারা এটাই বোঝা যায় যে, এখানে শর্তহীন হাদিসটি শর্তযুক্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হানাফিদের মতেও এ হাদিসটি শর্তযুক্ত অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেনোনা, হাদিসটি একই সূত্রে বর্ণিত। অর্থাৎ, উভয়টি ইয়াহইয়া ইবনে কাসির-আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা-আবু কাতাদা সূত্রে বর্ণিত।

টীকা- ১. الاستنجاء শব্দের অর্থ হলো, নাপাক স্থান অন্বেষণ করা। অর্থাৎ, নাপাক ময়লা দূর করা-নববি। শায়খ বিন্নৌরি (র.) বলেছেন, النجو শব্দের আসল অর্থ হলো হিংস্র প্রাণীর গোবর-বিষ্টা। যেমন, ইবনে কুতায়বা (র.) বলেছেন (ادب الكتاب فى باب فرق الأرواث) অতএব ইস্তেঞ্জা মানে হলো, নাপাক অন্বেষণ করা, তা দূর করা ও পরিষ্কার করার জন্য। এর সৌন্দর্য অস্পষ্ট নয়। মা'আরিফুস্ সুনান : ১/১১৮ (সংক্ষিপ্ত)।

আল্লামা খাত্তাবি হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি (র.) এবং অন্যান্য কোনো কোনো আলেম এখানে এই বিস্ময়কর আলোচনা করেছেন যে, এ হাদিসে নিষেধ করা হয়েছে ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করতে। অপরদিকে রয়েছে ডান হাতে ইস্তেঞ্জা করার নিষিদ্ধতা। অতএব, শুধু বাম হাতে দুটি কাজ কিভাবে হতে পারে? তারপর এর জবাব দিতে গিয়ে বিস্ময়কর পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, যেগুলোর অধিকাংশই হাস্যকর। যেমন খাত্তাবি (র.) লিখছেন যে, ঢিলা রাখবে টাখনুর ওপর আর বাম হাতে ইস্তেঞ্জা করবে। কেউ কেউ লিখেছেন, দেওয়াল ইত্যাদি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করবে, হাতে ইস্তেঞ্জা করবেই না। অনেকে বলেছেন, ডান হাতে ঢিলা নিবে এবং বাম হাতে অঙ্গের ওপর তা ঘষবে।

এগুলো মূলত অনর্থক আলোচনা। প্রথমতো ডান হাতে স্পর্শ করা ব্যতিত বাম হাতে ইস্তেঞ্জা করাতে কোনো জটিলতা নেই। দ্বিতীয়তো যদি কারো কোনো সময় প্রয়োজন হয়, এসব আদবের মধ্যে থেকে কোনো একটি আদব তরক করে অন্যটির ওপর আমল করতে পারে। যেমন, লজ্জাস্থান বাম হাতে ধরে ডান হাতে ঢিলা নিবে, তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না। বিস্ময়ের বিষয়, এতো বড় বড় আলেম এত সহজ বিষয়ে ফেঁসে গেলেন কিভাবে!

بَابُ الإِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ (صـ ١٠)

অনুচ্ছেদ- ১২ : ঢিলা দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা প্রসঙ্গে (মতন ১০)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ قِيْلَ لِسَلْمَانَ قَدْ اَجَلْ نَهَانَا اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ اَوْ اَنْ يَّسْتَنْجِيَ اَحَدُنَا بِاَقَلَّ مِنْ ثَلٰثَةِ اَحْجَارٍ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ اَوْ بِعَظْمٍ ـ

১৬. অর্থ : হজরত আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াজিদ বলেন, হযরত সালমান (রা.)কে বলা হলো, তোমাদের নবী তোমাদেরকে প্রতিটি বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন। এমনকি পেশাব-পায়খানার ধরন বা নিয়ম পর্যন্ত শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত সালমান (রা.) বলেছেন, হ্যাঁ! তিনি আমাদের পেশাব-পায়খানাকালে কেবলামুখী হতে অথবা ডান হাতে ইস্তেঞ্জা করতে অথবা তিনটির কম পাথর বা ঢিলা দিয়ে ইস্তেঞ্জা করতে অথবা শুষ্ক গোবর কিংবা হাড্ডি দিয়ে ইস্তেঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আয়েশা, খুজায়মা ইবনে সাবেত, জাবের ও খাল্লাদ ইবনুস সায়েব কর্তৃক পিতা হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, সালমান (র.)-এর হাদিসটি حسن صحيح। রাসূল ﷺ-এর সাহাবা এবং তার পরবর্তী অধিকাংশ আলেমের মতে ঢিলা দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা যথেষ্ট, পানি ব্যবহার যদিও নাই করুক না কেনো, যখন পায়খানা-পেশাবের আছর পরিষ্কার করে ফেলে। সাওরি, ইবনুল মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর উক্তি এটাই।'

দরসে তিরমিযী

حتى الخرائة : خرائه শব্দটির خاء-এর নিচে যের। 'ইসলাহু খাতায়িল মুহাদ্দিসিনে' আল্লামা খাত্তাবি (র.) লিখেছেন যে, অধিকাংশ লোক এটাতে خاء-এর ওপর যবর পড়েন। কিন্তু এটা ভুল। কারণ, خرائة -এর অর্থ হলো, নাপাক। এখানে বিশুদ্ধ হলো خاء-এর নিচে যের পড়া। যার দ্বারা বুঝায় মল-মূত্র ত্যাগের জন্য বসার অবস্থাকে।

قال سلمان أجل : أجل শব্দটি ব্যবহৃত نعم-এর অর্থে। অর্থাৎ, হ্যাঁ। আরবিতে এটাকে বলা হয় হরফে ইজাব। কোনো কোনো অভিধানবিদ উভয়ের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, نعم শব্দটি প্রশ্নবোধক শব্দের

জবাবে ব্যবহৃত হয়, আর أجل শব্দটি আসে খবরের জবাবে। হযরত সালমান (রা.)-এর উদ্দেশ্য ছিলো যে বিষয়টিকে তোমরা ভর্ৎসনার কারণ মনে করছো, সেটি মূলত রাসূল ﷺ-এর সুপ্রশংসিত সিফাত।

او ان يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة احجار : এ বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে যে, ইস্তেঞ্জার জন্য ঢিলা ব্যবহারে কোনো সংখ্যা সুন্নত কিনা? ১. ইমাম শাফেয়ি (র.), ইমাম আহমদ (র.) আবু সাওর এবং আহলে জাহেরের মতে ইস্তেঞ্জাতে পরিচ্ছন্নতা ও তিন সংখ্যা ওয়াজিব এবং বিজোড় সংখ্যা ব্যবহার করা মুস্তাহাব। ২. ইমাম আবু হানিফা এবং মালেক (র.)-এর মতে শুধু পরিষ্কার করা ওয়াজিব। তিন সংখ্যা সুন্নত এবং বিজোড় সংখ্যা মুস্তাহাব। হাদিসসমূহে তিন সংখ্যার উল্লেখ তাঁদের মতে এজন্য এসেছে যে, সাধারণত এই সংখ্যা দ্বারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা লাভ হয়। ইমাম শাফেয়ি (র.) তিন সংখ্যা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে ওপরযুক্ত অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। কারণ, এতে নিষেধ করা হয়েছে তিন থেকে কম ঢিলা ব্যবহার করতে। এর জবাব পূর্বে দেওয়া হয়েছে যে, যেহেতু সাধারণত তিন পাথর দ্বারাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা লাভ হয়, এজন্য তার চেয়ে কম সংখ্যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু যদি এর চেয়েও কম দ্বারাও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন হয়, তাহলে তা-ও বৈধ।

হানাফিদের দলিলগুলো নিম্নেযুক্ত,

১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর একটি হাদিস আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারাকুতনি, মুস্তাদরাকে হাকেম, বায়হাকি, ইবনে হাব্বান, তাবারানিতে রয়েছে,

من استجمر[১] فليوتر . من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج[২].

সুস্পষ্ট ভাষায় এতে বলা হয়েছে যে, বিজোড় সংখ্যা ব্যবহার করা মোস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। ইমাম বায়হাকি (র.)-এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, এর দ্বারা বিজোড় সংখ্যা ব্যবহার করা মোস্তাহাব প্রমাণিত হয়, তিন সংখ্যা নয়। এর জবাব হলো, বেজোড় সংখ্যা ব্যাপক আর তিন সংখ্যা খাস। আর ব্যাপককে অস্বীকার করার ফলে অবশ্যই খাসটিও অস্বীকার করা হয়। ইমাম বায়হাকি (র.)-এর দ্বিতীয় জবাব এই দিয়েছেন যে, উল্লিখিত হাদিসে বিজোড় দ্বারা উদ্দেশ্য তিনের উর্ধ্বে বিজোড়। যার প্রমাণ হলো, এই হাদিসটিরই শেষে কোনো কোনো বর্ণনায় এটুকু সংযুক্ত আছে যে, فإن الله وتر يحب الوتر اما ترى السماوات سبعا والأرضين سبعا (আল্লাহ বিজোড়, তিনি বিজোড়কে পছন্দ করেন। তুমি কি দেখো না, আসমান সাতটি, জমিন সাতটি!)-এর জবাব হলো, এ হাদিসটি 'মুস্তাদরাক' (১/১৫৮ কিতাবুত্ তাহারাত, من استجمر فليوتر (যে ঢিলা দিয়ে ইস্তেঞ্জা করবে সে যেনো বেজোড় ঢিলা ব্যবহার করে।)-এ ইমাম হাকেম (র.)-ও বর্ণনা করেছেন। এর অধীনে হাফেজ জাহাবি (র.) লিখেছেন– منكر والحارث ليس بعمدة অর্থাৎ, হাদিসটি মুনকার। হারেস নামক রাবি নির্ভরযোগ্য নন। দ্বিতীয় জবাবটি হাফেজ জামালুদ্দিন জায়লায়ি (র.) নসবুর্ রায়াহ : ১/২১৮-তে দিয়েছেন যে, যদি এ হাদিসটি দ্বারা প্রমাণ সঠিক হয় তবুও সাত আসমানের আলোচনা দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে, এর পরবর্তীতে যে বেজোড়ের কথা আলোচিত হয়েছে দ্বারা তিনোর্ধ্ব উদ্দেশ্য। কেনোনা, যদি এমন হয় তবে মানতে হবে যে, সাতটি ঢিলা ব্যবহার করা মোস্তাহাব। অথচ কেউ এর পক্ষে না।

০ হানাফিদের এই হাদিসটির ওপর তৃতীয় আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে যে, এটিকে আল্লামা ইবনে হাজম (র.) প্রমুখ জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। কেনোনা, এটি বর্ণিত হুসাইন আল-জার্রানি আল-হিময়ারি থেকে। ইনি অজ্ঞাত রাবি। হাফেজ ইবনে হাজার (র.) 'তাকরিবে' লিখেছেন– 'তিনি অজ্ঞা, ষষ্ঠ স্তরের বর্ণনাকারি।' হাফেজ জাহাবি (র.) লিখেছেন, 'তিনি পরিচিত নন, অন্তর্ভুক্ত তাবেয়িনের।'

টীকা- ১. الاستجمار -এর অর্থ হলো, ইস্তেঞ্জায় ছোট ছোট পাথর ব্যবহার করা। –ফাতহুল বারি : ১/২১১, অথবা (ছোট ছোট) পাথর অন্বেষণ করা। -মা'আরিফুস সুনান : ১/১১৮।

টীকা- ২. আবু দাউদ প্রমুখ এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। -মা'আরিফুস সুনান : ১/১১৫, বাবুল ইস্তেঞ্জা বিল হিজারাহ।

০ জবাব হলো, হাদিসটি সুনিশ্চিতরূপে প্রমাণ্য। কেনোনা, এ হাদিসটি আবু দাউদ (র.) বর্ণনা করে এর ওপর নীরবতা অবলম্বন করেছেন। ইবনে হাব্বান এটাকে সহিহ সাব্যস্ত করে সহিহ ইবনে হাব্বানে বর্ণনা করেছেন। (মাওয়ারিদুজ্জাম'আন : ৬২)। স্বয়ং হাফেজ জাহাবি (র.) 'তালখিসুল মুসতাদরাক', কিতাবুল আশরিবাতে এ হাদিসটিকে বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করেছেন। তাছাড়া 'ফাতহুল বারি' : ১/২০২-এ হাফেজ ইবনে হাজার (র.) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদিসের আওতায় ومن لا فلا حرج এই অতিরিক্ত অংশটুকুর সনদকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন। অতএব, যদি হুসাইন জাররানির অজ্ঞাত হওয়ার বিষয়টি ক্ষতিকর হয় তবে তাঁরা এ হাদিসটিকে কিভাবে বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করতে পারেন? অতএব, হয়তো হুসাইনের অজ্ঞাত হওয়ার বিষয়টি সহনীয়, নতুবা এর সহায়ক বিদ্যমান রয়েছে। মোটকথা, হাদিসটি দ্বারা প্রমাণ পেশ করা বিশুদ্ধ।

২. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ এবং দারাকুতনি ইত্যাদিতে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে,

قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار يستطيب[1] بهن فأنها تجزء عنه.

[1] لفظه لأبي داود جـ١ صـ٢، كتاب الطهارة باب الإستنجاء بالأحجار.

'তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ পায়খানায় যায় তখন যেনো সাথে করে তিনটি ঢিলা নিয়ে যায়। এগুলো দিয়ে সে ইস্তেঞ্জা (শৌচকর্ম) করবে। কারণ, তার জন্য এগুলো যথেষ্ট হয়ে যাবে।'

এ হাদিসটি বর্ণনা করার পর ইমাম দারাকুতনি (র.) লিখেছেন, হাদিসটির এ সনদ বিশুদ্ধ। এখানে فإنها تجزأ عنه বাক্যটি বলেছে যে, আসল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো পরিচ্ছন্নতা-পবিত্রতা, কোনো বিশেষ সংখ্যা মূল লক্ষ নয়। অতএব, যেখানে তিন সংখ্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে উদ্দেশ্য হলো এই সংখ্যাটি পরিষ্কার -পরিচ্ছন্নতার জন্য যথেষ্ট।

৩. মু'জামে তাবারানিতে হযরত আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) থেকে অনুরূপ অর্থের আরেকটি হাদিস বর্ণিত আছে–

اذا تغوط احدكم فليمسح بثلاثة احجار فان ذلك كافيه.

'যখন তোমাদের কেউ পায়খানা করবে তখন তিনটি ঢিলা দিয়ে মুছে ফেলবে। কারণ, তার জন্য এটা যথেষ্ট।'

মাজমাউজ্জাওয়ায়িদ : ১/২১১ কিতাবুত্ তাহারাত, বাবুল ইস্তেজমার বিল হাজার এ আল্লামা হায়সামি (র.) এই বর্ণনাটি বর্ণনা করার পর লিখছেন– এর রাবিগণ শুধুমাত্র আবু আইয়ুবের শিষ্য আবু শুআয়ব ব্যতিত সবাই নির্ভরযোগ্য। আমি আবু শু'আয়ব সম্পর্কে সদালোচনা-সমালোচনা কিছুই পাইনি।

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনাটি পরবর্তী অনুচ্ছেদে আসছে। তিনি বলেন,

خرج النبى صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمسلى ثلاثة احجار. قال فاتيته بحجرين وروثة فاخذ الحجرين، القى الروثة وقال انها ركس

'রাসূলুল্লাহ ﷺ (পায়খানার) হাজত পূরণ করার জন্য বের হয়ে আমাকে বললেন, আমার জন্য তিনটি পাথর বা ঢিলা খোঁজ করো। তিনি বললেন, তারপর আমি তাঁকে দু'টি ঢিলা আর একটি শুষ্ক গোবর টুকরা এনে দিলাম। তিনি ঢিলা দুটি গ্রহণ করলেন আর গোবর টুকরোটি ফেলে দিলেন। বললেন, এটি অপবিত্র।'

হানাফিদের মাজহাবের ওপর ইমাম তাহাবি (র.)-ও এ হাদিসটি দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। অর্থাৎ, যদি তিন সংখ্যা জরুরি হতো, তাহলে প্রিয়নবী ﷺ আরও একটি ঢিলা অবশ্যই চাইতেন।

প্রশ্ন : শাফেয়ি মতাবলম্বীগণ হানাফিদের এই প্রমাণের ওপর অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, যেমন ইমাম বায়হাকি (র.) বলেছেন, এই হাদিসটি মুসনাদে আহমদ, বায়হাকি, দারাকুতনিতে আব্দুর রাজ্জাক-মা'মার-আবু

ইসহাক- আলকামা-আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাতে فإنها ركس -এরপর রাসূল ﷺ-এর এই এরশাদটিও মওজুদ রয়েছে, ائتنى بحجر। (আমাকে একটি পাথর এনে দাও)। যা দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রিয়নবী ﷺ শুধু দুটি পাথর ব্যবহারে ক্ষান্ত থাকেননি।

জবাব : 'উমদাতুল কারি'তে আল্লামা আইনি (র.) এবং 'নসবুর রায়া'য় হাফেজ জায়লায়ি (র.)-এর জবাব দিতে গিয়ে বলেন যে, এই অতিরিক্ত অংশটুকু যে সূত্রে বর্ণিত সেটি নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ, আবু ইসহাক আলকামা থেকে শ্রবণ করেননি। হাফেজ জায়লায়ি (র.) বলেন, স্বয়ং ইমাম বায়হাকি (র.) এ স্থানে তো এই বর্ণনার ওপর কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করেননি, কিন্তু কিতাবুত্ দিয়াত, باب الدية اخماس-এ স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যে, আবু ইসহাক আলকামা থেকে কিছুই শ্রবণ করেননি এবং আবু ইসহাকের স্বীকারোক্তি দ্বারাও এ বিষয়টুকু প্রমাণিত। অতএব, এ হাদিসটি মুনকাতে' এবং এটি প্রমাণযোগ্য নয়। -নসবুর রায়াহ : ১/২১৭

০ 'ফাতহুল বারি' : ১/২০৭-এ হাফেজ ইবনে (র.) একটি জবাব এই দিয়েছেন যে, কারাবিসি (র.) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, আবু ইসহাক এই হাদিসটি আলকামা থেকে শুনেছেন। কিন্তু প্রকাশ থাকে যে, কারাবিসির বক্তব্য স্বয়ং আবু ইসহাকের বক্তব্যের মুকাবেলা করতে পারে না। অতএব, হাফেজ সাহেবের এই জবাবও বেকায়দা।

০ দ্বিতীয় জবাব দিয়েছেন, যদি শ্রবণ না হয়ে থাকে তবুও এ হাদিসটি মুরসাল হবে। আর হানাফিদের মতে মুরসাল প্রমাণ। অর্থাৎ, হানাফিগণ প্রথম তিন যুগে (সাহাবি, তাবেয়ি, তাবে-তাবেয়ির যুগে) সনদগত বিচ্ছিন্নতাকে দুর্বলতার কারণ মনে করেন না।

তবে হাফেজ ইবনে হাজার (র.)-এর মতো মহান ব্যক্তিত্বের পক্ষ থেকে এমন জবাব বিস্ময়কর মনে হয়। কারণ, হানাফিগণের নিকট মুরসাল ব্যাপক আকারে প্রমাণ নয়; বরং এর প্রমাণ হওয়ার জন্য রয়েছে কয়েকটি শর্ত।

যেমন, একটি শর্ত হলো, ইরসাল কোনো এমন ব্যক্তি থেকে হতে হবে যিনি বর্ণনা করেন নির্ভরযোগ্য রাবি থেকেই। দ্বিতীয় শর্ত হলো, সুনিশ্চিত শব্দে বর্ণনা করতে হবে। অথচ عن শব্দটি 'সুনিশ্চিত' বুঝাবার শব্দ নয়। আর এখানে عن দ্বারা বর্ণনা হয়েছে।

প্রশ্ন : কিংবা বলুন যে, মুরসালকে হানাফিগণ প্রমাণ মনে করেন সেটি মুরসাল মুনকাতে' অর্থে ব্যবহৃত নয়; বরং সুপ্রসিদ্ধ অর্থে মুরসাল। অর্থাৎ, তাবেয়ির মুরসাল। আর যদি আবু ইসহাকের শ্রবণ আলকামা থেকে না হয়ে থাকে তবে এই অতিরিক্ত অংশটুকু মুনকাতে' অর্থে মুরসাল হবে, সুপ্রসিদ্ধ অর্থে নয়। হানাফিদের মতে মুনকাতে' অর্থে মুরসাল প্রমাণযোগ্য নয়।

জবাব : উপরিউক্ত প্রশ্নের একটি মজবুত জবাব হাফেজ ইবনে হাজারের এটাও যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর এই বর্ণনার সূত্রে প্রচণ্ড ইজতেরাব বা ইখতেলাফ পাওয়া যায়। যার ব্যাখ্যা পরবর্তী অনুচ্ছেদে আসছে। এই ইজতেরাবকে দূর করার জন্য ইমাম তিরমিযী (র.) ইসরাইলের সূত্রকে প্রধান সাব্যস্ত করেছেন এবং ইমাম বোখারি (র.) জুহায়রের সূত্রকে এবং স্বয়ং 'হুদাস্ সারি মুকাদ্দামাতু ফাতহিল বারি' : ২/১০৮-এর অষ্টম পরিচ্ছেদে স্পষ্ট ভাষায় হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেছেন যে, এই হাদিসের শুধু দুটি সূত্রই বিশুদ্ধ, বাকি কোনো সূত্র বিশুদ্ধ নয়। আর যে সূত্রে ائتنى بحجر বর্ণিত হয়েছে সেটি এই দুই সূত্রের বাইরে। ফল কথা এই যে, নিজ হাফেজ ইবনে হাজার (র.)-এর স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, ائتنى بحجر যুক্ত সূত্রটি সহিহ নয়। আর যদি এই সূত্রটিকেও বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে মূল হাদিসের ইজতেরাব দূর করার কোনো পদ্ধতি নেই। সারকথা, মা'মারের যেই সূত্রে ائتنى بحجر অতিরিক্ত অংশটি বর্ণিত হয়েছে শাস্ত্রগত দৃষ্টিকোণ থেকে সেটি প্রামাণ্য নয়।

০ হাফেজ (র.)-এর ওপরযুক্ত জবাবের জবাব আল্লামা আইনি (র.) এই দিয়েছেন যে, মূলত ইনকেতা' বা বিচ্ছিন্নতা প্রমাণ দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য শাফেয়ি মতাবলম্বীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা যে, আপনার মাজহাব মতে

এটা সহিহ নয়। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, আল্লামা আইনির এই জবাব দ্বারা শাফেয়ি মতাবলম্বীদের ওপর চাপতো সৃষ্টি করা যায়; কিন্তু হানাফিদের মতে প্রমাণিত হয় না। সুতরাং, বিশুদ্ধ জবাব যেগুলো আগে আলোচিত হয়েছে।

০ হানাফিদের প্রমাণ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদিসের ওপর একটি প্রশ্ন এটাও করা হয় যে, যদি ائتنى بحجر -এর এ অতিরিক্ত শব্দ বর্ণনাগতভাবে প্রমাণিত নাও হয় তবুও এ অধ্যায়ের হাদিসটিতে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, রাসূল ﷺ গোবর ছুড়ে ফেলার পর অন্য একটি পাথর নিজে তুলে নিয়েছেন, অথবা চেয়ে নিয়েছেন ইবনে মাসউদ (র.) থেকে। কেনোনা, অনুল্লেখ অবিদ্যমানতাকে আবশ্যক করে না। আর যখন কোনো সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, তদ্বারা প্রমাণ বাতিল হয়ে যায়।

নিঃসন্দেহে এ প্রশ্নটি ওজনি। তাই অনেক হানাফি আলেম এ প্রশ্নটি স্বীকার করেছেন। হযরত 'আল-ওয়াদুশ্ শাজি'তে শায়খুল হিন্দ (র.) বলেছেন, এ হাদিস দ্বারা হানাফিদের প্রমাণ পূর্ণাঙ্গ নয়। তাছাড়া হিদায়া গ্রন্থকারও সম্ভবত এ জন্যই এই মাসআলাতে ইবনে মাসউদ (র.)-এর এই বর্ণনাটিকে প্রমাণরূপে উল্লেখ করেননি; বরং من استجمر فليوتر। হাদিস দ্বারা প্রমাণ শেষ করেছেন। অবশ্য অনেকে এই প্রশ্নের জবাব দিতে চেয়েছেন।

০ তার একটি জবাব হলো, السكوت فى معرض البيان يقوم مقام النفى। বিশদ বিবরণের ক্ষেত্রে নীরবতা 'না'-এর স্থলাভিষিক্ত। এখানে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.)-এর উদ্দেশে ইস্তেঞ্জার আদব বর্ণনা করা। অতএব, যদি প্রিয়নবী ﷺ তৃতীয় আরেকটি পাথর চাইতেন, তাহলে সেটার আলোচনা অবশ্যই করতেন। তাছাড়া হাদিসের পূর্বাপর বলছে যে, সে স্থানটি ছিলো এমন যেখানে পাথর পাওয়া যাচ্ছিলো না। তাই হজরত আব্দুল্লাহ (রা.) গোবরের একটি টুকরো তুলে নিয়েছিলেন। এমন স্থানে যদি তিনি তৃতীয় কোনো পাথর চাওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন তাহলে এর আলোচনা ইবনে মাসউদ (রা.) নিশ্চয় করতেন।

أو ان نستنجى برجيع : رجيع শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে رجوع থেকে। যার অর্থ مرجوع। অর্থাৎ, الغداء المرجوع إلى هذه الحالة। মানে সে খাদ্য যেটি এ অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। رجيع সব ধরনের জন্তুর গোবর বা বিষ্ঠাকে বলে। অনেকে গরু এবং মহিষের সাথে বিশেষিত করেছেন। তবে প্রথম বক্তব্যটি বিশুদ্ধ।

او بعظم : অন্য হাদিসে এর কারণ, জিনদের রসদ উপকরণ হওয়া সাব্যস্ত করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে একটি মূলনীতি হলো, ইস্তেঞ্জা শুধু সেসব জিনিস দ্বারা বৈধ যেটি শরয়িভাবে সম্মানিত নয়, কোনো মাখলুকের খাদ্য নয়, নাপাক নয় এবং ক্ষতিকর নয়।

أن الإستنجاء بالحجارة يجزء : ঢিলা দ্বারা ইস্তেঞ্জা যথেষ্ট না হওয়ার জন্য শর্ত হলো, নাপাক বের হওয়ার নিজ স্থান থেকে এক দিরহামের অধিক অতিক্রম না করা। অন্যথায় আবশ্যক হবে পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা।

بَابُ الاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرَيْنِ (صـ١٠)

অনুচ্ছেদ- ১৩ : দুটি ঢিলা দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা প্রসঙ্গে (মতন ১০)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَتِهِ فَقَالَ اَلْتَمِسْ لِيْ ثَلٰثَةَ اَحْجَارٍ قَالَ فَاَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ فَاَخَذَ بِحَجَرَيْنِ وَاَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ اِنَّهَا الرِّجْسُ.

১৭. অর্থ : হজরত আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ একবার তাঁর হাজত সেরে আসার জন্য বের হলো। তারপর আমাকে বললেন, তুমি আমার জন্য তিনটি ঢিলা তালাশ করো। বর্ণনাকারি বলেন, তারপর আমি তাঁর নিকট দুটি পাথর এবং গোবরের একটি শুষ্ক টুকরা নিয়ে এলাম। তিনি গ্রহণ করলেন ঢিলা দুটি। আর শুষ্ক গোবর টুকরোটি ফেলে দিলেন। বললেন, এটি অপবিত্র।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন কায়স ইবনুর রবি' আবু ইসহাক-আবু উসায়দা-আব্দুল্লাহ সূত্রে ইসরাইলের হাদিসের মতো। মা'মার ও আম্মার ইবনে রুজাইক-আবু ইসহাক-আলকামা-আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর জুহায়র বর্ণনা করেছেন আবু ইসহাক-আব্দুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ-আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ-আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে।

জাকারিয়া ইবনে আবু জাইদা বর্ণনা করেছেন আবু ইসহাক-আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াজিদ-আবদুল্লাহ (রা.) সূত্রে। এই হাদিসটিতে ইজতেরাব বা গড়মিল রয়েছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান (দারেমি) (র.)-কে আমি জিজ্ঞেস করেছি, এ প্রসঙ্গে আবু ইসহাক সূত্রে কোন বর্ণনাটি বিশুদ্ধতম? তিনি তখন এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দেননি। আমি মুহাম্মদ (ইমাম বোখারি)কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনিও কোনো সিদ্ধান্ত দেননি। যেনো তাঁর মতে জুহায়রের হাদিসটি আবু ইসহাক-আব্দুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ-আসওয়াদ-আবদুল্লাহ (র.) সূত্রে সত্যের সাথে বেশি সামঞ্জস্যশীল। এটিকে তিনি তাঁর জামে' স্থান দিয়েছেন। আমার মতে এ অনুচ্ছেদে বিশুদ্ধতম হলো, ইসরাইল ও কায়সের হাদিস আবু ইসহাক-আবু উবায়দা-আব্দুল্লাহ (রা.) সূত্রে। কেনোনা, ইসরাইল অন্যদের তুলনায় আবু ইসহাকের হাদিস অধিক মুখস্থকার ও বেশি মজবুত। আর তাঁর মুতাবে' রয়েছেন এই ব্যাপারে কায়স ইবনুর রবি'। ইনি বলেছেন, আমি আবু ইসহাক মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্নাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি আব্দুর রহমান ইবনে মাহদিকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, সুফিয়ান কর্তৃক বর্ণিত আমার যেসব হাদিস আবু ইসহাক হতে ছুটে গেছে, সেগুলো তখনই ছুটেছে যখনই আমি নির্ভর করেছি ইসরাইলের ওপর। কেনোনা, ইসরাইল হাদিস বর্ণনা করতেন পূর্ণাঙ্গরূপে।

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, আবু ইসহাকের ক্ষেত্রে জুহায়র শক্তিশালী নন। কেনোনা, শেষকালে তাঁর কাছ থেকে তিনি শুনেছেন। আমি আহমদ ইবনুল হাসানকে বলতে শুনেছি; তিনি বলেছেন, আমি আহমদ ইবনে হাম্বলকে বলতে শুনেছি– যখন তিনি জাইদা ও জুহায়র থেকে হাদিস শুনবে তখন তাদের ছাড়া অন্যদের হাদিস শোনার পরোয়া করবে না। শুধুমাত্র আবু ইসহাকের হাদিস ব্যতিত। আবু ইসহাকের নাম হলো, আমর ইবনে আবদুল্লাহ আস্ সাবিয়ি আল হামদানি। আবু উবায়দা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তাঁর বাপ থেকে শুনেননি। তাঁর নাম অজ্ঞাত।

'মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার আমর ইবনে মুর্‌রা বলেন, আমি আবু উবায়দা ইবনে আবদুল্লাহর নিকট জিজ্ঞেস করেছি, আপনি কি আবদুল্লাহ থেকে কোনো কিছু আলোচনা করেন? তিনি বলেন, না।'

দরসে তিরমিযী

عن أبى عبيدة : হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ছেলে। তাঁর নাম আমির। তাঁর পিতা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ওফাতকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো সাত বছর। বলা হয়ে থাকে, তিনি ছিলেন তাঁর পিতার উলুমের সবচেয়ে অধিক জ্ঞানী।

عن عبد الله : সাহাবিগণের শ্রেণীতে হাদিসের গ্রন্থাবলিতে যখন সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয় আবদুল্লাহ, তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় হজরত ইবনে মাসউদ (রা.)।

ركس : অনেকে এর অর্থ বলেছেন, নাপাক এবং এটাকে সাব্যস্ত করেছেন رجس এর সমার্থবোধক হিসেবে। এর সহায়তা সেসব বর্ণনা দ্বারাও হয় যেগুলোতে এ স্থলে ركس -এর পরিবর্তে رجس এসেছে। আর কেউ কেউ এটাকে رجيع এর সমার্থবোধক সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম নাসায়ি (র.)-এর অর্থ বলেছেন জিনের খাদ্য। কিন্তু অধিকাংশ আলেম এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেনোনা, অভিধানের কোথাও এ অর্থ নেই।

قال أبو عيسى : এ হাদিসের আওতায় ইমাম তিরমিযী (র.) قال أبو عيسى শব্দ উল্লেখ করেছেন তিনবার। মূলত প্রথম উক্তির দ্বারা তার উদ্দেশ্য এ হাদিসের সদনগত ইজতেরাবের ব্যাখ্যা প্রদান এবং দ্বিতীয় উক্তিতে ইজতেরাব[১] দূরীকরণার্থে ইমাম বোখারি, ইমাম দারেমি এবং নিজের রায় বর্ণনা করেছেন। আর তৃতীয় উক্তিতে খণ্ডন করেছেন ইমাম বোখারি (র.)-এর রায়।

এ হাদিসের ইজতেরাবের সারনির্যাস হলো, এতে মাদারে ইসনাদ (সূত্রের কেন্দ্র) হলো আবু ইসহাক সুরাইরি এবং এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর ছয়জন, শিষ্য।

১. ইসরাইল ইবনে ইউনুস।

২. কায়স ইবনে রবি'

৩. মা'মার।

৪. আম্মার ইবনে রুজাইক।

৫. জুহায়র।

৬. জাকারিয়া ইবনে আবু জাইদা।

এতে ইজতেরাব পাওয়া যায় দু'ভাবে,

০ প্রথম ইজতেরাব, আবু ইসহাক এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মাঝে দুটি কিংবা একটি সূত্র রয়েছে। জুহায়র দুটি সূত্র বর্ণনা করেন। অর্থাৎ, أبو اسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن ابيه عبد الله আর অন্য পাঁচজন ছাত্র উল্লেখ করেন শুধু একটি সূত্র।

০ দ্বিতীয় ইজতেরাব, এই পাঁচজনের মাঝে সূত্র নির্ধারণে। ইসরাইল ইবনে ইউনুস এবং কায়স ইবনে রবি'-এর বর্ণনায়সূত্র হলো আবু উবায়দা। মা'মার এবং আম্মারের বর্ণনায় সূত্র আলকামা। জাকারিয়া ইবনে আবু জাইদার বর্ণনায় আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াজিদ।

০ আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান তথা ইমাম দারেমি (র.)কে আমি এই ইজতেরাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এসব বর্ণনার মাঝে কোনটি বিশুদ্ধতম? তখন তিনি কোনো ফয়সালা দিতে পারেননি। তারপর ইমাম বোখারি (র.)কে জিজ্ঞেস করলাম তিনিও কোনো জবাব দেননি। কিন্তু তাঁর কর্মপদ্ধতি দ্বারা বোঝা যায়, তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন জুহায়িরের বর্ণনাকে। কারণ, তিনি জামে' বোখারিতে জুহায়রের বর্ণনাই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, আমার মতে এসব বর্ণনার মাঝে ইসরাইলের বর্ণনাই প্রধান ও বিশুদ্ধতম। কেনোনা, আবু ইসহাকের সমস্ত শিষ্যের মধ্যে ইসরাইল সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য এবং বড় হাফেজ। তাই, আব্দুর রহমান ইবনে মাহি বলেন– সুফিয়ান সাওরি আবু ইসহাক থেকে যেসব হাদিস বর্ণনা করতেন, আমি সেগুলো শুধু এ কারণে ছেড়ে দিয়েছি যে, সেসব বর্ণনা আমি অর্জন করেছি ইসরাইল সূত্রে। যেহেতু সেসব বর্ণনা তিনিই পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণনা করতেন, সেহেতু আমি তার ওপরই নির্ভর করেছি।

আর আলোচ্য হাদিসে ইসরাইলের অনুসরণ করেছেন কায়স ইবনে রবিও, যার ফলে তার বর্ণনা আরো বেশি প্রধান হয়ে যায়। অথচ ইসহাকের ব্যাপারে জুহায়র এতোটা নির্ভরযোগ্য নন। যার কারণ হলো, জুহায়র যখন আবু ইসহাকের শিষ্যত্ব অবলম্বন করেন, অর্থাৎ তার নিকট থেকে হাদিসগুলো গ্রহণ করেন তখন আবু ইসহাক জীবনের শেষ পর্যায়ে উপনীত এবং তাঁর স্মরণশক্তিতে কিছু পরিবর্তনও এসে গিয়েছিলো। এজন্য ইমাম আহমদ (র.) বলেছেন, যদি তোমরা জায়দা এবং জুহায়র থেকে কোনো হাদিস শুনে থাক তাহলে অন্যের নিকট থেকে শোনার তোয়াক্কা করবে না। অর্থাৎ, তাঁরা নির্ভরযোগ্য; কিন্তু আবু ইসহাকের হাদিস। অর্থাৎ, এঁরা দু'জন তো এমনিতে নির্ভরযোগ্য কিন্তু আবু ইসহাক সূত্রে তাদের বর্ণনা এতোটা নির্ভরযোগ্য নয়। এসব কারণে ইমাম তিরমিযী (র.)

টীকা- ১. কোনো হাদিসের যদি রাবি সনদ বা মতনে বিভিন্ন প্রকার গড়বড় করে বিবরণ দেয় তবে এটাকে বলে ইজতেরাব। যে হাদিসে এই ইজতেরাব পাওয়া যায় সেটিকে বলে মুজতারিব। সমন্বয় সাধন বা সমস্যা সমাধানের পূর্বে এ হাদিস প্রমাণরূপে ব্যবহার করা যায় না। –অনুবাদক।

এখানে জুহায়রের বিপরীতে ইসরাইলের বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং ইমাম বোখারি (র.)-এর ব্যাপারে আপত্তি করেছেন যে, তিনি জুহায়রের বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন কেন।

কিন্তু এটা ইমাম তিরমিযী (র.)-এর নিজস্ব মত। অন্যান্য মুহাক্কিক আলেম ও মুহাদ্দিসিন ইমাম তিরমিযী (র.)-এর এ মতের সমালোচনা করেছেন। তাই 'হুদাস্‌সারি মুকাদ্দমাতু ফাতহিল বারি'র অষ্টম[১] পরিচ্ছেদে হাফেজ ইবনে হাজার (র.) এবং আল্লামা আইনি (র.) 'উমদাতুল কারি' : ১/৭৩৫ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (র.)-এর মত খণ্ডন করেছেন। বিভিন্ন কারণে জুহায়রের বর্ণনাকে ইসরাইলের বর্ণনার বিপরীতে প্রধান সাব্যস্ত করেছেন। যদিও ইসরাইলের বর্ণনাকে সহিহ বলেছেন। কেনোনা, তিনি বলেছেন,

১. জুহায়রের বর্ণনা প্রধান্যের প্রথম কারণ হলো– জুহায়রের অনেক মুতাবে'[২] রয়েছে। মু'জামে তাবারানির রেওয়ায়াতে ইবরাহিম ইবনে ইউসুফ ইবনে ইসহাক ইবনে আবু ইসহাক জুহায়রের মুতাবা'আত করেছেন। যেহেতু এ বর্ণনাটি বর্ণিত স্বয়ং আবু ইসহাকের বংশধর থেকে এবং এর মুতাবা'আত অত্যন্ত শক্তিশালী। এই সূত্রেই 'মু'জামে তাবারানি'র বরাতে হাফেজ ইবনে হাজার (র.) জুহায়রের আরো একটি মুতাবে' উল্লেখ করেছেন। যেটির সূত্র হলো, يحيى بن أبى زائده عن أبيه عن أبى إسحاق । এমনভাবে মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে জুহায়রের বর্ণনার আরো এক মুতাবে' রয়েছেন লাইছ ইবনে আবু সুলাম। তিনি যদিও স্মরণশক্তিতে জয়িফ; কিন্তু মুতাবা'আত ও শাহাদাতের জন্য যথেষ্ট। তাছাড়া শরিক জুহাইরের মুতাবা'আত করেছেন এবং শরিক কায়স ইবনে রবি এর তুলনায় অধিক নির্ভরযোগ্য। অথচ ইমাম তিরমিযী (র.) ইসরাইলের বর্ণনার প্রাধান্যের একটি কারণ বর্ণনা করেছিলেন যে, কায়স ইবনে রাবি' তার মুতাবে'। তাছাড়া ইবনে হাম্মাদ হানাফি এবং তাঁর মুতাবা'আত করেছেন আবু হুরায়মও।

২. প্রাধান্যের দ্বিতীয় কারণ হলো, ইমাম বোখারি (র.) জুহায়রের যে বর্ণনাটি বর্ণনা করেছেন তার শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত,

حدثنا زهير عن أبى اسحاق قال لى أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه انه سمع عبدالله

'আবু ইসহাক থেকে জুহায়র আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এটি আবু উবায়দা উল্লেখ করেননি। কিন্তু আব্দুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবদুল্লাহ (রা.) থেকে হাদিস শুনেছেন।'

ইসরাইলের সূত্রটিকে এতে স্পষ্ট ভাষায় রদ করে দিয়েছেন। প্রবল ধারণা অনুযায়ী এর কারণ হচ্ছে, আবু ইসহাক প্রথমে এ হাদিসটি আবু উবায়দা থেকে বর্ণনা করতেন। কিন্তু এর ওপর প্রশ্ন হতো, আবু উবায়দার শ্রবণ হয়তো আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে সন্দেহজনক। পরবর্তীতে আবু ইসহাক আব্দুর রহমান ইবনে আসওয়াদের সূত্রেও এ হাদিসটি পেয়ে গেছেন, যার ওপর কোনো প্রশ্নই ছিলো না। তাই তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, এ হাদিসটি আমার নিকট শুধু আবু উবায়দা সূত্রেই নয়; বরং আব্দুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ সূত্রে বিদ্যমান। মোটকথা, আবু ইসহাকের এই সুস্পষ্ট বিবরণ থেকে প্রমাণ হলো যে, জুহায়রের সামনে হাদিস বর্ণনা করার সময় তার স্মৃতিতে উভয় সূত্র হাজির ছিলো এবং এগুলোর মধ্য থেকে তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আসওয়াদ সূত্রই গ্রহণ করেছেন। আর এর চেয়ে বড় প্রাধান্যের কোনো কারণ হতে পারে না।

৩. তৃতীয় কারণ, আবু ইসহাক সাবয়ি মুদাল্লিস। অতএব, তার عن-এর বিপরীতে প্রধান হবে تحديث-এর শব্দ। এবার ইসরাইলের সূত্রে তিনি আবু উবায়দা সূত্রে عن عن করে হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং ইউসুফ ইবনে

টীকা-১. في سياق الأحاديث التى انتقدها الدار قطنى على البخارى وهو الحديث الأول منها مخطوطة فى مكتبتنا من غير صفحة : جـ٢، صـ١٠٧-١٠٨ من المطبوعة.

টীকা. ২. এক রাবির হাদিসের অনুরূপ যদি অপর রাবির হাদিস পাওয়া যায়, তবে দ্বিতীয় রাবির হাদিসটিকে প্রথম রাবির হাদিসের মুতাবে' বলে, যদি দুটি হাদিসের মূল বর্ণনাকারি তথা সাহাবি এক হন। আর এমন করার নাম মুতাবা'আত। আর মূল রাবি এক না হলে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদিসটিকে শাহেদ বলে। আর এমন হওয়ার নাম শাহাদাত। এ দুটির ফলে হাদিসের শক্তি বাড়ে। - অনু.

আবু ইসহাকের সূত্রে যিনি জুহায়রের মুতাবে' তিনি সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন تحديث-এর। এজন্য ইমাম বোখারি (র.) জুহায়রের বর্ণনা বর্ণনা করার পর বলেন,

وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبى اسحاق قال حدثنى عبد الرحمن .

সুতরাং জুহায়রের সূত্রে তাদলিসের কোনো সন্দেহ নেই। অথচ ইসরাইলের সূত্রে এই সন্দেহ রয়েছে।

৪. প্রাধান্যের চতুর্থ কারণ হলো, 'উমদাতুল কারি'তে আল্লামা আইনি (র.) বর্ণনা করেছেন, ইসরাইলের বর্ণনাগুলোতে মতবিরোধ[১] রয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় তার হাদিস জুহায়রের হাদিসের সম্পূর্ণ অনুরূপ, আর কোনোটিতে পার্থক্য রয়েছে। অথচ জুহায়রের বর্ণনায় কোনো মতবিরোধ নেই।

৫. ইসরাইলের মাহাত্ম্য বর্ণনা করার জন্য ইমাম তিরমিযী (র.) আব্দুর রহমান ইবন মাহদির বক্তব্য পেশ করেছেন, কিন্তু 'উমদাতুল কারি'তে আল্লামা আইনি (র.) 'মু'জামে ইসমাইলি' ইত্যাদির বরাতে কোনো কোনো মুহাদ্দিসের বক্তব্য[২] উল্লেখ করেছেন। যার ফলে ইসরাইলের বিপরীতে জুহায়রের প্রাধান্য অর্জিত হয়। এসব কারণে অন্যান্য মুহাদ্দিস এবং ইমাম বোখারি (র.) জুহায়রের রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, এর ফলে ইমাম বোখারি (র.)-এর সূক্ষ্ম নজর ও অন্তর্দৃষ্টির সন্ধান পাওয়া যায়।

أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه : ইসরাইলের সূত্রকে ইমাম তিরমিযী (র.) প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীতে এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, আবু উবায়দা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে শুনেননি। সুতরাং এ বর্ণনাটি মুনকাতে'। সূত্রগত বিচ্ছিন্নতার প্রমাণ হানাফিদের এই দলিলে উত্থাপন করেন। হানাফিদের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে এর তিনটি জবাব।

০ এক জবাব তো হলো যে মুহাক্কিকিনের নিকট ইসরাইলের পরিবর্তে জুহায়রের সূত্র প্রধান। তাতে আবু উবায়দা নেই।

০ দ্বিতীয় জবাবে স্বীকার করে নিয়ে যদি ইসরাইলের সূত্র অবলম্বন করা হয় যদি তবুও ইমাম তিরমিযীর এ বক্তব্য তত্ত্বজ্ঞানীদের নিকট অগ্রহণযোগ্য যে, আবু উবায়দা তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে শুনেননি। আল্লামা আইনি (র.) 'ওমদাতুল কারি'তে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং আবু উবায়দার শ্রবণের ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র.)-এর ঝোঁকও এদিকে যে, আবু উবায়দার শ্রবণ তাঁর পিতা থেকে প্রমাণিত। কারণ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ওফাতের সময় আবু উবায়দার বয়স ছিলো সাত বছর। এই বয়স হাদিস গ্রহণের জন্য যথেষ্ট। এজন্য শুধু তাঁর কম বয়সের কারণে অশ্রবণযোগ্যতার ওপর প্রমাণ পেশ করা ঠিক নয়।

০ আর যদি স্বীকার করে নিই, আবু উবায়দা তাঁর পিতা থেকে প্রত্যক্ষভাবে শুনেননি, তা সত্ত্বেও মুহাদ্দিসিনে কেরামের এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, তিনি ইবনে মাসউদের এলেম সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন। ইমাম তাহাবি (র.)-এর বিষয়টি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন। ইমাম বায়হাকি (র.) লিখেছেন– আবু উবায়দা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের এলেম সম্পর্কে হুনায়ফ ইবনে মালিক ও তাঁর ন্যায় অন্যদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। এ কারণে উম্মত এ হাদিসটিকে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছেন। এ জবাবটি প্রধান। এর দ্বারা এটাও বোঝা যায় যে, কোনো কোনো সময় একটি হাদিস সূত্রগতভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরেও সহিহ এবং প্রামাণ্য হয়ে থাকে। যার কারণ হয় উম্মতের গ্রহণ অথবা সূত্রগত বিচ্ছিন্নতাকারি বর্ণনাকারির অনেক বেশি নির্ভরযোগ্যতা। এখানে বিদ্যমান এ দু'টি বিষয়ই।

টীকা- ১. ইখতেলাফ রয়েছে ইসরাইলের বর্ণনায়। তিনি বর্ণনা করেছেন জুহায়রের বর্ণনায়র মতো। আর আব্বাদ আল-কুতওয়ানি ও খালেদ আল-আবদ ইসরাইল থেকে বর্ণনা করেছেন আবু ইসহাক-আলকামা-আবদুল্লাহ সূত্রে। আর হুমায়দি বর্ণনা করেছেন, আবু উয়াইনা-ইসরাইল-আবু ইসহাক-আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াজিদ সূত্রে। এটা উল্লেখ করেছেন, দারাকুতনি এবং আদভি (র.) তাঁর মুসনাদে। কিন্তু জুহায়রের বর্ণনায় কোন মতবিরোধ নেই। –উমদাতুল কারি : ১/৭৩৫।

টীকা- ২. তবে তিরমিযী কর্তৃক ইসরাইলের হাদিসকে জুহায়রের হাদিসের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়টি সহিহ ইসমাইলির বিবরণের সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ, তিনি এটি ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদের হাদিস থেকে বর্ণনা করেছেন। আর ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ জুহায়র হতে আবু ইসহাক সংক্রান্ত অশ্রুত কোনো কিছু গ্রহণ করতে সম্মত নন। আজুররি (র.) বলেছেন, আমি আবু দাউদকে জুহাইর এবং ইসরাইল-আবু ইসহাক সূত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। জবাবে তিনি বলেছেন, যুহাইর ইসরাইলের অনেক ঊর্ধ্বে। –উমদাতুল কারি : ১/৭৩৫

بَابُ كَرَاهِيَةِ مَا يُسْتَنْجَى بِهِ (صـ ١١)

অনুচ্ছেদ- ১৪ : ইস্তেঞ্জা করা যেসব জিনিস দ্বারা মাকরূহ (মতন ১১)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَسْتَنْجُوْا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ فَإِنَّهُ زَادُ اِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ ـ

১৮. অর্থ : 'হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,, তোমরা শুষ্ক গোবর এবং হাড্ডি দিয়ে ইস্তেঞ্জা করো না। কেনোনা এগুলো তোমাদের ভাই জিনদের খাবার।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু হুরায়রা, সালমান জাবের ও ইবনে উমর (রা.) থেকেও এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'এ হাদিসটি ইসমাইল ইবনে ইবরাহিম প্রমুখ দাউদ ইবনে আবু হিন্দু থেকে হজরত শা'বি সূত্রে আলকামা থেকে, তিনি আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জিনের (সম্মেলন) রজনীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে ছিলেন। এ হাদিসটি রাবি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। শা'বি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন, তোমরা শুষ্ক গোবর আর হাড্ডি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করবে না। কারণ, এটি তোমাদের ভাই জিনের খাদ্য। হাফস ইবনে গিয়াসের বর্ণনা অপেক্ষা ইসমাইলের বর্ণনাটি ছিলো বিশুদ্ধতম। ওলামায়ে কেরামের মতে আমল এ হাদিসের ওপর।

জাবের (রা.) ও ইবনে উমর (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।'

দরসে তিরমিযী

حفص بن غياث : কুফার আয়িম্মায়ে হাদিসের অন্তর্ভুক্ত। সর্বসম্মতিক্রমে নির্ভরযোগ্য। অবশ্য শেষ বয়সে তাঁর স্মরণশক্তিতে পরিবর্তন এসে গিয়েছিলো।

داود بن أبى هند : প্রখ্যাত মুহাদ্দিস এবং সেকাহ; কিন্তু শেষ বয়সে স্মরণশক্তি হয়ে গিয়েছিলো জয়িফ।

فإنه زاد اخوانكم من الجن : انه শব্দের জমির তথা সর্বনামটি দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে (মাজকুরের তা'বিলে) روث এবং عظام দুটির দিকেই। অর্থাৎ, গোবর এবং হাড্ডি উভয়টি জিনের খাবার। এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা রয়েছে।

১. প্রথম আলোচনা হলো, গোবর জিনের রসদ হওয়ার কি অর্থ?

০ অনেকে বলেছেন, গোবর জিনের সারের কাজ দেয়। এভাবে এটি তাদের খাদ্যের উপকরণ হয়। কিন্তু এই জবাবটি জয়িফ। কারণ, যদি রসদ দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এতে জিনদের কোনো বিশেষত্ব নেই; বরং মানুষের জন্যও গোবর সারের কাজ দেয়।

০ অনেকে বলেছেন, গোবর সত্তাগতভাবেই জিনদের খোরাক এবং তাদের জন্য এটা থেকে নাপাকি তুলে নেওয়া হয়। তাদের জন্য গোবরকে স্বীয় আসল অবস্থায় ফিরিয়ে শষ্যে পরিণত করে দেওয়া হয়। এর সহায়তা হয় বোখারি : ১/৫৪৪ কিতাবুল মানাকিব, বাবু জিকরিল জিন... এর একটি বর্ণনা দ্বারা। তাতে বলেছেন,

فسألونى الزاد فدعوت الله لهم ان لا يمر بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما ـ

'তারপর তারা আমার নিকট খাদ্যের আবেদন করলো, ফলে তাদের জন্য আমি আল্লাহর দরবারে দোয়া করলাম, যেনো তারা যে কোনো হাড় এবং শুষ্ক গোবরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে সেটাতেই যেনো তারা খাদ্যরূপে পায়।'

০ কিন্তু অধিকাংশ আলেম এ জবাব দিয়েছেন যে, গোবর জিনের রসদ হওয়ার মানে এটা তাদের জন্তু-জানোয়ারের খাবার হয়। এ জবাবটি সহিহ মুসলিমের একটি হাদিস থেকে গৃহীত। যাতে প্রিয়নবী ﷺ জিনগুলোকে সম্বোধন করে বলেছেন,

وكل بعرة علف لدوابكم، مسلم جـ١، صـ١٨٤ كتاب الصلوة باب الجهر بالقرائت بالصبح والقرائة على الجن فى حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه .

'প্রতিটি শুষ্ক গোবর তোমাদের জন্তুগুলোর খাবার।'

২. দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় হলো, হাড় জিনের রসদ হওয়ার অর্থ কি? এর সর্বোত্তম এ তাত্ত্বিক জবাব হলো, জিনদের জন্য এই হাড্ডিগুলো মাংস বানিয়ে দেওয়া হয়। যেমন, সহিহ মুসলিম এবং জামে' তিরমিযীর বর্ণনাগুলো দ্বারা বোঝা যায়।

০ এখানে অবশ্য মুসলিম এবং তিরমিযীর বর্ণনাগুলোতে একটি বৈপরীত্য বোঝা যায়। এর তত্ত্ব বুঝে নেওয়া আবশ্যক। বৈপরীত্য হলো, সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় প্রিয়নবী ﷺ জিনগুলোকে সম্বোধন করে বলেছেন,

لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى ايديكم او فرما يكون لحما .

'আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় যেসব হাড়ের ওপর, তোমাদের হাতে পড়ে সেগুলো সবচেয়ে বেশি মাংসল হয়ে যায়।'

এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, জবাইকৃত জন্তুগুলোর হাড় জিনগুলোর জন্য মাংসল সম্পূর্ণ বানিয়ে দেওয়া হয়। এর পরিপন্থী এ বর্ণনাটি ইমাম তিরমিযী (র.) সূরা আহকাফের তাফসিরে বর্ণনা করেছেন,

كل عظم لم يذكر اسم الله عليه يقع فى ايديكم او فر ما كان لحما،

-ترمذى جـ١، صـ١٨١، ابواب التفسير .

'আল্লাহর নাম যেসব হাড়ের ওপর স্মরণ করা হয় না, সেগুলো তোমাদের হাতে পড়ে সর্বাধিক মাংসল হয়ে যায়।'

০ হজরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, এই বৈপরীত্য দূর করার জন্য সিরাতে হলবিয়ার লেখক ব্যতিত আর কেউ পদক্ষেপ নেননি। তিনি এই বৈপরীত্যের এ জবাব দিয়েছেন যে, সহিহ মুসলিমের বর্ণনাটি মুসলমান জিনগুলোর সম্পর্কে ছিলো, আর কাফের জিনগুলো সম্পর্কে ছিলো তিরমিযীর বর্ণনাটি।

০ তবে হজরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, এই জবাবটি সঠিক নয়। কেনোনা এটি বর্ণনাকারিদের ইখতেলাফের ভিত্তিতে একই হাদিসের বিভিন্ন শব্দ। অতএব, হয়তো বলা হবে মুসলিমের বর্ণনা তিরমিযীর বর্ণনার ওপর সনদগত শক্তির কারণে প্রধান। অথবা মুহাদ্দিসিনের অন্য একটি মূলনীতির ওপর আমল করা হবে, যার ফলে এমন স্থানে সামঞ্জস্য বিধানের কাজ নেওয়া হয়। সে মূলনীতিটি হলো, حفظ كل ما لم يحفظ الاخر অর্থাৎ, কখনও কখনও এমন হয়ে থাকে যে, রাসূল ﷺ দুটি কথাই বলেছেন। একজন রাবির একটি কথা স্মরণ ছিলো, তিনি তা বর্ণনা করেছেন। আর অন্য রাবির দ্বিতীয় কথাটি স্মরণ ছিলো, তিনি তা বর্ণনা করেছেন এবং বাস্তবে স্ব স্ব স্থানে দু'টি কথাই বিশুদ্ধ। এখানেও রাসূল ﷺ হয়তো বলেছিলেন যে, হাড়ের ওপর আল্লাহর নাম স্মরণ করা হোক বা না হোক, উভয় অবস্থাতে সেটি জিনদের খোরাক হয়। একজন বর্ণনাকারি প্রথম কথাটি বর্ণনা করেছেন, অন্যজন দ্বিতীয়টি। হজরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, বর্ণনাগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে উক্ত মূলনীতিটি অনেক উপকারি। কিন্তু এটাকে উসুলে হাদিসের কিতাবগুলোতে মুহাদ্দিসিন উল্লেখ করেননি। অবশ্য 'ফাতহুল বারি'র বিভিন্ন স্থানে হাফেজ ইবনে হাজার (র.) এর আলোচনা করেছেন, এটাকে কাজে লাগিয়েছেন।

৩. তৃতীয় আলোচ্য বিষয় হলো, ইস্তেঞ্জা মাকরূহ হওয়ার বিষয়টি উক্ত দুটি জিনিসের সাথে বিশেষিত কি না? এর জবাব হলো, ফুকাহায়ে কেরাম এ দুটি জিনিস সম্পর্কে নিষেধের কারণ উৎসারণ করে মাকরূহ হওয়ার

কারণটিকে অন্যান্য জিনিসের ক্ষেত্রেও ব্যাপক করে দিয়েছেন। অর্থাৎ, যেসব জিনিস সম্মানিত অথবা কারো খাদ্য কিংবা নাপাক অথবা ক্ষতিকর সেগুলো দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা জায়েজ নয়।

إنه كان مع النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الجن : হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রিয়নবী ﷺ-এর সাথে ছিলেন কি-না এ ব্যাপারে বর্ণনা বিভিন্ন রকম। ঘটনা হলো, জিনের (সম্মেলন) রজনী কয়েকবার হয়েছিলো। প্রসিদ্ধ পুস্তিকা 'আকামুল মারজান ফি আহকামিল জান'-এ আল্লামা বদরুদ্দিন শিবলি লিখেছেন যে, জিন রজনী ছয়বার সংঘটিত হয়েছিলো। কোনো কোনো রাত্রে হজরত আবদুল্লাহ (রা.) সাথে ছিলেন, কোনোটিতে ছিলেন না।

وكان رواية اسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث : এ দুটি বর্ণনার মাঝে পার্থক্য হলো, لا تستنجو بالروث বাক্যটি হাফসের বর্ণনায় মুসনাদ এবং মুত্তাসিল; কিন্তু ইসমাইলের বর্ণনায় এ বাক্যটি ইমাম শা'বির মুরসালের মর্যাদা রাখে। ইমাম তিরমিযী (র.) বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করেছেন ইসমাইলের বর্ণনাটিকে। ইমাম মুসলিম (র.)-এর আচরণেও এরই সহায়তা হয়। কারণ, তিনি এ বাক্যটি স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করেছেন قال الشعبى বলে।

بَابُ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ (ص ١١)

অনুচ্ছেদ- ১৫ : পানি দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা প্রসঙ্গে (মতন ১১)

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ مُرْنَ أَزْوَاجَكُمْ أَنْ يَّسْتَطِيْبُوْا بِالْمَاءِ فَإِنِّىْ أَسْتَحْيِيْهِمْ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ ـ

১৯. অর্থ : 'হজরত হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের স্বামীদেরকে নির্দেশ দাও পানি দিয়ে ইস্তেঞ্জা করতে। কারণ, আমি তাদের (নিকট এ কথা বলতে) লজ্জাবোধ করি। কেনোনা এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ করতেন।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

জারির ইবনে আবদুল্লাহ বাজালি, আনাস ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা ভালো মনে করেন। যদিও তাদের মতে পাথর বা ঢিলা দিয়ে ইস্তেঞ্জাও যথেষ্ট। কারণ, তারা পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা মুস্তাহাব মনে করেন। এটাকে উত্তম মনে করেন। সুফিয়ান সাওরি, ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর মাজহাব হলো এটাই।

দরসে তিরমিযী

محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب : ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম মুসলিমের উস্তাদ। صدوق তথা সত্যবাদী, মা'মুলি ধরনের রাবি। তাঁর সম্পর্কে ইমাম নাসায়ি (র.) বলেন, لا بأس به অর্থাৎ, তাঁর মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই।

قتادة : কাতাদা ইবনে দি'আমা আস্-সাদুসি। প্রসিদ্ধ তাবেয়িনের অন্তর্ভুক্ত। তাকে সমকালীন যুগে বলা হতো أحفظ الناس মানে সবচেয়ে বড় হাফেজ। অনেক সময় তিনি তাদলিসও করতেন। কিন্তু সর্বসম্মতিক্রমে সেকাহ। এ জন্য তাঁর বর্ণনাগুলো গ্রহণযোগ্য।

معاذة : মু'আজ বিনতে আবদুল্লাহ আল-আদাবিয়্যাহ আল-বসরিয়্যাহ। তাঁর উপনাম হলো 'উম্মুস্ সাহ্বা'। নির্ভরযোগ্য তাবেয়ি মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত। উঁচু পর্যায়ের আবেদা-জাহেদা ছিলেন। রাতভর তাহাজ্জুদ পড়তেন।

হাফেজ জাহাবি (র.) তাঁর বক্তব্য বর্ণনা করতেন, أعجب من عين تنام بالليل وقد علمت بطول رقادها في القبور অর্থাৎ, সে চোখের ওপর আমার আশ্চর্য হয় যেটি রাতভর ঘুমায়। অথচ সেটি কবরের দীর্ঘ নিদ্রা সম্পর্কে জানে।

مرن أزواجكن : এ থেকে বুঝা গেলো যে, না-মাহরাম পুরুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মেয়েদের জন্য উচিত, তার মাহরাম মহিলাকে মাধ্যম বানানো।

أن يستطيبوا بالماء : استطابة -এর আভিধানিক অর্থ-পবিত্রতা কামনা করা। উদ্দেশ্য, ইস্তেঞ্জা। এ হাদিস দ্বারা পানি দ্বারা প্রমাণিত হয় ইস্তেঞ্জা বৈধতা এবং সুন্নত হওয়ার বিষয়টি। তাই এ হাদিসটি পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা সুন্নত হওয়ার ক্ষেত্রে জমহুরের প্রমাণ। অতএব, এ হাদিসটি হজরত সায়িদ ইবনে মুসাইয়িব এবং কোনো কোনো আহলে জাহেরের বিরুদ্ধে প্রমাণ, যারা পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জাকে সুন্নত সাব্যস্ত করেন। অপরদিকে এর সম্পূর্ণ বিপরীত ইবনে হাবিব মালেকির বক্তব্য হলো, পাথর বা ঢিলা দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা নাজায়েজ। এ বক্তব্যটি পূর্বেযুক্ত হাদিসগুলোর আলোকে প্রত্যাখ্যাত। ইমাম চতুষ্টয় এবং অধিকাংশের মত হলো, পাথর বা ঢিলা এবং পানি উভয়টি ব্যবহার করা উত্তম। কোনো কোনো আহলে জাহের এটাকেও সুন্নতের খেলাফ সাব্যস্ত করেন। পানি এবং ঢিলা উভয়টি ব্যবহার করা সংক্রান্ত সবগুলো হাদিস তাদের মতে জয়িফ। অর্থাৎ, হয়তো স্পষ্ট কিংবা বিশুদ্ধ নয়। কিন্তু তাদের এ ধারণা সঠিক নয়। কেনোনা যদিও এ অর্থের হাদিসগুলো আলাদাভাবে জয়িফ, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এগুলো প্রমাণযোগ্য।

কেনোনা এখানে শুধু উদ্দেশ্য ফজিলত সাব্যস্ত করা। আর ফাজায়েলে আ'মালে এমন হাদিস গ্রহণ করা হয়। এজন্য এসব বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করাতে কোনো অসুবিধা নেই। বিশেষভাবে যখন অধিকাংশ উম্মত এগুলোকে গ্রহণ করে মামুল সাব্যস্ত করেছেন। তাছাড়া কোনো স্পষ্ট হাদিসে মারফু যদিও এ অধ্যায়ে নেই, কিন্তু কেনো কোনো হাদিস দ্বারা পানি এবং ঢিলা উভয়টি ব্যবহার করার বিষয় উৎসারিত হয়। যেমন, কুবাবাসীদের প্রশংসায় কোরআনে কারিমের আয়াত নাজিল হলো– فيه رجال يحبون ان يتطهروا (কুবার পার্শ্বে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা পবিত্রতাকে ভালোবাসে।) তখন প্রিয়নবী ﷺ তাঁদের বিশেষ পবিত্রতার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তারা বললেন,

قالوا لا غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجى بالماء. ١

'তারা বললেন, না, অতিরিক্ত পবিত্রতার তেমন কিছু তো নেই। তবে আমাদের কেউ যখন শৌচাগার থেকে বের হয় তখন পানি দিয়ে ইস্তেঞ্জা করতে ভালোবাসে।'

এখানে পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করার আলোচনা হয়েছে– মল-মূত্র ত্যাগ করে বেরিয়ে আসার পর। কিন্তু মল-মূত্র ত্যাগ করে বেরিয়ে এসে ঢিলা দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা ব্যতিত হবে না। সুতরাং, এই বর্ণনাটি যেটি সিহাহ সিত্তায় বর্ণিত আছে এবং সনদগত দিক দিয়ে বিশুদ্ধ, আবেদনগতভাবে বুঝায় ঢিলা এবং পানি উভয়টি ব্যবহার করার অর্থ।

কোনো কোনো ফিকহের কিতাবে কুবাবাসির এ বক্তব্য বর্ণিত আছে– إنا نتبع الحجارة بالماء এই বক্তব্যটি যদিও স্পষ্ট কিন্তু হাদিসের গ্রন্থাবলিতে পাওয়া যায় না। তাছাড়া পানি এবং ঢিলা উভয়টি ব্যবহারের অর্থ হজরত আলি (রা.)-এর বক্তব্য মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ও বায়হাকিতে বর্ণিত আছে,

إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا فإنكم تثلطون ثلطا فاتبعوا الحجارة الماء.

'তোমাদের পূর্ববর্তীগণ মলত্যাগ করতো, আর তোমরাও পাতলা পায়খানা করো। সুতরাং ঢিলা ব্যবহারের পর পানিও ব্যবহার করো।'

এই আছরটিকে 'নসবুর রায়াহ' হাফেজ জায়লায়ি (র.) উত্তম সাব্যস্ত করেছেন। অতএব, ঢিলা এবং পানি উভয়টি ব্যবহারকে বিদআত সাব্যস্ত করা সঠিক নয়। এই আছরটির অধীনে হানাফিদের মাজহাব হলো, যদি নাপাকি পায়ু পথ থেকে এক দিরহাম পরিমাণ অধিক অতিক্রম করে তবে পানি ব্যবহার করা ফরজ। আর যদি

এক দিরহাম পরিমাণ থেকে অতিক্রান্ত না হয়, তবে পানি ব্যবহার করা ওয়াজিব। আর যদি এর চেয়ে কম অতিক্রান্ত হয় তাহলে পানি ব্যবহার করা সুন্নত।

এ বিষয়টিও এখানে প্রকাশ থাকে যে, পাথর এবং পানি ব্যবহার না করার সুরতেও পানি ব্যবহার করা উত্তম। কেনোনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে পানি অধিক ক্রিয়াশীল। এজন্য আল্লামা নববি (র.) আল্লামা আইনি (র.), আল্লামা ইবনে নুজায়ম প্রমুখ এটাই লিখেছেন। অবশ্য পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করার সময় ঢিলার মতো তিন বার ব্যবহার করা আবশ্যক না।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ (صـ١١)

অনুচ্ছেদ- ১৬ : রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজত পূর্ণ করার ইচ্ছে করলে বেশ দূরে চলে যেতেন (মতন ১১)

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رضـ) قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيْ سَفَرٍ فَأَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَاجَتَهُ فَأَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ.

২০. অর্থ : হজরত মুগিরা ইবনে শো'বা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমি নবী করিম ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি তাঁর (শৌচাগারের) প্রয়োজন সারার জন্য বেশ দূরবর্তী স্থানে গেলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আব্দুর রহমান ইবনে আবু কুরাদ, আবু কাতাদা, জাবের ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ তাঁর পিতা থেকে এ অনুচ্ছেদে আবু মূসা, ইবনে আব্বাস ও বিলাল ইবনুল হারেস (রা.) থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদিসটি حسن صحيح। নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি পেশাবের জন্য নরম স্থান অন্বেষণ করতেন। যেমন তালাশ করতেন নরম মঞ্জিল। আবু সালামার নাম আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ আজ্ জুহরি।

দরসে তিরমিযী

عبد الوهاب الثقفى : সেকাহ রাবি তবে শেষ বয়সে স্মরণশক্তি কমে গিয়েছিলো।

عن أبى سلمة : হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)-এর ছেলে। তাঁর নামের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ তাঁর নাম সাব্যস্ত করেছেন। কেউ বলেছেন, আবু সালামা উপনাম নয়, আসল নাম। একটি বক্তব্য মুতাবেক মদিনা তাইয়্যিবার সুপ্রসিদ্ধ সাত ফকিহের অন্তর্ভুক্ত তিনি। সপ্ত ফকিহের নামগুলো অনেকে একটি বাক্যে উল্লেখ করেছেন। তাতে আবু সালামার নাম যদিও নেই।

الا كل من لا يقتدى بأئمة * فقسمته ضيزى عن الحق خارجة

فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم * سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة

সাবধান! যেসব লোক ইমামদের অনুসরণ করে না তাদের ভাগ্য খারাপ। হক থেকে দূরে।

ইমামগণের নামগুলো (জেনে নাও)- উবায়দুল্লাহ, উরওয়া, কাসেম, সায়িদ, আবু বকর, সুলায়মান, খারেজা।

এতে উবায়দুল্লাহ দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য উবায়দুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ (র.)। উরওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য উরওয়া ইবনে জুবায়ির। কাসেম দ্বারা উদ্দেশ্য কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর সিদ্দিক। সায়িদ দ্বারা উদ্দেশ্য সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব। আবু বকর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হারেস ইবনে হিশাম (র.)। সুলায়মান দ্বারা উদ্দেশ্য সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র.)। খারেজা দ্বারা উদ্দেশ্য খারেজা ইবনে জায়দ ইবনে সাবেত (র.)। অনেকে হজরত আবু সালামা (র.)-কে সপ্ত ফুকাহার অন্তর্ভুক্ত করেছেন আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমানের পরিবর্তে।

أبعد في المذهب : أبعد শব্দটি এখানে লাজেমের (অকর্মক ক্রিয়া) অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তাতে بعد অপেক্ষা আতিশয্য অধিক পাওয়া যায়। بعد -এর অর্থ হলো, দূর হয়েছে। আর أبعد -এর অর্থ হলো, দূরত্ব অবলম্বন করেছে।

ইমাম নববি (র.) লিখেছেন, রাসূল ﷺ-এর এই দূরত্ব অবলম্বন ছিলো পর্দার জন্য। সুতরাং কাছে থেকেও যদি পর্দা অর্জিত হয় তাহলে দূরে যেতে হবে না।

بَابُ مَا جَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِى الْمُغْتَسَلِ (ص ۱۲)

অনুচ্ছেদ- ১৭ : গোসলখানায় পেশাব করা মাকরূহ প্রসঙ্গে (মতন ১২)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَاَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسٰى (وفى نسخة بيروت "بن مردويه") قَالَا اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اَشْعَثَ (وفى نسخة بيروت بن عبد الله) عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهٰى اَنْ يَّبُوْلَ الرَّجُلُ فِى مُسْتَحَمِّهٖ وَقَالَ اِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ ـ

২১. অর্থ : হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করিম ﷺ কোনো ব্যক্তিকে তার গোসলখানায় পেশাব করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি বলেছেন, অধিকাংশ ওয়াসওয়াসা তা থেকেই সৃষ্টি হয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

নবী করিম ﷺ-এর একজন সাহাবি থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি জয়িফ। আশআস ইবনে আবদুল্লাহর হাদিস ব্যতিত আমরা এটি মারফু' রূপে জানি না। এই আশআসকে أشعث الاعمى বলা হয়।

অনেক আলেম মনে করেন গোসলখানায় পেশাব করা মাকরূহ। তাঁরা বলেছেন, বেশির ভাগ ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হয় এ থেকে। তবে কোনো কোনো আলেম এ ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন। তন্মধ্যে একজন হলেন ইবনে সিরিন (র.)। কেউ তাঁকে বলেছিলো, বলা হয়, বেশির ভাগ ওয়াসওয়াসার উৎস গোসলখানা। তখন তিনি বলেছেন, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা। তাঁর কোনো শরিক নেই।

হজরত ইবনুল মুবারক (র.) বলেছেন, গোসলখানা থেকে যদি পানি প্রবাহিত হয়ে চলে যায়, তাহলে গোসলখানায় পেশাব করা।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিস আমাদের কাছে তো বর্ণনা করেছেন, আহমদ ইবনে আবদা আল-আমুলি হাব্বান থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক থেকে।

দরসে তিরমিযী

أحمد بن محمد بن موسى : ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ির উস্তাদ। ইমাম নাসায়ি (র.) বলেন, لا بأس به তাঁর মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই।

عن أشعث : 'আশআস' ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাবের আল হুদ্দানি আল-হাদ্দানি আল-আযাদি। ইমাম তিরমিযী (র.)-এর বক্তব্য মুতাবেক তাকে 'আশআস' আ'মাও বলা হয়। বিভিন্ন গ্রন্থাবলিতে তাঁর নাম 'আশআস' আ'মা, 'আশআস' ইবনে আবদুল্লাহ, 'আশআস' ইবনে জাবের, 'আশআস' হুদ্দানি, 'আশআস' আজদি এবং 'আশআস' হাদ্দানি এসেছে। এসব একই ব্যক্তির নাম। তিনি ثقة।

في مستحمه : مستحم গোসলখানাকে বলা হয়। হামিম থেকে এ শব্দটির উৎপত্তি। যার অর্থ গরম পানি। সা'লাব বলেন, এ শব্দটি বিপরতধর্মী। ঠাণ্ডা পানিকেও হামিম বলে। সর্বাবস্থায় মুস্তাহাম্মের অর্থ হলো, পানি ব্যবহারের জায়গা।

إن عامة الوسواس منه : এর দ্বারা উদ্দেশ্য, গোসলখানায় পেশাব করার দ্বারা এই সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, শরিরের কোথাও নাপাকির ছিটা লেগে গেলো কিনা। এরপর মানুষ সন্দেহের রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) বলেছেন, এই নিষেধ সে সুরতের সাথে বিশেষিত যখন গোসলখানায় পানি জমা হয়ে যায়, অথবা মেঝে কাঁচা থাকে। কিন্তু যদি ফ্লোর পাকা হয় এবং পানি বের হওয়ার পথ থাকে তবে এই নিষেধাজ্ঞা নেই। এ হাদিসে গোসলখানায় পেশাব করার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ কারণে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হয়।

ওয়াসওয়াসার হাকিকত হলো, আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন আমল ও কাজে কিছু বৈশিষ্ট্য রেখে দিয়েছেন, যেগুলোতে বাহ্যত কোনো সম্পর্ক আছে বলে নজরে পড়ে না। যেমন, আল্লামা শামি (র.) অনেক আমল সম্পর্কে বলেছেন, এগুলো বিস্মৃতি সৃষ্টি করে। যেমন, গোসলখানায় পেশাব করা, সতরের দিকে দৃষ্টিপাত করা ইত্যাদি। এই ধারণা কোনো কল্পনা পুরস্তি নয়; বরং যেমনভাবে অন্যান্য জিনিসের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখাও একত্ববাদের পরিপন্থী নয়, এমনভাবে সেসব আমল ও কর্মের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখাও তাওহিদের বিপরীত না।

এ ধরণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আশ'আরি, মাতুরিদি ও মু'তাজিলার প্রসিদ্ধ মতানৈক্য আছে।

১. মু'তাজিলার মত হলো, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো দ্রব্য সৃষ্টি করেন তখন তাতে কিছু বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় নিজে নিজে। যেগুলো সত্তাগত আবশ্যকীয় বিষয়ের পর্যায়ভুক্ত হয়; কিন্তু এ মতটি ভ্রান্ত। কেনোনা, এর ফলে কোনো বস্তুর সত্তাগতভাবেও ক্রিয়াশীল হওয়াও আবশ্যক হয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলার কুদরতের সম্পর্ক বস্তুর বৈশিষ্ট্যের সাথে অবশিষ্ট থাকে না। এর ফলে অলৌকিক বিষয়াবলি অস্বীকার করতে হয়।

২. আশআরিদের মত এর সম্পূর্ণ বিপরীত যে, মাখলুকাত এবং এগুলোর বৈশিষ্ট্যাবলির মাঝে মূলত কোনো সম্পর্ক হয় না; বরং যখন সৃষ্টিকর্তা কোনো জিনিস অথবা কাজ সৃষ্টি করেন তখন তার সাথে বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টিও স্বতন্ত্রভাবে করে দেন। যেমন আগুনের সাথে জ্বালানোর মূলত কোনো সম্পর্কই নেই। যখন আগুন সৃষ্টি করা হয়েছে তখন তার জ্বালিয়ে দেওয়ার বৈশিষ্ট্যও স্বতন্ত্র ও আলাদাভাবে তৈরি করা হয়েছে। এবার এটা সম্পূর্ণ সম্ভব যে, কোনো স্থানে আগুন সৃষ্টি করা হয়েছে কিন্তু জ্বালিয়ে দেওয়ার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করা হয়নি। যেমনটি হয়েছে হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর ঘটনায়। আবার এর বিপরীতও হয়েছে। যেমন, কোরআনে কারিমে বলা হয়েছে, أغرقوا فادخلوا نارا (তাদেরকে পানিতে নিমজ্জিত করা হয়েছে তারপর প্রবিষ্ট করা হয়েছে আগুনে।)

৩. কিন্তু মাতুরিদিদের মত হচ্ছে, বস্তু এবং এগুলোর বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কহীন নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা কোনো বস্তু অথবা কোনো কর্ম সৃষ্টি করার সময় তাতে কিছু বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে দেন। যেনো আগুনের সৃজনের সাথে এতে জ্বালানোর বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করে দেন। হ্যাঁ, যখন সৃষ্টিকর্তা চান এ বৈশিষ্ট্য তখন তুলে দেন। যেমন, তা অলৌকিক বিষয়াবলির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

মাতুরিদিদের ব্যাখ্যা ও ভাব প্রকাশ স্পষ্টতর এবং কোরআন ও সুন্নাহর সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল।

ويقال له الاشعث الأعمى : আশআস ইবনে আব্দুল্লাহ এবং আশআস আ'মা একই ব্যক্তি। কিন্তু 'তাহজিবুত্ তাহজিবে' হাফেজ ইবনে হাজার (র.) দুজনের আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে করেছেন এবং আশআস ইবনে আবদুল্লাহকে শক্তিশালী আর আশআস আ'মাকে বলেছেন জয়িফ।

فقال ربنا الله لا شريك له : অনেকে ইমাম ইবনে সিরিন (র.)-এর এই বক্তব্যর উদ্দেশ্য এই গ্রহণ করেছেন যে, তিনি গোসলখানায় পেশাব করা ওয়াসওয়াসা সৃষ্টিকারক হওয়াকে মনে করতেন তাওহিদের বিপরীত। কিন্তু ইমাম ইবনে সিরিনের মতো বড় আলেম থেকে এ বিষয়টি অযৌক্তিক। বাহ্যত তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো এ কথাটি তাঁর নিকট কোনো বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়। তাই এতে কোনো সন্দেহ বা ধারণার প্রয়োজন নেই। এটা ঠিক এমন– যেমন কোনো ব্যক্তি কাউকে মহামারি আক্রান্ত এলাকায় যেতে বারণ করলে সে জবাবে বলে ربنا الله। এর উদ্দেশ্য এছাড়া আর কিছু নয় যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষতি না হওয়ার যেনো আশা করা হয়। মোটকথা, ইমাম ইবনে সিরিন (র.)-এর এ বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায় যে, তাঁর নিকট ওপরযুক্ত অনুচ্ছেদের হাদিসটি পৌঁছেনি নতুবা তিনি কখনও এমন বক্তব্য দিতেন না।

بَابُ مَاجَاءَ فِى السِّوَاكِ (ص-١٢)

অনুচ্ছেদ- ১৮ : মিসওয়াক করা প্রসঙ্গে (মতন ১২)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَوْ لَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ ـ

২২. অর্থ : হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম তাহলে তাদের প্রতিটি নামাজের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক-মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম-আবু সালামা-জায়দ ইবনে খালেদ-নবী করিম ﷺ সূত্রেও বর্ণিত এ হাদিসটি আছে।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবু সালামা সূত্রে আবু হুরায়রা (র.) ও জায়দ ইবনে খালেদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত দু'টি হাদিসই আমার মতে সহিহ। কারণ, এ হাদিসটি নবী করিম ﷺ হতে আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু মুহাম্মদ মনে করেন, আবু সালামের হাদিসটি জায়দ ইবনে খালেদ থেকে বিশুদ্ধতম। আবু বকর সিদ্দিক, আলি, আয়েশা, ইবনে আব্বাস, হুজায়ফা, জায়দ ইবনে খালেদ, আনাস, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, উম্মে হাবিবা, ইবনে উমর, আবু উমামা, আবু আইয়ুব, তাম্মাম ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে হান্‌জালা, উম্মে সালামা এবং আবু মূসা (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا عَبْدَةُ (وفى نسخة بيروت "بن سليمان") عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ لَوْ لَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ وَلَاَخَّرْتُ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ ـ قَالَ فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلَوَاتِ فِى الْمَسْجِدِ وَسِوَاكُهٗ عَلٰى اُذُنِهٖ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ اُذُنِ الْكَاتِبِ لَا يَقُوْمُ اِلَى الصَّلٰوةِ اِلَّا اسْتَنَّ ثُمَّ رَدَّهٗ اِلٰى مَوْضِعِهٖ ـ

২৩. অর্থ : 'হজরত জায়দ ইবনে খালেদ আল জুহানি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, আমি আমার উম্মতের জন্য যদি কষ্টকর মনে না করতাম তাহলে প্রতিটি নামাজের সময় তাদের মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম এবং অবশ্যই এশার নামাজ পিছিয়ে দিতাম এক-তৃতীয়াংশ রাত পর্যন্ত। বর্ণনাকারি বলেন, ফলে জায়দ ইবনে খালেদ প্রতিটি নামাজে মসজিদে হাজির হতেন, কানের ওপর মিসওয়াক রেখে যেখানে লেখকের কানে কলম থাকে। যখনই কোনো নামাজের জন্য তৈরি হতেন তখনই তিনি মিসওয়াক করতেন। তারপর তা পুনরায় রেখে দিতেন স্বস্থানে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।'

দরসে তিরমিযী

أبو كريب : মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা। সিহাহ সিত্তার লেখকগণ তাঁর সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি ثقة।

عبدة بن سليمان : দ্বিতীয় শতাব্দির মুহাদ্দিস। ইমাম আজালি প্রমুখ তাঁকে নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন।

لأمرتهن بالسواك : سواك শব্দটি ব্যবহৃত হয় মিসওয়াকের উপকরণ এবং মিসওয়াক করার কর্ম উভয়টির ক্ষেত্রে। প্রথম অবস্থায় এখানে ইস্তি'মাল শব্দটিকে مضاف রূপে উহ্য মানতে হবে, দ্বিতীয় অবস্থায় উহ্য মানতে হবে না। এই শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ساك يسوك سوكا থেকে। যার অর্থ হলো, ঘষা দেওয়া। কারো কারো মতে, এটি تساول الابل থেকে গৃহীত। যার অর্থ হলো উটগুলোর এদিক সেদিক ঝুঁকে পড়া। উভয় অবস্থাতেই যোগসূত্র এবং সামঞ্জস্য স্পষ্ট। تفاعل -এর সাথে افتعال থেকেও আসে এবং استنان শব্দটিও এ অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেটি سن থেকে উৎপন্ন। তারপর এই শব্দটির প্রয়োগ সাধারণ দাঁত মাজার ক্ষেত্রে হয়। চাই মিসওয়াক ব্যবহার না হোক। এজন্য বলে استاك بالاصابع (সে আঙুল দিয়ে দাঁত মেজেছে।) মিসওয়াকের উপকারিতা অসীম। আল্লামা ইবনে আবিদিন শামি (র.) বলেন যে, মিসওয়াকের উপকারিতা সত্তরের ওপরে। যেমন,

ادناها اماطة الاذى عن الفم واعلاها تذكير الشهادتين عند الموت .

'তার সর্বনিম্ন উপকার হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করার সমান। আর সবচেয়ে বড় উপকার হলো, মৃত্যুর সময় কালিমা নসিব হওয়া।'

عند كل صلوة : মিসওয়াকের শরয়ি মর্যাদা সম্পর্কে কিছু মতবিরোধ রয়েছে। (১) আল্লামা নববি (র.) মিসওয়াক সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন। (২) অবশ্য ইমাম ইসহাক এবং দাউদ জাহেরি থেকে দু'টি বক্তব্য বর্ণিত আছে। একটি হলো, মিসওয়াক করা সুন্নত, অপরটি হলো ওয়াজিব। ওয়াজিব হওয়ার বক্তব্যের ওপর তাদের প্রমাণ হলো, হজরত রাফে ইবনে খাদিজ এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হাল্হালাহ (রা.)-এর একটি বর্ণনা,

السواك واجب وغسل الجمعة واجب على كل مسلم .

-رواه أبو نعيم فى كتاب السواك وذكره السيوطى فى الجامع الصغير

"মিসওয়াক করা ওয়াজিব এবং জুম'আর গোসল করা ওয়াজিব প্রতিটি মুসলমানের ওপর।"

তবে 'তালখিসুল হাবিরে' হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি (র.) এ হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন, اسناده واه অর্থাৎ, এ হাদিসটির সনদ জয়িফ। অতএব, এ হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা ঠিক নয়। আল্লামা নববি (র.) লিখেছেন যে, ইমাম ইসহাক (র.) ওয়াজিব হওয়ার বক্তব্য করেছেন, এটা বলা ঠিক নয়; বরং বিশুদ্ধ হলো,

তিনিও জমহুরের মতো মিসওয়াক সুন্নত হওয়ার প্রবক্তা। এবার শুধু থেকে যান ইমাম দাউদ জাহেরি। তাঁর সম্পর্কেও প্রসিদ্ধ এটাই যে, তিনিও সুন্নত হওয়ার প্রবক্তা। যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় তিনি ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা তবেও ইজমার পরিপন্থী তার মতপার্থক্য সমস্যা নেই।

০ জমহুরের মাঝে মতবিরোধ হলো, মিসওয়াক কি নামাজের সুন্নত না ওজুর সুন্নত। (১) ইমাম শাফেয়ি (র.) এটাকে নামাজের সুন্নত সাব্যস্ত করেন। জাহেরি সম্প্রদায় থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। (২) কিন্তু হানাফিগণ এটাকে বলে ওজুর সুন্নত। মতানৈক্যের ফল এই দাঁড়াবে যে, যদি কোনো ব্যক্তি ওজু এবং মিসওয়াক করে এক নামাজ আদায় করে তারপর এই ওজু দ্বারা অন্য নামাজ পড়তে চায় তাহলে ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মতে নতুনভাবে মিসওয়াক করা মাসনুন হবে। আর ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে যেহেতু এটি ওজুর সুন্নত। তাই দ্বিতীয়বার মিসওয়াক করার প্রয়োজন হবে না। ইমাম শাফেয়ি (র) প্রমাণ পেশ করেন উক্ত অধ্যায়ের হাদিসটি দ্বারা, لولا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك عند كل صلوة 'আমার উম্মতের কষ্টের আশঙ্কা আমি যদি না করতাম, তাহলে প্রতিটি নামাজের সময় মিসওয়াকের নির্দেশ দিতাম।'

এর জবাবে হানাফিগণ বলেন যে, এখানে একটি مضاف উহ্য আছে। অর্থাৎ عند وضوء كل صلوة যার প্রমাণ হলো, হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর এই বর্ণনাটি 'মুস্তাদরাকে হাকেমে' নিম্নেযুক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে,

لولا ان اشق على امتى لفرضت عليهم السواك مع الوضوء

'তালখিসুল মুস্তাদরাকে' হাফেজ জাহাবি (র.) এ হাদিসটি বর্ণনা করার পর লিখেন, هو على شرطهما ليس له علة অর্থাৎ, এটি বোখারি-মুসলিমের শর্তে উন্নীত। তাতে কোনো সূক্ষ্ম ত্রুটি নেই। তাছাড়া এই বর্ণনাটিই সহিহ ইবনে হাব্বানে হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে নিম্নেযুক্ত ভাষায়,

لولا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلوة ـ

ইমাম নিমবি (র.) বলেন, اسناده صحيح। এই বর্ণনাটি হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বর্ণনা করেছেন 'তালখিসে' এবং এ হাদিস সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেছেন যা তাঁর মতে হাদিসটির প্রামাণিকতার প্রমাণ। তাছাড়া 'মু'জামে তাবারানি'তে হজরত আলি (রা.) থেকে বর্ণিত আছে মারফু সূত্রে,

لولا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك مع كل وضوء 'মাজমাউজ জাওয়ায়িদে' ১/২২১, বাবুন ফিস সিওয়াকে আল্লামা নুরুদ্দিন হায়সামি (র.) এ হাদিসটি বর্ণনা করার পর লিখেছেন,

رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه ابن اسحق وهو ثقة مدلس وقد صرح بالتحديث واسناده حسن

তাছাড়া সুনানে নাসায়ি, মুসনাদে আহমদ, মুসতাদারাকে হাকেম, সহিহ ইবনে খুজায়মা এবং সহিহ ইবনে হাব্বানের সেসব বর্ণনা দ্বারা হানাফিদের স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করা হয়, যেগুলোতে عند كل صلوة এর পরিবর্তে এসেছে عند كل وضوء বা مع كل وضوء শব্দ।

মোল্লা আলি কারি (র.) বলেছেন যে, ইমাম শাফেয়ি (র.) عند كل صلوة কে আসল সাব্যস্ত করে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ, তিনি ওজু এবং নামাজ উভয়ের সময় মিসওয়াককে মাসনুন সাব্যস্ত করেন। হানাফিগণ مع كل وضوء -এর বর্ণনাগুলোকে মূল সাব্যস্ত করে عند كل صلوة-এর বর্ণনাগুলোতে এই অর্থ করেন যে, এখানে مضاف উহ্য রয়েছে।[১] عند وضوء كل صلوة -এর ওপর কিছু যৌক্তিক দলিল আছে।

টীকা- ১. ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর একটি বর্ণনা এর সহায়ক, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

لولا ان اشق على امتى لأمرتهم عند كل صلوة بوضوء ومع كل وضوء بسواك مجمع الزوائد ١ ظ٢٢١ باب فى السواك ـ

'আমি যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম তাহলে প্রতিটি নামাজের সময় অবশ্যই ওজু করার নির্দেশ দিতাম এবং প্রতিটি ওজুর সাথে মিসওয়াকের নির্দেশ দিতাম।'

১. নামাজযুক্ত বর্ণনাগুলোতে প্রতিটি স্থানে عند শব্দ এসেছে, যেটি প্রকৃত মিলন বুঝায় না, বরং যদি মিসওয়াক এবং সালাতের মাঝে কিছু দেরিও হয় তবুও তার ক্ষেত্রে عند كل صلوة প্রয়োগ হতে পারে। এর পরিপন্থি ওপরযুক্ত বর্ণনাগুলোতে কোনো কোনো স্থানে مع শব্দ বর্ণিত হয়েছে, যেটি বুঝায় প্রকৃত মিলন।

২. পবিত্রতা অর্জনের একটি মাধ্যম মিসওয়াক । অর্থাৎ, এর সম্পর্ক পবিত্রতার সাথে। এ কারণে নাসায়ি, ইবনে হাব্বান এবং 'মুসনাদে আহমদের' বর্ণনায় হজরত আয়েশা (রা.)-এর সনদে একটি হাদিসে রয়েছে,

السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب١.

'মুখ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করার উপকরণ মিসওয়াক, প্রতিপালকের সন্তুষ্টির কারণও।'

আর মিসওয়াক দ্বারা উদ্দেশ্য দাঁত পরিষ্কার করা, যা পবিত্রতার অন্তর্ভুক্ত। এজন্য স্পষ্ট হলো মিসওয়াককে ওজুর সুন্নত সাব্যস্ত করা।

৩. মিসওয়াক যদি সালাতের সময় সুন্নত হয়, তবে কোনো কোনো সময় দাঁত থেকে রক্ত বের হওয়ারও আশঙ্কা আছে। হানাফিদের মতে যেটি ওজু ভঙ্গকারি। শাফেয়ি মতাবলম্বীদের মতেও অপছন্দনীয়। কেনোনা, তাদের মতেও নাপাক বের হওয়াতো ভালো নয়।

৪. রাসূল ﷺ সালাতের জন্য দাঁড়ানোর সময় মিসওয়াক করতেন বর্ণনাগুলো দ্বারা কোথাও প্রমাণিত হয় না। এসব কারণে মিসওয়াকের যথার্থ স্থান মনে হয় ওজুই।

দীর্ঘকাল থেকে গ্রন্থাবলিতে হানাফি এবং শাফেয়িগণের এই মতবিরোধ বর্ণিত হয়ে আসছে। কিন্তু হজরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, এটা শুধু শাব্দিক বিতর্ক। যদি কোনো ব্যক্তি পুরনো ওজু দ্বারা নতুন সালাত আদায় করার মনস্থ করেন তবে হানাফিদের নিকট তার জন্য মিসওয়াক করা সুন্নত। কারণ, 'ফাতহুল কাদিরে' শাইখ ইবনুল হুমাম লিখেছেন যে, পাঁচটি স্থানে মিসওয়াক করা মোস্তাহাব। নামাজের প্রস্তুতিকেও তিনি সে পাঁচটি স্থানের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

والإستحباب والنية كلاهما متقاربان لا تخالف بينهما ويكفى لرفع الخلاف هذا القدر .

'সুন্নত ও মোস্তাহাব উভয়টি কাছাকাছি। উভয়ের মাঝে কোনো বিরোধ নেই। বিরোধ অবসানের জন্য এটুকুই যথেষ্ট।' এতে বোঝা যায় প্রকৃত কোনো বিরোধ নেই।

০ মিসওয়াক সংক্রান্ত আরেকটি আলোচ্য বিষয় হলো, মিসওয়াক করার মাসনুন পদ্ধতি কি? এ প্রসঙ্গে ঐকমত্য রয়েছে যে, দাঁতগুলোতে প্রস্থে মিসওয়াক করা হবে। এ বিষয়টিও হজরত আতা ইবনে আবু রবাহ-এর একটি মারফু মুরসাল বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত।

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شربتم فاشربوا مضا واذا استكتم فاستاكوا عرضا . رواه ابو داود فى مراسيله تحت كتاب الطهارة، ص٥ .

'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন পান করো তখন চুষে পান করো। আর যখন তোমরা মিসওয়াক করো তখন তা প্রস্থে করো।'

'তালখিসুল হাবিরে' হাফেজ ইবনে হাজার (র.) এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করে লিখেছেন,

فيه محمد بن خالد القرشى ابن القطان لا يعرف قلت وثقه ابن معين وابن حبان .

'মুহাম্মদ ইবনে খালেদ কুরাশি ইবনুল কাত্তান এ হাদিসের সনদে রয়েছেন। তিনি পরিচিত নন। আমি বলি, ইবনে মাইন ও ইবনে হাব্বান তাঁকে বলেছেন ثقة।'

টীকা- ১. নাসায়ি : ১/৫, কিতাবুত্ তাহারাত, আত-তারগিব ফিস্ সিওয়াক।

০ এ হাদিসটি এ হিসেবে হাসান তো হয়ে যায়, কিন্তু এর ওপর এই প্রশ্নটি তারপরও থেকে যায় যে, এটি আতা ইবনে আবু রাবাহের মুরসাল এবং তাঁর মুরসালগুলোকে বলা হয় দুর্বলতম মুরসাল। -তাহজিবুত্ তাহ্জিব

তবে এটি তো ফাজায়েলের জায়গা। অতএব, এতোটুকু দুর্বল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। দ্বিতীয় হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বাবুস্ সিওয়াকে এ হাদিসটি উদ্ধৃত করার পর লিখেন,

له شاهد موصول عند العقيلى فى الضعفاء .

'উকায়লির মতে জুআফায় এর একটি মুত্তাসিল শাহেদ রয়েছে।'

সূত্রগতভাবে যদিও এই শাহেদটি জয়িফ, তা সত্ত্বেও হজরত আতার মুরসালের সহায়তা অবশ্যই হয়। তারপর 'তালখিসুল হাবিরে' হাফেজ ইবনে হাজার (র.) লিখেছেন যে, দাঁতগুলোতে প্রস্থে মিসওয়াক করা সুন্নত। কিন্তু জিহ্বায় দৈর্ঘ্যে মিসওয়াক করা উত্তম। যেমন, বোখারি-মুসলিমে হজরত আবু মূসা (রা.)-এর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। মুসনাদে আহমদে এ হাদিসটির শব্দ নিম্নেযুক্ত,

و الطرف السواك على لسانه يستن إلى فوق قال الراوى كأنه يستن طولا الخ .

-(اعلاء السنن جـ١، صـ٥٣ باب نية السواك بحوالة تلخيص الحبير جـ١ صـ٢٣)

'আর জিহ্বার ওপর ছিলো মিসওয়াকের একটি দিক, তিনি মিসওয়াক করছিলেন ওপরের দিকে। রাবি বলেন, যেনো তিনি লম্বালম্বিভাবে (দৈর্ঘ্যে) মিসওয়াক করছিলেন।'

সুন্নত হলো, পিলু গাছের (এক প্রকার প্রসিদ্ধ গাছ দ্বারা দাঁতন তৈরি করা হয় মিসওয়াক। এজন্য সহিহ ইবনে হাব্বান, মু'জামে তাবারানি এবং মুসনাদে আবু ইয়ালাতে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা রয়েছে,

قال كنت اختبى لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك ذكره الحافظ فى التلخيص١ الحبير وسكت عليه .

'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য পিলু গাছের একটি মিসওয়াক লুকিয়ে রাখতাম।'

তাছাড়া মাজমাউজ জাওয়ায়িদ ২/১০০, কিতাবুস্ সালাত, باب بأى شيئ يستاك -তে আল্লামা হায়সামি (র.) হজরত আবু খায়রা আস্-সাবাখি (রা.)-এর এই বর্ণনাটি বর্ণনা করেছেন,

كنت فى الوفد الذين اتوا النبى صلى الله عليه وسلم فزودنا الاراك نستاك٢ به، الحديث .

টীকা- ১. ১/৬৫, কিতাবুত্ তাহারাত, বাবুস্ সিওয়াক। এমনভাবে মুসনাদে আহমদ : ১/৪২০-এ ইবনে মাসউদ (রা)-এরই একটি বর্ণনা রয়েছে– 'ইবনে মাসউদ (রা.) পিলু গাছের একটি মিসওয়াক লুকিয়ে রাখতেন। মিসওয়াকটির গোছাদ্বয় তথা নিচের দিক ছিলো সরু। বাতাস এটিকে নাড়াচারা দিতো। ফলে লোকজন হেসে দিলো, রাসূল ﷺ ফরমালেন, তোমরা কেনো হাসছো? তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মিসওয়াকটির পায়ের গোছাদ্বয় (নিম্ন দিক) চিকন দেখে। এতদশ্রবণে তিনি বললেন, কসম সে সত্তার যার মুঠোয় আমার জান, এ গোছাদ্বয় মিজানে (পাল্লায়) উহুদ পাহাড় অপেক্ষাও অনেক ভারি।

অনুরূপভাবে মুসনাদে আহমদে (৩/৩৮৬) হজরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে,

ان رسول الله صـ مربهم وهم يجتنبون اراك واعطاه رجل جنى اراك فقال لو كنت متوضأ اكلته

তাদের নিকট দিয়ে রাসূল ﷺ অতিক্রম করছিলেন, তারা তখন পিলু গাছের ফল পারছিলেন। এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ কে একটি পিলু ফল দিলেন। ফলে তিনি ফরমালেন, 'আমি যদি ওজু করতাম, এটি তবে খেতাম।'

টীকা- ২. এই বর্ণনাটি হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি (র.) 'তালখিসুল হাবির' : ১/৬৫ বাবুস্ সিওয়াক-এ উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও লিখেছেন। তারিখুল বোখারি ইত্যাদিতে হজরত আবু খায়রা আস্ সাবাহির হাদিস রয়েছে,

كنت في الوفد فزودنارسول الله صلي الله عليه وسلم بالاراك وقال استاقوا بهذا

আমি প্রতিনিধি দলে ছিলাম। তারপর আমরা রাসূল ﷺ কে পিলু গাছ (এর ডাল) উপঢৌকন দিলাম। তিনি বললেন, এটা দিয়ে তোমরা মিসওয়াক করো।' –সংকলক

'রাসূলে আকরাম ﷺ-এর দরবারে যে প্রতিনিধি দল এসেছিলো আমি ছিলাম তাদের অন্তর্ভুক্ত। আমরা নবীজি ﷺ-কে পিলু গাছের (বৃক্ষ বিশেষ যা দ্বারা মিসওয়াক তৈরি করা হয়) মিসওয়াক উপঢৌকন দিয়েছিলাম, যা দিয়ে আমরা মিসওয়াক করতাম।'

আল্লামা হায়সামি (র.) বলেন,

رواه الطبرانی فی الکبیر واسناده حسن . راجع جمع الفوائد جـ۱ صـ۹۲ کتاب الطهارة التخليل والسواك وغل اليدين .

'এটি বর্ণনা করেছেন তাবারানি কাবিরে। এর সনদ حسن।'

আরেকটি আলোচ্য বিষয় হলো, বর্তমান যুগে যে ব্রাশ ইত্যাদির প্রচলন আছে এগুলো দ্বারা সুন্নত আদায় হয় কি-না? এর তাত্ত্বিক জবাব হলো, এখানে দু'টি জিনিস আলাদা আলাদা। একটি হলো মিসওয়াকের সুন্নত, আরেকটি হলো মাসনুন মিসওয়াক ব্যবহার করার সুন্নাত। মিসওয়াকের সুন্নতের ব্যাপারটি হলো, ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, মাসনুন মিসওয়াক না থাকলে কাপড়, মাজন অথবা অঙ্গুলি ঘর্ষণ দ্বারা মিসওয়াকের সুন্নত আদায় হয়ে যায়। যদিও মাসনুন মিসওয়াক ব্যবহারের সুন্নত আদায় হবে না। এ হুকুমটিও একটি হাদিস থেকে গৃহীত। ইমাম দারাকুতনি, বায়হাকি এবং ইবনে আদি হজরত আনাস (রা.)-এর এই মারফূ বর্ণনাটি বর্ণনা করেছেন,

تجری من الاصابع (بیهقی جـ۱ صـ٤٠ باب الإستياك بالاصابع)

'মিসওয়াক আঙুল দিয়ে করলেও যথেষ্ট হবে।'

'তালখিস', বাবুস্ সিওয়াক : ৭০-এ হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি (র.) এর সনদ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। কিন্তু সাথে সাথেই হাফেজ জিয়া মুকাদ্দাসি (র.)-এর এ বক্তব্যও উদ্ধৃত করেছেন,

لا اری بسنده بأسا 'আমি এ সনদে কোনো ত্রুটি দেখি না।'

তাছাড়া ইমাম বায়হাকি (র.)-ই এটা দ্বিতীয় সনদে বর্ণনা করেছেন যেটি নির্ভরযোগ্য। তাছাড়া মুসনাদে আহমদে হজরত আলি (র.)-এর এই আমল বর্ণিত আছে,

أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض فادخل بعض اصابعه فی فيه .

'তিনি পানির একটি পেয়ালা আনতে বললেন। তারপর তাঁর চেহারা দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন এবং কুলি করলেন। তারপর তাঁর আঙুলগুলোর কিছু অংশ মুখে প্রবিষ্ট করলেন।'

আর হজরত আলি (র.) এ হাদিসে বলেছেন,

هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم 'এ হলো রাসূল ﷺ-এর ওজু।' 'তালখিস' : ১/৭০-এ বাবুস্ সিওয়াকে এ হাফেজ ইবনে হাজার (র.) হাদিসের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তাছাড়া 'মাজমাউজ জাওয়ায়িদ' : ২/১০০, كتاب الصلوة باب ما يفعل عند عدم السواك এ হাদিসটি বর্ণিত আছে এভাবে,

عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنی عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاصابع تجری مجری السواك اذا لم يكن سواك .

-(رواه الطبرانی فی الاوسط وكثير ضعيف وقد حسن الترمذی حديثه (اعلاء السنن ۲۱/۵۲)

'রাসুল ﷺ বলেছেন, মিসওয়াক না থাকলে মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হবে আঙুলগুলো।'

সামগ্রিকভাবে এসব বর্ণনা আঙুল যথেষ্ট হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্টাকারে প্রমাণ দিচ্ছে। এমনভাবে হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন,

وعند فقده يعالج بالاصبع . 'মিসওয়াক হারিয়ে ফেললে বা না থাকলে আঙুল দিয়ে মাজবে।'

সুতরাং মাজন অথবা ব্রাশ দ্বারা এ সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো ব্রাশের রেশাগুলো হতে হবে পাক। যেসব ব্রাশে শূকরের পশমের রেশা হবে সেগুলো ব্যবহার করা হারাম। কিন্তু মাসনুন মিসওয়াক ব্যবহার করার ফজিলত শুধু জায়তুন, পিলু এবং নিমের মিসওয়াক দ্বারা অর্জিত হয়। মাজন কিংবা ব্রাশ ব্যবহার করার ফলে এ ফজিলত অর্জিত হতে পারে না। তাছাড়া দাঁত এবং মাড়ির জন্য মাসনুন মিসওয়াক যে পরিমাণ উপকারি এতোটা অন্য কেনো দ্রব্য নয়।

وأما محمد فزعم أن حديث أبى سلمة عن زيد بن خالد اصح .

○ ইমাম তিরমিযী (র)-এর উদ্দেশ্য হলো, হজরত আবু হুরায়রা (রা.) এবং হজরত জায়দ ইবনে খালেদ আল-জুহানি (র.) উভয়ের বর্ণনাই যদিও সহিহ। কিন্তু ইমাম বোখারি (র.) হজরত জায়দের বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধতম সাব্যস্ত করেছেন।

প্রশ্ন : একটি প্রশ্ন উথাপিত হয় যে, জায়দ ইবনে খালেদ (রা)-এর বর্ণনা যেহেতু বিশুদ্ধতম সেহেতু ইমাম তিরমিযী (র.) অনুচ্ছেদের শুরুতে এই বর্ণনাটিকে মূল বানিয়ে উল্লেখ করলেন না কেনো?

জবাব : ইমাম তিরমিযী (র.)-এর সাধারণ পদ্ধতি হলো, তিনি অধিকাংশ সময় এমন হাদিস উল্লেখ করার চেষ্টা করেন যেটি অন্যরা উল্লেখ করেননি। হজরত জায়দ (রা.)-এর বর্ণনা ইমাম বোখারি (র.) স্বীয় জামে'তে উল্লেখ করেছেন, এজন্য ইমাম তিরমিযী (র.) হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনাটিকে মূল হিসেব উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন : এখানে দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন হলো, হজরত জায়দ (রা.)-এর বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধতম সাব্যস্ত করার কারণ কি?

জবাব : এখানে বাহ্যত হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনায় মুহাম্মদ ইবনে আমর নামক একজন রাবি আছেন। যিনি উঁচু মাপের বর্ণনাকারি নন। তাছাড়া আরেকটু অতিরিক্ত অংশও আছে হজরত জায়দ (রা.)-এর বর্ণনায়।

অতএব, নির্ভরযোগ্য রাবির অতিরিক্ত অংশ গ্রহণযোগ্য এই মূলনীতি অনুসারে সে বর্ণনাটি পূর্ণাঙ্গতর।

محمد بن ابراهيم : নির্ভরযোগ্য রাবি। অবশ্য ইমাম আহমদ (র.) বলেছেন, তিনি কোনো কোনো মুনকার হাদিসও বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا (١٣)

অনুচ্ছেদ- ১৯ : ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর তোমাদের কেউ যেনো হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে হাত না দেয় (মতন ১৩)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلٰثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِيْ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ .

২৪. অর্থ : হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন রাত্রে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হবে তখন যেনো হাত দুই বার অথবা তিন বার না ধুয়ে পানির পাত্রে প্রবিষ্ট না করে। কেনোনা, রাত্রে তার হাত কোথায় ছিলো তা তার জানা নেই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'এ হাদিসটি حسن صحيح'। ইমাম শাফেয়ি (র.) বলেন, আমি পছন্দ করি বিশ্রাম থেকে উঠে চাই ঘুমাক কিংবা না ঘুমাক ওজুর পানিতে হাত না ধুয়ে তা প্রবিষ্ট না করানো। যদি হাত ধোয়ার পূর্বে তাতে প্রবিষ্ট করায় তবে এটাকে আমি মাকরূহ জানি। অবশ্য এটা পানিকে বিনষ্ট করবে না, তার হাতে যদি নাপাক না থাকে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন, যখন কেউ রাত্রে ঘুম থেকে জাগ্রত হবে তখন তার হাত ধোয়ার পূর্বে ওজুর পানিতে প্রবিষ্ট করাবে। তবে আমি পছন্দ করি সেই পানি ফেলে দেওয়া।

আল্লামা ইসহাক (র.) বলেন, যখন কেউ রাত্রে অথবা দিনে ঘুম থেকে উঠবে তখন হাত ধোয়ার পূর্বে ওজুর পানিতে তা প্রবিষ্ট করবে না। 'ইবনে উমর, জাবের ও আয়েশা (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।'

দরসে তিরমিযী

ابو الوليد : পুরো নাম আহমদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে বাক্কার। তিনি صادق। অর্থাৎ, মা'মুলি ধরনের রাবি। অনেকে তাকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ হলো তাঁকে দুর্বল সাব্যস্ত করার কোনো মজবুতপ্রমাণ নেই।

الوليد بن مسلم : ইনিও সত্যবাদী। মানে মা'মুলি ধরনের রাবি। অবশ্য তাদলিসে তাসবিয়ায় অভ্যস্ত। তাদলিসে তাসবিয়া মানে দুজন নির্ভরযোগ্য রাবির মাঝখান থেকে দুর্বল রাবিকে বাদ দিয়ে দেওয়া। এটি তাদলিসের নিকৃষ্টতম প্রকার। তাঁর নিয়ম ছিলো অনেক হাদিস عن الأوزاعى عن الزهرى বলে বর্ণনা করতেন, অথচ এই দু'জনের মাঝে সূত্র থাকতো। অনেকে তাকে নিষেধও করেছেন কিন্তু তিনি তা মানেননি।

عن الأوزاعى : হাদিস ও ফিক্হের সুপ্রসিদ্ধ ইমাম। সর্বসম্মতিক্রমে ثقة।

اذا استيقظ أحدكم من الليل : এই হাদিসের কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে من الليل (রাত্রে)-এর শর্তের। আবার কোনো কোনোটিতে নেই।[১]

১. ইমাম শাফেয়ি (র.) প্রাধান্য দিয়েছেন শর্তায়ন না হওয়ার দিকটিকে। হানাফিয়া এবং জমহুরে ফুকাহার মত হলো, এই হুকুমে রাত এবং দিনের কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ, দুহাত ধৌত করার হুকুম প্রতিটি ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সময়; রাতের নিদ্রার সাথে এটি বিশেষিত নয়। ২. কিন্তু ইমাম আহমদ (র.)-এর হুকুমটিকে রজনীর সাথে বিশেষিত করেছেন। তিনি মিনাল্লাইল দ্বারা রাতের শর্ত প্রমাণ পেশ করেন। হানাফিয়া ও অন্যান্যের মতে من الليل -এর শর্ত ইহতেরাজি নয়, ইত্তেফাকি (অন্যটিকে বাদ দেওয়ার জন্য নয়; বরং ঘটনাক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে)। এর প্রমাণ হলো, সহিহ বোখারিতে এটি রাতের শর্ত ছাড়া বর্ণিত হয়েছে। যদিও ইমাম তিরমিযী (র.) হাদিসটি রাতের শর্তসহকারে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু শিরোনাম কায়েম করেছেন বোখারির বর্ণনা অনুসারে। যা দ্বারা বোঝা যায়, তিনিও জমহুরের মাজহাবকে প্রাধান্য দেন। তাছাড়া এই হুকুমটির একটি কারণ রয়েছে, সে কারণটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেছেন, فانه لا يدرى اين باتت يده (কারণ, হাতটি রাত্রে কোথায় ছিলো তা তার জানা নেই।)

আর এই আশঙ্কা রাতদিনে সমান। অতএব, হুকুমও হবে সমান।

فلا يدخل يده فى الإناء : এতে মতপার্থক্য রয়েছে যে, দু'হাত ধৌত করার এ হুকুম কোন্ পর্যায়ের? ১) ইমাম ইসহাক এবং দাউদে জাহেরি এটাকে সাব্যস্ত করেন ওয়াজিব পর্যায়ের। আল্লামা ইবনে কুদামা (র.) আল-মুগনিতে ইমাম আহমদ (রা.)-এর এই বক্তব্য বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর মতে এই হুকুমটি ওয়াজিব পর্যায়ের। ২) কিন্তু ইমাম শাফেয়ি (র.) এ হুকুমটিকে ব্যাপক আকারে মাসনুন বলেন।

টীকা- ১. আবু দাউদের বর্ণনায় অনুরূপ আছে। -প্রথম খণ্ড : باب فى الرجل يدخل يده فى الاناء قبل ان يغسلها

৩) ইমাম মালেক (র.) ব্যাপক আকারে মুস্তাহাব বলেন। ৪) হানাফিদের নিকট এ মাসআলাটিতে তাফসিল রয়েছে। এই বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন 'আল-বাহরুর রায়েকে' আল্লামা ইবনে নুজায়ম (র.) যে, যদি হাতে নাপাক লাগার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে তথা ইয়াকিন হয়, তাহলে উভয় হাত ধৌত করা ফরজ। প্রবল ধারণা থাকলে ওয়াজিব, আর যদি সন্দেহ হয় তাহলে মাসনূন, আর যদি সন্দেহও না হয় তবে মুস্তাহাব। মূলত জমহুর এখানে নাপাকির ধারণাকে হুকুমের কারণ সাব্যস্ত করেছেন। এজন্য হুকুমটি এর ওপর নির্ভরশীল। এ কারণেই না তাদের মতে রাত এবং দিনের কেনো পার্থক্য আছে, না এ হুকুমটি ওয়াজিব পর্যায়ের। কারণ, ধারণার কারণে ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না। এর পরিপন্থি ইমাম আহমদ (র.) কোনো কারণ উৎসারণ করার পরিবর্তে তিরমিযীর হাদিসটির বাহ্যিক শব্দের ওপর আমল করেন। এজন্য তিনি রাত এবং দিনের পার্থক্য করেছেন এবং হুকুমটিকে মেনে নিয়েছেন ওয়াজিব বলে।

০ আরেকটি মাসআলা হলো, কোনো ব্যক্তি যদি এই হুকুমের ওপর আমল না করে এবং জাগ্রত হওয়ার পর হাত না ধুয়ে পাত্রের মধ্যে হাত দেয় তাহলে এর হুকুম কি? ১. হজরত হাসান বসরি (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পাত্রের পানি ব্যাপক আকারে নাপাক হয়ে যাবে। ২. ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, যদি পানি বেশি হয় তাহলে নাপাক হবে না; কম হলে নাপাক হয়ে যাবে। ৩. ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মতে পানি নাপাক তো হবে না তবে তার মধ্যে কারাহাত এসে যাবে। ৪. ইমাম মালেক (র.)-এর মতে পানি বিনা মাকরূহে পাক থাকবে। ৫. আর হানাফিদের মতে পূর্বেযুক্ত সেই ব্যাখ্যাতো আছেই।

০ ইমাম শাফেয়ি (র.) এবং অন্যান্য ফুকাহায়ে কেরাম থেকে আল্লামা নববি (র.), বর্ণনা করেছেন যে, ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর দু'হাত ধৌত করার হুকুমের প্রেক্ষাপট হচ্ছে, আরবগণ সাধারণত লুঙ্গি পরিধান করতেন, অঞ্চলও উষ্ণ ছিলো এবং ঘাম খুব বেশি হতো। আর সাধারণত পাথর দ্বারা ইস্তেঞ্জা করার প্রচলন ছিলো। এজন্য সে যুগে এই সম্ভাবনা বেশি ছিলো যে, ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের হাত কোনো নাপাক স্থানে পৌঁছে গিয়েছে কি-না এবং ময়লাযুক্ত হয়েছে কি-না? এজন্য এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর আবেদন হলো, কেউ যদি পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করে থাকে অথবা সালোয়ার-পায়জামা পরিহিত থাকে তবে এ হুকুম তার জন্য নয়।

০ তবে আল্লামা আবুল ওয়ালিদ বাজি মালেকি (র.) বলেছেন, এ ব্যাপারে ইরাকিদের বক্তব্য অধিক পছন্দনীয় যে, মূলত এই হুকুমটি পবিত্রতার পরিবর্তে পরিচ্ছন্নতার সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ, যদিও হাত নাপাক হওয়ার সম্ভাবনা না হোক, তবুও ঘুমের পরে হাত ধৌত করা ব্যতিত পানিতে হাত দেওয়া পরিচ্ছন্নতার পরিপন্থি এবং পবিত্রতার সাথে পরিচ্ছন্নতাও উদ্দেশ্য। অতএব, শুধু তখনকার যুগের জন্য এ হুকুমটি বিশেষিত ছিলো না; বরং সমস্ত মানুষ, সর্ব যুগ এবং সর্ব অঞ্চলের জন্য এ হুকুমটি ব্যাপক।

حتى يفرغ عليها مرتين وثلثا : এ হাদিস দ্বারা হেদায়া গ্রন্থকার ওজুর শুরুতে দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা সুন্নত হওয়ার ওপর প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু 'ফাতহুল ক্বাদিরে' শায়খ ইবনে হুমাম (র.), 'নসবুর রায়া'য়, হাফেজ জায়লায়ি (র.) 'ইনায়া' শরহে হিদায়ায়, আকমালুদ্দিন বাবরতি (র.), 'বাদায়ি'য়ে মালিকুল ওলামা কাসানি (র.) এবং আল্লামা ইবনে রুশদ 'বিদায়াতুল মুজতাহিদে' স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, এ হাদিসের সম্পর্ক ওজুর সুন্নতের সাথে নয়; বরং পানির আহকামের সাথে এবং এই বক্তব্যটিই প্রধান। কারণ, এই হাদিসে ওজুর কোনো আলোচনা নেই। বাক্যের অগ্রপশ্চাদ এ উদ্দেশ্যে এসেছে যে, নাপাক ধারণাকারি ব্যক্তি হাত দ্বারা যেনো পানি নষ্ট না করে। অতএব, এর উদ্দেশ পানিকে পবিত্র বা পরিচ্ছন্ন রাখা, ওজুর সুন্নত বাতলানো নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ওজুর শুরুতে দু'হাত ধৌত করা মাসনুন নয়; বরং এটিই মাসনুন। কিন্তু এ সুন্নতের বিষয়টি উক্ত অধ্যায়ের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় না; বরং সেসব হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, যেগুলোতে নবী করিম ﷺ-এর ওজুর পূর্ণাঙ্গ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলোর অধিকাংশ হাদিসে উল্লেখ রয়েছে যে, ওজু শুরু করার আগে তিনি তাঁর হাত ধুয়ে নিতেন।

بَابُ فِى التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوْءِ (١٣)

অনুচ্ছেদ- ২০ : ওজুর সময় বিসমিল্লাহ পড়া প্রসঙ্গে (মতন ১২)

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ (فى ن ب الجهضمى) وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ قَالَا نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ أَبِىْ ثِفَالٍ الْمُرِّيِّ عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ عَنْ جَدَّتِهِ عَنْ أَبِيْهَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ .

২৫. অর্থ : হজরত রাবাহ ইবনে আব্দুর রহমানের দাদি থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে হাদিস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, যে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে না তার কোনো ওজু নেই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আয়েশা, আবু হুরায়রা, আবু সায়িদ খুদরি, সাহ্‌ল ইবনে সাদ ও আনাস (রা.) থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, 'ইমাম আহমদ (র.) বলেছেন, আমি এ অনুচ্ছেদে এমন কোনো হাদিস সম্পর্কে জানি না, যেটির সনদ উত্তম। ইসহাক (র.) বলেছেন, যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ বর্জন করে, তাহলে পুনরায় ওজু করে নেবে। আর যদি ভুলক্রমে অথবা তা'বিল করে বিসমিল্লাহ বাদ দেয় তবে তা যথেষ্ট হবে।

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বলেছেন, রাবাহ ইবনে আব্দুর রহমানের হাদিসটি এই অনুচ্ছেদে সর্বোত্তম হাদিস।

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, রাবাহ ইবনে আব্দুর রহমান তাঁর দাদি থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে (বর্ণনা করেছেন) আর তাঁর পিতার নাম হলো, সায়িদ ইবনে জায়দ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল। পক্ষান্তরে আবু ছিফাল মুর্‌রির নাম হলো, ছুমামা ইবনে হুসাইন। রাবাহ ইবনে আব্দুর রহমান হলেন আবু বকর ইবনে হুয়াইতিব। এদের অনেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আবু বকর ইবনে হুয়াইতিব থেকে এ হাদিসটি বর্ণিত। তিনি এ হাদিসটি সম্বন্ধযুক্ত করেছেন তাঁর দাদার দিকে।

দরসে তিরমিযী

نصر بن على : তিনি নাসর ইবনে আলি আল-জাহ্‌জামি। সিহাহ সিত্তা লেখকদের উস্তাদ। দশম শ্রেণীর সাথে সম্পৃক্ত। তিনি বসরি, সেকাহ্।

بشر بن معاذ العقدى : বিশর ইবনে মু'আজ আল-আকাদি। ইমাম তিরমিযীর উস্তাদ। দশম শ্রেণীর মুহাদ্দিস, সেকাহ্।

بشر بن المفضل : বিশর ইবনে মুফাজ্জাল। নির্ভরযোগ্য আবেদ।

عبد الرحمن بن حرملة : সত্যবাদী তথা মা'মুলি ধরনের রাবি।

أبى ثفال المرى : তাঁর পূর্ণ নাম হচ্ছে ছুমামা ইবনে ওয়াইল ইবনে হুসাইন। কোনো কোনো সময় দাদার দিকে সম্বোধন করে ছুমামা ইবনে হুসাইনও বলা হয়। তিনি সত্যবাদী তথা মা'মুলি ধরনের রাবি।

رباح بن عبد الرحمن : সত্যবাদী। অর্থাৎ, মা'মুলি ধরনের বর্ণনাকারি। অবশ্য কোনো কোনো সময় তাঁর ওহাম বা ভ্রম হয়ে যায়।

عن جدته : এর দ্বারা উদ্দেশ্য আসমা বিনতে সায়িদ ইবনে জায়দ। অনেকে তাঁকে মহিলা সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবার অনেকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন অজ্ঞাতদের।

عن أبيها : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হজরত সায়িদ ইবনে জায়েদ (রা.)। যিনি আশারায়ে মুবাশ্‌শারার অন্তর্ভুক্ত।

لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله : ওজুতে বিসমিল্লাহ কি মর্যাদা? এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের সামান্য মতপার্থক্য আছে। ১) হানাফি, শাফেয়ি, হাম্বলি ও মালেকি সবার থেকে একটি বর্ণনা হলো এটি সুন্নত। ২) আরেকটি বর্ণনা হলো এটি মুস্তাহাব। হানাফিদের মধ্য থেকে হেদায়া গ্রন্থকার মুস্তাহাবের বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ৩) অবশ্য হানাফিদের মধ্য থেকে শায়খ ইবনে হুমাম (র.) বিসমিল্লাহ ওয়াজিব বলে মত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর বিশিষ্ট শিষ্য আল্লামা কাসেম, ইবনে কাতলুবুগা (র.) বলেন, تفردات شيخي غير مقبولة 'আমার শায়খের একক বক্তব্যগুলো গ্রহণযোগ্য নয়।' ইমাম ইবনে হুমাম (র.) প্রায় দশটি স্থানে স্বতন্ত্র ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তার মধ্যে একটি এটি। ইমাম মালেক (র.) থেকে সুন্নত এবং মোস্তাহাব সংক্রান্ত বর্ণনা ছাড়াও বিদআত বলেও একটি বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু কাজি আবু বকর ইবনে আরাবি (র.) বিদআতের বর্ণনাটিকে অস্বীকার করেছেন। শাফেয়ি এবং মালেকিদের নিকট বিশুদ্ধতম বক্তব্য হলো, ওজুতে বিসমিল্লাহ বলা মাসনুন। হাম্বলিদের দুটি বর্ণনা থেকে মোস্তাহাবের বর্ণনাটিকে আল্লামা ইবনে কুদামা (র.) প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি ফিকহে হাম্বলির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারি। ইমাম আহমদ (র.)-এর দিকে ওয়াজিবের সম্বোধন বিশুদ্ধ নয়। কারণ, ইবনে কুদামা (র.) তাঁর দুটি বর্ণনাই উল্লেখ করেছেন। এতে বোঝা গেলো, চার ইমামের কেউ বিসমিল্লাহ ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা নন। অবশ্য ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ এবং কোনো কোনো আহলে জাহের এই বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করে বলেন, ওজুতে বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব। তাদের মতে যদি জেনে বুঝে বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেয় তবে পুনরায় ওজু করা ওয়াজিব, আর ভুলে ছেড়ে দিলে মাফ তথা– প্রয়োজন হবে না।

এ অধ্যায়ের জমহুর হাদিসে নফিকে (না-কে) অপূর্ণাঙ্গতার ওপর প্রয়োগ বলে উল্লেখ করেন, অবৈধতার ওপর নয়। যেমন হাদিসে রয়েছে,

لا صلوة لجار المسجد إلا في المسجد .

دار قطني ج١ كتاب الصلوة باب الحث لجار المسجد على الصلوة فيه الا من عذر : ص٤٢٠-

'মসজিদের প্রতিবেশির নামাজ মসজিদ ছাড়া অন্যত্র হয় না।'

এই সদার্থের কয়েকটি কারণ আছে,

১. বিসমিল্লাহ ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি কেনো শক্তিশালী বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং এ অধ্যায়ের হাদিসটিও সবগুলো সনদে দুর্বল। যেমন, ইমাম আহমদ (র)-এর বক্তব্য স্বয়ং ইমাম তিরমিযী (র.) বর্ণনা করছেন যে,

لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد

'এই অনুচ্ছেদে উত্তম সনদবিশিষ্ট কোনো হাদিস সম্পর্কে আমার জানা নেই।'

এর কারণ হলো, এই অনুচ্ছেদের হাদিসটি নির্ভর করে রাবাহ ইবনে আব্দুর রহমানের ওপর। 'আত্-তালখিসুল হাবির' : ১/৭৪-এ হাফেজ ইবনে হাজার (র.) তাঁকে অজ্ঞাত সাব্যস্ত করেছেন। তাছাড়া হাফেজ (র.) ইমাম আবু জুরআ' (র) এবং আবু হাতেম (র.)-এর বক্তব্যও বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরাও রাবাহকে অজ্ঞাত বলেছেন।

০ এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, ইমাম ইবনে হাব্বান (র.) রাবাহকে কিতাবুস্ সিকাতে উল্লেখ করেছেন; কিন্তু এর জবাব হলো, 'তাদরিবুর রাবি'তে আল্লামা সুয়ুতি (র.) স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন, ইমাম

ইবনে হাব্বান (র.)-এর পরিভাষা জমহুরে মুহাদ্দিসিন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেটা হলো, যদি কোনো ব্যক্তি থেকে কোনো নির্ভরযোগ্য রাবি বর্ণনা করেন তাহলে তিনি তাঁর অজ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও তাকে নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করেন। অতএব, শুধু ইবনে হাব্বানের 'কিতাবুস্ সিকাতে' কোনো রাবির উল্লেখ থাকার ফলে এটা আবশ্যক নয় যে, সে রাবিও বাস্তবে নির্ভরযোগ্য হবেন।

এ অধ্যায়ের হাদিসটিতে দ্বিতীয় দুর্বলতা রয়েছে এ কারণে যে, তাতে আবু ছিফাল আল-মুররি নামক একজন বর্ণনাকারি রয়েছেন। মাজমাউজ জাওয়ায়িদে আল্লামা হায়সামি (র.) লিখেছেন,

قال البخاری فی حدیثه نظر . অর্থাৎ, ইমাম বোখারি (র.) বলেছেন– তার হাদিস প্রশ্নসাপেক্ষ।

২. অনেক সাহাবি রাসূলে আকরাম ﷺ-এর ওজুর বিবরণ সবিস্তারে দিয়েছেন। তাতে কোথাও বিসমিল্লাহর আলোচনা পাওয়া যায় না। যদি বিসমিল্লাহ পড়া ওয়াজিব হতো, তবে সেসব হাদিসে এর আলোচনা অবশ্যই হওয়ার কথা ছিলো।

৩. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) প্রমুখ থেকে মারফূ সূত্রে দারাকুতনি ও বায়হাকিতে বর্ণিত আছে,

من توضأ فذكر اسم الله على وضوئه كان طهورا لجسده قال و من توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لاعضائه١ -(دار قطنی جـ١ صـ٧٤ و ٧٥) باب التسمية على الوضوء وسنن كبرى بيهقى جـ١ صـ٤٤ باب التسمية على الوضوء .

'যে ওজুর সময় আল্লাহর নাম নিয়ে ওজু করবে সেটি তার গোটা দেহের পবিত্রতার কারণ হবে। বর্ণনাকারি বলেন, আর যে আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে ওজু করবে সেটি হবে তার ওজুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পবিত্রতার কারণ।'

এমনভাবে বায়হাকি ১/৪৫তে এই অধ্যায়ে হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকেই বর্ণিত আছে,

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ وذكر اسم الله تطهر جسده كله ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يتطهر الا موضع الوضوء .

'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে ওজু করবে তার পুরো দেহ পবিত্র হবে। আর যে আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে ওজু করবে তার শুধু ওজুর স্থানই পবিত্র হবে।'

এ থেকে বোঝা গেলো যে, বিসমিল্লাহ ছাড়াও ওজু মকবুল হয়।

০ এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, এ হাদিসটি জয়িফ। কেনোনা, হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর এ বর্ণনায় মিরদাস ইবনে মুহাম্মদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, এরা দু'জনই জয়িফ এবং এ হাদিসটি দারাকুতনি এবং বায়হাকি (র.) হজরত ইবনে উমর (রা.) থেকেও বর্ণনা করেছেন। তাতে আবু বকর আদ-দাহেরি নামক এক অপাংক্তেয় রাবি রয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি নিজের পক্ষ থেকে মনগড়া হাদিস বানাতেন। বায়হাকি এবং দারাকুতনি (র.) এই বর্ণনাটি হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণনা করেছেন। তাতে ইয়াহইয়া ইবনে হাশেম সিমসার নামক একজন রাবি রয়েছেন অপাংক্তেয়। এ হাদিসটিই আব্দুল মালেক ইবনে হাবিব ইসমাইল ইবনে আইয়াশ আবান সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটি দুর্বলতম মুরসাল। মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাতে : ১/৩ এ হাদিসটি এই শব্দেই হজরত আবু বকর সিদ্দিক (র.) থেকেও মাওকুফ সূত্রে বর্ণিত আছে। কিন্তু এতে লাইছ ইবনে আবু সুলায়ম এবং হাসান ইবনে উমারা নামক দুজন রাবি সম্পর্কে আপত্তি রয়েছে। অতএব, এ বর্ণনাটি দুর্বল। কিন্তু এর জবাব হলো, যেমনভাবে এ অধ্যায়ের হাদিসটিকে দুর্বলতা সত্ত্বেও বিভিন্ন সূত্রের কারণে গ্রহণ করে নেয়া হয়েছে এমনভাবে এ হাদিসটিও অনেক সূত্রের কারণে হাসান লিগায়রিহির পর্যায়ে উপনীত।

টীকা- ১. এ হাদিসটির তাহকিকের জন্য দ্রষ্টব্য 'আল-কাওকাবুদ্ দুররি'র টীকা ১/২৪ এবং 'তালখিসুল হাবির'-হাফেজ ইবনে হাজার : ১/৭৬, সুনানুল ওজু।

৪. আছারুস্ সুনান : ৩০-এ 'মু'জামে সগির' তাবারানীর বরাতে আল্লামা নিমবি (র.) হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর একটি মরফু' হাদিস লিখেছেন,

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريرة اذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله فان حفظتك لا تبرح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء .

'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আবু হুরায়রা! যখন তুমি ওজু কর তখন বলো বিসমিল্লাহ, ওয়ালহামদুলিল্লাহ। কেনোনা, তোমার রক্ষক ফেরেশতারা এই ওজু থেকে অপবিত্র হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তোমার জন্য নেকি লিখতেই থাকবে।'

'মাজমাউজ জাওয়ায়িদ' : ১/২২০ বাবুত্ তাসমিয়াতি ইনদাল ওজুতে আল্লামা হায়সামি (র.) এ হাদিসটি উল্লেখ করে বলেছেন, এ হাদিসটির সনদ হাসান। এ হাদিসটি (বিসমিল্লাহ) মোস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট। কেনোনা, এতে আলহামদুলিল্লাহ বলারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যার আবশ্যকতার কথা কেউ বলেন না।

৫. আল্লামা উসমানি (র.) ই'লাউস্সুনান : ১/৪৪তে স্বীয় মাজহাবের ওপর এ মারফু' হাদিসটি দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, আল্লামা আলি আল-মুত্তাকি (র.) যেটি কানজুল উম্মাল[১] আদাবুল ওজুতে ইমাম মুস্তাগফিরি (র.)-এর 'কিতাবুদ্ দাওয়াত'-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন,

عن البراء (رض) مرفوعا ما من عبد يقول حين يتوضأ بسم الله ثم يقول لكل عضو أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقول حين يفرغ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الا فتحت له ثمانية ابواب الجنة يدخل من أيها شاء فان قام من فوره ذلك فصلى ركعتين يقرأ فيهما ويعلم ما يقول انفتل من صلوته كيوم ولدته امه ثم يقال له استأنف العمل .

'মারফুরূপে বারা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যে কোনো বান্দা ওজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলবে তারপর প্রতিটি অঙ্গ (ধৌত করার) সময় বলবে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু। জান্নাতের আটটি দরজাই তার জন্য খুলে দেওয়া হবে। যে কোনো একটি দিয়ে ইচ্ছে সে প্রবেশ করতে পারবে। যদি তৎক্ষণাত উঠে দু'রাকাত নামাজ পড়ে তাতে কেরাত পাঠ করে এবং যা পড়ে তা সে জানে বুঝে, তাহলে তার নামাজ থেকে তার মা হতে সদ্য প্রসূত সন্তানের মতো সে প্রত্যাবর্তন করবে। তারপর তাকে বলা হবে, আমল শুরু করো নতুনভাবে।

এ হাদিসটিকে আল্লামা মুস্তাগফিরি (র.) হাসান দুর্বল বলেছেন। এ হাদিসটিতে বিসমিল্লাহকে অন্যান্য মাসনুন জিকিরের সাথে ফজিলতের কারণ সাব্যস্ত করেছেন। অন্যান্য জিকির সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব নয়। অতএব, বিসমিল্লাহও ওয়াজিব হবে না; বরং মোস্তাহাব ও মাসনুন হবে।

৬. হানাফিদের উসুল মুতাবেক বিসমিল্লাহ ওয়াজিব না হওয়ার ওপর একটি মৌলিক দলিল হলো, বিসমিল্লাহ প্রমাণিত হয়েছে খবরে ওয়াহিদগুলো দ্বারা। অথচ খবরে ওয়াহিদের মাধ্যমে কিতাবুল্লাহর ওপর বৃদ্ধি জায়েজ হতে পারে না।

৭. বিসমিল্লাহ পাঠ ওয়াজিব না হওয়ার ওপর ইমাম তাহাবি (র.) হজরত মুহাজির ইবনে কুনফুজ (রা.)-এর একটি বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন,

قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فسلمت عليه فلم يرد على فلما فرغ من وضوئه قال إنه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني كنت على غير طهر[১]

টীকা -১. ইমাম নাসায়ি (র.) বাবু রদ্দিস্ সালাম বা'দাল ওজুতে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান সহিহ ইবনে হাব্বানে এবং হাকেম মুস্তাদরাকে কিছু শাব্দিক পরিবর্তন সহকারে বর্ণনা করেছেন। –মা'আরিফুস্ সুনান : ১/১৫৬।

'তিনি বলেন, আমি দেখলাম নবী করিম ﷺ ওজু করছেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম; কিন্তু তিনি আমাকে সালামের জবাব দিলেন না। ওজু থেকে অবসর হয়ে তিনি আমাকে বললেন, তোমাকে সালামের জবাব দিতে আমার সামনে প্রতিবন্ধক ছিলো শুধু এটি যে, তখন আমি পবিত্র অবস্থায় ছিলাম না।'

প্রমাণের কারণ হলো, عليكم السلام -এ স্পষ্টভাবে আল্লাহর নাম নেই। তা সত্ত্বেও প্রিয়নবী ﷺ তা বর্জন করেছেন। তাহলে বিসমিল্লাহ যাতে স্পষ্টাকারে আল্লাহর নাম বিদ্যমান রয়েছে সেটা প্রিয়নবী ﷺ ওজুবিহীন অবস্থায় কিভাবে পড়তে পারেন?

০ এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, এ বর্ণনা দ্বারা তো ওজুর সময় বিসমিল্লাহ পড়া মাকরূহ মনে হয়। অথচ এর প্রবক্তা কেউ নেই। এর জবাব হজরত শাহ সাহেব (র.) এই দিয়েছেন যে, ইমাম তাহাবি (র.)-এর মূল উদ্দেশ্য হলো, এ হাদিস দ্বারা বিসমিল্লাহ ওয়াজিব নয় এটা বোঝা গেছে, বাকি রইলো এর মাসনুন ও মোস্তাহাব হওয়ার বিষয়টি। আর এটা এ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় না। এটা প্রমাণ করার জন্য অন্যান্য বর্ণনা রয়েছে।

তবে ইনসাফের কথা হলো, এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ দুর্বল। কারণ স্বয়ং প্রমাণদাতারাও এটাকে সেকালের জন্য প্রযোজ্য ধরেন, যখন আল্লাহর জিকির বিনা ওজুতে জায়েজ ছিলো না এবং এটাও মানেন যে, পরবর্তীতে এটা জায়েজ হয়ে গেছে। অতএব, এটা কেনো হতে পারবে না যে, বিসমিল্লাহ পাঠ এই ঘটনার পর ওয়াজিব হয়ে থাকবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ (ص ٤)

অনুচ্ছেদ- ২১ : কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া প্রসঙ্গে (মতন ১৪)

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَثِرْ وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ ـ

২৭. অর্থ : হজরত সালামা ইবনে কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তুমি যখন ওজু করো তখন নাক ঝাড়ো। আর যখন ঢিলা ব্যবহার করো তখন বিজোড় ব্যবহার করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এ অনুচ্ছেদে উসমান লাকিত ইবনে সাবিরা, ইবনে আব্বাস, মিকদাম ইবনে মা'দি কারিব, ওয়াইল ইবনে হুজ্র এবং আবু হুরায়রা (রা.) হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'সালামা ইবনে কায়সের হাদিসটি حسن صحيح। যে কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া তরক করবে তার সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ হয়েছে। একদল বলেছেন, যদি ওজুতে এই দুটি তরক করে নামাজ পড়ে তাহলে তা পুনরায় পড়ে নিবে। ওজু এবং গোসল ফরজ উভয় অবস্থাতে এটাকে তারা সমান মনে করেন। ইবনে আবু লায়লা, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর মাজহাব এটাই।

ইমাম আহমদ (র.) বলেন, নাকে পানি দেওয়া কুলি করার চেয়ে অধিক তাকিদপূর্ণ।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'আরেক দল আলেম বলেন, ফরজ গোসল অবস্থায় হলে নামাজ পুনরায় পড়ে নিবে আর ওজুতে হলে দোহরাবে না। এটাই হলো, সুফিয়ান সাওরি ও কোনো কোনো কুফাবাসীর বক্তব্য। আরেক দল বলেন, ওজুতে হলে দোহরাবে না, এমনিভাবে জানাবাত তথা গোসল ফরজ হলেও। কারণ, এ দুটো রাসূল ﷺ-এর সুন্নত। অতএব, যে এই দুটো ওজু এবং গোসল ফরজকালে তরক করবে তার ওপর (নামাজ) দোহরানো ওয়াজিব নয়। এটা হলো, ইমাম মালেক ও শাফেয়ি (র.)-এর বক্তব্য।

দরসে তিরমিযী

مضمضة : এর অর্থ হলো تحريك الماء فى الفم ثم مجه মুখে পানি নারা-চারা দিয়ে তা ফেলে দেওয়া তথা কুলি করা। এতে বোঝা গেলো, মাজমাজা হলো পানি মুখের ভিতরে ঢুকানো, নারা-চারা দেওয়া এবং বাইরে ফেলে দেওয়ার সমষ্টির নাম। আর مج শুধুমাত্র বাইরে ফেলার নাম। استنشاق শব্দটি গৃহিত نشق، ينشق، نشقا থেকে। যার অর্থ হলো, ادخال الريح فى الأنف তথা নাকে ঘ্রাণ শুকা এবং باب إستفعال থেকে এর অর্থ হলো ادخال الماء فى الأنف অর্থাৎ, নাকে পানি দেওয়া। এর পরিপন্থী انتثار অথবা استنثار -এর অর্থ হলো, اخراج الماء من الأنف অর্থাৎ, নাক থেকে পানি ফেলা।

حماد بن زيد : সেকাহ রাবি।

جرير : তাঁর সম্পর্কে অনেক রিজাল, শাস্ত্রবিদ আপত্তি করেছেন। কেনোনা শেষ বয়সে তাঁর স্মরণশক্তি কমে এসেছিলো।

عن منصور : এর দ্বারা উদ্দেশ্য মানসুর ইবনুল মু'তামির। যিনি কুফার সেকাহ রাবিদের অন্তর্ভুক্ত।

هلال بن يساف : অধিকাংশ মুহাদ্দিস ى -এর মধ্যে লিখেছেন যের সহকারে। আল্লামা খাজরাজি (র.) ى এর মধ্যে যবর সহকারে লিখেছেন। তিনি মধ্যম ধরনের তাবেয়ি এবং সেকাহ।

اذا توضأت فانتثر : এ হাদিসে রয়েছে শুধু নাক ঝাড়ার কথা। অথচ শিরোনামে কুলির কথাও আলোচিত হয়েছে। এই অসামঞ্জস্যতার বিভিন্ন জবাব দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম হলো, ইমাম তিরমিযী (র.) وفى الباب-এর মাধ্যমে যেসব বর্ণনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, সেগুলোতে কুলির কথা রয়েছে।

০ সামান্য মতবিরোধ কুলি এবং নাকে পানি দেওয়ার মর্যাদা সম্পর্কে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযী (র.) তিনটি মাজহাব উল্লেখ করেছেন,

প্রথম মাজহাব : ইবনে আবু লায়লা, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক (র)-এর। তাঁরা কুলি এবং নাকে পানি দেওয়া উভয়টিকে ওজু এবং গোসল উভয়তেই ওয়াজিব বলেন। এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা ওয়াজিব বলে প্রমাণ পেশ করেন; যাতে নাক ঝাড়ার ব্যাপারে নির্দেশসূচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা কুলি করা ওয়াজিবও প্রমাণিত হয়। কারণ, উভয়ের মাঝে পার্থক্যের প্রবক্তা কেউ নেই। তাছাড়া কুলি করা ওয়াজিব হওয়ার স্বপক্ষে তাদের প্রমাণ হিসেবে আরেকটি বর্ণনাও আছে। আবু দাউদ শরিফে লাকিত ইবনে সাবিরা (র.) থেকে বর্ণিত আছে,

اذا توضأت فمضمض وقال الحافظ فى الفتح إن اسنادها صحيح[১] -

'যখন তুমি ওজু করো তখন কুলি করো।' 'ফাতহুল বারি'তে হাফেজ (র.) বলেছেন, এই হাদিসটির সনদ বিশুদ্ধ।'

২য় মাজহাব : ইমাম মালেক (র.) এবং ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর। কুলি এবং নাকে পানি দেওয়া ওজু-গোসল উভয়টিতে তাঁদের মতে সুন্নত। তাঁদের প্রমাণে عشر من الفطرة[২] (দশটি কাজ স্বভাবজাত) সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ হাদিসটি। তাতে কুলি এবং নাকে পানি দেওয়াকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া আবু দাউদ শরিফে একটি বর্ণনা আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বেদুইনকে বলেছেন, توضأ كما أمرك الله (আল্লাহর নির্দেশ মতো ওজু করো) এবং কোরআন কারিমে কুলি এবং নাকে পানি দেওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার কোনো নির্দেশ নেই।

টীকা– ১. নাইলুল আওতার, বাবুল মাজমাজাতি ওয়াল ইস্‌তিনশাক : ১/১২২।

টীকা– ২. হজরত আয়েশা (রা.)-এর হাদিস। আবু দাউদ শরিফ : ১/৮ বাবুন আস-সিয়ায়াকু মিনাল ফিতরাহ। তাছাড়া হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.)-এর বর্ণনা এ অনুচ্ছেদে বিদ্যমান রয়েছে,

قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الفطرة المضمضة والإستنشاق الحديث، رشيد أشرف سيفى عفى عنه -

'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া ফিতরাত বা স্বভাবজাত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।'

এতে বোঝা গেলো– এগুলো ওয়াজিব নয়। শাফেয়ি এবং মালেকি মতাবলম্বীগণ এবং অধ্যায়ের হাদিসে উল্লিখিত নির্দেশসূচক শব্দটিকে মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরেন।

৩য় মাজহাব : হানাফিয়া এবং সুফিয়ান সাওরি প্রমুখের। কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া তাঁদের মতে ওজুতে সুন্নত, গোসলে ওয়াজিব।

ওজু প্রসঙ্গে হানাফিদের দলিল সেটিই যেটি শাফেয়ি এবং মালেকি মতাবলম্বীদের। তাছাড়া হানাফিদের মাজহাবের ওপর অন্যান্য শক্তিশালী প্রমাণাদি আছে।

১. হজরত গাঙ্গুহি (র.) গোসলের ক্ষেত্রে وان كنتم جنبا فاطهروا (তোমরা যখন অপবিত্র তথা গোসল ফরজ অবস্থা থাকবে, তখন ভালোরূপে পবিত্রতা অর্জন কর।) দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। তাতে আতিশয্য জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ হলো, গোসলের পবিত্রতা ওজুর পবিত্রতা অপেক্ষা বেশি হওয়া উচিত। এবার এই বেশি রূপের দিক দিয়ে হবে অথবা ধরনের দিক দিয়ে। রূপের দিকে দিয়ে বৃদ্ধি শরিয়তে বিদিত নয়। অতএব, অবশ্যই এই বৃদ্ধি হবে পরিমাণগতভাবে। তারপর এই পরিমাণগত বৃদ্ধি হতে পারে দুভাবে,

এক. ধোয়ার পরিমাণে বৃদ্ধি করা।

দুই. ধোয়ার অঙ্গগুলোতে বৃদ্ধি করা।

ধোয়ার সংখ্যায় বৃদ্ধি করারও কোনো পথ নেই। কেনোনা হাদিস শরিফে আছে,

فمن زاد على هذا فقد تعدى وظلم

'যে এর চেয়ে বেশি করবে সে সীমালঙ্ঘন ও জুলুম করবে।'

অতএব প্রমাণিত হলো, এ বৃদ্ধি হবে ধোয়ার অঙ্গগুলোতে। তারপর এরও দুটি পদ্ধতি রয়েছে–

এক. যেসব অঙ্গ ধৌত করার কথা ওজুর মধ্যে একেবারেই নেই, গোসলে সেগুলোকে ধৌত করা। যেমন, বুক, পেট ইত্যাদি।

দুই. যেসব অঙ্গকে ধৌত করা ওজুতে সুন্নত ছিলো, সেগুলোকে গোসলে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা। যেমন কুলি এবং নাকে পানি দেওয়া। এই দ্বিতীয় প্রকার আতিশয্যের দাবি হলো, কুলি এবং নাকে পানি দেওয়াকে গোসলে ওয়াজিব ধরা।

২. সুনানে দারাকুতনি : ১/১১৫তে ইমাম দারাকুতনি (র.) باب ما روى فى المضمضة والإستنشاق فى غسل الجنابة শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় কায়েম করেছেন। তাতে হযরত মুহাম্মদ ইবনে সিরিন (র.) থেকে মুরসাল সূত্রে এ বর্ণনাটি বর্ণনা করেছেন,

قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإستنشاق من الجنابة ثلاثا .

'রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন ফরজ গোসলে তিনবার নাকে পানি দেওয়ার জন্য। এর সনদ সহিহ। যেটি ইমাম দারাকুতনি (র.)-ও স্বীকার করেছেন। মুরসাল বর্ণনা আমাদের মতেও প্রমাণ। বিশেষত মুহাম্মদ ইবনে সিরিনের মুরসালগুলো সবচেয়ে শক্তিশালী মুরসালের অন্তর্ভুক্ত। তাই 'মিনহাজুস্ সুন্নাহ' নামক গ্রন্থে আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ (র.) উল্লেখ করেছেন,

ومحمد بن سيرين من أورع الناس فى منطقة ومراسيله من اصح المراسيل .

'তথা কথাবার্তায় মুহাম্মদ ইবনে সিরিন সবচেয়ে পরহেজগার ব্যক্তিত্ব। তাঁর মুরসালগুলো হলো বিশুদ্ধতম।'

আর শাফেয়ি মতাবলম্বীরাও গ্রহণ করেন মুহাম্মদ ইবনে সিরিনের মুরসালগুলোকে। 'মুকাদ্দামায়ে শরহুল মুহাজ্জাবে' ইমাম নববি (র.) স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন– এ হাদিসে من الجنابة শর্তারোপ স্পষ্ট ভাষায় বলছে যে, কুলি এবং নাকে পানি দেওয়ার যে হুকুম ফরজ গোসলের অবস্থায় প্রদত্ত হয়েছে, সেটি ওজুর হুকুম থেকে উঁচু পর্যায়ের। যেহেতু এ বিষয়টি সর্বসম্মত যে, ওজুতে কুলি এবং নাকে পানি দেওয়া অন্তত্পক্ষে সুন্নত। সুতরাং গোসলের ক্ষেত্রে এটিকে ওয়াজিবই বলা যেতে পারে।

৩. ইমাম দারাকুতনি (র.) باب ماروى فى المضمضة والإستنشاق فى غسل الجنابة-তে আবু হানিফা (র.) ইবনে রাশেদ-আয়েশা বিনতে আজরাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো গোসল ফরজবিশিষ্ট যে ব্যক্তি কুলি এবং নাকে পানি দিতে ভুলে যায়, তার কি হুকুম? তখন হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) জবাব দিলেন,

يمضمض ويستنشق ويعيد الصلوة ـ

'সে কুলি করবে এবং নাকে পানি দিবে ও নামাজ দোহরিয়ে নিবে।' –দারাকুতনি : ১/১৬১

হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এ ফত্ওয়া হানাফিদের মতের স্বপক্ষে সুস্পষ্ট। ইমাম দারাকুতনি (র.)-এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, عائشة بنت عجرد لا تقوم بها حجة তথা আয়েশা বিনতে আজরাদ প্রমাণযোগ্য ব্যক্তিত্ব নন। কিন্তু ইমাম দারাকুতনির এই প্রশ্ন হানাফিদের জন্য ক্ষতিকর নয়। কারণ, আয়েশা বিনতে আজরাদ সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে যে, তিনি সাহাবি কি-না? যেমন 'মিজানুল ই'তিদালে'[১] ইমাম জাহাবি (র.) এবং 'লিসানুল মিযানে'[২] হাফেজ ইবনে হাজার (র.) তা লিখেছেন।

তাঁকে যদি সাহাবি স্বীকার করা হয় তবে তো কোনো প্রশ্নই নেই। لان الصحابة كلهم عدول কারণ, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম শরিয়তের অনুসারী ও নির্ভরযোগ্য। আর যদি তাবেয়ি সাব্যস্ত করা হয় তাহলেও তাঁর নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে এটুকুই যথেষ্ট যে ইমাম আবু হানিফা (র.) তাঁর সূত্রে শুধু হাদিসই বর্ণনা করেননি, বরং এই মাসআলাতে তাঁর বর্ণনার ওপর নিজ মাজহাবের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। ইমাম দারাকুতনি (র.), ইমাম শাফেয়ি (র.), হাফেজ জাহাবি (র.) অথবা হাফেজ ইবনে হাজার (র.) তাঁর সম্পর্কে সর্বোচ্চ এটা বলতে পারেন যে, তাঁর হাল অজানা। কিন্তু ইমাম আবু হানাফি (র.) প্রত্যক্ষভাবে আয়েশা বিনতে আজরাদ থেকে শুনেছেন। অতএব, তাঁর সম্পর্কে তিনি যতোটা ওয়াকিফহাল হতে পারেন, অন্যরা ততোটা ওয়াকিফহাল হতে পারেন না। অতএব, যদি অন্যান্যের নিকট তিনি অজ্ঞাত হয়ে থাকেন তবে এটা ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর বিরুদ্ধে প্রমাণ হবে না। তাছাড়া আল্লামা উসমানি (র.) 'ই'লাউস্ সুনানে' বলেছেন– 'তাজরিদ' : ১/৩০২ এ হাফেজ জাহাবি (র.) লিখেছেন যে, ইমাম আবু হানিফা (র.) ছাড়া হাজ্জাজ ইবনে আরতাত ও আয়েশা বিনতে আজরাদও হাদিস বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে মূলনীতি হলো, যে ব্যক্তি থেকে দুজন বর্ণনা করেন, তিনি আর অজ্ঞাত থাকেন না। তাছাড়া ইয়াহইয়া ইবনে মাইন (র.) আয়েশা বিনতে আজরাদকে পরিচিত সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, لها صحبة অর্থাৎ, তিনি সাহাবি। তাই এই প্রমাণটি প্রশ্নের ক্ষেত্রে হতে পারে না।

৪. সুনানের লেখকগণ হজরত আলি (র.)-এর একটি প্রসিদ্ধ হাদিস উল্লেখ করেছেন,

تحت كل شعرة جنابة[৩] فاغسلوا الشعر وانقو البشرة ـ

'প্রতিটি পশমের নিচে রয়েছে জানাবাত। অতএব, প্রতিটি পশম ধৌত করো এবং চামড়া পরিচ্ছন্ন করো।'

আর নাকের মধ্যেও পশম থাকে। সুতরাং সে অংশটুকু ধোয়া ওয়াজিব হবে। যখন নাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব হবে তখন কুলি করাও ওয়াজিব হবে। কেনোনা, কেউ উভয়ের মাঝে পার্থক্যের পক্ষে নেই।

৫. গোসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা কুলি করতেন এবং নাকে পানি দিতেন; কখনো তা বর্জন করেননি। যেটি ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ।

প্রশ্ন : এখানে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, সর্বদাতো ওজুও করেছেন?

জবাব : তবে এর জবাব হবে এই যে, সর্বদা ওজু করার বিষয়টি প্রমাণিত খবরে ওয়াহেদ দ্বারা। সর্বদা করার কারণে কুলি এবং নাকে পানি দেওয়াকে যদি ওজুতেও ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে খবরে ওয়াহেদ দ্বারা

টীকা- ১. ইমাম জাহাবি (র.) বলেন, আমার উক্তি হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা (র.) তাঁর সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে উসমান ইবনে আবু রাশিদও। বলা হয় তিনি সাহাবিয়া। তবে এটা প্রমাণিত হয়নি। –মিজানুল ই'তিদাল।

টীকা- ২. দ্রষ্টব্য ৩/২২৭। কারণ তিনি তাঁর সাহাবি হওয়ার ব্যাপারে বক্তব্য সংক্রান্ত ভ্রান্তির মূল কারণ উল্লেখ করেছেন।

টীকা- ৩. ইমাম তিরমিযী মারফূ' সূত্রে باب ما جاء ان تحت كل شعرة جنابة অধ্যায়ে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

কিতাবুল্লাহর ওপর সংযোজন আবশ্যক হবে। কারণ, ওজুর ধোয়ার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো আল্লাহর কিতাব সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এর পরিপন্থী গোসলে এ'দুটোকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করলে কিতাবুল্লাহর ওপর কোনো প্রকার সংযোজন হয় না। কেনোনা কিতাবুল্লাহতে গোসলের বিস্তারিত পদ্ধতি বর্ণিত হয়নি; বরং শুধু فاطهروا। তথা ভালো করে পবিত্রতা অর্জন কর– এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই শব্দটি দ্বারা ওয়াজিব হওয়ারই সহায়তা হয়। সুতরাং এসব খবরে ওয়াহেদ-এর ব্যাখ্যা হবে। এর জন্য রহিতকারি হবে না, আর কোরআনের ওপর সংযোজনও হবে না।

وبعض أهل الكوفة : এর দ্বারাও উদ্দেশ্য হানাফিগণ। ইমাম তিরমিযী (র.) নিজ গ্রন্থে কোথাও ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর বক্তব্য নাম উল্লেখপূর্বক আলোচনা করেননি। এর ফলে অনেকে মনে করেছেন যে, তিনি হানাফিদের এতোটাই বিরোধী যে, তাঁর নাম উচ্চারণও বরদাশত করেন না। কিন্তু এই ধারণাটি ভুল। ইমাম তিরমিযী (র.) কয়েক সূত্রে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর শিষ্য। তিনি যদি হানাফিদের এতোটাই শত্রু হতেন তবে তাঁদের বক্তব্যকে আহলে ইলম বা আলেমদের বক্তব্য বলে বর্ণনা করতেন না। হজরত শাহ সাহেব (র.) বলেছেন, মূলত ইমাম তিরমিযী (র.)-এর এই কর্মপদ্ধতি ভীষণ সতর্কতার ওপর নির্ভরশীল। তাঁর পদ্ধতি হলো, তিনি শুধু তাঁদের মাজহাব স্বীয় গ্রন্থে আলোচনা করেন, যাদের বক্তব্য তাঁর নিকট মুত্তাসিল সনদে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে পৌঁছেছে। ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মাজহাব যেহেতু তাঁর নিকট মুত্তাসিল সনদে পৌঁছেনি, এজন্য তিনি তাঁর মাজহাব উল্লেখ করেন না এবং যখন উল্লেখ করেন তখন নাম উল্লেখ করে আলোচনা করেন না; বরং উল্লেখ করেন কুফাবাসীদের দিকে সম্বোধন করে।

بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ (١٤)

অনুচ্ছেদ- ২২ : এক কোষ পানি দিয়ে নাক ঝাড়া এবং কুলি করা প্রসঙ্গে (মতন ১৪)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ (رض) قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلٰثًا .

২৮. অর্থ : হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী আকরাম ﷺ-কে আমি দেখেছি তিনি কুলি করেছেন এক অঞ্জলি (পানি) দিয়ে এবং নাক ঝেড়েছেন। অনুরূপ তিনি তিনবার করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ (রা.)-এর হাদিসটি حسن غريب।

এ হাদিসটি ইমাম মালেক ও ইবনে উয়াইনাসহ আরও একাধিক ব্যক্তি আমর ইবনে ইয়াহইয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ অংশটি তাঁরা উল্লেখ করেননি যে, রাসূল ﷺ এক কোষ (পানি) দ্বারা কুলি করেছেন ও নাক পরিষ্কার করেছেন। এই অংশটুকু শুধু খালেদ ইবনে আবদুল্লাহ উল্লেখ করেছেন। বস্তুত খালেদ নির্ভরযোগ্য হাফেজ মুহাদ্দিসিনের অন্তর্ভুক্ত। আর কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'এক কোষ পানি দ্বারা নাক পরিষ্কার করা ও কুলি করা যথেষ্ট'। আর অনেকে বলেছেন, 'কুলি এবং নাক পরিষ্কার আলাদা আলাদাভাবে করা আমাদের কাছে বেশি উত্তম।

ইমাম শাফেয়ি (র.) বলেন, এক কোষ পানি দিয়ে যদি কুলি ও নাক পরিষ্কার করে তবে তা বৈধ। আর যদি আলাদা আলাদাভাবে করে তবে সেটা আমাদের মতে বেশি উত্তম।'

দরসে তিরমিযী

خالد : এর দ্বারা উদ্দেশ্য খালেদ ইবনে আবদুল্লাহ। নির্ভরযোগ্য এবং হাফেজ হওয়ার সাথে সাথে ইবাদত ও জুহদ-তাকওয়াও। ইমাম আহমদ (র.) বলেন, তিনি নিজেকে তিন বার রূপার দ্বারা মাপিয়েছেন এবং সে রূপাগুলো সদকা করে দিয়েছেন। বলেছেন,

اشتريت نفسي من الله غزو جل ـ 'আমার নিজ সত্তাকে আমি আল্লাহর কাছ থেকে কিনে নিয়েছি।"

عبد الله بن زيد : এই নামে সাহাবি আছেন দু'জন। একজন আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ ইবনে আসেম, যিনি এ হাদিসের রাবি। আর দ্বিতীয়জন হলেন, আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ ইবনে আবদে রাব্বিহি। যাঁর সাথে আজানের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো। আজান সংক্রান্ত হাদিসগুলো ব্যতিত তাঁর সূত্রে অন্য কোনো হাদিস বর্ণিত হয়নি।

مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا : কুলি এবং নাকে পানি দেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি ফুকাহায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত,

১. একত্রে এক কোষ।
২. আলাদা আলাদ এক কোষ।
৩. আলাদা আলাদা দুই কোষ।
৪. একত্রে মিলিয়ে তিন কোষ।
৫. আলাদা আলাদা[১] তিন কোষ।
৬. আলাদা আলাদা ছয় কোষ।

এ সবগুলো পদ্ধতি জমহুরের মতে বৈধ। অবশ্য এ ব্যাপারে সামান্য মতবিরোধ রয়েছে– উত্তম কোন্‌টি।

১. হানাফিদের মতে সর্বশেষ পদ্ধতিটি অর্থাৎ, আলাদা আলাদা ছয় অঞ্জলি উত্তম এবং প্রাধান্যপ্রাপ্ত। ইমাম মালেক (র.)-এরও একটি বর্ণনা অনুরূপ। ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মতও ইমাম তিরমিযী (র.) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

قال الشافعي ان جمعهما في كف واحد فهو جايز وان فرقهما فهو احب إلينا ـ

তবে এটা, ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর পুরনো বক্তব্য। যার প্রমাণ হলো, ইমাম তিরমিযী (র.) ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর বক্তব্যগুলো জা'ফরানি সূত্রে বর্ণনা করেন। আর জা'ফরানি বর্ণনা করেন তাঁর পুরনো বক্তব্যগুলোই।

২. ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর নতুন বক্তব্য যেটি আল্লামা নববি (র.) বর্ণনা করেছেন, সেটি হলো একত্রে তিন কোষ। এই বক্তব্যর ওপরই ফতওয়া শাফেয়ি মতাবলম্বীদের নিকট।

৩. ইমাম মালেক (র.)-এর দ্বিতীয় বক্তব্যটিও অনুরূপ। তাছাড়া এরই সহায়তা এ অনুচ্ছেদে হাদিসটি দ্বারাও হয়।

হানাফিদের প্রমাণাদি নিম্নেযুক্ত,

১. 'তালখিসুল হাবিরে'[১] হাফেজ ইবনে হাজার (র.) সহিহ ইবনুস সাকানের বরাতে হজরত শাকিক ইবনে সালামার থেকে বর্ণনা করেছেন,

شهدت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضأ ثلاثا وافردا المضمضة من الإستنشاق ثم قالا هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ـ

'আলি ইবনে আবু তালেব ও উসমান ইবনে আফফান (রা.)-এর সামনে আমি উপস্থিত ছিলাম। তাঁরা ওজু করেছেন তিন বার তিন বার করে। কুলি আর নাক পরিষ্কার দুটি আলাদা আলাদাভাবে করেছেন। তারপর তাঁরা বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবে ওজু করতে দেখেছি।'

এ হাদিসটি বর্ণনা করার পর হাফেজ ইবনে হাজার (র.) নীরবতা অবলম্বন করেছেন। যেটা তাঁর মতে হাদিস গ্রহণযোগ্য হওয়ার নিদর্শন। তাছাড়া 'সহিহ ইবনুস সাকানে' এ বাধ্যবাধকতাও অবলম্বন করা হয়েছে যাতে সহিহ অপেক্ষা নিম্নস্তরের কোনো হাদিস না আসে। এতে বোঝা যায়, ইবনুস্ সাকানের মতেও এ হাদিসটি صحيح।

টীকা- ১. এক কোষ একত্রে ও আলাদা দুটোই, দুই কোষ শুধু আলাদা, তিন কোষ শুধু একত্রে মিলিয়ে, ছয় কোষ শুধু আলাদা। মা'আরাফিসু সুনান : ১/১৬৬ সংকলক।

২. আবু দাউদ শরিফে باب فى الفرق بين المضمضة والإستنشاق এ তালহা ইবনে মুসার্‌রিফ-তাঁর পিতা-তাঁর দাদা সূত্রে হাদিস বর্ণিত,

قال دخلت يعنى على النبى صلى الله عليه وسلم هو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والإستنشاق .

'তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-এর নিকট প্রবেশ করেছি তখন তিনি ওজু করছিলেন। চেহারা ও দাড়ি থেকে তাঁর বুকের ওপর পানি বেয়ে পড়ছিলো। আমি তাঁকে দেখেছি তিনি কুলি এবং নাক পরিষ্কার আলাদা আলাদাভাবে করেছিলেন।'

হানাফিদের মাজহাবের পক্ষে এ হাদিসটি সুস্পষ্ট। অবশ্য এ হাদিসটির ওপর দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে–

প্রশ্ন : এক. তালহা ইবনে মুসার্‌রিফ-তাঁর পিতা থেকে, এই সূত্রটি জয়িফ। কারণ, باب صفة وضوء النبى صلى الله عليه وسلم এ সবিস্তারে ইমাম আবু দাউদ (র.) এ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন, তারপর বলেছেন,

سمعت أحمد يقول أن ابن عيينة[১] زعموا انه كان ينكر ويقول أيش هذا طلحة عن أبيه عن جده .

জবাব : যে হাদিসটি باب فى الفرق بين المضمضة ولإستنشاق এ উল্লেখ করা হয়েছে এবং যেটি আমাদের প্রমাণ সেটি সম্পর্কে তিনি নীরবতা অবলম্বন করেছেন। যেটি নিদর্শন হলো যে, হাদিসে কুলি এবং পানি দেওয়ার অংশটুকু তাঁর নিকট সহিহ। হাফেজ মুনজিরি (র.) ও সংক্ষিপ্ত আবু দাউদ এই হাদিসটির ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তাছাড়া অন্যান্য কোনো কোনো মুহাদ্দিসও এ হাদিসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন সহীহ বলে। যেমন, হাফেজ (র.) 'তালখিসুল হাবিরে' হাফেজ (র.) এর বর্ণনা দিয়েছেন।

প্রশ্ন : আরেকটি প্রশ্ন করা হয় যে, এ হাদিসটি বর্ণিত। লাইস ইবনে আবু সুলায়মান থেকে। যাকে জয়িফ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

জবাব : এর জবাব হলো, লাইস ইবনে আবু সুলায়ম মূলত নির্ভরযোগ্য আদিল। কিন্তু মুদাল্লিস হওয়ার কারণে তাঁকে জয়িফ বলা হয়েছে। অতএব, যেখানে মুহাদ্দিসিনের এই ধারণা প্রবল হয়ে যায় যে, তিনি তাদলিস করেননি, সেখানে তাঁর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হয়। আর এ হাদিসে ইমাম আবু দাউদ ও হাফেজ মুনজিরি (র.)-এর নীরবতা এর নিদর্শন যে, এ হাদিসটিতে মুহাদ্দিসিন লাইসের এবারতের ওপর নির্ভর করেছেন। তাছাড়া ইমাম তিরমিযী (র.) তাঁর হাদিসগুলো সম্পর্কে 'হাসান' বলে মন্তব্য করেছেন। কিতাবুল হজ্জ, বাবুল কিরানে তাঁর একটি হাদিসকে তিরমিযী (র.) 'হাসান' বলেছেন। অনুরূপভাবে কিতাবুদ্‌ দাওয়াতেও তার একটি হাদিসকে 'হাসান' সাব্যস্ত করেছেন। আর তালহা ইবনে মুসার্‌রিফের অজ্ঞাত হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে আল্লামা উসমানি (র.) 'এ'লাউস্‌ সুনানে' বিস্তারিত জবাব দিয়েছেন। সেখানে দেখা যেতে পারে। তাছাড়া এই বর্ণনাটি 'মু'জামে তাবারানি'তে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় এসেছে। মোটকথা এ হাদিসটি দ্বারা ছয় অঞ্জলির ফজিলত সাব্যস্ত হয়।

৩. রাসূল ﷺ-এর ওজুর বিবরণ দিয়েছেন বহু সাহাবি। সুনান লেখকগণ সেগুলো বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে হজরত আবু বকর, উসমান, আলি, আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ (রা.) প্রমুখের রেওয়ায়াতে এসেছে[২]– فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا। এসব শব্দ বাহ্যিকরূপেই আলাদা আলাদাভাবে ছয় অঞ্জলির সহায়তা করে। আর এ অনুচ্ছেদের হাদিসটিতে যে তিন অঞ্জলির সহায়তা রয়েছে সেটা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হলো, এটি প্রযোজ্য বৈধতার বিবরণের ক্ষেত্রে।

টীকা- ১. ১/৭৯, সুনানুল ওজু, হাদিস নং ৭৯, ছাপা : মদিনা মুনাওয়ারা।

টীকা- ২. এবারতটিতে আগ-পাছ হয়ে গেছে। মূল এবারতটি হলো سمعت أحمد بن حنبل يقول قال العلماء إن ابن عيينة كان ينكر هذا الحديث كما فى حاشية أبى داود . مرتب عفى عنه *' আমি আহমদ ইবনে হাম্বলকে বলতে শুনেছি ওলামায়ে কেরাম বলেছেন ইবনে উয়াইনা (র.) এ হাদিসটি প্রত্যাখ্যান করতেন; আবু দাউদের টীকা। –সংকলক।*

بَابٌ فِى تَخْلِيْلِ اللِّحْيَةِ (صـ١٤)

অনুচ্ছেদ- ২৩ : দাড়ি খেলাল করা প্রসঙ্গে (মতন ১৪)

عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ (رض) تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ فَقِيْلَ لَهُ أَوْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَتُخَلِّلُ لِحْيَتَكَ؟ قَالَ وَمَا يَمْنَعُنِيْ؟ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ.

২৯. অর্থ : হজরত হাস্সান ইবনে বিলাল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.)-কে দেখেছি, তিনি ওজু করেছেন, তারপর দাড়ি খেলাল করেছেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, অথবা রাবি বলেন, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আপনার দাড়ি খেলাল করেন? এ শুনে তিনি বললেন, এর জন্য আমার সামনে প্রতিবন্ধক কি? আমি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বীয় দাড়ি খেলাল করতে দেখেছি ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

عن عمار (رض) عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله .

৩০. অর্থ : হজরত আম্মার (রা.) সূত্রে নবী করিম ﷺ থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এই অনুচ্ছেদে আয়েশা, উম্মে সালামা, আনাস, ইবনে আবু আওফা ও আবু আইয়ূ্যব (রা.) থেকে হাদিস বর্ণিত রয়েছে,

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, ইসহাক ইবনে মানসূরকে বলতে আমি শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)কে বলতে শুনেছি, ইবনে উয়াইনা (র.) বলেছেন, আব্দুল কারিম হাস্সান ইবনে বিলাল থেকে খেলাল সংক্রান্ত হাদিস শুনেননি।

وائل عن عثمان (رض) بن عفان ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته .

৩১. অর্থ : হজরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ তাঁর দাড়ি খেলাল করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল (র.) বলেছেন, এই অনুচ্ছেদে বিশুদ্ধতম হাদিস হলো, আমির ইবনে শাকিক-আবু ওয়ায়িল-উসমানের বর্ণনাটি। তিনি আরো বলেছেন, এ কারণে রাসূল ﷺ-এর সাহাবা ও তৎপরবর্তী অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এর প্রবক্তা। তাঁরা দাড়ি খেলাল করার মতো পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ি (র.)ও এটাই বলেন। ইমাম আহমদ (র.) বলেছেন, খেলাল করতে ভুলে গেলে (অসুবিধা নেই) ওজু বৈধ।

ইসহাক (র.) বলেন, যদি একটি ভুলক্রমে অথবা তা'বিল করে ছেড়ে দেয় তবে যথেষ্ট হবে। আর যদি ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেয় তাহলে পুনরায় করতে হবে।

দরসে তিরমিযী

يخلل لحيته : এখানে রয়েছে, দুটি বিষয়। একটি হল দাড়ি ধৌত করার, অন্যটি দাড়ি খেলাল।

০ দাড়ি ধৌত করার বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ হলো, পাতলা দাড়ি এবং অঝুলন্ত ঘন দাড়ি সম্পর্কে সর্বসম্মতিক্রমে বক্তব্য হলো এগুলোর পুরো অংশ ধৌত করা ওয়াজিব। অবশ্য ঝুলন্ত ঘন দাড়ি সম্পর্কে হানাফিদের থেকে বর্ণিত আছে ছয়টি বক্তব্য। যেগুলো আল্লামা ইবনে নুজায়ম (র.) আল-বাহরুর্ রায়েকে বর্ণনা করেছেন,

এক. সম্পূর্ণ ধৌত করা।

দুই. সম্পূর্ণ মাসাহ করা।

তিন. এক-তৃতীয়াংশ মাসাহ করা।

চার. এক-চতুর্থাংশ মাসাহ করা।

পাঁচ. চামড়ার সাথে মিলিত অংশ মাসাহ করা।

ছয়. সবটুকু তরক করা।

এক-চতুর্থাংশ মাসেহের বক্তব্য অবলম্বন করেছেন 'কানজুদ্দাকায়িক' ও 'বেকায়া' গ্রন্থকার। কিন্তু অন্যান্য ফুকহায়ে কেরাম তা রদ করে দিয়েছেন। হানাফিদের নিকট প্রথম বক্তব্যটির ওপরই ফতওয়া। অর্থাৎ, পরিপূর্ণ অংশ ধৌত করা। দুররে মুখতার গ্রন্থকারও এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অতএব ওয়াজিব পুরো অংশ ধৌত করা।

০ দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, দাড়ি খেলাল করা। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণ হলো, ইমাম ইসহাক (র.)-এর মতে এটা ওয়াজিব। ১. শাফেয়ি মতাবলম্বীগণ এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে সুন্নত। হানাফিগণ এবং জমহুরের মতে মোস্তাহাব। হানাফিদের কাছে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর বক্তব্যর ওপর ফতওয়া। মোটকথা, অধিকাংশ (আলেম) ওয়াজিব না হওয়ার প্রবক্তা। ইমাম ইসহাক (র.) প্রমাণ পেশ করেন হজরত উসমান (রা.)-এর এ অধ্যায়ের হাদিসটি দ্বারা।

ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته ـ

এতে كان শব্দটি সর্বদা বুঝায়। এর জবাব হলো, মুহাদ্দিসিনের নিকট প্রসিদ্ধ হলো, হাদিসগুলোতে كان শব্দটি সর্বদা বুঝায় না; বরং কখনো কখনো সংঘটিত হওয়ার কথা বোঝায়। যেমন আল্লামা নববি (র.)'শরহে মুসলিমে' সুস্পষ্ট ভাষায় এর বিবরণ দিয়েছেন। কেনোনা এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যে, কোনো কোনো সাহাবি বলেছেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا ـ

'রাসূল ﷺ এমন করতেন।' অথচ সে কাজটি রাসূল ﷺ থেকে সাব্যস্ত ছিলো মাত্র কয়েক বার।

দাড়ি খেলাল করার ওয়াজিব না হওয়ার পক্ষে জমহুরের প্রমাণ হলো,

প্রথমত : রাসূল ﷺ-এর ওজু অনেক সাহাবি বর্ণনা করেছেন; কিন্তু দাড়ি খেলালের কথা পাওয়া যায় শুধু কয়েক জনের বিবরণে।

দ্বিতীয়ত : খবরে ওয়াহিদ দ্বারা পাওয়া যায় দাড়ি খেলাল করার প্রমাণ। এগুলো দ্বারা কিতাবুল্লাহর ওপর সংযোজন জায়েজ হতে পারে না।

তৃতীয়ত : ওয়াজিব নয়, হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.)-এর এ অধ্যায়ের হাদিসটি দ্বারা বোঝা যায়। কেনোনা যখন হজরত আম্মার (রা.)-এর ওপর দাড়ি খেলাল করার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, তখন তিনি জবাব দিয়েছিলেন– وما يمنعنى؟ ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته

এটা শুধু বৈধতার প্রমাণ। যদি খেলাল করা ওয়াজিব হতো, তবে হজরত আম্মার (রা.) শুধু বৈধতার দলিলের ওপর ক্ষান্ত করতেন না; বরং জোর দিয়ে বলতেন, এ আমলটিতো ওয়াজিব। তাহলে আমি এটা ছাড়তে পারি কিভাবে?

لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال : এ হাদিসটি দুই সূত্রে ইমাম তিরমিযী (র.) উল্লেখ করেছেন–

১. আব্দুল করিম সূত্রে।

২. সায়িদ ইবনে আবু আরূবা সূত্রে।

ইমাম তিরমিযী (র.) প্রথম বক্তব্য সম্পর্কে ইমাম আহমদ (র.)-এর এই বক্তব্য বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল করিম এই হাদিসটি হাসসান থেকে শুনেননি। সুতরাং এটি মুনকাতে' (সূত্র পরম্পরায় বিচ্ছিন্ন)। কিন্তু দ্বিতীয় সূত্রের ওপর কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। অথচ, অন্যান্য মুহাদ্দিস মুনকাতে' সাব্যস্ত করেছেন দ্বিতীয় সূত্রটিকে। কেনোনা কাতাদাও এ হাদিসটি হাসসান ইবনে বিলাল (রা.) থেকে শুনেননি।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ (١٥)

অনুচ্ছেদ- ২৪ : মাথা মাসেহের সময় সামনের দিক থেকে শুরু করে পেছনের দিকে যাবে (মতন ১৫)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا اِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتّٰى رَجَعَ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

৩২. অর্থ : হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, দু'হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মাথা মাসেহ করেছেন। মাথার পেছন ভাগ থেকে আরম্ভ করে হস্তদ্বয় সামনের দিকে নিয়েছেন এবং সামনের দিক থেকে পেছনের দিকে এনেছেন। প্রথমে মাথার শুরুর দিক থেকে আরম্ভ করেছেন। তারপর ঘাড়ের দিকে দুহাত নিয়ে গেছেন। তারপর যেখান থেকে আরম্ভ করেছেন সেখানে পুনরায় নিয়ে গেছেন। তারপর ধৌত করেছেন দুই পা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

মুআবিয়া, মিকদাম ইবনে মা'দি-কারিব ও আয়েশা (রা.) হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে জায়দের হাদিসটি এ অনুচ্ছেদে বিশুদ্ধতম এবং সর্বোত্তম। ইমাম শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক এর মত এটাই।

দরসে তিরমিযী

فأقبل بهما وأدبر : এ বিষয়টি এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, অভিধানে إقبال শব্দের অর্থ হলো, হাতগুলোকে পেছন দিক থেকে সামনের দিকে আনা। আর إدبار এর অর্থ হলো, সামনের থেকে পেছনের দিকে নেওয়া। এ বাক্যটি দ্বারা বাহ্যত এমন মনে হচ্ছে যে, মাথা মাসেহের সূচনা মস্তকের পেছনের দিক থেকে হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী বাক্য অর্থাৎ بدأ بمقدم رأسه সামনে থেকে সূচনা করার ক্ষেত্রে স্পষ্ট। অতএব, হাদিসের শুরু ও শেষে বৈপরীত্য মনে হচ্ছে। এর সবচেয়ে উত্তম জবাব হলো, প্রথম বাক্যটিতে واو অক্ষরটি সাধারণত একত্র করণের অর্থে ব্যবহার হয়েছে, তারতিবের জন্য নয় এবং এতে إقبال কে আগে উল্লেখ করার কারণ হলো, আরবদের নিয়ম হলো, যখনই কেউ নিজ এবারতের إقبال ও إدبار-কে একত্র করেন তখন إقبال -কে আগে উল্লেখ করেন। চাই বাস্তব ক্রমানুসারে এর অবস্থান এর উল্টোই হোক না কেনো। যেমন, ইমরাউল কায়েসের কবিতা,

مقر مفر مقبل مدبر معا * كجلمود صخر حطه السيل من عل[১]

আর আরবদের নিয়ম হলো, যখন তারা দুটি জিনিস একত্রে উল্লেখ করেন, তখন ক্রমানুযায়ী উত্তমটিকে প্রথমে রাখেন। সুতরাং এখানেও তা করা হয়েছে।

সারকথা, এ হাদিস অনুযায়ী জমহুরের মত হলো, মাথা মাসেহের সূচনা সামনের দিক থেকে করা মাসনুন। কিন্তু হজরত ওয়াকি' ইবনুল জার্‌রাহ (র.) পেছন দিক থেকে শুরু করাকে মাসনুন বলেন। তাঁর দলিল পরবর্তী অনুচ্ছেদে হজরত রুবাইয়ি বিনতে মুআওয়াজ এর বর্ণনা। তাতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে,

টীকা- ১. *অনুবাদ : নেহায়েত আক্রমণাত্মক, দ্রুত পশ্চাদগামী, অত্যন্ত তীব্রগতিতে সামনে অগ্রগামী, পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারি, (তার গতি) সে পাথরের ন্যায় যেটাকে বন্যা ওপর থেকে নিচে নিক্ষেপ করছে। التسهيلات للسبع المعلقات হতে চয়নকৃত।–সংকলক*

بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه

এ দুটি মাজহাবের মধ্যখানে তৃতীয় আরেকটি মাজহাব হলো, হজরত হাসান ইবনে সালেহ (র.)-এর, তাঁর মতে মাথার মধ্যখান হতে মাসেহ শুরু করা মাসনুন। তাঁর প্রমাণ আবু দাউদ শরিফে১ হজরত রুবাইয়ি বিনতে মু'আওয়াজ (রা.)-এরই একটি বর্ণনা। তাতে রয়েছে–

مسح الرأسه كله من قرن الشعر .

এ দুটো বর্ণনার জবাব জমহুরের পক্ষ থেকে দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, হজরত রুবাইয়ি এর বর্ণনাগুলো এ ব্যাপারে মুজতারিব। এজন্য মুসনাদে আহমদে তাঁর সূত্রে মাসেহের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এজন্য অনেকে তো বলেছেন, মূলত এই বৈপরীত্য রাবিদের ধারণার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাপারটি ছিলো এই যে, إقبال ও إدبار-এর ব্যাখ্যায় রাবিদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিলো। এ কারণে সবাই নিজেদের বুঝ মুতাবেক তাফসির বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হজরত গাঙ্গুহি (র.) এ বক্তব্যটিকে অপছন্দনীয় সাব্যস্ত করে বলেছেন যে, বস্তুত রাসূল ﷺ হজরত রুবাইয়ি (রা.)-এর সামনে বিভিন্নভাবে হয়তো মাসেহ করেছেন এবং জমহুরও সবগুলো পদ্ধতিকে জায়েজ বলেন। মতবিরোধ শুধু শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে। এ হিসেবে আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ (রা.)-এর বর্ণনা মূল। যেটি জমহুরের মাজহাবের পক্ষে সুস্পষ্ট হওয়ার সাথে সাথে ইমাম তিরমিযী (র.)-এর স্পষ্ট বিবরণ মুতাবেক এ অনুচ্ছেদে আসাহ। অথচ হজরত রুবাইয়ি হাদিস এর বিপরীতে প্রধান নয়।

অধিক ধারণা এর কারণ হলো, তাতে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আকিল নামক একজন রাবি রয়েছেন, তাঁর সম্পর্কে আপত্তি রয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ اَنَّهُ يَبْدَأُ بِمُؤَخَّرِ الرَّأْسِ (ص-١٥)

অনুচ্ছেদ- ২৫ : মাসেহ শুরু করবে মাথার পেছন দিক থেকে (মতন ১৫)

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ بَدَأَ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ وَبِاُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظُهُوْرِهِمَا وَبُطُوْنِهِمَا .

৩৩. অর্থ : হজরত রুবাইয়ি বিনতে মুআওয়িজ ইবনে আফরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করিম ﷺ দু'বার মাথা মাসেহ করেছেন। প্রথম আরম্ভ করেছেন মাথার পেছন দিকে থেকে, তারপর মাথার সামনের দিক এবং মাসেহ করেছেন দুই কানের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অংশ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ (রা.)-এর হাদিসটি বিশুদ্ধতম। কোনো কোনো কুফাবাসী এ হাদিস অনুযায়ী মত পোষণ করেছেন। তন্মধ্যে রয়েছেন ওয়াকি' ইবনুল জার্‌রাহ (র.)।

দরসে তিরমিযী

بشر بن المفضل : সেকাহ আদিল রাবি। আল্লামা ইবনুল মাদিনি (র.) বলেন, তিনি প্রতিদিন চার শ' রাকাত নামাজ পড়তেন। সারা জীবন সওমে দাউদি পালন করতেন (একদিন রোজা, একদিন বে-রোজা)।

عن الربيع بنت معوذ بن عفراء : আনসারি সাহাবিয়া। যিনি বাইয়াতে রিজওয়ানেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

টীকা- ১. باب صفة وضوء النبى صلى الله عليه وسلم

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ مَرَّةً (ص ١٥)

অনুচ্ছেদ- ২৬ : মাথা একবার মাসেহ করা প্রসঙ্গে

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ قَالَتْ مَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَصُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ـ

৩৪. অর্থ : হজরত রুবাইয়ি বিনতে মুআওয়িজ ইবনে আফরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী করিম ﷺ -কে ওজু করতে দেখেছেন। তিনি বলেন, তিনি মাথা মাসেহ করেছেন এবং মাথার সামনের ও পেছনের অংশ এবং কানপট্টি ও দুই কান মাসেহ করেছেন একবার একবার।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আলি এবং ত্বালহা ইবনে মুসাররিফ ইবনে আমর এর দাদা থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, রুবাইয়ির হাদিস حسن صحيح। একাধিক সূত্রে নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার মাথা মাসেহ করেছেন। রাসূল ﷺ-এর সাহাবি ও তৎপরবর্তী অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল চলতে থাকবে।

এরই প্রবক্তা জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ, সুফিয়ান সাওরি, ইবনুল মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক (র.)। তাঁরা মনে করেন মাথা মাসেহ করবে একবার।

'মুহাম্মদ ইবনে মানসুর বলেন, আমি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাকে বলতে শুনেছি, আমি জা'ফর ইবনে মুহাম্মদকে মাথা মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, 'এটি একবার করলে যথেষ্ট হবে কি না? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম।'

দরসে তিরমিযী

ومسح ما أقبل منه وما أدبر : এখানে مسح ما أقبل منه وما أدبر এবং فأقبل بهما و أدبر -এর পার্থক্য মনে রাখা উচিত। أقبل -এর অর্থ হলো بدأ অর্থাৎ, মাথার পেছন দিক থেকে শুরু করেছেন। আর مسح ما أقبل -এর অর্থ হলো, সামনের দিক থেকে মাসেহ শুরু করেছেন। অতএব এখানে بدأ بمقدم الرأس এই শব্দটিও মাথা সামনের দিক থেকে মাসেহ শুরু করার মাসআলায় জমহুরের দলিল।

مرة واحدة : ১. মোল্লা আলি কারি (র.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক, সুফিয়ান সাওরি (র.) এবং জমহুরের মাজহাব হলো, মাথা শুধু একবার মাসেহ করা হবে।

২. ইমাম শাফেয়ি (র.) ধোয়ার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর মতো মাসেহের ক্ষেত্রেও তিনবার করা মাসনুন মনে করেন। যদিও ইমাম তিরমিযী (র.) ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর বক্তব্যও জমহুরের সাথে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু শাফেয়ি মতাবলম্বীগণের গ্রন্থাবলিতে পছন্দনীয় বক্তব্য হলো, তিনবার করাই। হতে পারে অপ্রসিদ্ধ কোনো বক্তব্য জমহুরের মতো রয়েছে, আর ইমাম তিরমিযী (র.) সেটাই বর্ণনা করেছেন। মোটকথা, শাফেয়ি মতাবলম্বীগণের পছন্দনীয় মত হলো, তিনবার মাসেহ করা। অনেকে ইমাম মালেক (র.)কে এবং আবার ইমাম আহমদ (র.)কেও গণ্য করেছেন ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর সাথে। মোটকথা, এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি হানাফিদের প্রমাণ। আর অনেক হাদিসে একবার মাসেহ করার দলিল আছে।

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন,

وقد روى من غير وجه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة ـ

'কয়েকটি সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মাথা মাসেহ করেছেন একবার।'

শাফেয়ি (র.)-এর প্রমাণ আবু দাউদ শরিফে হজরত উসমান (র.)-এর একটি বর্ণনা রয়েছে। তাতে তিনি রাসূল ﷺ-এর ওজুর বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন– مسح رأسه ثلاثا[১] অর্থাৎ, তিনি মাসেহ করেছেন তিনবার।

কিন্তু জমহুরের পক্ষ থেকে এর জবাব এই যে, এই হাদিসটি শাজ (শক্তিশালী রাবির পরিপন্থী বর্ণনা রাবির বর্ণনা)। কারণ, এই একটি হাদিস ছাড়া হজরত উসমান (রা.)-এর সমস্ত বর্ণনা শুধু একবার মাসেহ প্রমাণ করেছে। এ কারণে স্বয়ং ইমাম আবু দাউদ (র.) তিনবার মাসেহ বিশিষ্ট বর্ণনাটিকে এই বলে রদ করে দিয়েছেন যে,

أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة فأنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره -

'উসমান (রা.)-এর সহিহ হাদিসগুলো প্রমাণ করছে যে, মাথা মাসেহ হবে একবার। কারণ, তাঁরা ওজুর কথা তিনবার উল্লেখ করেছেন। আর তাতে বলেছেন, 'তিনি মাথা মাসেহ করেছেন'। একাধিক বার মাসেহের কথা উল্লেখ করেননি। যেমন অন্যগুলোর ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন।'

যদি মেনে নিই, হজরত উসমান (রা.)-এর এই তিনবার সংক্রান্ত বর্ণনাটিও সহিহ, তবুও সেটি বৈধতার বিবরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। তাই অনেক হানাফি মুহাক্কিক তিনবার মাসেহকেও বৈধ বলেছেন। যদিও অনেকে এটিকে মাকরূহ এবং বিদআত সাব্যস্ত করেছেন। 'হেদায়া' গ্রন্থকার এর কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, নতুন পানি দিয়ে যদি তিনবার মাসেহ করা হয়, তাহলে সেটি আর মাসেহ থাকবে না; বরং ধোয়ার কাজ হয়ে যাবে। এতে স্পষ্ট হয় যে, যদি এমনভাবে তিনবার মাসেহ করা হয় এবং যাতে সেটি ধোয়ার সীমা পর্যন্ত না পৌঁছে, তবে তা হানাফিদের মতেও বৈধ হবে। বরং হাসান ইবনে জিয়াদ থেকে বর্ণিত ইমাম আজম (র.)-এর একটি বর্ণনা, তিনবার মাসেহ করা মোস্তাহাব প্রমাণ করে। কিন্তু 'হেদায়া' গ্রন্থকার এটাকে রদ করে দিয়েছেন। পেছনের অনুচ্ছেদে বর্ণিত রুবাইয়ির যে রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে مسح برأسه مرتين (দু'বার মাথা মাসেহ করেছেন) শব্দ, সেটি প্রবল ধারণা মুতাবিক إقبال ও إدبار-এর দুটি গতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেটি মূলত দু'বার মাসেহ নয়; বরং পূর্ণ মাথা মাসেহের একটি পদ্ধতি। মুস্তাদরাকে হাকেম, সহিহ ইবনে খুজায়মা, সহিহ ইবনে হাব্বানে এর যেই তরিকা ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তা দ্বারাও এর সহায়তা হয়। এ কারণে হাদিসে আছে যে, প্রথমে দু'হাতের তিন অঙুলি দ্বারা মাসেহ করেছেন মাথার সামনে থেকে পেছনের দিকে। তারপর অবশিষ্ট দু'দুটি আঙুল দ্বারা মাথার দুদিকে পেছন থেকে সামনের দিকে মাসেহ করেছেন। কিয়াস দ্বারাও একবার মাসেহ করার বিষয়টির সহায়তা হয়। কিয়াস হলো, মোজার ওপর মাসেহ এবং পট্টির ওপর মাসেহও একবারই হয়। এর আবেদন হলো, মাথা মাসেহও হওয়া উচিত একবারই।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يَأْخُذُ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيْدًا (١٦)

অনুচ্ছেদ- ২৭ : মাথা মাসেহের জন্য নতুন পানি নেওয়া প্রসঙ্গে (মতন ১৬)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَأَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ

৩৫. অর্থ : হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী করিম ﷺ-কে দেখেছেন তিনি ওজু করেছেন এবং তার মাথা মাসেহ করেছেন দুহাতে লেগে থাকা অবশিষ্ট পানি ছাড়া নতুন পানি দিয়ে।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। ইবনে লাহি'আহ এই হাদিসটি হাব্বান ইবনে ওয়াসি'-ওয়াসি'-আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম ﷺ ওজু করেছেন এবং দু'হাতে লেগে থাকা অতিরিক্ত পানি ব্যতিত নতুন পানি দ্বারা তাঁর মাথা মাসেহ করেছেন।

হজরত আমর ইবনে হারেস সূত্রে বর্ণিত হাব্বানের হাদিসটি বিশুদ্ধতম। কারণ, একাধিক সূত্রে এ হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ (রা.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করিম ﷺ মাথা মাসেহের জন্য গ্রহণ করেছেন নতুন পানি ।

অধিকাংশ আলেমের মতে- এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা মনে করেন, মাথার জন্য নতুন পানি নেবে।

দরসে তিরমিযী

بماء غير فضل يديه : জমহুর মাথা মাসেহের জন্য নতুন পানি শর্ত সাব্যস্ত করেন। তাই তাঁদের নিকট যদি হাতের অবশিষ্ট পানি দ্বারা মাসেহ করা হয় তবে ওজু হবে না। অথচ হানাফিদের মতে ওজু হয়ে যাবে। কারণ, তাঁদের মতে নতুন পানি নেওয়া শুধু সুন্নত, ওজু বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত নয়। অধিকাংশের প্রমাণ উক্ত অধ্যায়ের হাদিসটি। কিন্তু এ হাদিসটি হানাফিদের পরিপন্থী নয়। কেনোনা এর দ্বারা সুন্নত প্রমাণিত হয়, ওয়াজিব নয়। এই বর্ণনাটির দ্বিতীয় সূত্র যেটি ইবনে লাহি'আহ থেকে বর্ণিত তাতে بماء غير فضل يديه শব্দ রয়েছে। যেটি হানাফিদের প্রমাণ হতে পারে। কারণ, এর অর্থ এই হবে যে, তিনি মাথা মাসেহের জন্য নতুন পানি নেননি; বরং হাতের অবশিষ্ট পানি দ্বারা মাসেহ করেছেন। তবে ইমাম তিরমিযী (র.) ইবনে লাহি'আর সূত্রটিকে মারজুহ (অপ্রধান) সাব্যস্ত করেছেন এবং এর বিপরীতে আমর ইবনুল হারেসের সূত্রটিকে বিশুদ্ধতম সাব্যস্ত করেছেন এবং স্পষ্ট বিষয়ও এটাই যে, এতে ভুল হয়ে গেছে কোনো লিপিকার অথবা রাবি থেকে। তাই হজরত শাহ সাহেব (র.) মত প্রকাশ করেছেন যে, ইবনে লাহি'আর রেওয়ায়াতে বিকৃতি ঘটেছে। অতএব, সহিহ বর্ণনা হলো, بماء غير فضل يديه এবং এর জবাব যে, এর দ্বারা সুন্নত প্রমাণিত হয়, ওয়াজিব নয়। পক্ষান্তরে ওয়াজিব না হওয়ার প্রমাণ আবু দাউদ باب صفة وضوء النبى صلى الله عليه وسلم -এর আওতায় হজরত রুবাইয়ি বিনতে মু'আওয়িজ (রা.)-এর হাদিস। তাঁর একটি বর্ণনায় রয়েছে নিম্নেযুক্ত শব্দ–

مسح برأسه من فضل ماء كان فى يده ـ

'তালখিসুল হাবিরে' হাফেজ ইবনে হাজার (র.) নিম্নেযুক্ত শব্দ বর্ণনা করেছেন– مسح ببلل كفيه (দু'হাতের সিক্ততা দ্বারা মাসেহ করেছেন।) যদি নতুন পানি শর্ত হতো তবে তিনি কখনও নতুন পানি ছাড়া মাথা মাসেহ করতেন না। মূলত এই মতবিরোধের ভিত্তি হলো, হানাফিদের মতে পানি ততোক্ষণ পর্যন্ত مستعمل বা ব্যবহার হয় না, যতোক্ষণ পর্যন্ত অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়। শাফেয়ি মতাবলম্বী ও অন্যদের নিকট ব্যবহৃত হয়ে যায় বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে।

بما غير فضل يديه : এই বাক্যটিতে ব্যাকরণগত দিক থেকে দুটি তারকিব হতে পারে,

১. فضل يديه শব্দটি بما غير থেকে বদল। অতএব, এ অবস্থায় فضل শব্দটিতে যের হবে। কেনোনা এর محلا مجرور ـ مبدل منه ।

২. হতে পারে এখানে উহ্য غير শব্দের পর من। এ অবস্থায় এ শব্দটি منصوب بنزع الخافض হবে। আসল এবারতটি হবে بما غير من فضل يديه

بَابُ مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا (صـ ١٦)

অনুচ্ছেদ- ২৮ : কানের ওপর ও ভেতরের অংশ মাসেহ করা প্রসঙ্গে (মতন ১৬)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا ـ

৩৬. অর্থ : হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করিম ﷺ তাঁর মাথা ও দুই কানের ওপর ও অভ্যন্তর অংশ মাসেহ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

রুবাইয়ি থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح। অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা মত পোষণ করেন দুই কানের ভেতর ও বাইরের অংশ মাসেহ করার স্বপক্ষে।'

দরসে তিরমিযী

مسح برأسه و أذنيه ظاهرهما وباطنهما : ইমাম চতুষ্টয়ের মতে দু'কান সংক্রান্ত হুকুম হলো মাসেহ করা, ধৌত করা নয়। অবশ্য কোনো কোনো ফকিহ যেমন ইমাম জুহরি, কাজি আবু শুরাইহ, দাউদ জাহেরি দু'কানকে ধোয়ার অঙ্গগুলোর অন্তর্ভুক্ত করেন এবং দু'কানের ভেতর ও বাহির অংশকে চেহারার সাথে ধোয়া জরুরি সাব্যস্ত করেন। অথচ ইমাম হাসান ইবনে সাহিল এবং ইমাম শা'বি (র.)-এর মতে কানের ভেতরের অংশ ধোয়ার অঙ্গগুলোর অন্তর্ভুক্ত করেন, যেগুলো চেহারার সাথে ধোয়া ওয়াজিব। আর কানগুলোর জাহেরি অংশ অর্থাৎ, পেছনের অংশ মাসেহের অঙ্গগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এটাকে মাসেহ করতে হবে মাথার সাথে।[১]

এই অনুচ্ছেদটি ইমাম তিরমিযী (র.) কায়েম করেছেন তাঁদের মত খণ্ডনের উদ্দেশে। তাই এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি জমহুরের মাজহাবের স্বপক্ষে স্পষ্ট এবং তাঁদের মত খণ্ডনের জন্য যথেষ্ট। কেনোনা এই হাদিসে জাহের ও বাতেন (বহিরভাগ ও ভেতরের অংশ) উভয়টির মাসেহের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া এ বিষয়ে আরও অনেক হাদিস রয়েছে। যেগুলো জমহুরের দলিল।

দু'কান মাসেহের প্রসিদ্ধ পদ্ধতি হলো, কানের ভেতরের অংশ মাসেহ করবে দুই শাহাদাত অঙুলি দ্বারা, আর বহির্ভাগ মাসেহ করবে বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয়ের মাধ্যমে। সুনানে নাসায়িতে এই পদ্ধতিটি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত আছে। তাছাড়া, হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এ হাদিসটি ইবনে মাজাহ, হাকেম, ইবনে খুজায়মা, ইবনে হাব্বান, ইবনে মান্দাহ প্রমুখও বর্ণনা করেছেন। 'আত্-তালখিসুল হাবিরে' (১/৯০) হাফেজ ইবনে হাজার (র.) এ বিষয়ে অনেক হাদিস লেখেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ (١٦)

অনুচ্ছেদ- ২৯ : দুই কান মাথার অংশ (মতন ১৬)

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ (رض) قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلٰثًا وَيَدَيْهِ ثَلٰثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَقَالَ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ .

৩৭. অর্থ : হজরত আবু উমামা (রা.) বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ওজু করেছেন। তাতে তিনি চেহারা ও হস্তদ্বয় তিনবার করে ধৌত করেছেন, আর মাথা মাসেহ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, দুই কান মাথার অংশ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, কুতায়বা বলেছেন, হাম্মাদ বলেছেন, আমার জানা নেই, এটি কি নবী করিম ﷺ-এর বক্তব্য না আবু উমামা (রা.)-এর।

হজরত আবু উমামা (রা.) থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

টীকা- ১. নাইলুল আওতার : ১/১৩২ باب تعاهد الماقين ج١ . ١٤٠ . باب أن الاذن من الرأس الأذنين من الرأس

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটির সনদ তেমন ঠিক নয় তথা জয়িফ। এর ওপর আমল অব্যাহত রয়েছে। রাসূল ﷺ-এর সাহাবি ও তৎপরবর্তী অধিকাংশ আলেমের মতে **কর্ণদ্বয়** মাথার অংশ। এটাই সুফিয়ান সাওরি, ইবনুল মুবারক, আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর বক্তব্য। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, দুই কানের সামনের অংশ চেহারার অন্তর্ভুক্ত, আর পেছনের অংশ মাথারই।

আল্লামা ইসহাক (র.) বলেন, কর্ণদ্বয়ের সামনের অংশ চেহারার সঙ্গে আর পেছনের অংশ মাথার সঙ্গে মাসেহ করা আমি পছন্দ করি।

দরসে তিরমিযী

الأذنان من الرأس : কর্ণদ্বয়ের জন্য নতুন পানি নিবে না মাথা মাসেহের অবশিষ্ট পানি এগুলোর জন্য যথেষ্ট এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের অনেক বক্তব্য রয়েছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ মাজহাব দুটি।

১. দু'কানের জন্য নতুন পানি নেওয়া উচিত শাফেয়িদের মতে। কেনোনা দু'কান মাসেহ করা ওজুর একটি স্বতন্ত্র আমল। শাফেয়িগণ মু'জামে তাবারানির একটি বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। হাদিসটি হজরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তাতে হজরত রাসূল ﷺ-এর মাসেহের ধরন বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে,

وأخذ لصماخه فمسح[১] صماخه ماء جديدا ـ

'তিনি কানের ছিদ্রের জন্য পানি নিয়েছেন, তারপর এই নতুন পানি দিয়ে কানের দুই ছিদ্র মাসেহ করেছেন।'

২. হানাফিদের মতে নতুন পানিই ওয়াজিব নয়, শুধু তাই নয়; বরং মাসনুন হলো মাথা মাসেহ করার পর অবশিষ্ট পানি দ্বারা দু'কান মাসেহ করা। ইমাম আহমদ (র.), সুফিয়ান সাওরি (র.) এবং আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) প্রমুখের মাজহাবও এটাই। ইমাম মালেক (র.)-এর একটি বর্ণনাও অনুরূপ। হানাফিদের প্রমাণ ওপরযুক্ত অধ্যায়ে বর্ণিত হজরত রাসূল ﷺ-এর এই বাণী– الأذنان من الرأس (কর্ণদ্বয় মাথার অংশ হুকুমের দিক দিয়ে)।

'নসবুর রায়া'য় হাফেজ জামালুদ্দিন জায়লায়ি (র.) এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করে লিখেছেন যে, এ হাদিসটি আট জন সাহাবি থেকে বর্ণিত। তাছাড়া আরো চার জন থেকে এমন হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোতে নবী করিম ﷺ এ আমল বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি দু'কান মাসেহের জন্য নতুন পানি নেননি। এভাবে মোট বারোটি হাদিস হানাফিদের সহায়ক। তার মধ্যে কোনো কোনোটির সনদ যদিও জয়িফ কিন্তু শক্তিশালী হাদিসগুলোর মুতাবা'আত ও সহায়তার কারণে এগুলোর দুর্বলতা দূর হয়ে যায়। তাছাড়া ইমাম নাসায়ি (র.) নিজ সুনানে অন্য একটি সূক্ষ্ম পদ্ধতিতেও প্রমাণ পেশ করেছেন। সেটি হচ্ছে হাদিসে আছে,

فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه

'সে যখন মাথা মাসেহ করে তখন তার গোনাহগুলো মাথা থেকে বেরিয়ে যায়। এমনকি সেগুলো বের হয় তার দুই কান থেকে।'

এ থেকে বোঝা যায় যে, কান দুটো মাথার অংশ। অতএব, মাথা মাসেহের জন্য যে পানি হবে যথেষ্ট কানের জন্য যথেষ্ট।

০ এ অনুচ্ছেদের হাদিস যেটি হানাফিদের সহায়তা করছে, এর ওপর সনদ এবং মূলপাঠে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।

প্রশ্ন : প্রথম প্রশ্নটি করেছেন ইমাম তিরমিযী (র.) যে, এই হাদিসের রাবি হাম্মাদ ইবনে জায়দ বলেন,

لا ادرى هذا قول النبى صلى الله عليه وسلم او من قول ابى امامة ـ

'আমি জানি না, এটি কি রাসূল ﷺ-এর বাণী না-কি আবু উমামার বক্তব্য?'

টীকা- ১. এটি ইমাম 'তাবারানি সগিরে' বর্ণনা করেছেন জীম অধ্যায়ে এবং অনুরূপভাবে 'আওসাতে'ও বর্ণনা করেছেন– হায়সামি। মা'আরিফুস্ সুনান : ১/১৮২–সংকলক।

উত্তর : এ থেকে বোঝা যায় যে, এ হাদিসটির মারফু হওয়ার বিষয়টি সংশয়যুক্ত। এর জবাব হলো, হাফেজ জায়লায়ি (র.) এ হাদিসটির একাধিক সূত্র বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে হতে কোনো কোনোটি নেহায়েত শক্তিশালী। এসব সনদে এই বাক্যটি নিঃসন্দেহে মারফু রূপে বর্ণিত হয়েছে। অতএব, শুধু এক হাম্মাদের সংশয় প্রকাশ করার কারণে কোনো পার্থক্য থাকবে না।

প্রশ্ন : দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন করা হয় যে, এই হাদিসটি উদ্ধৃত করার পর ইমাম তিরমিযী (র.) লিখেছেন, هذا حديث ليس اسناده بذاك القائم অর্থাৎ, এর সনদ জয়িফ।

জবাব : এর জবাবে আল্লামা জায়লায়ি (র.) বলেছেন, যে, ইমাম তিরমিযী (র.) এ হাদিসটিকে শাহ্র ইবনে হাওশাব নামক রাবির কারণে জয়িফ বলেছেন। অথচ তিনি একজন বিতর্কিত রাবি। অনেক মুহাদ্দিস তাঁকে নির্ভরযোগ্যও বলেছেন। বরং স্বয়ং ইমাম তিরমিযী (র.)ও আল্লাহ তা'আলার ইসমে আজম অনুচ্ছেদে শাহ্র ইবনে হাওশাব থেকে বর্ণিত একটি হাদিস সম্পর্কে 'হাসান' বলে মন্তব্য করেছেন। এমনভাবে হজরত ফাতেমা (রা.)-এর মর্যাদা অনুচ্ছেদে শাহ্র ইবনে হাওশাব থেকে বর্ণিত একটি হাদিস সম্পর্কে حسن صحيح বলে বক্তব্য করেছেন। তাছাড়া এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি শাহ্র ইবনে হাওশাবের ওপর নির্ভর করে না। কেনোনা এ হাদিসটি অন্যান্য রাবি থেকেও বর্ণিত হয়েছে। অতএব, এটাকে প্রত্যাখ্যান করার কোনো ইল্লত নেই।

অনেক শাফেয়ি মতাবলম্বী তৃতীয় আরেকটি মত অবলম্বন করেছেন। সেটি হলো, মাসেহের সঙ্গে এ হাদিসটির কোনো সম্পর্ক নেই; বরং এটি সৃষ্টির বিবরণ সংক্রান্ত। অর্থাৎ, কান হলো সৃষ্টিগতভাবে মাথার অংশ। কিন্তু প্রকাশ থাকে যে, এ প্রশ্নটি খুবই দুর্বল। কারণ রাসূল ﷺ বিধিবিধান বর্ণনা করার জন্য প্রেরিত হয়েছেন, সৃষ্টির বিবরণের জন্য নয়। তাছাড়া এ অনুচ্ছেদের হাদিসে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, প্রিয় নবী ﷺ এই বাক্যটি মাথা মাসেহের তৎক্ষণাৎ পর বলেছেন, যেটি এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, এর সম্পর্ক আলোচ্য মাসেহের মাসআলার সাথে রয়েছে।

প্রশ্ন : অনেক শাফেয়ি মতাবলম্বীর পক্ষ থেকে চতুর্থ আরেকটি প্রশ্ন করা হয়েছে যে, الأذنان من الرأس -এর অর্থ এই নয় যে, মাথা মাসেহের পর সে পানি দ্বারাই দু'কান মাসেহ করা হবে; বরং এর অর্থ হলো, দু'কান মাসেহকৃত হওয়ার ব্যাপারে মাথার মতো। অথবা এই অর্থ যে, দু'কান মাসেহ চেহারা ধৌত করার পর মাথা মাসেহের তৎক্ষণাত পর হওয়া উচিত।

জবাব : কিন্তু এই দুটো ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ, প্রথম ব্যাখ্যা মুতাবেক الرجلان من اليدين বলা সঠিক হওয়া উচিত। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা মুতাবেক উচিত الرجلان من الرأس বাক্যটি বিশুদ্ধ হওয়া। অথচ, কেউ এটা বলেন না। অতএব, এর এ অর্থই সুনির্দিষ্ট যে, মাথা মাসেহ করবে দু'কান মাসেহের পর অবশিষ্ট পানি দ্বারাই।

০ হানাফিদের ওপর অনেক শাফেয়ি মতাবলম্বী পঞ্চম একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, الأذنان من الرأس-এর অর্থ হলো, দু'কান মাসেহের হুকুমে মাথার অংশ। যেমন হানাফিগণ বলেন। অতএব, যদি কোনো ব্যক্তি শুধু দু'কান মাসেহ করে এবং মাথা মাসেহ তরক করে তবে তার মাসেহ সঠিক হওয়া উচিত। কেনোনা আপনার মতে দু'কান মাথার অংশ। এর জবাব হলো, الأذن من الرأس -এর এ অর্থ আমরা করি না যে দু'কান মাথার অংশ; বরং আমরা এ অর্থ বলি যে, দু'কান মাথার অধীনস্থ। অতএব, দু'কানের জন্য নতুন পানির প্রয়োজন নেই। তাছাড়া কিতাবুল্লাহ দ্বারা মাথা মাসেহের হুকুম প্রমাণিত। আর দু'কান মাথার অংশ হওয়া খবরে ওয়াহেদ দ্বারা প্রমাণিত। অতএব, এর দ্বারা কিতাবুল্লাহর ওপর বাড়াবাড়ি অবৈধ।

শাফেয়ি মতাবলম্বীদের প্রমাণ 'মু'জামে তাবারানি'র বর্ণনা সম্পর্কে বলবো যে, তাতে একজন বর্ণনাকারি রয়েছেন উমর ইবনে আবান। হাফেজ জাহাবি (র.) তাকে মাজহুল বলেছেন। যেমন, 'মাজমাউজ জাওয়ায়িদে' রয়েছে, যদিও ইবনে হাব্বান তাকে নির্ভরযোগ্যদের মাঝে উল্লেখ করছেন। কিন্তু ভূমিকায় এই আলোচনা এসেছে যে, ইবনে হাব্বান (র.) অজ্ঞাতদেরকেও নির্ভরযোগ্য বলে দেন। অতএব, তার পক্ষ থেকে কাউকে নির্ভরযোগ্য বলার কারণে কোনো অজ্ঞাত রাবি পরিচিত হয়ে যান না এবং এই অজ্ঞতা দূরীভূত হয় না। আর যদি সনদগত দিক দিয়ে এটি প্রামাণ্যও হয় তবে হানাফিগণ এটাকে সেক্ষেত্রে প্রমাণিত ধরেন। যখন হাতের সিক্ততা পরিপূর্ণরূপে শুকিয়ে যায় তখন নতুন পানি নেওয়া সুন্নত।

بَابُ فِىْ تَخْلِيْلِ الْأَصَابِعِ (١٦)

অনুচ্ছেদ- ৩০ : আঙুলগুলো খেলাল করা প্রসঙ্গে

عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم اِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ .

৩৮. **অর্থ :** হজরত আসেম ইবনে লাকীত ইবনে সাবিরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ এরশাদ করেছেন, তুমি যখন ওজু কর তখন আঙুলগুলো খেলাল কর।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইবনে আব্বাস, মুসতাওরিদ ও আবু আইয়্যুব (রা.) হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে আমল এর ওপর যে, দুই পায়ের আঙুলগুলো ওজুতে খেলাল করবে। এই বক্তব্যই করেছেন ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.)। ইসহাক (র.) বলেছেন, দু'হাত ও দু'পায়ের আঙুলগুলো খেলাল করবে। পক্ষান্তরে আবু হাশিমের নাম হলো, ইসামইল ইবনে কাছির।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ اَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ .

৩৯. **অর্থ :** হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তুমি ওজু করো তোমার দু'হাত ও দু'পায়ের আঙুলগুলো খেলাল করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদিসটি حسن غريب।'

عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ الْفِهْرِىِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم اِذَا تَوَضَّأَ دَلَكَ اَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهٖ .

৪০. 'হজরত মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ আল-ফিহ্‌রি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি তিনি ওজু করেছেন। দু'পায়ের আঙুলগুলো ডলেছেন কনিষ্ঠাঙুলি দ্বারা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'এ হাদিসটি غريب। ইবনে লাহি'আর হাদিস ব্যতীত এটি আমরা জানি না।'

দরসে তিরমিযী

فخلل الأصابع : ১. আঙুলগুলো খেলাল করা ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতে মোস্তাহাব। ২. ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে মাসনুন। অবশ্য ইমাম আহমদ (র.) দু'পায়ের খেলালকে অধিক তাকিদপূর্ণ সাব্যস্ত করেন। ৩. কোনো কোনো জাহেরির মতে আঙুল খেলাল করা ওয়াজিব। তারা উক্ত অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন যাতে নির্দেশসূচক শব্দ ব্যবহার হয়েছে। জমহুরের পক্ষ থেকে এর জবাব হলো, এই নির্দেশ মোস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ, যে সমস্ত সাহাবি রাসূল ﷺ-এর ওজুর বিবরণ দিয়েছেন তাদের সংখ্যা অনেক। শুধুমাত্র কয়েক জনই আঙুল খেলাল করার কথা আলোচনা করেছেন। যদি এটি ওয়াজিব হতো, তাহলে সবাই আলোচনা করতেন। তাছাড়া নামাজ ভুলকারির হাদিসে রাসূল ﷺ খেলাল

করার কথা আলোচনা করেননি। অথচ তাতে ওজুর ওয়াজিবগুলো বর্ণনা করা হয়েছে গুরুত্বের সঙ্গে।

عبد الرحمن بن أبى الزناد : প্রখ্যাত মাদানি ফকিহ। শেষ বয়সে বাগদাদ চলে আসায় তাঁর স্মরণশক্তিতে পরিবর্তন এসে গিয়েছিলো। এজন্য ইমাম ইবনে মাইন (র.) বলেছেন যে, তাঁর মাদানি হাদিসগুলো মাকবুল।

موسى بن عقبه : নির্ভরযোগ্য রাবি। বিশেষত যুদ্ধ-বিগ্রহ-মাগাজি সংক্রান্ত বর্ণনার ইমাম। মাগাজির ব্যাপারে তাঁর চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য আর কোনো রাবি নেই।

دلك أصابع رجليه بخنصره : ফুকাহায়ে হানাফিয়্যাহ এ থেকেই যেমন শায়খ ইবনে হুমাম (র.) প্রমুখ দু'পায়ের আঙুলগুলো খেলাল করার এ পদ্ধতি উৎসারণ করেছেন যে, বাম হাতের কনিষ্ঠাঙুল দ্বারা খেলাল করবে এবং এর সুচনা ডান পায়ের কনিষ্ঠাঙুল হতে শুরু করে বাম পায়ের কনিষ্ঠাঙুলে সমাপ্ত করবে। এর পরিপন্থী দু'হাতের আঙুলগুলো একটিকে অপরটির ভেতর প্রবিষ্ট করিয়ে খেলাল করবে। অনেকে তাসফিককে (হাতের ওপর হাত মারা) তাশবিকের (এক হাতের আঙুল অপর হাতে প্রবিষ্ট করা) ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আর অনেকে প্রাধান্য দিয়েছেন তাসফিক পদ্ধতিকে।

بَابُ مَاجَاءَ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ (صـ ١٦)

অনুচ্ছেদ- ৩১ : পায়ের গোড়ালির জন্য রয়েছে আগুনের শাস্তি (মতন ১৬)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ .

৪১. অর্থ : হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করিম ﷺ বলেছেন, পায়ের গোড়ালিগুলোর জন্য আগুনের শাস্তি। অর্থাৎ, ধোয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন না করলে জাহান্নামে জ্বলবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আয়েশা, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবনে হারেস, মু'আইতিব, খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ, শুরাহবিল ইবনে হাসানা, আমর ইবনুল আ'স এবং ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح। নবী করিম (স.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি এরশাদ করেছেন, পায়ের গোড়ালি এবং পায়ের পাতার জন্য জাহান্নাম রয়েছে।'

এ হাদিসের নিগূঢ় রহস্য হলো যে, চামড়ার মোজা বা সূতি মোটা মোজা পরিহিত না থাকলে দু'পা মাসেহ করা অবৈধ।

দরসে তিরমিযী

ويل للأعقاب من النار : ويل শব্দের আভিধানিক অর্থ ধ্বংস ও শাস্তি। এরই নিকটবর্তী শব্দ ويح ও আরবিতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু উভয়টির মধ্যে পার্থক্য হলো যে, ويل সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলা হয় যে শাস্তিযোগ্য, আর ويح সে ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয় যে শাস্তিযোগ্য নয়। তাছাড়া ويل সে ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয় যে ধ্বংসে পতিত হয়েছে, ويح বলা হয় সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে ধ্বংসের নিকটবর্তী।

أعقاب শব্দটি عقب -এর বহুবচন। যার অর্থ হলো, পায়ের টাখনু। অনেকে বলেছেন, এখানে مضاف উহ্য আছে। অর্থাৎ لذوى الأعقاب । আর কেউ বলেছেন, উহ্যর প্রয়োজন নেই। হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, এই গোনাহের শাস্তি পায়ের টাখনুর ওপর স্বয়ং আপতিত হবে।

من النار-এর সাথে ويل-এর সম্পর্ক। আসলে ছিলো ويل من النار للأعقاب -এ হাদিসের এবারতুন্ নস দ্বারা যে বিষয়টি প্রমাণিত হয়, সেটি হচ্ছে ওজুতে পায়ের টাখুন শুকনা না থাকা চাই; বরং সেটি পরিপূর্ণরূপে ধৌত করা আবশ্যক। কিন্তু এ হাদিসটির دلالة النص এ কথার প্রমাণ যে, দু'পায়ের হুকুম হলো ধৌত করা, মাসেহ করা নয়। এ হাদিসটিকে এখানে আনার দ্বারা তিরমিযী (র.)-এর উদ্দেশ্য এটাই প্রমাণ করে। এজন্যই তিনি বলেছেন, وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين । এজন্য এখানে ধোয়ার বিষয়টি আলোচনায় এসেছে।

দুই পা ধোয়া ও মাসেহ করা সম্পর্কে আহলে সুন্নাত এবং শিয়া-রাফেজিদের মাঝে মতপার্থক্য

وامسحوا برءوسكم وأرجلكم : এ মাসআলাতে বর্ণিত আছে তিনটি মাজহাব। ১) প্রথম মাজহাব হলো, অধিকাংশ আহলে সুন্নাতের। সেটি হচ্ছে দু'পা ধৌত করা জরুরি এবং মাসেহ নাজায়েজ। ২) দ্বিতীয় মাজহাব হলো, রাফেজিদের মধ্য হতে ফিরকায়ে ইমামিয়ার নিকট দু'পায়ের হুকুম হলো মাসেহ। ৩) তৃতীয় মাজহাবটি বর্ণিত ইমাম ইবনে জারির তাবারি, আবু আলি জুব্বায়ি মু'তাজেলি এবং দাউদ জাহেরি থেকে। সেটি হচ্ছে ধোয়া এবং মাসেহ এ দুটোর মাঝে এখতিয়ার রয়েছে। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (র.) লিখেছেন যে, এই তৃতীয় মাজহাবটি কোনো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত থেকে প্রমাণিত নয়। অতএব, প্রথম মাজহাবটির ওপর আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের ইজমা রয়েছে। মূলত দাউদ জাহেরির দিকে এ মাজহাবটির সম্বোধনও প্রমাণিত নয়। আর যেই ইবনে জারির তাবারির দিকে এই তৃতীয় মাজহাবটির সম্বোধিত, তাঁর দ্বারা উদ্দেশ্য আহলে সুন্নাতের প্রখ্যাত আলেম ইবনে জারির তাবারি নন। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য শিয়া ইবনে জারির তাবারি। বাস্তব ঘটনা হলো, ইবনে জারির তাবারি নামে দু'ব্যক্তি প্রসিদ্ধ। উভয়ের নাম মুহাম্মদ ইবনে জারির। দু'জনেরই নিসবত তাবারি। উভয়ের উপনাম আবু জা'ফার। দু'জনই তাফসির লিখেছেন। কিন্তু এদের একজন সুন্নি, অপরজন শিয়া। দু'পা ধোয়া ও মাসেহের মাঝে এখতিয়ারের মাজহাব হলো, শিয়া ইবনে জারিরের। আর সেই ইবনে জারির যার তাফসির 'জামিউল বায়ান' এবং 'তারিখুল উমাম ও ওয়াল মুলূক' সুপ্রসিদ্ধ তিনি আহলে সুন্নাতের লোক। তিনি পা ধোয়ার ব্যাপারে জমহুরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সঙ্গে রয়েছেন।

প্রশ্ন : তবে অনেকে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন ইবনুল কাইয়িমের এ কথার ওপর যে, আহলে সুন্নাত ইবনে জারির তাবারিও 'তাফসিরে জামিউল বায়ানে' ধোয়া ও মাসেহ, উভয়টিকে একত্রিত করার বক্তব্য গ্রহণ করেছেন। ওজুর আয়াতের অধীনে তিনি যে তাফসির লিখেছেন তা দ্বারা এটাই বোঝা যায়। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীদের নিকট এ প্রশ্ন সঠিক নয়। হাফেজ ইবনে কাসির (র.) নিজ তাফসিরে লিখেছেন যে, আমি ইবনে জারির তাবারির এবারত নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছি, তখন মনে হয়েছে যে তিনি ধোয়া এবং মাসেহের মাঝে এখতিয়ার কিংবা উভয়টি করার প্রবক্তা নন; বরং তার উদ্দেশ্য হলো, দু'পায়ের হুকুম তো হলো ধোয়াই; কিন্তু তাতে ডলা ওয়াজিব। কারণ, পায়ে ময়লা থাকার সম্ভাবনা বেশি। অবশ্য তিনি ডলার অর্থটিকে মাসেহ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এর ফলে অনেকে বুঝে নিয়েছেন যে, তিনি ধোয়া ও মাসেহ উভয়টির প্রবক্তা। অথচ বাস্তব ঘটনা আমরা যা বললাম তাই। অর্থাৎ তিনি জমহুরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সাথে রয়েছেন। তাঁর মাজহাব তাদের চেয়ে ব্যতিক্রম কিছু নয়।

০ মোটকথা তাহকিক হলো, আহলে সুন্নাতের মধ্য হতে কারো মাজহাব পা মাসেহ করা নয়। অবশ্য রাফেজিরা এর প্রবক্তা। অতএব, মূল বিতর্ক হলো আহলে সুন্নাত ও রাফেজিদের মাঝে রাফেজিরা তাদের বাতিল মতের ওপর وامسحوا برؤسكم وأرجلكم আয়াতের যেরের কেরাত দ্বারা প্রমাণ পেশ করে। আহলে সুন্নাতের পক্ষ থেকে এর বিভিন্ন জবাব প্রদত্ত হয়েছে। যেগুলোর সার নির্যাস হলো,

জবাব : ১. এই আয়াতে أرجلكم -এর মধ্যে প্রতিবেশী হিসেবে যের রয়েছে। অন্যথায় أرجلكم আত্ফ أيديكم -এর ওপর হয়েছে।

২. যেরের কেরাতটি মোজা পরিহিত অবস্থায় প্রযোজ্য, আর যবরের কেরাতটি সাধারণ অবস্থায় প্রযোজ্য।

৩. যেরের কেরাতটিতে رؤوس -এর ওপরই أرجل-এর আত্ফ। কিন্তু যখন মাসেহের সম্বোধন أرجل -এর দিকে হবে তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে হালকা ধোয়া। আর মাসেহ শব্দটির এই অর্থে ব্যবহার মশহুর।

৪. এমন আরও অনেক জবাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে সবচেয়ে তাহকিকি এবং সন্তোষজনক আলোচনা করেছেন হজরত আল্লামা আনওয়ার শাহ্ (র.) 'মুশকিলাতুল কোরআন' নামক গ্রন্থে। তিনি বলেন যে, কোরআনে কারিমের বিবরণ বোঝার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পথ হলো, রাসূল ﷺ-এর আমল। আমরা যখন তাঁর আমলের দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন এমন একটি বর্ণনাও পাওয়া যায় না, যা দ্বারা দু'পায়ের মাসেহ প্রমাণিত হয়। এটা সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, কোরআনে কারিমে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ধোয়ার; মাসেহের না।

প্রশ্ন : এখন প্রশ্ন হয় যে, এমন স্থলে এমন শব্দ ব্যবহার করা হলো না, যেটি কোনো বিরোধী সম্ভাবনা ব্যতিত ধোয়ার অর্থ বুঝায়।

জবাব : এর জবাব হলো, কোরআন কারিমের নিয়ম হলো, এটি অনেক সময় কিছু বিষয় সম্বোধিত ব্যক্তিদের বুঝের ওপর নির্ভর করে ছেড়ে দেয়। এবার এখানে সুরতটি হলো, এই আয়াতটি সূরা মা'য়িদার। সূরা মায়িদা মাদানি সূরা। এ আয়াতটি তখন নাজিল হয়েছিলো যখন রাসূল ﷺ-এর প্রেরিত হওয়ার কমপক্ষে ১৮ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিলো। অথচ ওজুর ওপর আমল চলে আসছিলো নবীরূপে প্রেরিত হওয়ার সূচনা থেকেই। অতএব, এ আয়াত কোনো নতুন হুকুম দেয়নি; বরং সাবেক আমলকে শক্তিশালী করেছে। যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম ১৮ বছর থেকে ওজু করে আসছেন এবং এর পদ্ধতি ছিলো সুপ্রসিদ্ধ; যার মধ্যে এ বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত ছিলো যে, পা ধুইতে হবে। অতএব, এ আয়াতে প্রতিটি শাখাগত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ আবশ্যক ছিলো না। যেহেতু এই আয়াত থেকে ধোয়া ব্যতিত অন্য কোনো হুকুম উৎসারণ করার কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না, সেহেতু কোনো কোনো সূক্ষ্ম বিষয় ও ফায়দার (পরবর্তীতে বর্ণিত হবে) দিকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা أرجل শব্দটিকে মাসেহের আওতায় উল্লেখ করে এবারত এমন রেখেছেন, যাতে বাহ্যত দু'পা ধোয়া এবং মাসেহ উভয় অর্থের সম্ভাবনা আছে। উম্মতের আমল এর প্রমাণ যে, তারা বাস্তবে ধোয়া ব্যতিত অন্য কোনো অর্থ বুঝেননি।

আয়াতটি নিয়ে এই ভূমিকার পর গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, এখানে রয়েছে দুটি কেরাত। একটি যেরের, অপরটি যবরের। তাহকিকের বিষয় হলো, এ দুটো থেকে অবলম্বন করা হবে কোন্টা?

আয়াতের তারকিবের দিকে গভীরভাবে চিন্তা করুন। সর্বপ্রথম যবরের কেরাতটি নিয়ে। সাধারণভাবে এর তারকিব এমন বর্ণনা করা হয় যে, أرجل আতফ হয়েছে أيديكم -এর ওপর। কিন্তু হজরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, এ ব্যাখ্যাটি উত্তম নয়। কারণ, এমতাবস্থায় معطوف এবং معطوف عليه -এর মাঝে একটি অপরিচিত শব্দ অর্থাৎ, وامسحوا برؤسكم দ্বারা বিচ্ছেদ আবশ্যক হয়। যেটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্যের শান উপযোগী নয়। অতএব, হজরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, এখানে তারকিবের রয়েছে দুটি সম্ভাবনা,

এক. এখানে তাজমিন স্বীকার করে নেওয়া হবে। তাজমিনের অর্থ হলো, উল্লিখিত আমেলের মা'মুলের ওপর উহ্য আমেলের মা'মুলকে আতফকরণ। আরবি বাক্যে এর অনেক নজির রয়েছে। যেমন প্রসিদ্ধ কাব্যে রয়েছে,

يا ليت شيخا قد غدا * متقلدا سيفا و رمحا

এখানে رمحا শব্দের আমেল উহ্য। মূলত ছিলো এমন, متقلدا سيفا وحاملا رمحا এমনভাবে علفته تبنا و سقيته এ সকিয়তে গোপন রয়েছে। মূল এবারত ছিলো এমন, علفته تبنا وسقيته ما باردا ماء باردا

কোরআন কারিমেও এর উদাহরণ রয়েছে। বলা হয়েছে, أجمعوا أمركم وشركائكم । এখানে মূলত উহ্য এবারত ছিলো এমন– أجمعوا أمركم وأجمعوا شركائكم অর্থাৎ, নিজেদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে নাও এবং স্বীয় শরিকদেরকে একত্রিত কর। কেনোনা, ইজমা'-এর অর্থ হলো, দৃঢ় সংকল্প করা এবং এটাকে شركاء -এর আমেল সাব্যস্ত করা যায় না। হুবহু এই পদ্ধতিটি ওজুর আয়াতেও এসেছে যে, সেটি আসলে ছিলো,

وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم ।

০ 'ফাতহুল কাদিরে' শায়খ ইবনুল হুমাম (র.) এর ওপর প্রশ্ন তুলেছেন যে, তাজমিন সে স্থানে দুরস্ত হয় যখন বক্তব্যে উল্লিখিত আমেল এবং উহ্য আমেল উভয়টির মা'মুলের এ'রাব একই হয়। অথচ ওজুর আয়াতে رؤوس শব্দে যের আর أرجل এ যবর রয়েছে। হজরত শাহ সাহেব (র.) এর জবাব দিয়েছেন যে, رؤوس শব্দটিও যের বিশিষ্ট শব্দের স্থানে রয়েছে। কেনোনা সেটি ب এর মাধ্যমে امسحوا -এর মাফউল। অতএব এই প্রশ্ন উঠবে না।

০ দ্বিতীয় সম্ভাবনা হলো وأرجلكم -এর واو টিকে معيت তথা সাথের অর্থে সাব্যস্ত করে وأرجلكم শব্দটিকে وامسحوا এর মাফউলে মা'আহু সাব্যস্ত করা । এমতাবস্থায় অর্থ হবে– وامسحوا برؤسكم مع غسل أرجلكم

এখানে এ কথাটি স্মর্তব্য যে, মাফউলে মা'আহুর জন্য واو -এর পূর্বাপর ক্রিয়ায় যৌথ হওয়া জরুরি নয়; বরং এক সাথে হওয়া জরুরি। অর্থাৎ, দুটি ক্রিয়া আলাদা আলাদা হতে পারে। কিন্তু কালগতভাবে এক সাথে হওয়ার কারণে উভয়ের মাঝে واو معيت এসে যায়। যেমন, আরবগণ বলেন إستوى الماء والخشية । এখানে إستواء -এর সম্পর্ক শুধু পানির সাথে। কারণ, নতুন সমতা পানির মধ্যেই হয়। কাঠতো প্রথম থেকেই সমান হয়ে থাকে। এমনভাবে مشيت والشارع অতএব, ওপরযুক্ত আয়াতেও মাসেহের সম্পর্ক শুধু মাথার সাথে হবে, পায়ের সাথে নয়। তাই ওপরযুক্ত আয়াতে واو معيت -এর অর্থ উদ্দেশ্য হলে কোনো প্রশ্ন উঠে না।

এ ব্যাখ্যাগুলো সম্পৃক্ত যবরের কেরাতের সাথে। যেরের কেরাত সম্পর্কে সাধারণত বলা হয় যে, এটি جر جوار-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু হজরত শাহ সাহেব (র.) এটাকে নিজ জবাবের ভিত্তি স্থাপন করেননি। তাই جر جوار-এর বিষয়টি ব্যাকরণবিদদের মাঝে বিতর্কিত। ইবনে জিন্নি এবং আস্-সায়রাফি তো বলেন যে, جر جوار-এর কোনো অস্তিত্বই নেই। যিনি এটা করেছেন তিনি ভুল করেছেন। আল্লামা ইবনে হাজেব (র.) বলেন, جر جوار-এর অস্তিত্ব তো আছে, কিন্তু এটি ফাসাহাতের খেলাফ (ভাষাগত পাণ্ডিত্যের পরিপন্থী) এবং কখনো কখনো কাব্যিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। 'মুগনিল্ লাবিব' ও 'মুরূজুজ জাহারে'র ব্যাখ্যায় ইবনে হিশাম (র.) লিখেছেন যে, جر جوار সাধারণত দুটি স্থানে ব্যবহৃত হয়– না'তে ...।

এবং তাকিদে। ইমরাউল কাইসের নিম্নেযুক্ত কবিতা না'তের উদাহরণ,

كأن ثبيرا في عرانين وبله * كبير أناس في بجاد مزمل

এখানে مزمل শব্দটি كبير-এর صفت; অতএব, উচিত ছিলো এটাতে পেশ হওয়া। কিন্তু بجاد -এর প্রতিবেশী হওয়ার কারণে এতে যের হয়েছে। এমনভাবে আরবগণ বলেন– جحر ضب خرب। এখানে خرب শব্দটি جحر এর صفت । কিন্তু ضب -এর প্রতিবেশী হওয়ার কারণে তাতে যের হয়েছে।

তাকিদের উদাহরণ, يا صاح بلغ ذوى الزوجات كلهم এখানে كلهم শব্দটি ذوى -এর তাকিদ। যেটি স্থানগতভাবে যবর বিশিষ্ট। কিন্তু الزوجات শব্দটি প্রতিবেশী হওয়ার কারণে তাতে যের হয়েছে।

আল্লামা ইবনে হিশাম (র.) বলেন, এ দুটি পদ্ধতি ছাড়া جر جوار প্রসিদ্ধ নয়। বিশেষত عطف نسق এ প্রতিবেশীত্বের কারণে যের দেওয়ার কোনো নজির আরবি বাক্যে নেই। যার কারণও স্পষ্ট যে, واو عطف -এর ব্যবধান প্রতিবেশীত্ব হ্রাস করে। এর আবেদন হলো, وامسحوا برؤسكم وأرجلكم এ বিশুদ্ধ না হওয়া। এ কারণেই হজরত শাহ সাহেব (র.) এই আয়াতে جر جوار এর বক্তব্যকে পছন্দ করেননি। তিনি বলেছেন, এখানে সম্ভব দুটি সুরতই,

১. رؤوس -এর ওপর عطف হয়েছে أرجل শব্দটি। মাসেহের সম্পর্ক উভয়টির সাথে হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। কিন্তু যখন মাসেহের সম্পর্ক মাথার সাথে হবে তখন এর অর্থ হবে إمرار اليد المبتلة (ভিজা হাত ফেরানো) আর যখন পায়ের সাথে হবে তখন এর অর্থ হবে হালকাভাবে ধৌত করা। আরবি বাক্যে এর অনেক উদাহরণ রয়েছে, যেগুলোতে শব্দের অর্থ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে সংশ্লিষ্ট জিনিসের পার্থক্যের কারণে। যেমন, صلوة শব্দটি। এর বিভিন্ন অর্থ প্রসিদ্ধ। অনুরূপভাবে نضح শব্দটির সম্পর্কে যখন بحر -এর সাথে হয় তখন এর অর্থ হয় তরঙ্গ। উটের দিকে নিসবত হলে এর অর্থ হয় পিপাসা নিবারণ। এমনভাবে মাসেহ শব্দটির আভিধানিক অর্থ, ايصال الماء الى الممسوح। অর্থাৎ, মাসেহের অংশের দিকে পানি পৌঁছানো। যখন এর সম্পর্ক হবে মাথার দিকে তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে امرار اليد المبتلة। ভিজা হাত ফিরানো। যখন পায়ের দিকে তার সম্পর্ক হবে তখন অর্থ হবে ধৌত করা। বস্তুত মাসেহ শব্দটিকে ধোয়ার অর্থে ব্যবহার করা অপ্রসিদ্ধ নয়। হযরত হাসান বসরি (র.)-এর বক্তব্য রয়েছে– تمسحنا। সর্বসম্মতিক্রমে এর অর্থ توضأنا তথা আমরা ওজু করেছি। তাছাড়া মাসেহ দ্বারা উদ্দেশ্য إمرار اليد المبطلة হওয়া এটা পরবর্তী পরিভাষা। আভিধানিকভাবে প্রথম দিকে মাসেহ শব্দটি ধোয়ার অর্থেও ব্যবহার হতো।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা হলো এখানেও তাজমিনের। অর্থাৎ أرجل -এর পূর্বে যুৎসই কোনো আমেল ঊহ্য বের করা। যেমন, এখানে ঊহ্য হতে পারে এমন,

وامسحوا برؤسكم مع غسل أرجلكم. 'তোমরা মাথা মাসেহ করো সাথে সাথে পাও ধৌত করো।'

০ এখন কেবল একটি কথা থেকে যায়, সেটি হচ্ছে যদি আল্লাহ তা'আলার নিকট পাগুলোকে ধোয়ার অঙ্গ সাব্যস্ত করাই মূল হয়ে থাকে, তাহলে বিবরণের এই পদ্ধতি অবলম্বন করে এসব ব্যাখ্যা এবং ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ সৃষ্টি করা হলো কেনো? পাগুলোকে স্পষ্টভাবে ধোয়ার আওতায় কেনো উল্লেখ করা হলো না, তাহলে তো সব প্রশ্নোত্তরেরও কোনো প্রয়োজন হতো না। এর জবাব সেটাই যে, ওজুর ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের ১৮ বছরের আমলের ভিত্তিতে ভুল বোঝাবুঝির কোনো আশঙ্কাই ছিলো না এবং পাগুলোকে মাসেহের আওতায় উল্লেখ করার মধ্যে অনেক উপকারিতা ও হিকমত নিহিত ছিলো। এ কারণে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। কিছু ফায়দা এবং হিকমত নিম্নে তুলে ধরা হলো,

১. কোনো কোনো সময় পায়ের মধ্যেও মাসেহের হুকুম হয়। যেমন, মোজা পরা অবস্থায় এবং ওজুর ওপর ওজু করার সময়। যদি এই কেরাত যেরের না হতো, তাহলে আয়াত দ্বারা সর্বাবস্থায় ধোয়াই সাব্যস্ত হতো এবং মোজার ওপর মাসেহের বর্ণনাগুলো এর সাথে সাংঘষিক হতো। এ কেরাতের কারণে এই বৈপরীত্যের অবসান করা হলো।

২. এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য যে, মাথা মাসেহ এবং পা ধোয়ার বিষয়টি অনেক হুকুমে যৌথ এবং সমান। যেমন, তায়াম্মুমে বাদ পড়ে যায় উভয়টি।

৩. رؤوس -এর পরে أرجل শব্দটিকে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে মাসনুন তারতিবের দিকেও। অথচ এ ফায়দাটি এর উল্টো তারতিবে অর্জিত হতো না।

টীকা- ১. (অনুবাদ) সবির পাহাড় বৃষ্টির শুরুতে এমন মনে হয় যেনো মানুষের একজন বড় নেতা, যিনি রেখাবিশিষ্ট কম্বল জড়িয়ে আছেন। –তাসহিলাত-সংকলক।

৪. মাথা মাসেহ আর পা ধোয়া এ দুটি বিষয়ের মাঝে মিল হলো, উভয়টি শরিয়ত প্রবর্তকের বিধিবদ্ধতার কারণে জানা গেছে। অথচ চেহারা ও হাত ধোয়ার বিধিবদ্ধতার আমল ওজুর পূর্বেও আরবদের নিকট ছিলো। এ হিসেবেও এ দুটি বিষয়কে এক সাথে উল্লেখ করা সঙ্গত ছিলো। তাছাড়া আরো অনেক হিকমত থাকতে পারে যেগুলো আমরা জানি না। মোটকথা, এসব প্রচুর উপকারিতার ভিত্তিতে বর্তমান বিবরণ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। পা ধোয়ার বিষয়টি পূর্ণ স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়নি শ্রোতার বুঝের ওপর নির্ভর করে।

এতোক্ষণ আলোচনা ছিলো আয়াত সম্পর্কে। মাসেহের প্রবক্তাগণ কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারাও আহলে সুন্নতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন।

১. 'মু'জামে কাবিরে' ইমাম তাবারানি, ইমাম বাগাবি এবং আবু নু'আইম প্রমুখ উবাদা ইবনে তামিম সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন,

قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على لحيته ورجليه -

'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি তিনি ওজু করেছেন এবং তাঁর দাড়ি ও দু'পা মাসেহ করেছেন।'

আল্লামা হায়সামি (র.) 'মাজমাউজ জাওয়ায়িদে'[১]- এই বর্ণনাটি বর্ণনা করে বলেন, এর রাবিগণ নির্ভরযোগ্য।

আল্লামা আলি আল-মুত্তাকি (র.) 'কানজুল উম্মালে'[২] 'ইসাবা'র বরাত দিয়ে লিখেন, এর রাবিগণ নির্ভরযোগ্য।

এর জবাব হলো, এতে মোজা পরার অবস্থার বিবরণ রয়েছে। অর্থাৎ, হয়তো প্রিয়নবী ﷺ মোজা পরিহিত ছিলেন। ফলে মাসেহ করেছেন। অথবা এই হাদিসে ব্যাখ্যা করা অবশ্যক ইমাম ও মুতাওয়াতির হাদিসের বিরোধিতার কারণে। সে ব্যাখ্যাটি হলো, এখানে মাসেহ শব্দটি হালকা ধোয়ার সাথে সাথে ডলা অর্থে প্রযোজ্য। যার প্রমাণ হলো, দাড়ি সম্পর্কেও মাসেহ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ সেটিও ধোয়ার অঙ্গ।

২. ১/৯৬, باب وجوب غسل القدمين والعقبين এ নামাজে ভুলকারির হাদিসের কোনো কোনো সূত্রে এমন শব্দও বর্ণিত হয়েছে,

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها صلوة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين... الخ

'রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ হলো তোমাদের একজনের নামাজ। ওজু পরিপূর্ণরূপে করবে যেমন আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে সে তার ধৌত করবে চেহারা ও হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত। আর মাসেহ করবে তার মাথা ও দু পা টাখনু পর্যন্ত।'

০ জবাব এই হাদিসে রাসূল ﷺ বাতলে দিয়েছেন কোরআনের আয়াতের তারতিবে ওজুর পদ্ধতি। কোরআনের বিবরণের' অনুসরণ করেছেন। অতএব, এখানেও সেসব ব্যাখ্যা করা হবে যেগুলো আয়াতে করা হয়েছে।

৩. হজরত আলি (রা.), হযরত আনাস (রা.) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর আমল কোনো কোনো বর্ণনায় এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁরা মাসেহ করেছেন পায়ের ওপর।

০ অনেকে এর জবাব দিয়েছেন যে, তাঁদের এই আমল প্রযোজ্য ওজুর ওপর ওজুর ক্ষেত্রে। এর প্রমাণ ইজমায়ে মুতাওয়াতের। দ্বিতীয় জবাব 'ফাতহুল বারি'তে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি (র.) এই দিয়েছেন যে, ওপরযুক্ত সাহাবায়ে কেরাম থেকে এই মাজহাব হতে প্রত্যাবর্তনও প্রমাণিত আছে। সুতরাং তাঁদের পূর্বেকার কোনো আমল দ্বারা প্রমাণ পেশ করা ঠিক নয়। হাফেজ (র.) সায়িদ ইবনে মানসুর (র.)-এর বরাতে এর সহযোগিতাস্বরূপ আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লার এই বক্তব্যও বর্ণনা করেছেন,

أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين -

'দু'পা ধোয়ার ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর সাহাবিগণ একমত হয়েছেন।'

টীকা- ১. ওজু সংক্রান্ত অধ্যায়ের শেষদিক : ১/২৩৪ ছাপা বৈরুত। টীকা- ২. ৫/১০২, হা. নং ২১৯৩, ছাপা হায়দারাবাদ দাক্ষিনাত্য।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْوُضُوْءِ مَرَّةً مَرَّةً (ص ١٦)

অনুচ্ছেদ- ৩২ : একবার একবার (পানি দিয়ে) ওজু করা প্রসঙ্গে (মতন ১৬)

حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَهَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ قَالُوْا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً ـ

৪২. **অর্থ :** হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করিম ﷺ ওজু করেছেন একবার একবার (পানি দিয়ে)।

উমর, জাবের, বুরায়দা, আবু রাফে' ও ইবনুল ফাকিহ (রা.) থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) **বলেছেন,** এই অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদিসটি সর্বোত্তম ও আসাহ।

রিশদিন ইবনে সা'দ এ হাদিসটি জাহহাক ইবনে শুরাহবিল-জায়দ ইবনে আসলাম-তাঁর পিতা-উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম ﷺ একবার একবার করে (পানি দিয়ে) ওজু করেছেন। কিন্তু এ হাদিসটি কিছুই নয়– গুরুত্বহীন। বিশুদ্ধ হলো, ইবনে আজলান, হিশাম ইবনে সা'দ, সুফিয়ান সাওরি ও আব্দুল আজিজ ইবনে মুহাম্মদ-জায়দ ইবনে আসলাম-আতা ইবনে ইয়াসার-ইবনে আব্বাস-নবী করিম ﷺ সূত্রে বর্ণিত বর্ণনাটি।

দরসে তিরমিযী

এখানে ধারাবাহিকভাবে ইমাম তিরমিযী (র.) পাঁচটি অনুচ্ছেদে কায়েম করেছেন। যেগুলোর উদ্দেশ্য ধোয়ার অঙ্গগুলোতে ধোয়ার সংখ্যা বর্ণনা করা। প্রথম অধ্যায়ে করা হয়েছে এক এক বার ধোয়ার আলোচনা। দ্বিতীয়টিতে দুই দুই বার, তৃতীয়টিতে তিন তিন বার, চতুর্থটিতে সামগ্রিকভাবে সবগুলোর আলোচনা। আর পঞ্চমটিতে একই ওজুতে কোনো কোনো অঙ্গকে দুই বার, কোনোটিকে তিনবার ধোয়ার কথা আলোচিত হয়েছে। এসব পদ্ধতি সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ। তবে শর্ত হলো, পরিপূর্ণ অঙ্গ ধৌত করতে হবে। অবশ্য যেহেতু রাসূল ﷺ-এর নিয়ম ছিলো তিনবার ধৌত করা, তাই তিন বার ধোয়া সুন্নত।

وليس هذا بشئ : রিশদিন ইবনে সা'দের সনদে সাহাবি থেকে বর্ণনাকারি হচ্ছেন জায়দ ইবনে আসলামের পিতা, আর ইবনে আজলানের সনদে আতা ইবনে ইয়াসার। রিশদিনের সনদটিকে ইমাম তিরমিযী (র.) ভুল বলেছেন। কারণ, রিশদিন জয়িফ। এর বিপরীতে উল্লেখ করেছেন ইবনে আজলান, হিশাম ইবনে সাদ, সুফিয়ান সাওরি এবং আব্দুল আজিজ ইবনে মুহাম্মদের মতো নির্ভরযোগ্য রাবিগণ আতা ইবনে ইয়াসারের কথাই।

দ্বিতীয় মতবিরোধ হলো, রিশদিন এ হাদিসটিকে হজরত উমর (রা.)-এর মুসনাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর অন্যান্য রাবি হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মুসনাদে শামিল করেছেন। রিশদিনের সনদ ভুল।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْوُضُوْءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ (ص ١٦)

অনুচ্ছেদ- ৩৩ : ওজুতে দু'বার করে অঙ্গ ধোয়া প্রসঙ্গে (মতন ১৬)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ـ

৪৩. **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী কারিম ﷺ ওজুতে অঙ্গ ধুয়েছেন দু'বার করে।

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب। ইবনে সাওবান কর্তৃক আবদুল্লাহ ইবনুল ফজল সূত্রে বর্ণিত হাদিস ছাড়া এটি আমরা জানি না। আর এটি হাসান সহিহ সনদ।

জাবের (রা.) থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে হাদিস বর্ণিত আছে যে, নবী করিম ﷺ ওজু করেছেন তিনবার করে (পানি দিয়ে)।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْوُضُوْءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا (صـ ١٧)

অনুচ্ছেদ- ৩৪ : ওজুতে তিনবার করে অঙ্গ ধোয়া প্রসঙ্গে (মতন ১৭)

عَلِىٌّ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ ثَلٰثًا ثَلٰثًا .

৪৪. **অর্থ :** হজরত আলি (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করিম ﷺ ওজু করেছেন তিনবার করে (পানি দিয়ে)।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

উসমান, রুবাইয়ি', ইবনে উমর, আয়েশা, আবু উমামা, আবু রাফে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, মুআবিয়া, আবু হুরায়রা, জাবের, আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ ও আবু জর (রা.) থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে আলি (রা.)-এর হাদিসটি সর্বোত্তম ও আসাহ। এ হাদিসের ওপর অধিকাংশ আলেমের আমল যে, একবার একবার অঙ্গ ধৌত করে ওজু করা যথেষ্ট। দু'বার করে অঙ্গ ধৌত করা এর চেয়ে উত্তম। আর তিনবার ধৌত করা সর্বোত্তম। এরপর আর কিছু নেই। ইবনুল মুবারক (র.) বলেছেন, ওজুতে তিনবারের বেশি ধৌত করলে গোনাহগার হওয়া থেকে আমি নিরাপদ মনে করি না। আহমদ ও ইসহাক (র.) বলেন, পাগল ব্যতিত কেউ তিন বারের বেশি ধৌত করবে না।'

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْوُضُوْءِ مَرَّةً وَ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا (صـ ١٧)

অনুচ্ছেদ-৩৫ : ওজুর অঙ্গসমূহ এক, দুই অথবা তিনবার ধোয়া প্রসঙ্গে (মতন ১৭)

حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُوْسَى الْفَزَارِىُّ نَا شَرِيْكٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ اَبِىْ صَفِيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا جَابِرٌ اَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَمَرَّتَيْنِ وَثَلٰثًا وَثَلٰثًا؟ قَالَ نَعَمْ

৪৫. **অর্থ :** হজরত সাবেত ইবনে আবু সাফিয়্যাহ (রা.) বলেন, আবু জা'ফরকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নিকট কি জাবের (রা.) এ হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম ﷺ একবার, দু'বার, তিনবার করে অঙ্গ ধুয়ে ওজু করেছেন? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ!

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এই হাদিসটি ওয়াকি সাবেত ইবনে আবু সফিয়্যাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,আমি আবু জা'ফর (ইমাম মুহাম্মদ বাকির (র.)কে জিজ্ঞেস করলাম, জাবের (রা.) কি আপনার নিকট হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওজু করেছেন একবার করে পানি দিয়ে? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, এই হাদিসটি আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন হান্নাদ ও কুতায়বা। তাঁরা দু'জন বলেছেন, আমাদেরকে হাদিস বর্ণনা করেছেন ওয়াকি' সাবেত হতে।

এটি হলো, শরিকের হাদিস অপেক্ষা আসাহ। কারণ, এটি একাধিক সূত্রে সাবেত থেকে ওয়াকি'-এর বর্ণনার মতো বর্ণিত হয়েছে। আর শরিকের প্রচুর ভুল হয়।

সাবেত ইবনে আবু সফিয়্যাহ হলেন, আবু হামজা ছুমালি।

بَابٌ فِيْ مَنْ تَوَضَّأَ بَعْضَ وُضُوْئِهِ مَرَّتَيْنِ وَبَعْضَهُ ثَلَاثًا (صـ ١٧)

অনুচ্ছেদ- ৩৬ : যে কোনো অঙ্গ দু'বার আর কোনোটি তিনবার করে ধুয়ে ওজু করে (মতন ১৭)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ ان النبى صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَاسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ -

৪৭. **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী আকরাম ﷺ ওজু করেছেন, তিনি তাঁর চেহারা তিনবার ধুয়েছেন, হস্তদ্বয় দুইবার করে ধুয়েছেন, মাথা মাসেহ করেছেন, দু'পা ধুয়েছেন।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। একাধিক হাদিসে উল্লেখ রয়েছে যে, নবী আকরাম ﷺ ওজু করার সময় কোনো অঙ্গ একবার কোনোটি তিনবার ধুয়েছেন। কোনো কোনো আলেম এর অনুমতি দিয়েছেন। কেউ ওজুর সময় কোনো অঙ্গ তিনবার কোনোটি দুইবার অথবা একবার ধুয়ে ওজু করলে তাতে তাঁরা কোনো রকম অসুবিধা মনে করেন না।'

بَابٌ فِيْ وُضُوْءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ كَانَ (صـ ١٧)

অনুচ্ছেদ- ৩৭ : নবী আকরাম ﷺ ওজু করতেন কিভাবে? (মতন ১৭)

عَنْ اَبِيْ حَيَّةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا (رضـ) تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتّٰى اَنْقَاهُمَا ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ فَضْلَ طَهُوْرِهِ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ اَحْبَبْتُ اَنْ اُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طُهُوْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم -

৪৮. **অর্থ :** হজরত আবু হাইয়াহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হজরত আলি (রা.)-কে ওজু করতে দেখেছি। তিনি দু'হাতের তালু (কব্জি পর্যন্ত) ধুয়ে পরিষ্কার করেছেন। তারপর তিনবার কুলি করেছেন। তিনবার নাকে পানি দিয়েছেন। তিনবার চেহারা ধুয়েছেন। তিনবার দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়েছেন। মাথা মাসেহ করেছেন একবার। তারপর টাখনু পর্যন্ত তিনি তার দু'পা ধুয়েছেন। তারপর দাঁড়িয়ে ওজুর অতিরিক্ত পানি পান করলেন। এরপর বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্রতা (ওজু) কেমন ছিলো আমি পছন্দ করেছি তোমাদেরকে তা প্রদর্শন করতে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

উসমান, আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আয়েশা, রবি এবং আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) مِثْلَ حَدِيْثِ اَبِيْ هَيْثَةَ اِلَّا اَنَّ عَبْدَ خَيْرٍ قَالَ كَانَ اِذَا فَرَغَ مِنْ طُهُوْرِهِ اَخَذَ مِنْ فَضْلِ طَهُوْرِهِ بِكَفِّهِ فَشَرِبَهُ -

৪৯. **অর্থ :** হজরত আলি (রা.) থেকে আবু হাইয়াহর হাদিসের মতো একটি হাদিস বর্ণিত আছে। তবে আবদে খায়র বলেছেন, তিনি যখন ওজু থেকে অবসর হতেন তখন হাতের তালুতে নিয়ে ওজুর বেঁচে যাওয়া পানি থেকে পান করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু সাঈদ তিরমিযী (র.) বলেছেন, আলি (রা.)-এর হাদিসটি আবু ঈসা হামদানি বর্ণনা করেছেন আবু হাইয়াহ, আবদে খায়র এবং হারিস সূত্রে আলি (রা.) হতে।

জায়দা ইবনে কুদামাসহ আরও একাধিক ব্যক্তি খালেদ ইবনে আলকামা হতে আবদে খায়র সূত্রে আলি (রা.) হতে ওজুর সুদীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

আর এ হাদিসটি حسن صحيح। শো'বা এ হাদিসটি খালেদ ইবনে আলকামা থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি তাঁর নাম ও তাঁর পিতার নামে ভুল করেছেন। তিনি বলেছেন, মালেক ইবনে উরফুতা-আবু আওয়ানা থেকে খালেদ ইবনে আলকামা-আবদে খায়র-আলি (রা.) সূত্রে হাদিস বর্ণিত হয়েছে এবং আবু আওয়ানা থেকে মালেক ইবনে উরফুতা হতে শো'বার বর্ননার মতো হাদিস বর্ণিত আছে। কিন্তু খালেদ ইবনে আলকামা সহিহ।'

দরসে তিরমিযী

সামগ্রিকভাবে রাসূল ﷺ-এর ওজুর পদ্ধতি এই অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে। যে হাদিসটি কোনো বিষয়ে সমস্ত শাখা-প্রশাখাগত ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর আমলের বিবরণ দেয়, এমন হাদিসকে মুহাদ্দিসগণ 'জামে' বলেন। এ অনুচ্ছেদে হজরত আলি (রা.)-এর হাদিস বর্ণিত আছে। এটি সমস্ত খুটিনাটি বিষয়সহকারে হানাফিদের দলিল।

فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم : অনেক আলেম বলেছেন, ওজুর অবশিষ্ট পানি এবং জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা সুন্নত। কিন্তু 'রদ্দুল মুহতারে' আল্লামা ইবনে আবিদিন শামি (র.) এ বক্তব্য খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন, এটা মুবাহ বা বৈধ। আর যেসব হাদিসে এ দু'টি স্থানে রাসূল ﷺ হতে দাঁড়িয়ে পানি পান করার কথা জানা যায়, সেগুলো দ্বারাও মুবাহ প্রমাণিত হয়, মোস্তাহাব নয়। জমজমের পানি তিনি দাঁড়িয়ে এজন্য পান করেছেন যে, সেখানে ভিড়ের কারণে বসার স্থান ছিলো না। আর ওজুর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে এজন্য পান করেছেন যাতে তারা জানতে ও দেখতে পারে যে, ওজুর অবশিষ্ট পানি নাপাক কিংবা মাকরূহ হয় না। অতএব, এসব হাদিস দ্বারা মোস্তাহাব হওয়ার প্রমাণ পেশ করা যায় না। কিন্তু ওপরযুক্ত অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা আল্লামা শামি (র.)-এর এ ব্যাখ্যার ওপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, যদি এই দাঁড়িয়ে পান করা শুধু একটি ওজরের কারণেই হয়ে থাকে তাহলে হজরত আলি (রা.) এখানে দাঁড়িয়ে পানি পান করতেন না। কেনোনা তাঁর এ ওজর ছিলো না। এজন্য স্পষ্ট এটাই যে, হজরত আলি (রা.) ওজুর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করেছেন সুন্নত-মোস্তাহাব হওয়ার ভিত্তিতে।

بَابٌ فِي النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ (ص ١٧)

অনুচ্ছেদ- ৩৮ : ওজুর পর পানি ছিটানো প্রসঙ্গে (মতন ১৭)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ جَاءَ نِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ .

৫০. অর্থ : হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করিম ﷺ বলেছেন, আমার কাছে জিবরাইল (আ.) এসে বললেন, মুহাম্মদ! আপনি যখন ওজু করবেন তখন পানি ছিটিয়ে দেবেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি গরিব। মুহাম্মদকে আমি বলতে শুনেছি, হাসান ইবনে আলি আল-হাশেমি منكر الحديث।

আবুল হাকাম ইবনে সুফিয়ান, ইবনে আব্বাস, জায়দ ইবনে হারেসা এবং আবু সায়িদ (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। অনেকে বলেছেন, সুফিয়ান ইবনুল হাকাম অথবা হাকাম ইবনে সুফিয়ান তাঁদের এ হাদিসে ইজতেরাব রয়েছে।

দরসে তিরমিযী

السلیمی البصری : বনি সালেম-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। কোনো কোনো রাবি সুলামি হয়ে থাকেন। তিনি সম্বন্ধযুক্ত হন বনি সুলায়িমের দিকে।

اذا توضأت فانتضح : انتضاح দ্বারা অনেকে উদ্দেশ্য করেছেন পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা। এমতাবস্থায় اذا توضأت দ্বারা উদ্দেশ্য হবে যখন আপনি ওজু করার ইচ্ছা পোষণ করেন। আর অনেকে এর অর্থ বলেছেন, ওজুর পর অবশিষ্ট পানি কপালের ওপর বইয়ে দেওয়া। যেমন কোনো কোনো বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকেও এ বিষয়টি প্রমাণিত[১]।

তবে অধিকাংশ আলেম এর অর্থ নিয়েছেন, ওজুর পর জামার নিচে ছিটা নিক্ষেপ বা এর হিকমত সাধারণত এই বর্ণনা করা হয় যে, এর ফলে পেশাবের ফোঁটা বের হওয়ার কুমন্ত্রণা[২] হয় না।

হজরত শাইখুল হিন্দ (র.)-এর আরেকটি সূক্ষ্ম হিকমত এই বর্ণনা করেছেন যে, ওজু দ্বারা আসল উদ্দেশ্য তো আধ্যাত্মিক পবিত্রতা। কিন্তু কার্যত তাতে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ধৌত করা হয়, যার ফলে বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জিত হয়। কিন্তু এ থেকে অবসর হওয়ার পর এমন দুটি আমল মোস্তাহাব সাব্যস্ত করা হয়েছে যেগুলো দ্বারা বাতেনি পবিত্রতার কথা মনে সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য হয়। প্রথমতো ওজুর অবশিষ্ট পানি পান করা। দ্বিতীয়তো লজ্জাস্থানে পানি ছিটিয়ে দেয়া। এতে এই হিকমত রয়েছে যে, মানুষের সমস্ত গোনাহের উৎস হলো শরীরের এই দুটি বস্তু– এক. মুখ, দুই. লজ্জাস্থান। পেটের প্রবৃত্তির প্রভাব দূর করার জন্য ওজুর অবশিষ্ট পানি পান বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। আর লজ্জাস্থানের (অবৈধ) কাম চাহিদা বন্ধ করার দিকে আকৃষ্ট করার জন্য লুঙ্গির ওপর পানি ছিটিয়ে দেওয়ার বিষয়টিকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। মোটকথা, এই হুকুমটি আবশ্যকীয় নয়; বরং উত্তমতার বিবরণের জন্য এবং অর্থের সমস্ত বর্ণনা সূত্রগতভাবে জয়িফ। তাই এ অনুচ্ছেদের হাদিসটিও হাসান ইবনে আলি হাশেমির কারণে জয়িফ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন সূত্রের কারণে সামগ্রিকভাবে[৩] গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া বিষয়টি ফাজায়েল সংক্রান্ত। তাই এতোটুকু দুর্বলতা সমস্যা নেই।

بَابُ إِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ (ص ١٨)

অনুচ্ছেদ- ৩৯ : পূর্ণাঙ্গরূপে ওজু করা প্রসঙ্গে (মতন ১৮)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ ۔

৫১. অর্থ : হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন, আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয়ের দিক-নির্দেশনা দিবো না, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পাপ মিটিয়ে দিবেন এবং তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন! সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জবাবে তিনি বললেন, কষ্টসত্ত্বেও পূর্ণাঙ্গরূপে ওজু

টীকা- ১. দ্রষ্টব্য : মা'আরিফুস্ সুনান : ১/২০০, باب اسباغ الوضوء

টীকা- ২. ইমাম বায়হাকি, ইবনে আবু শায়বা, মুসাদ্দাদ একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যেটি এর সহায়ক–
'হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে মাওকুফ সূত্রে বর্ণিত যে, তোমাদের কেউ যখন ওজু করো তখন এক অঞ্জলি পানি নিয়ে লজ্জাস্থানের ওপর ছিটিয়ে দাও। যদি (প্রস্রাবের রাস্তা) থেকে কোনো জিনিস পৌঁছে, তাহলে বলো, এটি এই পানির কারণে। হাফেজ (র.) বলেন, হাদিসটি সহিহ মাওকুফ।' (المطالب العالية ج١ ص٤٦ رقم١١٧)

টীকা- ৩. আবু দাউদ, নাসায়ি, ইবনে মাজাহ, হাকেম ও আহমদ হাকাম, ইবনে সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল ﷺ যখন ওজু করতেন তখন এক অঞ্জলি পানি নিয়ে লজ্জাস্থানে নিক্ষেপ করতেন। আজিজি আস্-সিরাজুম মুনির : ১/২১-এ এ হাদিসটি সম্পর্কে সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন।

করা এবং মসজিদের দিকে প্রচুর পদক্ষেপ ও এক নামাজের পর অপর নামাজের অপেক্ষা করা। এগুলোই হলো রিবাত' (অর্থাৎ সীমান্ত পাহারার মতো আমল)।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ وَقَالَ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ فذلكم الرباط ثَلٰثًا ـ

৫২. **অর্থ :** 'হজরত আলা হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণিত আছে। কুতায়বা এ হাদিসে বলেন, এগুলোই রিবাত এগুলোই রিবাত, এগুলোই রিবাত, তিনবার এমনটি বলেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আলি, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, ইবনে আব্বাস, উবায়দা, আয়েশা, আব্দুর রহমান ইবনে আয়েশা ও আনাস (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। উল্লেখ্য, ওপরযুক্ত উবায়দাকে উবায়দা ইবনে আমরও বলা হয়।

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح। আলা ইবনে আব্দুর রহমান হলেন, ইবনে ইয়াকুব আল জুহানি। তিনি মুহাদ্দিসিনের মতে নির্ভরযোগ্য।

দরসে তিরমিযী

اسباغ الوضوء على المكار : اسباغ الوضوء দ্বারা জমহুরের মতে উদ্দেশ্য তিনবার ধোয়া। المكاره শব্দটি مكره -এর বহুবচন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এমন অবস্থা, যে অবস্থায় ওজু করা কষ্টকর মনে হয়। যেমন, প্রচণ্ড শীত ইত্যাদি।

انتظار الصلوة بعد الصلوة : এর বাস্তব উদ্দেশ্য হলো, মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরও মানুষের ধ্যান পরবর্তী নামাজের প্রতি লেগে থাকা। যেমন,

سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد ـ[১]

'আল্লাহ তা'আলা সেদিন তাঁর ছায়ায় সাতদল লোককে আশ্রয় দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতিত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। তার মধ্যে একজন সে, যার অন্তর ঝুলন্ত থাকে মসজিদের সঙ্গে।'

হাদিসে এক ব্যক্তির আলোচনা নিম্নেযুক্ত ভাষায় করা হয়েছে, ورجل قلبه معلق بالمساجد (এমন ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে ঝুলন্ত বা গভীরভাবে সম্পৃক্ত।)

فذلكم الرباط : رباط –এর অর্থ হলো, ইসলামি সীমান্তের রক্ষণাবেক্ষণ। যেহেতু সীমান্তে পাহারাদারি করা এক জটিল কাজ এজন্য এই তিনটি কাজকে এর সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। সওয়াব ও ফজিলতের দিক দিয়ে এগুলোকে সাব্যস্ত করা হয়েছে সীমান্তের পাহারাদারির অনুরূপ।

بَابُ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ (صـ ١٨)

অনুচ্ছেদ- ৪০ : ওজুর পর রুমাল ব্যবহার করা প্রসঙ্গে (মতন ১৮)

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوْءِ ـ

৫৩. হজরত হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক খণ্ড কাপড় ছিলো এটি দিয়ে তিনি ওজুর পর (ওজুর অঙ্গগুলো) মুছতেন।

মু'আজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

টীকা- ১. সহিহ বোখারি : باب من جلس فى المسجد ينتظر الصلوة

عن معاذ بن جبل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه .

৫৪. **অর্থ :** হজরত মু'আজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি যখন ওজু করতেন তখন তাঁর কাপড়ের এক কোনা দিয়ে স্বীয় চেহারা মুছে ফেলতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি গরিব। এর সনদ জয়িফ। রিশদিন ইবনে সাদ ও আব্দুর রহমান ইবনে জিয়াদ ইবনে আনউম আল আফরিকিকে হাদিস বিষয়ে জয়িফ সাব্যস্ত করা হয়।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আয়েশা (রা.)-এর হাদিসটি জয়িফ। এ বিষয়ে নবী করিম ﷺ থেকে কোনো বিশুদ্ধ হাদিস নেই।

হজরত আবু মু'আজ সম্পর্কে মুহাদ্দিসিনগণ বলেন, তিনি হচ্ছেন সুলায়মান ইবনে আরকাম। তিনি হাদিস বিশারদদের নিকট জয়িফ। রাসূল ﷺ-এর সাহাবি ও তৎপরবর্তীগণের মধ্যে একদল আলেম ওজুর পর রুমাল ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। আর যারা মাকরূহ মনে করেছেন, তারা এজন্য মাকরূহ মনে করেছেন যে, বলা হয়েছে,ওজু (এর পানি) ওজন করা হবে। এটি বর্ণিত আছে সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব ও জুহরি থেকে।

'তাঁরা বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনে হুমায়দ রাজি বলেন, জারির আমাদেরকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আলি ইবনে মুজাহিদ আমার কাছ থেকে শুনে আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন ছালাবা সূত্রে জুহরি থেকে, আর আলি ইবনে মুজাহিদ আমার মতে নির্ভরযোগ্য। তিনি বলেন, আমি ওজুর পরে রুমাল ব্যবহার করা এজন্যই মাকরূহ মনে করি যে, ওজু (এর পানি) পরিমাপ করা হবে।'

দরসে তিরমিযী

خرقة ينشف بها بعد الوضوء : হজরত সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব এবং ইমাম জুহরি (র.)-এর মতে ওজুর পর তোয়ালে ব্যবহার করা মাকরূহ। তাঁরা সহিহ বোখারির[১] বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন, যেটি হজরত মায়মুনা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ-এর খেদমতে একবার একটি তোয়ালে পেশ করা হয়েছিলো, তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিলেন। এ অনুচ্ছেদে হাদিসটির জবাব তারা দু'জন এভাবে দেন যে, এটি জয়িফ। এর পরিপন্থি জমহুরের মতে ওজুর পর তোয়ালে ব্যবহার করা জায়েজ। এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি জমহুরের প্রমাণ।

তাতে বর্ণনা করা হয় রাসূল ﷺ-এর এ অভ্যাস যে, তিনি সাধারণত অঙ্গগুলো মুছে শুকিয়ে ফেলতেন। এ হাদিসটি যদিও জয়িফ, কারণ রিশদিন ইবনে সাদ এবং আব্দুর রহমান ইবনে জিয়াদ ইবনে আন'উম ইফরিকি স্পষ্টভাবে জয়িফ প্রতীয়মান হয়। আরেকটি সনদে আবু মুআজ সুলায়মান ইবনে আরকাম অপাংক্তেয় রাবি। কিন্তু যেহেতু এ অর্থটি অনেক হাদিসে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত এজন্য সামগ্রিকভাবে এটিকে গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে হজরত মায়মুনা (রা.)-এর বর্ণনার জবাব জমহুর এই দিয়েছেন যে, সেটি প্রযোজ্য বৈধতার বিবরণ অথবা ঠাণ্ডা অর্জনের ক্ষেত্রে।

তারপর জমহুরের মধ্য হতে ইমাম মালেক ও শাফেয়ি (র.) এটাকে মুবাহ বলেন। হানাফিদের মধ্য থেকে منية المصلى গ্রন্থকার এটাকে মোস্তাহাব বলেছেন। কাজিখান প্রমুখ মুবাহ সাব্যস্ত করেছেন। ফত্ওয়া হলো কাজিখান (র.)-এর বক্তব্যর ওপর।

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) রুমাল ব্যবহার মাকরূহ সাব্যস্তকারিদের একটি প্রমাণ এও বর্ণনা করেছেন যে, إن الوضوء يوزن অর্থাৎ, ওজুর পানি ওজন দেওয়া হবে এবং সাওয়াব বৃদ্ধির কারণ হবে। অতএব, যদি শুকিয়ে ফেলা হয় তবে কিভাবে ওজন দেওয়া হবে? কিন্তু এ প্রমাণটি খুবই জয়িফ। কারণ, যদি পানি শুকিয়ে যাওয়া ওজনের

টীকা. ১. ১/৪০, باب المضمضة والإستنشاق صـ١٤ باب نفض اليدين من غسل الجنابة, সংকলক।

পরিপন্থি হয়, তাহলে কোনো অবস্থাতেই ওজনের কল্পনা করা যায় না। কারণ, কাপড় দিয়ে না শুকালেও কোনো না কোনো সময় অবশ্যই তা শুকিয়ে যাবে।

قال حدثنيه على بن مجاهد عنى : জারিরের এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, একবার আমি এ হাদিসটি আলি ইবনে মুজাহিদের সামনে বর্ণনা করেছিলাম, পরবর্তীতে আমি তা ভুলে যাই। এবার আলি ইবনে মুজাহিদ স্বয়ং আমার বরাতে এ হাদিসটি আমাকে শুনান। যদিও এ হাদিসটি এখনও আমার স্মরণ আসেনি। কিন্তু আমার নিকট তিনি নির্ভরযোগ্য। তাই আমি তাঁর হাদিস গ্রহণ করি।

بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ الْوُضُوْءِ (صـ ١٨)

অনুচ্ছেদ- ৪১ : ওজুর পর কি দোয়া পড়া হবে প্রসঙ্গে (মতন ১৮)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) قَالَ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ . فُتِحَتْ لَهٗ ثَمَانِيَةُ اَبْوَابٍ مِّنَ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ .

৫৫. অর্থ : হজরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে সুন্দরভাবে ওজু করার পর বলবে, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু... (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতিত আর কোনো মা'বুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আয় আল্লাহ! আমাকে তাওবাকারিদের অন্তর্ভুক্ত করো, শামিল কর পবিত্রতা অর্জনকারিদের দলে।) জান্নাতের আটটি দরজাই তার জন্য খুলে দেওয়া হবে। সে ইচ্ছেমতো প্রবেশ করতে পারবে যে কোনো একটি দিয়ে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আনাস ও উকবা ইবনে আমির (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এই হাদিসের সাথে হজরত জায়দ ইবনে হুবাব (রা.)-এর হাদিসের পার্থক্য রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে সালেহ প্রমুখ মু'আবিয়া ইবনে সালেহ-রবিআ' ইবনে ইয়াজিদ-আবু ইদরিস-উকবা ইবনে আমের-উমর (রা.) সূত্রে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু উসমান থেকে জুবায়র ইবনে নুফায়র সূত্রে উমর (রা.) থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আর এই হাদিসটির সনদে ইজতেরাব রয়েছে। এ অনুচ্ছেদে নবী আকরাম ﷺ থেকে তেমন বেশি কিছু বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত নেই। মুহাম্মদ বলেছেন, উমরের কাছ থেকে আবু ইদরিস কিছুই শুনেনি।

দরসে তিরমিযী

عن أبى إدريس الخولانى وأبى عثمان : এই ইবারত দ্বারা বাহ্যত বোঝা যায়, عطف أبى ادريس হয়েছে . أبى عثمان -এর ওপর। এরা দু'জনই রবি'আর উস্তাদ। অথচ বাস্তব ঘটনা হলো, أبى عثمان -এর عطف হয়েছে ربيعة -এর ওপর। অর্থাৎ, মু'আবিয়া ইবনে সালিহের উস্তাদ দু'জন। একজন রবি'আ, আরেকজন আবু উসমান। মূলত এখানে সনদ দু'টি,

১. জায়দ ইবনে হুবাব-মু'আবিয়া ইবনে সালেহ, রবি'আ ইবনে ইয়াজিদ-আবু ইদরিস-উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)।

২. জায়দ ইবনে হুবাব-মু'আবিয়া ইবনে সালেহ-আবু উসমান-উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)।

قوله من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ...الخ - হাদিস দ্বারা ওজুর পরে তিন প্রকারের জিকির প্রমাণিত।

১. শাহাদাতাইন অর্থাৎ, তাওহিদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য এবং اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين যেমন ইমাম তিরমিযী (র.) বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (র.)ও সহিহ মুসলিমে ১/১২২, كتاب الطهارة باب الذكر المستحب عقب الوضوء তে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে শুধু শাহাদাতাইন রয়েছে, পরবর্তী দোয়াটি নেই।

২. اللهم اغفرلي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي - رواه النسائي وابن السني من حديث أبي موسى الاشعرى وذكره الجزرى في الحصن الحصين - كما في معارف السنن)

'আয় আল্লাহ! আমার গোনাহ মাফ করো। আমার বাড়িতে প্রাচুর্য দান করো। বরকত দাও আমার রিজিকে।'

৩. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا انت وحدك لا شريك لك استغفرك وأتوب إليك

'হে আল্লাহ! তোমার সব প্রশংসা পবিত্রতা। তুমি ব্যতিত আর কোনো মাবুদ নেই। তুমি এক, তোমার কোনো শরিক নেই। তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তওবা করছি তোমার নিকট।'

এই জিকিরটি 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাতি' গ্রন্থে ইবনুস্ সুন্নি (র.) বর্ণনা করেছেন।

এই তিনটি জিকির ব্যতিত ওজুর সময় প্রতিটি অঙ্গ ধৌত করা কালে যেসব দোয়া প্রচলিত আছে কোরআন হাদিসে সেগুলোর প্রমাণ নেই। এজন্য কোনো কোনো আহলে জাহের এগুলোকে كذب مختلق তথা জাল-মিথ্যা বলে দিয়েছেন। এর উদ্দেশ্য হলো, হাদিস দ্বারা এগুলো প্রমাণিত নয়। এর এই অর্থ নয় যে, এগুলো পড়া অবৈধ। এজন্য ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, انه من دأب الصالحين অর্থাৎ, এগুলো নেককারদের অভ্যাস।

بَابُ الْوُضُوْءِ بِالْمُدِّ (صـ ١٨)

অনুচ্ছেদ-৪২ : এক মুদ (পরিমাণ পানি) দ্বারা ওজু করা প্রসঙ্গে (মতন ১৮)

عَنْ سَفِيْنَةَ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَضَّؤُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ -

৫৬. অর্থ : হজরত সফিনা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করিম ﷺ এক মুদ (পানি) দিয়ে ওজু করতেন, আর এক সা' দিয়ে গোসল করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আয়েশা, জাবের ও আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, সফিনা (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح। আবু রায়হানার নাম আবদুল্লাহ ইবনে মাতার। কোনো কোনো আলেমের রায় হলো, ওজুতে এক মুদ এবং গোসলে এক সা অবৈধ।

ইমাম শাফেয়ি আহমদ ও ইসহাক (র.) বলেন, এই হাদিসের অর্থ নয় যে, এর বেশি ও কম ব্যবহার করা জায়েয নেই। এটা হলো সে পরিমাণ যা দ্বারা (ওজু-গোসল) যথেষ্ট হয়ে যায়।

দরসে তিরমিযী

عن سفينة : তাঁর নাম মিহরান। তিনি রাসূলে করিম ﷺ-এর খাদেম ছিলেন। কোনো একদিন তিনি অস্বাভাবিক বোঝা বহন করেছিলেন। এজন্য তাঁর উপাধি প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো সফিনা (নৌকা বা জাহাজ)।

كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع : এ ব্যাপারে সমস্ত ফুকাহায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে যে, ওজু এবং গোসলের জন্য পানির কোনো বিশেষ পরিমাণ শরয়িভাবে সুনির্দিষ্ট নেই; বরং অপব্যয় থেকে বেঁচে যতোটুকু পানি যথেষ্ট হয় তা ব্যবহার করা বৈধ। তাছাড়া এ ব্যাপারেও ঐকমত্য রয়েছে যে, রাসূল ﷺ-এর সাধারণ মা'মুল ছিলো এক মুদ দ্বারা ওজু করা এবং এক সা' দ্বারা গোসল করা এবং এ বিষয়টিও সর্বসম্মত যে, এক সা' হয় চার মুদে। কিন্তু এ বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে যে, মুদের পরিমাণ ও ওজন কি?

১. ইমাম শাফেয়ি (র.), ইমাম মালেক (র.), আহলে হিজাজ এবং এক বর্ণনা মুতাবেক ইমাম আহমদ (র.)-এর মাজহাব হলো ১$\frac{১}{৩}$ রতলে এক মুদ হয়। অতএব এই হিসেবে এক সা' ৫$\frac{১}{৩}$ রতলে হয়। (এক রতল অর্ধ সেরের মতো)।

২. এর পরিপন্থি ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মুহাম্মাদ এবং ইরাকবাসীরা এবং এক বর্ণনা মুতাবেক ইমাম আহমদ (র.)-এর মাজহাবও হলো, এক মুদ দুই রতল আর এক সা হয় আট রতলে।

শাফেয়ি মতাবলম্বী প্রমুখ মদিনাবাসীদের আমল দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। কেনোনা ইমাম মালেক (র.)-এর মাজহাবও হলো, এক মুদ দুই রতল আর এক সা' হয় আট রতলে।

শাফেয়ি মতাবলম্বী প্রমুখ। মদিনাবাসীদের আমল দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। কেনোনা ইমাম মালেক (র.)-এর যুগে মদিনা তায়্যিবায় তাঁর মাজহাব মুতাবেক এক মুদ ১$\frac{১}{৩}$ রতলে এবং এক সা' হতো ৫$\frac{১}{৩}$ রতলে।

হানাফিদের প্রমাণ নিম্নোক্ত বর্ণনাসমূহ,

১. শরহে মা'আনিল আছারে باب وزن الصاع كم هو তে ইমাম তাহাবি (র.) হজরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন,

قال دخلنا على عائشة (رضـ) فاستقى بعضنا فاتى بعس ١قالت عائشة (رضـ) كان النبى صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثل هذا قال مجاهد فحزرته فيما احزر ثمانية ارطال عشرة ارطال .

'আমরা হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর নিকট প্রবেশ করলাম। আমাদের কোনো একজন পানি পান করতে চাইলেন তখন একটি বড় পেয়ালা হাজির করা হলো। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বললেন, নবী করিম ﷺ গোসল করতেন এ পরিমাণ (পানি) দ্বারা। মুজাহিদ বলেন, আমি নিজে আন্দাজ করলাম, তাতে হবে আট রতল/নয় রতল/দশ রতল।'

সন্দেহের অবস্থায় নিম্ন পর্যায়ের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট। আর সেটি হলো, ৮ রতল।

২. كتاب الطهارة باب ذكر قدر الذى يكتفى به الرجل من الماء للغسل শিরোনামে মূসা জুহানি থেকে ইমাম নাসায়ি (র.) হাদিস বর্ণনা করেছেন,

قال اتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية ارطال فقال حدثتنى عائشة (رضـ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مثل هذا .

'মুজাহিদ একটি পেয়ালা নিয়ে আসলেন। আমি অনুমান করলাম আট রতল। তারপর তিনি বললেন, হজরত আয়েশা (রা.) আমার নিকট হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গোসল করতেন এই পরিমাণ (পানি) দ্বারা।'

এই বর্ণনা দ্বারা ইমাম তাহাবি (র.)-এর বর্ণনার সন্দেহ দূর হয়ে যায়।

টীকা- ১. عس এর অর্থ বড় পেয়ালা। এর বহুবচন আসে عساس وأعساس আর কোনো কোনো বর্ণনায় بعشا ، وبعسا বর্ণিত হয়েছে। এর অর্থ বড় পেয়ালা শরহে মা'আনিল আছারের হাশিয়াগুলো থেকে গৃহীত। –সংকলক।

৩. মুসনাদে আহমদে হজরত আনাস (রা.)-এর বর্ণনা আছে,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد رطلين وبالصاع ثمانية ارطال -

'রাসুলুল্লাহ ﷺ ওজু করতেন এক মুদ দুই রতল এবং এক সা' আট রতল দ্বারা।'

এই হাদিসটির সনদ যদিও জয়িফ; কিন্তু প্রথমতো অনেক সূত্র থাকার কারণে এটি প্রমাণযোগ্য, দ্বিতীয়তো ইমাম আবু দাউদ (র.)-এর প্রথমাংশ নিম্নেযুক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন,

كان النبى صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين -

'নবী কারেম ﷺ দুই রতল (পানি) ধরে এমন পাত্র দিয়ে ওজু করতেন।'

ইমাম আবু দাউদ (র.) এ হাদিসটি বর্ণনা করার পর নিরবতা অবলম্বন করেছেন। যা এর প্রমাণ যে, এ হাদিসটি তাঁর নিকট বিশুদ্ধ। এর দ্বারা হানাফিদের প্রমাণ পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

অনেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবু ইউসুফ (র.) যখন মদিনা মুনাওয়ারায় তাশরিফ নিয়েছিলেন তখন সত্তর জনের বেশি সাহাবি সন্তান তাঁকে স্ব-স্ব মুদ এবং সা' দেখিয়েছেন। সেখানে মুদ ১$\frac{১}{৩}$ রতলে এবং সা' ৫$\frac{১}{৩}$ রতলে ছিলো। এটা দেখে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ইমাম আজম (র.) এর মত থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। শায়খ ইবনে হুমাম (র.) এই ঘটনা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এর একটি কারণ তো এই যে, এর সনদ জয়িফ। দ্বিতীয়তো যদি ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মত প্রত্যাহার প্রমাণিত হতো তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.) নিজ গ্রন্থাবলিতে অবশ্যই উল্লেখ করতেন। কারণ, তিনি ইমাম আবু ইউসুফ (র.) নিজ গ্রন্থাবলিতে অবশ্যই উল্লেখ করতেন। কেনোনা তিনি ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর প্রত্যাহৃত বক্তব্যগুলোর উল্লেখ বাধ্যতামূলক বানিয়ে নিয়েছিলেন।

সা' এবং মিসকাল ইত্যাদির ওজনে ভারতীয় ওলামায়ে কেরামেরও কিছু মতবিরোধ আছে। ইনশাআল্লাহ কিতাবুজ জাকাতে যার বিস্তারিত বিবরণ আসবে।

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْإِسْرَافِ فِى الْوُضُوْءِ (صـ ١٩)

অনুচ্ছেদ- ৪৩ : ওজুতে অপচয় করা মাকরূহ প্রসঙ্গে (মতন ১৯)

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ لِلْوُضُوْءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الْوَلْهَانُ فَاتَّقُوْا وَسْوَاسَ الْمَاءِ -

৫৭. অর্থ : হজরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত, হজরত নবী করিম ﷺ বলেছেন যে, ওজুর জন্য নির্ধারিত একটি শয়তান আছে, তাতে বলা হয় 'ওয়ালাহান'। কাজেই তোমরা পানির ব্যাপারে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টিকারী থেকে পরহেজ কর। অর্থাৎ, বেঁচে থাক ওয়ালাহানের সন্দেহ প্রবণতা থেকে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, উবাই ইবনে কা'বের হাদিসটি গরিব। এর সনদ মুহাদ্দিসিনে কেরামের নিকট শক্তিশালী নয়। কারণ, এটিকে খারিজা ব্যতিত অন্য কেউ মুসনাদ আকারে বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না।

হাসান (বসরি) (র.) থেকে এ হাদিসটি একাধিক সূত্রে তাঁর বক্তব্যরূপে বর্ণিত হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে নবী করিম ﷺ থেকে বিশুদ্ধরূপে কেনো কিছু বর্ণিত নেই। খারিজা আমাদের সাথিদের মধ্যে শক্তিশালী নন। ইবনুল মুবারক (র.) তাঁকে জয়িফ বলেছেন।

بَابُ الْوُضُوْءِ لِكُلِّ صَلٰوةٍ (صـ ١٩)

অনুচ্ছেদ- ৪৪ : প্রত্যেক নামাজের জন্য ওজু করা প্রসঙ্গে (মতন ১৯)

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَضَّؤُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ طَاهِرًا اَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسٍ فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ اَنْتُمْ؟ قَالَ كُنَّا نَتَوَضَّؤُ وُضُوْءً وَاحِدًا .

৫৮. অর্থ : হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করিম ﷺ প্রত্যেক নামাজের জন্য (নতুন) ওজু করতেন। চাই পবিত্র থাকুন কিংবা অপবিত্র। বর্ণনাকারি হুমাইদ বলেন, আমি আনাস (রা.)কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি করতেন? জবাবে আনাস (রা.) বললেন, আমরা এক ওজুই করতাম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আনাস (রা.)-এর হাদিসটি حسن غريب। মুহাদ্দিসিনের নিকট প্রসিদ্ধ হলো, আমর ইবনে আমির সূত্রে বর্ণিত হজরত আনাস (রা.)-এর হাদিস।

অনেক আলেম প্রত্যেক নামাজের জন্য ওজু ওয়াজিব নয়, তবে মোস্তাহাব মনে করেন।'

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اَنَّهُ قَالَ : (مَنْ تَوَضَّأَ عَلٰى طُهْرٍ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهٖ عَشْرَ حَسَنَاتٍ) .

৫৯. অর্থ : ইবনে উমর (রা.) সূত্রে নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে আছে, নবী করিম ﷺ বলেছেন, যে পবিত্র অবস্থায় ওজু করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য এর বিনিময়ে দশটি নেকি লিখবেন।

عَنْ عَمْرِو ابْنِ عَامِرٍ الْاَنْصَارِيِّ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ (رضـ) يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّؤُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ قُلْتُ فَاَنْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ؟ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ مَالَمْ نُحْدِثْ .

৬০. অর্থ : হজরত আমর ইবনে আমির আল-আনসারি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা.)কে বলতে শুনেছি, নবী আকরাম ﷺ প্রতিটি নামাজের সময় ওজু করতেন। আমি (আনাস (রা.)কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি করতেন? জবাবে তিনি বললেন, আমরা ওজু ভঙ্গ হওয়ার আগ পর্যন্ত অনেক নামাজ এক ওজু দ্বারা আদায় করতাম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। হজরত ইবনে উমর (রা.) থেকে নবী করিম ﷺ-এর একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, যে পবিত্র অবস্থায় ওজু করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য এর বিনিময়ে দশটি নেকি লিখবেন।

এই হাদিসটি ইফরিকি আবু গুতাইফ থেকে ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটি বর্ণনা করেছেন হুসাইন ইবনে হুরাইস আল মারওয়াজি। তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদিস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ আল-ওয়াসিতি আফরিকি হতে। এটি জয়িফ সনদ।

আলি বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ আল-কাত্তান বলেছেন, হিশাম ইবনে উরওয়ার নিকট এই হাদিসটি উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন, এ সনদটি মাশরেকি।

يتوضأ لكل صلوة : আবু দাউদের একটি বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, রাসূল ﷺ-এর জন্য প্রথমদিকে প্রতিটি নামাজের ক্ষেত্রে ওজু ওয়াজিব ছিলো। পরবর্তীতে এ হুকুম রহিত হয়ে যায়। অতএব, হতে পারে এ ঘটনা তখনকার। আর যদি পরবর্তী ঘটনা হয়ে থাকে তবে এটা মোস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

كنا نتوضأ وضوء واحدا : অর্থাৎ, এক ওজু দ্বারা অনেক নামাজ পড়তেন। এজন্য ইমাম নববি (র.) প্রমুখ এর ওপর ইজমা উদ্ধৃত করেছেন যে, নাপাক হওয়া ব্যতিত ওজু ওয়াজিব হয় না। শুধু কোনো কোনো সাহাবি থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা اذا قمتم إلى الصلوة দ্বারা প্রমাণ পেশ করে প্রতিটি নামাজের জন্য ওজু ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু ইবনে হুমামের বক্তব্য মুতাবেক এই আয়াতটি اقتضاء النص রূপে প্রমাণ করে যে, এখানে وانتم محدثون (নাপাক অবস্থায়) এর শর্তটি লক্ষণীয়। কেনোনা পরবর্তীতে এরশাদ রয়েছে ولكن يريد ليطهركم (কিন্তু আল্লাহ চান তোমাদের পবিত্র করতে) বস্তুত পবিত্রতা অর্জন নাপাক অবস্থায় হতে পারে। তাছাড়া এই আয়াতেই রয়েছে وان كنتم جنبا فاطهروا যেটি دلالة النص দ্বারা اذا قمتم -এ নাপাক হওয়ার শর্ত লক্ষণীয় বলে বোঝায়। তাছাড়া এই আয়াতে তায়াম্মুমকে ছোট নাপাকির শাখা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু স্থলাভিষিক্ত জিনিসটিই শাখা, সেহেতু মূলটি উত্তমরূপেই শাখা হবে।

فقال هذا اسناد مشرقی : মুহাদ্দিসিন যে সনদ হিজাজবাসির দ্বারা গঠিত সেটাকে اسناد مغربی আর কুফা ও বসরাবাসীদের দ্বারা যে সনদ গঠিত সেটাকে বলা হয় ইসনাদে মাশারেফি। ইমাম নববি (র.) বলেন, হাদিসের শক্তি ও দুর্বলতার সনদ মাশরেকি অথবা মাগরেবি হওয়ার ওপর নির্ভর করে না, বরং রাবিগণের নির্ভরযোগ্যতা ও অনির্ভরযোগ্যতার ওপর তা নির্ভর করে। অতএব, মনে রাখা উচিত যে, হিশাম ইবনে উরওয়ার উদ্দেশ্য নিজ বক্তব্যর মাধ্যমে এ হাদিসটিকে জয়িফ সাব্যস্ত করা। বস্তুত এ হাদিসটি অবশ্যই জয়িফ। কিন্তু মাশরেকি হওয়ার কারণে নয়; বরং আফরেকি রাবি জয়িফ হওয়ার কারণে।

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّهُ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ (صـ ١٩)

অনুচ্ছেদ- ৪৫ : রাসূল ﷺ একই ওজুতে অনেক নামাজ পড়তেন (মতন ১৯)

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ فَقَالَ عُمَرُ اِنَّكَ فَعَلْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ فَعَلْتَهُ؟ قَالَ عَمَدًا فَعَلْتُهُ.

৬১. **অর্থ :** হজরত সুলায়মান ইবনে বুরায়দার পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক নামাজের জন্য ওজু করতেন। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি সব নামাজ পড়েছেন এক ওজুতে এবং তাঁর মোজাদ্বয়ের ওপর মাসেহ করেছেন। ফলে হজরত উমর (রা.) তাঁকে বললেন, আজকে আপনি এমন একটি কাজ করলেন যা আগে করতেন না। এ শোনে নবী করিম ﷺ বললেন, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করেছি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। এ হাদিসটি আলি ইবনে কাদিম সুফিয়ান সাওরি থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি অতিরিক্ত আরেকটি অংশ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ওজু করেছেন একবার একবার (পানি দিয়ে)।

সুফিয়ান সাওরি (র.)ও এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুহারিব ইবনে দিছার সূত্রে সুলায়মান ইবনে বুরায়দা থেকে যে, নবী করিম ﷺ প্রতিটি নামাজের জন্য আলাদা আলাদা ওজু করতেন। আর ওয়াকি' সুফিয়ান সূত্রে মুহারিব হতে সুলায়মান ইবনে বুরায়দা সূত্রে তাঁর পিতা হতে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

আব্দুর রহমান ইবনে মাহদি প্রমুখ মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান-মুহারিব ইবনে দিছার-সুলায়মান ইবনে বুরায়দা-নবী করিম ﷺ সূত্রে। আর এটি ওকি'-এর হাদিস অপেক্ষা বিশুদ্ধতম। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত, অপবিত্র হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এক ওজুতে অনেক নামাজ পড়তে পারবে।

অনেকে প্রত্যেক নামাজের জন্য মোস্তাহাব ও মর্যাদা লাভের ইচ্ছায় স্বতন্ত্র ওজু করতেন।

আর ইফরিকি-আবু গুতাইফ-ইবনে উমর-নবী করিম ﷺ সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থা ওজু করবে আল্লাহ তা'আলা এর ফলে তাঁর জন্য লিখবেন দশটি নেকি।

এ সনদটি জয়িফ। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম ﷺ জোহর ও আসরের নামাজ এক ওজুতে পড়েছেন।

بَابُ فِى وُضُوْءِ الرَّجُلِ وَالْمَرْئَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ (١٩)

অনুচ্ছেদ-৪৬ : একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে পুরুষ ও মহিলার ওজু প্রসঙ্গে (মতন ১৯)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ حَدَّثَتْنِىْ مَيْمُوْنَةُ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ .

৬২. **অর্থ :** হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মায়মুনা (রা.) আমার নিকট হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরজ গোসল করতাম একই পাত্র থেকে (পানি নিয়ে)।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। এটি অধিকাংশ ফকিহের মত যে, একই পাত্র থেকে মহিলা ও পুরুষের গোসলে কোনো অসুবিধা নেই। এ অনুচ্ছেদে আলি, আয়েশা, আনাস, উম্মে হানি, উম্মে সুবাইয়াহ, উম্মে সালামা এবং ইবনে উমর (রা.) থেকে হাদিস বর্ণিত রয়েছে। আবু শা'ছার নাম জাবের ইবনে জায়দ।'

দরসে তিরমিযী

এখানে ইমাম তিরমিযী (র.) তিনটি অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন। প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে, নারী-পুরুষ এক পাত্র থেকে এক সঙ্গে গোসল করার সম্পর্কে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, নারীর পবিত্রতা অর্জনের পর অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা মাকরূহ হওয়া সম্পর্কে। তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, এ ব্যাপারে বৈধতার সুযোগ দান সম্পর্কে। মূলত এখানে কয়েকটি পদ্ধতি সম্ভব,

১. পুরুষের পবিত্রতা অর্জনের পর অবশিষ্ট পানি পুরুষ কর্তৃক ব্যবহার করা।

২. মহিলার অবশিষ্ট পানি মহিলা কর্তৃক ব্যবহার করা।

৩. মহিলার অবশিষ্ট পানি পুরুষ কর্তৃক ব্যবহার করা।

৪. পুরুষের অবশিষ্ট পানি মহিলা কর্তৃক ব্যবহার করা।

ওপরযুক্ত প্রতিটি পদ্ধতিতে দু'দুটি সুরত রয়েছে। হয়তো দু'জন গোসল করবে একসঙ্গে। কিংবা একের পর এক। এভাবে সর্বমোট আটটি পদ্ধতি হলো। ১. জমহুরে ফুকাহার মতে এ সবগুলো পদ্ধতিই জায়েজ। ২. কিন্তু

মহিলার পবিত্রতা অর্জনের পর অতিরিক্ত পানি দ্বারা গোসল অথবা ওজু করা ইমাম আহমদ (র.) এবং ইমাম ইসহাক (র.) মাকরূহ বলেন। তাঁরা প্রমাণ পেশ করেন باب كراهية فضل طهور المرأة এ বর্ণিত হজরত হাকাম গিফারি (রা.)-এর একটি হাদিস দ্বারা,

قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة ـ

'রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলার পবিত্রতা অর্জনের পর বেঁচে যাওয়া পানি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।'

এ হাদিসটি আবু দাউদ ইত্যাদিতেও বর্ণিত হয়েছে।

উক্ত অধ্যায়ের হাদিসটি জমহুরের প্রমাণ,

عن ابن عباس قال حدثنى ميمونة (رضـ) قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة ـ

এ হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, একত্রে গোসল করা বৈধ। আর একের পর এক অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করার বৈধতা হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর-ই অন্য একটি হাদিস দ্বারা বোঝা যায়। যেটি এখান থেকে বক্তব্যলিখিত হয়েছে তৃতীয় অনুচ্ছেদে,

قال إغتسل بعض ازواج النبى صلى الله عليه وسلم فى جفنة فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت يا رسول الله! انى كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب ـ

'রাসূল ﷺ-এর কোনো স্ত্রী গোসল করেছেন একটি পাত্র থেকে (পানি দিয়ে)। তারপর নবী করিম ﷺ তা থেকে ওজু করতে চাইলেন। ফলে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ওপর গোসল ফরজ ছিলো। এ শোনে নবী করিম ﷺ বলেন, পানি নাপাক হয় না।'

০ এ অনুচ্ছেদের হাদিসটির জবাব জমহুরের পক্ষ থেকে এই যে, এটি মাকরূহে তানজিহির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন 'ফাতহুল বারি'তে হাফেজ ইবনে হাজার (র.)।

০ হজরত আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (র.) বলেন, এই নিষেধাজ্ঞা মূলত পারিবারিক ও সামাজিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট। যেহেতু মহিলারা সাধারণত পুরুষের তুলনায় পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি কম গুরুত্বারোপ করে, সেহেতু তাদের পবিত্রতা অর্জনের পর অতিরিক্ত পানি ব্যবহারে স্বামীর কষ্ট হতে পারে। আর এ বিষয়টি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পারিবারিক সম্পর্কে অবনতির কারণ হতে পারে। এ জন্য তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

০ 'মা'আলিমুস্ সুনানে' আল্লামা খাত্তাবি (র.) একটি জবাব এই দিয়েছেন যে, এখানে فضل طهور দ্বারা উদ্দেশ্য ব্যবহৃত পানি। কিন্তু জমহুর এই জবাবটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেনোনা হাদিসটিকে ব্যবহৃত পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। মোটকথা, এ অনুচ্ছেদের হাদিসটিতে নিষেধাজ্ঞা দিক-নির্দেশনা পর্যায়ের শরিয়ত সংক্রান্ত নয়।

بَابُ كَرَاهِيَةِ فَضْلِ طُهُوْرِ الْمَرْأَةِ (١٩)

অনুচ্ছেদ- ৪৭ : মহিলার পবিত্রতার পর অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করা মাকরূহ প্রসঙ্গে (মতন ১৯)

عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ غِفَارٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَضْلِ طُهُوْرِ الْمَرْأَةِ ـ

৬৩. **অর্থ :** হজরত বনু গিফার গোত্রের এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলার পবিত্রতা অর্জনের পর বেঁচে যাওয়া পানি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, অনেক ফকিহ মহিলার পবিত্রতা অর্জনের পর বেঁচে যাওয়া পানি দ্বারা ওজু করা মাকরূহ মনে করেন। এটা আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর মত। তাঁরা মনে করেছেন, মহিলার পবিত্রতা অর্জনের পর অতিরিক্ত পানি ব্যবহার মাকরূহ।

কিন্তু মহিলার উচ্ছিষ্ট-অতিরিক্ত জিনিস ব্যবহার করাতে কোনো অসুবিধা মনে করেন না।

عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهٰى اَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُوْرِ الْمَرْاَةِ اَوْ قَالَ بِسُؤْرِهَا .

৬৪. অর্থ : 'মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার হাকাম ইবনে আমর আল-গিফারি হতে বর্ণিত যে, নবী করিম ﷺ মহিলার পবিত্রতা অর্জনের পর অতিরিক্ত পানি দিয়ে অথবা তিনি বলেছেন তাঁর উচ্ছিষ্ট দিয়ে পুরুষকে ওজু করতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এই হাদিসটি حسن। আবু হাজিরের নাম সাওয়াদা ইবনে আসেম। মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার তাঁর হাদিসে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষ কর্তৃক মহিলার পবিত্রতা অর্জনের পর অতিরিক্ত পানি দিয়ে ওজু করতে নিষেধ করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার এই হাদিসে সন্দেহের (অথবা উচ্ছিষ্ট-এর) কথা উল্লেখ করেননি।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ ذٰلِكَ (٢٠)

অনুচ্ছেদ- ৪৮ : এই প্রসঙ্গে অনুমোদন (মতন ২০)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ اِغْتَسَلَ بَعْضُ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِىْ جَفْنَةٍ فَاَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَنْ يَّتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنِّىْ كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ اِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ .

৬৫. অর্থ : হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা)-এর কোনো স্ত্রী একটি গামলা থেকে (পানি নিয়ে) গোসল করেছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তা থেকে ওজু করতে মনস্থ করলেন। তখন তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অপবিত্র ছিলাম (গোসল ফরজ ছিলো)। জবাবে তিনি বললেন, পানি অপবিত্র হয় না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। এটা সুফিয়ান সাওরি, মালেক ও শাফেয়ি (র.)-এর মাজহাব।

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْئٌ (٢٠)

অনুচ্ছেদ- ৪৯ : কোনো কিছু পানিকে নাপাক করতে পারে না (মতন ২০)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِىَ بِئْرٌ يُلْقٰى فِيْهَا الْحِيَضُ وَلُحُوْمُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْئٌ .

৬৬. **অর্থ :** আবু সায়িদ খুদরি (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলে আকরাম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি বীরে বুজা'আহ নামক কূপের (পানি) দ্বারা ওজু করবো? এটি এমন একটি কূপ যাতে ফেলা হয় মাসিকের নেকড়া এবং (মরা) কুকুরের গোশত ও ময়লা আবর্জনা। তখন জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, পানি পবিত্র, তাকে কোনো কিছু অপবিত্র করতে পারে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি حسن। আবু উসামা এ হাদিসটি উত্তমরূপে বর্ণনা করেছেন। আবু উসামা যেমন বর্ণনা করেছেন তার চেয়ে উত্তম হলো, বুজা'আ কূপ সম্পর্কে আবু সায়িদ (রা.)-এর হাদিস।'

একাধিক সূত্রে এ বর্ণনাটি আবু সায়িদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস ও আয়েশা (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

দরসে তিরমিযী

পানির হুকুম-আহকাম[১]

ইমাম তিরমিযী (র.) এখান থেকে পানির হুকুম-আহকাম সংক্রান্ত আলোচনা আরম্ভ করছেন। প্রথম তিনটি অনুচ্ছেদে প্রথমটি ইমাম মালেক (র.), দ্বিতীয়টি ইমাম শাফেয়ি (র.) এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদটি ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মাজহাব অনুযায়ি।

ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে পানির পবিত্রতা ও অপবিত্রতা সংক্রান্ত বিষয়টি প্রচণ্ড বিতর্কিত মাসায়িলের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে ফুকাহার বক্তব্য বিশেরও অধিক। তা সত্ত্বেও এ মাসআলায় প্রসিদ্ধ মাজহাব চারটি,

১. হজরত আয়েশা, হাসান বসরি, দাউদ জাহেরির মাজহাব বলে বলা হয় যে, পানি চাই কম হোক বা বেশি যদি তাতে নাপাক পতিত হয়, তবে সেটা ততোক্ষণ পর্যন্ত নাপাক হবে না; বরং পবিত্র থাকবে যতোক্ষণ পর্যন্ত তার স্বভাব। অর্থাৎ, তরলতা শেষ না হয়ে যায়। চাই তার তিনটি গুণ পরিবর্তিত হোক না কেনো।

হজরত গাঙ্গুহি (র.) বলেন, যদি হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা দ্বারা এ মাজহাবটি প্রমাণিত হতো, তবে এটি হতো সবচেয়ে শক্তিশালী মাজহাব। কেনোনা হজরত আয়েশা (রা.) পানি সংক্রান্ত মাসায়িল সবচেয়ে বেশি জানতেন এবং এ ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর নিকট বেশি বেশি শরণাপন্ন হতেন। কিন্তু বিশুদ্ধ হলো, এই মাজহাবটি হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনাগতভাবে প্রমাণিত নয়।

২. ইমাম মালেক (র.)-এর পছন্দনীয় মাজহাব হলো, যতোক্ষণ পর্যন্ত পানির তিন গুণের একটি পরিবর্তিত না হবে ততোক্ষণ পর্যন্ত নাপাক পতিত হলে তা অপবিত্র হয় না। চাই পানি কম হোক বা বেশি।

৩. ইমাম শাফেয়ি, ইমাম আহমদ (র.)-এর মাজহাব হলো, যদি পানি কম হয় তবে অপবিত্র বস্তু পতিত হলে তা অপবিত্র হয়ে যাবে। যদিও তার কোনো একটি গুণও পরিবর্তিত না হোক। আর যদি পানি বেশি হয়, তবে অপবিত্র হবে না। যতোক্ষণ না এর অধিকাংশ গুণ পরিবর্তিত হয়। পক্ষান্তরে বেশির পরিমাণ তাদের মতে দুই কুল্লা (মটকা)। আর এই পরিমাণটি অনুমান স্বরূপ নয়, বরং প্রকৃত। এমনকি ইমাম নববি (র.) লিখেছেন, যদি এক কুল্লা পানিতে নাপাকি পতিত হয়, তবে সেটি নাপাক হয়ে যাবে। কিন্তু যদি তাতে এক কুল্লা পবিত্র পানি রেখে দেওয়া হয় তবে পূর্ণ পানি পাক হয়ে যাবে। আর এরপর যদি পুনরায় উভয়টিকে আলাদা আলাদা করে ফেলা হয়, তবে নাপাকি ফিরে আসবে না।

টীকা- ১. আবু ইসমা (রা.) বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (র.) এ প্রসঙ্গে ১০x১০ নির্ণয় করতেন। তারপর তিনি ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর বক্তব্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। বলেছেন, আমি কিছুই নির্ধারণ করবো না। -ইবনুল হুমাম (র.)....... । (তারপর তিনি বলেছেন) কাপড়ের গজ ধর্তব্য জনসাধারণের প্রতি উদারতার খাতিরে। গজ হলো, সাত মুষ্টি পরিমাণ। প্রতিটি মুষ্টির ওপর এক আঙুল দাঁড়ানো। মুহিদ নামক গ্রন্থে আছে বিশুদ্ধতম হলো, প্রতিটি স্থান ও কালে সেখানকার গজ ধর্তব্য মনে করা হয়। অনুরূপ বলেছেন আল্লামা শুমুন্নি (র.)। -লামআতুত তানকিহ : ২/১৩৭

৪. হানাফিদের মাজহাব, যেটি শাফেয়ি মতাবলম্বীদের নিকটবর্তী। পার্থক্য এটুকু যে, হানাফিদের মতে কম ও বেশির কোনো পরিমাণ সুনির্দিষ্ট নেই। বরং ইমাম আবু হানিফা (র.) এটাকে ছেড়ে দিয়েছেন مبتلى به (পরিস্থিতির শিকার বা কোনো বিষয়ে লিপ্ত ব্যক্তি)-এর মতের ওপর। অবশ্য ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে এতোটুকু সীমাবদ্ধতা অবশ্যই আছে যে, যেই পানিতে নাপাকির আছর অপর প্রান্তে পৌঁছে সেটি কম, আর যাতে তা না হবে তা বেশি পানি। এটাকেই ইমাম কুদুরি (র.) ব্যক্ত করেছেন مالم يتحرك بتحريك الطرف الاخر দ্বারা।

দৈর্ঘ্য প্রস্থে দশ হাত দশ হাত (১০০ ক্ষেত্রফল)-এর যে নির্দিষ্ট সীমা প্রসিদ্ধ পরবর্তী ফুকাহায়ে কেরামের নিকট হয়ে গেছে, সেটি আয়িম্মায়ে মাজহাব থেকে বর্ণিত নয়। এর বাস্তবতা শুধু এতোটুকু যে, একবার আবু সুলায়মান জাওজেজানি (র.) উস্তাদ ইমাম মুহাম্মদ (র.)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, কতোটুকু পানি বেশি বলে ধর্তব্য হবে? জবাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, كمسجدى هذا অর্থাৎ, আমার এই মসজিদের ন্যায়। পরবর্তীতে আবু সুলায়মান জাওজেজানি (র.) এই মসজিদটি পরিমাপ করেছিলেন। তখন দেখা গেলো, ভেতর থেকে ৮×৮ আর বাহির থেকে ১০×১০ ছিলো। সতর্কতামূলক ১০×১০ গ্রহণ করা হয়েছে।[১] অতএব, হাকিকত সেটাই যে, হানাফিরা বেশির কোনো নির্ধারিত পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করেননি এবং এটাকে مبتلى به -এর রায়ের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তথা مبتلى به পানির যে পরিমাণকে বেশি মনে করে তার ওপর বেশির বিধিবিধান চালু হবে। হ্যাঁ, মূর্খ জনসাধারণের ক্ষেত্রে সহজের দিকে লক্ষ্য করে পরবর্তীগণ গ্রহণ করেছেন ১০×১০-এর বক্তব্যকে।

হাদিসে বীরে বুজা'আহ

নিজের মাজহাবের স্বপক্ষে ইমাম মালেক (র.) এ অনুচ্ছেদে প্রমাণ পেশ করেছেন বীরে বুজা'আর হাদিস দ্বারা।

عن أبى سعيد الخدرى قال قيل يا رسول الله انتوضأ من بير بضاعة

তিরমিযী শরিফের কপিতে আছে نتوضأ মুতাকাল্লিমের শব্দ (উত্তম পুরুষ)। আর অন্যান্য বর্ণনায় تتوضأ হাজিরের সীগা রয়েছে এবং এ বর্ণনাটিই প্রধান। بضاعته শব্দটি ب -এর মধ্যে পেশ এবং যের উভয়টি জায়েজ। অবশ্য পেশ অধিক প্রসিদ্ধ। এটি একটি প্রসিদ্ধ কূপের নাম। যেটি মদিনা তাইয়িবায় বনু সাইদা মহল্লায় অবস্থিত এবং এখন পর্যন্ত রয়েছে।

وهى بير يلقى فيها الحيض : এখানে حيض শব্দটিতে ح -এর নিচে যের। ى -এর ওপর যবর। এটি حيضة -এর বহুবচন। অর্থ- এমন কাপড়ের টুকরা যেটা মহিলারা ব্যবহার করে মাসিকের সময়।

ولحوم الكلاب والنتن : نتن এর ن -এর মধ্যে যবর এবং ت সাকিন। অনেকে ت -এর নিচে যের বলেছেন। এর অর্থ দুর্গন্ধ। এখানে উদ্দেশ্য দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস।

فقال رسول الله ان الماء طهور لا ينجسه شئ : প্রমাণের স্থল হলো, এই শেষ বাক্যটি। এখানে কোনো শর্ত-শরায়েত নেই। সম্পূর্ণ নিঃশর্ত।

০ হানাফিদের পক্ষ থেকে এই প্রমাণের জবাব এবং বর্ণনাটির ব্যাখ্যা অনুধাবনের পূর্বে এখানে দুটি বিষয় মনে রাখা উচিত। প্রথম কথা হলো, এ হাদিসের নিঃশর্ততা ও ব্যাপকতার ওপর স্বয়ং ইমাম মালেক (র.) ও আমল করেন না। কারণ, এ হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, যদি পানির গুণাবলি পরিবর্তিত হয়ে যায় তবুও পবিত্র থাকবে, নাপাক হবে না। অথচ ইমাম মালেক (র.) এর প্রবক্তা নন। অতএব, তিনিও এই নিঃশর্ততাকে শর্তায়িত করার জন্য বাধ্য।

০ এর জবাবে অনেক মালেকি মতাবলম্বি বলেছেন যে, ইমাম মালেক (র.) এ শর্তায়নও হাদিসের ভিত্তিতেই করেছেন। কেনোনা, দারাকুতনিতে হজরত সাওবান (রা.) হজরত আবু উমামা (রা.) থেকে এবং ইবনে মাজায় শুধু আবু উমামা (রা.) থেকে এ হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

ان الماء طهور لا ينجسه شئ الا ما غلب على طعمه او لونه أو ريحه .

তবে 'তালখিসুল হাবিরে' : ১/১৫ হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বিস্তারিতভাবে প্রমাণ করেছেন যে, হজরত সাওবান (রা.) ও আবু উমামা (রা.)-এর এ বর্ণনা সহিহ নয়। কারণ, এটি নির্ভর করে রিশদিন ইবনে সা'দের ওপর, যিনি অপাংক্তেয় এবং ইমাম দারাকুতনি (র.) এই অতিরিক্ত অংশ বর্ণনা করার পরে লিখেছেন– لا يثبت هذا الحديث তথা এ হাদিসটি প্রমাণিত নয়। অতএব, তিনগুণ পরিবর্তিত না হওয়ার দ্বারা হাদিসকে সত্যায়িত করা কোনো সহিহ হাদিসের ভিত্তিতে হলো না; বরং ইমাম মালেক (র.) কিয়াস এবং মূলনীতির ভিত্তিতে এই সত্যায়ন করেছেন। ইমাম মালেক (র.) যেহেতু হাদিসের ব্যাপকতাকে সত্যায়িত করতে পারেন, সেহেতু অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে এটাকে কোনো বিশেষ শর্তে শর্তায়িত করা হানাফি এবং শাফেয়িদেরও অধিকার রয়েছে।

০ আরেকটি কথা হলো, এ হাদিসের শব্দগুলো এবং পূর্বাপর প্রমাণ করছে যে, এটি বাহ্যিক অর্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আর এ হাদিসটিকে যদি এর বাহ্যিক অর্থে প্রযোজ্য ধরা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে بضاعة কুয়ায় হায়েজের কাপড়, মৃত কুকুরের গোশত এবং অন্যান্য দুর্গন্ধ জাতীয় জিনিস নিয়মিত ফেলার অভ্যাস ছিলো। যেনো এ কুয়াটি দ্বারা ডাস্টবিন বা ময়লা ফেলার কাজ নেওয়া হতো। অথচ এ কথাটি দু'কারণে নেওয়ায়েত যৌক্তিক নয়।

১. হেজাজে পানি পাওয়া যেতো খুবই কম, এজন্য সাহাবায়ে কেরাম জেনে শুনে তাতে নাপাক ফেলবেন তা অযৌক্তিক। কমপক্ষে পরিচ্ছন্নতার আবেদন হলো, কুয়াকে এসব জিনিস থেকে পবিত্র রাখা। কেউ কেউ বলেছেন, এসব নাপাক ফেলতো মুনাফিকরা। কিন্তু হজরত শাহ সাহেব (র.) এর বক্তব্য মতে পরিচ্ছন্নতা একটি মানবিক বিষয়, তাতে কোনো মুনাফিকের কাছ থেকেও এমন আচরণ আশা করা যায় না।

২. যদি বাস্তবেই ময়লা ফেলার কাজ নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে পানির গুণাবলি পরিবর্তিত হওয়াই স্বাভাবিক। ইমাম আবু দাউদ (র.)-এর সুস্পষ্ট বিবরণ মুতাবেক সে কুয়াটির পরিমাণ ছিলো ছয় হাত। তাতে পানি কমপক্ষে হাঁটু বা উর্ধ্বে নাভি পর্যন্ত থাকতো। অতঃপর এটা কিভাবে সম্ভব যে তাতে মাসিকের কাপড় এবং মৃত জিনিস নিক্ষেপ করা হবে? অথচ এ পানির তিনটি গুণ অপরিবর্তিত থাকবে? এমন সময় স্বয়ং ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, এর নাপাক হওয়ার বিষয়টিতে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না। অথচ যদি হাদিসের বাহ্যিক অর্থের ওপর আমল করতে হয়, তাহলে উচিত পানির গুণ পরিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও পবিত্র বলা। অথচ স্বয়ং ইমাম মালেক (র.)-এর প্রবক্তা নন। এ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হাদিসের বাহ্যিক শব্দ দ্বারা যে দৃশ্য সামনে আসে তা মূলত উদ্দেশ্য না।

হানাফিদের পক্ষ থেকে এই ভূমিকার পর এ হাদিস সংক্রান্ত যেসব ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য করা যাক।

১. বুজা'আ কূপ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের এই প্রশ্ন নাপাক প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে ছিলো না; বরং তা ছিলো নাপাকের ধারণা ও কল্পনা নির্ভর। মূলত এ কূপটি ছিলো নিম্ন ভূমিতে অবস্থিত। এর চারদিকে জনবসতি ছিলো। সাহাবায়ে কেরাম আশঙ্কা করলেন যে, এর চতুর্দিকে যেসব নাপাক পড়ে থাকে সেগুলো বাতাসে উড়ে অথবা বৃষ্টির ফলে বয়ে এসে হয়তো এই কুয়ার মধ্যে পড়তে পারে। এসব ধারণার কারণে সাহাবায়ে কেরাম এর পবিত্রতা ও অপবিত্রতা সম্পর্কে প্রিয়নবী ﷺ-এর নিকট প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু এসব ধারণা শুধু ওয়াসওয়াসা ও কল্পনা ছিলো প্রত্যক্ষ্যভাবে দর্শননির্ভর ছিলো না, এজন্য রাসূল ﷺ মনের ওয়াসওয়াসা দূর করার জন্য দার্শনিক সুলভ জবাব দিয়েছেন,

إن الماء طهور لا ينجسه شئ- 'তথা পানি পবিত্র, এটাকে কোনো কিছুই অপবিত্র করতে পারে না।'

এই ব্যাখ্যার সারনির্যাস হলো, الماء শব্দটির ال - عهد خارجى তথা সুনির্দিষ্ট বস্তু বোঝানোর জন্য। এর দ্বারা উদ্দেশ্য বিশেষভাবে বুজা'আ কূপের পানি। আর لا ينجسه شئ -এর অর্থ হলো, لا ينجسه شئ مما تتوهمون

(তোমাদের কাল্পনিক কোনো কিছু এটাকে নাপাক করে না।) এই অনুচ্ছেদে এ হাদিসটির ব্যাখ্যা অধমের নিকট সর্বপ্রধান, সর্বোৎকৃষ্ট ও আসাহ।

২. অনেকে দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি এমন দিয়েছেন যে, يلقى فيه الحيض মূলত كان يلقى فيه الحيض -এর অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ, বর্বরতার যুগে বিভিন্ন ধরণের অপবিত্র ময়লা ইত্যাদি বুজা'আহ কূপে ফেলা হতো। ইসলামের পর এই ধারা বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে এই সন্দেহ থেকে যায় যে, যদিও এখন কূপ পরিষ্কার হয়ে গেছে। কিন্তু তার দেওয়ালগুলোতে এখন পর্যন্ত নাপাকির আছর হয়তো অবশিষ্ট রয়ে গেছে। এর ফলে তারা প্রশ্ন করলেন, এতে প্রিয়নবী ﷺ স্বীয় এরশাদের মাধ্যমে তাদের সে ধারনা দূর করলেন।

প্রশ্ন : ৩. তৃতীয় ব্যাখ্যা 'শরহে মা'আনি আছারে' ইমাম তাহাবি (র.) এই করেছেন যে, বুজা'আহ কূপের পানি ছিলো প্রবাহিত। এর সহায়তায় তিনি একটি বর্ণনা পেশ করেছেন, إنها كانت سيحا تجرى (এটি ছিলো প্রবাহিত) এবং يستقى منه البساطين তথা এর পানি দ্বারা বাগানগুলোতে সিঞ্চন করা হতো– শব্দ এসেছে। 'তালখিসুল হাবির' : ১/১৪তে হাফেজ ইবনে হাজার (র.) অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। ইমাম তাহাবি (র.)-এর এই ব্যাখ্যায় একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে যে, এই কুয়াটি চালু হওয়া অযৌক্তিক। কারণ, কূপটি ছোট ছিলো।

জবাব : এর জবাব এই দেওয়া হয়েছে যে, এটি জারি বা প্রবাহিত হওয়ার অর্থ নদী এবং সমুদ্রের মতো প্রবাহিত হওয়া নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হলো, এই কূপ থেকে বালতি ইত্যাদির মাধ্যমে উদ্যানগুলোতে সেচের কাজের জন্য রীতিমতো পানি তোলা হতো। কূপ যেহেতু ছোট ছিলো সেহেতু নিশ্চয় একবার বাগান সিঞ্চন করার জন্য সব পানি চলে আসতো। নাপাক পতিত হওয়ার কারণে সেটি প্রভাবিত হতো না।

প্রশ্ন : ৪. ইমাম তাহাবি (র.)-এর ব্যাখ্যায় একটি মজবুত প্রশ্ন এই করা হয় যে, তার ওপরযুক্ত বর্ণনাটি ওয়াকিদি থেকে বর্ণিত, অথচ তিনি জয়িফ।

জবাব : কোনো কোনো হানাফি আলেম-এর জবাব দিয়েছেন যে, ওয়াকিদি যদিও হাদিসের ক্ষেত্রে জয়িফ; কিন্তু ইতিহাস ও সিরাতের ক্ষেত্রে তিনি ইমাম– তাঁর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য। আর এ বিষয়টি ইতিহাস সংক্রান্ত। কিন্তু এ জবাবটি ইনসাফের দৃষ্টিতে জয়িফ। প্রথমতো এ কারণে যে, ওয়াকিদি স্বয়ং ইতিহাস ও সিরাতের ক্ষেত্রেও বিতর্কিত রাবি। তত্ত্বজ্ঞানী ঐতিহাসিকগণের একটি দল তাকে ইতিহাসের ক্ষেত্রেও উপাখ্যান রচয়িতা সাব্যস্ত করেন।

দ্বিতীয়তো, যদিও ইতিহাসে তাঁর বক্তব্য গ্রহণ করাও হয়, তা সত্ত্বেও যে ঐতিহাসিক বর্ণনার ওপর কোনো ফিক্‌হি বিষয় নির্ভরশীল সেটাকে পরখ করার জন্য جرح وتعديل-এর সে মূলনীতিই ব্যবহার করতে হবে, যেগুলো ফিক্‌হি বর্ণনা পরখ করার জন্য সুনির্দিষ্ট, ইতিহাসের জন্য নয়। এ হিসেবে কোনো ফিক্‌হি মাস'আলায় এ বর্ণনাটি প্রমাণ পেশ করা দ্বারা ঠিক না।

৫. অনেকে বুজা'আ কূপ সংক্রান্ত হাদিসের ওপর সনদগতভাবেও আপত্তি তুলেছেন। বলেছেন সনদগত দুর্বলতার কারণে এ হাদিসটি প্রমাণযোগ্য নয়। একতো এ কারণে যে, এ হাদিসটি নির্ভর করে ওয়ালিদ ইবনে কাসিরের ওপর, যাকে দুর্বল সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর অনেকে তাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন খারেজিদের ইব্বাজি ফিরকার মধ্যে। তবে ইনসাফের কথা হলো, ওয়ালিদ ইবনে কাসির হাসান হাদিসের রাবিদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর হাদিসগুলো গ্রহণযোগ্য[১]। তাই হাফেজ ইবনে মাইন (র.) প্রমুখ তাকে নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন। যদি মেনে নিই, তিনি ইব্বাজি ফিরকার সাথে সম্পৃক্ত, তাহলেও উসুলে হাদিসে এই সিদ্ধান্ত আছে যে, বিদআতি যদি আদেল

টীকা- ১. ইবনুল জাওজি (র.) বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম দারাকুতনি (র.) বলেছেন, এটা প্রমাণিত নয়। এটা আমরা তার 'ইলালে' দেখিনি না তার 'সুনানে'। দারাকুতনি ইলালে ইবনে ইসহাক (র.) প্রমুখের ব্যাপারে মতবিরোধ উল্লেখ করেছেন। তিনি ইবনে ইসহাকের ব্যাপারে বক্তব্যের শেষের দিকে উল্লেখ করেছেন, 'সর্বোত্তম সনদবিশিষ্ট হাদিস হলো, ওয়ালিদ ইবনে কাসির-মুহাম্মদ ইবনে সা'দ তথা অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে রাফে' সূত্রে-আবু সায়িদ (রা.) হতে বর্ণিত হাদিস। (২য় পৃষ্ঠা...)

ও সেকাহ হয় তাহলে তার হাদিসগুলো মকবুল হয়। তবে শর্ত হলো, সে বর্ণনাটি তার মাজহাবের সহযোগিতায় যেনো না হয়। হাদিসটির দুর্বলতার দ্বিতীয় কারণ বলা হয় যে, এর সনদে মুহাম্মদ ইবনে কা'বের পর ইজ্তেরাব (গড়মিল) রয়েছে। অনেক বর্ণনায় আছে, عبيد الله بن عبد الله بن رافع عن ابن خديج আবার কোনোটিতে রয়েছে- عبد الرحمن بن رافع بن خديج কোনোটিতে আছে, عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج কোনোটিতে রয়েছে- عبد الله بن رافع بن خديج। কিন্তু সত্য কথা হলো, দুর্বলতার কারণ এই ইজতেরাব নয়। কেনোনা মুহাদ্দিসিনে কেরাম এই চারটি সূত্র থেকে عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج এর সূত্রটিকে প্রধান সাব্যস্ত করেছেন। আর প্রাধান্য দেওয়া হলে ইজতেরাব অবশিষ্ট থাকে না। তাই ইমাম তিরমিযী (র.) এ হাদিসটিকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন। অতএব, এ হাদিসের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা সেটি যেটি সর্বপ্রথম বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া সে ব্যাখ্যাটির মাধ্যমে সমস্ত বর্ণনায় মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানও সম্ভব হয়।

بَابٌ مِّنْهُ أُخَرُ (صــ ٢١)

অনুচ্ছেদ- ৫০ : এমন আরেকটি অনুচ্ছেদ (মতন ২১)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُسْئَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُوْنُ فِى الْفَلَاةِ مِنَ الْاَرْضِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ؟ قَالَ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخُبْثَ

৬৭. অর্থ : হজরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলাল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমি এমন ধরণের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি যা জমা হয়ে থাকে অরণ্যভূমি ও মানবশূন্য প্রান্তরে। বিভিন্ন ধরনের হিংস্র প্রাণী ও বন্য জন্তু-জানোয়ার পালায় পালায় এসে থাকে। রাবি বলেন, তখন রাসূল ﷺ জবাব দিলেন, পানি যখন দুই মটকা পরিমাণ হয়, তা তখন অপবিত্র হয় না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেছেন, মটকা হলো, গড়া বা বড় মটকা এবং যেটি ব্যবহার করা হয় পান করানোর জন্য।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এটি হলো, শাফেয়ি আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর বক্তব্য। তাঁরা বলেছেন, যখন পানি দুই মটকা পরিমাণ হয় তখন আর এটাকে কোনো কিছুই অপবিত্র করতে পারে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তার ঘ্রাণ অথবা স্বাদ পরিবর্তিত না হয়। তাঁরা বলেছেন, এটা প্রায় পাঁচ কলসি পরিমাণ হয়ে থাকে।

দরসে তিরমিযী

হাদিসুল কুল্লাতাইন

ইমাম শাফেয়ি (র.) তার মতের পক্ষে প্রমাণ পেশ করেন পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর বর্ণনা দ্বারা,

---

পূর্বের টীকা- ইবনুল কাত্তান (র.) আবু সায়িদ (র.) থেকে এর রাবি অজ্ঞাত বলে এটিকে মা'লুল বা ত্রুটিযুক্ত সাব্যস্ত করেছেন। এমনিভাবে এ রাবির নামের ক্ষেত্রে এ তার পিতার নামের ক্ষেত্রে বর্ণনাকারিদের ইখতেলাফের কারণেও এটিকে ত্রুটিযুক্ত বলেছেন। ইবনুল কাত্তান (র.) বলেছেন, এসব সনদ ছাড়াও এর আরেকটি উত্তম সূত্র রয়েছে। কাসেম ইবনে আসবাগ তার মুসান্নাফে বলেছেন,

حدثنا محمد بن وضاح حدثنا عبد الرحمن بن ابى السفينة الحلبى بحلب حدثنا عبد العزيز بن ابى حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله انك تتوضأ من بير بضاعة وفيها ما ينجى الناس والمحائض والخبث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شئ -

ইবনে হাজার (র.) বলেছেন, 'ইবনে আবু সাকিনা নামক রাবি যাকে ইবনে হাজম (র.) মশহুর মনে করেছেন, ইবনে আব্দুল বার (র.) প্রমুখ বলেছেন, ইবনে আব্দুল বারসহ এবং আরও একাধিক ব্যক্তি তার সম্পর্কে বলেছেন যে, 'তিনি অজ্ঞাত। তার থেকে হাদিস বর্ণনাকারি মুহাম্মদ ইবনে ওয়াজ্জাহ ব্যতিত আর কাউকে আমরা পাইনি।' -তালখিসুল হাবির : ১/১৩

قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسئل عن الماء يكون فى الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب؟ قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث .

কুল্লাতাইনের পরিমাণকে এ হাদিসে বেশি সাব্যস্ত করা হয়েছে।

০ এরও বিভিন্ন রকম জবাব হানাফিদের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। 'হিদায়া' গ্রন্থকার এর একটি জবাব দিয়েছেন, لم يحمل الخبث এর অর্থ এটি নাপাকি বরদাশত করতে পারে না, ইমাম আবু দাউদ (র.) এটিকে জয়িফ বলেছেন। কিন্তু যেহেতু আবু দাউদের প্রসিদ্ধ কপিগুলোতে সুস্পষ্ট কোনো জয়িফ সাব্যস্তকারি বক্তব্য পাওয়া যায় না, এ কারণে 'হিদায়া' গ্রন্থকারের বিরুদ্ধে শোর হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায় যে, তিনি আবু দাউদের প্রতি জয়িফ সাব্যস্ত করার ভ্রান্ত বক্তব্য করেছেন।

০ কোনো কোনো হানাফি এর জবাবে বলেছেন, আবু দাউদ দ্বারা উদ্দেশ্য আবু দাউদ সিজিস্‌তানি-সুনান গ্রন্থকার আবু দাউদ নন, বরং আবু দাউদ তায়ালিসি উদ্দেশ্য। কিন্তু এ বক্তব্যটি প্রথমতো এ জন্য অযৌক্তিক যে, যখন সাধারণত আবু দাউদ বলা হয় তখন আবু দাউদ সিজিস্‌তানিই উদ্দেশ্য হয়, আবু দাউদ ত্বায়ালিসি নয়।

০ দ্বিতীয়তো, হযরত শাহ সাহেব (র.) বলেছেন, স্বয়ং অধমও এ হাদিসটি মুসনাদে ত্বায়ালিসিতে দেখেছে সেখানেও জয়িফ সাব্যস্ত করা হয়েছে, এমনটি নেই।

০ তাই অনেকে জবাব দিয়েছেন যে, এখানে উদ্দেশ্য আবু দাউদ সিজিস্‌তানিই। তিনি যদিও সুস্পষ্টভাবে এ হাদিসটিকে জয়িফ সাব্যস্ত করেননি, কিন্তু এ হাদিসের ইজতেরাব বর্ণনা করেছেন, যেটি জয়িফ সাব্যস্ত করার স্থলাভিষিক্ত। কিন্তু এ জবাবটিও সঠিক নয়। কেনোনা আবু দাউদের বর্তমান কপিতে ইজতেরাবের বিবরণের সাথে সাথে প্রধানটির প্রাধান্যও দেওয়া আছে। আর প্রাধান্য প্রদানের সময় ইজতেরাব বাকি থাকে না। আবু দাউদের এবারত নিম্নেযুক্ত,

هذا لفظ ابن العلاء وقال عثمان والحسن بن على عن محمد بن عباد بن جعفر قال أبو داود والصوات إلى محمد بن جعفر .

০ সুতরাং বিশুদ্ধ জবাব হলো, আবু দাউদের বর্তমান কপিতে কোথাও পাওয়া যায়নি যে, এটিকে জয়িফ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু عناية গ্রন্থকার আবু দাউদের একটি এবারতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাতে সুস্পষ্ট ভাষায় জয়িফ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এই এবারতটি আবু দাউদ লু'লুয়ির বর্তমান প্রচলিত কপিগুলোতে তো নেই, কিন্তু আলি ইবনুল হাসানের কপিতে নিশ্চয় মওজুদ থাকবে যেটি বর্তমানে পাওয়া যায় না। এতে রাবিদের ওপর অনেক আলোচনা রয়েছে। প্রবল ধারণা عناية ও هداية গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সে কপিটিই ছিলো।

০ মোটকথা, কুল্লাতাইনের হাদিসের একটি জবাব দেওয়া হয়েছে যে, হাদিসটি জয়িফ। কারণ,এ হাদিসটি নির্ভর করে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের ওপর নির্ভর করে। তিনি জয়িফ। তাছাড়া এ হাদিসটিতে সনদ, মতন, অর্থ ও বাস্তব প্রয়োগে প্রচণ্ড ইজতেরাব লক্ষণীয়।

সনদগত ইজতেরাবের বিশ্লেষণ হলো, কোনো কোনো সূত্রে এই উদ্ধিতিটি বর্ণিত হয়েছে الزهرى عن سالم عن محمد بن جعفر عن عبيد الله عن بن عمر সনদে। কোনোটিতে عن بن عمر رضى الله تعالى عنه সূত্রে। অতঃপর ওয়ালিদ ইবনে কাসিরের কোনো কোনো সূত্রে عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله عن عنه رضى الله আবার কোনোটিতে عن محمد بن عباد بن جعفر এসেছে। অতঃপর সাহাবি থেকে বর্ণনাকারির নামেও মতপার্থক্য রয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় তাঁর নাম উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আর কোনোটিতে

আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া হাম্মাদ ইবনে সালামা সূত্রে হাদিসটি মওকুফ না মারফু' এ ব্যাপারে ইজতেরাব পাওয়া যায়। অর্থাৎ, অনেক সূত্রে এটি ইবনে উমর (রা.)-এর ওপর মওকুফ, যেমন আবু দাউদের মত। আর কোনো সূত্রে মারফু', যেমন আলোচ্য অধ্যায়ে ইমাম তিরমিযী (র.)-এর অভিমত।

ইবারতের দিক দিয়ে ইজতেরাবের ব্যাখ্যা হলো, অনেক বর্ণনায় اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث এসেছে। আবার কোনোটিতে قلتين أو ثلاثا যেমন, দারাকুতনি এবং ইবনে আদি (র.) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনিতেই বিভিন্ন সূত্রে أربعين قلة বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি সূত্রকে শায়খ ইবনে হুমাম (র.) ও সহিহ সাব্যস্ত করেছেন। তাছাড়া ইমাম দারাকুতনি (র.) কোনো কোনো হাদিস এমন বর্ণনা করেছেন, যেগুলোতে বর্ণিত হয়েছে أربعين دلوا يا أربعين غربا শব্দ।

অর্থের দিক দিয়ে ইজতেরাবের বিবরণ হলো, কামূস গ্রন্থকারের বক্তব্য মতে কুল্লার বিভিন্ন অর্থ হয়, পাহাড়ের চূড়া, মানুষের দেহ, মটকা। কোনো একটি অর্থ এখানে নির্ধারণ করা কঠিন।

আল্লামা ইবনে নুজায়ম (র.) বলেন যে, এই তিন প্রকারের ইজতেরাব ব্যতিত আরো একটি ইজতেরাব রয়েছে কুল্লার বাস্তব প্রয়োগ ক্ষেত্রে। অর্থাৎ, যদি কুল্লার অর্থ মটকাই মেনে নেওয়া হয়, যেমন ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মাজহাব, তাহলেও মটকার দেহাকৃতি বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। তা থেকে কোনো একটি নির্ধারণ করা মুশকিল। কেনোনা হাদিসে এটি সুনির্দিষ্ট করা হয়নি যে মটকা কত বড় উদ্দেশ্য হবে। যদি বলা হয় যে, দারাকুতনির এক বর্ণনায় من قلال هجر শব্দ এসেছে। যা থেকে বোঝা যায় ইয়েমেনের হাজার নামক স্থানের মটকা উদ্দেশ্য, তাহলে এর জবাব হবে যে, এই অতিরিক্ত শব্দটি শুধু মুগিরা ইবনে ছাকলাব উল্লেখ করেছেন। যিনি মুহাদ্দিসিনের সুস্পষ্ট শব্দটি শুধু মুগিরা ইবনে ছাকলাব উল্লেখ করেছেন। যিনি মুহাদ্দিসিনের সুস্পষ্ট বিবরণ মুতাবেক 'মুনকারুল হাদিস'। আবার কোনো কোনো মুহাদ্দিস তাঁর সম্পর্কে এর চেয়েও অধিক কঠোর বাক্য ব্যবহার করেছেন। এজন্য স্বয়ং দারাকুতনি (র.) এই অতিরিক্ত শব্দটিতেও অরক্ষিত বলে সাব্যস্ত করেছেন। মোটকথা, কুল্লার বাস্তব প্রয়োগ ক্ষেত্রে ইজতেরাব রয়েছে। তাই হাফেজ ইবনে হাজার (র.)-এর নির্দিষ্টকরণে ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর নয়টি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। যার কারণ হলো, প্রথমতো না ইমাম শাফেয়ি (র.) কুল্লা দ্বারা হাজারের মটকা উদ্দেশ্য করেছেন। কারণ, রাসূল ﷺ-এর যুগে এটির প্রচলন বেশি ছিলো। কিন্তু ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর যুগে এর প্রচলন খতম হয়ে যায়। তখন তিনি মশক বা চর্মপাত্র দ্বারা তা নির্ধারণ করেছেন। কোনো বক্তব্য মুতাবেক ৫ মশক, কোনো বক্তব্য মুতাবেক ৬ মশক নির্ধারণ করেছেন। অধিকন্তু হিজাজের বাইরে মশকেরও প্রচলন ছিলো না। এজন্য রতলের মাধ্যমে তা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তাতেও অনেক বক্তব্য সম্বোধিত হয়েছে ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর দিকে।

এ ধরনের বিভিন্ন প্রকার ইজতেরাবের কারণে অনেকে এ হাদিসটিকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। শায়খ ইবনে হুমাম (র.) বর্ণনা করেছেন যে, 'আল-ইলমাম' নামক গ্রন্থে হাফেজ ইবনে আব্দুল বার (র.) এ হাদিসটিকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। তাছাড়া কাজি ইসমাইল ইবনে ইসহাক এবং আবু বকর ইবনে আরাবি থেকেও জয়িফ সাব্যস্ত করার বিবরণ রয়েছে। তাছাড়া বাদায়ে' গ্রন্থকার আলি ইবনুল মাদিনি (র.) থেকেও জয়িফ সাব্যস্ত করার বিবরণ দিয়েছেন। 'তাহজিবুস্ সুনানে' হাফেজ ইবনুল কাইয়িম (র.) ও কুল্লাতাইনের হাদিসের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করে এটাকে অপ্রামাণ্য সাব্যস্ত করেছেন। তেমনি করে ইবনে তাইমিয়্যাহ , ইমাম গাজালি, আল্লামা আইনি, আল্লামা জায়লানি (র.)ও জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন বলে বর্ণিত আছে।

০ তবে বাস্তব সত্য হলো, ওপরযুক্ত ইজতেরাব ইত্যাদির কারণে এ হাদিসটিকে ব্যাপক আকারে জয়িফ ও অপ্রামাণ্য সাব্যস্ত করা ইনসাফের দৃষ্টিতে মুশকিল। বাস্তব ঘটনা হলো, এই হাদিসের দুর্বল প্রশ্ন এবং সমস্ত ইজতেরাব দূর হতে পারে। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের দুর্বলতার যে বিষয়টি সে সম্পর্কে হাফেজ জাহাবি (র.)-এর সিদ্ধান্তমূলক বক্তব্য পেছনে এসেছে যে, তিনি হাসান হাদিসের রাবিদের অন্তর্ভুক্ত। হযরত শাহ সাহেব (র.)ও এ

বক্তব্যটিকে সবচেয়ে মধ্যপন্থী সাব্যস্ত করেছেন। এ কারণে, হানাফিগণও তার বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। ইজতেরাবগুলো 'ফাতহুল কাদিরে' শায়খ ইবনে হুমাম (র.) দু'টি বাক্যের মাধ্যমে দূর করেছেন। তাঁর বক্তব্য হলো, ওয়ালিদ ইবনে কাসির এই বর্ণনাটি মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর ইবনে জুবায়র এবং মুহাম্মদ ইবনে আব্বাস ইবনে জা'ফর উভয় থেকে শুনেছেন। এরা দু'জন উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর উভয় থেকে শুনেছেন। এভাবে বর্ণনার মৌলিক ইজতেরাব দূরীভূত হয়ে যায়। এমনিভাবে ইমাম দারাকুতনি (র.)ও ইজতেরাবটিকে সামঞ্জস্য বিধান করে দূরীভূত করেছেন। তিনি বলেছেন, এই বর্ণনাটি এ সবগুলো সূত্রে বর্ণিত; একটি সূত্র অপর সূত্রের সাথে মিল রয়েছে।

অবশিষ্ট আছে মূল পাঠের ইজতেরাব। সেটিও কমজোরির কারণে নয়। কেনোনা, সমস্ত মুহাদ্দিসিন কুল্লাতাইনের বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেই বর্ণনায় তিন কুল্লার কথা অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে, প্রথমতো সেটি প্রধান নয়। যদি সেটাকে সহিহও স্বীকার করে নেওয়া হয়, তবুও সামঞ্জস্য বিধান হতে পারে। কারণ, কম সংখ্যা বেশি সংখ্যাকে বাতিল করতে পারে না এবং এটাও অযৌক্তিক নয় যে, এখানে أو ثلاثا শব্দটি فصاعدا এর অর্থে ব্যবহৃত। তাই ইমাম দারাকুতনি (র.) কোনো কোনো বর্ণনা নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণনা করেছেন, إذا كان الماء قلتين فصاعدا لم يحمل الخبث এটাও হতে পারে যে, কোনো বর্ণনাকারি فصاعدا -এর অর্থ ব্যক্ত করেছেন أو ثلاثا শব্দে। অবশিষ্ট আছে أربعين قلة -এর বর্ণনা। কাসেম উমরি ব্যতিত কেউ এটাকে মারফূ সূত্রে উল্লেখ করেননি। ইমাম দারাকুতনি (র.) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি তাঁর সনদে বিভ্রমের বশবর্তী হয়েছেন। তিনি প্রচুর ভ্রান্তির স্বীকার হতেন। মূলত এই বর্ণনাটি আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর ওপর মওকুফ। যেমন ইমাম দারাকুতনি (র.) বহু সূত্রে তা বর্ণনা করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, মওকূফ হাদিস মারফূ-এর মুকাবেলা করতে পারে না। তাছাড়া কম সংখ্যা বেশি সংখ্যাকে বাতিল করে না। সুতরাং মূল পাঠগত ইজতেরাবও ধর্তব্য থাকলো না।

অবশিষ্ট আছে অর্থগত ইজতেরাব। বাক্যের পূর্বাপর বলছে যে, এখানে পাহাড়ের চূড়া কিংবা মানুষের দেহাকৃতি উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে উদ্দেশ্য কলসি বা মটকার অর্থ। কেনোনা কুল্লা শব্দ যখন পানির জন্য বলা হয়, তখন এর দ্বারা সাধারণত মটকাই উদ্দেশ্য হয়। তাছাড়া পাহাড়ের শৃঙ্গ অথবা মানুষের দেহ উদ্দেশ্য করাতে স্বতঃসিদ্ধ কৃত্রিমতা-লৌকিকতাও হয়।

এবার ইজতেরাব থেকে যায় শুধু প্রয়োগ ক্ষেত্রে। সেটাও জয়িফতার প্রচলন দ্বারা হতে পারে। কারণ, এমন স্থানে সাধারণত সে জিনিস উদ্দেশ্য হয় যেটি সাধারণত প্রচলিত। মদিনা তাইয়িবাতে হাজার নামক স্থানে তৈরি মটকার প্রচলন ছিলো, যেগুলোতে দুই মশকের বেশি পানি সংকুলান হতো। এজন্য ইমাম শাফেয়ি (র.) এই মটকাই উদ্দেশ্য করেছেন এবং কুল্লাতাইনকে পাঁচ মশক দ্বারা নির্ণয় করেছেন।

তাই মুহাদ্দিসিনের একটি বড় অংশ এ হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। ইমাম শাফেয়ি (র.), ইমাম আহমদ (র.), হাফেজ ইবনে মান্দাহ (র.),-এর ঝোঁকও জয়িফ না হওয়ার দিকে। ইমাম তাহাবি (র.)ও এর সনদে কোনো আপত্তি তুলেননি। 'সি'আয়া' গ্রন্থকারের ঝোঁকও জয়িফ না হওয়ার দিকে। এজন্যই হযরত গাঙ্গুহি (র.) 'আল-কাওকাবুদ্ দুররি'তে বলেছেন, কুল্লাতাইনের হাদিসকে জয়িফ সাব্যস্ত করা কঠিন।

সুতরাং বিশুদ্ধ জবাব হলো, এ হাদিসটি যদিও জয়িফ নয়, কিন্তু নিম্নোক্ত কারণগুলোর ভিত্তিতে এটাকে শরয়ি সীমা নির্ধারণের মর্যাদা দেওয়া জটিল।

১. এ বিষয়টি সিদ্ধান্তকৃত যে, হিজাজ এলাকায় পানির সংকট বেশি ছিলো। সেখানে পানির পবিত্রতা অপবিত্রতার মাসায়িল দৈনন্দিন প্রচুর সামনে আসতো। মানুষের মধ্যে পানির মাসায়িল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার আগ্রহও ছিলো প্রচুর। এর দাবি ছিলো এই যে, যদি রাসূল ﷺ কমবেশির সীমা নির্ধারণ করে দিয়ে থাকতেন, তাহলে এটা সাহাবায়ে কেরামের এই বিশাল সংখ্যার মাঝে কুল্লাতাইনের এই সীমা নির্ধারক হাদিস

বর্ণনাকারি শুধু এই কম বয়স্ক একজন সাহাবি অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) ব্যতিত আর কেউ নন। তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনাকারি তাঁর দুই ছেলে ব্যতিত আর কেউ নেই। এটা যেনো خبر الواحد فيما تعم به البلوى। (সাধারণ লিপ্ততার ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহিদ) মুহাদ্দিসিন এবং ফুকাহায়ে কেরামের নিকট সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রশ্ন সাপেক্ষ ব্যাপার।

২. বিষয় সংশ্লিষ্ট শরয়ি পরিমাণ সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে। এটা প্রমাণের জন্য নেহায়েত শক্তিশালী এবং বিভিন্ন সম্ভবনাহীন অকাট্য দলিল-প্রমাণাদির প্রয়োজন হয়। কুল্লাতাইনের হাদিসকে যদি জয়িফ না বলা হয়, তবুও এর স্তর হাসানের ঊর্ধ্বে নয়। অথচ হানাফিগণ পানির অপবিত্রতা সম্পর্কে যেসব হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন সেগুলো বিশুদ্ধতার চূড়ান্ত পর্যায়ের। এ দিক দিয়ে কুল্লাতাইনের হাদিস সেসব সহিহ বর্ণনায় মুকাবেলা করতে পারে না।

৩. বাকি সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত হয়নি যে, তারা কুল্লাতাইনকে কম ও বেশির মাপকাঠি বানিয়েছেন; বরং 'লামআতুত তানকিহ' : ২/১৩৬-এ শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবি (র.) তো এতোটুকু পর্যন্ত বলেছেন, মনে হচ্ছে এর দ্বারা সীমা নির্ধারণ না করার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা। যার প্রমাণ হলো, একবার জমজম কূপে একজন হাবশি পড়ে গিয়েছিলো। তখন তাঁরা দুজন পরিপূর্ণ কূপের পানি তুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথচ পানিতে মৃত লাশের আছরও প্রকাশিত হয়নি। জমজম কূপের পানি নিঃসন্দেহে কুল্লাতাইন থেকে অনেক বেশি ছিলো। আর এ কাজটিও সাহাবায়ে কেরামের একটি জামাতের সামনে হয়েছিলো। কোনো সাহাবি এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেননি বা এটা প্রত্যাখ্যান করেননি। অতএব, কুল্লাতাইনের হাদিস ইজমার পরিপন্থী। সুতরাং তা মকবুল না।[১]

তাই ওপর্যুক্ত কারণসমূহের ভিত্তিতে এ হাদিসটিকে শরয়ি পরিমাণের ক্ষেত্রে সীমা নির্ধারণ ও বিধিবদ্ধতার স্থান দেওয়া যায় না; বরং প্রয়োজন হলো, কোনো সঙ্গত ব্যাখ্যার মাধ্যমে এ হাদিসটিকে সহিহ শক্তিশালী হাদিসগুলোর অর্থে প্রযোজ্য করা। এ কারণে হানাফিদের পক্ষ থেকে কুল্লাতাইনের হাদিসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তা থেকে দুটি ব্যাখ্যা মূল।

০ **১ম ব্যাখ্যা :** হযরত শাহ সাহেব (র.) বলেছেন, হাদিসের শব্দাবলির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, এ হাদিসে পানি দ্বারা উদ্দেশ্য হেজাজের বিশেষ পানি, যা মক্কা-মদিনার পথে প্রচুর পাওয়া যায়। এগুলো পাহাড়ি নালার পানি হয়ে থাকে এবং পানির উৎস থেকে বেরিয়ে নালা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ছোট ছোট গর্তে জমা হয়ে যায়। এগুলোর পরিমাণ সাধারণত দুই কুল্লা থেকে বেশি হয় না। কিন্তু এই পানি চালু বা প্রবাহিত হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, এটি নাপাক হয় না। এর সহায়তা হয় হাদিসের প্রাথমিক বাক্যটি থেকে যে, وهو يسئل عن الماء يكون فى الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এখানে ঘর-বাড়িতে প্রাপ্য পানি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হচ্ছে না। বরং প্রশ্ন করা হচ্ছে জঙ্গল ও ময়দানে প্রাপ্য পানি সম্পর্কে।

প্রশ্ন : যদি সে পানি প্রবাহিত হয়ে থাকে তবে কুল্লাতাইনের সীমা নির্ধারণ করার প্রয়োজন কি?

জবাব : এখানে সীমা নির্ধারণ করা হচ্ছে না, বরং বাস্তব ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। হয়তো এর উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, দুই মটকা থেকে কম পানির মধ্যে প্রবাহিত হওয়া সত্ত্বেও পরিবর্তন এসে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। হযরত শাহ সাহেব (র)-এর এই ব্যাখ্যা মূলত ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর নিম্নেযুক্ত বক্তব্যের বিশ্লেষণ, যেটি তিনি ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-কে বলেছিলেন, اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا كان جاريا তথা পানি যখন দুই মটকা হয় তখন সেটি প্রবাহিত হলে নাপাক হয় না।'

০ **২য় ব্যাখ্যা :** হযরত গাঙ্গুহি (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই হাদিসটি হানাফিদের পরিপন্থী নয়। মূলত হানাফিদের মতে নাপাকির আছর পৌছার ওপর (অপবিত্রতা) নির্ভরশীল। যদি কোনো স্থানে مبتلى به -এর ইয়াকিন হয়ে যায় যে, দুই মটকা পরিমাণে নাপাকির আছর পৌছেনি, তবে এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা

টীকা- ১. 'লামআতুত তানকিহ' নামক গ্রন্থে : ২/১৩৭ শায়খ (র.) বলেছেন, যেহেতু নবী করিম ﷺ হতে পানির সীমা নির্ধারণের ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই, সেহেতু আমাদের সাথিগণ এ ব্যাপারে প্রমাণাদির শরণাপন্ন হন। ঐতিহ্যগত বা শ্রুত প্রমাণাদির শরণাপন্ন হন না এবং কম ও বেশির সীমা নির্ধারণ করেছেন পানি পৌছা।

জায়েজ। এ কারণে তিনি বলেন, আমি স্বয়ং এর বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। একটি গর্ত খনন করে তাতে পাঁচ মশক পানি ঢেলেছি যা দুই মটকার সমপরিমাণ ছিলো। তাতে এক দিক নাড়াচাড়া দেওয়ার ফলে অপর দিক নড়েচড়েনি। প্রকাশ থাকে যে, এমন সময় হানাফিগণও পানিকে অপবিত্র বলেন না। অবশ্য অনেক অবস্থায় এমন পরিস্থিতিতেও তাতে নাপাকির আছর পৌঁছতে পারে। এমতাবস্থায় সে পানিকে অপবিত্র মনে করা হবে। যেনো মূল নির্ভরশীলতা নাপাকির আছর পৌঁছার ওপর। এজন্য কুল্লাতাইন বা দুই মটকাকে একটি সীমা নির্ধারণ করা ঠিক নয় এবং মূলনীতিরূপে সীমা নির্ধারণ করার পরিবর্তে এটাকে مبتلى به-এর রায়ের ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে। হজরত গাঙ্গুহি (র.)-এর এ ব্যাখ্যাটি অত্যন্ত প্রশান্তিদায়ক।

হানাফিদের দলিলগুলো, হানাফিদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে প্রমাণরূপে পেশ করা হয় চারটি হাদিস,

১. জামে তিরমিযী باب كراهية البول فى الماء الراكد এ হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত,

لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يتوضأ منه .

'বদ্ধ পানিতে পেশাব করে অতঃপর তা থেকে ওজু করবে– এমন কাজটি কেউ যেনো কখনো না করে।'

২. ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া সংক্রান্ত হাদিস[১]।

৩. কুকুর কর্তৃক পাত্রে মুখ দেওয়ার হাদিস[২]।

৪. ঘির মধ্যে ইঁদুর পতিত হওয়ার হাদিস[৩]।

এ সব হাদিসগুলো সব বিশুদ্ধ। এ অনুচ্ছেদে প্রথম হাদিসটি এ অনুচ্ছেদে বিশুদ্ধতম। বোখারি-মুসলিমও এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। প্রথম এবং তৃতীয় হাদিসটিতে তরল পদার্থের সাথে প্রকৃত নাপাকি মিশ্রণের আলোচনা রয়েছে। চতুর্থ হাদিসটিতে জমাট বস্তুর সাথে প্রকৃত নাপাকি মিশ্রণ বিবরণ রয়েছে। আর দ্বিতীয় হাদিসটিতে রয়েছে কল্পনা প্রসূত নাপাকির বর্ণনা।

এ থেকে বোঝা যায়, নাপাক চাই মিশ্রিত হোক তরল পদার্থের সাথে কিংবা জমাট বস্তুর সাথে, সব অবস্থায় তা নাপাকির কারণ। এতে না গুণের কোনো একটির পরিবর্তন শর্ত আছে, না দুই মটকা থেকে কম হওয়ার। হ্যাঁ, বেশি পরিমাণ তা থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত। আর এই ব্যতিক্রমভুক্তির প্রমাণ হলো, সমুদ্র ইত্যাদির পানি দ্বারা ওজুর হাদিসগুলো। পানি যদি বেশি হয় তাহলে নাপাক পতিত হলে অপবিত্র হয় না। যেহেতু কম ও বেশির কোনো সীমা নির্ধারণ কোনো প্রশান্তিদায়ক পদ্ধতিতে প্রমাণিত নয় এবং অবস্থা ভেদে তাতেও বিভিন্ন রূপ ধারণ করে এজন্য ইমাম আবু হানিফা (র.) এটাকে مبتلى به -এর রায়ের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِى الْمَاءِ (صـ ٢١)

অনুচ্ছেদ– ৫১ : আবদ্ধ পানিতে পেশাব করা মাকরূহ প্রসঙ্গে (মতন ২১)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ .

৬৮. **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেনো আবদ্ধ পানিতে পেশাব করে অতঃপর তা দ্বারা ওজু না করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। জাবের (রা.) হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।'

টীকা- ১. তিরমিযী : ১/২২-২৩, باب اذا استيقظ أحدكم من منامه الخ

টীকা- ২. باب حكم ولوغ الكلب . مسلم جا صـ٣٧

টীকা- ৩. صحيح بخارى جا صـ٣٧ . باب ما يقع من النجاسات فى السمن والما

بَابُ فِى مَاءِ الْبَحْرِ أَنَّهُ طَهُوْرٌ (ص ٢١)

অনুচ্ছেদ- ৫২ : সাগরের পানি পবিত্র প্রসঙ্গে (মতন ২১)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ أَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ أَبِىْ بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ (رض) يَقُوْلُ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ ـ

৬৯. **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো, আল্লাহর রাসূল! আমরা সাগরের (বিভিন্ন যানে) আরোহণ করি (সফর ও যাতায়াত করি)। আমাদের সাথে বহন করি স্বল্প পানি। যদি তা দ্বারা ওজু করে ফেলি তবে আমাদের পিপাসার্ত থাকতে হয়। তবে কি আমরা সমুদ্রের পানি দিয়ে ওজু করবো? জবাবে রাসূল ﷺ বললেন, এর পানি পবিত্র, এর মৃত প্রাণী হালাল।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

জাবের ও ফেরাসি থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। এটাই হলো রাসূল ﷺ-এর অধিকাংশ ফকিহ সাহাবির বক্তব্য। তার মধ্যে রয়েছেন আবু বকর, উমর, ইবনে আব্বাস (রা.)। তাঁরা সমুদ্রের পানি দিয়ে (পবিত্রতা অর্জনে) কোনো অসুবিধা মনে করেন না।

অনেক সাহাবি সাগরের পানি দ্বারা ওজু মাকরূহ মনে করেছেন। তার মধ্যে রয়েছেন ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেছেন, এটি আগুন (ক্ষতিকর, রোগ সৃষ্টিকারক)।

দরসে তিরমিযী

أفنتوضأ من البحر : সাগরের পানি দিয়ে ওজু করার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মনে সংশয় ছিলো। কেনোনা সমুদ্র হচ্ছে অসংখ্য জীব-জন্তুর আবাস এবং তাতে দৈনন্দিন হাজার হাজার জীব-জন্তু মরে। অতএব, সেসব মৃত জন্তুগুলোর কারণে সমুদ্রের পানি নাপাক হয়ে যাওয়ার কথা। অথবা সন্দেহের কারণ এই ছিলো যে, রাসূলে আকরাম ﷺ-এর বক্তব্য রয়েছে– ان تحت البحر نارا। তথা সমুদ্রের নিচে অগ্নি রয়েছে। রাসূলে আকরাম ﷺ তাদের সন্দেহের জবাবে শুধু الطهور ماءه। বলে ক্ষান্ত হননি, বরং এর সাথেই الحل ميتته। (এর মৃত জন্তু হালাল।) বৃদ্ধি করেছেন। প্রশ্নের মূল কারণেরই যাতে সমাপ্তি হয়[১]।

هو الطهور ماءه : এতে খবরের মধ্যে ال। নেওয়া হয়েছে শুধু পরিচয়ের উদ্দেশ্য, সীমাবদ্ধতার জন্য নয়। প্রথমদিকে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে সমুদ্রের পানি দিয়ে ওজু করার ব্যাপারে মতভেদ ছিলো। তাই ইমাম

টীকা- ১. 'মিরকাতুস্ সাউদ' গ্রন্থকার বলেন, চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে তারা শুধু সমুদ্রের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। প্রিয়নবী ﷺ তাদেরকে সমুদ্রের পানি এবং খাদ্য সম্পর্কে জবাব দিয়েছেন। কেনোনা তিনি জানতেন যে, সমুদ্রে তাদের রসদের প্রয়োজন হবে কূপের পানির। যেহেতু খাদ্য পানীয় উভয়টির প্রয়োজন দেখা দিবে সেহেতু জবাবের মধ্যে উভয় সমস্যার সমাধান দিয়েছেন।

–বজলুল মাজহুদ : ১/৫৩।

তিরমিযী (র.)-ও হজরত ইবনে উমর (রা.) এবং ইবনে আমর (রা.)-এর মত এই বর্ণনা করেছেন যে, সমুদ্রের পানি দিয়ে ওজু করা মাকরূহ। তবে পরবর্তীতে এর বৈধতার ওপর ইজমা' হয়ে গেছে।

الحل ميتته : কয়েকটি বিষয় এখানে আলোচনা সাপেক্ষ। প্রথম বিষয়টি হলো, সমুদ্রের কোন জিনিসটি হারাম আর কোনটি হালাল?

১. ইমাম মালেক (র.)-এর মাজহাব হলো, সামুদ্রিক শূকর ব্যতিত জলজ সকল প্রাণী হালাল[১]।

২. ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মাজহাব হলো, মাছ ব্যতিত সমস্ত জন্তু হারাম এবং মরে ভেসে যাওয়া মাছও হালাল থেকে দূরে।

৩. এ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ি (র.) থেকে চারটি বক্তব্য বর্ণিত আছে–

১. হানাফিদের মত। ২. যেসব প্রাণী স্থলে হালাল সেগুলোর অনুরূপ সামুদ্রিকও হালাল, আর যেগুলো স্থলে হারাম সেগুলো সমুদ্রেও হারাম। যেমন, সামুদ্রিক গরু হালাল এবং সামুদ্রিক কুকুর হারাম। আর স্থলে যেসব সামদ্রিক প্রাণীর নজির নেই সেগুলো হালাল।

৪. ব্যাঙ ব্যতিত অন্য সব সামুদ্রিক প্রাণী হালাল।

আল্লামা নববি (র.) ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর এই সর্বশেষ বক্তব্যটিকে প্রাধান্য দিয়ে এটাকে সাব্যস্ত করেছেন শাফেয়ি মতাবলম্বীগণের مفتى به বক্তব্য।

মালেকি এবং শাফেয়িদের প্রমাণাদি নিম্নেযুক্ত

১. احل لكم صيد البحر وطعامه কোরআনের এই আয়াত صيد বা শিকার শব্দটি ব্যাপক। এজন্য প্রতিটি জন্তু হবে হালাল।

২. উক্ত অধ্যায়ের হাদিসে الحل ميتته শব্দ জলিয় সমস্ত মৃত প্রাণীর বৈধতার বিবরণ দেয়।

৩. আম্বর সংক্রান্ত হাদিসটিও মালেকি ও শাফেয়িদের প্রমাণ। তাতে সাহাবায়ে কেরাম বলেছেন, আমরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত একটি সামুদ্রিক প্রাণী ভক্ষণ করছিলাম যার নাম ছিলো আম্বর। باب غزوة سيف البحر-এ বোখারির এই বর্ণনায় শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত– فألقى لنا البحر دابة يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر الخ 'অতঃপর সমুদ্র আমাদের জন্য একটি প্রাণী উৎক্ষেপণ করলো, যাকে বলা হয় আম্বর। আমরা এটি থেকে ভক্ষণ করেছি অর্ধ মাস পর্যন্ত।'

এই বর্ণনায় دابة প্রাণী শব্দটি বলছে সে প্রাণীটি মাছ ব্যতিত অন্য কিছু ছিলো।

ইমাম মালেক (র.) কোরআনের আয়াত (শূকরের গোশত)-এর ব্যাপকতার কারণে সামুদ্রিক শূকরকে বৈধতা থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত সাব্যস্ত করেন। আর ইমাম শাফেয়ি (র.) ব্যাঙ মারার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদিসগুলোর কারণে ব্যাঙকে হালাল থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত করেন।

তাঁদের পরিপন্থী হানাফিদের প্রমাণাদি নিম্নেযুক্ত

১. ويحرم عليهم الخبائث : আল্লামা আইনি (র.) কোরআনের এই আয়াত দ্বারা হানাফিদের মাজহাবের ওপর প্রমাণ পেশ করেছেন। কারণ الخبائث শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য সেসব মাখলুক যেগুলোকে মানুষ স্বভাবতো ঘৃণা করে। মাছ ব্যতিত সামুদ্রিক অন্যসব প্রাণী এমন, যেগুলোকে স্বভবতো মানুষ ঘৃণা করে। সুতরাং মাছ ব্যতিত সামুদ্রিক অন্যান্য জন্তু خبائث এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

টীকা- ১. কোনো কোনো ফকিহ এবং ইবনে আবু লায়লা বলেছেন, এটা খাওয়া হালাল। সমুদ্রের মাছ ব্যতিত ব্যাঙ, কাকড়া, জলীয় সাপ, কুকুর, শূকর ও অনুরূপ জন্তুও খাওয়া হালাল। তবে জবাই করতে হবে। এটাই হলো লায়ছ ইবনে সা'দের বক্তব্য। তবে তাঁর মতে সামুদ্রিক মানুষ ও শূকর খাওয়া হালাল নয়। –বজলুল মাজহুদ : ১/৫৪।

২. حرمت عليكم الميتة 'তোমাদের ওপর মৃত প্রাণী হারাম করা হয়েছে।' এতে বোঝা গেলো, প্রতিটি মৃত জন্তু হারাম। অবশ্য শরয়ি দলিল দ্বারা প্রমাণিত যেসব মৃত প্রাণী ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে সেগুলো আলাদা।

৩. আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারাকুতনি বায়হাকি ইত্যাদিতে প্রসিদ্ধ একটি মারফু[১] হাদিস রয়েছে,

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال (اللفظ لابن ماجة[২])

'আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাদের জন্য দুটি মৃত বস্তু হালাল করা হয়েছে এবং দুটি রক্তপিণ্ড হালাল করা হয়েছে। মৃত প্রাণী দুটি- মাছ ও পঙ্গপাল। আর রক্তপিণ্ড- কলিজা এবং প্লীহা।'

এখানে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে ইবারতুন্ নস দ্বারা। কেনোনা আয়াতের পূর্বাপর বৈধতা ও নিষিদ্ধতার বিবরণের জন্য হবে। আর বৈপরীত্যের সময় ইবারতুন্ নস দ্বারা প্রমাণ প্রাধান্য পায়। উসুলে ফিক্‌হে তাই সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং এই হাদিস দ্বারা এই বিষয়টি স্পষ্ট যে, মৃত অর্থাৎ সেসব প্রাণী যেগুলোতে প্রবাহিত রক্ত হয় না, সেগুলোর মধ্য হতে শুধু দুই প্রকার হালাল- পঙ্গপাল এবং মাছ। সামুদ্রিক অন্যান্য প্রাণী যেহেতু এ দুই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত নয়, এগুলো তাই হারাম।

৪. গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, রাসূলে করিম ﷺ-এর সারা জীবনে তিনি এবং তৎপরবর্তী সাহাবায়ে কেরাম হতে মাছ ব্যতিত অন্য কোনো সামুদ্রিক প্রাণী ভক্ষণ প্রমাণিত নয়। যদি এই প্রাণীগুলো হালাল হতো তবে তিনি কোনো না কোনো সময় বৈধতার বিবরণের জন্য হলেও অবশ্যই তা খেতেন। যেহেতু তা করেননি, সুতরাং সেগুলো হালাল নয়।

প্রশ্ন : অবশিষ্ট রইলো, শাফেয়ি এবং মালেকি মতাবলম্বীগণের احل لكم صيد البحر আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করা।

জবাব : স্বয়ং শাফেয়ি মতাবলম্বীদের প্রমাণ তখন বিশুদ্ধ হতে পারে যখন صيد শব্দটিকে مصيد তথা শিকারের অর্থে গ্রহণ করা হয়, আর اضافت ব্যাপকতার জন্য ব্যবহৃত হয়। অথচ মাসদারকে اسم مفعول এর অর্থে ব্যবহার করা রূপক। বিনা প্রয়োজনে রূপকের শরণাপন্ন হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এই কারণে হানাফিগণ এর প্রবক্তা যে, এখানে صيد শব্দটি প্রকৃত অর্থে অর্থাৎ معنى مصدرى -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বাক্যের ধারাও এর প্রমাণ। কারণ, আলোচনা হলো সেসব কাজের যেগুলো মুহরিম ব্যক্তির জন্য জায়েজ-নাজায়েজ। সুতরাং এখানে উদ্দেশ্য শুধু এ কথা বলা যে, সমুদ্রে শিকার করা জায়েজ। এর দ্বারা খাওয়ার বৈধতা প্রমাণিত না।

০ দ্বিতীয় জবাব দেওয়া হয়েছে, যদি মেনে নিই যে, এখানে صيد . مصيد তথা শিকারের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তাহলে بحر -এর দিকে এর اضافت ব্যাপকতার জন্য নয়; বরং সুনির্দিষ্ট বুঝানোর জন্য। অতএব, এখানে একটি সুনির্দিষ্ট শিকার তথা মাছ উদ্দেশ্য, যার বৈধতা অন্য প্রমাণাদির আলোকে প্রমাণিত হয়েছে। আর এটা ঠিক এমনই যেনো حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما আয়াতে সর্বসম্মতিক্রমে اضافت ব্যবহৃত হয়েছে সুনির্দিষ্ট বস্তু বোঝানোর জন্য।

০ এখন আছে এ অধ্যায়ের হাদিস দ্বারা শাফেয়ি এবং মালেকি মতাবলম্বীগণের দলিল।[৩]

০ এর এক জবাব তো সেটাই যে ميتته -এর মধ্যে اضافت সবগুলো মৃত বোঝানোর জন্য নয়, বরং সুনির্দিষ্ট মৃত বুঝানোর জন্য। বস্তুত عهد خارجى বা সুনির্দিষ্ট বস্তুই হলো আসল। অতএব, এ হাদিসের অর্থ

টীকা- ১. 'তালখিসুল হাবিরে' হাফেজ ইবনে হাজার (র.) এ হাদিসটি মারফু এবং মওকুফ দু'ভাবেই বর্ণনা করেছেন। মওকুফ সূত্রটিকে বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করেছেন। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন জায়দ ইবনে আসলাম সূত্রে ইবনে উমর (রা.) হতে ইমাম শাফেয়ি (র.) আহমদ, ইবনে মাজাহ, দারাকুতনি বায়হাকি, ইবনে আদি, ইবনে মারদুওয়াইহ (তাঁর তাফসিরে) এর মতানুসারে। হাফেজ (র.) মওকুফ সূত্রটি উদ্ধৃত করেছেন দারাকুতনি আবু যুরআ ও আবু হাতেমের পক্ষ থেকে। -মাআরিফুস্ সুনান : ১/২৫৭।

টীকা- ২. পৃষ্ঠা : ২৩৮, বাবুল কাবিদি ওয়াততিহার আবওয়াবুল আতইমা।

টীকা- ৩. এর সনদ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন, 'তালখিসুল হাবির' ঃ ১/৯তে হাফেজ ইবনে হাজার (র.)। এর নির্যাস হলো, হাদিসটি সহিহ। একাধিক সাহাবি থেকে এটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত। তন্মধ্যে রয়েছেন, আবু হুরায়রা, জাবের, ইবনে আব্বাস, ইবনুল ফুরাশি (রা.)। যদিও কোনো কোনো সূত্রে আপত্তি আছে।

এটাই হলো যে, সামুদ্রিক সুনির্দিষ্ট মৃত জন্তুই হালাল। যেটি সম্পর্কে বৈধতার প্রমাণ রয়েছে। সেটি মাছ হচ্ছে।

০ এ হাদিসের দ্বিতীয় জবাব হজরত শাইখুল হিন্দ (র.) এই দিয়েছেন যে, اضافت ا যদি استغراق ا তথা সমস্ত সংখ্যা বোঝানোর জন্যই মেনে নেওয়া হয়, তাহলে الحل ا শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য বৈধতা নয়; বরং পবিত্রতা। আর حل শব্দটি আরবি বাক্যে পবিত্রতা অর্থে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এজন্য বোখারি শরিফের একটি প্রসিদ্ধ[১] হাদিসে রয়েছে حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنابها إلى ...الخ এ হাদিস حلت শব্দটি পবিত্রতার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এমনভাবে উক্ত অধ্যায়ের হাদিসটিতে حل শব্দটি পবিত্র-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর একটি প্রমাণ এটিও যে, বাক্যের ধারা পবিত্রতা সংক্রান্তই চলে আসছে। সাহাবায়ে কেরামের সন্দেহ ছিলো যে, সমুদ্রের মৃত প্রাণীগুলো নাপাক হয়ে যায়। এই সন্দেহের অবসান ঘটানোর জন্য প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন যে, সমুদ্রের মৃত প্রাণীগুলো থাকে পবিত্র।

০ মালেকি আর শাফেয়ি মাজহাবের তৃতীয় প্রমাণ ছিলো আম্বার এর হাদিস। এর জবাব হলো সহিহ বোখারির[২] এক বর্ণনায় এই হাদিসে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে فألقى البحر حوتا ميتا (অতঃপর, সমুদ্র একটি মৃত মাছ উৎক্ষেপণ করলো।) যা থেকে বোঝা যায় যে, অন্য বর্ণনায় دابة শব্দ দ্বারা মাছ উদ্দেশ্য।

মরে ভেসে উঠা মাছ প্রসঙ্গে

এ আলোচনায় আরেকটি বিষয় হলো, মরে ভেসে উঠা মাছের বৈধতা ও নিষিদ্ধতা সংক্রান্ত বিষয়। طافي সেই মাছকে বলা হয়, যেটি পানিতে কোনো বহির্গত কারণ ব্যতীত স্বাভাবিকভাবে মরে উল্টে থাকে। ১) ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম আহমদ (র.) এমন মাছকে হালাল বলেন। ২) ইমাম আজম (র.) অথচ নিষিদ্ধতার পক্ষে। এই মাজহাবই হলো হজরত আলি, ইবনে আব্বাস, জাবের (রা.) ইবরাহিম নাখয়ি, শা'বি, তাউস এবং সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব প্রমুখের।

০ উক্ত অধ্যায়ের হাদিস ইমামত্রয়ের এক প্রমাণ। তারা الحل ميتته দ্বারা জবাইবিহীন মৃত উদ্দেশ্য করেন। হাদিসের এর বৈধতার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

০ আম্বর সংক্রান্ত হাদিস দ্বিতীয় প্রমাণ। সাহাবায়ে কেরাম এটি মৃত অবস্থায় পেয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তারা এটাকে অর্ধমাস পর্যন্ত খেতে থাকেন।

০ তৃতীয় প্রমাণ হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর একটি আছর। যেটি 'সুনানে বায়হাকি' ও 'দারেকুতনি'তে হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। (মা'আরিফুস্ সুনান : ১/২৫৭) এই আছরে হালাল সাব্যস্ত করা হয়েছে মরে ভেসে উঠা মাছকে।

০ আবু দাউদ[৩] ও ইবনে মাজাহ[৪] শরিফে হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা হানাফিদের প্রমাণ।

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما القى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه .

'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে প্রাণীকে সমুদ্র নিক্ষেপ করেছে অথবা তা থেকে পানি সরে গেছে তোমরা সেটি ভক্ষণ কর। আর যেটি পানিতে মরে ভেসে উঠে সেটি ভক্ষণ করো না।'

ইমাম আবু দাউদ (র.) এই বর্ণনাটি মারফূ এবং মাওকূফ উভয় সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর মাওকূফ সূত্রটিকে বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, মারফূ' বর্ণনাটিও নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে। কাজেই এটাকে মারফূ মানতে কোনো আপত্তি নেই। আর যদি মাওকুফ সূত্রটিকে সহিহ মানেন তবুও যেহেতু বিষয়টি যুক্তির আলোকে অনুধাবনযোগ্য নয়, এ কারণে এ হাদিসটি মারফূ-এর পর্যায়ভুক্ত হবে।

এ হাদিসটিকে ইমাম বায়হাকি (র.) জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। অথচ এটা যথার্থ নয়। কেনোনা জয়িফতার

টীকা- ১. এই হাদিসটি ইমাম বোখারি সহিহ বোখারিতে (১/২৯৮) কিতাবুল বুয়ু'-এর শেষে আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, باب هل يسافر باجارية أن يستبرأها তে।

টীক- ২. সহিহ বোখারির বর্ণনাগুলোতে حوت (মাছ) এবং دابة (জন্তু) দুটো শব্দই এসেছে। দ্রষ্টব্য : ২/৬৩৫-৬২৬ كتاب المغازى، باب غزوة سيف البحر সংকলক।

টীকা- ৩. ১ম খণ্ড, ২/৫৩২, كتاب الاطعمة، باب فى أكل الطافى من السمك টিকা- ৪. পৃষ্ঠা ২৩৪, ابواب الصيد باب الطافى فى صيد البحر .

কারণ বর্ণনা করেছেন ইবনে সুলায়িমের জয়িফতা। অথচ ইবনে সুলাইম বোখারি-মুসলিমের রাবি। অতএব, তাদেরকে জয়িফ সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। ইবনুল জাওজি (র.)১ মারফু হাদিসটিকে ইসমাইল ইবনে উমাইয়্যার কারণে জয়িফ বলেছেন। অথচ তাঁর বিভ্রান্তি ঘটেছে। কারণ, ইনি ইসমাইল ইবনে উমাইয়্যা আবুস্ সালত নন, যিনি জয়িফ। বরং ইনি হচ্ছেন ইসমাইল ইবনে উমাইয়্যা কুরাশি উমাবি। যিনি নির্ভরযোগ্য রাবি। কোরআনের আয়াত حرمت عليكم الميتة দ্বারাও হানাফি মাযহাবের সহায়তা হয়।

০ শাফেয়ি মাজহাবের প্রমাণাদির জবাব হলো যে, الحل ميتته দ্বারা জবাইবিহীন জন্তু উদ্দেশ্য নয়; বরং প্রবাহিত রক্ত বিশিষ্ট নয় এমন জন্তু উদ্দেশ্য। যেমন, احلت لنا ميتتان-এর মধ্যে ميته দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই। হানাফিদের প্রমাণ ওপরযুক্ত হাদিসের ভিত্তিতে যদি বলা হয় যে, মরে ভেসে উঠা মাছ এ থেকে ব্যতিক্রম, তবেও তা অযৌক্তিক হবে না। অথবা হজরত শায়খুল হিন্দ (র.)-এর বক্তব্য মতে الحل দ্বারা হালাল উদ্দেশ্য নয়; বরং পবিত্র উদ্দেশ্য।

০ আর আম্বর সংক্রান্ত হাদিসের জবাব হলো, মরে ভেসে উঠা মাছ বলে উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট বিবরণ নেই। طافى শুধু সে মাছকে বলে, যেটি কোনো বাহ্যিক কারণ ব্যতিত নিজে নিজে সমুদ্রে মরে ভেসে উঠে। এর পরিপন্থী নদীর কোনো মাছ কোনো বাহ্যিক কারণে যেমন প্রচণ্ড গরম ও শৈত্য প্রবাহে অথবা ঢেউ-তরঙ্গের কারণে অথবা তীরে পানির ওপরে উঠার পর পানি সরে যাওয়ার কারণে মরে যায়, তবে সেটি طافى নয়। এটা খাওয়া হালাল। আম্বর সংক্রান্ত হাদিসেও স্পষ্ট এটাই যে, এ মাছটি মরে গিয়েছিলো পানি থেকে তীরে উঠে চলে আসার কারণে। সুতরাং এটার বৈধতা নিয়ে কোনো বিতর্ক নয়।

০ এবার রয়ে গেলো শুধু হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর আছর। এর জবাব হলো, প্রথমতো এতে প্রচণ্ড ইজতেরাব রয়েছে। দ্বিতীয়তো যদি এটাকে সূত্রগতভাবে সহিহও মেনে নেওয়া হয় তবুও এটি একজন সাহাবির ইজতিহাদ হতে পারে, যা মারফু হাদিসের বিপরীতে প্রমাণ নয়। তৃতীয়তো সম্ভাবনা আছে এখানে মৃত মাছ দ্বারা সেই মাছ উদ্দেশ্য যেটি মারা গেছে বাহ্যিক কারণে।

চিংড়ি হালাল না হারাম?

০ শাফেয়ি এবং মালেকিদের মতে এর বৈধতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু হানাফিদের মতে এটা নির্ভর করছে এ কথার ওপর যে, এটা মাছ কি না? এ বিষয়টি বিশেষতো ভারতীয় ওলামায়ে কেরামের মাঝে বিতর্কিত রয়েছে। 'হায়াতুল হায়াওয়ান' নামক গ্রন্থে আল্লামা দিমইয়ারি (র.) এটাকে এক প্রকার মাছ সাব্যস্ত করেছেন। এ কারণে ভারতীয় কোনো কোনো আলেম এর বৈধতার প্রবক্তা। তাঁদের মধ্যে হজরত থানবি (র.)ও আছেন। তিনি 'ইমদাদুল ফাতাওয়া'তে এটা (খাওয়ার) অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু 'ফাতাওয়া হাম্মাদিয়া' গ্রন্থকার ও অন্যান্য কোনো কোনো ফকিহ এটাকে মাছ বলতে অস্বীকার করেছেন। অধম প্রাণীবিদ্যা বিশেষজ্ঞদের নিকট এ সম্পর্কে তাহকিক করেছে। তাদের সবাইকে চিংড়ি মাছ নয় বলে একমত দেখা গেছে এবং উভয়ের মাঝে সম্পর্ক হলো, বাঘ ও বিড়ালের মাঝে সম্পর্কের মতো। মাছের যে সংজ্ঞা প্রাণীবিদ্যার গ্রন্থাবলিতে লেখা আছে, তার আলোকেও চিংড়ি মাছ এর বাস্তব উদাহরণের অন্তর্ভুক্ত নয়। সেই সংজ্ঞাটি হলো, এমন মেরুদণ্ড বিশিষ্ট প্রাণী যেটি পানি ব্যতিত জীবিত থাকতে পারে না এবং এটি চোয়াল দিয়ে শ্বাস নেয়। এতে চিংড়ি প্রথম শর্ত দ্বারাই বাদ পড়ে যায়, তাতে মেরুদণ্ডের হাড্ডি হয় না। কোনো কোনো প্রাণী বিশেষজ্ঞ তো এটাকে পোকা-মাকড়ের এক প্রকার সাব্যস্ত করেছেন। তাছাড়া সাধারণ উরফেও এটাকে মাছ মনে করা হয় না। কেনোনা যদি কোনো ব্যক্তিকে মাছ আনার নির্দেশ দেওয়া হয়, আর সে চিংড়ি নিয়ে আসে তবে তাকে যথার্থ হুকুম পালনকারি মনে করা হয় না। তাই প্রাধান্য প্রাপ্ত বক্তব্য এটাই যে, চিংড়ি মাছ নয়। সুতরাং এটা না খাওয়া উচিত।

অবশিষ্ট থাকে আল্লামা দিমইয়ারি (রহ.)-এর বিষয়। তিনি কোনো প্রাণীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ নন; বরং তিনি শুধু বিবরণদাতা। তিনি 'হায়াতুল হায়াওয়ানে' গ্রহণযোগ্য অগ্রহণযোগ্য সব ধরনের বর্ণনা সংকলন করেছেন। এজন্য তাঁর বক্তব্য এ বিষয়ে অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণের বিপরীতে প্রমাণ নয়। তাছাড়া যে বিষয়ে হালাল-হারামের প্রমাণাদি বিপরীতমুখী সেখানে হারামেরই প্রাধান্য হয়। এজন্য আবশ্যক হলো এটি খাওয়া থেকে পরহেজ করা।

টীকা- ১. মা'আরিফুস সুনান : ১/২৬০

بَابُ التَّشْدِيْدِ فِى الْبَوْلِ (صـ ٢١)

অনুচ্ছেদ- ৫৩ : পেশাবের ব্যাপারে কঠোরতা প্রসঙ্গে (মতন ২১)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلٰى قَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا هٰذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهٖ وَاَمَّا هٰذَا فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ .

৭০. **অর্থ :** হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার দুটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করা কালে বললেন, তাদের দু'জনকে আজাব দেওয়া হচ্ছে। অবশ্য এদেরকে বড় কোনো অপরাধের কারণে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। (একটি কবরের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন,) এ লোকটি পেশাব থেকে পরহেজ করতো না। আর অপর লোকটি চোগলখোরি করে বেড়াতো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

জায়দ ইবনে সাবেত, আবু বকর, আবু হুরায়রা, আবু মূসা ও আব্দুর রহমান ইবনে হাসানা (রা.) থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। মনসুর এ হাদিসটি মুজাহিদ সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাতে তাউসের সূত্রের কথা উল্লেখ করেননি। আ'মাশের বিবরণটিই বিশুদ্ধতম। আমি আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আবানকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি ওয়াকি' (র.)কে বলতে শুনেছি, আ'মাশ মনসুর অপেক্ষা ইবরাহিমের সনদের অধিক সংরক্ষণকারি।

দরসে তিরমিযী

مر على قبرين : হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও জাবের (রা.) উভয় থেকে এই ঘটনাটি বর্ণিত। কোনো কোনো সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় এ কথা স্পষ্ট রয়েছে যে, এ দুটো কবর ছিলো বাকি'তে আর হজরত জাবির (রা.)-এর বর্ণনায় কোনো কোনো সূত্রে স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সফরের সময়। আল্লামা আইনি (র.) এবং হাফেজ ইবনে হাজার (র.) এই বিরোধ অবসান করতে গিয়ে বলেছেন যে, এ দুটো ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন।

وما يعذبا فى كبير : বোখারি শরিফের বর্ণনায়[১] এ হাদিসের শেষে এই শব্দও আছে, قال بلى (তিনি বললেন, হ্যাঁ)। তাই বাহ্যত হাদিসটির শুরু ও শেষে বৈপরীত্য আছে বলে মনে হয়। কিন্তু ওলামায়ে কেরাম এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, এর উদ্দেশ্য হলো এই দুটো গোনাহ এমন যে, এগুলো থেকে বেঁচে থাকা কোনো মুশকিল কাজ নয়। এ হিসেবে এগুলো কবিরা নয়। কিন্তু গোনাহের দিক দিয়ে পেশাবের ছিটা থেকে না বাঁচা এবং চোগলখোরি করা গৌনাহে কবিরা।

فكان لا يستتر من بوله : এখানে বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্ন প্রকার শব্দ এসেছে[২]।

لا يستنثر . لا يستبرئ . لا يستنزه . لا يستتر এবং لا ينتتر সবগুলোর অর্থ একই। অর্থাৎ, লোকটি পেশাবের ছিটা থেকে পরহেজ করতো না। لا يستتر অর্থ অনেকে এটাও বর্ণনা করেছেন যে, পেশাবের সময় সতর ঢাকার প্রতি সে গুরুত্বারোপ করতো না। কিন্তু উত্তম হলো, এই শব্দটিকে অন্যান্য সূত্রের ওপর প্রযোজ্য ধরে পেশাব থেকে পরহেজ না করার অর্থই করা। এর সহায়তা এ হাদিস দ্বারা হয় যাতে বলা হয়েছে,

استنزهوا[৩] من البول فان عامة عذاب القبر منه .

টীকা- ১. ১/৩৪-৩৫, كتاب الوضوء، باب من الكبائر ان لا يستتر من بوله

টীকা- ২. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মা'আরিফুস্ সুনান : ১/২৬২ সংকলক। টীকা- ৩. মা'আরিফুস সুনান : ১/২৭৫

প্রশ্ন : একটি প্রশ্ন হয় এখানে যে, পেশাবের ছিটা থেকে পরহেজ না করার সাথে কবর আজাবের কিসের সম্পর্ক?

জবাব : এর বাস্তব অবস্থা তো আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। অবশ্য আল-বাহরুর্ রায়েক : ১/১১৪তে আল্লামা ইবনে নুজাইম (র.) একটি হিকমত এই বর্ণনা করেছেন যে, পেশাব হতে পবিত্রতা মানে ইবাদতের দিকে প্রথম পদক্ষেপ। আর কবর হলো পরকালের প্রথম মঞ্জিল। আর কবরে পবিত্রতা অর্জন না করার কারণে আজাব দেওয়া হবে। মু'জামে তাবারানির একটি মারফু বর্ণনা দ্বারাও এর সহায়তা হয়,

اتقوا البول فانه اول ما يحاسب به العبد فى القبر. رواه الطبرانى باسناد حسن

(معارف السنن جـ١ صـ٢١٣)

'পেশাব থেকে বাঁচো। কারণ, কবরে সর্বপ্রথম এ ব্যাপারে বান্দার হিসেব নেওয়া হবে।'

وأما هذا فكان يمشى بالنميمة : তিরমিযী শরীফে হাদিস এখানেই শেষ হয়েছে।

কবরে ফুল দেওয়া

কিন্তু রাসূল ﷺ একটি ডাল নিয়ে এটি দু'টুকরো করলেন এবং দুটিকে দুটি কবরের ওপর গেড়ে দিলেন। তিনি এর হিকমত এই বর্ণনা করেছেন,

لعله ان يخفف عنهما مالم تيبسا -

'হতে পারে তাদের কবরের আজাব আল্লাহ তা'আলা লঘু করবেন এ দুটি ডাল শুকানোর আগ পর্যন্ত।'

বোখারির[১] বর্ণনায় এবং এই বর্ণনায় অন্য সূত্রে এই ঘটনাও বক্তব্য লিখিত আছে কোনো কোনো বিদ'আতি এর দ্বারা কবরের ওপর ফুল দেওয়ার বৈধতার ওপর প্রমাণ পেশ করেছে। কিন্তু এই প্রমাণটি সম্পূর্ণ বাতিল। কেনোনা ফুল দেওয়ার কোনো আলোচনা এ হাদিসে নেই।

অবশ্য ওলামায়ে কেরামের আলোচনা এই মাসআলায় হয়েছে যে, এ হাদিস মুতাবেক কবরে ডাল গাড়ার কি হুকুম।

ওলামায়ে কেরামের একটি দল এ কথার পক্ষে যে, এটা ছিলো রাসূল ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য। এটা অন্য কারো জন্য করা দুরস্ত নয়। আল্লামা ইবনে বাত্তাল এবং আল্লামা জাজরি (র)-এর কারণ এটা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ-কে ওহির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিলো যে, তাদের কবরে আজাব হচ্ছে এবং এর সাথে সাথে এই জ্ঞানও দেওয়া হয়েছে যে, এই ডাল পুতে দেওয়ার কারণে তাদের শাস্তি লাঘব হতে পারে। কিন্তু অন্য কোনো ব্যক্তির না কবরবাসীর আজাব হওয়ার জ্ঞান হতে পারে, না শাস্তি লঘু হওয়ার। তাই অন্যদের জন্য ডাল গাড়া জায়েজ নয়। এই ধরনের সুস্পষ্ট বিবরণ হাফেজ ইবনে হাজার, আল্লামা আইনি, ইমাম নববি, আল্লামা খাত্তাবি প্রমুখ থেকেও বর্ণিত আছে। অবশ্য 'বজলুল মাজহুদে'[২] হজরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরি (র.) ইবনে বাত্তাল এবং মাজরি (র.)-এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। বলেছেন, যদি শাস্তিতে লিপ্ত হওয়ার জ্ঞান নাও হয়, তাহলেও এর দ্বারা মৃতের জন্য আজাব লঘু করার কোনো সুরত অবলম্বন না করা আবশ্যক নয়। অন্যথায় মৃতদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া এবং ইসালে সওয়াবও দুরস্ত না হওয়া চাই। এ কারণেই আবু দাউদ কিতাবুল জানায়েজে বর্ণিত আছে যে, হজরত বুরাইদা ইবনে হুসাইব (রা.) এই অসিয়ত করেছিলেন যে, আমার ওফাতের পর আমার কবরের ওপর যেনো ডাল গেড়ে দেওয়া হয়। এ কারণে মাওলানা সাহারানপুরি (র.)-এর ঝোঁকও এদিকে মনে হচ্ছে যে, এ হাদিসের ওপর আমল করতে গিয়ে কবরের ওপর ডাল গেড়ে দেওয়া বৈধ এবং আফজলও বটে।

তাফসিরে মা'আরিফুল কোরআন লেখক হজরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফি (কু.সি.)– এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তমূলক এ মন্তব্য করেছেন যে, হাদিস দ্বারা প্রমাণিত প্রতিটি বিষয়কে তার সে সীমার ওপর রাখা উচিত, যে সীমা পর্যন্ত সেটি প্রমাণিত। হাদিসে ১/২ বার তো ডাল গড়ার কথা প্রমাণিত আছে, এতে বোঝা যায়, কোনো কোনো সময় এমন করা জায়েজ। আর শায়খ সাহারানপুরির বক্তব্য এমন ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। কিন্তু এ কথাও

টীকা- ১. ১/৩৫. باب من الكبائر ان لا يستتر من بوله টীকা- ২. ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫।

প্রমাণিত হয় না যে, উক্ত অনুচ্ছেদের হাদিস ব্যতিত রাসূলে কারিম ﷺ-এর অন্য কারো কবরের ওপর এমন করেছেন। অনুরূপভাবে হজরত বুরাইদা (রা.) ব্যতিত অন্য কোনো সাহাবি থেকে বর্ণিত নেই যে, তিনি কবরের ওপর ডাল গাড়ার বিষয়টিকে নিজের মা'মুল বানিয়ে নিয়েছেন। এমনকি হজরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে জাবের (রা.) থেকে যারা এ হাদিসের[১] রাবি– এ কথা বর্ণিত নেই যে, তারা আজাব লঘু করার জন্য এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এ থেকে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ কাজটি যদিও জায়েজ কিন্তু সুন্নতে জারিয়া এবং স্বতন্ত্র নিয়ম বানানোর বিষয় নয়। হক হলো প্রতিটি জিনিসকে তার অধিকার দেওয়া, সীমালঙ্ঘন না করা। এটাকেই বলে দীনের গভীর এলেম।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ نَضْحِ بَوْلِ الْغُلَامِ قَبْلَ اَنْ يَّطْعَمَ (٢١)

অনুচ্ছেদ- ৫৪ : খাবারে অভ্যস্ত হওয়ার আগে শিশুর পেশাব হালকাভাবে ধোয়া প্রসঙ্গে (মতন ২১)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالَا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ دَخَلْتُ بِابْنٍ لِيْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ عَلَيْهِ ـ

৭১. অর্থ : হজরত উম্মে কায়স বিনতে মিহসান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার এক দুগ্ধপোষ্য শিশু নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। শিশুটি তখনো (দুধ ব্যতিত অন্য শক্ত খাবার) খেতে আরম্ভ করেনি। বাচ্চাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গায়ে পেশাব করে দেয়। তিনি তখন পানি আনিয়ে তার ওপর ছিটিয়ে দিলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আলি, আয়েশা, জয়নাব, লুবাবা বিনতে হারেস (তিনি হলেন, উম্মুল ফজল বিনতে আব্বাস ইবনে আব্দুল (মুত্তালিব) এবং আবুস্ সাম্হ, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবু লায়লা ও ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এটা হলো, একাধিক সাহাবি, তাবেই ও তৎপরবর্তী যেমন আহমদ ও ইসহাক (র)-এর বক্তব্য। তাঁরা বলেছেন, দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাব হালকাভাবে ধোয়া হবে, আর শিশু কন্যার পেশাব ভালভাবে ধৌত করা হবে। আর এই হুকুম ততোক্ষণ যখন তারা দুধ ব্যতীত অন্য শক্ত খাবার খেতে আরম্ভ না করবে। যখন দুগ্ধপোষ্য ছেলে ও মেয়ে দুধ ব্যতীত অন্য শক্ত খাবারও খেতে আরম্ভ করবে তখন তাদের উভয়ের পেশাব ভালো করে ধুইতে হবে।'

দরসে তিরমিযী

فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه : ১) এমন শিশুর পেশাব সম্পর্কে দাউদ জাহেরির মাজহাব হলো তা পাক। ২) জমহুর এমন শিশুর পেশাব অপবিত্র হওয়ার পক্ষে। কাজি ইয়াজ (র.) ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মাজহাবও দাউদ জাহেরির মাজহাবের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, এমন শিশুর পেশাব পবিত্র। কিন্তু আল্লামা নববি (র.) কাজি ইয়াজ (র.)-এর বক্তব্য খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন, ইমাম শাফেয়ি (র.) ও জমহুরের ন্যায় এর অপবিত্রতার পক্ষে।

০ অতঃপর জমহুরের মাঝে এমন শিশুর পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে।

টীকা- ১. অর্থাৎ এই অধ্যায়ে উল্লিখিত হাদিস, বুরাইদার হাদীস নয়।

১. ছেলে শিশুর পেশাব ধোয়ার পরিবর্তে তার ওপর পানি ছিটিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট ইমাম শাফেয়ি (র.), ইমাম আহমদ (র.) এবং ইমাম ইসহাক (র.)-এর মতে। অথচ দুগ্ধপোষ্য কন্যা শিশুর পেশাব ধৌত করা জরুরি। অতঃপর পানির ছিটা নিক্ষেপ করার সীমা সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর একটি বক্তব্য হলো, পানির ফোঁটা পড়া একেবারেই জরুরি নয়। আর দ্বিতীয় ফতওয়ার বক্তব্যটি হলো, এতোটুকু ছিটা মারা জরুরি যাতে পানির ফোঁটাতো পড়বে না তবে নিংড়ালে ফোঁটা বেরুবে।

২. ইমাম আজম আবু হানিফা এর পরিপন্থী, ইমাম মালেক, সুফিয়ান সাওরি এবং ফুকাহায়ে কুফার মাজহাব হলো, কন্যা শিশুর পেশাবের মতো শিশু ছেলের প্রস্রাবও ধৌত করা জরুরি। অবশ্য দুগ্ধপোষ্য শিশু ছেলের প্রস্রাব অধিক ধোয়া জরুরি নয়, বরং সামান্য ধোয়াই যথেষ্ট।

০ ইমাম শাফেয়ি (র.) প্রমুখ এ অনুচ্ছেদের হাদিস এবং সেসব হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন যেগুলোতে শিশু ছেলের পেশাবের সাথে نضح অথবা رش শব্দ এসেছে। যেগুলোর অর্থ হলো, ছিটা মারা।

০ হানাফিদের প্রমাণ প্রথমতো সেসব হাদিস দ্বারা যেগুলোতে পেশাব থেকে পরহেজ করার তাকিদ দেওয়া হয়েছে এবং সেটাকে নাপাক সাব্যস্ত করা হয়েছে। এসব হাদিস ব্যাপক। এগুলোতে কোনো বিশেষ প্রকার পেশাব খাস করা হয়নি।

০ দ্বিতীয়তো শিশু ছেলের পেশাব সম্পর্কে হাদিসে صب عليه الماء (পানি ঢেলে দিয়েছেন।) এবং اتبعه الماء (অতঃপর পানি ব্যবহার করেছেন।) শব্দও এসেছে। যেটি ধৌত করার পক্ষে স্পষ্ট। এমন হাদিসের সমস্ত সূত্রগুলো সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে; বরং ই'লাউস্ সুনান : ১/৪৭৩-এ হজরত আয়েশা (রা.)-এর হাদিস বর্ণিত আছে। যা দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় শিশু ছেলের পেশাব ধোয়ার কথা,

قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فاتى بصبى مرة فبال عليه فقال صبوا عليه الماء صبا ـ رواه الطحاوى واسناده صحيح (اثار السنن) جا ص١٧

'তিনি বলেন, হজরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে শিশুদের আনা হতো। একবার এক শিশুকে আনার পর সেটি তাঁর গায়ে পেশাব করে দেয়। ফলে তিনি বলেন, ভালো করে এর ওপর পানি ঢেলে দাও।'

০ ইমাম আজম (র.) এসব কারণে শাফেয়ি মতাবলম্বীদের প্রমাণের জবাবে বলেন, সঙ্গত হলো যেসব হাদিসে نضح এবং رش শব্দ এসেছে সেগুলোর এমন অর্থ উদ্দেশ্য করা যেগুলো অন্য হাদিসের সাথে মিল। সে অর্থ হচ্ছে হাল্কা ধোয়া। نضح এবং رش শব্দ যেরূপ ছিটা নিক্ষেপ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেখানে হাল্কা ধোয়ার অর্থেও প্রসিদ্ধ। স্বয়ং ইমাম শাফেয়ি (র.)ও কোনো কোনো স্থানে এসব শব্দের এই ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন তিরমিযীতে باب فى المذى يصيب الثوب তে হজরত সাহল ইবনে হুনায়ফ (র.)-এর বর্ণনা আছে, যাতে রাসূল ﷺ পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি বাতলাতে গিয়ে বলেছেন,

يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى انه اصاب منه ـ

'তোমার জন্য যথেষ্ট হলো, এক অঞ্জলি পানি নিয়ে তোমার কাপড় হালকাভাবে ধোয়া, যেখানে দেখবে নাপাক মজি লেগেছে।'

এই বর্ণনার আওতায় ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন,

وقد اختلف اهل العلم فى المذى يصيب الثوب فقال بعضهم لا يجزئ الا الغسل وهو قول الشافعى (رحـ) واسحاق ـ

'কাপড়ের মধ্যে যদি মজি লেগে যায় এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম মতানৈক্য করেছেন, তবে কেউ কেউ বলেছেন ধোয়া ব্যতিত যথেষ্ট হবে না। এটা হলো ইমাম শাফেয়ি ও ইসহাক (র.)-এর মাজহাব।'

প্রকাশ থাকে যে, এখানে ইমাম শাফেয়ি (র.) نضح শব্দের অর্থ হালকা ধোয়া কবুল করেছেন।

এমনিভাবে সহিহ মুসলিম শরিফ : ১/১৪৩ باب المذى তে হজরত আলি (কা.)-এর বর্ণনা রয়েছে,

ارسلنا المقداد بن الاسود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذى يخرج من الإنسان كيف يفعل به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك -

'মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা.)কে আমরা হজরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটপাঠালাম। তিনি মানুষ থেকে যে মজি বের হয় এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, লোকটি কি করবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি ওজু কর এবং তোমার লজ্জাস্থান ধোও।'

ইমাম নববি (র.) এর অধীনে লিখেছেন,

وأما قوله صلى الله عليه وسلم ونضح فرجك فمعناه اغسله فان النضح يكون غسلا ويكون رشا وقد جاء فى الرواية الأخرى يغسل ذكره فتعين حمل النضح عليه -

'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য وانضح فرجك-এর অর্থ তুমি তা ধৌত করে নাও। কেনোনা, نضح শব্দ ধোয়া এবং পানি ছিটানো উভয় অর্থে ব্যবহার হয়। অন্য বর্ণনাতে শব্দ এসেছে يغسل ذكره তথা সে তার লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে। সুতরাং, نضح শব্দটি ধোয়ার অর্থে প্রয়োগ করা সুনির্ধারিত হয়ে গেলো।'

ইমাম তিরমিযী (র.) باب فى غسل دم الحيض من الثوب তে অনুরূপভাবে হজরত আসমা বিনতে আবি বকর (রা.)-এর বর্ণনা তাখরিজ (সনদ ও বরাতসহ উল্লেখ) করেছেন,

ان امرأة سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلى فيه -

'নবী আকরাম ﷺ-কে এক মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, কাপড়ে মাসিকের রক্ত লাগে (এটার হুকুম কি?) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা তুমি ঘষে ফেলো। অতঃপর পানি দিয়ে ঢলে ঢলে ধুয়ে ফেলো এবং তাতে নামাজ পড়ো।'

এখানেও رش শব্দটি ইমাম শাফেয়ি (র.) ধোয়ার অর্থে নিয়েছেন। এজন্য এ হাদিসের অধীনে ইমাম তিরমিযী (র.) লিখেছেন,

وقال الشافعى (رح) يجب عليه الغسل وان كان أقل من قدر الدرهم وشدد فى ذلك -

'ইমাম শাফেয়ি (র.) বলেছেন, তার ওপর ধোয়া ফরজ, যদিও এক দিরহামের চেয়ে কম পরিমাণই হোক না কেনো। এ ব্যাপারে তিনি কঠোরতা আরোপ করেছেন।'

এই হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে সহিহ মুসলিম : ১/১৪০ باب نجاسة الدم وكيفية غسله নিম্নেযুক্ত শব্দে,

عن اسماء قالت جائت إمرأة إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلى فيه -

'হজরত আসমা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এক মহিলা নবী করিম ﷺ-এর কাছে এসে বললো, আমাদের কোনো মহিলার কাপড়ে মাসিকের রক্ত লেগে যায়। সে এটা কি করবে? জবাবে তিনি বললেন, নখ দিয়ে ঘষে এটি তুলে ফেলবে। অতঃপর তা ডলবে। তারপর ধৌত করে তাতে নামাজ পড়বে।'

শাফেয়ি মতাবলম্বীরা আল্লামা নববি (র.) এই হাদিসের আওতায় লিখেছেন–

ومعنى تنضحه تغسله وهو بكسر الضاد كذا قال الجوهرى وغيره وفى هذا الحديث وجوب غسل النجاسة بالماء ـ

'تنضحه শব্দের অর্থ হলো, তা তুমি ধোবে। আল্লামা জাওহারি প্রমুখ এই মন্তব্য করেছেন। এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় নাপাক বস্তু পানি দ্বারা ধোয়া ওয়াজিব।'

সুতরাং, যেমনভাবে এসব স্থানে নিয়েছেন نضح এবং رش শব্দটিকে ধোয়ার অর্থে, এমনভাবে এখানে নিতে কি অসুবিধা? অবশ্য হাদিসগুলো দ্বারা এতোটুকু বিষয় অবশ্যই বুঝে আসে যে, ছেলেশিশু ও কন্যা শিশুর প্রস্রাবে পার্থক্য আছে। সেটি হলো, কন্যা শিশুর পেশাব ভালো করে ধৌত করতে হবে। তবে পেশাবের ছেলে শিশুর পেশাব হালকা ধৌত করাই যথেষ্ট।

প্রশ্ন : এবার এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুর পেশাবের পার্থক্য কেন করা হলো? যদিও এই পার্থক্য হানাফিদের মতে বেশি করে ধোয়া ও না ধোয়ারই হোক না কেন?

জবাব : এর বিভিন্ন জবাব দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে উত্তম হলো, কন্যা শিশুর পেশাব খুব দুর্গন্ধযুক্ত এবং ঘন, অথবা ছেলে শিশুর পেশাব এতোটা ঘন নয় এবং যখন দুধ পানের সময় শেষ হয়ে যায় খাদ্যের প্রভাবে ছেলের পেশাবেও ঘনত্ব সৃষ্টি হয়। তাই তখন অন্য কোনো পার্থক্য থাকে না।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ (صـ ١٢)

অনুচ্ছেদ- ৫৫ : যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল সেগুলোর পেশাব সম্পর্কে (মতন ২১)

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَبَعَثَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِىْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ اِشْرَبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا فَقَتَلُوْا رَاعِىَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَاقُوا الْاِبِلَ وَارْتَدُّوْا عَنِ الْاِسْلَامِ فَاُتِىَ بِهِمُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَطَّعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ وَسَمَرَ اَعْيُنَهُمْ وَاَلْقَاهُمْ بِالْحَرَّةِ قَالَ اَنَسٌ فَكُنْتُ اَرٰى اَحَدَهُمْ يَكُدُّ الْاَرْضَ بِفِيْهِ حَتّٰى مَاتُوْا نُوْرُبَمَا قَالَ حَمَّادٌ يَكْدِمُ الْاَرْضَ بِفِيْهِ حَتّٰى مَاتُوْا ـ

৭২. অর্থ : হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার উরাইনা গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক মদিনায় এলো। অতঃপর তারা পেটের অসুখে আক্রান্ত হলো বা মদিনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল হলো না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সাদকার উটগুলোর মধ্যে পাঠিয়ে দিলেন। বলে দিলেন, তোমরা এগুলোর দুধ ও পেশাব পান করো। তারা সেখানে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাখালকে হত্যা করে ফেললো, উটগুলো হাকিয়ে নিয়ে গেলো এবং ইসলাম থেকে ফিরে গেলো তথা মুরতাদ হয়ে গেলো। পরে তাদেরকে নবীজি ﷺ-এর নিকট ধরে আনা হলো। তিনি তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেললেন। অর্থাৎ, একদিকের হাত ও অপরদিকের পা কর্তনের নির্দেশ দিলেন। তাদের চোখগুলো শলাকা দিয়ে ফোঁড়ে দিলেন। তাদেরকে প্রস্তরময় স্থানে ফেলে রাখলেন।

হজরত আনাস (রা.) বলেছেন, আমি তাদের কাউকে দেখছিলাম মুখ মাটিতে ঘষছে। তারা এভাবেই মৃত্যুবরণ করলো। হাম্মাদ কখনও বলেছেন يكدم الارض بفيه حتى ماتوا। (মাটি কামড়ে কামড়ে মরেছে।)

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। একাধিক সূত্রে এটি হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। এটা হলো, অধিকাংশ আলেমের মত। তারা বলেছেন, যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল সেগুলোর পেশাবে কোনো সমস্যা নেই।

حَدَّثَنَا اَلْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْاَعْرَجُ نَا يَحْيٰى بْنُ غَيْلَانَ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ اِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اَعْيُنَهُمْ لِاَنَّهُمْ سَمَلُوْا اَعْيُنَ الرُّعَاةِ ـ

৭৩. অর্থ : হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে আকরাম ﷺ তাদের চোখ গরম শলাকা দিয়ে এজন্য ফোঁড়ে দিয়েছিলেন যে, তারা রাখালদের চোখগুলো ফোঁড়ে দিয়েছিলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি غريب। এই শায়খই (ইয়াহইয়া ইবনে গায়লান) ইয়াজিদ ইবনে জুরাইজ থেকে এ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া আর কেউ তা উল্লেখ করেছেন বলে আমরা জানি না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কাজটি সব ধরনের জখমের জন্য সমান দণ্ড তথা الجروح قصاص -এর বাস্তব তাফসির। মুহাম্মদ ইবনে সিরিন (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূল ﷺ শরয়ি দণ্ডবিধি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে এই শাস্তি দিয়েছিলেন।'

দরসে তিরমিযী

ان ناسا من عرينة قدموا المدينة : কোনো কোনো বর্ণনায় এখানে উরাইনার পরিবর্তে عكل[১] শব্দ এসেছে এবং বোখারির[২] এক বর্ণনায় من عكل وعرينة ـ واو حرف عطف সহকারে এসেছে। আরেকটি বর্ণনায় من عكل او عرينة[৩] সন্দেহসহকারে এসেছে। আরেকটি বর্ণনায় ان رهطا من عكل ثمانية শব্দে এসেছে।

ওলামায়ে কেরাম বলেছেন– মূলত তারা ছিলো সর্বমোট আট জন। তন্মধ্যে চারজন উরাইনা গোত্রের, আর তিনজন ছিলো উক্‌ল গোত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রবল ধারণা মুতাবেক আরেকজন ব্যক্তি ছিলো অন্য কোনো গোত্রের। এভাবে সবগুলো বর্ণনার মধ্যে মিল হয়।

فاجتووها : اجتواء শব্দের আভিধানিক অর্থ, জাওয়া রোগে আক্রান্ত হওয়া। 'জাওয়া' পেটের একটি রোগের নাম। যার ফলে পেট ফুলে যায়, খুব পিপাসা লাগে। এ রোগটিকে সাধারণত استسقاء (তৃষ্ণা-পিপাসা) বলা হয়। অনেকে اجتووا শব্দের অর্থ করেছেন, তারা মদিনার আবহাওয়া প্রতিকূল পেয়েছে। অর্থাৎ, তারা মদিনা তাইয়িবার পরিবেশ স্বীয় স্বাস্থ্যের জন্য অনুকূল পায়নি। এই দ্বিতীয় অর্থটি মূল। কেনোনা কোনো কোনো বর্ণনায় اجتووا শব্দের স্থানে[৪] استوخموا المدينة শব্দ এসেছে। আর استيخام শব্দ সুনির্দিষ্ট দ্বিতীয় অর্থের জন্য।

وقال اشربوا من البانها وابوالها : এই বাক্যটির সাথে দুটি ফিক্‌হি মাসআলা সংশ্লিষ্ট। প্রথম মাসআলাটি হলো, যেসব জন্তুর গোশত খাওয়া হালাল সেগুলোর পেশাব সংক্রান্ত– এটা কি পবিত্র না অপবিত্র?

টীকা- ১. বোখারি : ২/৬০২ كتاب المغازى باب قصة عكل وعرينة
টীকা- ২. সূত্র ঐ।
টীকা- ৩. বোখারি : ১/৩৬ كتاب الوضوء باب ابوال الأبل والدواب والغنم ومرابضها
টীকা- ৪. বোখারি : ২/৬০২ باب قصة عكل وعرينة

১. ইমাম মালেক, ইমাম মুহাম্মদ, আরেক বর্ণনা মুতাবেক ইমাম আহমদ (র.)-এর মাজহাবও এটি পবিত্র।

২. অথচ ইমাম আবু হানিফা (র.) ইমাম শাফেয়ি (র.) ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ও সুফিয়ান সাওরি (র.)-এর মাজহাব হলো, এটি অপবিত্র।

৩. অবশ্য ইমাম আবু হানিফা (র.) এটাকে সাব্যস্ত করেন হালকা নাপাক। কেনোনা ফুকাহায়ে কেরামের মতানৈক্যের কারণে তাঁর মতে বিধিবিধানে কিছুটা সহজতার সৃষ্টি হয়।

এ অধ্যায়ের বর্ণনায় ওপরযুক্ত বাক্যটি ইমাম মালেক (র.) প্রমুখের প্রমাণ। সুতরাং যদি উটের পেশাব পবিত্র না হতো, তাহলে রাসূল ﷺ এটা পান করার নির্দেশ দিতেন না। তাঁদের দ্বিতীয় প্রমাণ হলো সে বর্ণনা, যাতে রাসূল বলেছেন, صلوا فى مرابط الغنم (তোমরা বকরি বাঁধার স্থানে নামাজ পড়ো।)

দলিলের কারণ হলো, ছাগল বাঁধার জায়গাগুলো বকরির পেশাব এবং বিষ্ঠার কেন্দ্র হয়ে থাকে। যদি এগুলোর পেশাব ইত্যাদি নাপাক হতো তাহলে তাতে নামাজ পড়ার অনুমতি হতো না। এর ফলে তাঁরা যেসব জন্তুর গোশত খাওয়া হালাল সেগুলোর পেশাব ব্যতিত গোবর, বিষ্ঠার পবিত্রতার ওপরও প্রমাণ পেশ করেন।

১. মুসতাদরাক[১] : ১৮৩; ইবনে মাজাহ : ১২৯, দারাকুতনি এবং সহিহ ইবনে খুজায়মায় হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর একটি হাদিস হানাফিদের একটি প্রমাণ,

إستنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه ـ

'পেশাব থেকে তোমরা বেঁচে থাকো। কেনোনা অধিকাংশ কবরের আজাব হয়ে থাকে এর কারণেই।'

এ হাদিসটিকে হজরত হাকেম (র.) বোখারির শর্ত মুতাবেক সহিহ সাব্যস্ত করেছেন। এ হাদিসটিকে 'মাজমাউজ জাওয়ায়িদে' আল্লামা হায়সামি (র.)ও বর্ণনা করেছেন। এতে পেশাব শব্দটি ব্যাপক। তাতে যেসব জন্তুর গোশত খাওয়া হালাল সেগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইমাম দারাকুতনি (র.) সুনানে : ১/১২৮-তে ওপরিউক্ত হাদিসের শব্দ বর্ণনা করার পর বলেছেন, الصواب انه مرسل (সঠিক হলো, এটি মুরসাল) কিন্তু পরবর্তীতে,

ابو على الصفارنا محمد بن على الوراق نا عفان (وهو ابن مسلم) نا ابو عوانة عن الاعمش عن ابى صالح عن ابى هريرة (رض)

সূত্রে মারফু ভাবে এই শব্দগলো বর্ণনা করেছেন– اكثر عذاب القبر من البول। (অধিকাংশ কবরের আজাব পেশাবের কারণে হয়ে থাকে।) আর এটাকে বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করেছেন। তাছাড়া অন্য আরেকটি সূত্রে নিম্নেযুক্ত শব্দগুলো বর্ণনা করেছেন,

عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا من البول ـ

'অধিকাংশ কবরের আজাব হয় পেশাবের কারণে। সুতরাং তোমরা পেশাব (-এর ছিটা) থেকে বেঁচে থাকো।'

অতঃপর বলেছেন, لا بأس به তথা তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

২. মুসনাদে আহমদে হজরত সা'দ ইবনে মু'আজ (রা)-এর ওফাতের ঘটনা[২] হানাফিদের দ্বিতীয় প্রমাণ যাতে রয়েছে যে, দাফনের পর তাঁকে কবর খুব জোরে চাপ দিয়েছে। এটাও এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূল ﷺ এই সংবাদ দেওয়ার পর বলেছেন, তাঁর পেশাব থেকে পরহেজ না করার কারণে এই শাস্তি ছিলো।

'আল-কাওকাবুদ্ দুররি'তে হজরত গাঙ্গুহি (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এই হাদিসের অনেক সূত্রে স্পষ্ট বলা হয়েছে, যখন তার স্ত্রীর নিকট জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, তখন তিনি বলেছিলেন, তিনি মহিষ চরাতেন এবং এগুলোর পেশাব থেকে যথাযথভাবে পরহেজ করতেন না। হজরত সাদ ইবনে মু'আজ (রা.)-এর ওফাতের ঘটনায়

টীকা- ১. মা'আরিফুস্ সুনান : ১/২৭৫।

টীকা- ২. মিশকাতুল মাসাবিহ : ১/২৬, باب اثبات عذاب القبر، الفصل الثانى

স্ত্রীর নিকট জিজ্ঞেস করার এ কাহিনী অধম হাদিসের কোনো কিতাবে পায়নি। কিন্তু হজরত গাঙ্গুহি (র.) এটাকে অত্যন্ত মজবুতভাবে উল্লেখ করেছেন। যদি এই ঘটনাটি প্রমাণিত হয়, তাহলে সুস্পষ্ট নসের মর্যাদা রাখে আলোচ্য মাসআলায়।

৩. তিরমিযী হানাফিদের তৃতীয় প্রমাণ أبواب الأطعمة باب ماجاء به فى اكل لحوم الجلالة والبانها তে বর্ণিত হজরত ইবনে উমর (রা.)-এর হাদিস-

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الجلالة والبانها ـ

'রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন নাপাক ভক্ষণকারি জন্তুর গোশত ও দুধ খেতে।'

جلالة বলে এমন প্রাণীকে যেটি বিষ্ঠা এবং নাপাক খায়। যেমন, গোবর নাপাক খাওয়া নিষেধাজ্ঞার কারণ। এর ফলে দালালাতুন্ নস (নসের উদ্দিষ্ট অর্থ) দ্বারা যেসব জন্তুর গোশত খাওয়া হারাম সেগুলোর পেশাব বিষ্ঠার অপবিত্রতা বোঝা যায়।

হানাফি এবং শাফেয়িগণের পক্ষ থেকে এ অনুচ্ছেদের হাদিসটির বিভিন্ন জবাব দেওয়া হয়েছে।

১. নবী আকরাম ﷺ-কে ওহির মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছিলো যে, উটের পেশাব পান করা ব্যতিত তাদের আরোগ্য এবং বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এভাবে তারা নিরুপায়ের পর্যায়ে চলে এসেছিলো। আর নিরুপায় ব্যক্তির জন্য নাপাক দ্রব্য ব্যবহার করা ও পান করা জায়েজ হয়ে যায়।

২. দ্বিতীয় জবাব এই দেওয়া হয় যে, রাসূল ﷺ তাদেরকে পেশাব পান করার হুকুম দেননি; বরং বাইরে ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মূলত এই বাক্যটি علفته تبنا وماء باردا -এর অন্তর্ভুক্ত। এতে তাজমীন (এক শব্দে ভিন্ন অর্থও সংশ্লিষ্ট থাকা।) পাওয়া যায়। মূলত ইবারত ছিলো এমন,

اشربوا من ألبانها واستنشقوا من ابوالها يا اضمدوا من ابوالها

উটনির দুধ পান করো এবং পেশাবের ঘ্রাণ নাও। অথবা পেশাবের প্রলেপ দাও। اضمدوا অর্থ হলো, প্রলেপ দাও।

৩. অনেকে তৃতীয় জবাব দিয়েছেন, এ হাদিসটি রহিত হয়ে গেছে। এর জন্য রহিতকারি হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিস استنزهوا من البول। রহিত হওয়ার প্রমাণ হলো, ঐতিহাসিকদের সুস্পষ্ট বিবরণ মুতাবেক উরানিদের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো, ৬ হিজরি জুমাদাল উলা, শাওয়াল অথবা জ্বিলকদে। অবশ্যই استنزهوا من البول হাদিস এর বিপরীত। কেনোনা এর বর্ণনাকারি হজরত আবু হুরায়রা (রা.) যিনি ৭, হিজরিতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া এই হাদিসেই উল্লেখ করেছে যে, প্রিয়নবী ﷺ উরানিদের বিকৃত করেছিলেন। অথচ সর্বসম্মতিক্রমে বিকৃতির হাদিস রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং স্পষ্ট হলো এ হুকুমটিও হবে মানসুখ।

এ জবাবটি তবে উত্তম নয়। কারণ, উসুলে হাদিসে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, শুধু রাবির পরবর্তীতে মুসলমান হওয়া হাদিস পরবর্তীতে হওয়ার প্রমাণ নয়। কেনোনা হতে পারে হাদিসটি তার ইসলাম গ্রহণের আগের এবং রাবি ইসলাম কবুল করার পর অন্য কোনো সাহাবি থেকে শুনে তা বর্ণনা করেছেন। এমন হাদিসকে সাহাবির মুরসাল বলা হয়।

এর বহু দৃষ্টান্ত হাদিসের গ্রন্থাবলিতে রয়েছে। অতএব, উরানিদের হাদিসকে রহিত বলা কঠিন। সুতরাং প্রথম দুটি জবাবই অধিক প্রাধান্য উপযোগী।

হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করা

এখানে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা হলো, হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করা। অর্থাৎ কোনো হারাম জিনিস ঔষধরূপে ব্যবহার করা জায়েজ কি না? এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। যদি অপারগ অবস্থা হয় অর্থাৎ, হারাম জিনিস ব্যবহার করা ব্যতিত জান বাঁচা মুশকিল হয়, তবে প্রয়োজন মাফিক হারাম দ্বারা চিকিৎসা করা সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ। কিন্তু যদি জানের আশঙ্কা না হয়; বরং রোগ দূর করার জন্য হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, তবে তাতে আয়িম্মায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে।

১. ইমাম মালেক (র.)-এর মতে এমন অবস্থায়ও হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করা বৈধ।

২. পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মতে এমতাবস্থায় হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করা অবৈধ।

৩. নেশাজাত দ্রব্য ইমাম বায়হাকি (র.)-এর মতে সমস্ত চিকিৎসা করা অবৈধ। অন্য হারাম দ্রব্যগুলো দ্বারা জায়েজ। হানাফিদের ইমাম আজম আবু হানিফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মতো নাজায়েজের পক্ষে।

৪. ইমাম তাহাবি (র.)-এর মাজহাব, শরাব ছাড়া অন্য সব হারামদ্বারা চিকিৎসা করা বৈধ।

৫. ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাজহাব, যদি কোনো বিশেষজ্ঞ ডা. সিদ্ধান্ত দেন যে, হারাম দ্বারা চিকিৎসা ব্যতিত রোগ মুক্তি সম্ভব নয় তবে এমতাবস্থায় হারাম দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা করা বৈধ। যারা সাধারণত জায়েজের প্রবক্তা এ অধ্যায়ের হাদিসটি তাদের প্রমাণ। হানাফিদের যে বক্তব্যের ফতওয়া সে বক্তব্যে মুতাবেক এ হাদিসের ব্যাখ্যা হলো, রাসূল ﷺ ওহির মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, তাদের রোগ নিরাময় উটের পেশাবের মধ্যে সীমিত, তাই তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন উটের পেশাব ব্যবহার করার।

فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر اعينهم : سمر শব্দের অর্থ হলো, গরম শলাকা দ্বারা দাগ দেওয়া।

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন হয় এটাতো বিকৃতি যা নিষিদ্ধ।

জবাব : এই ঘটনা বিকৃতি হারাম হওয়ার আগের। অনেকে জবাব দিয়েছেন– তারা সাদকার উটের রাখালকে যিনি ছিলেন কোনো কোনো বর্ণনা মুতাবেক হজরত আবু জর (রা.)-এর ছেলে– তাঁকে তারা হত্যা করেছিলো অনুরূপভাবে, এজন্য অনুরূপ করা হয়েছিলো কিসাস স্বরূপ।

সাদৃশ্য কিসাস

এখান থেকে জন্ম নেয় সমান কিসাসের বিষয়টি।

১. এ মাসআলায় দুটি বক্তব্যে বর্ণিত আছে ইমাম শাফেয়ি (র.) থেকে।

প্রথম বক্তব্য হলো, আগুনে পোড়ানো ব্যতিত অন্য সব অপরাধে সদৃশ্য কিসাস হবে। আর দ্বিতীয় বক্তব্য হলো, প্রতিটি অপরাধে সাদৃশ্য কিসাস শুধু ব্যতিক্রম সেই হত্যা যা শরিয়াত কর্তৃক নিষিদ্ধ অন্য কোনো মাধ্যমে করা হয়েছে। যেমন জিনা বা সমকামিতা।

২. হানাফিদের মতে শুধু তলোয়ারের মাধ্যমেই হয় কিসাস।

তাঁদের প্রমাণ, ইবনে মাজাহ শরিফের একটি বর্ণনা– لا قود الا بالسيف (তলোয়ার ব্যতিত অন্য কোনোভাবে কিসাস নেই।) অবশ্য আঘাত সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ হলো, যেখানে সমান কিসাস সম্ভব সেখানে কিসাস হবে অন্যথায় রক্তপণ।

والقاهم بالحرة : حرة বলা হয়, এমন প্রস্তরময় ভূমিকে যাতে বড় বড় কালো পাথর ভূমির ওপর উত্থিত অবস্থায় পড়ে থাকে। মদিনা তাইয়িবার জবাব ও দক্ষিণে অনেক ভূমি এমনটি আছে।

قال انس فكنت ارى احدهم يكد الأرض من فيه حتى ماتوا : يكد শব্দের অর্থ, ঘর্ষণ দেওয়া। আর এক বর্ণনায় আছে يكدم যার অর্থ হলো কাটা। অনেক বর্ণনায় এ কর্মের এই কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা ছিলো পিপাসার্ত, তাদেরকে পানি দেওয়া হয়নি। যদিএ বিষযটি বিশুদ্ধ হয়ে থাকে তবে তা তাদেরই বৈশিষ্ট্য হবে। অন্যথায় নির্দেশ হলো, কোনো অপরাধী যতো বড় শাস্তিরই যোগ্য হোক না কেনো, পানি চাইলে তাকে পানি পান করতে দেওয়া হবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْوُضُوْءِ مِنَ الرِّيْحِ (صـ ٢٣)

অনুচ্ছেদ- ৫৬ : বায়ু নির্গত হলে ওজু করা প্রসঙ্গে (মতন ২৩)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله وسلم قَالَ لَا وُضُوْءَ اِلَّا مِنْ صَوْتٍ اَوْ رِيْحٍ .

৭৪. **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (বায়ুর আওয়াজ) কিংবা দুর্গন্ধ না পেলে কোনো ওজু নেই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

حدثنا قتيبة نا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابى صالح عن ابيه عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه قَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فِى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رِيْحًا بَيْنَ اَلْيَتَيْهِ فَلَا يَخْرُجْ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا .

৭৫. **অর্থ :** 'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে অবস্থান করে, অতঃপর তার দুই নিতম্বের মাঝে তথা পায়ু পথে বায়ু অনুভব করে তখন শব্দ শোনা অথবা দুর্গন্ধ পাওয়া ব্যতীত (মসজিদ থেকে) বের হবে না।

حدثنا محمود بن غيلان نا عبد الرزاق انا معمر عن همام بن منبه عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُ صَلٰوةَ اَحَدِكُمْ اِذَا اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّاَ .

৭৬. **অর্থ :** মাহমুদ ইবনে গায়লান .. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী আকরাম ﷺ এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কারো নামাজ কবুল করেন না, যতোক্ষণ না তোমাদের কারো ওজু নষ্ট হয়ে গেলে ওজু করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ, আলি ইবনে তাল্‌ক, আয়েশা, ইবনে আব্বাস ও আবু সায়িদ (রা.) থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। এটা হলো ওলামায়ে কেরামের মত। বায়ুর শব্দ শোনা অথবা দুর্গন্ধ অনুভব করার ফলে অপবিত্র হলেই কেবল কোনো ব্যক্তির ওপর ওজু ওয়াজিব, তা ব্যতিত নয়।

ইবনুল মুবারক (র.) বলেছেন, যখন অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হবে তার ওপর ততোক্ষণ পর্যন্ত ওজু ওয়াজিব হবে না, যতোক্ষণ এমন নিশ্চিত বিশ্বাস না হবে যে, এর ওপর শপথ করতে পারে। তিনি বলেছেন, যখন মহিলার সামনের পথ তথা লজ্জাস্থান দিয়ে হাওয়া বের হয় তখন তার ওপর ওজু ওয়াজিব হয়। শাফেয়ি ও ইসহাক (র.)-এর মাজহাব এটা।

দরসে তিরমিযী

لا وضوء الا من صوت او ريح : এখানে এই সীমাবদ্ধতা সর্বসম্মতিক্রমে আপেক্ষিক। সর্বসম্মতিক্রমে আওয়াজ এবং গন্ধ দ্বারা নিশ্চিত অপবিত্রতার প্রতি ইঙ্গিত। তাই এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা রয়েছে যে, যদি আওয়াজ অথবা

দুর্গন্ধ ব্যতিত দূষিত বায়ু বের হওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে যায় তবুও ওজু ভেঙে যায়। আবু দাউদে এর প্রমাণ রয়েছে। যা দ্বারা বোঝা যায় রাসূল ﷺ একজন ওয়াসওয়াসা বা খুঁতখুঁতে রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে এ কথা বলেছিলেন। তা ব্যতিত এই হাদিসের বিস্তারিত বিবরণ মুসনাদে বাজ্জারে হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে মারফু সূত্রে রয়েছে এমন,

يأتى احدكم الشيطان فى صلوته ينفخ فى مقدمته فيخيل انه قد احدث فاذا وجد ذلك احدكم فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا باذنه او يجد ريحا بانفع (كشف الأستار عن زوائد البزار (رح) جا ١ صا٧٤١)

'শয়তান এসে তোমাদের কারও নামাজে তার সামনের দিকে ফুঁক দেয়, তখন তার কাছে মনে হয়, তার ওজু ছুটে গেছে, অপবিত্র হয়ে গেছে। কেউ যখন এটা অনুভব করবে তখন সে যেনো মোটেও ফিরে না আসে, যতোক্ষণ না নিজ কানে শব্দ শ্রবণ করবে অথবা আপন নাকে দুর্গন্ধ পাবে।'

اذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء .

১. সামনের রাস্তা দিয়ে যে হাওয় বের হয় ইমাম মালেক (র.)-এর মতে তা ব্যাপক আকারে ওজু ভঙ্গকারি নয়।

২. ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মতে পক্ষান্তরে ওজু ভঙ্গকারি। হানাফিদের মাজহাবও ইমাম মালেক (র.)-এর মতোই যে, সামনে রাস্তা দিয়ে হাওয়া বের হলে ওজু ভঙ্গ হয় না। শায়খ ইবনে হুমাম (র.)-এর এই কারণ বর্ণনা করেছেন যে, সামনের রাস্তার হাওয়া মূলত বায়ুই নয়, বরং মাংসের নড়াচড়া। যেটি ওজু ভঙ্গকারি নয়। তা ব্যতিত যদি এটাকে বায়ু মেনেও নেওয়া হয়, তবুও হিদায়া গ্রন্থকার, বাহরুর রায়েক গ্রন্থকারের বক্তব্য মুতাবেক সামনের রাস্তার হাওয়া নাপাক স্থান অতিক্রম করে আসে না। এজন্য ওজু ভঙ্গকারি হয় না। অবশ্য যাদের সামনের রাস্তা ও পেছনের রাস্তা এক হয়ে গেছে, এমন মহিলা সম্পর্কে হানাফিদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, তার ওজু সামনের রাস্তার বায়ু দ্বারা ভেঙে যায় কি-না? আল্লামা শামি (র.) এ ব্যাপারে তিনটি লিখেছেন,

১. এমন মহিলার ওপর ওজু ওয়াজিব।

২. যদি সামনের রাস্তার বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত হয় তবে ওয়াজিব, তা ব্যতিত নয়।

৩. এমন মহিলার ওপরও ওয়াজিব নয়, বরং মোস্তাহাব ও আফজল।

এই সর্বশেষ বক্তব্যটির ওপর ফতওয়াও। মূলকথা এমন মহিলার ক্ষেত্রে ওজু করার মধ্যেই সতর্কতা রয়েছে।

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ النَّوْمِ (٢٤)

অনুচ্ছেদ- ৫৭ : ঘুমের কারণে ওজু প্রসঙ্গে (মতন ২৪)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّهٗ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ حَتّٰى غَطَّ اَوْ نَفَخَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّىْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّكَ قَدْ نِمْتَ؟ قَالَ اِنَّ الْوُضُوْءَ لَا يَجِبُ اِلَّا عَلٰى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَاِنَّهٗ اِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهٗ .

৭৭. অর্থ : 'হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি দেখলেন নবী করিম ﷺ সেজদারত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েছেন। এমনকি তিনি নাক ডাকলেন এবং দীর্ঘশ্বাস নিলেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েছেন। ফলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। জবাবে তিনি বললেন, শুধুমাত্র যে পার্শ্বে শুয়ে ঘুমায় কেবল তার জন্য ওজু ওয়াজিব, অন্যদের ওপর না। কেনোনা, তখন তার জোড়াগুলো ঢিলে হয়ে যায় যখন পার্শ্বে শুয়ে ঘুমায়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'আবু খালেদের নাম ইয়াজিদ ইবনে আব্দুর রহমান। আয়েশা, ইবনে মাসউদ ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।'

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَنَامُوْنَ ثُمَّ يَقُوْمُوْنَ فَيُصَلُّوْنَ وَلَا يَتَوَضَّئُوْنَ.

৭৮. অর্থ : 'হজরত আনাস ইবনে মালেক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিগণ (বসে বসে) ঘুমাতেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন ওজু না করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদিসটি حسن صحيح। সালেহ ইবনে আবদুল্লাহকে আমি বলতে শুনেছি, আমি ইবনুল মুবারককে ইচ্ছাকৃত বসে বসে ঘুমন্ত ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। জবাবে তিনি বলেছেন, তার জন্য ওজু নেই। তিনি বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদিসটি সায়িদ ইবনে আবু আরূবা কাতাদাহ সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে তাঁর বক্তব্যরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি আবুল আলিয়ার নাম উল্লেখ করেননি এবং হাদিসটিকে মারফু রূপে রেওয়ায়েত করেননি।

ঘুমের কারণে ওজু সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ আলেমের মত হলো, বসে অথবা দাঁড়িয়ে ঘুমালে তার ওপর ওজু ওয়াজিব হয় না, যতোক্ষণ না পার্শ্বে শুয়ে ঘুমাবে। এটাই হলো সাওরি, ইবনে মুবারক ও আহমদ (র.)-এর মত। অনেকে বলেছেন, যখন কেউ তার বিবেকের ওপর প্রবল হয়ে নিদ্রা যাবে তার ওপর ওজু আবশ্যক।

ইসহাক (র.)-এর মাজহাব এটাই। ইমাম শাফেয়ি (র.) বলেছেন, যে বসে বসে ঘুমাবে ফলে স্বপ্ন দেখবে অথবা তন্দ্রার কারণে তার নিতম্ব সরে যাবে, তার ওপর ওজু আবশ্যক।

দরসে তিরমিযী

حتى غط او نفخ : غط - غطيط -এর অর্থ হলো নাক ডাকা। আর نفخ অর্থ হলো দীর্ঘশ্বাস নেওয়া।

ان الوضوء لا يجب الا على من نام مضطجعا : এখানে প্রশ্ন হয় যে, রাসূল ﷺ হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে এ জবাব কেনো দিলেন না যে, নবীদের ঘুম ওজু ভঙ্গকারি হয় না।

জবাব : প্রিয়নবী ﷺ-এর উদ্দেশ্য ছিলো এমন একটি জবাব দেওয়া যেটি সাধারণ লোকদের জন্য উপকারি হয়। প্রিয়নবী ﷺ-এর উদ্দেশ্য হলো, আমার নিদ্রা ছিলো সেজদা অবস্থায়। আর এমন নিদ্রা সাধারণ মুসলমানের জন্যও ওজু ভঙ্গকারি হয় না। শেষনবী ﷺ-এর জন্য তো ওজু ভঙ্গকারি হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

ঘুমের কারণে ওজু সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। এই মাসআলাতে আল্লামা নববি (র.) আটটি এবং আল্লামা আইনি (র.) দশটি উক্ত বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মূলত এ বক্তব্যেগুলোর সারনির্যাস নিম্নেযুক্ত তিনটি,

১. নিদ্রা সাধারণত ওজু ভঙ্গকারি নয়। এই মাজহাবটি হজরত ইবনে উমর, আবু মুসা আশআরি (রা.), আবু মিজলাজ, হুমাইদ আল-আ'রাজ এবং শো'বা (র.) হতে বর্ণিত।

২. ঘুম সাধারণত ওজু ভঙ্গকারি। চাই অল্প হোক বা বেশি। এ বক্তব্যটি বর্ণিত হজরত হাসান বসরি, ইমাম জুহরি এবং আওজায়ি (র.) থেকে।

৩. অধিক ঘুম ওজু ভঙ্গকারি। হাল্কা ঘুম ওজু ভঙ্গকারি নয়। এই মাজহাবটি হলো, ইমাম চতুষ্টয় ও জমহুরের। মূলত এই তৃতীয় বক্তব্যটির প্রবক্তারা এ ব্যাপারে একমত যে, নিন্দা সত্তাগতভাবে ওজু ভঙ্গকারি নয়;

বরং বায়ু বের হওয়ার সম্ভাব্য কারণ হওয়ার ফলে ওজু ভঙ্গকারি হয়। যেহেতু এ সম্ভাব্য কারণ মা'মুলি ঘুমের ফলে সৃষ্টি হয় না, সেহেতু এই মত অবলম্বন করা হলো যে, হালকা ঘুম ওজু ভঙ্গকারি নয়। তবে প্রবল ঘুম অর্থাৎ, এমন নিদ্রা যার ফলে মানুষ বেখবর হয়ে যায় এবং জোড়াগুলো ঢিলা হয়ে যায়, সেটি ওজু ভঙ্গকারি। যেহেতু নিদ্রা অবস্থায় বায়ু বের হওয়ার জ্ঞান হতে পারে না, এজন্য জোড়া ঢিলা হওয়াকে শরয়ি মতে বায়ু বের হওয়ার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। যেমন, এ অনুচ্ছেদের হাদিস– اذا اضطجع استرخت مفاصله শব্দ দ্বারাও এটা বোঝা যায় যে, হুকুমটি নির্ভর করে জোড়া ঢিলে হওয়ার ওপর। অতএব, যদি জোড়া ঢিলে হওয়া সত্ত্বেও কারো বায়ু বের না হওয়ার নিশ্চিত হয় তবুও ওজু ভেঙে যাবে। যেমন, সফরকে মাশাক্কাতের (কষ্টের) স্থলাভিষিক্ত করে সফরের কসরের নির্ভরতা করা হয়েছে এর ওপরেই।

০ তৃতীয় বক্তব্যকারিদের মধ্যে জোড়া ঢিলে হওয়া এবং অধিক ঘুমের সীমা নির্ধারণে মতবিরোধ আছে। ইমাম শাফেয়ি (র.) জমিন থেকে নিতম্ব পৃথক হওয়াকে জোড়া ঢিলে হওয়ার নিদর্শন সাব্যস্ত করেছেন। অতএব, তাঁর মতে যেসব নিদ্রায় পেছনের দিক জমিন থেকে পৃথক হয় সেগুলো ওজু ভঙ্গকারি হবে। হানাফিদের পছন্দসই মাজহাব হলো, ঘুম যদি নামাজের অবস্থায় হয় তাহলে জোড়া ঢিলে হয় না। অতএব, এমন নিদ্রা ওজু ভঙ্গকারি নয়। আর যদি নামাজের অবস্থা ভিন্ন, অন্য পদ্ধতিতে ঘুম হয়, তাহলে যদি জমিনের ওপর নিতম্ব নির্ভরশীল থাকে, তাহলে ওজু ভঙ্গকারি নয়। আর যদি মজবুতভাবে জমিনের ওপর নির্ভরতা ফওত হয়ে যায়, তবে ওজু ভঙ্গকারি। যেমন, কাত হয়ে অথবা চিত হয়ে শুইলে অথবা এক পার্শ্বে শুইলে। এমনভাবে যদি কোনো ব্যক্তি হেলান দিয়ে বসে এবং এ অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে, তবে যদি নিদ্রা এ পরিমাণ প্রবল হয় যে, আশ্রয় সরিয়ে ফেললে লোকটি পড়ে যায় তাহলে এই ঘুমও ওজু ভঙ্গকারি হবে। কেনোনা, এ অবস্থায় জমিনের ওপর মজবুতভাবে নির্ভর হয়।

আল্লামা হজরত গাঙ্গুহি (র.) বলেন, ঘুম ওজু ভঙ্গকারি হওয়া মূলত নির্ভর করে এই অনুচ্ছেদের হাদিসের সুস্পষ্ট বিবরণ মুতাবেক জোড়া ঢিলা হওয়ার ওপর। ফুকাহায়ে কেরাম এ কারণেই বিভিন্ন আলামত নির্ধারন করেছেন। যেহেতু জোড়া ঢিলে হওয়া কাল এবং মানুষের শক্তির দিকে লক্ষ্য করলে পরিবর্তিত হতে থাকে, সেহেতু এই সীমাগুলো স্থায়ী নয়। অতএব, হানাফিদেরও আজকাল স্বীয় মাজহাবের ওপর জেদ না ধরা উচিত যে, নামাজের অবস্থায় ঘুমালে ওজু ভাঙে না। কেনোনা এযুগে নামাজের অবস্থায়ও জোড়া ঢিলে হয়ে যায়। তাই অনেক সময় দেখা যায়, নামাজের অবস্থায় নিদ্রাকালে ওজু ভেঙেও যায় এবং এ সম্পর্কে নিদ্রামগ্ন ব্যক্তির কোনো অনুভূতি নেই।

এ অধ্যায়ের হাদিসটির জমহুর এ উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন, যে ঘুম প্রবল হয় না, যাতে জোড়া ঢিলে হয় না, সেটি ওজু ভঙ্গকারি হয় না। এটাকে প্রিয়নবী ﷺ কাত হয়ে শোয়া দ্বারা এজন্য ব্যক্ত করেছেন যে, সাধারণত এ প্রকারের নিন্দা হয়ে থাকে এ অবস্থাতেই।

قال ابو عيسى وابو خالد اسمه زيد بن عبد الرحمن : এ হাদিসের সনদে ইমাম তিরমিযী (র.) কোনো আপত্তি তোলেননি। কিন্তু মূলত এর সনদে কিছু কথা হয়েছে। এর সনদের ওপর দুটি প্রশ্ন উথাপন করেছেন ইমাম আবু দাউদ (র.)–

১. এই বর্ণনাটি নির্ভর করে আবু খালিদ ইয়াজিদ ইবনে আব্দুর রহমান দালানির ওপর। যাকে জয়িফ বলা হয়েছে।

২. কাতাদা-আবুল আলিয়া সূত্রে এই বর্ণনাটি বর্ণিত হয়েছে। অথচ কাতাদা আবুল আলিয়া থেকে শুধু চারটি হাদিস শুনেছেন। কাজেই এমন মনে হচ্ছে যে, এই হাদিসের সনদ বর্ণনায় আবু খালেদ দালানির ভুল হয়েছে যে, তিনি কাতাদা এবং আলিয়ার মাঝে একটি সূত্র ছেড়ে দিয়েছেন। এ কারণে ইমাম আবু দাউদ (র.)-এর ঝোঁক এ হাদিসটির দুর্বলতার দিকে। কিন্তু অন্যান্য আলেম ইমাম আবু দাউদের এই প্রশ্নগুলো রদ করে দিয়েছেন। কারণ, আবু খালেদ দালানি একজন বিতর্কিত রাবি। যেখানে তার সম্পর্কে 'জয়িফ' বলে মন্তব্য করা হয়েছে, সেখানে অনেক ইমাম তাঁকে নির্ভরযোগ্যও বলেছেন। নির্ভরযোগ্য সাব্যস্তকারিদের মাঝে বড় বড় মুহাদ্দিসও রয়েছেন। যেমন, ইবনে আবু হাতেম, ইবনে জারির তাবারি (র.)।

অবশিষ্ট আছে, কাতাদা আবুল আলিয়া থেকে শুধু চারটি হাদিস শুনেছেন এই বিষয়টিই। যদি আবু খালিদ দালানিকে নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করা হয় তাহলে কাতাদা কর্তৃক আবুল আলিয়া থেকে বর্ণিত এটি হবে পঞ্চম বর্ণনা। সুতরাং এ হাদিসটি হাসানের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের নয়।

যারা নিদ্রাকে সাধারণত ওজু ভঙ্গকারি বলেন না, তাদের প্রমাণ হজরত আনাস (রা.)-এর শক্তিশালী হাদিসটি,

قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون .

'রাসূল ﷺ-এর সাহাবিগণ ঘুমাতেন তারপর ওজু না করে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন।'

০ জমহুরের পক্ষ থেকে এর জবাব হলো, এখানে ঘুম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হালকা ঘুম, প্রবল নয়। যার প্রমাণ হলো, এই হাদিসটির কোনো কোনো সুত্রে একথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামের এই ঘুম ছিলো এশার নামাজের অপেক্ষায়। প্রকাশ থাকে যে, নামাজের অবস্থায় ঘুম প্রবল হওয়া মুশকিল। কিন্তু এর ওপর প্রশ্ন হয় যে, এই বর্ণনার কোনো কোনো সূত্রে এই শব্দও আছে[১] حتى تخفق رؤوسهم كما عند ابى داود (এমনকি ঝিমুতে তাঁদের মাথা নড়াচড়া করতে থাকতো) এবং ইবনে আবু শায়বা, আবু ইয়ালা, তাবারানি, মুসনাদে আহমদ ইত্যাদিতে حتى انى لاسمع لاحدهم غطيطا (এমনকি আমি কারও কারও নাক ডাকার আওয়াজ শুনতাম।) আর কোনোটিতে يوقظون للصلوة (তারা নামাজের জন্য জাগতেন।) এবং কোনোটিতে فيضعون جنوبهم পার্শ্বে শুয়ে আরাম করতেন।) শব্দ এসেছে যা দ্বারা বোঝা যায়, তারা পার্শ্বে শুয়ে নাক ডেকে ঘুমাতে আরম্ভ করতেন এবং তাদেরকে ঘুম থেকে জাগানো হতো। এটাকে সামগ্রিকভাবে হাল্কা ঘুমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরা কঠিন।

০ জবাব হজরত আনাস (রা.)-এর এই বর্ণনার সবগুলো সূত্র সামনে রাখার পর বোঝা যায়, কোনো কোনো সাহাবি তো বসে বসে ঘুমাতেন, এমন সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বলা হয়েছে, تخفق رؤسهم (তাদের মাথা ঝিমুতে থাকতো) আর অনেকের এ সময় নাক ডাকার অবস্থাও হয়ে যেতো। তাদেরকে নামাজের জন্য জাগানোর প্রয়োজন হতো। কিন্তু যেহেতু এগুলো সব বসা অবস্থায় হতো এজন্য ওজুর প্রয়োজন হতো না। অন্য কোনো কোনো সাহাবি পার্শ্বে শুয়ে পড়তেন, কিন্তু তাদের মধ্যে কারও কারও ঘুম প্রবল হতো না। এজন্য তাদের ওজুর প্রয়োজন হতো না। আর কারও কারও ঘুম হতো প্রবল, আর এ অবস্থায় নাক ডাকাও শোনা যেতো। কিন্তু এমন সাহাবিগণ অজু ব্যতিত নামাজ পড়তেন না। তাই মুসনাদে বাজ্জারে হজরত আনাস (রা.)-এর এই বর্ণনায় নিম্নেযুক্ত শব্দ রয়েছে,

كانو يضعون جنوبهم فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ .

'তেমনি তাঁরা তাদের পার্শ্বে শুয়ে ঘুমাতেন। অতঃপর তাদের কেউ ওজু করতেন। আর কেউ করতেন না।'

তেমনি একটি বর্ণনা মুসনাদে আবু ইয়ালাতেও আছে। যার শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত,

عن أنس وعن اناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يضعون جنوبهم فينامون فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ ۔[١]

'হজরত আনাস (রা.) এবং আরও অনেক সাহাবি হতে বর্ণিত আছে, তারা তাদের পার্শ্বে শুয়ে ঘুমাতেন। অতঃপর তাদের কেউ ওজু করতেন আবার কেউ ওজু করতেন না।'

টীকা- ১, আবু ইয়া'লা হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। (আল-মাত্বালিবুল আলিয়া : ১/৪৪; হাদিস নং ১/৫৩, এর হাশিয়ায় আছে- قوله عن اناس الخ। হায়সামির জাওয়ায়িদে আবু ইয়া'লাতে তার লেখা কপিটি অনুরূপই। যেমন, মাজমাউজ জাওয়ায়িদের টীকায় রয়েছে। আর আসলি দুটি কপিতে أو غيره শব্দ আছে। আমি মনে করি, এটি ভুল মুসনাদুল বাজ্জারে হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে- ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ। দ্রষ্টব্য : জাওয়ায়িদ : ১/৩৪৮

'মাজমাউজ জাওয়ায়িদে' আল্লামা হায়সামি (র.) এই বর্ণনাগুলো বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন। যা দ্বারা বিষয়টি সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যায়। বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন 'ফাতহুল মুলহিম শরহে সহিহ মুসলিম' প্রথম খণ্ডের শেষে শায়খ উসমানি (র.)।

بَابُ الْوُضُوْءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ (صـ ٢٤)

অনুচ্ছেদ- ৫৮ : যে বস্তুকে আগুনে পরিবর্তন করেছে তা ব্যবহার করে পুনরায় ওজু করা প্রসঙ্গে (মতন ২৪)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَلْوُضُوْءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ (رضـ) (وفى نسخة بيروت "يا ابا هريرة"!) أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الدُّهْنِ أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الْحَمِيْمِ؟ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَا ابْنَ أَخِيْ! إِذَا سَمِعْتَ حَدِيْثًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (وفى نسخة بيروت "رسول الله") فَلَا تَضْرِبْ لَهُ مَثَلًا ـ

৭৯. অর্থ : হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আগুনে স্পর্শকৃত জিনিস ভক্ষণের ফলে ওজু করতে হয়। যদিও তা পনিরের টুকরা হোক। বর্ণনাকারি বলেছেন, অতঃপর ইবনে আব্বাস (রা.) আবু হুরায়রা (রা.)-কে বললেন, আমরা কি তেল ব্যবহারের কারণে ওজু করবো? আমরা কি গরম পানি ব্যবহার করেও ওজু করব? এতদশ্রবণে আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, ভাতিজা! যখন তুমি নবী করিম ﷺ-এর কোনো হাদিস শুনবে তখন তার সামনে কোনো দৃষ্টান্ত বর্ণনা করো না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

উম্মে হাবিবা, উম্মে সালামা, জায়দ ইবনে সাবেত, আবু তালহা, আবু আইয়ুব ও আবু মূসা (রা.) থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন : কোনো কোনো আলেমের মত হলো, আগুন যে জিনিসে পরিবর্তন এনেছে (আগুনে রান্না করা খাবার) তা ভক্ষণ বা ব্যবহার করলে ওজু করতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেইন ও তৎপরবর্তীগণের মধ্য হতে অধিকাংশ আলেম এই মতের ওপর আছেন যে, আগুন যাতে পরিবর্তন ঘটিয়েছে তার কারণে ওজু করার প্রয়োজন নেই।

দরসে তিরমিযী

الوضوء مما مست النار : এখানে مبتدا-এর خبر উহ্য হলো واجب বা ثابت।

قال فقال له ابن عباس أنتوضأ من الدهن أنتوضأ من الحميم؟ : এর উত্তরে হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন,

يا أخي اذا سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا ـ

মনে রাখতে হবে, কখনো হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্দেশ্য এই ছিলো না যে, তিনি মারফু হাদিসকে নিজের রায় দ্বারা প্রত্যাখ্যান করবেন, অথবা হাদিসের বিপরীতে নিজের রায় পেশ করবেন; বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো, হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর এই হাদিসের অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে। অন্যথায় রাসূলে আকরাম ﷺ এ কথা বলতে পারেন না। হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট স্বীয় এই দাবীর প্রমাণ এই ছিলো যে, তিনি রাসূলে আকরাম ﷺ-কে বহুবার গোশত ভক্ষণ করে ওজু ব্যতিত নামাজ পড়তে দেখেছেন। মোটকথা, আগুনে স্পর্শ করা তথা রান্না করা কিছু খেয়ে ওজু করা সম্পর্ক সাহাবায়ে কেরামের প্রাথমিক যুগে মত পার্থক্য ছিলো।

তবে আল্লামা নববি (র.) বলেন, এ বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, আগুন দ্বারা রান্না করা কিছু খেয়ে ওজু করা ওয়াজিব নয়। যারা ওজু ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা ছিলেন, তাঁরা কোনো বাচনিক অথবা ক্রিয়াবাচক হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করতেন। যেমন এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি। কিন্তু জমহুর সেসব অগণিত হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন যেগুলো দ্বারা ওজু তরক করা প্রমাণিত হয়। যেমন পরবর্তী অনুচ্ছেদে হজরত জাবের (র.)-এর হাদিস। জমহুরের পক্ষ থেকে আলোচ্য অধ্যায়ের হাদিস এবং এ ধরনের অন্যান্য বর্ণনায় বিভিন্ন ধরনের তিনটি জবাব হয়েছে।

১. আগুনে রান্না করা কিছু খেয়ে ওজু করার হুকুম রহিত হয়েছে। এর প্রমাণ আবু দাউদে[১] হজরত জাবের (রা.)-এর বর্ণনা,

قال كان اخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار .

'তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্বশেষ নির্দেশ ছিলো আগুন যাতে পরিবর্তন এনেছে তার জন্য ওজু না করা।'

২. ওজুর হুকুম মোস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ওয়াজিব নয়। এর প্রমাণ রাসূল ﷺ থেকে ওজু করা, না করা উভয়টি প্রমাণিত। এটা মোস্তাহাবের অবস্থা।

৩. ওজু দ্বারা এই অনুচ্ছেদে পারিভাষিক ওজু উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য আভিধানিকই। এর প্রমাণ জামে' তিরমিযী : ২য় খণ্ড كتاب الأطعمة باب ما جاء في التسمية على الطعام -এ হজরত ইকরাশ ইবনে জুয়াইব (রা.)-এর হাদিস। তিনি তাতে একটি দাওয়াতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

ثم اتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه وقال يا عكراش! هذا الوضوء مما غيرت النار .

'আমাদের কাছে অতঃপর পানি আনা হলো, রাসূল ﷺ তাঁর দু'হাত ধুইলেন। আর হাতের তালুর ভেজা পানি দ্বারা তাঁর চেহারা, দু'হাত ও মাথা মাসেহ করলেন। আর বললেন, ইকরাশ! এটা হলো, আগুন যার মধ্যে পরিবর্তন এনেছে তা খাওয়ার দ্বারা অজু।

আব্দুর রহমান ইবনে গানম আশ'আরি (র.) 'মুসনাদে বাজ্জারে' বলেন,

قلت لمعاذ بن جبل هل كنتم تتوضئون مما غيرت النار، قال نعم اذا أكل أحدنا طعاما مما غيرت النار فغسل يديه وفاه فكنا نعد هذا وضوء .

'মু'আজ ইবনে জাবাল (রা.)-কে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আগুন যাতে পরিবর্তন এনেছে (রান্না করেছে) তার ফলে কি আপনারা ওজু করতেন? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমাদের কেউ যখন আগুনে পাকানো খানা খেতেন তখন দু'হাত এবং মুখ ধৌত করতেন। এটাকে আমরা গণ্য করতাম ওজু।'

হজরত মুহাদ্দিসিন ও ফুকাহায়ে কেরাম এ তিনটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু সামগ্রিকভাবে বর্ণনাগুলোর প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করার পর যে কথাটি অধমের বুঝে আসে সেটি হচ্ছে, এই তিনটি ব্যাখ্যা একই সময় সঠিক এবং যথার্থ। অর্থাৎ, وضوء مما مست النار (রান্না করা খাবার গ্রহণের পর ওজু) দ্বারা আভিধানিক ওজু উদ্দেশ্য। যেমন, হজরত ইকরাশের বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়। এই আমলটি মোস্তাহাব ছিলো, ওয়াজিব কখনই ছিলো না। কিন্তু পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশে প্রথম দিকে এর প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করা হতো। পরবর্তীতে যখন এই আশঙ্কা হলো যে, এই গুরুত্বারোপের ফলে এই ওজুকে ওয়াজিব মনে করা হবে, অথবা ওজু দ্বারা শরয়ি ওজু উদ্দেশ্য করা হবে, তখন রহিত করে দেওয়া হয়েছে এর মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়টিও। এর সহায়তা হয় মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বায় হজরত মুগিরা ইবনে শু'বা (রা.)-এর বর্ণনাতে,

টীকা- ১, ১/২৫, باب في ترك الوضوء مما مست النار

عن المغيرة بن شعبة (رضـ) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل طعاما ثم اقيمت الصلوة وقد كان توضأ قبل ذلك فاتيته بماء ليتوضأ فانتهرني وقال وراءك ولو فعلت ذلك فعل الناس بعدى (مصنف ابن ابى شيبة جـ١، صـ٤٧)

'হজরত মুগিরা ইবনে শো'বা (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ খাবার খেলেন, অতঃপর নামাজের ইকামত দেওয়া হলো, ইতোপূর্বে তিনি ওজু করেছিলেন। আমি তাঁর কাছে ওজু করার জন্য পানি নিয়ে এলাম। তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, পেছনে সরাও। আমি যদি ওজু করি তবে আমার পরবর্তীতে লোকেরা তা করবে।'

এই বর্ণনাটির বিস্তারিত বিবরণ মাজমাউজ জাওয়ারিদে (১/২৫১) এভাবে এসেছে,

عن المغيرة بن شعبة (رضـ) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل طعاما ثم اقيمت الصلوة فقام وقد كان توضأ قبل ذلك فاتيته بماء ليتوضأ منه فانتهرني وقال ورائك فسائنى والله ذلك ثم صلى فشكوت ذلك إلى عمر (رضـ) فقال يا نبى الله! ان المغيرة قد شق عليه شيئ فقال النبى صلى الله عليه وسلم ليس عليه فى نفسى الا خير ولكن اتانى بماء لأتوضأ وانما أكلت طعاما ولو فعلت فعل الناس ذلك بعدى، رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات، (اعلاء السنن جـ١، صـ١٧٥)

'হজরত মুগিরা ইবনে শো'বা (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ খানা খেলেন, অতঃপর নামাজের ইকামত দেওয়া হলো, তিনি দাঁড়ালেন, এর পূর্বে কিন্তু তিনি ওজু করেছিলেন। আমি তাঁর কাছে ওজু করার জন্য পানি নিয়ে এলাম। তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, অতঃপর তিনি নামাজ পড়লেন। আমি এ বিষয়ে উমর (রা.)-এর নিকট অনুযোগ পেশ করলাম। তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি মুগিরাকে যে ধমক দিয়েছেন, এটা তার কাছে খুব ভারি মনে হয়েছে। তার আশঙ্কা হয়েছে, আপনার মনে হয়তো তার কারণে কষ্ট হয়েছে। এতদশ্রবণে নবী করিম ﷺ এরশাদ করলেন, তার সম্পর্কে আমার মনে ভালো ব্যতিত খারাপ কিছু নেই। কিন্তু সে আমার নিকট পানি নিয়ে এসেছে, যাতে আমি ওজু করি। আমি তো শুধু খানা খেয়েছি। যদি আমি তা করি তবে সেটা করবে আমার পরবর্তী লোকজন।'

'মু'জামে কাবিরে' ইমাম তাবারানি (র.) হজরত হাসান ইবনে আলি (রা.)-এর বর্ণনা দ্বারা হজরত ফাতেমা (রা.)-এরও অনুরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি নিম্নেযুক্ত,

عن الحسن ١ بن على أيضا أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيت فاطمة فناولته كتف شاة مطبوخة فاكلها ثما قام يصلى فاخذت ثيابه فقالت الا توضأ يا رسول الله! قال مم يا بيية؟ قالت قد اكلت مما مسته النار قال ان اطهر طعامكم ما مسته النار ـ

'হজরত হাসান ইবনে আলি (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূল ﷺ-এর নিকট হজরত ফাতেমা (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন হজরত ফাতেমা (রা.) তাঁকে রান্না করা একটি বকরির কাঁধের অংশ দিলেন। তিনি তা ভক্ষণ করলেন। অতঃপর নামাজের জন্য প্রস্তুত হলেন। ফলে হজরত ফাতেমা (রা.) তাঁর কাপড় টেনে ধরে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি ওজু করবেন না? এতদশ্রবণে প্রিয়নবী ﷺ বললেন, কেনো হে প্রিয় কন্যা? তিনি বললেন, আপনি তো আগুনে রান্না করা খাবার খেয়েছেন। এর জবাবে প্রিয়নবী ﷺ বললেন, তোমাদের খাদ্যের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্রতম হলো আগুনে পাকানো খাদ্য।'

টীকা- ১, মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ১/২৫২

হজরত মুগিরা (রা.)-এর পানি আনা এসব ঘটনাতে এবং হজরত ফাতেমা (রা.) কর্তৃক ওজু সম্পর্কে প্রশ্ন এ কথার প্রমাণ যে, এ ওজু প্রথমে প্রসিদ্ধ ছিলো এবং প্রিয়নবী ﷺ কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করা এর প্রমাণ যে, রাসূল ﷺ ওজু ওয়াজিব হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার আশঙ্কায় তা তরক করেছেন। যার ফল বের হয় এই,

প্রথমে এই ওজু ওয়াজিব ছিলো না, বরং মোস্তাহাব ছিলো। তা ব্যতিত যদি এটা ওয়াজিব হতো, চাই ইসলামের শুরুর দিকেই হোক তাহলে হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর আলোচ্য অনুচ্ছেদে হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর জবান হতে এই হুকুম শুনে বিস্ময় প্রকাশ করতেন না। মোটকথা, শেষ যুগে এই মুস্তাহাবও রহিত হয়ে গেছে। কারণ, প্রিয়নবী ﷺ রান্না করা খাবার খেলে ওজু সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন। যেমন, হজরত জাবের ও হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদিস দ্বারা বোঝা যায়। হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বুঝ-জ্ঞান অবস্থায় রাসূলে আকরাম ﷺ-এর সংসর্গ ও বন্ধুত্বের সুযোগ হয়েছে মক্কা বিজয়ের পর। এই সময়ে তিনি কখনও প্রিয়নবী ﷺ-কে আগুনে রান্না করা খাবার খেয়ে ওজু করতে দেখেননি। ইমাম আবু বকর হাজেমি (র.) كتاب الإعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار -এ হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এই বর্ণনা দ্বারা আগুনে রান্না করা খাবারের ফলে ওজুর হুকুম রহিত হওয়ার ওপর প্রমাণ পেশ করেছেন। মোটকথা, পূর্বেযুক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা সবগুলো বর্ণনার মাঝে উত্তম সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায় এবং সমস্ত হাদিসের অর্থও স্পষ্ট হয়ে যায়।

بَابٌ فِى تَرْكِ الْوُضُوْءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ (٢٤)

অনুচ্ছেদ- ৫৯ : আগুনে পাকানো খাবার খেয়ে অজু না করা প্রসঙ্গে (মতন ২৪).

عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَاَنَا مَعَهٗ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَذَبَحَتْ لَهٗ شَاةً فَاَكَلَ وَاَتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلظُّهْرِ وَصَلّٰى ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَتْهُ بِعُلَالَةٍ مِنْ عُلَالَةِ الشَّاةِ فَأَكَلَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ـ

৮০. অর্থ : হজরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার বের হলেন, আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি এক আনসারি মহিলার নিকট প্রবেশ করলেন। ফলে সে মহিলা তাঁর উদ্দেশে একটি বকরি জবাই করলো। তিনি তা থেকে খেলেন। অতঃপর মহিলা তাঁর জন্য একটি থালায় করে তাজা খেজুর নিয়ে এলেন। তিনি তা থেকে খেলেন। অতঃপর জোহরের জন্য ওজু করে নামাজ পড়লেন। নামাজ শেষে ফিরে এলেন। তখন মহিলা তার জন্য বকরির অবশিষ্ট গোশত নিয়ে এলেন। তিনি তা খেলেন অতঃপর ওজু না করেই আসরের নামাজ পড়লেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস রয়েছে। সূত্রগতভাবে আবু বকর (রা.)-এর হাদিসটি এ অনুচ্ছেদে সহিহ নয়। এটি বর্ণনা করেছেন হুসাম ইবনে মিসাক ইবনে সিরিন সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা.) হতে আবু বকর (রা.)-এর সনদে নবী কারিম ﷺ হতে। সহিহ হলো ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী কারিম ﷺ হতে বর্ণিত বর্ণনা। অনুরূপ বর্ণনা করেছেন হাফিজে হাদিসগণ।

ইবনে সিরিন-ইবনে আব্বাস-নবী কারিম ﷺ হতে একাধিক সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। এ হাদিসটি আ'তা ইবনে ইয়াসার-ইকরামা-মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আতা-আলি ইবনে আবদুল্লাহ আব্বাস-ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী করিম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা তাতে আবু বকর (রা.)-এর সূত্র উল্লেখ করেননি। এটিই বিশুদ্ধতম।

আবু হুরায়রা, ইবনে মাসউদ, আবু রাফে', উম্মুল হাকাম, আমর ইবনে উমাইয়াহ, উম্মে আমির, সুয়াইদ ইবনে নু'মান এবং উম্মে সালামা (রা.) থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, রাসূল ﷺ-এর সাহাবা, তাবেইন ও তৎপরবর্তী অধিকাংশ আলেম যেমন, সুফিয়ান, ইবনুল মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর মত হলো, আগুনে রান্না করা খাবার খেয়ে ওজু না করা। এটা হলো, রাসূল ﷺ-এর সর্বশেষ নির্দেশ। এ হাদিস ছিলো প্রথম হাদিসের জন্য অর্থাৎ, আগুনে রান্না করা জিনিস খেয়ে ওজু করার হাদিসটির জন্য না বৈধ।

ইমাম তিরমিযী

فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ : আবু দাউদ (র.) দাবি করেছেন যে, হজরত জাবের (রা.)-এর এ হাদিস তারই অপর একটি হাদিসের ব্যাখ্যা। যাতে হজরত জাবের (রা.) বলেছেন,

كان اخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار

'রাসুল ﷺ-এর দু'টি নির্দেশের মধ্যে সর্বশেষ নির্দেশ ছিলো আগুনে রান্না করা খাবার খেয়ে ওজু না করা।'

ইমাম আবু দাউদ (র.)-এর ধারণা মতে যেনো এ দুটি বিষয়ে সে বক্তব্য অনুচ্ছেদের হাদিসের ঘটনায় সামঞ্জস্য বিধান যে, জোহরের সময় রাসূল ﷺ গোশত খেয়ে ওজু করেছেন, আর আসরের সময় গোশত খেয়ে ওজু করেননি। فكان الثانى ناسخا للأول কাজেই দ্বিতীয়টি প্রথমটির জন্য রহিতকারি হয়ে গেলো। কিন্তু অন্যান্য মুহাদ্দিস ও ফকিহ ইমাম আবু দাউদ (র.)-এর এ ধারণা খণ্ডন করেছেন। তাঁরা বলেছেন, হজরত জাবের (রা.)-এর দুটি বর্ণনা আলাদা আলাদ। কারণ, রাবি এক হওয়ার কারণে ঘটনাও এক হওয়া আবশ্যক নয় এবং كان اخر الأمرين দ্বারা এই ঘটনাই উদ্দেশ্য হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই, বরং স্পষ্ট বিষয় হলো, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের ঘটনায় রাসূল ﷺ কর্তৃক জোহরের নামাজের জন্য ওজু করা কোনো অপবিত্রতার কারণে ছিলো, খাওয়ার জন্য না।

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ (٢٥)

অনুচ্ছেদ- ৬০ : উটের গোশত খেয়ে ওজু করা প্রসঙ্গে (মতন ২৫)

عَنِ الْبَرَاءِبْنِ عَازِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلي عليه وسلم الْوُضُوْءُ مِنْ لُحُوْمِ الْابِلِ؟ فَقَالَ تَوَضَّئُوْا مِنْهَا وَسُئِلَ عَنِ الْوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ لَا تَتَوَضَّئُوْا مِنْهَا .

৮১. **অর্থ :** হজরত বারা ইবনে আজেব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একবার উটের গোশত খেয়ে ওজু করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তা খেয়ে তোমরা ওজু কর। আর বকরির গোশত খেয়ে ওজু করা সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞেসিত হলে জবাবে বললেন, তোমরা তা খেয়ে ওজু করো না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

জাবের ইবনে সামুরা এবং উসাইদ ইবনে হুজাইর (রা.) থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেছেন, হাজ্জাজ ইবনে আরতাত এই হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লা উসাইদ ইবনে হুজাইর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সহিহ হলো, আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লা সূত্রে বারা ইবনে আজেব (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসটি। আহমদ ও ইসহাক (র)-এর মাজহাব এটাই।

এ হাদিসটি উবায়দা আজ-জাব্বি বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ আর রাজি-আব্দুর রহমান-আবু লায়লা-জুল উজ্জাহ সূত্রে। আর হাম্মাদ ইবনে সালামা এ হাদিসটি হাজ্জাজ ইবনে আরতাত (রা.) থেকে বর্ণনা

করেছেন। তাতে তিনি ভুল করেছেন। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লা সূত্রে, তিনি তাঁর পিতা সূত্রে তিনি উসাইদ ইবনে হুজাইর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ আর রাজি-আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লা সনদে বারা ইবনে আজেব (রা.) সূত্রে এটি।

ইসহাক (র.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এ অনুচ্ছেদে বিশুদ্ধতম হলো দুটি হাদিস,

এক. বারা (রা.)-এর হাদিস। দুই. জাবের ইবনে সামুরা (রা.)-এর হাদিস।

দরসে তিরমিযী

উটের গোশত খেয়ে ওজু করার মাসআলাটি রান্না করা জিনিস খেয়ে ওজু করার মাসআলা থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদা রাখে। এ কারণে ইমাম তিরমিযী (র.)-এর জন্য স্বতন্ত্র একটি অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ (র.) যদিও রান্না করা জিনিস খাবার পর ওজুর প্রবক্তা নন, কিন্তু উটের গোশত খাওয়ার পর তাঁরা ওজু ওয়াজিব বলেন। চাই রান্না করা ব্যতিতই তা খাওয়া হোক না কেনো। এটাই ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর পুরনো বক্তব্যে।

এখানেও জমহুরের মত এটাই যে, উটের গোশত খাওয়ার পর ওজু ওয়াজিব নয়। আর আলোচ্য অনুচ্ছেদে হাদিসে ওজুর অর্থ হাত মুখ ধোয়া। এ হুকুম মোস্তাহাব হিসেবে দেওয়া হয়েছে। মোস্তাহাব হওয়ার প্রমাণ মু'জামে তাবারানি কাবিরে বর্ণিত হজরত সামুরা আস্-সাওয়ায়ি (রা.)-এর বর্ণনা,

قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت انا اهل بادية وماشية فهل نتوضأ من لحوم الإبل والبانها قال نعم فهل نتوضأ من لحوم الغنم والبانها، قال لا (رواه الطبراني فى الكبير واسناده حسن انشاء الله - (مجمع الزوائد ج١، ص٢٥٠)

'তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি জিজ্ঞেস করলাম, বললাম, আমরা গ্রাম্য লোক, জন্তু চরাই। আমরা কি উটের গোশত ও দুধ খেয়ে ওজু করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কি বকরির গোশত ও দুধ খেয়ে ওজু করব? বললেন, না।'

মুসনাদে আবু ইয়ালার বর্ণনায় এমনভাবে আছে,

عن مولى لموسى بن طلحة او عن ابن لموسى بن طلحة عن ابيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ من ألبان الإبل ولحومها ولا يتوضأ من البان الغنم ولحومها ويصلى فى مرابضها- رواه ابو يعلى وفيه رجل لم يسم

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج١، ص٢٥٠)

'বর্ণনাকারি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উটের দুধ ও গোশত খেয়ে ওজু করতেন। কিন্তু বকরির দুধ ও গোশত খেয়ে ওজু করতেন না। তিনি নামাজ পড়তেন বকরি বাঁধার স্থানে (এর কাছে)।'

ওপরযুক্ত হাদিসগুলোতে দুধের কথাও আলোচিত হয়েছে, অথচ, উটের দুধ পান করার পর ওজু ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা না ইমাম আহমদ, না ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ (র.)। যেহেতু উটের দুধ খাওয়ার পর ওজুর বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে মোস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সুতরাং এ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে উটের গোশত খাওয়ার পর ওজুর বিষয়টিও।

০ এখানে প্রশ্ন হয় যে, বিশেষভাবে উটের গোশতের ব্যাপারে এ হুকুম কেনো লাগানো হলো? এর জবাব হজরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ (র.) এই দিয়েছেন যে, মূলত উটের গোশত বনি ইসরাইলের জন্য হারাম করে দেওয়া

হয়েছিলো; কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদিয়ার জন্য তা জায়েজ করে দেওয়া হয়েছে। অতএব, বৈধতার শুকরানা হিসেবে ওজু বিধিবদ্ধ ও মুস্তাহাব করা হয়েছে। তা ব্যতিত উটের গোশত ও দুধে চর্বি এবং গন্ধ বেশি থাকে, এ কারণে মোস্তাহাব সাব্যস্ত করা হয়েছে এর পর ওজু।

'ফাতহুল মুলহিমে' আল্লামা উসমানি (র.) এই মতও প্রকাশ করেছেন যে, এ ব্যাপারেও বিধিবিধান ক্রমশ এসেছে। প্রথমে সাধারণভাবে আগুনে স্পর্শ করা খাবার খেয়ে ওজু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো, তারপর উটের গোশত খাবার পর, তারপর এসব হুকুম মানসুখ হয়ে গেছে।

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ (٢٥)

অনুচ্ছেদ- ৬১ : লজ্জাস্থান স্পর্শ করে ওজু করা প্রসঙ্গে (মতন ২৫)

عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ ـ

৮২. অর্থ : হজরত বুসরা বিনতে সাফওয়ান (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করিম ﷺ বলেছেন, যে তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করবে সে যেনো ওজু না করে নামাজ না পড়ে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

উম্মে হাবিবা আবু আইয়ুব, আবু হুরায়রা, আরওয়া বিনতে উনাইস, আয়েশা, জাবের, জায়দ ইবনে খালিদ ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। একাধিক ব্যক্তি এ হাদিসটি হিশাম ইবনে ওরওয়া-ওরওয়া-বুসরা সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

وَرَوٰى اَبُوْ اُسَامَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ بُسْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ ـ حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ بِهٰذَا ـ

৮৩. অর্থ : এ হাদিসটি আবু উসামা ও একাধিক ব্যক্তি হিশাম ইবনে ওরওয়া-তার পিতা-মারওয়ান -বুসরা-নবী করিম ﷺ সূত্রে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এই হাদিসটি আমাদের কাছে ইসহাক ইবনে মানসুর বর্ণনা করেছেন। তাঁর নিকট এটি বর্ণনা করেছেন আবু উসামা।

وَرَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ اَبُوْ الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بُسْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ـ حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بُسْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ ـ

৮৪. অর্থ : আবুজ জিনাদ-ওরওয়া-বুসরা-নবী করিম ﷺ সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, এ হাদিসটি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আলি ইবনে হুজর। তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান ইবনে আবুজ জিনাদ তার পিতা হতে। তিনি ওরওয়া হতে, তিনি বুসরা হতে, তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন নবী করিম ﷺ থেকে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এটা একাধিক সাহাবি ও তাবেয়ির মাজহাব। আওজায়ি, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক (র.)ও এই মত পোষণ করেন। মুহাম্মদ (বোখারি) (র.) বলেছেন, বুসরার হাদিসটি এ অনুচ্ছেদে বিশুদ্ধতম।

হজরত আবু জুরআ বলেছেন, উম্মে হাবিবার হাদিসটি এ অনুচ্ছেদে বিশুদ্ধতম। সেটি হলো, আলা ইবনুল হারেস-মাকহুল-আম্বাসা ইবনে আবু সুফিয়ান-উম্মে হাবিবা সূত্রে বর্ণিত হাদিস। মুহাম্মদ বলেছেন, মাকহুল আম্বাসা ইবনে আবু সুফিয়ান থেকে (হাদিস) শ্রবণ করেননি। মাকহুল জনৈক ব্যক্তি থেকে আম্বাসা হতে এ হাদিস ব্যতিত অন্য একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেনো তিনি এ হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলে মত পোষণ করেন না।

এই মাসআলাটি ফুকাহা ও মুহাদ্দিসিনের মাঝে মহাবিতর্কিত হয়ে আসছে যে, পুরুষের লজ্জাস্থান স্পর্শ করা ওজু ভঙ্গের কারণ কি না?

১. ইমাম শাফেয়ি (র.) -এর মাজহাব, যদি বেপর্দা হাতের তালুতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করে তবে সেটা ওজু ভঙ্গকারি হবে। 'আল-মুহাজ্জাবে' আল্লামা আবু ইসহাক শিরাজি শাফেয়ি (র.) লিখেছেন যে, মহিলাদের লজ্জাস্থান স্পর্শ করার হুকুমও তাই। ইমাম শাফেয়ি (র.) 'কিতাবুল উম্মে' স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যে, ওজু ভঙ্গের কারণ পায়ু পথ স্পর্শ করাও।

২. ইমাম আজম আবু হানিফা (র.)-এর নিকট পুরুষের লজ্জাস্থান, মহিলার লজ্জাস্থান এবং পায়ুপথ স্পর্শ করার কারণে ওজু ওয়াজিব হয় না। ইমাম আহমদ (র.) এবং ইমাম মালেক (র.)-এর মাজহাবও এটাই। যেমন, আল্লামা ইবনে খুজায়মা (র.) 'সহিহ ইবনে খুজায়মা'তে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন। অবশ্য এ দু'জনের আরেকটি বর্ণনা শাফেয়িদের মতোই।

শাফেয়ি মতাবলম্বীদের প্রমাণ হজরত বুসরা বিনতে সাফওয়ানে সূত্রে বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের নিম্নেযুক্ত বর্ণনাটি,

ان النبى صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ .

'রাসূলে আকরাম ﷺ বলেছেন, যে তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করবে সে যেনো ওজু করার পূর্বে নামাজ না পড়ে।'

এতে তিনি হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিস দ্বারা হাতের তালুতে আড়াল ব্যতিত স্পর্শ করার শর্ত প্রমাণ করেছেন। বর্ণনাটি মুসনাদে বাজ্জার, মুসনাদে আহমদ এবং ইমাম তাবারানির মু'জামে সগির ও আওসাতে রয়েছে,

ان النبى صلى الله عليه وسلم قال من أفضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء [১] . (مجمع الزوائد ج۱، ص۲٤٥)

'নবী আকরাম ﷺ বলেছেন যে, পর্দাহীনভাবে নিজের হাত তার যৌনাঙ্গ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে তার ওপর ওজু ওয়াজিব।'

মহিলাদের লজ্জাস্থান স্পর্শ করার আলোচনাও হজরত বুসরার বর্ণনায়র কোনো কোনো সূত্রে এসেছে। দারাকুতনি : ১/১৪৭-তে ইসমাঈল ইবনে আইয়াশ সূত্রে বর্ণিত আছে, واذا مست المرأة قبلها فلتتوضأ (আর মহিলা যখন তার সামনের রাস্তা তথা যৌনাঙ্গ স্পর্শ করবে তখন সে যেনো অবশ্যই ওজু করে।)

মুসনাদে আহমদে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)-এর বর্ণনায় এমনভাবে রয়েছে,

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ[২]. (مجمع الزوائد ج۱۳، ص۲٤٥)

'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করবে সে যেনো অবশ্যই ওজু করে। আর যে মহিলা তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করে অবশ্যই ওজু সে যেনো ওজু করে নেয়।'

টীকা- ১. এই হাদিসের সনদে ইয়াজিদ ইবনে আব্দুল মালেক আন-নাওফিলি নামক একজন রাবি রয়েছেন। অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাঁকে জয়িফ বলেছেন। ইয়াহইয়া ইবনে মাইন এক বর্ণনায় তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ১/২৪৫

টীকা- ২. ১/১২২, باب مس المقعدة

ইমাম শাফেয়ি (র.) মহিলার লজ্জাস্থান স্পর্শ করার কারণে ওজু ওয়াজিব হওয়ার হুকুম এখান থেকে উৎসারণ করেছেন। অবশ্য পায়ু পথ স্পর্শ করার কারণে ওজু ভেঙে যাওয়ার ওপর কোনো মারফু বর্ণনা অধমের নজরে পড়েনি। মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে[১] ইবনে জুরাইজ হতে বর্ণিত রয়েছে,

قال قلت لعطاء مس الرجل معقدته سبيل الخلاء ولم يضع يده هناك أفيتوضأ قال نعم اذا كنت متوضأ من مس الذكر توضأت من مسها ـ

'তিনি বলেন, আতাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এক ব্যক্তি তার মল ত্যাগের পথ– তার বসার স্থান স্পর্শ করল, তার হাত সেখানে রাখলো না, সে কি ওজু করবে? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, ওজু করবে। তুমি যখন পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করো তখন ওজু কর। সুতরাং এটা স্পর্শ করলেও ওজু করো।

কিন্তু এটি হজরত আতার কিয়াস।

পরবর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত হানাফিদের দলিল হজরত তালক ইবনে আলি (রা.)-এর বর্ণনা,

عن النبى صلى الله عليه وسلم هل هو الا مضغة منه او بضعة منه ـ

'নবী কারিম ﷺ হতে বর্ণিত, যে, পুরুষাঙ্গ তা শরীরের একটি অঙ্গ বা টুকরো ব্যতিত কিছু নয়।'

অন্যান্য হাদিসের কিতাবে এ হাদিসটির আরো কিছু বিস্তারিত বিবরণ আছে,

عن طلق بن على رضى الله عنه قال قال رجل مست ذكرى (أو قال) الرجل يمس ذكره فى الصلوة عليه وضوء؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك (اخرجه الخمسة)٢

'তালক ইবনে আলি (রা.) বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, আমি আমার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করেছি। অথবা বললো, এক ব্যক্তি নামাজে তার পুরুষাঙ্গ সর্স্প করে তার ওপর কি ওজু ওয়াজিব? জবাবে নবী করিম ﷺ বললেন, না। এটি তো তোমার দেহের একটি অংশ।'

এ ব্যাপারে মতবিরোধের কারণ, হাদিসগুলোর বিভিন্নতা।

দুটি হাদিস এ অধ্যায়ে মূলের মর্যাদা রাখে। একটি হজরত বুসরার বর্ণনা, যা দ্বারা শাফেয়িগণ প্রমাণ পেশ করেন। দ্বিতীয়টি হজরত তালক ইবনে আলির বর্ণনা যা দ্বারা হানাফিগণ প্রমাণ দেন।

এবার বিষয় হলো, এ দুটো থেকে কোনো হাদিসটি গ্রহণ করা হবে? ইনসাফের কথা হলো দুটি হাদিস স্ব স্ব স্থানে প্রমাণযোগ্য, যদিও সামান্য সামান্য কথাবার্তা দুটি হাদিসের সনদ নিয়ে হয়েছে।

প্রশ্ন : হজরত তালক ইবনে আলি (রা.)-এর বর্ণনার ওপর দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।

১. এ হাদিসটি আইয়ুব ইবনে উতবা এবং মুহাম্মদ ইবনে জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে। এরা দুজন জয়িফ।

উত্তর : কিন্তু এ প্রশ্নটি ভুল। কারণ, এই বর্ণনাটি এ দুজন ব্যতিতও মুলাজিম ইবনে আমর এবং আবদুল্লাহ ইবনে বদর থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র.) এবং ইমাম আবু দাউদ (র.) দু'জনই তাদের সনদে এ হাদিস বর্ণনা করে এটাকে সহিহ বলেছেন। তা ব্যতিত অধমও এ হাদিসটি সহিহ ইবনে হাব্বানে হুসাইন ইবনুল ওয়ালিদ-ইকরামা ইবনে আম্মার-কাইস ইবনে তালক সূত্রে পেয়েছে। যেমন, موارد الظمآن : ১/৭৭৭, হাদিস নং ২০৮-এ রয়েছে। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আইয়ুব ইবনে উতবা ও মুহাম্মদ ইবনে জাবেরের অনেক মুতাবে' রয়েছে। তাদের বিদ্যমানতায় আইয়ুব ইবনে ইতবা এবং মুহাম্মদ ইবনে জাবেরের দুর্বলতার প্রশ্ন হাদিসের জন্য ক্ষতিকর নয়।

টীকা- ১. ইমাম আহমদ (র.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এটির সূত্রে বাকিয়া ইবনুল ওয়ালিদ নামক রাবি রয়েছেন। তিনি এ হাদিসটি عن عن *করে বর্ণনা করেছেন। তিনি মুদাল্লিস। –মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ১/২৪৫।*

টীকা- ২. ইলাউস সুনান : ১/১৯০, باب مس الذكر غير ناقض

প্রশ্ন : আরেকটি প্রশ্ন করা হয়েছে যে, এই হাদিস নির্ভর করে কায়স ইবনে তালকের ওপর, আর তিনি হলেন জয়িফ।

জবাব : কায়স ইবনে তাল্‌ক একজন বিতর্কিত বর্ণনাকারি। ইমাম আহমদ আবু জুরআ' আবু হাতেম এবং এক বর্ণনায় ইয়াহইয়া ইবনে মাইন তাঁকে যদিও জয়িফ বলেছেন, কিন্তু অপরদিকে ইমাম আজালি, আলি ইবনুল মাদিনি এবং ইয়াহইয়া ইবনে মাইন (র.) অন্য বর্ণনায় তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইবনে কাত্তান (র.) সিদ্ধান্তমূলক বক্তব্য দিয়েছেন– يقضى ان يكون خبره حسنا لا صحيحا 'তাঁর হাদিস সহিহ নয়; বরং সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে হাসান বলে।'

মিজানুল ই'তিদালে ৩/৩৯৭ হাফিজ জাহাবি (র.) এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করার পর ইবনুল কাত্তান (র.)-এর উপরিউক্ত বক্তব্যে বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা বোঝা যায়, তাঁর মতে তাঁর হাদিস হাসান থেকে কম মর্যাদা সম্পন্ন নয়। হজরত বুসরা (রা.)-এর বর্ণনা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে যে, এ পুরো ঘটনা সুনানে নাসায়ি[১] এবং তাহাবি ইত্যাদিতে বর্ণিত হয়েছে। সেটি হলো, একবার হজরত ওরওয়া ইবনুজ জুবাইর মারওয়ান ইবনে হাকামের নিকট উপস্থিত ছিলেন। ওজু ভঙ্গকারি বিষয়ে আলোচনা চলছিলো। মারওয়ান পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার বিষয়টিকেও ওজু ভঙ্গকারির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হজরত ওরওয়া (র.) এটা অস্বীকার করলেন। তখন তিনি হজরত বুশরা (রা.)-এর বর্ণনা শুনিয়েছেন। তারপর সত্যায়নের জন্যে নিজের একজন পুলিশ হজরত বুশরা (রা.-)এর নিকট পাঠালেন। পুলিশও এসে এ হাদিস শুনালো। এ ঘটনা দ্বারা বোঝা যায়, হজরত ওরওয়া এ হাদিস সরাসরি বুসরা থেকে শুনেননি; বরং মাঝখানে হয়ত পুলিশ কিংবা মারওয়ানের মাধ্যম রয়েছে। যদি পুলিশের মাধ্যম হয় তবে সে অজ্ঞাত, আর যদি মারওয়ানের মাধ্যম হয় তবে তিনি বিতর্কিত রাবি[২]। কেউ কেউ তাঁকে জয়িফ বলেছেন। আর কেউ কেউ বলেছেন নির্ভরযোগ্য। যদিও ইমাম বোখারি (র.) তাঁর সূত্রে বোখারিতে হাদিস নিয়েছেন; কিন্তু কেউ কেউ এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, তাঁর শাসক হওয়ার পূর্বেকার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য; এর পরেরগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। মোটকথা, তাঁর সম্পর্কে সিদ্ধান্তমূলক কথা হলো, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র (রা.)-এর সাথে তাঁর ঝগড়া-বিতর্কের পূর্বেকার হাদিস গ্রহণযোগ্য। আর পরবর্তীগুলো প্রত্যাখ্যাত। ইমাম বোখারি (র.) তাঁর থেকে ঝগড়ার পূর্বেকার হাদিসগুলো বর্ণনা করেছেন, পরেরগুলো নয়। ওপরযুক্ত বর্ণনাটি যেহেতু পরবর্তীকালের, তাই উচিত এ বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য না হওয়া।

প্রশ্নের জবাব কোনো কোনো শাফেয়ি মতাবলম্বী দিয়েছেন যে, হজরত ওরওয়া (র.) এই ঘটনার পর প্রত্যক্ষভাবে হজরত বুসরা (রা.) থেকে এ হাদিসটির সত্যায়ন করেছিলেন। এ কারণে সহিহ ইবনে খুজায়মা এবং সহিহ ইবনে হাব্বানে এই ঘটনার পর এ অতিরিক্ত অংশটুকু বর্ণিত আছে যে, ওরওয়া ইবনুজ জুবায়র পরবর্তীকালে সরাসরি হজরত বুসরা (রা.)-এর কাছেও জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন তিনি মারওয়ানের সত্যায়ন করেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায়, ওরওয়া ইবনুজ জুবায়র এবং হজরত বুসরার মাঝে কোনো মাধ্যম নেই।

টীকা- ১. ১/৩৮ باب الوضوء من مس الذكر

টীকা- ২. হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেছেন, বলা হয় তিনি রাসূল (স.)-এর দর্শন লাভ করেছেন। যদি এটা প্রমাণিত হয়, তবে যে তার সম্পর্কে আপত্তি তুলেছে তার বক্তব্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। ওরওয়া ইবনুজ জুবায়র বলেছেন, হাদিসের ব্যাপারে মারওয়ানকে অভিযুক্ত করা হতো না। তার থেকে সাহল ইবনে সা'দ সাইদি নামক সাহাবি তার সত্যতার ওপর নির্ভর করে হাদিস বর্ণনা করেছেন। বাকি তাঁরা তার সমালোচনা করেছেন। এ কারণে যে, মারওয়ান জঙ্গে জামালে হজরত তালহা (রা.)-এর ওপর তীর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করেছিলেন। এরপর থেকে খেলাফত অন্বেষণে তলোয়ার বা মারামারি প্রসিদ্ধ হয়ে উঠে। অতঃপর যা ঘটার তাই ঘটে। বাকি রইলো, তালহা (রা.)-এর হত্যা। এ প্রসঙ্গে তিনি ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। ইসমাইলি প্রমুখ তাই সাব্যস্ত করেছেন। এর পরবর্তী তার কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন, সাহল ইবনে সা'দ, ওরওয়া, আলি ইবনে হুসাইন ও আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান ইবনুল হারিস। ইমাম বোখারি (র.) সহিহ বোখারিতে তাদের হাদিস মারওয়ান থেকে সনদ ও বরাতসহকারে বর্ণনা করেছেন মদিনায় শাসক থাকাকালীন হজরত ইবনে জুবায়র (র)-এর সাথে বিরোধ প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে। والله اعلم, ইমাম মালেক (র.) তার হাদিসের ওপর নির্ভর করেছেন। তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে ইমাম মুসলিম (র.) ব্যতিত অন্যরাও হাদিস বর্ণনা করেছেন। –হুদাস্ সারি মুকাদ্দামা ফাতহুল বারি, অনুচ্ছেদ ৯, আমাদের লাইব্রেরিতে রক্ষিত হস্তলিপি। ১/৩৮. باب الوضوء من مس الذكر সংকলক।

○ কোনো কোনো হানাফি এর জবাবে বলেছেন, এ অতিরিক্ত অংশটুকু বিশুদ্ধ নয় এর প্রমাণ হলো, যদি এ অতিরিক্ত অংশটুকু সহিহ হতো, তাহলে ইমাম বোখারি (র.) এ হাদিসটিকে সহিহ বোখারিতে অবশ্যই উল্লেখ করতেন। অথচ ইমাম বায়হাকি (র.)-এর বক্তব্যে মুতাবেক ইমাম বোখারি (র.) এই বর্ণনাটি এজন্য বর্ণনা করেননি যে, বুসরা থেকে ওরওয়ার শ্রবণে সন্দেহপূর্ণ ছিলো। তা ব্যতিত মুস্তাদরাকে হাকেম : ১/১৩৯ এবং 'সুনানে দারাকুতনি' : ১/৫৫ এবং সুনানে কুবরা লিল বায়হাকি : ১/১৩৭-এ রাজা ইবনে মুরজি সূত্রে বর্ণিত আছে যে, একবার মসজিদে খাইফে হজরত ইয়াহইয়া ইবনে মাইন এবং আলি ইবনুল মাদিনি ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (র.) সম্মেলন ঘটেছিলো। লজ্জাস্থান স্পর্শ করার বিষয়টি আলোচনায় এলে ইয়াহইয়া ইবনে মাইন (র.) বলেছেন, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে ওজু ওয়াজিব। পক্ষান্তরে আলি ইবনুল মাদিনির বক্তব্যে ছিলো ওজু ওয়াজিব নয়। ইবনে মাইন (র.) ওজু ওয়াজিব হওয়ার ওপর বুসরা বিনতে সাফওয়ানের হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। এর ওপর আলি ইবনুল মাদিনি প্রশ্ন করেছেন যে, হজরত ওরওয়া ইবনুজ জুবায়র এ হাদিস সরাসরি বুসরা থেকে শুনেননি।

كيف تتقلد اسناد بسرة؟ ومروان ارسل شرطيا حتى رد جوابها إليه .

'বুসরার সনদ আপনি কিভাবে মেনে নিচ্ছেন? অথচ মারওয়ান একজন পুলিশ পাঠিয়েছেন, ফলে বুসরা তার মাধ্যমে তার কাছে জবাব পাঠিয়েছেন।' স্বয়ং আলি ইবনুল মাদিনি তাল্‌ক ইবনে আলির হাদিস পেশ করেছেন। এর ওপর ইয়াহইয়া ইবনে মাইন প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, এটি কায়স ইবনে তাল্‌ক থেকে বর্ণিত,

وقد اكثر الناس فى قيس بن طلق ولا يحتج بحديثه

'কায়স ইবনে তাল্‌ক সম্পর্কে অনেকেই আপত্তি করেছেন। তাঁর হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় না। ইমাম আহমদ (র.) উভয়ের প্রশ্নাবলি গ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করলেন। বললেন, كلا الأمرين على ما قلتما অর্থাৎ, আপনাদের দু'জনের কথাই ঠিক। এরপর ইয়াহইয়া ইবনে মাইন (র.) বললেন, مالك عن نافع عن ابن عمر (رض) انه توضأ من مس الذكر অর্থাৎ, মালেক-নাফে'-ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে ওজু করেছেন। এ শুনে আলি ইবনুল মাদিনি (র.) বলেছেন,

كان ابن مسعود رضى الله تعالى عنه يقول لا يتوضأ منه وانما هو بضعة من جسدك .

'হজরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলতেন, এর ফলে ওজু করার দরকার নেই। এটাতো কেবল তোমার শরীরের একটি অংশ।' এ শুনে ইয়াহইয়া ইবনে মাইন এর সনদ জিজ্ঞেস করলেন। তখন আলি ইবনুল মাদিনি (র.) বললেন, سفيان عَنْ ابى قيس عن هزيل عن عبد الله সাথে সাথে এও বললেন واذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر (رض) واختلفا فابن مسعود أولى ان يتبع অর্থাৎ, ইবনে মাসউদ ইবনে উমর দু'জন একত্রিত হয়ে মতবিরোধ করলে ইবনে মাসউদের অনুসরণ উত্তম। ইমাম আহমদ (র.) এটা শুনে বললেন,

نعم ولكن وابو قيس لا يحتج بحديثه .

'হ্যাঁ! তবে আবু কায়সের[১] হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় না।'

অতঃপর আলি ইবনুল মাদিনি (র.) বললেন,

حدثنى ابو نعيم نا مسعر عن عمير بن سعيد عن عمار بن ياسر (رض) قال ما ابالى مسسته او انفى .

টীকা- ১. আল্লামা মারদিনি (র.) বলেন, এই আবু কায়সকে আল্লামা ইবনে মাইন (র.) নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আজালি তাঁকে নির্ভরযোগ্য লেছেন। ইমাম বোখারি (র.) তাঁর দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। ইবনে হাব্বান তাঁর হাদিস সহিহ ইবনে হাব্বানে এবং হাকেম মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেছেন। -মা'আরিফুস্ সুনান : ১/২৯৯।

'আবু নু'আইম আমার নিকট হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা কাছে মিসআর হাদিস বর্ণনা করেছেন হুমাইদ ইবনে সাইদ সূত্রে আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) হতে। তিনি বলেছেন, আমি পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলাম নাকি আমার নাক স্পর্শ করলাম তার কোনো পরোয়া আমি করি না।'

ইমাম আহমদ (র.) এর ওপর বললেন,

عمار وابن عمر استويا فمن شاء اخذ بهذا ومن شاء اخذ بهذا -

'আম্মার ও ইবনে উমর দু'জন সমান। সুতরাং যার ইচ্ছা আম্মারকে গ্রহণ করবে, আর যার ইচ্ছা ইবনে উমরকে গ্রহণ করবে।'

এই মুনাজারা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াহইয়া ইবনে মাইন, আলি ইবনুল মাদিনি এবং ইমাম আহমদের ন্যায় সুমহান মুহাদ্দিসিন এমনকি ইমাম বোখারি (র.) পর্যন্ত হজরত ওরওয়া ইবনুজ জুবায়রের হাদিসে, فسئلت بسرة بعد ذلك فصدقته এই অতিরিক্ত অংশটুকু সম্পর্কে বেখবর ছিলেন।

অতিরিক্ত অংশটুকু যদি সহিহ হতো তাহলে তাঁরা না-ওয়াকিফহাল থাকতেন না। কিন্তু ইনসাফের কথা হচ্ছে হাদিসের বিশুদ্ধতার নির্ভরতা হওয়া উচিত সনদের ওপর। যদি এর সনদ সহিহ হয় তবে এটাকে মেনে নেওয়া উচিত। তা ব্যতিত জ্ঞান না থাকা অবাস্তবতাকে আবশ্যক করে না। অতএব, শুধু তাদের না-ওয়াকিফহাল হওয়ার কারণে এই অতিরিক্ত অংশটুকু সহিহ হতো তাহলে তাঁরা না-ওয়াকিফহাল থাকতেন না। কিন্তু ইনসাফের কথা হচ্ছে হাদিসের বিশুদ্ধতার নির্ভরতা সনদের ওপর হওয়া উচিত। যদি এর সনদ সহিহ হয় তবে এটাকে মেনে নেওয়া উচিত। তা ব্যতিত জ্ঞান না থাকা অবাস্তবতাকে আবশ্যক করে না। অতএব, শুধু তাদের না-ওয়াকিফহাল হওয়ার কারণে এই অতিরিক্ত অংশটুকু রদ করে দেওয়া যায় না। বিশেষত যখন অন্যান্য মুহাদ্দিস এই অতিরিক্ত অংশটুকু সহিহ সাব্যস্ত করেছেন।[১] ইমাম দারাকুতনি (র.) এটাকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় এটাকে সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন। এমনভাবে ইমাম ইবনে খুজায়মা (র.) ও সুস্পষ্ট ভাষায় এর বিশুদ্ধতার বক্তব্যে করেছেন। তা ব্যতিত আলি ইবনুল মাদিনি এবং ইয়াহইয়া ইবনে মাইনের মুনাজারা 'মুস্তাদরাকে হাকেম'ও বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে যেখানে আলি ইবনুল মাদিনি হজরত বুসরার বর্ণনার ওপর সনদগত বিচ্ছিন্নতার প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, সেখানে ইয়াহইয়া ইবনে মাইনের জবাবও নিম্নেযুক্ত ভাষায় রয়েছে,

ثم لم يقنع ذلك عروة حتى اتى بسرة فسألها فشافهته بالحديث -

'এর ওপর ওরওয়া সন্তুষ্ট হতে পরেননি। ফলে বুসরার কাছে এসে তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি তাঁকে সরাসরি হাদিস বললেন।' এর ওপর আলি ইবনুল মাদিনির পক্ষ থেকে কোনো প্রশ্নের কথা উল্লেখ নেই। যা

টীকা- ১. আমি বলবো, পরে আমি দেখেছি, ইবনে হাব্বান এই অতিরিক্ত অংশটুকু নিম্নেযুক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন,

محمد بن اسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن رافع حدثنا بن ابى فديك اخبرنى ربيعة بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة -

অতঃপর হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন, ওরওয়া বলেছেন, অতঃপর আমি বুসরাকে জিজ্ঞেস করেছি, ফলে তিনি তাঁর সত্যায়ন করেছেন। -মাওয়ারিদুজ জাম'আন : ৭৮, হাদিস নং ২২১। ইমাম দারাকুতনি (র.) ও নিম্নেযুক্ত সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন– عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا الحكم بن موسى حدثنا شعيب بن اسحاق اخبرنى هشام بن عروة عن ابيه ان مروان حدثه *অতঃপর হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। তারপর বলেছেন, অতঃপর ওরওয়া তা অস্বীকার করেছেন। পরে বুসরাকে জিজ্ঞেস করেছেন, তখন বুসরা তাঁর কথার সত্যায়ন করেছেন। দারাকুতনি বলেন,*

هذا صحيح تابعه ربيعة بن عثمان والمنذر بن عبد الله الحرامى وعن بسرة بن عبد الواحد وحميد بن الأسود فرووه عن هشام هكذا عن أبيه عن مروان عن بسرة قال عروة فسئلت بسرة بعد ذلك فصدقته - سنن الدارقطنى جا صـ١٤٦)

অতএব, স্পষ্ট হলো এই অতিরিক্ত অংশটুকু সহিহ। এজন্যই ইবনে খুজায়মা (র.) বলেছেন, ইমাম শাফেয়ির মতই আমি পোষণ করি। ওরওয়া বুসরার হাদিস তার থেকে শুনেছেন। এমন নয় যেমন আমাদের কোনো কোনো আলেম ধারণা করেছেন, যে হাদিসটি জয়িফ, মারওয়ানের ব্যাপারে সমালোচনা করেন। ابن خزيمة ـ١/٢٣ ، ٣٤

দ্বারা বোঝা যায় যে, এ অতিরিক্ত অংশটুকুও কমপক্ষে ইয়াহইয়া ইবনে মাইন (র.)-এর নিকট সঠিক ছিলো। এ কারণে আমরা প্রথমে বলেছি যে, সনদগত দিক দিয়ে সামান্য কিছু কথা সত্ত্বেও হজরত তল্ক এবং হজরত বুসরা দু'জনের হাদিসই প্রমাণ্য।

এগুলোর মধ্য থেকে সূত্রগতভাবে কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়া কঠিন। প্রশ্নোত্তর উভয়ের পক্ষেই করা ও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কারো জবাবকে সুনিশ্চিত এবং সন্তোষজনক সাব্যস্ত করে অপরটিকে জয়িফ বলা যায় না। সর্বোচ্চ শক্তিশালী ও অধিক শক্তিশালী পার্থক্য করা যায়। এ কারণে ইমাম বোখারি ও মুসলিম (র.) এ দুটোর মধ্য থেকে কোনো একটি হাদিসও বোখারি-মুসলিমে বর্ণনা করেননি। তা ব্যতিত বিতর্কের ঘটনা থেকে মনে হচ্ছে ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে দুটি হাদিসের কোনোটিই আপত্তি মুক্ত না।

মতবিরোধ অবসানের একটি পথ হলো রহিত বলা। রহিত হওয়ার এই দাবিও উভয়ের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। কিন্তু সত্য কথা হলো, রহিত হওয়ার পর্যাপ্ত দলিল কারো কাছে নেই। অবশ্য রয়েছে নিদর্শনাবলি উভয় পক্ষে।

হজরত তাল্ক ইবনে আলি (রা.)-এর বর্ণনা রহিত হবার নিদর্শন হলো, হজরত তাল্ক (রা.) প্রথম হিজরিতে মসজিদে নববি তৈরির সময় মদিনা তাইয়্যিবায় আগমন করেন। এরপর তিনি ফিরে চলে যান। অন্য দিকে ওজুর হাদিস আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, যিনি সপ্তম হিজরিতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কাজেই হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা 'পরবর্তী মেনে রহিতকারি সাব্যস্ত করা যায় এবং হজরত তালকের হাদিস রহিত বলা যায়, কিন্তু আরজ করা হয়েছে যে, রহিত হওয়ার জন্য এই প্রমাণ যথেষ্ট নয়। প্রথমতো এ কারণে যে, কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারা হজরত তালকের নবম হিজরিতে মদিনা তাইয়্যিবায় আগমন প্রমাণিত হয়। হতে পারে এ হাদিসটি তিনি তখন শুনেছেন। তাছাড়া রাবির পরবর্তীতে মুসলমান হওয়ার বর্ণনা পরবর্তী হওয়ার প্রমাণ নয়। পরে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব, এটা মানসুখ হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।[১]

হজরত বুসরার হাদিস রহিত হওয়ার নিদর্শন হলো যে, ইসলামের এমন নজির রয়েছে, যেগুলোতে কোনো আমল দ্বারা ওজু প্রমাণিত হওয়ার বিষয় পরবর্তীতে রহিত করে দেওয়া হয়েছে, যেমন আগুনে স্পর্শ করা তথা রান্না করা খাওয়ার পর ওজু করা। কিন্তু এমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই যাতে প্রথমে ওজু না করার সুস্পষ্ট হুকুম এসেছে এবং

টীকা- ২. মাজমাউজ জাওয়ায়িদ (১/২৪৫) বাবুন ফি মাম মাসসা ফারজাহুতে আছে,

وعن طلق بن على وكان فى الوفد الذين وفدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ .

'কাবিরে' এ হাদিসটি তাবারানি বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, আইয়ুব ইবনে উতবা থেকে এ হাদিসটি হাম্মাদ ইবনে মুহাম্মদ ব্যতিত আর কেউ বর্ণনা করেননি। আরেকটি হাদিসও হাম্মাদ ইবনে মুহাম্মদ বর্ণনা করেছেন। দু'টি হাদিসই আমার মতে সহীহ। মনে হয় প্রথম হাদিসটি রাসূলে আকরাম ﷺ থেকে এর পূর্বে শুনেছেন। অতঃপর এ হাদিসটি শুনেছেন। অতএব, বুসরা উম্মে হাবিবা, আবু হুরায়রা, জায়দ ইবনে খালেদ (রা.) প্রমুখ যাঁরা নবী করিম ﷺ থেকে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার কারণে ওজুর নির্দেশ বর্ণনা করেছেন এবং রহিতকারি ও রহিত উভয়টি শুনেছেন, তাঁদের সবার হাদিস এক রকম হয়ে গেলো। আমার ধারণা শায়খ আল্লামা মাওলানা জাফর আহমদ উসমানি (র.) ব্যতিত আর কেউ এ প্রশ্নটি সম্পর্কে আলোচনা করেননি। (ই'লাউস্ সুনান : ১/১৯০-১৯১, باب ان مس الذكر غير ناقض) তিনি এ প্রশ্নটির প্রমাণ নির্ভর জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, রহিত হওয়ার দাবি করা মুশকিল এবং এর কোনো প্রয়োজনও নেই। আমি যে মুশকিল বললাম, এর কারণ হলো, এর জন্য এমন কোনো শব্দের প্রয়োজন যা মনসূখ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করবে। অথচ তা প্রমাণিত নয়। পরস্পর সাংঘর্ষিক দুটি হাদিসের তারিখ সম্পর্কে জানা থাকা মানসুখ হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। অতএব যখন তা জানা থাকবে না তখন তাও কিভাবে যথেষ্ট হবে। কেনোনা, হতে পারে পূর্বের হাদিসটি মোস্তাহাবের ক্ষেত্রে আর পরবর্তীটি বৈধতার বিবরণের ক্ষেত্রে কিংবা এর সম্পূর্ণ উল্টো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এমন সম্ভাবনা প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর।

আর আমি যে বললাম 'এর কোনো প্রয়োজনও নেই' এর কারণ হলো, উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব যে, নির্দেশটি মোস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্যে। আর 'না' করা হয়েছে আবশ্যকতা বাদ দেওয়া রজন্য। অতএব, মানসূখ বলার প্রয়োজন নেই।

আমার মতে সহিহ হলো নির্দেশটি মোস্তাহাবের জন্য। যেমন, দুররে মুখতারে আছে– 'ইখতেলাফ থেকে বাঁচার জন্য তা মুস্তাহাব হবে। বিশেষত ইমামের জন্য....। –দুররে মুখতার, ফতওয়া শামিসহ : ১/১৫২ সংকলক।

পরবর্তীতে ওজু ওয়াজিব হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকাশ থাকে যে, এটি শুধু একটি নিদর্শনের মর্যাদা রাখে, মানসুখ হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ নয়। মূলত এই মাসআলাতে দলিলগুলো পরস্পর বিরোধী। আর এমন স্থানেই কোনো মুজতাহিদের আঁচল সামলানোর প্রয়োজন অনুভব হয়। ইমাম শাফেয়ি (র.) হজরত বুসরার হাদিস এজন্য অবলম্বন করেছেন যে, এর সহায়তা হজরত আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, ইবনে উমর, জায়দ ইবনে খালিদ জুহানি, উম্মে হাবিবা, আরওয়া বিনতে উনাইস, জাবের এবং আবু আইয়ুব (রা.)-এর হাদিসগুলো দ্বারা হয়[১]। তন্মধ্যে অধিকাংশের সনদ যদিও জয়িফ এবং বিতর্কিত, কিন্তু সহায়ক হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। অন্যদিকে হজরত তাল্‌ক ইবনে আলি (রা.)-এর হাদিসের সহায়ক হলো, হজরত উমামা, হজরত আয়েশা, হজরত ইসমা ইবনে মালেক খিতমি এবং হজরত জুরাই (রা.)-এর হাদিসগুলো। তন্মধ্যে হজরত জুরাইয়ের বর্ণনার ওপর কালাম হয়েছে। আর অবশিষ্ট বর্ণনাগুলোর দুর্বলতা সম্পর্কে সবাই একমত। কিন্তু হজরত ইমাম আজম আবু হানিফা (র.) নিম্নেযুক্ত কারণসমূহের ভিত্তিতে হজরত তাল্‌ক ইবনে আলি (রা.)-এর বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

১. বুসরা (রা.)-এর বর্ণনা যদি অবলম্বন করা হয়, তাহলে হজরত তালকের বর্ণনা সম্পূর্ণ বর্জন করতে হয়। অথচ সূত্রগতভাবে সেটিও প্রামাণ্য। এর পরিপন্থি যদি হজরত তালকের বর্ণনা গ্রহণ করা হয়, তাহলে হজরত বুসরার হাদিস বর্জন করা আবশ্যক হয় না। কেনোনা এটাকে ধরা যায় মোস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ ব্যাখ্যা কোনো অযৌক্তিক নয়। কেনোনা স্বয়ং ইমাম শাফেয়ি (র.) রান্না করা জিনিস খাওয়ার কারণে ওজু এবং উটের গোশত খাওয়ার কারণে ওজু করার বিষয়টিতে এই ব্যাখ্যাই করেছেন। তা ব্যতিত স্বয়ং বুসরার বর্ণনায় কোনো কোনো সূত্রে এমন রয়েছে, যেগুলোকে স্বয়ং বুসরার বর্ণনায় কোনো কোনো সূত্রে এমন রয়েছে, যেগুলোকে স্বয়ং ইমাম শাফেয়ি (র.)ও মোস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরেন। ইমাম তাবারানি মু'জামে কাবির এবং মু'জামে আওসাতে এমন একটি বর্ণনা আছে,

عن بسرة بنت صفوان قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره او انثييه او رفغيه (اى أصول فخذيه) فليتوضأ للصلوة قال الهيثمى فى مجمع الزوائد ج١ صـ٢٤٥ بعد ذكر هذا الحديث رجاله رجال الصحيح -

'বুসরা বিনতে সাফওয়ান হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে তার পুরুষাঙ্গ বা অণ্ডদ্বয় অথবা তার বসার স্থান স্পর্শ করবে, সে যেনো নামাজের জন্য ওজু করে।'

অণ্ডদ্বয় এবং উরুর মূল অংশ স্পর্শ করার কারণে এতে ওজুর হুকুম সর্বসম্মতিক্রমে মোস্তাহাব। এ কারণে ইমাম শাফেয়ি (র.) কিতাবুল উম্মে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, অণ্ডদ্বয় স্পর্শ করার কারণে ওজু ভঙ্গ হয় না। অতএব, অণ্ডদ্বয় স্পর্শ করা ও উরুদ্বয়ের মূল স্পর্শ করার ক্ষেত্রে আপনাদের যে জবাব লজ্জাস্থান স্পর্শ করার ক্ষেত্রে আমাদেরও সে জবাব।

০ অনেকে এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, ইমাম দারাকুতনি (র.) অণ্ডদ্বয় স্পর্শ করার বিষয় বর্ণনা করে এটাকে জয়িফ এবং মওকুফ সাব্যস্ত করেছেন ওরওয়া ইবনুজ জুবায়রের ওপর।

টীকা- ১. হাদিসটি অনুরূপভাবে আয়েশা (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে। এটি বর্ণনা করতেন ইবনে আবু হাতেম নিম্নেযুক্ত সূত্রে, হাসান আল হুলওয়ানি-আব্দুস্ সামাদ ইবনে আব্দুল ওয়ারিস- তাঁর পিতা-হুসাইন আল মুআল্লিম-ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসির-মুহাজির ইবনে ইকরামা-জুহরি-ওরওয়া-আয়েশা-নবী করিম ﷺ। তিনি এরশাদ করেছেন- من مس ذكره فليتوضأ যে তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করবে সে যেনো অবশ্যই ওজু করে। অতঃপর ইবনে আবু হাতেম বলেছেন, আমার পিতা আবু হাতেম বলেছেন, এ হাদিসটি জয়িফ। ইয়াহইয়া জুহরি থেকে হাদিসটি শুনেননি। তিনি রাবিদের মাঝখানে অপ্রসিদ্ধ একজন লোককে প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়েছেন। আর এ হাদিসটি তাঁর থেকে ইয়াহইয়া ব্যতিত আর কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমি জানি না।... । -ইলালুল হাদিস : ১/৩৬।

০ স্পষ্ট যে, ইমাম তাবারানি (র.) এটাকে শক্তিশালী সনদে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা হায়সামি (র.) এ কারণে বলেছেন, এর সূত্রগুলো সহিহ হাদিসের সনদ। তা ব্যতিত স্বয়ং ইমাম দারাকুতনি (র.) বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই দুর্বলতার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায় একাধিক সূত্রের কারণে।

২. তাল্‌ক ইবনে আলি (রা.)-এর বর্ণনা স্পষ্ট। এর বরখেলাফ হজরত বুসরার হাদিস অস্পষ্ট। এতে একথা স্পষ্ট নেই যে, যৌন আবেদনসহ স্পর্শ করার অবস্থায় ওজুর হুকুম, না যৌন আবেদন ব্যতিত স্পর্শ করার অবস্থায় এবং পর্দাহীন স্পর্শ হবে, না পর্দা সহকারে। পর্দার শর্ত ইমাম শাফেয়ি (র.) হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা থেকে গ্রহণ করেছেন। সেটি ইয়াজিদ ইবনে আব্দুল মালেক নাওফেলি থেকে বর্ণিত, যিনি জয়িফ। এ ব্যাপারে আল্লামা হায়সামি 'মাজমাউজ জাওয়ায়িদে' স্পষ্ট ভাষায় বিবরণ দিয়েছেন। এ বিষয়েও অস্পষ্টতা রয়েছে যে, নিজের পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা ওজু ভঙ্গের কারণ, না অন্যেরটি স্পর্শ করাও? এ কারণেই এসব বিস্তারিত বিবরণে ওজু ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তাদের ভীষণ মতবিরোধ রয়েছে। কাজি আবু বকর ইবনে আরাবি (র.) এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন প্রায় ৪০টি বক্তব্যে।

৩. বিস্ময়কর ব্যাপার যে, ইমাম শাফেয়ি (র.) অণ্ডদ্বয় স্পর্শ করার বর্ণনাকে ওজু ভঙ্গের কারণ বলেন না! অথচ এর সনদও সহিহ। অথচ পায়ুপথ স্পর্শ করাকে ওজু ভঙ্গের কারণ মনে করেন। কিতাবুল উম্মে এর সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। অথচ এ সম্পর্কে 'মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে' হজরত আ'তার বক্তব্যের স্বপক্ষে কোনো দুর্বল বর্ণনাও বিদ্যমান নেই। বরং এর বিপরীত 'মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকেই'[১] হজরত কাতাদার একটি আছর আছে, যা দ্বারা পায়ু পথ স্পর্শ ওজু ভঙ্গের কারণ নয় বলে বোঝা যায়। তা ব্যতিত ইমাম শাফেয়ি (র.) মহিলাদের জন্যে তাদের লজ্জাস্থান স্পর্শ করাকেও ওজু ভঙ্গকারি বলেন। অথচ যতোগুলো বর্ণনায় মহিলাদের লজ্জাস্থান স্পর্শ করার আলোচনা এসেছে সেগুলো দুর্বল। যেমন এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে আল্লামা হায়সামি (র.)-এর 'মাজমাউজ জাওয়ায়িদে'।

৪. হাদিসের পরস্পর বিরোধের সময় একটি সিদ্ধান্তকারি বিষয় হয়ে থাকে সাহাবায়ে কেরামের আমল এবং তাঁদের আছর। এদিকে লক্ষ্য করলেও হজরত তালকের হাদিস প্রধান। কারণ, অধিকাংশ সাহাবি এ মুতাবেক আমল করেছেন। ইমাম ত্বাহাবি (র.) তো বলেছেন যে, ওজু ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে।

ইবনে উমর (রা.) ব্যতিত অন্য কারও থেকে প্রমাণিত নয়। অনেকে হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর মাজহাব ও এর মুতাবেক স্বীকার করেছেন। মোটকথা, বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম যথা হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত আলি, হজরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, হজরত আবু মুসা আশআরি, হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসির, হজরত হুজায়ফা, হজরত আনাস, হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) প্রমুখ হতে এ ব্যাপারে ওজু না করা প্রমাণিত। তাঁদের আছর এবং বক্তব্যগুলো মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, ই'লাউস্ সুনান ইত্যাদিতে দ্রষ্টব্য। এর পরিপন্থি ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর সহযোগি রয়েছে শুধু হজরত ইবনে উমর (রা.)-এর আছর এবং এটাকেও প্রযোজ্য বলা যায় মোস্তাহাবের ক্ষেত্রে।

৫. হাদিসগুলোর মাঝে পারস্পরিক বিরোধের সময়, কিয়াসেরও শরণাপন্ন হতে হয়। কিয়াস দ্বারাও হানাফিদের মাজহাবের সহায়তা হয়। কেনোনা, মল-মূত্র ইত্যাদি যেগুলো সরাসরি নাপাক, সেগুলো স্পর্শ করলে কারও মতে ওজু ভঙ্গ হয় না। সুতরাং, সুনির্দিষ্ট সেসব অঙ্গ যেগুলোর পবিত্রতা সর্বসম্মত, সেগুলোর স্পর্শ উত্তমরূপে ওজু ভঙ্গের কারণ না হওয়া উচিত।

بَابُ تَرْكِ الْوُضُوْءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ (صـ ٢٥)

অনুচ্ছেদ- ৬২ : লজ্জাস্থান স্পর্শ করে ওজু না করা প্রসঙ্গে (মতন ২৫)

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا مُلَازِمُ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ عَنْ اَبِيْهِ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَ هَلْ هُوَ اِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ؟ اَوْ بُضْعَةٌ مِنْهُ؟

৮৫. অর্থ : হজরত কায়স ইবনে তাল্ক ইবনে আলি আল-হানাফি (রা.) হতে বর্ণিত, নবী কারিম ﷺ বলেছেন, এটি তো তার দেহের একটি অঙ্গ বা টুকরো ব্যতিত আর কিছু নয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু উমামা (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, একাধিক সাহাবি ও কোনো কোনো তাবেয়ি থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা লজ্জাস্থান স্পর্শ করার ফলে ওজু করার মত পোষণ করেন না। এটা কুফাবাসী ও ইবনে মুবারকের মাজহাব। আর এ হাদিসটি এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিশুদ্ধতম। এ হাদিসটি আইয়ুব ইবনে উতবা ও মুহাম্মদ ইবনে জাবের, কায়স ইবনে তাল্ক সূত্রে তাল্ক হতে বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে জাবের ও আইয়ুব ইবনে উতবা সম্পর্কে কোনো কোনো আপত্তি তুলেছেন। মুলাজিম ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনে বদরের হাদিসটি বিশুদ্ধতম।

بَابٌ فِيْ تَرْكِ الْوُضُوْءِ مِنَ الْقُبْلَةِ (صـ ٢٥)

অনুচ্ছেদ- ৬৩ : চুম্বন করে ওজু না করা প্রসঙ্গে (মতন ২৫)

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ قُلْتُ مَنْ هِيَ اِلَّا اَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ.

৮৬. অর্থ : হজরত আয়েশা (রা.) হতে যে, নবী করিম ﷺ একবার তার কোনো এক স্ত্রীকে চুমু দিয়ে ওজু না করে নামাজের জন্য বেরিয়ে আসেন। ওরওয়া বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে স্ত্রী কে ছিলেন? আপনি ব্যতিত আর কেউ নন? তিনি হেসে ফেলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, একাধিক আলেম সাহাবি ও তাবেইন থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এটাই সুফিয়ান সাওরি ও কূফাবাসীর মত। তাঁরা বলেছেন, চুম্বনে ওজু নেই।

মালেক ইবনে আনাস, আওজায়ি, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক (র.) বলেছেন, চুমুতে ওজু আছে। এটা হলো, একাধিক আলেম সাহাবি ও তাবেয়িনের মাজহাব। আর আমাদের সঙ্গীগণ আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত নবী কারিম ﷺ-এর এই হাদিস এই প্রসঙ্গে এজন্য বর্ণনা করেছেন যে, এটি সনদগত সমস্যার কারণে তাদের মতে বিশুদ্ধ নয়। তিনি (তিরমিযী র.) আরও বলেছেন, 'আমি আবু বকর আল-আত্তার বসরিকে আলি ইবনুল মাদিনি থেকে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ আল-কাত্তান এ হাদিসটিকে জয়িফ বলেছেন। তিনি বলেছেন, এটি অপদার্থের মত বা জয়িফ।'

তিরমিযী (র.) বলেছেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইলকে এ হাদিসটি জয়িফ সাব্যস্ত করতে শুনেছি। তিনি আরও বলেছেন, হাবিব ইবনে আবু সাবেত ওরওয়া হতে হাদিসটি শ্রবণ করেনি।

ইবরাহিম তাইমি সূত্রে আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম ﷺ তাঁকে চুমু দিয়েছেন কিন্তু ওজু করেননি। এ হাদিসটিও সহিহ নয়। ইবরাহিম তাইমি আয়েশা (রা.) থেকে (হাদিস) শুনেছেন বলে আমরা জানি না। এ প্রসঙ্গে নবী করিম ﷺ থেকে কোনো বিশুদ্ধ হাদিস নেই।

দরসে তিরমিযী

قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلوة ولم يتوضأ : মহিলাকে স্পর্শ করার কারণে ওজু– এটিও একটি মহা বিতর্কিত বিষয়। এ বিষয়ে ইখতেলাফ সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ আলোচনা নিম্নেযুক্ত,

১. সাধারণভাবে হানাফিগণ মহিলা সম্পর্কে ওজু ভঙ্গের কারণ বলেন না। হ্যাঁ, যদি স্ত্রী মিলন হয় তবে সেটা ভিন্ন ব্যাপার।

২. এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর যে উক্তিটির ওপর ফত্ওয়া সেটি হচ্ছে, মহিলা স্পর্শ সাধারণভাবে ওজু ভঙ্গের কারণ। চাই ছোট মেয়ে হোক অথবা বড়, মাহরাম হোক কিংবা গাইরে মাহরাম, যৌন আবেদনের সাথে স্পর্শ হোক অথবা তা ছাড়া। এমনকি অনেক শাফেয়ি মতাবলম্বী লিখেছেন,

حتى اذا لطمها او داوى جرحها انتقض وضوئه .

'কেউ মহিলাকে চড়-থাপ্পড় দেয় অথবা তার জখমের চিকিৎসা করে, তবেই তার ওজু ভেঙে যাবে। অবশ্য শাফেয়িদের নিকট শুধু একটি শর্ত আছে, সেটি হচ্ছে স্পর্শ করা আবরণহীনভাবে।

৩. ইমাম মালেক (র.)-এর কাছে তিনটি শর্তের সাথে তা ওজু ভঙ্গের কারণ :

ক. মহিলা বয়স্কা হতে হবে।

খ. মহিলা তথা মাহরাম না হতে হবে।

গ. যৌন আবেদনসহকারে স্পর্শ করতে হবে।

৪. আল্লামা ইবনে কুদামা (র.) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) থেকে তিনটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন।

ক. হানাফিদের মত।

খ. শাফেয়িদের মত।

গ. মালেকিদের মত।

এ বিষয়ে তাদের নিকট কোনো হাদিস নেই; বরং তাদের প্রমাণ হলো কোরআনের আয়াত– او لامستم النساء। তাঁরা এটাকে হাতে স্পর্শ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরেন। এরজন্য হামজা এবং কিসায়ির কেরাত او لمستم। দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। তাঁরা বলেন, لمس শব্দটির প্রয়োগ হাতে স্পর্শ করার ক্ষেত্রেই হয়। তাছাড়া তারা প্রমাণ দেন ইবনে মাসউদ ও ইবনে উমর (রা.)-এর হাদিস দ্বারা।

এর বিপরীতে ওজু ওয়াজিব না হওয়ার ওপর হানাফিদের প্রমাণ নিম্নেযুক্ত,

১. এ অনুচ্ছেদে হজরত আয়েশা (রা.)-এর হাদিস,

ان النبى صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلوة ولم يتوضأ .

'রাসূলুল্লাহ ﷺ চুম্বন করেছিলেন তাঁর কোনো অর্ধাঙ্গিনীকে। তারপর ওজু না করে নামাজের জন্য বেরিয়ে পড়েছিলেন।'

পরবর্তী সময়ে এর সনদের ওপর বিস্তারিত আলোচনা হবে।

২. বোখারি ও মুসলিমে হজরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনায় আছে যে, আমি তাহাজ্জুদের সময় রাসূলে আকরাম ﷺ-এর সামনে শুয়ে থাকতাম। তিনি যখন সেজদা করতেন তখন আমাকে নাড়া দিতেন। তখন আমি পা সরিয়ে নিতাম।

হাফেজ ইবনে হাজার (র.)-এর জবাবে এই বক্তব্য যে, 'এটা ছিল আবরণসহ স্পর্শ, লৌকিকতা ব্যতিত আর কিছু সুনানে নাসায়িতে হজরত আয়েশা (রা.)-এর হাদিস,

عن عائشة (رضـ) قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى وانى لمعترضه اعتراض الجنازة حتى اذا اراد ان يؤتر مسنى برجله ـ

نسائى جـ١ صـ٣٨ ترك الوضوء من مس الرجل إمرأته من غير شهوة ـ

'হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ পড়তেন আর আমি সামনে লম্বালম্বিভাবে জানাজার ন্যায় শুয়ে থাকতাম। তারপর তিনি যখন বিতর পড়ার জন্য মনস্থ করতেন তখন আমাকে স্পর্শ করতেন তাঁর পায়ে।'

৪. আয়েশা (রা.) থেকেই সহিহ মুসলিম ১/১৯২ باب ما يقال فى الركوع والسجود -এ একটি হাদিস আছে,

عن عائشة (رضـ) قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدى على بطن قدمه وهو فى المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم انى اعوذ برضاك من سخطك ـ

'আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে আমি আমার বিছানা থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হারিয়ে ফেললাম। তারপর আমি তাঁকে তালাশ করলাম। তখন আমার হাত পড়লো তাঁর পায়ের তালুতে। তিনি তখন ছিলেন মসজিদে। তাঁর পদযুগল ছিলো খাড়া। তিনি তখন দোয়া পড়ছিলেন– اللهم انى اعوذ برضاك من سخطك 'হে আল্লাহ! আমি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সন্তোষের আশ্রয় চাচ্ছি।'

৫. 'মাজমাউজ জাওয়ায়িদ' : ১/২৪৭, باب فى من قبل او لامس তে আল্লামা হায়সামি (র.) 'মু'জামে তাবারানি আওসাতে'র বরাতে হজরত আবু মাসউদ আনসারি (রা.) থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন,

ان رجلا اقبل إلى الصلوة فاستقبلته امرأته فأكب عليها فتناولها فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكره ذلك له فلم ينهه ـ

'নামাজের দিকে এক ব্যক্তি এগিয়ে যাচ্ছিলো। তখন তার স্ত্রী সামনের দিক থেকে তার কাছে এগিয়ে এলে লোকটি স্ত্রীর গায়ে পড়ে তাকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর লোকটি নবী করিম ﷺ-এর নিকট এ বিষয়ে আলোচনা করলো। কিন্তু নবী করিম ﷺ তাকে এ ব্যাপারে নিষেধ করলেন না।'

লাইস ইবনে আবু সুলায়ম নামক একজন রাবি এর সনদে মুদাল্লিস। কিন্তু অন্যান্য হাদিসের বর্তমানে এটা সুনিশ্চিতরূপে মোটেও ক্ষতিকর নয়।

৬. 'মু'জামে তাবারানি আওসাতে' হজরত উম্মে সালামা (রা.)-এর বর্ণনায় রয়েছে,

قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ثم يخرج الى الصلوة ولا يحدث وضوء ـ

'তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়াসাল্লাম চুমু খেতেন। তারপর নতুন ওজু না করে নামাজের জন্য বেরিয়ে পড়তেন।'

এর সনদে একজন রাবি আছেন ইয়াজিদ ইবনে সিনান আর-রাহাবি। ইমাম আহমদ, ইয়াহইয়া ইবনুল মাদিনি (র.) তাঁকে জয়িফ বলেছেন। কিন্তু ইমাম বোখারি, ইমাম আবু হাতেম, মারওয়ান ইবনে মু'আবিয়া (র.) তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। মোটকথা, এমন প্রচুর বর্ণনার বর্তমানে হানাফিদের মাজহাব মারজুহ।

o আমরা শাফেয়ি মতাবলম্বী প্রমুখের প্রমাণাদির জবাবে বলব, او لامستم দ্বারা সহবাসের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যার প্রমাণ– এই আয়াতের আসল উদ্দেশ্য হলো, তায়াম্মুমের বিবরণ এবং এ কথা বলা যে, তায়াম্মুম ছোট নাপাকি এবং বড় নাপাকি উভয়টির কারণেই হতে পারে।

او جاء احدكم من الغائط (অথবা কেউ যখন পায়খানা থেকে বেরিয়ে আসে।) দ্বারা ছোট নাপাকির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আর বড় নাপাকির জন্য او لامستم ইঙ্গিতমূলক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যদি او لامستم কেও ছোট নাপাকির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ধরা হয়, তাহলে আয়াতটি বড় নাপাকির বিবরণ থেকে শূন্য হয়ে যাবে।

তাছাড়া لامستم শব্দটি باب مفاعلة থেকে এসেছে, যেটি ক্রিয়ায় উভয় পক্ষ থেকে অংশীদারিত্ব বোঝায়। এই অংশীদারিত্ব সহবাস ও স্ত্রী মিলনেই হতে পারে। বাকি রইলো, সে কেরাত যেটিতে لمستم শব্দ এসেছে। সেটিও সহবাসের দিকে ইঙ্গিত। এ কারণেই হাফেজ ইবনে জরির (র.) প্রমুখ সহিহ সনদে হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বক্তব্য বর্ণনা করেছেন যে, এখানে উদ্দেশ্য হলো সহবাস। হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর প্রমাণে অন্য একটি উদ্দেশ্য হলো সহবাস। হজরত আব্বাস (রা.)-এর প্রমাণে অন্য একটি আয়াত– وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن (যদি তোমরা তাদেরকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দাও) পেশ করেছেন যে, এখানে সর্বসম্মতিক্রমে সহবাস উদ্দেশ্য, হাতে স্পর্শ করা উদ্দেশ্য নয়। অতএব, যেমনভাবে مس শব্দটি দ্বারা সহবাসের দিকে ইঙ্গিত হতে পারে, এমনভাবে হতে পারে لمس দ্বারাও। বিশেষতো ওপরোল্লিখিত সেসব হাদিসের বর্তমানে, যেগুলো বোঝায় স্পর্শের পরে ওজু না করা।

o এখন আছে ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর (রা.) প্রমুখের আছর দ্বারা প্রমাণের বিষয়টি। প্রথমতো, এগুলোর সনদ শক্তিশালী নয়।

দ্বিতীয়তো, অন্যান্য স্পষ্ট সহিহ হাদিসের বিপরীত হওয়ার কারণে প্রামাণ্যও নয়। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যদি ملامسة অথবা لمس দ্বারা হাতে স্পর্শ করা বোঝাতো তাহলে প্রিয়নবী ﷺ-এর জীবনে কোনো একটি ঘটনা এমন পাওয়া যাওয়ার কথা ছিলো, যাতে তিনি মহিলাকে স্পর্শ করার কারণে ওজু করেছেন কিংবা এর নির্দেশ দিয়েছেন; অথচ পুরো হাদিস ভাণ্ডারে এমন একটি জয়িফ বর্ণনাও পাওয়া যায় না।

لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد : এই বাক্যটি দ্বারা ইমাম তিরমিযী (র.)-এর উদ্দেশ্য আলোচ্য অধ্যায়ের হাদিসটিকে জয়িফ সাব্যস্ত করা। এরই সহায়তায় তিনি ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ আল-কাত্তান (র.)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, هو شبه لا شيئ। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, এ হাদিসটি সহিহ। মুসলিমের শর্ত তার মধ্যে বিদ্যমান। ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল-কাত্তান (র.) অথবা অন্যান্য মুহাদ্দিস যে এটিকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন এর ভিত্তি সঠিক নয়। আর এ হাদিস সম্পর্কে উত্থাপিত সেসব প্রশ্নের দিকে লক্ষ্য করলেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এ হাদিসটি দুটি সূত্রে বর্ণিত আছে,

১. عن حبيب بن ابى ثابت عن عروة عن عائشة (رضـ)

২. ابوروق عن ابراهيم التيمى عن عائشة (رضـ)

বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে এই দুই সূত্রের ওপর। তাইমির বর্ণনার ওপর আলোচনা পরবর্তীতে আসবে।

o ওরওয়ার বর্ণনার ওপর দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। প্রথম প্রশ্ন হলো, এখানে ওরওয়া ইবনে জুবায়র উদ্দেশ্য নয়, বরং ওরওয়া আল-মুজানি উদ্দেশ্য। ইনি অজ্ঞাত। আর ওরওয়া দ্বারা ওরওয়া মুজানি উদ্দেশ্য হওয়ার প্রমাণ হলো, ইমাম আবু দাউদ (র.) এ হাদিসটি বর্ণনা করার পর এর আরেকটি সনদ বর্ণনা করেছেন। তা নিম্নেযুক্ত,

حدثنا ابراهيم بن مخلد الطالقانى قال ثنا عبد الرحمن بن مغراء قال ثنا الاعمش قال ثنا اصحاب لنا عن عروة المزنى عن عائشة (رضـ) بهذا الحديث ـ

ওরওয়ার সাথে মুজনি এতে স্পষ্ট বিদ্যমান। তাছাড়া ইমাম আবু দাউদ (র.) সুফিয়ান সাওরির এই বক্তব্যটিও বর্ণনা করেছেন,

قال ما حدثنا حبيب الاعن عروة المزنى (يعنى لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشئ)

'হাবিব আমাদের নিকট হাদিস বর্ণনা করেছেন কেবলমাত্র ওরওয়া আল-মুজানি থেকেই।' অর্থাৎ, ওরওয়া ইবনে জুবায়র থেকে কোনো হাদিসই তাঁদের নিকট বর্ণনা করেননি। এটাও এর নিদর্শন যে, আলোচ্য অনুচ্ছেদে হাদিসে ওরওয়া মুজানি উদ্দেশ্য।

০ জবাব হলো, আবু দাউদের এই সূত্রে যেখানে স্পষ্টাকারে মুজানি বিদ্যমান-এর সনদ নেহায়েত জয়িফ। প্রথমতো এর রাবি হচ্ছেন আব্দুর রহমান ইবনে মাগরা। তাঁর জয়িফতা সর্বজন বিদিত। তাঁর সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনে মাইন লিখেছেন,

له ست مائة حديث يرويها عن الأعمش تركناها لم يكن بذاك .

'ছয়শত হাদিস আছে তাঁর, যেগুলো তিনি আ'মাশ থেকে বর্ণনা করেছেন। এগুলো আমরা বর্জন করেছি। এগুলো শক্তিশালী নয়।' অন্যান্য মুহাদ্দিস থেকেও এর দুর্বলতার বিবরণ রয়েছে। তাছাড়া এই হাদিসে আ'মাশের উস্তাদগণ, যাদেরকে اصحاب لنا বলে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা অজ্ঞাত। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় না।

অবশিষ্ট আছে সুফিয়ান সাওরির বক্তব্য। প্রথমতো ইমাম আবু দাউদ (র.) এটা সূত্রবিহীন উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়তো স্বয়ং আবু দাউদ (র.) পরবর্তীতে এটা রদ করে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,

وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا .

'হাবিব থেকে হামজা আজ জাইয়াত, তিনি ওরওয়া ইবনে জুবায়র থেকে, তিনি আয়েশা (রা.) থেকে বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণনা করেছেন।'

এ দিয়ে উদ্দেশ্য করেছেন ইমাম আবু দাউদ (র.) সে বর্ণনা যেটি ইমাম তিরমিযী (র.) দোয়া পর্বে উল্লেখ করেছেন,

أنه عليه السلام كان يقول اللهم عافنى فى جسدى وعافنى فى بصرى .

-رواه الترمذى ج١ صـ٢٠٧ باب بلا ترجمه بعد باب ماجاء فى جامع الدعوات .

'নবীজি ﷺ এই দোয়া করতেন। হে আল্লাহ! আমার দেহ সুস্থ রাখ। আমার চোখ ভালো রাখো।'

মোটকথা, ইমাম আবু দাউদ (র.) ওপরযুক্ত হাদিসটিকে সহিহ সাব্যস্ত করে সুফিয়ান সাওরির বক্তব্য খণ্ডন করে দিয়েছেন যে, ওরওয়া ইবনে জুবায়র থেকে হাবিব ইবনে আবু সাবিতের কোনো বর্ণনা প্রমাণিত নয়। বাস্তব সত্য হলো, সুফিয়ান সাওরির এই বক্তব্যের প্রথমতো কোনো সনদ নেই। দ্বিতীয়তো এই বক্তব্যটি যদি প্রমাণিতও হয় তবুও তাঁর এই বক্তব্য নিজের জানা মুতাবেক হবে। কিন্তু অজানা অবাস্তবতার জ্ঞানকে আবশ্যক করে না। এ কারণে হজরত মাওলানা সাহারানপুরি (র.) চারটি সহিহ বর্ণনা বর্ণনা করেছেন। যেগুলো হাবিব ইবনে আবু সাবেত সূত্রে ওরওয়া ইবনে জুবায়র থেকে বর্ণিত। যা দ্বারা বোঝা যায় যে, হাবিব ইবনে আবু সাবেত কর্তৃক ওরওয়া ইবনে জুবায়র থেকে হাদিস বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত।

বাস্তব ঘটনা হলো, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটির সনদে ওরওয়া দ্বারা ওরওয়া ইবনে জুবায়র উদ্দেশ্য, ওরওয়া আল-মুজানি নয়। এর প্রমাণাদি নিম্নেযুক্ত,

১. এ হাদিসটি ইবনে মাজায়[১] নিম্নেযুক্ত সনদে রয়েছে,

حدثنا ابو بكر بن ابى شيبة وعلى بن محمد قالا ثنا وكيع ثنا عن حبيب بن ابى ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة (رضـ) .

টীকা- ১. ابواب الطهارة باب الوضوء من القبلة

২. এ হাদিসটি সুনানে দারাকুতনি, মুসনাদে আহমদ এবং মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বায় বিভিন্ন সূত্র বর্ণিত হয়েছে। যেগুলোর কোনো কোনোটিতে ইবনুজ জুবায়র আবার কোনোটিতে ইবনে আসমা সুস্পষ্ট ভাষায় আছে।

৩. মুহাদ্দিসিনের রীতি হলো, তাঁরা সাধারণত যখন ওরওয়া বলেন, তখন তাঁর দ্বারা ওরওয়া ইবনে জুবাইর উদ্দেশ্য করেন।

৪. এ হাদিসের শেষে হজরত আয়েশা (রা.)কে সম্বোধন করে হজরত ওরওয়া বললেন, من هى الا انت (তিনি আপনি ব্যতিত আর কেউ নন)।

এ শুনে আয়েশা (রা.) হেসে দিলেন। এটি একটি লৌকিকতাহীন-অকৃত্রিম বাক্য। যেটি হজরত ওরওয়া ইবনে জুবায়র (রা.)-ই বলতে পারেন। কারণ, তিনি ছিলেন হজরত আয়েশা (রা.)-এর ভাগ্নে। কোনো পরপুরুষের সাথে এ ধরনের কথাবার্তা আশা করা যায় না। মোটকথা, এসব প্রমাণাদির বর্তমানে এ বিষয়টি অখণ্ডনীয় যে, ওরওয়া ইবনে জুবায়র এ হাদিসের রাবি।

প্রশ্ন : দ্বিতীয় একটি প্রশ্ন এই হাদিসের সনদের ওপর করা হয়েছে যে, ওরওয়া ইবনে জুবায়রই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে তার থেকে হাবিব ইবনে আবু সাবেতের শ্রবণ প্রমাণিত হয়। এজন্যই ইমাম তিরমিযী (র.) ইমাম বোখারি (র.)-এর এই বক্তব্য বর্ণনা করেছেন, حبيب بن أبى ثابت لم يسمع من عروة (হাবিব ইবনে আবু সাবেত ওরওয়া থেকে শুনেননি)।

জবাব : আল্লামা সাহারানপুরি (র.) যে হাবিব ইবনে আবু সাবেতের শ্রবণ এমন লোকজন হতে প্রমাণিত, যারা ছিলেন ওরওয়া ইবনে জুবায়রেরও পূর্বেকার। মূলত ইমাম বোখারি (র.)-এর এই প্রশ্ন হয়েছে এ মূলনীতির ভিত্তিতে যে, শুধু সমকালীন হলেই তিনি সনদ মুত্তাসিল হওয়াকে যথেষ্ট মনে করেন না; বরং সাক্ষাৎ ও শ্রবণ প্রমাণিত হওয়াকে জরুরি সাব্যস্ত করেন। কিন্তু ইমাম মুসলিম (র.)-এর নিকট সমকালীন হওয়া এবং শ্রবণের সম্ভাবনা হাদিস বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আর এখানে সমকালীনতা বিদ্যমান। এজন্য এ হাদিসটি মুসলিমের শর্তানুসারে সহিহ। এসব আলোচনা ছিলো হাদিসের সে সূত্রের ওপর যেটি বর্ণিত হাবিব ইবনে আবু সাবেত-ওরওয়া সূত্রে।

ولا نعرف لابراهيم التيمى سماعا من عائشة (رض) : ইমাম তিরমিযী (র.)- এই বাক্যটি দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন আলোচ্য অনুচ্ছেদে হাদিসের দ্বিতীয় সূত্রটিকেও জয়িফ সাব্যস্ত করা, যেটি বর্ণিত ইবরাহিম তাইমি থেকে। এ সূত্রটি পরিপূর্ণভাবে আবু দাউদ (র.) বর্ণনা করেছেন,

حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحى وعبد الرحمن قال ثنا سفيان عن ابى روق عن ابراهيم التيمى عن عائشة (رض) ان النبى صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ .

'মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার-ইয়াহইয়া ও আব্দুর রহমান-সুফিয়ান-আবু রওক-ইবরাহিম তাইমি-আয়েশা সূত্রে বর্ণিত যে, নবী করিম ﷺ তাঁকে চুম্বন করেছেন; তবে ওজু করেননি।'

প্রশ্ন : এ সূত্রের ওপর ইমাম তিরমিযীর মতো ইমাম আবু দাউদ (র.)ও বিচ্ছিন্নতার প্রশ্ন উথাপন করেছেন। এ কারণে এ হাদিসটি আলোচনা করার পর তিনি বলেন,

قال أبو داود وهو مرسل وابراهيم التيمى لم يسمع من عائشة (رض) شيئا .

'আবু দাউদ বলেছেন, এটি মুরসাল। ইবরাহিম তাইমি আয়েশা (রা.) থেকে কিছুই শুনেননি।'

জবাব : প্রথমতো আপনার প্রশ্ন মুতাবেক এই বর্ণনাটি সর্বোচ্চ মুরসাল হবে। ومراسيل الثقات حجة عندنا 'তথা নির্ভরযোগ্য রাবিদের মুরসাল হাদিস আমাদের কাছে দলিল'।

দ্বিতীয়তো ইমাম দারাকুতনি (র.) সুনানে দারাকুতনিতে এ হাদিসটি উল্লেখ করার পর লিখেছেন,

وقد روى هذا الحديث معاوية بن هشام عن الثورى عن ابى الروق عن ابراهيم التيمى عن ابيه عن عائشة (رضـ) فوصل اسناده ـ (اعلاء السنن جـ١ صـ١٧٢)

হাদিসটি এই সূত্রে মুত্তাসিল হয়ে গেছে عن أبيه এই অতিরিক্ত অংশের কারণে। তাই এ প্রশ্নটি এখানে শেষ।[১]

ইমাম দারাকুতনি (র.) অন্য আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, মু'আবিয়া ইবনে হিশাম থেকে এই বর্ণনাটি দুই সূত্রে বর্ণিত। একটিতে قبلها ولم يتوضأ (তাঁকে চুম্বন করেছেন অথচ ওজু করেননি।) শব্দ আরেকটিতে قبلها وهو صائم (রোজা অবস্থায় তিনি তাঁকে চুম্বন করেছেন।) শব্দ। তারপর ইমাম দারাকুতনি (র.) এই মত প্রকাশ করেছেন যে, মূলত হাদিস ছিলো قبلها وهو صائم কিন্তু কোনো রাবি ভ্রান্তিক্রমে এটাকে ওজুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে قبلها ولم يتوضأ বর্ণনা করেছেন। বাস্তব সত্য হলো, ইমাম দারাকুতনি (র.) এই প্রশ্ন সম্পূর্ণ রুচিহীন। যেহেতু উভয় সূত্রের সমস্ত রাবি নির্ভরযোগ্য এবং স্বয়ং ইমাম দারাকুতনি (র.)-এর স্বীকারোক্তি মুতাবেক তাতে বিচ্ছিন্নতাও নেই। তাহলে রাবিদের ওপর সন্দেহ করা মানে হাদিসের ভাণ্ডার থেকে আস্থা তুলে নেওয়া। বিশুদ্ধ কথা হলো, قبلها وهو صائم এবং উভয়টি আলাদা আলাদা বর্ণনা এবং দুটোই স্বস্থানে সহিহ।[২]

وليس يصح عن النبى صلى الله عليه سلم فى هذا الباب شئ : ইমাম তিরমিযী (র.) এই বাক্যটি নিজ জ্ঞান ও ইজতেহাদ মুতাবেক বলেছেন। অন্যথায় বোখারি এবং মুসলিম প্রমুখের বর্ণনাগুলো এই অনুচ্ছেদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ। তাছাড়া আলোচ্য অধ্যায়ের হাদিসের ওপর উত্থাপিত প্রশ্নাবলির পর প্রমাণিত হয় যে, এটিও মুসলিম এর শর্ত মুতাবেক সহিহ। আর যদি মেনে নিই, এটি জয়িফ, তখনও একাধিক সূত্রের কারণে হাসান লিগাইরিহি হয়ে যায়। তাই 'তুহফাতুল আহওয়াজি'তে মুবারকপুরি (র.) স্বীকার করেছেন যে, একাধিক সূত্রের কারণে এ হাদিসটি প্রমাণযোগ্য। এ কারণে মুবারকপুরি (র.)সহ অনেক আহলে হাদিস আলেম এই মাসআলায় হানাফিদের সহায়তা করেছেন।

একটি আপত্তি ও তার জবাব

অনেক হাদিস অস্বীকারকারি এবং মুলহিদ আলোচ্য অধ্যায়ের হাদিস, عن عائشة (رضـ) عن النبى صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ এবং এই ধরনের অন্যান্য হাদিসের ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, রাসূল ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ নিজেদের গোপন বা অন্তরঙ্গ জীবন সম্পর্কে এমন কথা লোকজনের সামনে কেন বর্ণনা করেন, যা একজন সাধারণ রমণীও বর্ণনা করতে লজ্জাবোধ করে। কিন্তু ফাসাদিদের এ প্রশ্ন শুধু ভ্রান্তি এবং

টীকা- ১. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক : ১/১৩৫, হাদিস নং ৫১০ باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة - এ একটি হাদিস এমন বর্ণিত রয়েছে,

عبد الرزاق عن إبراهيم بن مجد عن معبد بن بنانة عن محمد بن عمر عن عروة بن الزبير عن عائشة (رضـ) قالت قبلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ولم يحدث وضوء .

এতে সুস্পষ্ট ভাষায় ইবনে জুবায়র হওয়ার সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে এবং সনদে না ইবরাহিম তাইমি আছেন, না হাবিব ইবনে আবু সাবেত। –সংকলক।

টীকা- ২. ইমাম আবু জুরআ (র.) এ কারণেই এ হাদিসটিকে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন এবং ইমাম ইবনে আবু হাতেম (র.) লেখেন– আবু জুর'আ (র.)কে চুম্বনের কারণে ওজু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। জবাবে তিনি বললেন, যদি হজরত আয়েশা (রা.)-এর হাদিস সহিহ না হতো, তবে চুম্বন দ্বারা আমি ওজুর প্রবক্তা হতাম। –ইলালুল হাদিস : ১/৪৮; হাদিস নং ১১০, ই'লাউস্ সুনান : ১/১৮৪-১৮৫তে একটি হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে দারাকুতনি সূত্রে। সে হাদিসটি দুটি বিষয়েরই সমন্বয়কারি। অর্থাৎ, প্রিয়নবী ﷺ তাঁকে চুম্বন করেছেন এবং ওজু করেননি। আর তাঁকে রোজাদার অবস্থায় চুম্বন করেছেন। আলি ইবনে আব্দুল আজিজ আল-ওয়াররাক-আসেম ইবনে আলি-আবু ইদরিস-হিশাম ইবনে ওরওয়া-ওরওয়া-আয়েশা সূত্রে বর্ণিত যে, হজরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট ইবনে উমর (রা.)-এর এই বক্তব্য পৌঁছেছিলো যে, চুম্বনের ওজু রয়েছে। তখন আয়েশা (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রোজা অবস্থায় চুম্বন করতেন, তারপর ওজু করতেন না।

দীনের স্বভাব সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলশ্রুতি। কারণ, পবিত্র স্ত্রীগণের ওপর শরয়িভাবে দায়িত্ব অর্পিত হতো এবং তাঁদের মর্যাদাগত একটি দায়িত্ব এই ছিলো যে, রাসূল ﷺ-এর পবিত্র জীবনের সে অংশ লোকদের সামনে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করবেন যেগুলোর জ্ঞান তাদের ব্যতিত আর কারও হতে পারে না। যাতে পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত বিধিবিধান এবং রাসূল ﷺ-এর সুন্নত তাদের সামনে এসে যায়। পবিত্র স্ত্রীগণ এই শিক্ষা দান ও শিক্ষাগ্রহণে তথাকথিত লজ্জাকে কখনও প্রতিবন্ধক হতে দেননি। আল্লাহ না করুন যদি তাঁরা এমন করতেন তবে শরিয়তের অনেক বিধিবিধান পর্দার আড়ালে গোপন থেকে যেতো। নিঃসন্দেহে লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। কিন্তু এটা ততোক্ষণ পর্যন্ত ভালো যতোক্ষণ পর্যন্ত এটা কোনো শরয়ি অথবা স্বাভাবিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক না হয়। কিন্তু শিক্ষা প্রদান ও প্রচার এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে লজ্জা-শরমের বাহানা সুনিশ্চিতরূপে যুক্তিযুক্ত নয়।

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ الْقَيْئِ وَالرُّعَافِ (ص۲۵)

অনুচ্ছেদ- ৬৪ : বমি এবং নাক দিয়ে রক্ত বের হলে ওজু করা প্রসঙ্গে (মতন ২৫)

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَاءَ فَتَوَضَّأَ فَلَقِيْتُ ثَوْبَانَ فِى مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ صَدَقَ أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوْءَهُ ـ

৮৭. **অর্থ :** হজরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একবার) বমি করেছিলেন। তারপর ওজু করেছেন। ফলে আমি দামেশকের মসজিদে হজরত সাওবান (রা.)-এর সাথে সাক্ষাতের পর এ বিষয়ে তার সামনে আলোচনা করলাম। তিনি বলেন, তিনি সত্য বলেছেন। আমি নবীজি ﷺ-কে ওজুর পানি ঢেলে দিয়েছিলাম। ইসহাক ইবনে মানসুর বলেছেন, (মা'দান ইবনে আবু তালহা এর স্থলে) মা'দান ইবনে তালহা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন : 'ইবনে আবু তালহাই বিশুদ্ধতম। আবু ঈসা তিরমিযী (র.) আরো বলেছেন, সাহাবি ও তাবেইন থেকে একাধিক আলেম বর্ণনা করেছেন, বমি করলে এবং নাক দিয়ে রক্ত পড়লে ওজু করতে হয়। এটা হলো সুফিয়ান সাওরি, ইবনে মুবারক, আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর মাজহাব। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, বমি করলে এবং নাক দিয়ে রক্ত পড়লে তাতে ওজু নেই। এটা হলো, মালেক ও শাফেয়ি (র.) এর মত। হুসাইন আল-মু'আল্লিম এ হাদিসটি উত্তমরূপে বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে হুসাইনের হাদিসটি আসাহ।

এ হাদিসটি মা'মার ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসির থেকে বর্ণনা করেছেন, তাতে তিনি ভুল করেছেন। তিনি বলেছেন, ইয়ায়িশ ইবনুল ওয়ালিদ থেকে, তিনি খালেদ ইবনে মা'দান থেকে তিনি আবুদ্ দারদা (রা.) সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন। এতে আওজায়ির কথা উল্লেখ করেননি। তিনি বলেছেন, খালেদ ইবনে মা'দান থেকে বর্ণিত, আসলে তিনি হচ্ছেন, মা'দান ইবনে আবু ত্বালহা (খালেদ ইবনে মা'দান নয়)।'

দরসে তিরমিযী

قاء فتوضأ : বমি ও নাক দিয়ে রক্ত ঝরার পর ওজু সংক্রান্ত মাসআলাটি একটি মৌলিক মতানৈক্যের শাখা।

১. সেটি হচ্ছে হানাফিদের মতে যে কোনো নাপাক শরীরের যে কোনো অংশ থেকে বের হয় তা ওজু ভঙ্গকারি। চাই নাপাক বের হওয়া স্বাভাবিক হোক অথবা রোগের কারণে হোক। হাম্বলিগণ এবং এটাই ইমাম ইসহাকের মাজহাবও।

২. ইমাম মালেক (র.)-এর মাজহাব এর বিপরীত, শুধু সে নাপাক বের হওয়া ওজু ভঙ্গের কারণ যেটি স্বাভাবিক এবং তার বের হওয়ার পথও স্বাভাবিক। যেমন, মল-মূত্র। অতএব, বমি, নাক দিয়ে রক্ত ঝরা এবং রক্ত

তাদের মতে ওজু ভঙ্গকারি নয়। কেনোনা এগুলো বের হওয়ার স্থান স্বাভাবিক নয়। যদি পেশাব-পায়খানার রাস্তা থেকে মল-মূত্র, মণি, মজি, ওয়াদি এবং বায়ু ব্যতিত অন্য কোনো জিনিস বের হয় তাহলে সেটাও তাদের মতে ওজু ভঙ্গকারি নয়। কারণ বের হওয়ার পথ স্বাভাবিক হলেও যেটি বের হওয়ার সেটি বের হয়। কিন্তু ইমাম মালেক (র.) এর মতে কিয়াস মুতাবেক তো তার দ্বারা ওজু না ভাঙার কথা। কিন্তু এটাকে তিনি ওজু ভঙ্গের কারণ মনে করেন তাআব্বুদি হিসেবে।

৩. শাফেয়ি (র.)-এর মতে বের হওয়ার পথ তো স্বাভাবিক হওয়া জরুরি। কিন্তু যেটি বের হবে সেটি স্বাভাবিক হওয়া জরুরি নয়। অতএব, যদি পেশাব-পায়খানার রাস্তা থেকে অস্বাভাবিক অর্থাৎ, প্রসাব-পায়খানা ব্যতিত অন্য কোনো জিনিস বের হয় তাহলে সেটা তার মতে ওজু ভঙ্গের কারণ। অতএব, পেশাব-পায়খানার রাস্তা ব্যতিত অন্য কোনো স্থান দিয়ে নাপাক বের হলে না মালেকিদের মতে ওজু ভাঙে, না শাফেয়িদের মতে। অথচ হানাফিদের মতে ওজু ভেঙে যায়। হানাফিদের দলিল নিম্নেযুক্ত,

১. হজরত আবুদ্ দারদা (রা.)-এর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان فى مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق انا صببت له وضوءه ـ

এই বর্ণনাটির যে সূত্র ইমাম তিরমিযী (র.) বর্ণনা করেছেন, সেটি হুসাইন আল-মু'আল্লিম থেকে বর্ণিত এবং বিশুদ্ধ। অথচ অন্য কোনো কোনো সূত্রে অনেক ইজতেরাব পাওয়া যায়। কিন্তু এ সূত্রটি নিঃসন্দেহে প্রামাণ্য। ইমাম তিরমিযী (র.) এজন্য বলেছেন,

وقد جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين اصح شئ فى هذا الباب ـ

'এ হাদিসটি হুসাইন আল মু'আল্লিম উত্তমরূপে বর্ণনা করেছেন। হুসাইনের হাদিসটি এ অনুচ্ছেদে আসাহ।'

০ শাফেয়ি মতাদর্শীরা এ হাদিসের ওপর দুটি প্রশ্ন করেছেন–

১. قاء فتوضأ তে ف অক্ষরটি কারণ বোঝানোর জন্য নয়; বরং তাকিবের (পরবর্তীতে কাজ করা) জন্য তাছাড়া হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্য কোনো নাপাকির কারণে ওজু করেছেন। কিন্তু এর জবাব হলো, এ ব্যাখ্যাটি সুস্পষ্ট বিষয়ের পরিপন্থি। বমির তৎক্ষণাত পর ওজুর কথা আলোচনা এ কথার প্রমাণ যে, বর্ণনাকারি বমিকে ওজুর কারণ সাব্যস্ত করতে চান। এজন্য প্রমাণ ব্যতিত সৃষ্ট সম্ভাবনা ধর্তব্য নয়।

০ অনেক শাফেয়ি মতাবলম্বী দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, মূলত এ হাদিসটি ছিলো قاء فافطر। কোনো রাবির ভ্রম হয়ে গিয়েছিলো যে, তিনি قاء فتوضأ বর্ণনা করে দিয়েছেন। এর প্রমাণ হলো, মুস্তাদরাকে হাকেম : ১/৪২৬, باب الإفطار من القيء এ হুসাইন আল-মু'আল্লিমের বর্ণনা থেকে হজরত আবুদ দারদা এবং হজরত সাওবান (রা.)-এর এ হাদিস এসেছে নিম্নেযুক্ত শব্দে,

ان النبى صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فلقيت ثوبان فى مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق انا صببت له وضوءه ـ

জবাব হলো, যখন বর্ণনাটির সনদ বিশুদ্ধ বলে জানা গেছে, তারপর এই বিভ্রমের কুধারণা কোনো ক্রমেই ঠিক নয়। বাস্তব ঘটনা হলো, এ দুটি বর্ণনা নিজ নিজ স্থানে বিশুদ্ধ قاء فأفطر ও এবং قاء فتوضأ ও।

والأصح ان يقال ان الحديث مشتمل على كلا اللفظين لأن تمام الحديث فى مسند احمد ج١ ص٤٤٩ عن أبى داود قال استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فافطر فاتى بماء فتوضأ (رح) ـ

'আসাহ হলো, এমন বলা যে হাদিসটি দুটো শব্দ সংবলিত। কেনোনা পূর্ণ হাদিস মুসনাদে আহমদে : ৬/৪৪৯ বর্ণিত হয়েছে আবু দাউদ থেকে। বর্ণনাকারি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বমি করেছেন, তারপর রোজা ভেঙেছেন। তার কাছে পানি নিয়ে আসা হলো, তিনি ওজু করলেন।'

আর যদি শুধু فأفطر বিশিষ্ট বর্ণনাটি গ্রহণ করা হয় তখন আমাদের প্রমাণ উক্ত হাদিসে হজরত সাওবান (রা.)-এর নিম্নোক্ত বাক্যটি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায়– انا صببت له وضوئه (আমি তাঁকে পানি ঢেলে দিয়েছি।)

২. হানাফিদের প্রমাণে হিদায়া গ্রন্থকার একটি বাচনিক মারফু হাদিস পেশ করছেন– الوضوء من كل دم سائل অর্থাৎ, প্রতিটি প্রবাহিত রক্তের কারণে ওজু করতে হবে। আল্লামা জামালুদ্দিন জায়লায়ি[১] (র.) লিখেছেন যে, এ হাদিসটি হজরত তামিম দারি এবং হজরত জায়দ ইবনে সাবেত (রা.) থেকেও বর্ণিত। তামিম দারির বর্ণনাটি বর্ণনা করেছেন ইমাম দারাকুতনি (র.)। আর সেটি বর্ণিত يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن تميم الدارى সূত্রে।

কিন্তু এই সূত্রটি ইমাম দারাকুতনির বক্তব্য মতে জয়িফ। প্রথমতো এ কারণে যে ইয়াজিদ ইবনে খালেদ এবং ইয়াজিদ ইবনে মুহাম্মদ দু'জনই অজ্ঞাত। দ্বিতীয়তো এজন্য যে, হজরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র.) হজরত তামিম (রা.) থেকে শ্রবণ করেননি।[২]

ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ কর্তৃক তামিম থেকে হাদিস না শোনার বিষয়টিও আমাদের জন্য ক্ষতিকর নয়। কারণ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দাবলিতে সূত্রগত বিচ্ছিন্নতা আমাদের মতে কোনো ত্রুটি নয়। বিশেষতো উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র.)-এর বর্ণনাটি হাফেজ ইবনে আদি (র.) 'আল-কামেলে' বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনাটির সনদে অনেকে এ প্রশ্ন করেছেন যে, এতে আহমদ ইবনে ফারাজ নামক একজন রাবি রয়েছেন, যাকে জয়িফ বলা হয়েছে। এর জবাব স্পষ্ট যে, স্বয়ং হাফেজ ইবনে আদি (র.) তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত লিখেছেন যে, আহমদ ইবনে ফারাজ যদিও জয়িফ, কিন্তু যেহেতু তিনি সবসময় লিখে হাদিস বর্ণনা করতেন, এজন্য মুহাদ্দিসিন তাঁকে প্রমাণযোগ্য মনে করেছেন। এ কারণে একাধিক মুহাদ্দিস তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। অতএব, তাঁর হাদিস প্রমাণযোগ্য। ন্যূনতম পক্ষে হাসান অবশ্যই। তারপর এই বর্ণনাটিকে হাসান বলার দ্বারা হজরত তামিম দারির বর্ণনাতেও দৃঢ়তা আনে।

৩. ইবনে মাজায় হজরত আয়েশা (রা.)-এর মারফু বর্ণনা রয়েছে,

قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيئ او رعاف او قلس او مذى فلينصرف فليتوضأ ثم لبين على صلوته وهو فى ذلك لايتكلم ـ

(ابن ماجة كتاب الصلوة ماجاء فى البناء على الصلوة)

তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার বমি হয়েছে অথবা নাক দিয়ে রক্ত ঝরেছে অথবা পেট থেকে মুখে পানি এসেছে কিংবা মজি বেরিয়েছে, সে যেনো ফিরে যেয়ে ওজু করে তারপর তার নামাজের ওপর বেনা করে (পূর্বে যেখান থেকে নামাজ ভঙ্গ হয়েছে সেখান থেকে পূর্ণ করে), সে ইতোমধ্যে (যদি) কথা না বলে থাকে।'

باب ما جاء لا يتقبل صلوة بغير طهور এ এই হাদিসের সনদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

টীকা- ১. জায়লায়ি : ১/১২১

টীকা- ২. 'ই'লাউস্ সুনান' : ১/১৫২তে উল্লেখ করা হয়েছে, 'সি'আয়া' গ্রন্থে বলেছেন, ইয়াজিদ ইবনে খালেদ এবং ইয়াজিদ ইবনে মুহাম্মদ সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। ওলামায়ে কেরাম তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। যেমন আল্লামা জাহাবির কাশিফে রয়েছে। -জামিউল আছার আমাদের শায়খ : ১১। আমি বলি (আল্লামা উসমানি (র.)-এর সহযোগিতা ও সমর্থন পাওয়া যায় পরবর্তী বক্তব্য দ্বারা। এখানে ইমাম দারাকুতনি (র.) কর্তৃক রাবি অজানা থাকার প্রশ্নটি খতম হয়ে গেছে অন্য জনের নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করার ফলে। কারণ অজ্ঞাত ব্যক্তিকে নির্ভরযোগ্য বলা যায় না।

৪. সিহাহ সিত্তার অধিকাংশ কিতাবে হজরত ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা.)-এর বিবরণ আছে,

عن عائشة (رضـ) قالت جائت فاطمة بنت ابى حبيش إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انى امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلوة؟ قال لا انما ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدعى الصلوة فاذا اقبلت الحيضة فدعى الصلوة واذا ادبرت فاغسلى عنك الدم وصلى ـ

'হজরত আয়েশা (রা) বলেছেন, ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা.) নবী করিম ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আমি ইস্তিহাজা বিশিষ্ট মহিলা। আমি পবিত্র হতে পারি না। তবে কি আমি নামাজ ত্যাগ করবো? জবাবে তিনি বললেন, না। এটা হলো, শিরা (এর রক্ত)। এটা হায়জ নয়। তারপর যখন হায়জ বা মাসিক আসবে তখন তুমি নামাজ ছেড়ে দাও। আর যখন মাসিকের সময় শেষ হয়ে যায় তখন নামাজ পরো রক্ত ধুয়ে।'

এ হাদিসে আবু মু'আবিয়ার বিশিষ্ট সূত্রটিতে নিম্নেযুক্ত শব্দাবলি আছে,

توضئ لكل صلوة حى يجئ ذلك الوقت -(رواه الترمذى فى باب فى المستحاضة)

'প্রতিটি নামাজের জন্য ওজু করো সে ওয়াক্ত আসার আগে।'

এখানে ওজুর হুকুমের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে এই যে, انما ذلك عرق অর্থাৎ, এটি শিরা থেকে প্রবাহিত খুন। এতে বোঝা গেলো, রক্ত বের হওয়া ওজু ভঙ্গের কারণ।

০ ইমাম মালেক (র.) ও শাফেয়ি (র.)-এর প্রমাণ হজরত জাবের (রা.)-এর হাদিস– যেটি ইমাম বোখারি (র.) প্রাসঙ্গিক[১] উল্লেখ করেছেন,

ويذكر عن جابر ان النبى صلى الله عليه وسلم كان فى غزوة ذات الرقاع فرمى رجل... بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى فى صلوته ـ

'হজরত জাবের (রা.) হতে উল্লেখ করা হয় যে, নবী করিম, ﷺ ছিলেন 'জাতুর রিকা' যুদ্ধে। সেখানে এক ব্যক্তির প্রতি তীর ছোড়া হলো, তার দেহ থেকে তীব্রগতিতে রক্ত বের হলো। তিনি রুকু করলেন, সেজদা করলেন এবং নামাজ আদায় করতে থাকলেন।'

ইমাম আবু দাউদ[২] (র.) সনদসহ এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা করেছেন। যে সাহাবি তীরবিদ্ধ হয়েছিলেন তিনি হজরত আব্বাস ইবনে বিশর (র.) ছিলেন।

০ হানাফিদের পক্ষ থেকে এর উত্তর এই দেওয়া হয়েছে যে, এই ঘটনায় রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে অনুমোদন প্রমাণিত নয়। রাসূল ﷺ-এর অনুমোদন ব্যতিত একজন সাহাবির কাজ অন্যান্য হাদিসগুলোর বিপরীতে প্রমাণ হতে পারে না। তারপর যদি এ হাদিস দ্বারা ওজু ভঙ্গ না হওয়ার ওপর প্রমাণ পেশ করা যায়, তাহলে এর দ্বারা রক্তের পবিত্রতার ওপরও প্রমাণ পেশ করা সঠিক হওয়া উচিত। কারণ, আবু দাউদের সুস্পষ্ট বিবরণ মুতাবেক তিনটি তীরবিদ্ধ হয়েছিলো। এজন্য তাঁর কাপড় রক্তাপ্লুত না হওয়া ছিলো অসম্ভব। আর অনেক শাফেয়ি মতাবলম্বীর এই বক্তব্য সম্পূর্ণ কৃত্রিমতা যে, রক্ত তীরের বেগে বেরিয়ে সোজা জমিনে পতিত হয়েছে, কাপড়ে লাগেনি। শাফেয়ি মতাবলম্বীদের এই ব্যাখ্যার রদ আবু দাউদের নিম্নেযুক্ত বাক্য দ্বারা হয়ে যায়,

فلما راى المهاجرى ما بالانصارى من الدماء ـ 'যখন মুহাজির ব্যক্তি আনসারির গায়ে রক্ত দেখলেন।'

রক্ত নাপাক হওয়ার ক্ষেত্রে তোমাদের যে জবাব ওজু ভঙ্গের ক্ষেত্রে আমাদেরও সেই জবাব। যাই হোক, এই জবাব তো ছিলো বাধ্যতামূলক।

টীকা- ১. সহিহ বোখারি : ১/২৯ كتاب الوضوء، باب من لم يرى الوضوء الا من مخرجين القبل والدبر

টীকা- ২. সুনানে আবু দাউদ : ১/২৬৩ باب الوضوء من الدم

০ এটির তাত্ত্বিক জবাব মূলত হজরত আব্বাছ (রা.) নামাজ ও কোরআন তিলাওয়াতের স্বাদ উপভোগে এতোটা বিভোর ছিলেন যে, হয়তো তাঁর রক্ত বের হওয়ার খবরই ছিলো না। অথচ ছিলো কিন্তু (তেলাওয়াতের) স্বাদ উপভোগের প্রবলতার কারণে নামাজ ভঙ্গ করতে পারেননি। এটা ছিলো হালের প্রবলতা ও বিভোরতার অবস্থা। যা দ্বারা কোনো ফিকহি মাসআলা উৎসারণ করা যায় না। এর সহায়তা আবু দাউদের নিম্নেযুক্ত বাক্য দ্বারা হয়,

قال ان كنت فى سورة اقرؤها فلم أحب ان اقطعها .

'আমি একটি সূরা তেলাওয়াত করছিলাম। এ সূরা তেলাওয়াত বাদ দিতে পছন্দ করিনি।'

এ ব্যতিত ওজু ভঙ্গের যেসব দলিল প্রমাণ আগে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো মৌলিক নীতিমালার মর্যাদা রাখে। এটি বিভিন্ন ঘটনার ফলে সেগুলো কোরবান করা যায় না।

০ সাহাবি ও তাবেয়িনের কোনো কোনো আছর শাফেয়িদের দ্বিতীয় প্রমাণ, এজন্য ইমাম বোখারি (র.)[১] হাসান বসরি (র.) ইবনে আবু আওফা (র.), ইবনে উমর (রা.) ও তাউস (র.) প্রমুখের আছর প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর জবাব হলো, সাহাবি ও তাবেয়িনের আছর উভয় পক্ষে রয়েছে। আল্লামা ইবনে আবু শায়বা 'মুসান্নাফে'[২] উভয় প্রকার আছর সংকলন করেছেন। যেগুলো দ্বারা বোঝা যায় যে, হজরত আবু হুরায়রা (রা.) প্রমুখ ছিলেন ওজু ভঙ্গের প্রবক্তা। অতএব, শুধু এক পক্ষের আছর দ্বারা প্রমাণ হতে পারে না। তাছাড়া ওজু না ভাঙার প্রমাণ আছরগুলোর মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ব্যাখ্যা দেওয়া যায় যে, সেগুলো প্রযোজ্য ছিলো ওজরের ক্ষেত্রে।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, হানাফিদের প্রমাণ মারফু সহিহ হাদিসগুলোর মুকাবেলা সাহাবি ও তাবেয়িনের আছর করতে পারে না।

০ শাফেয়িদের একটি প্রমাণ হলো, বোখারিতে[৩] বর্ণিত হজরত হাসান বসরি (র.)-এর বক্তব্য যে, ما زال المسلمون يصلون فى جراحاتهم (জখম নিয়ে মুসলমানগণ নামাজ পড়ে আসছেন।)

জবাব, এখানে হজরত হাসান বসরি (র.)-এর উদ্দেশ্য সে জখম যেগুলো থেকে রক্ত প্রবাহিত হতো না। যার প্রমাণ হলো, 'মুসান্নাফে ইবনে[৪] আবু শায়বা'য় সহিহ সনদে হজরত হাসান বসরি (র.) হতে বর্ণিত,

انه كان لا يرى الوضوء من الدم الا ما كان سائلا .

'তিনি প্রবাহিত রক্ত না হলে সে রক্ত বের হওয়ার ফলে ওজু করার মত পোষণ করতেন না।'

بَابُ الْوُضُوْءِ بِالنَّبِيْذِ (صـ ٢٦)

অনুচ্ছেদ- ৬৫ : নবিজ দ্বারা ওজু করা প্রসঙ্গে (মতন ২৫)

حدثنا هناد نا شريك عن ابى فزارة عن ابى زيد عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ سَأَلَنِى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَا فِىْ إِدَاوَتِكَ؟ فَقُلْتُ نَبِيْذٌ فَقَالَ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُوْرٌ قَالَ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ.

৮৮. অর্থ : হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী করিম ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার চামড়ার পাত্রে কি? আমি বললাম, নবিজ (খেজুর, কিসমিস ইত্যাদি ভিজিয়ে তৈরি শরবত)। তারপর তিনি বললেন, খেজুর পবিত্র এবং পবিত্র পানি। ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, তারপর তিনি তা দ্বারা ওজু করলেন।

টীকা- ১. ১/২৯,
টীকা- ২. ১ম খণ্ড, باب اذا سال الدم او قطر او برز ففيه الوضوء
টীকা- ৩. ১/২৯ باب من لم ير المخرجين القبل والدبر
টীকা- ৪. ১ম খণ্ড ৪ باب اذا سأل الدم او قطر او برز ففيه الوضوء

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি বর্ণিত কেবল, আবু জায়দ-আবদুল্লাহ-নবী করিম ﷺ সূত্রে। আর আবু জায়দ মুহাদ্দিসিনের নিকট অজ্ঞাত ব্যক্তি। আমরা এ হাদিসটি ব্যতিত তার অন্য আর কোনো বর্ণনা সম্পর্কে জানি না। কোনো কোনো আলেম নবিজ দ্বারা ওজুর মত পোষণ করেছেন। তন্মধ্যে রয়েছেন সুফিয়ান প্রমুখ। আর কোনো কোনো আলেম বলেছেন, নবিজ দ্বারা ওজু করা যাবে না। শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর মাজহাব এটাই।

ইমাম ইসহাক (র.) বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি এমন অবস্থার সম্মুখীন হয়, তাহলে নবিজ দ্বারা ওজু এবং তায়াম্মুম করাটা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, যিনি বলেন, নবিজ দ্বারা ওজু করা যাবে না, তার বক্তব্যটি কোরআনের অধিক নিকটবর্তী ও অধিক সামঞ্জস্যশীল। কারণ, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, তারপর (যদি) তোমরা পানি না পাও তবে তায়াম্মুম করো পবিত্র মাটি দ্বারা।'

দরসে তিরমিযী

وقد رأى بعض اهل العلم الوضوء بالنبيذ : নবিজ তিন প্রকার,

১. অপাকানো, অনেশাজাত, অপরিবর্তনীয়, অমিষ্ট, তরল। সর্বসম্মতিক্রমে এর দ্বারা ওজু বৈধ।

২. পাকানো, নেশাজাত, ঘন– যার তরলতা ও প্রবাহ নেই। এর দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে ওজু অবৈধ।

৩. মিষ্টি, তরল, অপাকানো, অনেশাজাত। এর সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে এবং বর্ণিত আছে কয়েকটি মাজহাব,

এক. ওজু জায়েজ নেই। যদি অন্য পানি পাওয়া না যায়, তাহলে তায়াম্মুম সুনির্দিষ্ট। এটা হলো, ইমামত্রয় এবং জমহুরের মাজহাব। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)ও এর প্রবক্তা। ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর এক বর্ণনা।

দুই. ওজু সুনির্ধারিত এবং তায়াম্মুম নাজায়েজ। এটা হলো সুফিয়ান সাওরির (র.) মত। ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর প্রসিদ্ধ বর্ণনাও এটাই।

তিন. ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাজহাব হলো, যদি অন্য পানি মওজুদ না থাকে, তাহলে প্রথমে এটা দ্বারা ওজু করে তারপর তায়াম্মুমও করবে এবং ইমাম আজম আবু হানিফা (র.)-এর এক বর্ণনাও এমন।

চার. ওজু ওয়াজিব, এরপর তায়াম্মুম মোস্তাহাব। এটা হলো, ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ এর মাজহাব।

'বাদায়িয়ে' আল্লামা কাসানি (র.) বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম সাহেব (র.) শেষে প্রথম বক্তব্যর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। অতএব, নবিজ দ্বারা ওজু করা যাবে না, এ ব্যাপারে ইমাম চতুষ্টয়ের ঐকমত্য হলো, হানাফিদের মধ্য থেকে ইমাম তাহাবি (র.), আল্লামা ইবনে নুজায়ম (র.) এবং কাজিখান (র.) এটাই অবলম্বন করেছেন। যদিও আল্লামা শামি (র.)-এর এতে আপত্তি রয়েছে। তিনি 'আল-বাহরুর রায়েকে'র টীকায় লিখেছেন যে, মতনের বর্ণনা মতো ফতওয়া হওয়া উচিত এবং এতে বৈধতার ফতওয়া দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী অধিকাংশ হানাফি প্রাধান্য দেন অবৈধতার বর্ণনাকে।

বিশেষতো এ কারণে যে, এর দিকে ইমাম সাহেব (র.)-এর প্রত্যাবর্তন প্রমাণিত।

এ অধ্যায়ের হাদিস,

عن عبد الله بن مسعود (رض) قال سألنى النبى صلى الله عليه وسلم ما فى اداوتك؟ قلت نبيذ فقال تمرة طيبة وماء طهور -

'হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমাকে নবী করিম ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার চামড়ার পাত্রে কি? বললাম, নবিজ। জবাবে তিনি বললেন, খেজুর পবিত্র, পানিও পবিত্র।'

হজরত সুফিয়ান সাওরি এবং ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর প্রথম বক্তব্যের দলিল। কিন্তু ইমাম তিরমিযী (র.) ও অধিকাংশ মুহাদ্দিস এটাকে অপ্রামাণ্য বলেন। কারণ, এটা নির্ভর করে আবু ইয়াজিদের ওপর, যিনি অজ্ঞাত। কোনো কোনো হানাফি হাদিসের দুর্বলতার প্রশ্ন দূর করে হাদিসটিকে প্রমাণ সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সেসব ব্যাখ্যা লৌকিকতা শূন্য নয়, বিশেষতো যখন ইমাম সাহেব (র.)-এর রুজু জমহুরের বক্তব্যের দিকে প্রমাণিত। অতএব, এগুলোর ওপর লৌকিকতাপূর্ণ জবাবের কোনো প্রয়োজন নেই। হানাফি মুহাদ্দিসিনও ইমাম তাহাবি (র.) এবং আল্লামা জায়লয়ি (র.)-এর মতো এ হাদিসের দুর্বলতা স্বীকার করেছেন।

بَابُ الْمَضْمَضَةِ مِنَ اللَّبَنِ (صـ ٢٧)

অনুচ্ছেদ- ৬৬ : দুধ পান করে কুলি করা প্রসঙ্গে (মতন ২৭)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَقَالَ اِنَّ لَهُ دَسَمًا .

৮৯. অর্থ : হজরত ইবনে আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করিম ﷺ একবার দুধ পান করলেন, তারপর পানি আনতে বললেন, তারপর তিনি কুলি করে বললেন, দুধে চর্বি আছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

সাহল ইবনে সাদ ও উম্মে সালামা থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। অনেকে আলেম দুধ পান করে কুলি করার মত পোষণ করেছেন। এটা আমাদের মতে মোস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আবার কুলি করার মত পোষণ করেন না অনেকে।'

بَابٌ فِىْ كَرَاهِيَةِ رَدِّ السَّلَامِ غَيْرَ مُتَوَضِّىءٍ (صـ ٢٧)

অনুচ্ছেদ- ৬৭ : ওজু ব্যতিত সালামের জবাব দেওয়া মাকরূহ প্রসঙ্গে (মতন ২৭)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَبُوْلُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ

৯০. অর্থ : হজরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, একবার নবী করিম ﷺ পেশাব করেছিলেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তাঁকে সালাম করলো। ফলে তিনি তার সালামের জবাব দেননি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'এ হাদিসটি حسن صحيح। সালামের জবাব দেওয়া আমাদের মতে কেবল তখন মাকরূহ যখন পেশাব-পায়খানায় রত থাকবে। কোনো কোনো আলেম এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত এটি সর্বোত্তম হাদিস। মুহাজির ইবনে কুনফুজ, আবদুল্লাহ ইবনে হানজালা, আলকামা ইবনুশ শাফওয়া, জাবের ও বারা (র.) থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস রয়েছে।

দরসে তিরমিযী

ان رجلا سلم على النبى صلى الله عليه وسلم هو يبول فلم يرد عليه : তিরমিযী (র.) এ শিরোনাম কায়েম করেছেন যে, ওজুবিহীন অবস্থায় সালামের জবাব দেওয়া মাকরূহ। কিন্তু তিনি এ অধ্যায়ে যে হাদিস নিয়েছেন সেটি পেশাবের সময় সালামের জবাব না দেওয়ার। এজন্য বাহ্যত আলোচ্য অধ্যায়ের হাদিস দ্বারা শিরোনাম প্রমাণিত নয়।

জবাব, মূলত ইমাম তিরমিযী (র.) এই শিরোনাম হজরত ইবনে উমর (রা.)-এর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা নয়; বরং হজরত মুহাজির ইবনে কুনফুজ (রা.)-এর বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ করেছেন। যার বরাত وفى الباب শিরোনামের অধীনে বিদ্যমান। হজরত মুহাজির ইবনে কুনফুজ (রা.) এর বর্ণনা নাসায়ি, আবু দাউদ, ইবনে মাজায় বর্ণিত আছে। যার শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত,

انه سلم على النبى صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه الصلام حتى توضأ فلما توضأ فرد عليه ـ [১]

'রাসূলুল্লাহ ﷺ পেশাব করছিলেন, এমন সময় তিনি তাঁকে সালাম করেছিলেন। ফলে তিনি ওজু করার পূর্বে সালামের জবাব দেননি। তার সালামের জবাব দিয়েছেন ওজু করে তারপর।'

সুতরাং এ হাদিস দ্বারা শিরোনাম প্রমাণিত হয়ে যায়, হানাফিদের মতে মল-মূত্র ত্যাগ ইত্যাদির সময় সালাম দেওয়া এবং জবাব দেওয়া উভয়টি মাকরূহ। তাছাড়া আল্লামা শামি (র.) এমন ১৭টি স্থান লিখেছেন, যেগুলোতে সালাম দেওয়া মাকরূহ। অবশ্য হানাফিদের মতে নাপাক (বে-ওজু) অবস্থায় সালাম মাকরূহ নয়। প্রথমে মাকরূহ ছিলো, পরবর্তীতে এর অনুমতি হয়ে গেছে। হজরত মুহাজির ইবনে কুনফুজ (রা.)-এর বর্ণনায় প্রিয়নবী ﷺ যে ওজু করে জবাব দিয়েছেন, এটা মোস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ কারণে সালামের জবাব দেওয়ার জন্য যদি কোনো ব্যক্তি ওজু বা তায়াম্মুমের প্রতি গুরুত্বারোপ করে তবে সেটা মুস্তাহাব।

পেশাব-পায়খানার অবস্থায় জবাব না নেওয়াতে হজরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনা,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل احيانه ـ

'রাসূলুল্লাহ ﷺ সব সময় আল্লাহর জিকির করতেন।' এর সাথে কোনো বিরোধ নেই। কেনোনা হজরত আয়েশা (রা.)-এর এই বক্তব্য হয়তো প্রযোজ্য আন্তরিক জিকিরের ক্ষেত্রে, অথবা নির্দিষ্ট সময়ের জিকিরের (اذكار متواردہ) ক্ষেত্রে।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ سُؤْرِ الْكَلْبِ (صـ ٢٧)

অনুচ্ছেদ- ৬৮ : কুকুরের উচ্ছিষ্ট প্রসঙ্গে (মতন ২৭)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم (فى ن بـ انه) قَالَ يُغْسَلُ الْاِنَاءُ اِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اُوْلٰهُنَّ اَوْ اُخْرٰى هُنَّ بِالتُّرَابِ وَاِذَا وَلَغَتْ فِيْهِ الْهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً ـ

৯১. অর্থ : হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ বলেছেন, কোনো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সেটা সাতবার ধৌত করতে হবে। প্রথমবার অথবা শেষবার মাটি দিয়ে ধুতে হবে। আর যখন তাতে বিড়াল মুখ দেয় তখন একবার ধুতে হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। এটা শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর মাজহাব।

একাধিক সূত্রে এ হাদিসটি আবু হুরায়রা (রা.)-এর সনদে নবী করিম ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে এ কথার উল্লেখ নেই যে, যখন বিড়াল তাতে মুখ দিবে তখন একবার ধৌত করবে। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

দরসে তিরমিযী

يغسل الإناء اذا ولغ فيه الكلب : ولغ শব্দটি বাবে فتح থেকে নির্গত ولوغ শব্দের অর্থ হলো, কুকুর কর্তৃক কোনো তরল জিনিসে মুখ দিয়ে জিহ্বা নড়াচড়া দেওয়া। চাই পান করুক বা না করুক। আর এর খাওয়ার জন্য لحس এবং খালি পাত্র চাটার জন্য لعق শব্দ ব্যবহৃত হয়। এখানে ولوغ দ্বারা উদ্দেশ্য সাধারণত মুখ দেওয়া। যাতে لحس এবং لعق ও অন্তর্ভুক্ত।

سبع مرات : কুকুরের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে (কুকুর মুখ দিলে) পাত্র নাপাক হয় না। অবশ্য সাতবার ধোয়ার হুকুম তা'আব্বুদি (ইবারতরূপে)। জমহুরের মতে কুকুরের ঝুটা নাপাক। যার প্রমাণ হলো, আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিস। সহিহ মুসলিম শরিফে باب حكم ولوغ الكلب এ হাদিসটি নিম্নেযুক্ত ভাষায় রয়েছে,

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولهن بالتراب ـ

'রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারও পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তা পবিত্র হয়, সাতবার ধুলে। তার মধ্যে প্রথমবার মাটি দিয়ে মাজবে।'

এতে ان يغسله শব্দটি বলছে যে, ধোয়ার হুকুম পবিত্র করার জন্য। আর পবিত্র করার হয় নাপাক জিনিসকে। সুতরাং, ইমাম মালেক (র.)-এর এ হাদিসটি বিরুদ্ধে দলিল।

০ তারপর পবিত্র করার পদ্ধতি সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে।

১. হাম্বলি এবং শাফেয়ি মতাবলম্বীদের মতে পবিত্র করার জন্য সাতবার ধোয়া ওয়াজিব। ইমাম মালেক (র.) ও তা'আব্বুদি বিষয় হিসেবে সাতবার ধোয়ার পক্ষে।

২. হজরত ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে তিনবার ধোয়া যথেষ্ট। ইমামত্রয়ের প্রমাণ আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি। এটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত এবং বিশুদ্ধ।

হানাফিদের প্রমাণ হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিস। হাফেজ ইবনে আদি (র.) এটি আল-কামেলে উল্লেখ করেছেন,

عن الحسين بن علي الكرابيسي ثنا اسحاق الازرق ثنا عبد الملك عن عطاء عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب فى اناء احدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات ـ [১]

'আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কারও পাত্রে কুকুর মুখ দেয়, তখন যেনো সেটা সে ফেলে দেয় এবং এই পাত্র অবশ্যই তিনবার ধৌত করে।'

০ শাফেয়িদের পক্ষ থেকে এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে যে, এ হাদিসটি নির্ভর করে কারাবিসির ওপর। প্রথমতো তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তি রয়েছে। কারণ, ইমাম আহমদ (র.) তাঁর সমালোচনা করেছেন। দ্বিতীয়তো এই বর্ণনাটি তিনি একা বর্ণনা করেছেন এবং নির্ভরযোগ্য রাবিদের বিরোধিতা করেছেন। কারণ, সমস্ত নির্ভরযোগ্য রাবি হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে সাতবার ধোয়ার কথা বর্ণনা করেছেন, অথচ তিনি তাদের পরিপন্থি তিন বারের বিবরণদাতা। সুতরাং তাঁর এ বর্ণনা মুনকার।

কারাবিসি হাদিসের ইমাম। ইমাম বোখারি এবং ইমাম দাউদ জাহেরির উস্তাদ। তার সম্পর্কে স্বয়ং ইমাম আহমদ (র.) বলেছেন,

له اخبار كثيرة هو حافظها ـ

টীকা- ১. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম জায়লায়ি (র.): ১/১৩১ এবং আইনি (র.) উমদাতুল কারিতে: ১/৮৭৪ মা'আরিফুস্ সুনান : ১/২২৫।

'তাঁর সূত্রে অনেক হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি সেগুলোর হাফেজ।' হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেছেন, صدوق فاضل (সত্যবাদী, জ্ঞান-গরিমার অধিকারি) (তাকরিব পৃ. ৪১)। তাঁর সম্পর্কে ইমাম আহমদ (র.) ব্যতিত আর কেউ সমালোচনা করেননি। আর তাঁর সম্পর্কে ইমাম আহমদ (র.)-এর সমালোচনার কারণ হলো, خلق قران (কোরআন 'সৃষ্ট')-এর ফিতনায় একবার তিনি বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারক শব্দ ব্যবহার করে নিজের জান বাঁচিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, এটা কোনো সমালোচনার কারণ নয়। কারণ, এমন আচরণ ইমাম বোখারি (র.) থেকেও প্রমাণিত। একবার তিনি لفظى بالقران مخلوق (কোরআন সম্পর্কে আমার বক্তব্য সৃষ্ট) বলে তিনি জান বাঁচিয়েছিলেন। (শায়খ তাকি উদ্দিন ইবনে দাকিকুল ইদ (র.)-এর সমালোচনা করেছেন, যা কেউ গ্রহণ করেননি। তাছাড়া এই ধরনের ব্যাখ্যা হজরত ইমাম শাফেয়ি (র.) থেকেও বর্ণিত আছে। আল্লামা বিন্নৌরি (র.) 'মা'আরিফে' উল্লেখ করেছেন। অতএব, শুধু এতোটুকু বিষয় কারাবিসির হাদিস রদ করার কারণ হতে পারে না। স্বয়ং 'আল-কামেলে' হাফেজ ইবনে আদি (র.) এ হাদিস বর্ণনা করার পর লিখেছেন,

لم يرفعه غير الكرابيسى لم اجد له حديثا منكرا غير هذا .

'কারাবিসি ব্যতিত অন্য কেউ এ হাদিসটি মারফু আকারে বর্ণনা করেননি। এই হাদিসটি ব্যতিত কারাবিসির অন্য কোনো মুনকার হাদিস আমি পাইনি।'

এ থেকে বোঝা গেলো, কারাবিসির হাদিসগুলো গ্রহণযোগ্য। অবশিষ্ট আছে, ইবনে আদি কর্তৃক এ হাদিস সম্পর্কে মুনকার মন্তব্য করার বিষয়টি। এটি মূলত ইনসাফ পরিপন্থি। কারণ, মুনকার সে হাদিসকে বলে যাতে কোনো জয়িফ রাবি কোনো নির্ভরযোগ্য হাদিসের বিরোধিতা করেন। যেহেতু কারাবিসি নির্ভরযোগ্য রাবি বলে প্রমাণিত, সেহেতু তাঁর হাদিসকে মুনকার বলা যায় না। হ্যাঁ, শাজ বলতে পারেন। কারণ, এখানে একজন নির্ভরযোগ্য রাবি অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রাবির বিরোধিতা করছেন। আর শাজ হাদিস গ্রহণ বা খণ্ডনের ব্যাপারে মুহাদ্দিসিনের সু-প্রসিদ্ধ মতবিরোধ রয়েছে। মুহাক্কিকিনের বক্তব্য হলো শাজ হওয়া বিশুদ্ধতার পরিপন্থি নয়। কারণ, এর রাবিও নির্ভরযোগ্য। 'ফতহুল মুলহিমে'র ভূমিকায় আল্লামা উসমানি (র.) হাফেজ সাখাবি র.) এবং হাফেজ ইবনে হাজার (র.)-এর বক্তব্য দ্বারা তা প্রমাণ করেছেন। তার পূর্ণ আলোচনা হতে সিদ্ধান্তমূলক কথা এই বের হয় যে, শাজ হওয়া বিশুদ্ধতার পরিপন্থি নয়। আলবৎ এর কারণে বর্ণনা সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করতে হবে যদি অন্য নিদর্শনাদি এর বিশুদ্ধতা বোঝায় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে। অন্যথায় তা রদ করে দেওয়া হবে। কারাবিসির এই বর্ণনায়র বিশুদ্ধতার বিভিন্ন আলামত আছে।

১. হজরত 'আতা ইবনে ইয়াসার (র.) সূত্রে সুনানে দারাকুতনিতে হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর একটি মওকুফ আছর রয়েছে,

اذا ولغ الكلب فى الإناء فاهرقه ثم اغسله ثلاث مرات .

'যখন কোনো পাত্রে কুকুর মুখ দেয় তখন সেটা ফেলে দাও। তারপর তা তিনবার ধৌত করো।'

প্রকাশ থাকে যে, হজরত আবু হুরায়রা (রা.) নিজেই সাতবারের হাদিসের রাবি। অতএব, তাঁর এই ফতওয়া প্রমাণ করছে যে, সাতবার হুকুম ওয়াজিব বোঝানোর জন্য নয়।

প্রশ্ন : ইমাম দারাকুতনি (র.) প্রথমতো এর ওপর প্রশ্ন করেছেন যে, বর্ণনাটি আব্দুল মালেকের একার বিবরণ।

জবাব : এই প্রশ্ন মোটেও ভ্রূক্ষেপযোগ্য নয়। কারণ, আব্দুল মালেক সর্বসম্মতিক্রমে সেকাহ। আর নির্ভরযোগ্য রাবির একাকিত্ব ক্ষতিকর নয়।

প্রশ্ন : ইমাম দারাকুতনি (র.) দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন যে, হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর এই আছরের মূল পাঠে ইজতেরাব রয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় এটা তাঁর বক্তব্য ছিলো। (যেমন ওপরযুক্ত বর্ণনায় রয়েছে) আর কোনোটিতে তাঁর আমল। যেমন দারাকুতনিতে একটি বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে অনুরূপ,

عن ابى هريرة (رضـ) قال انه كان اذا ولغ الكلب فى الإناء اهراقه فغسل ثلاث مرات .

'কোনো পাত্রে যখন কুকুর মুখ দিতো, আবু হুরায়রা (রা.) সেটা ফেলে দিতেন। তারপর পাত্রটি তিনবার ধৌত করতেন।'

জবাব : এটা কোনো ইজতেরাব নয়; বরং উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব যে, তিনি তিন বার ধোয়ার প্রতিও আমল করেছেন এবং বৈধতার ফতওয়াও দিয়েছেন।

প্রশ্ন : শাফেয়িদের পক্ষ থেকে একটি প্রশ্ন এটাও করা হয় যে, العبرة بما رأى لا بما روى তথা বিবরণ ধর্তব্য, রায় ধর্তব্য নয়। এই মূলনীতির আলোকে হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিস ধর্তব্য হবে তাঁর ফতওয়া নয়।

জবাব : তাঁর ফতওয়া কারাবিসির বর্ণনা মুতাবেক। এজন্য এখানে এই মূলনীতিটি সংশ্লিষ্ট না।

প্রশ্ন : চতুর্থ প্রশ্ন হাফেজ ইবনে হাজার (র.) নিজেই বলেছেন যে, দারাকুতনিতে হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর দ্বিতীয় আরেকটি ফতওয়া সাতবার ধোয়ারও আছে।

জবাব : হলো, তিনবার ধোয়ার ফতওয়া ওয়াজিবের ক্ষেত্রে, আর সাতবার ধোয়ার ফতওয়া[১] মোস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং উভয়ের মাঝে কোনো বৈপরীত্য থাকলো না।

২. সুনানে দারাকুতনিতে আছে,

ثنا جعفر بن محمد بن نصير نا الحسين بن على المعمرى نا عبد للوهاب بن ضحاك نا اسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن ابى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة (رضـ) عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الكلب يلغ فى الإناء انه يغسل ثلاثا او خمسا او سبعا .

-(دار قطنى جـ١ صـ٥٦٥ رقم ١٣ .

'নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণিত যে, কোনো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সেটা তিনবার অথবা পাঁচবার অথবা সাতবার ধুবে।'

যদিও এই বর্ণনাটি জয়িফ; কিন্তু কারবিসির ওপরযুক্ত বর্ণনার সহায়তার জন্য যথেষ্ট।

৩. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে (১/৭৯) হজরত 'আতা ইবনে ইয়াসার (র.)-এর ফতওয়া বিদ্যমান রয়েছে। যাতে তিনি তিনবারেরও অনুমতি দিয়েছেন।

عن ابن جريج قال قلت لعطاء كم يغسل الإناء الذى يلغ فيه الكلب؟ قال كل ذلك سمعت سبعا وخمسا وثلاث مرات .

'হজরত ইবনে জুরাইজ বলেন, আমি আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, যে পাত্রে কুকুর মুখ দিয়েছে সেটি ধুতে হবে কয়বার? জবাবে তিনি বললেন, সাতবার, পাঁচবার এবং তিনবার সবকটিই শুনেছি আমি।'

প্রকাশ থাকে যে, হজরত 'আতা (র.) সাতবারের হাদিসেরও রাবি। যদি সাতবারের হুকুম ওয়াজিবের জন্য হতো, তাহলে এর খেলাফের অনুমতি তিনি কখনো দিতেন না।[৩]

৪. সাতবারের বর্ণনাগুলো যদি ওয়াজিবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরা হয়, তাহলে সূত্রগতভাবে বিশুদ্ধ কারাবিসির বর্ণনাটি সম্পূর্ণ বর্জন করতে হয়। আর যদি কারাবিসির হাদিস অবলম্বন করা হয় তাহলে মোস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরে সাতবারের বর্ণনাগুলোর ওপরও আমল হতে পারে। বস্তুত 'বাহরুর্ রায়েক' গ্রন্থকারের বক্তব্য মতে ইমাম আবু হানিফা (র.) ও ছিলেন সাতবার ধোয়া মোস্তাহাবের পক্ষে।

টীকা- ১ মাহামিলি-হাজ্জাজ ইবনে শাইর-আরেম-হাম্মাদ ইবনে জায়দ-আইয়ুব-মুহাম্মদ সূত্রে বর্ণিত- পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সে সম্পর্কে আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, পাত্রের জিনিস ফেলে দিবে এবং সাতবার ধৌত করবে। হাদিসটি সহিহ মাওকুফ। -সুনানে দারাকুতনি : ১/২৪ -সংকলক।

টীকা- ২. ফারুকি প্রেসের কপিতে ১ম খণ্ড : ২৪।

টীকা- ৩. ইমাম জুহরির আছর দ্বারাও কারাবিসির সহায়তা হয়- عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهرى عن الكلب يلغ فى الإناء قال يغسل ثلاث مرات . مصنف عبد الرزاق جـ١ صـ٩٧ باب الكلب فى الإناء رقم ٣٣٦ . مرتب عفى عنه .

৫. যদি রহিত হওয়ার সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য করা হয়, তাহলে কারাবিসির বর্ণনা প্রধান। কারণ, কুকুর সম্পর্কে শরিয়তের বিধিবিধান ক্রমশ কঠোর থেকে সহজের দিকে এসেছে। যেমন, সহিহ মুসলিমে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা.)-এর বর্ণনায় আছে,

قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص فى كلب الصيد وكلب الغنم وقال اذا ولغ الكلب فى الإناء فاغسلوه سبع مرات و عفروه الثامنة بالتراب - (مسلم جـ١ باب حكم ولوغ الكلب، صـ١٣٧)

'তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন কুকুর হত্যার। তারপর বলেছেন, তাদের এবং কুকুরের কি অবস্থা? তারপর তিনি শিকারি কুকুর এবং বকরির রাখালরূপে কুকুর রাখার অনুমতি দিয়েছেন এবং বলেছেন, যখন কোনো পাত্রে কুকুর মুখ দেয়, তখন তোমরা সেটা সাতবার ধৌত করো, অষ্টমবারে মাজো মাটি দিয়ে।'

এই বর্ণনার পূর্বাপর বলছে যে, সাতবার ধোয়ার হুকুমও কুকুরের ব্যাপারে কঠোরতার ধারাবাহিকতার একটি অঙ্গ। আর এ বিষয়টি যুক্তিযুক্ত যে, শুরুতে সাতবারের হুকুম ওয়াজিবের জন্য ছিলো। আর পরবর্তিতে শুধু মোস্তাহাব অবশিষ্ট রয়েছে। যেমন এর সহায়তা হয় বর্ণনাগুলো দ্বারা।

৬. কারাবিসির বর্ণনায়র সহায়তা কিয়াস দ্বারাও হয় যে, সাতবারের হুকুম ওয়াজিব নয়। কারণ, যেসব নাপাক গলিজা এবং সেগুলোর অপবিত্রতা অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণিত, যেগুলোতে ময়লা এবং ঘৃণা স্বভাব বেশি। যেমন, মল-মূত্র এমনকি স্বয়ং কুকুরের মল-মূত্র তিনবার ধৌত করলে পবিত্র হয়ে যায়। সুতরাং কুকুরের ঝুটা যেটি গলিজা নয়, অকাট্যও নয় এবং মল-মূত্র অপেক্ষা অধিক ঘৃণিতও নয়, তাতে সাতবার ধোয়ার হুকুম যুক্তিযুক্ত কিভাবে হতে পারে? অতএব, স্পষ্ট বিষয় হলো এ হুকুম মোস্তাহাব। যেহেতু কুকুরের লালা অধিক বিষাক্ত হয়ে থাকে এ থেকে, সুনিশ্চিতরূপে বাঁচানোর লক্ষ্যে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সাতবার ধোয়ার জন্য। এজন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে মাটি দিয়ে মাজাও মোস্তাহাব।

৭. সাতবারের হাদিসগুলোতে এদিকে লক্ষ্য করলে বিরাট মতপার্থক্য আছে যে, অনেক বর্ণনায় أولى هن بالتراب [১] (প্রথমবার মাটি ব্যবহৃত হবে)। আর তিরমিযীর আলোচ্য বর্ণনার শব্দ হলো- أولى هن واخرهن بالتراب (প্রথমবার ও শেষবার মাটি দিয়ে মাজো।) কোনো কোনো বর্ণনার[২] السابعة بالتراب (সপ্তমবার মাটি দিয়ে মাজ) আর কোনোটিতে[৩] والثامنة عفروه فى التراب (অষ্টমবার মাটি দিয়ে মাজ) এই শেষ বাক্যটিতে أو হরফটিকে অনেকে সন্দেহের জন্য প্রযোজ্য বলেছেন। আর অনেকে বিভিন্ন বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে প্রকরণের জন্য প্রযোজ্য বলেছেন। মোটকথা, বর্ণনার শব্দগুলোর মাঝে পার্থক্যের কারণে সামঞ্জস্য বিধান জরুরি। আর ওয়াজিবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরলে সামঞ্জস্য বিধান লৌকিকতাশূন্য হয় না। কিন্তু মোস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরলে এগুলোতে বিনা লৌকিকতায় সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয় যে, এগুলোর প্রতিটি পদ্ধতিই বৈধ।

এসব নিদর্শনের ভিত্তিতে কারাবিসির বর্ণনা শাজ হওয়া সত্ত্বেও প্রধান হয়ে যায়।

টীকা- ১. সুনানে দারাকুতনি : ১/২৪, ছাপা ফারূকি প্রেস, দিল্লী, باب ولوغ فى الإنا

টীকা- ২. সূত্র ঐ,

টীকা- ৩. সূত্র ঐ।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ سُؤْرِ الْهِرَّةِ (صـ ٢٧)

অনুচ্ছেদ- ৬৯ : বিড়ালের উচ্ছিষ্ট প্রসঙ্গে (মতন ২৭)

عَنْ كَبْشَةَ ابْنَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ (رض) دَخَلَ عَلَيْهِ قُلْتُ فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوْأً قَالَتْ فَجَائَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ فَاَصْغٰى لَهَا الْاِنَاءَ حَتّٰى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَأٰنِيْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ اَتَعْجَبِيْنَ يَا ابْنَةَ اَخِيْ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله وسلم قَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ اِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ اَوِ الطَّوَّافَاتِ ـ

৯২. অর্থ : হজরত কাবশা বিনতে কা'ব ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি ছিলেন আবু কাতাদার পুত্রবধূ। একবার আবু কাতাদা তাঁর নিকট প্রবেশ করলেন। তিনি বলেন, তারপর আমি তাঁকে ওজুর পানি ঢেলে দিলাম। তিনি বলেন, তারপর একটি বিড়াল এসে (তা থেকে) পান করতে লাগলো। আবু কাতাদা পাত্রটি বিড়ালের জন্য কাত করে ধরলেন। ফলে বিড়ালটি পানি পান করলো। কাবশা বলেন, আবু কাতাদা আমাকে দেখলেন আমি তাঁর দিকে তাকাচ্ছি। ফলে তিনি বললেন, হে ভাতিজি! তুমি কি বিস্ময়বোধ করছো? বললাম, হ্যাঁ, তখন তিনি বললেন, রাসূল (স.) বলেছেন, বিড়াল অপবিত্র নয়। এটাতো তোমাদের আশেপাশে বিচরণকারি কিংবা বিচরণকারিণী।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আয়েশা ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র,) বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। এটা সাহাবা তাবেয়িন ও তৎপরবর্তী মনীষী যেমন শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক-এর মধ্যে অধিকাংশ আলেমের বক্তব্য। তাঁরা বিড়ালের উচ্ছিষ্টে কোনো অসুবিধা মনে করেন না (নাপাক নয়)।

এ অনুচ্ছেদে এ হাদিসটি সর্বোত্তম। ইমাম মালেক (র.) এ হাদিসটি ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু ত্বালহা থেকে উত্তমরূপে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালেক (র.) অপেক্ষা পূর্ণাঙ্গরূপে এটি আর কেউ বর্ণনা করেননি।'

দরসে তিরমিযী

انها ليست بنجس : ১. ইমাম আওজায়ি (র.)-এর মতে বিড়ালের ঝুটা নাপাক।

২. ইমামত্রয় এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে বিনা মাকরূহ পবিত্র।

৩. ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকটে মাকরূহ। তারপর ইমাম তাহাবি (র.) মাকরূহ তাহরিমি বলেন, আর ইমাম কারখি মাকরূহে তানজিহি। অধিকাংশ হানাফি কারখির বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং ফতওয়া দিয়েছেন মাকরূহে তানজিহি বলে।

ইমাম আওজায়ি (র.)-এর দলিল মুসনাদে আহমদ ইত্যাদি বর্ণিত হওরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিস,

قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار فشق ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله؟ تأتي دار فلان ولا يأتي دارنا فقال النبى صلى الله عليه وسلم لان فى داركم كلبا قالوا فان فى دارهم سنورا فقال النبى صلى الله عليه وسلم السنور سبع ـ

'তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসারি গোত্রের বাড়িতে আসতেন। অথচ তাদের পার্শ্বেই আরেকটি বাড়ি ছিলো। (সেখানে যেতেন না।) ফলে তাঁদের কাছে এ জিনিসটি ভারি মনে হলো। তাঁরা বললেন, হে

রাসূলুল্লাহ! অমুকের বাড়িতে আপনি তাশরিফ আনেন। কিন্তু আমাদের বাড়িতে আপনি তাশরিফ আনয়ন করেন না? জবাবে নবী করিম ﷺ বললেন, এর কারণ, তোমাদের বাড়িতে একটি কুকুর আছে। জবাবে তারা বললো, তাদের বাড়িতে তো একটি বিড়াল আছে। এ শোনে নবী করিম ﷺ বললেন, বিড়াল একটি হিংস্র প্রাণী।'

এই হাদিসের শেষ বাক্য السنور سبع (বিড়াল একটি হিংস্র প্রাণী) ইমাম আওজায়ির প্রমাণ। এই বাক্যে বিড়ালকে হিংস্র সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর হিংস্র জন্তুর ঝুটা নাপাক হয়ে থাকে। কিন্তু হাফেজ জামালুদ্দিন জায়লায়ি (র.) বলেছেন যে, এ হাদিসটি জয়িফ। তাছাড়া 'মাজমাউজ জাওয়ায়িদ' باب فى السنور والكلب جـ١ صـ١٨٦-١٨٧ তে আল্লামা হায়সামি (র.) এ হাদিসটি উল্লেখ করে বলেন, وفيه عيسى بن المسيب وهو ضعيف অর্থাৎ, এ হাদিসের সনদে ঈসা ইবনে মুসাইয়িব নামক একজন রাবি রয়েছেন, তিনি জয়িফ। তাছাড়া যদি এই প্রমাণ স্বীকার করে নেওয়া হয়, তবুও বিড়াল ঘরে ঘোরাফেরা করা এবং উমুমে বালওয়ার কারণে ব্যতিক্রম থাকবে হিংস্র প্রাণীর হুকুম থেকে।

আলোচ্য অধ্যায়ে বর্ণিত হজরত আবু কাতাদা (রা.)-এর হাদিস জমহুরের প্রমাণ। তাছাড়া আবু দাউদ-এর একটি বর্ণনাও তাদের প্রমাণ। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে নিম্নেযুক্ত,

حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه ان مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة (رضـ) فوجدتها تصلى فأشارت إلى ان ضعيها فجائت هرة فاكلت منها فلما انصرفت اكلت من حيث أكلت الهرة فقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هى من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضآ بفضله [1] - (ابو داود جـ١ باب سورة الهرة)

'সালেহের মা বর্ণনা করেন যে, তাঁর মুনিবা তাকে হজরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন গোশত ও গোশতের তৈরি খাবার সহকারে। আমি গিয়ে তাঁকে দেখতে পেলাম, তিনি নামাজ আদায় করছেন। তিনি আমাকে ইঙ্গিত করলেন, এটা রেখে দাও। তারপর একটি বিড়াল এসে তা থেকে কিছু খেয়ে ফেললো। তিনি যখন নামাজ থেকে ফিরলেন, তখন যেদিক থেকে বিড়াল খেয়েছে সেদিক থেকে তিনিও খেলেন। তারপর বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, বিড়াল নাপাক নয়। এটি তো তোমাদের মাঝে বিচরণকারি। আমি রাসূল ﷺ কে দেখেছি, তিনি ওজু করছেন বিড়ালের উচ্ছিষ্ট দিয়ে।'

০ ইমাম আবু হানিফা (র)-এর দলিল 'শরহে মা'আনিল আছারে' বিড়ালের ঝুটা অনুচ্ছেদে ইমাম তাহাবি (র.) উল্লেখ করেছেন,

ابو بكرة حدثنا قال ثنا ابو عاصم عن قرة بن خالد قال ثنا محمد بن سيرين عن ابى هريرة (رضـ) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال طهور الإناء اذا ولغ فيه الهرة ان يغسل مرة او مرتين (قرة شك) وهذا حديث متصل الاسناد -

টীকা- ১. উম্মে সালামা (রা.) থেকে মুসাদ্দাদ তাঁর মুসনাদে সনদ ও বরাত সহকারে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁকে একটি প্লেট হাদিয়া দেওয়া হয়েছিলো, তাতে ছিলো গোশত ও রুটি। তিনি নামাজের জন্য দাঁড়ালেন। আমরাও নামাজের জন্য দাঁড়ালাম। এমতাবস্থায় খাবারের দিকে একটি বিড়াল এগিয়ে এলো। তারপর তা থেকে কিছু খেলো। এমনকি আমরা নামাজের সালাম ফিরালাম। উম্মে সালামা (রা.) সে প্লেটটি নিয়ে ঘুরিয়ে এনে যেখান থেকে বিড়ালটি খেয়েছে সেদিক থেকে তিনি খেলেন। –আল মাতালিবুল আলিয়া, ইবনে হাজার : ১/১১, হাদিস নং ১৯, রুকাইন ইবনুর রবি' তার ফুফু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হাসান ইবনে আলি (রা.) বলেছেন, বিড়ালের ঝুটায় কোনো অসুবিধা নেই। আবু সাইদ আল-জাবেরি (র.) থেকে বর্ণিত আছে, হজরত আলি (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে, পাত্র থেকে যদি বিড়াল পান করে (তবে কি করবে?) জবাবে তিনি বললেন, বিড়ালের ঝুটাতে কোনো অসুবিধা নেই। ঐ, হাদিস নং ২০-২১।

'হজরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী করিম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, যখন বিড়াল কোনো পাত্রে মুখ দেয়, তার পবিত্রতা হলো, সেটাকে একবার অথবা দুইবার ধোয়া।'

প্রশ্ন : এর ওপর প্রশ্ন করা হয়েছে, এই হাদিসটি হিশাম ইবনে হাসসান মুহাম্মদ ইবনে সিরিন থেকে আবু হুরায়রা (রা.)-এর ওপর মওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন। অতএব, এ হাদিসে মওকুফ এবং মারফু হিসেবে ইজতেরাব সৃষ্টি হয়ে গেছে।

জবাব : এর জবাব ইমাম তাহাবি (র.) এই দিয়েছেন যে, মুহাম্মদ ইবনে সিরিনের অভ্যাস হলো, তিনি হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর মারফু হাদিস মাওকফরূপে বর্ণনা করেন। এর প্রমাণ ইমাম তাহাবি (র.) এই বর্ণনা করেছেন,

حدثنا ابراهيم بن أبى داود قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروى قال ثنا اسمعيل بن ابراهيم عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين انه كان اذا حدث عن أبى هريرة (رض) فقيل له عن النبى صلى الله عليه وسلم؟ فقال كل حديث أبى هريرة (رض) عن النبى صلى الله عليه وسلم [১] .

যখন আবু হুরায়রা (রা.) থেকে মুহাম্মদ ইবনে সিরিন হাদিস বর্ণনা করতেন, তারপর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হতো যে, এটি কি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণিত? তখন তিনি বলতেন, আবু হুরায়রা (রা.)-এর সব হাদিসই নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণিত।'

এ থেকে বোঝা গেলো, মুহাম্মদ ইবনে সিরিন হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে যা কিছু বর্ণনা করেন, সেগুলো মারফু হয়ে থাকে। চাই তিনি মারফু হওয়ার কথা স্পষ্ট ভাষায় বলুন অথবা নাই বলুন। সুতরাং অবসান ঘটলো এই ইজতেরাবের।

ইমাম তাহাবি (র.) এমনিভাবে হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর এই আছরও বর্ণনা করেছেন,

يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب [২]

'বিড়াল মুখ দিলে পাত্র এমনভাবেই ধুতে হবে যেমনভাবে ধুতে হয় কুকুর মুখ দিলে।'

এমনভাবে ইমাম তাহাবি (র.) 'শরহে মা'আনিল আছারে' ইবনে উমর (রা.)-এর আছরও বর্ণনা করেছেন,

حدثنا ابن عمر (رض) لا توضوا من سور الحماء ولا الكلب ولا السنور

'ইবনে উমর (রা.) আমাদেরকে হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, তোমরা গাধা, কুকুর ও বিড়ালের উচ্ছিষ্ট দ্বারা ওজু করো না।'

০ জমহুরের প্রমাণ হাদিসগুলোর বিশুদ্ধ জবাব হলো, মাকরূহে তানজিহিও বৈধতার একটি অংশ। অতএব, এ সব বর্ণনা বৈধতার বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর তাহাবির বর্ণনা প্রযোজ্য মাকরূহের ওপর। এর প্রমাণ হলো, স্বয়ং আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে প্রিয়নবী ﷺ অপবিত্র না হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করেছেন ঘরে ঘোরাফেরা করা। শায়খ ইবনে হুমাম (র.) বলেন, এর উদ্দেশ্য হলো, বিড়ালের ঝুটা সত্তাগতভাবে নাপাক। কিন্তু উমুমে বালওয়ার (গণআপদ বা ব্যাপক লিপ্ততা) কারণে এর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং মাকরূহে তানজিহি হওয়ার প্রমাণ এই কারণটি।

وقد جود مالك هذا الحديث... الخ : অনেকে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটির ওপর প্রশ্ন করেছেন যে, হুমায়দা এবং কাবশা উভয়েই অজ্ঞাত। কিন্তু সত্য কথা হলো, এই প্রশ্নটি ঠিক নয়। হাফেজ ইবনে হাব্বান (র.) উভয়কে নির্ভরযোগ্য রাবিদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 'আত্-তালখিসুল হাবিরে' হাফেজ ইবনে হাজার (র.) তাঁর আরও কয়েকটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া এ হাদিসটি 'মুয়াত্তায়'[৪] ইমাম মালেক (র.) বর্ণনা করেছেন, যা সত্তাগতভাবে হাদিসের বিশুদ্ধতার দলিল।

টীকা- ১. তাহাবি : ১/১১ باب سور الهرة টীকা. ২. সূত্র ঐ. টীকা. ৩. সূত্র ঐ. টীকা. ৪. পৃষ্ঠা-১৬, الطهور للوضوء

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ (ص ـ ٢٧)

অনুচ্ছেদ- ৭০ : মোজার ওপর মাসেহ করা প্রসঙ্গে (মতন ২৭)

حدثنا هناد نا وكيع عن الاعمش عن ابراهيم عن همام بن الحارث قال بال جرير بن عبد الله ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيْلَ لَهُ اَتَفْعَلُ هٰذَا؟ قَالَ وَمَا يَمْنَعُنِىْ؟ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ قَالَ وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيْثُ جَرِيْرٍ لِاَنَّ اِسْلَامَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ

৯৩. অর্থ : হজরত হাম্মাম ইবনে হারেস বলেছেন, জারির ইবনে আবদুল্লাহ একবার পেশাব করে তারপর ওজু করলেন এবং তাঁর চামড়ার মোজাদ্বয়ের ওপর মাসেহ করলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি এটা করেন? জবাবে তিনি বলেন, আমার সামনে (এটা করতে) প্রতিবন্ধক কিসের? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এটা (মোজার ওপর মাসেহ) করতে দেখেছি। বর্ণনাকারি বলেন, তাদেরকে জারির (রা.)-এর হাদিস বিস্ময়াভিভূত করত। কেনোনা তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সূরা মায়েদা অবতীর্ণ হওয়ার পর।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

উমর, আলি, হুজায়ফা মুগিরা, বিলাল, সা'দ আবু আইয়ুব, সালমান, বুরায়দা, আমর ইবনে উমাইয়া, আনাস সাহল ইবনে সা'দ ইয়া'লা ইবনে মুররা, উবায়দা ইবনে সামেত, উসামা ইবনে শারিক, আবু উমামা, জাবের ও উসামা ইবনে জায়দ (রা.) থেকে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, জারিরের হাদিসটি حسن صحيح।

وَيُرْوٰى عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ رَأَيْتُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقُلْتُ لَهُ فِىْ ذٰلِكَ؟ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقُلْتُ لَهُ اَقَبْلَ الْمَائِدَةِ اَمْ بَعْدَ الْمَائِدَةِ؟ فَقَالَ مَا اَسْلَمْتُ اِلَّا بَعْدَ الْمَائِدَةِ حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ زِيَادٍ التِّرْمِذِىُّ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ جَرِيْرٍ (رض).

৯৪. অর্থ : শাহ্র ইবনে হাওশাব হতে বর্ণনা করা হয়, তিনি বলেছেন, আমি জারির ইবনে আবদুল্লাহকে দেখেছি, তিনি ওজু করেছেন এবং তাঁর মোজাদ্বয়ের ওপর মাসেহ করেছেন। এ সম্পর্কে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি ওজু করেছেন এবং তাঁর মোজাদ্বয়ের ওপর মাসেহ করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম এটা কি সূরা মায়েদা নাযেল হওয়ার পূর্বে, না পরে? জবাবে তিনি বললেন, আমি তো সূরা মায়িদা অবতীর্ণ হওয়ার পরেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমাদেরকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন কুতায়বা। তিনি (তিরমিযী) বলেন, আমাদেরকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেন খালেদ ইবনে জিয়াদ তিরমিযী মুকাতিল ইবনে হাইয়ান হতে, তিনি শাহর ইবনে হাওশাব হতে, তিনি জারির থেকে। তিনি (তিরমিযী) আরও বলেছেন, বাকিয়্যা এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবরাহিম ইবনে আদহাম-মুকাতিল ইবনে হাইয়ান-শাহর ইবনে হাওশাব-জারির সূত্রে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এ হাদিসটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ্য। কেনোনা, যারা মোজাদ্বয়ের ওপর মাসেহকে অস্বীকার করেছেন, তাদের অনেকে এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, মোজার ওপর নবী করিম ﷺ-এর মাসেহ ছিলো সূরা মায়েদা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে। আর জারির তাঁর হাদিসে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি নবী করিম ﷺ-কে মোজাদ্বয়ের ওপর মাসেহ করতে

দরসে তিরমিযী

وكان يعجبهم حديث جرير : অর্থাৎ, অনেক সাহাবি থেকে যদিও মোজার ওপর মাসেহ বর্ণিত। কিন্তু এসব বর্ণনার বিপরীতে ওলামায়ে কেরাম জারির (রা.)-এর বর্ণনাটিকে এজন্য গুরুত্ব দিতেন যে, হজরত জারির (রা.) সূরা মায়িদায় ওজুর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যার অর্থ হলো, তিনি হজরত রাসূলে আকরাম ﷺ ওজুর আয়াত নাজিল হওয়ার পর মোজার ওপর মাসেহ করতে দেখেছিলেন। সুতরাং, এর দ্বারা বাতিলপন্থী তথা রাফেজি প্রমুখের মত খণ্ডন হয়ে যায়। যারা মোজার ওপর মাসেহের অনুমতিকে ওযুর আয়াত দ্বারা রহিত সাব্যস্ত করে। মোটকথা, মোজার ওপর মাসেহের বৈধতা বিষয় সর্বসম্মত।[১]

অনেকে অবৈধতার সম্বোধন করেছেন ইমাম মালেক (র.)-এর দিকে; কিন্তু এটা ভ্রান্ত। আল্লামা বাজি মালেকি (র.) এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন। মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা ইত্যাদিতে হজরত হাসান বসরি (র.)-এর বক্তব্য বর্ণিত আছে,

قال حدثني سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح على الخفين... الخ .

'আমাকে রাসূল ﷺ-এর সত্তর জন সাহাবি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মাসেহ করতেন মোজার ওপর।"[২]

আল্লামা আইনি (র.) বলেন ৮০ জনের অধিক সাহাবি মোজার ওপর মাসেহ বর্ণনা করেন। এজন্যই ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর বক্তব্য প্রসিদ্ধ আছে যে,

ما قلت بالمسح على الخفين حتى جائني مثل ضوء النهار

অর্থাৎ, আমার নিকট দিবালোকের মতো প্রতিভাত হওয়ার পূর্বে আমি মোজার ওপর মাসেহের প্রবক্তা হইনি। এ মোজার ওপর মাসেহের প্রবক্তা হওয়া আহলে সুন্নাতের একটি নিদর্শন; বরং এককালে তো এটা আহলে সুন্নাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হয়ে গিয়েছিলো। এজন্যই ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর বক্তব্য রয়েছে,

نفضل الشيخين ونحب الختنين ونرى المسح على الخفين

তথা আমরা আবু বকর, উমর (রা.)-কে শ্রেষ্ঠত্ব দান করি, রাসূল ﷺ-এর দুই জামাতাকে মহব্বত করি এবং মোজার ওপর মাসেহের আকিদা পোষণ করি।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ وَالْمُقِيْمِ (صـ ٢٧)

অনুচ্ছেদ- ৭১ : মুসাফির ও মুকিমের জন্য মোজার ওপর মাসেহ করা প্রসঙ্গে (মতন ২৭)

عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ لِلْمُسَافِرِ ثَلٰثٌ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَاَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِيُّ اسْمُهٗ عَبْدُ بْنُ عَبْدٍ .

৯৫. অর্থ : হজরত খুজায়মা ইবনে সাবেত (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার তিনি মোজার ওপর মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হয়েছিলেন। জবাবে তিনি বললেন, মুসাফিরের জন্য তিনদিন ও মুকিমের জন্য একদিন।

টীকা- ১. আবুল হাসান কারখি (র.) বলেন, যে মোজার ওপর মাসেহের ওপর আকিদা পোষণ করে না, আমি তার কুফরির আশঙ্কা করি। 'বাহরুর রায়িকে' (১/১৬৫) এটি সরাসরি আবু হানিফা (র.)-এর বক্তব্য বলে বর্ণিত আছে। –মা'আরিফুস্ সুনান : ১/৩৩২

টীকা- ২. মা'আরিফুস্ সুনান : ১/৩৩১।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু আবদুল্লাহ জাদালির নাম, আবদ্ ইবনে আবদ্।

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

আলি, আবু বকর, আবু হুরায়রা, সাফওয়ান ইবনে আস্‌সাল, আউফ ইবনে মালেক, ইবনে উমর এবং জারির (রা.) থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم .

৯৬. অর্থ : সাফওয়ান ইবনে আস্‌সাল (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিতেন আমরা যখন মুসাফির হতাম তখন যেনো গোসল ফরজ হওয়া ব্যতিত আমাদের মোজাগুলো তিনদিন তিন রাত পর্যন্ত না খুলি। তবে পেশাব-পায়খানা এবং ঘুমের জন্য ভিন্ন কথা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'এ হাদিসটি حسن صحيح। হাকাম ইবনে উতাইবা ও হাম্মাদ ইবরাহিম নাখয়ি থেকে, তিনি আবু আবদুল্লাহ জাদালি থেকে, তিনি খুজায়মা ইবনে সাবেত থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন এটি সহিহ নয়।'

হজরত আলি ইবনুল মাদিনি বলেছেন, ইয়াহইয়া বলেছেন, শো'বা বলেছেন, ইবরাহিম নাখয়ি আবু আবদুল্লাহ জাদালি থেকে মাসেহের হাদিস শুনেননি।

মানসুর থেকে জায়িদা বলেন যে, আমরা ইবরাহিম তাইমির হুজরায় ছিলাম। আমাদের সাথে ছিলেন ইবরাহিম নাখয়ি। তারপর আমর ইবনে মায়মুন-আবু আবদুল্লাহ জাদালি-খুজায়মা ইবনে সাবেত-নবী করিম (সা.) সূত্রে ইবরাহিম তাইমি আমাদেরকে মোজার ওপর মাসেহ সম্পর্কে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মদ বলেন, 'এ অনুচ্ছেদে সর্বোত্তম হলো সাফওয়ান ইবনে আস্‌সাল (রা.)-এর হাদিস।

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'এটা হলো, সাহাবি ও তাবেয়িন, ওলামায়ে কেরাম ও তৎপরবর্তী ফুকাহায়ে কেরাম। যেমন, সুফিয়ান সাওরি, ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর বক্তব্য। তারা বলেছেন, মুকিম একদিন একরাত মাসেহ করবে, আর মুসাফির করবে তিন দিন তিন রাত। কোনো কোনো আলেম বর্ণনা করেছেন যে, তারা মোজার ওপর মাসেহ সম্পর্কে কোনো সময় নির্ধারণ করেননি। এটা হলো, মালেক ইবনে আনাসের মাজহাব। তবে সময় নির্ধারণ করা আসাহ।'

للمسافر ثلث وللمقيم يوم : এ ব্যাপারে এ হাদিসটি জমহুরের পক্ষে সহিহ এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, মোজার ওপর মাসেহের মেয়াদ মুকিমের জন্য একদিন একরাত, আর মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত। এ অর্থের আরও অনেক হাদিস বর্ণিত আছে। বস্তুত মাসেহের সময় নির্ধারণের এই অর্থ মশহুরের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। হজরত আলি (রা.), আবু বকরা (রা.), আবু হুরায়রা (রা.), সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা.), ইবনে উমর (রা.), আউফ ইবনে মালেক (রা.) প্রমুখ থেকে এ বিষয়ে অনেক হাদিস রয়েছে।

দরসে তিরমিযী

ইমাম মালেক এবং লাইছ ইবনে সা'দ (র.)-এর মাজহাব, তাদের মতে মাসেহের কোনো সুনির্দিষ্ট সময় নেই; বরং যতোক্ষণ পর্যন্ত মোজা পরিহিত থাকবে ততোক্ষণ পর্যন্ত এর ওপর মাসেহ করতে পারবে। ইমাম মালেক (র.)-এর প্রমাণ নিম্নেযুক্ত হাদিসসমূহ,

১. আবু দাউদ باب التوقيت فى المسح-তে হজরত খুজায়মা ইবনে সাবেত (রা.)-এর হাদিসে রয়েছে,

عن النبى صلى الله عليه وسلم على الخفين للمسافر ثلثة ايام وللمقيم يوم وليلة، قال ابو داود رواه منصور بن المعتمر عن ابراهيم التيمى باسناده قال فيه ولو استزدناه لزادنا ـ

'নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণিত যে, মোজার ওপর মাসেহ মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং মুকিমের জন্য একদিন একরাত। ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, এ হাদিসটি মনসুর ইবনুল মু'তামির ইবরাহিম তাইমি থেকে তার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, আমরা যদি আরও অধিক সময় কামনা করতাম তবে তিনি আমাদেরকে সময় আরও বাড়িয়ে দিতেন।'

০ জমহুরের পক্ষ থেকে এর একটি জবাব এই দেয়া হয়েছে যে, ولو استزدناه لزادنا এই অতিরিক্ত অংশটুকু সহিহ নয়। আল্লামা জায়লায়ি এবং আল্লামা ইবনে দাকিকুল ইদ (র.) এটাকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। অনেকে বলেছেন, এটি প্রথম দিকের ঘটনা। পরবর্তীতে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিলো।

অনেকে জবাব দিয়েছেন যে, এটা হজরত খুজায়মা (রা.)-এর নিজস্ব ধারণা; যেটি শরয়ি মতে প্রমাণ নয়। কিন্তু সবচেয়ে উত্তম জবাব আল্লামা ইবনে সায়্যিদুন্ নাস শরহে তিরমিযীতে দিয়েছেন। এ জবাবটি 'নাইলুল আওতারে' কাজি শওকানি (র.) 'নাইলুল আওতারে' (১/১৭৯) বর্ণনা করেছেন। সেটি হলো, যদি এই অতিরিক্ত অংশ প্রমাণিতও হয়ে যায়, তবুও এ বাক্য দ্বারা সময়ের অনির্দিষ্টতার ওপর প্রমাণ পেশ করা ঠিক নয়। কেনোনা, لو অক্ষরটি দ্বিতীয়টি তথা جزا না হওয়ার কারণে প্রথমটি তথা شرط না হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। অতএব, এ হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, যদি আমরা রাসূলে আকরাম ﷺ-এর নিকট সময় আরও বেশি চাইতাম তাহলে তিনি আরও বাড়িয়ে দিতেন; কিন্তু আমরা আরও অধিক সময় চাইনি, তাই সময় বাড়ানো হয়নি।

আল্লামা উসমানি (র.) হজরত শায়খুল হিন্দ (র.)-এর বরাতে 'ফাতহুল মুলহিমে' এই জবাবটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বর্ণনা করেছেন যে, মূলত রাসূল ﷺ-এর অভ্যাস ছিলো তিনি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এবং বহু শরয়ি মু'আমালায় সীমা নির্ধারণে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করতেন। মোজার ওপর মাসেহের মেয়াদ নির্ধারণের ব্যাপারেও হয়তো তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করেছেন। হজরত খুজায়মা (রা.) এ সম্পর্কে বলেছেন, যদি আমরা অতিরিক্ত সময়ের মশওয়ারা দিতাম তাহলে তিনি আরও বেশি সময় নির্ধারণ করতেন; কিন্তু আমরা অতিরিক্ত সময়ের মশওয়ারা দেইনি, এজন্য তিনি সময় বৃদ্ধি করেননি। মোটকথা, এটা তখনকার ঘটনা যখন কোনো শরয়ি সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। কিন্তু যখন একটি মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে, তারপর এর বিরোধিতা নিশ্চিত নাজায়েজ।

২. দ্বিতীয় প্রমাণ আবু দাউদে[১] বর্ণিত হজরত উবাই ইবনে উমারা (রা.)-এর বর্ণনা। তিনি বলেন,

انه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم قال يوما؟ قال... ويومين... قال ثلثة؟ قال نعم وما شئت ـ

'হে রাসূলুল্লাহ! আমি কি মোজার ওপর মাসেহ করবো? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, একদিন? বললেন, দু'দিন? ... তিনি বললেন, তিন দিন? বললেন, হ্যাঁ। আরও যতো সময় চাও।'

আরেক বর্ণনায়[২] রয়েছে,

عن ابى عمارة (قال فيه حتى بلغ سبعا) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ما بدالك ـ

'আবু উমারা বলেন, (সাতদিন পর্যন্ত তিনি পৌঁছেছেন।) রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ, আরও যতো সময় তোমার প্রয়োজন হয়।'

টীকা- ১. ১/২১ باب التوقيت فى المسح টীকা. ২. সূত্র ঐ

সময় অনির্দিষ্ট থাকার ব্যাপারে এই বর্ণনাটি স্পষ্ট। কিন্তু এর জবাব হলো, এটি সূত্রগতভাবে জয়িফ। এজন্য ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেন,

وقد اختلف فى اسناده وليس هو بالقوى 'এর সনদে মতানৈক্য রয়েছে। এটি শক্তিশালী নয়।'

'কিতাবুল মা'রিফাতে' ইমাম বায়হাকি (র.) বলেন, اسناده مجهول (এর সনদ অজ্ঞাত) আর ইমাম দারাকুতনি (র.) স্বীয় 'সুনানে' লিখেন, এই সনদ প্রমাণিত নয়। এতে আব্দুর রহমান ইবনে রজিন মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ ও আইয়ুব ইবনে কুত্ন অজ্ঞাত। ইমাম তাহাবি (র.) বলেন,

ليس ينبغى لاحد ان يترك مثل هذه الاثار المتواترة فى التوقيت لمثل حديث ابى عمارة.

'আবু উমারার হাদিসের মতো প্রমাণ দ্বারা সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে এমন মুতাওয়াতির হাদিস বর্জন করা কারও জন্য বক্তব্য নয়।'

৩. ইমাম মালেক (র.)-এর তৃতীয় প্রমাণ শরহে মা'আনিল আছার– باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر এ বর্ণিত হজরত উকবা ইবনে আমের (রা.)-এর বর্ণনা,

قال اتردت (اى جئت) من الشام الى عمر بن الخطاب (رض) فخرجت من الشام يوم الجمعة ودخلت المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر (رض) وعلى خفان مجر مقانيان (صوابه جرمقانيان) فقال لى متى عهدك ياعقبة بخلع خفيك فقلت لبستها يوم الجمعة وهذه الجمعة فقال لى اصبت السنه .

'আমি উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর নিকট এসেছিলাম শাম থেকে। শাম হতে বেরিয়েছিলাম শুক্রবারের দিন, মদিনায় প্রবেশ করেছিলাম জুম'আর দিন। উমর (রা.)-এর নিকট প্রবেশ করেছিলাম তখন আমার পায়ে ছিলো দুটি মোজা। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, উকবা! তুমি তোমার মোজাদ্বয় কবে খুলেছো? আমি বললাম, মোজা পরেছি শুক্রবার দিন আর আজকে আরেক শুক্রবার। তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমল করেছো সুন্নাতের ওপর।'

০ এর জবাব হলো, জুম'আ হতে জুম'আ পর্যন্ত মাসেহ করার অর্থ হলো, বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে এক সপ্তাহ পর্যন্ত তিনি মোজা পরিহিত। আর বিধিবদ্ধ পদ্ধতি হচ্ছে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মোজাদ্বয় পা থেকে খুলে পা ধুয়ে ফেলা এবং পুনরায় মোজা পরিধান করা। এমন আমলকারিকে ওরফেও এটাই বলা হয় যে, তিনি এক মাস পর্যন্ত মাসেহ করছেন। এর প্রমাণ হলো, হজরত উমর (রা.) মাসেহের সুনির্দিষ্ট সময়ের প্রবক্তা ছিলেন। ওপরযুক্ত বর্ণনার পরিপন্থি তাঁর সূত্রে অনেক হাদিস প্রমাণিত আছে। যেমন, তাহাবি শরিফে[১] হজরত সুয়াইদ ইবনে গাফালা (রা.)-এর বর্ণনায় আছে,

قال كنا لنباتة الجعفى وكان اجرأنا على عمر سله عن المسح على الخفين فسأله فقال للمسافر ثلثة ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة .

'তিনি বলেন, নাবাতা আল-জু'ফিকে আমরা বললাম, উমর (রা.)-এর নিকট চর্ম নির্মিত মোজার ওপর মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। তিনি ছিলেন আমাদের মধ্যে উমর (রা.)-এর সামনে সবচেয়ে বড় সাহসী। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে জবাবে তিনি বললেন, মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত আর একদিন একরাত মুকিমের জন্য।'

টীকা- ১. ১/৪৩ باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر

উমর (রা.)-এর হাদিস প্রথম হাদিসের বিপরীত ও এর সাথে সাংঘর্ষিক। যদি প্রধান্যের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তাহলে স্পষ্ট হলো সে বর্ণনাটি প্রধান হবে যেটি মারফু মুতাওয়াতির হাদিস মুতাবেক। যদি সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হয় তাহলে বলা হবে, শরয়ি নিয়মানুযায়ী এক সপ্তাহ পর্যন্ত মোজা পরিহিত ছিলেন। তাছাড়া একবার হজরত সা'দ এবং হজরত ইবনে উমর (রা.)-এর মাঝে মোজার ওপর মাসেহ সম্পর্কে মতবিরোধ হয়েছিলো। এই বিষয়টি হজরত উমর (রা.)-এর সামনে পেশ করা হলো। তখন হজরত উমর ফারুক (রা.) সাহেবজাদা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)কে বললেন,

يا بنى عمك افقه منك للمسافر ثلثة ايام ولياليها وللمقيم يوم وليلة .

'প্রিয় ছেলে! তোমার চেয়ে তোমার চাচা বড় ফকিহ। মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত আর মুকিমের জন্য একদিন একরাত।' এতেও প্রমাণিত হয় যে, হজরত উমর (রা.) স্বয়ং সময় নির্ধারণের প্রবক্তা ছিলেন। তাছাড়া মুসনাদে বাজ্জারে স্বয়ং হজরত উমর (রা.) থেকে এই মারফু হাদিসটি রয়েছে,

ان النبى صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر على الخفين ثلاثة ايام ولياليهن والمقيم يوما وليلة -(كشف الأستار جا صـ١٥٦ رقم ١٦)

'নবী কারিম ﷺ বলেছেন, মুসাফির মোজার ওপর মাসেহ করবে তিনদিন তিনরাত, আর মুকিম একদিন একরাত।'

ইমাম বাজ্জার (র.) বলেন, وخالد لين الحديث وروى عنه جماعة (খালেদের হাদিস জয়িফ। তাঁর থেকে একদল হাদিস বর্ণনা করেছেন।)

৪. ইমাম মালেক (র.)-এর একটি প্রমাণ 'মুসনাদে আবু ইয়ালা'তে বর্ণিত হজরত মায়মুনা (র.)-এর একটি হাদিসও–

قالت يا رسول الله ايخلع الرجل خفيه كل ساعة قال لا ولكن يمسح عليهما ما بداله .

-(مجمع الزوايد جا صـ٢٥٨، باب التوقيت فى المسح على الخفين)

'তিনি বলেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এক ব্যক্তি কি তার মোজাদ্বয় সর্বদা খুলবে? জবাবে তিনি বললেন, না। সে মোজাদ্বয়ের ওপর যতক্ষণ প্রয়োজন-মাসেহ করবে।'

০ এই বর্ণনাটি উল্লেখ করার পর আল্লামা হায়সামি (র.) বলেন,

فيه عمر بن اسحاق قال الدار قطنى ليس بالقوى وذكره ابن حبان فى الثقات .

'উমর ইবনে ইসহাক নামক রাবি এই সনদে আছেন। দারাকুতনি তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, তিনি শক্তিশালী নন। ইবনে হাব্বান তাঁকে সেকাহদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।'

আল মাতালিবুল আলিয়া : ১/৩৫; নং ১১৩ তেও এ হাদিসটি উমর ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত রয়েছে,

قال قرأت لعطاء كتابا معه فاذا فيه حدثنى ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم انها قالت... الخ

'তিনি বলেন, আমি আতার একটি চিঠি পড়লাম। তাতে লেখা ছিলো নবী করিম ﷺ-এর স্ত্রী মায়মুনা (রা.) আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন।'

০ মোটকথা এর জবাব হলো, উমর ইবনে ইসহাক সম্পর্কে আপত্তি আছে। এ হাদিসটিকে যদি সহিহও মেনে নেওয়া হয়, তাহলে এর উদ্দেশ্য হলো যতোটুকু সময় তার প্রয়োজন হয় (ততোটুকু পর্যন্ত)। কেনোনা প্রশ্ন ছিলো শুধু সবসময় মোজা খোলার বিষয়ে।

৫. মুসনাদে আহমদে হজরত মায়মুনা (রা.)-এর একটি হাদিসে রয়েছে,

عن عطاء بن يسار قال سألت ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين قالت قلت يا رسول الله أكل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولا ينزعهما قال نعم ـ (مجمع الزوائد جـ١، صـ٢٥٨)

'আতা ইবনে ইয়াসার হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-এর অর্ধাঙ্গিনী মায়মুনা (রা.)-এর কাছে চর্ম নির্মিত মোজার ওপর মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বললেন, আমি জিজ্ঞেস করেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সবসময় কি একজন মানুষ মোজার ওপর মাসেহ করবে? এগুলো খুলবে না? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ।'

০ এতেও রয়েছে উমর ইবনে ইসহাক নামক একজন রাবির মাধ্যম। যদি এটাকে স্বীকারও করে নেওয়া হয়, তাহলেও এখানে সে জবাব হবে যেগুলো পেছনের হাদিসে দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে সহিহ মশহুর হাদিসগুলোর মুকাবেলা করতে পারে না এ হাদিসটি।

يأمرنا اذا كنا سفرا : سفر শব্দটি سافر -এর জন্ম। যেমন صحب শব্দটি صاحب -এর বহুবচন। বলেছেন, এটি মুসাফির-এর বহুবচন। কিন্তু প্রথম বক্তব্যটি আসাহ।

الا من جنابة لكن من غايط وبول ونوم : গোপন এবারতটি নিম্নেযুক্ত الا من جنابة فنغسل بها الرجلين ولا نمسح ولكم نمسح من غائط ونوم وبول ونوم। (তবে গোসল ফরজ হলে, তখন দুই পা ধুবো, মাসেহ করবো না। কিন্তু মাসেহ করবো পায়খানা-পেশাব ও ঘুমের পর।) এই উহ্য মানার প্রয়োজন এজন্য হয়েছে যে, لكن শব্দটি নেতিবাচক বিষয়ের ওপর ইতিবাচক বিষয়কে عطف করে, এর বিপরীত না।

بَابٌ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ اَعْلَاهُ وَاَسْفَلِهِ (صـ ٢٧)

অনুচ্ছেদ- ৭২ : মোজার ওপর-নিচ মাসেহ করা প্রসঙ্গে (মতন ২৭)

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ اَعْلَى الْخُفِّ وَاَسْفَلَهُ ـ

৯৭. অর্থ : হজরত মুগিরা ইবনে শু'বা (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী কারিম ﷺ মোজার ওপর ও নিচে মাসেহ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এটা একাধিক সাহাবি ও তাবেয়ির মাজহাব। এটাই বলেন, মালেক, শাফেয়ি ও ইসহাক। এ হাদিসটি মা'লুল তথা ত্রুটিযুক্ত। সাওর ইবনে ইয়াজিদ থেকে ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম ব্যতিত আর কেউ এটিকে মুসনাদরূপে বর্ণনা করেননি। আবু জুরআ ও মুহাম্মদকে এ হাদিস সম্পর্কে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাঁরা বলেছেন, এটি সহিহ নয়। কারণ, ইবনে মুবারক এ হাদিসটি সাওরি সূত্রে রাজা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মুগিরার মুনশি থেকে এ হাদিসটি আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে। এটি নবী করিম ﷺ হতে মুরসালরূপে বর্ণিত। মুগিরার নাম এতে নেই।'

দরসে তিরমিযী

ইমাম তিরমিযী (র.)-এর ভ্রম হয়ে গেছে এই শিরোনামে। হয়তো المسح على الخفين اعلاهما বলা উচিত ছিলো কিংবা المسح على الخف اعلاها واسفله।

مسح اعلى الخف واسفله : এ হাদিস দ্বারা ইমাম শাফেয়ি (র.) ও মালেক (র.) প্রমাণ পেশ করে বলেন যে, মোজাদ্বয়ের ওপর ও নিচে উভয়দিকে মাসেহ করতে হবে। তারপর ইমাম মালেক (র.) বলেন, উভয় দিকে

মাসেহ করা ওয়াজিব। আর ইমাম শাফেয়ি (র.) বলেন, ওপরের দিকে ওয়াজিব, আর নিচের দিকে মুস্তাহাব সাব্যস্ত করেন। হানাফি এবং হাম্বলিদের নিকট মোজার শুধু ওপরের দিক মাসেহ করা জরুরি, নিচের দিক মাসেহ করা প্রমাণিত না।

তিরমিযী শরিফে বর্ণিত হজরত মুগিরা ইবনে শো'বা (রা.)-এরই বর্ণনা হানাফিদের প্রমাণ যেটি باب فی المسح علی الخفین ظاهرهما -তে উল্লিখিত আছে,

قال رأيت النبی صلی الله عليه وسلم يمسح علی الخفين ظاهرهما قال ابو عيسی حديث المغيرة حديث حسن .

'তিনি বলেছেন, নবী করিম ﷺ-কে আমি মোজাদ্বয়ের ওপরে মাসেহ করতে দেখেছি।

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, মুগিরার হাদিসটি حسن।'

তবে এর পরিমাণ ইমাম তিরমিযী (র.) লিখেন,

وهو حديث عبد الرحمن بن زناد عن ابيه عن عروة عن المغيرة ولا نعلم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة علی ظاهرهما غيره .

'আব্দুর রহমান ইবনে জিনাদ-ওরওয়া-মুগিরা সূত্রে এই হাদিসটি বর্ণিত। ওরওয়া সূত্রে মুগিরা থেকে 'মোজাদ্বয়ের ওপরে' (মাসেহ করেছেন) তিনি ব্যতিত আর কেউ শব্দ উল্লেখ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

তবে এ বক্তব্যের ফলে হাদিসের বিশুদ্ধতার ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না। এ কারণে ইমাম বোখারি (র.) এ হাদিসটি তারিখে কাবিরে عن عروة عن المغيرة সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং এটাকে সাব্যস্ত করেছেন বিশুদ্ধ।

আব্দুর রহমান ইবনে আজ-জিনাদকে যদিও অনেকে জয়িফ বলেছেন, কিন্তু বিশুদ্ধ হলো তাঁর হাদিসগুলো গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া আবু দাউদে হাসান সনদে হজরত আলি (রা.)- বলেছেন,

عن علی (رض) لو كان الدين بالرائ لكان اسفل الخف اولی بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم يمسح علی ظاهر خفيه .

-وكذا فی بلوغ المرام وفی التلخيص ، ج١، ص٥٩ واسناده صحيح

'হজরত আলি (রা.) হতে বর্ণিত যে, দীন যদি যুক্তির ওপর নির্ভরশীল হতো, তাহলে মোজার ওপরের অংশ অপেক্ষা নিচের অংশ মাসেহ করা উত্তম হতো। অথচ আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মোজাদ্বয়ের ওপর মাসেহ করছেন।' এটাও স্পষ্ট দলিল।

আবু দাউদ তায়ালেসি কর্তৃক বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল আল-মুজানির হানাফিদের একটি প্রমাণ বর্ণনা,

قال أول من رأيت عليه خفين فی الإسلام المغيرة بن شعبة اتانا ونحن عند رسول الله صلی الله عليو وسلم وعليه خفان اسودان فجعلنا ننظر إليهما ونعجب منهما فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم أما انه سيكون لكم أعنی الخفاف قالوا يا رسول الله فكيف نصنع؟ قال تمسحون عليهما وتصلون . (المطالب العالية ج١، ص٣٥)

'তিনি বলেছেন, ইসলাম গ্রহণের পর সর্বপ্রথম আমি যাকে চামড়ার মোজা পরিহিত দেখেছি তিনি হচ্ছেন মুগিরা ইবনে শো'বা (রা.)। তিনি আমাদের কাছে এলেন, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত। তাঁর পায়ে ছিলো তখন দুটি কালো চামড়ার মোজা। আমরা সে মোজাদ্বয়ের দিকে তাকাতে লাগলাম এবং এগুলো

দেখে আশ্চর্যবোধ করছিলাম। তখন রাসূলে করিম ﷺ এরশাদ করলেন, মনে রেখো, শীঘ্রই তোমাদের জন্য তা হবে অর্থাৎ, মোজা। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন আমরা কি করবো? জবাবে তিনি বললেন, তোমরা এগুলোর ওপর মাসেহ করবে এবং নামাজ আদায় করবে।'

০ আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব হলো, এটি ত্রুটিপূর্ণ। শীঘ্রই এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে। যদি এটাকে প্রমাণযোগ্য মেনেও নেওয়া হয়, তখন বলা যেতে পারে মূলত প্রিয়নবী ﷺ মোজার শুধু ওপরের অংশে মাসেহ করেছেন; কিন্তু মোজা শক্ত হওয়ার কারণে নিচের অংশ ধরেছিলেন। যেটাকে রাবি বর্ণনা করেছেন মোজার নিচের অংশের মাসেহ দ্বারা।

وهذا حديث معلول : معلول সে হাদিসকে বলা হয়, যার মধ্যে কোনো ত্রুটি বিদ্যমান। এই নামটি শব্দ প্রকরণগত কিয়াসের পরিপন্থি। কারণ, এটি اعلال থেকে উদ্ভূত। অতএব, معل হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু মুহাদ্দিসিনের নিকট معلول এবং معلل প্রচলিত হয়ে গেছে। এজন্য এখন এটি বিশুদ্ধ এবং মুহাদ্দিসিনের পরিভাষা। মোটকথা, معلول সে হাদিসকে বলে যার সনদ অথবা মতনে কোনো গোপন আপত্তিকর কারণ পাওয়া যায়। চাই এর সমস্ত রাবি নির্ভরযোগ্য হোক না কেনো। معلول হাদিসের জটিলতম এবং সূক্ষ্মতম একটি প্রকার। কেনোনা হাদিসের রোগ চেনার জন্য প্রয়োজন বহু অভিজ্ঞতা এবং বিশেষজ্ঞতার।

এ অধ্যায়ের হাদিসটি معلول হওয়ার নিম্নেযুক্ত কারণ আছে,

১. প্রথম কারণটি স্বয়ং ইমাম তিরমিযী (র.) বর্ণনা করেছেন যে, এই বর্ণনাটি আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক সাওর ইবনে ইয়াজিদ বর্ণনা করেছেন। তাতে সনদ কাতিবুল মুগিরা পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে, মুগিরা ইবনে শো'বার কোনো আলোচনাই নেই। যেনো আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের সনদে এই হাদিসটি মুগিরার মুসনাদের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং কিতাবুল মুগিরার মুরসাল। ওয়ালিদ ইবনে মুসলিমের ভ্রম হয়েছে। তিনি এটাকে মুত্তাসিল বর্ণনা করেছেন। এজন্য ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন,

لم يسند عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم .

'হজরত সাওর ইবনে ইয়াজিদ সূত্রে ওয়াজিদ ইবনে মুসলিম ব্যতিত আর কেউ এটি মুসনাদরূপে বর্ণনা করেননি।'

২. দ্বিতীয় কারণটি ইমাম আবু দাউদ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, সেটি হচ্ছে সাওর ইবনে ইয়াজিদ এই হাদিসটি রাজা ইবনে হায়ওয়াহ থেকে শুনেননি। যেনো হাদিসটি মুনকাতে'। বশিরের সনদে এখানে حدثنا সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। যার কারণে অনেকে এটাকে মুত্তাসিল সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ হলো সুস্পষ্টভাবে حدثنا -এর উল্লেখ এখানে সঠিক নয়। যেমন জানা যায়, 'মুসনাদে আহমদ ইবনে উবায়দুল্লাহ সাফ্ফার' দ্বারা।

৩. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের সনদে রয়েছে– عن رجاء قال حدثت عن كاتب المغيرة । যা দ্বারা বোঝা যায়, স্বয়ং রাজা ইবনে হায়ওয়াও এ হাদিসটি প্রত্যক্ষভাবে কাতিবুল মুগিরা থেকে শুনেননি; বরং অন্য অজানা কোনো রাবি থেকে শুনেছেন। সুতরাং এটা আরেক প্রকার সনদগত বিচ্ছিন্নতা।

৪. চতুর্থ কারণটি হজরত কাশ্মিরি (র.) এই বর্ণনা করেছেন যে, হজরত মুগিরার এই এবারতটি মুসনাদে বাজজারে ৬০টি সনদে বর্ণিত আছে। কিন্তু আলোচ্য অধ্যায়ের হাদিস ব্যতিত কোনো বর্ণনায় মোজার নিচে মাসেহের আলোচনা নেই। মোটকথা, ওপরযুক্ত কারণগুলোর ফলে এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি সাব্যস্ত করা হয়েছে معلول।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ظَاهِرِهِمَا (صـ ٢٨)

অনুচ্ছেদ-৭৩ : মোজার ওপরে মাসেহ করা (মতন ২৮)

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رضـ) قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا .

৯৮. অর্থ : হজরত মুগিরা ইবনে শু'বা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি নবী করিম ﷺ-কে দেখেছি তিনি মোজার ওপরের দিকে মাসেহ করছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, মুগিরার হাদিসটি حسن। এটি হলো, আব্দুর রহমান ইবনে আবুজ জিনাদ-ওরওয়া-মুগিরা সূত্রে বর্ণিত হাদিস। আমরা ওরওয়া সূত্রে মুগিরা থেকে 'মোজার ওপরে' শব্দ উল্লেখ করতে আব্দুর রহমান ব্যতিত আর কাউকে জানি না। এটা একাধিক আলেমের বক্তব্য। এ মতই পোষণ করেন সুফিয়ান সাওরি ও আহমদ (র.)।

মুহাম্মদ বলেছেন, মালেক (র.) আব্দুর রহমান ইবনে আবুজ জিনাদকে জয়িফ সাব্যস্ত করতেন।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ (صـ ٢٩)

অনুচ্ছেদ- ৭৪ : সুতার মোটা মোজা এবং নিচের অংশে চামড়া লাগানো মোজার ওপর মাসেহ করা প্রসঙ্গে (মতন ২৯)

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رضـ) قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ .

৯৯. অর্থ : হজরত মুগিরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী করিম ﷺ ওজু করেছেন এবং কাপড়ের সুতি মোটা মোজার ওপর এবং নিচের অংশে চামড়া দ্বারা তৈরি মোজার ওপর মাসেহ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। এটা একাধিক আলেমের বক্তব্য। এমতই পোষণ করেন, সুফিয়ান সাওরি, ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক (র.)। তাঁরা বলেছেন, সুতি মোজার ওপর মাসেহ করতে পার যদিও তা না'লাইন না হয়ে থাকে, এগুলো যদি হয়ে থাকে মোটা।

আবু মূসা (রা.) থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

দরসে তিরমিযী

جورب : সুতি অথবা উলের মোজাকে বলে। যদি এমন মোজার ওপর দু'দিকে চামড়া লাগানো থাকে তবে সেটাকে বলে مجلد, যদি শুধু নিচের অংশে চামড়া লাগানো থাকে তবে সেটাকে বলে منعل, আর যদি পরিপূর্ণ মোজা চামড়ার তৈরি হয় অর্থাৎ, সুতা ইত্যাদির কোনো দখল তার মধ্যে না থাকে তবে এমন মোজাকে বলে خف। خفين ـ جوربين مجلدين ـ جوربين منعلين সবগুলোর ওপর মাসেহ করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ। আর যদি جوربين ـ مجلدين অথবা منعلين না হয় এবং পাতলা হয়, অর্থাৎ মোটা মোজার শর্তশরায়েত না পাওয়া

যায়, তাহলে এগুলোর ওপর মাসেহ করা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েজ। অবশ্য যদি جوربين غير منعلين غير مجلدين মোটা হয়, তবে এমন মোজার ওপর মাসেহ করা সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। মোটা হওয়ার অর্থ হলো, তার মধ্যে পাওয়া যায় তিনটি শর্ত।

এক. তার ওপর পানি থাকলে তা পা পর্যন্ত পৌঁছে না।

দুই. ধরে রাখা ব্যতিত পায়ে লেগে থাকা।

তিন. ক্রমশ একের পর এক চলা সম্ভব।

এমন মোজার ওপর মাসেহের বৈধতা সম্পর্কে কিছু মতানৈক্য আছে।

ইমামত্রয় এবং ইমাম আবু ইউসুফ মুহাম্মদ (র.)-এর মাজহাব হলো, এর ওপর মাসেহ করা বৈধ। ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর আসল মাজহাব হলো না জায়েজ। কিন্তু 'হিদায়া গ্রন্থকার, 'বাদায়ে' গ্রন্থকার প্রমুখ বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম সাহেব (র.) শেষে জমহুরের মাজহাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। 'মাজমাউল আনহুর' গ্রন্থে লিখেছেন যে, তিনি এ প্রত্যাবর্তন করেছেন ওফাতের ৯ দিন অথবা তিনদিন পূর্বে জামে' তিরমিযী আল্লামা আবেদ সিন্দির কলমি কপিতে এখানে অন্য একটি মতন রয়েছে।

قال ابو عيسى سمعت صالح بن محمد الترمذى قال سمعت ابا مقاتل السمرقندى يقول دخلت على أبى حنيفة فى مرضه الذى مات فيه فدعا بماء فتوضأ وعليه جوربان فمسح عليهما ثم قال فعلت اليوم شيئا لم اكن افعله مسحت على الجوربين وهما غير منعلين . (كذا فى طبعة الحلبى للترمذى بتصحيح الشيخ أحمد شاكرا المحدث)

'ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আমি সাহল ইবনে মুহাম্মদ তিরমিযীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি আবু মুকাতিল সমরকন্দিকে বলতে শুনেছি, আমি মৃত্যুশয্যায় শায়িত রোগে আক্রান্ত অবস্থায় আবু হানিফা (র.)-এর কাছে প্রবেশ করেছিলাম। তিনি পানি আনালেন, তারপর ওজু করলেন। তাঁর পায়ে তখন সুতি দুটি মোটা মোজা ছিলো। তিনি এগুলোর ওপর মাসেহ করলেন। তারপর বললেন, আমি আজ এমন একটি কাজ করলাম, যা পূর্বে করতাম না। আমি সুতি মোটা মোজার ওপর মাসেহ করলাম। অথচ এগুলোর নিচে চামড়াযুক্ত নয়।'

এর দ্বারাও বোঝা যায় যে, ইমাম সাহেব (র.) শেষে পুরানো বক্তব্য হতে ফিরে এসেছিলেন। অতএব এই মাসআলার ব্যাপারে ঐকমত্য হলো যে, মোটা সুতি অথবা পশমি মোজার ওপর মাসেহ করা বৈধ।

তবে মনে রাখতে হবে যে, جوربين -এর ওপর মাসেহের বৈধতা মূলত تنقيح المناط তথা ইল্লত বা কারণের ভিত্তিতে। অর্থাৎ যেসব সুতি অথবা পশমি মোজায় উপরিউক্ত তিনটি শর্ত পাওয়া যায় সেগুলোকে চামড়ার মোজার অন্তর্ভুক্ত করে সেগুলোর ওপর মাসেহের বৈধতার হুকুম দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় সেগুলো সব জয়িফ। অন্যথায় কমপক্ষে খবরে ওয়াহিদ যেগুলোর মাধ্যমে কিতাবুল্লাহর ওপর সংযোগ হতে পারে না; বরং এর বৈধতা প্রমাণিত হয়েছে চামড়ার মোজার ওপর মাসেহ সংক্রান্ত মুতাওয়াতির হাদিসগুলো দ্বারাই তানকিহে মানাতের ভিত্তিতে।

والنعلين (নীচে চামড়াবিশিষ্ট মোজা।) : ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্য হতে কারও নিকট এর ওপর মাসেহের অনুমতি নেই। সুতরাং এ হাদিসের ওপর হলো, এটি জয়িফ। যার বিশদ বিবরণ শীঘ্রই আসবে। অথবা বলা যায় যে, রাসূল ﷺ নিচের অংশে চামড়া জড়ানো মোজা পরিধান করতে করতে সুতা অথবা পশমের মোজার ওপর মাসেহ করেছেন। ফলে হাত نعلين তথা নিচে চামড়াযুক্ত মোজার ওপরও লেগেছে। কিন্তু এর ওপর মাসেহ উদ্দেশ্য ছিলো না। এটাকে বর্ণনাকারি ব্যক্ত করেছেন। مسح على النعلين শব্দে।

هذا حديث حسن صحيح : ইমাম তিরমিযী (র.)-এর ভ্রম এ হাদিস সম্পর্কে সহিহ বক্তব্যের করার ক্ষেত্রে হয়েছে। কারণ, মুহাদ্দিসিন এ হাদিসের দুর্বলতার ব্যাপারে একমত। ইমাম আবু দাউদ, ইয়াহইয়া ইবনুল মাইন, আলি ইবনুল মাদিনি, আব্দুর রহমান ইবনে মাহদি (র.)-এর ন্যায় হাদিসের ইমামগণ থেকে এ হাদিস সম্পর্কে 'জয়িফ' মন্তব্য বর্ণিত আছে। দুর্বলতার কারণ, আবু কায়স এবং হুজায়ল ইবনে শুরাহবিলের تضعيف।

وفى الباب عن أبى موسى : তবে হজরত আবু মূসা আশআরি (রা.)-এর বর্ণনাও জয়িফ। যেমন, ইমাম আবু দাউদ (র.) সুনানে আবু দাউদ : ১/২১-২২ باب المسح على الجوربين এ এ ব্যাপারে স্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالْعِمَامَةِ (صـ ٢٩)

অনুচ্ছেদ- ৭৫ : সুতি মোটা মোজা এবং পাগড়ির ওপর মাসেহ করা প্রসঙ্গে (মতন ২৯)

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْهِ (رض) قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَسَحَ عَلَى وَذَكَرَ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فِيْ مَوْضِعِ الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ قَالَ بَكْرٌ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ اٰخَرَ اَنَّهُ مَسَحَ عَلٰى نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ .

১০০. **অর্থ** : হজরত মুগিরা ইবনে শো'বা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী করিম ﷺ ওজু করেছেন এবং মাসেহ করেছেন চামড়ার মোজা এক পাগড়ির ওপর।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

একাধিক সূত্রে মুগিরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। অনেকে মাথার সামনের অংশের এ পাগড়ির ওপর মাসেহ করার কথা উল্লেখ করেছেন। আবার অনেকে মাথার সামনের ভাগের কথা বলেছেন,

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, আমি আহমদ ইবনুল হাসান (র.)কে বলতে শুনেছি, আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-কে বলতে শুনেছি, আমি আমার দুই নয়নে ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল-কাত্তানের মতো ব্যক্তিত্ব দেখিনি।

আমর ইবনে উমাইয়া, সালমান এবং সাওবান ও আবু উমার (রা.) হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেছেন, মুগিরা ইবনে শো'বা (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح। এটা একাধিক আলেম সাহাবির বক্তব্য। তার মধ্যে রয়েছেন হজরত আবু বকর, উমর ও আনাস (রা.)। এমতই পোষণ করেন আওজায়ি, আহমদ ও ইসহাক (র.)। তাঁরা বলেছেন, পাগড়ির ওপর মাসেহ করা।

আমি জারূদ ইবনে মু'আজকে বলতে শুনেছি, আমি ওকি' ইবনুল জাররাহকে বলতে শুনেছি- "যদি কেউ পাগড়ির ওপর মাসেহ করে তাহলে উক্ত হাদিসের কারণে তা তার জন্য বৈধ।"

عن ابى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال سألت جابر بن عبد الله (رض) عن المسح على الخفين؟ فقال السنة يا ابن اخى! وسألته عن المسح على العمامة؟ فقال مس الشعر .

১০১. **অর্থ** : হজরত আবু উবায়দা ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আম্মার ইবনে ইয়াসির হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)কে চামড়ার মোজার ওপর মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে তিনি বলেছেন, ভাতিজা! এটি সুন্নত। আমি তাঁকে পাগড়ির ওপর মাসেহ সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করেছিলাম, জবাবে তিনি বললেন, চুল স্পর্শ করা বা চুলে পানি লাগাও।

একাধিক আলেম সাহাবি ও তাবেয়ি বলেছেন, পাগড়ির সাথে মাথা মাসেহ করা ব্যতিত শুধু পাগড়ির ওপর মাসেহ করবে না। সুফিয়ান সাওরি, মালেক ইবনে আনাস, ইবনে মুবারক ও শাফেয়ি (র.)-এর মাজহাব এটাই।

عن كعب بن عجْرة عن بلال (رضـ) ان النبى صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار -

১০২. অর্থ : হজরত বিলাল (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজাদ্বয় এবং পাগড়ির ওপর মাসেহ করেছেন।

দরসে তিরমিযী

جوربين শব্দের উল্লেখ এই শিরোনামে ভুল। কেনোনা হাদিসে جوربين এর কোনো আলোচনা নেই। সুতরাং এটা হয় ইমাম তিরমিযী (র.)-এর ভ্রম, অথবা কোনো লিপিকারের ভুল। দ্বিতীয় পদ্ধতির সহায়তা তিরমিযীর আবিদ সিন্দির কপি দ্বারা হয়। কেনোনা جوربين-এর আলোচনা তাতে নেই।

مسح على الخفين والعمامة : ইমাম আহমদ, ইমাম আওজায়ি, ইমাম ইসহাক, ইমাম ওয়াকি' ইবনুল জার্‌রাহ (র.)-এর মাজহাব এ হাদিস দ্বারা প্রমাণ করে, শুধু পাগড়ির ওপর মাসেহ করা বৈধ। ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মতে, কেবল পাগড়ির ওপর মাসেহ করে ক্ষান্ত হওয়া অবৈধ। তবে মাথার ফরজ পরিমাণ অংশ মাসেহ করার পর পরিপূর্ণ মাথা মাসেহের সুন্নত, পাগড়ির ওপর আদায় করা যেতে পারে। কাজি আবু বকর ইবনুল আরাবি (র.) এ বক্তব্যটি ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর দিকেও সম্বোধন করেছেন। কিন্তু হানাফিদের গ্রন্থাবলিতে এর আলোচনা পাওয়া যায় না। অতএব সহিহ হলো, হানাফি এবং মালেকিদের নিকট পুরা মাথা মাসেহের সুন্নতও পাগড়ির ওপর মাসেহ করলে আদায় হয় না। যাঁরা পাগড়ির ওপর মাসেহ বৈধ বলেন, তাঁদের প্রমাণ আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস। তা ব্যতিত হজরত বিলাল (রা.)-এর একটি বর্ণনা, যেটি ইমাম তিরমিযী (র.) বর্ণনা করেছেন এ অনুচ্ছেদের শেষে,

عن بلال (رضـ) ان النبى صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار -

এমনিভাবে আবু দাউদ (র.) المسح على العمامة অধ্যায়ে হজরত সাওবান (রা.)-এর বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন,

قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فاصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم أن يمسحوا على العصائب (العمائم) والتساخين (جمع تسخان بمعنى الخف)

'একবার একটি দলকে রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধ অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন। তাদের ঠাণ্ডা লেগেছিলো। তারা যখন নবী করিম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন তাদেরকে পাগড়ি এবং মোজার ওপর মাসেহ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

তাছাড়া বোখারি শরিফে[১] বর্ণিত হজরত আমর ইবনে উমাইয়াহ জামরির একটি বর্ণনাও তাদের দলিল। যা দ্বারা পাগড়ির ওপর মাসেহের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ চারটি হাদিস সনদগতভাবে সহিহ।

০ কোরআনের আয়াত। وامسحوا برؤوسكم (তোমরা তোমাদের মাথা মাসেহ করো।)হানাফি এবং মালেকিদের প্রমাণ এটি অকাট্য দলিল। আর পাগড়ির ওপর মাসেহের হাদিসগুলো খবরে ওয়াহেদ; যেগুলো দ্বারা কিতাবুল্লাহর ওপর বৃদ্ধি সম্ভব নয়।

তবে মোজার ওপর মাসেহের বিষয়টি এর বিপরীত। কেনোনা, প্রথমতো স্বয়ং কোরআনে কারিমের যেরের কেরাতটি । সুতরাং এগুলো দ্বারা কিতাবুল্লাহর ওপর বৃদ্ধি সম্ভব।

টীকা-১. ১/৩৩, باب المسح على الخفين

পাগড়ির ওপর মাসেহ সংক্রান্ত আলোচ্য অধ্যায়ের হাদিস এবং অন্যান্য হাদিসগুলো সম্পর্কে জমহুরের পক্ষ থেকে বহু জবাব দেওয়া হয়েছে, ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বিভিন্ন রকমের তাবিল ও ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রয়েছে পাগড়ির ওপর মাসেহের বর্ণনাগুলোতে। হাফেজ জায়লায়ি (র.)-এর বক্তব্য মতে যেসব রেওয়ায়াতে পাগড়ির ওপর মাসেহের আলোচনা রয়েছে সেগুলো সংক্ষিপ্ত। মূলত ছিলো مسح على ناصيته وعمامته যার সংক্ষিপ্ত রূপ শুধু على عمامته হয়ে গেছে। তাই তো অনেকে রেওয়ায়াতে ناصية শ স্পষ্টাকারে বিদ্যামান রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন,

وذكر محمد بن البشار هذا الحديث فى موضع اخر انه مسح على ناصيته وعمامته ـ

'অন্যত্র মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার হাদিস উল্লেখ করেছেন, তিনি মাসেহ করেছেন মাথার সম্মুখ অংশে ও পাগড়ির ওপরে।'

বিলাল (রা.)-এর রেওয়ায়াতেও কোনো কোনো সূত্রে ناصيته -এর আলোচনা এসেছে। তাছাড়া হজরত জাবের (রা.)-এর পরবর্তী হাদিসটি দ্বারাও এর সহায়তা হয়, যাতে আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) বলেন, আমি হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (র.)-এর নিকট পাগড়ির ওপর মাসেহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তখন তিনি বললেন, مس الشعر তথা চুল স্পর্শ করো।

এ কথাই সহিহ মনে হচ্ছে এসব বর্ণনার আলোকে যে, প্রিয়নবী ﷺ কখনও শুধু পাগড়িতে মাসেহ করেননি। অতএব, এবার পাগড়ির ওপর মাসেহের সমস্ত বর্ণনার প্রয়োগক্ষেত্র এই হবে যে, রাসূল ﷺ মাথার ফরজ পরিমাণ মাসেহ করেছেন। এরপর পাগড়ির ওপর হাত ঘুরিয়েছেন। আর এ কাজটি বৈধতার বিবরণের জন্য করেছিলেন।

অনেকে এই জবাব দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা মাসেহের পর হয়তো পাগড়ি ঠিক করেছিলেন, যেটাকে বর্ণনাকারি পাগড়ির ওপর মাসেহ মনে করেছিলেন। কিন্তু এ জবাবটি জয়িফ কারণ, এটা নির্ভরযোগ্য রাবিদের বুঝের ওপর কুধারণা পর্যায়ের। অথচ পাগড়ির ওপর মাসেহের বিবরণগুলো একাধিক সাহাবি থেকে বর্ণিত। আর এসব সাহাবি সম্পর্কে এই খেয়াল বদগুমান।

'মুয়াত্তায়' ইমাম মুহাম্মদ (র.) আরেক পদ্ধতিতে পাগড়ির ওপর মাসেহের বর্ণনাগুলোর জবাব দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,

بلغنا ان المسح على العمامة كان فترك ـ

'আমাদের কাছে হাদিস পৌছেছে যে, পাগড়ির ওপর মাসেহের আমল প্রথমে ছিলো, তা পরবর্তীতে পরিহার করা হয়েছে।'

আব্দুল হাই লাখনবি (র.) লিখেছেন যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বালাগাত মুসনাদ। যদি এ কথা সহিহ হয়, তাহলে বিষয়টি সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যায় এবং পাগড়ির ওপর মাসেহের উৎকৃষ্ট জবাব হয়ে যায় যে, পাগড়ির ওপর মাসেহ মানসুখ হয়ে গিয়েছে।

এটি পাগড়ির ওপর মাসেহ সংক্রান্ত আলোচনার সারনির্যাস। এ বিষয়ের ওপর সবচেয়ে বিস্তারিত এবং প্রশান্তিমূলক আলোচনা করা হয়েছে 'ই'লাউস্ সুনানে'। (পৃষ্ঠা : ১/৮-৩৭)

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ (صـ ٢٩)

অনুচ্ছেদ- ৭৬ : ফরজ গোসল প্রসঙ্গে (মতন ২৯)

عَنْ مَيْمُوْنَةَ (رض) قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم غُسْلًا فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَاكْفَأَ الْاِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلٰى يَمِيْنِهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ فَاَفَاضَ عَلٰى فَرْجِهِ ثُمَّ دَلَكَ فَاَفَاضَ عَلٰى رَأْسِهِ ثَلٰثًا ثُمَّ اَفَاضَ عَلٰى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحّٰى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ـ

১০৩. অর্থ : হজরত মায়মুনা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করিম ﷺ-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তারপর তিনি ফরজ গোসল করলেন। তারপর পাত্রটি বাম হাত দিয়ে ডান হাতের ওপর কাত করে পানি ঢাললেন। দুই হাতের কজি পর্যন্ত ধৌত করলেন। তারপর হাত প্রবিষ্ট করলেন পানির পাত্রে। তারপর লজ্জাস্থানে পানি ঢাললেন। তারপর নিজ হাত দেওয়াল অথবা জমিনে ঘষলেন। তারপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন। মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় (কনুই পর্যন্ত) ধৌত করলেন। তারপর মাথার ওপর তিনবার পানি ঢাললেন। তারপর পানি ঢাললেন শরীরের বাকি অংশে। এরপর গোসলের স্থান থেকে সরে দু'পা ধুইলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। উম্মে সালামা, জাবের, আবু সায়িদ, জুবায়র ইবনে মুতয়িম ও আবু হুরায়রা (রা.) হতে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِذَا اَرَادَ اَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ بِغَسْلِ يَدَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُّدْخِلَهُمَا الْاِنَاءَ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُدْخلهما الاناء ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يُشَرِّبُ شَعْرَهُ الْمَاءَ ثُمَّ يَحْثِى عَلٰى رَأْسِهِ ثَلٰثَ حَثَيَاتٍ .

১০৪. অর্থ : হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফরজ গোসল করার ইচ্ছা করতেন, তখন প্রথমে দুহাত ধুতেন পাত্রে হাত ঢুকানোর আগে। তারপর লজ্জাস্থান ধুতেন ও নামাজের ওজুর মতো ওজু করতেন। তারপর পানি দ্বারা ভালো করে চুল ধুতেন। তারপর মাথায় তিন অঞ্জলি পানি ঢালতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। এটাই ওলামায়ে কেরাম ফরজ গোসলে অবলম্বন করেছেন যে, নামাজের ওজুর ন্যায় ওজু করবে। তারপর মাথায় তিনবার পানি ঢালবে। তারপর পদযুগল ধৌত করবে। ওলামায়ে কেরামের নিকট এর ওপর আমল অব্যাহত আছে। তাঁরা বলেছেন, যদি কোনো ফরজ গোসল বিশিষ্ট ব্যক্তি ওজু না করে পানিতে ডুব দেয়, তাহলে এটা তার জন্য যথেষ্ট হবে। শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর মাজহাব এটা।

দরসে তিরমিযী

فافاض على فرجه : 'বাহরুর্ রায়েক' গ্রন্থকার এ হাদিসে ভিত্তিতে লিখেছেন যে, গোসলে ইস্তিঞ্জা করা সুন্নত। সামনের রাস্তায়ও পেছনের রাস্তায়ও, চাই তাতে নাপাক থাক বা না থাক।

ثم تنحى فغسل رجليه : এ হাদিসে পা ধোয়ার কাজটি পরে করা হবে স্পষ্ট বলা হয়েছে। কিন্তু হজরত আয়েশা (রা.)-এর পরবর্তী হাদিসটিতে বলা হয়েছে يتوضأ وضوءه للصلوة -এর আবেদন হলো, পা ধোয়ার কাজটি গোসলের আগে সেরে ফেলা হবে। এজন্য ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভিন্নতা রয়েছে। অনেকে আগে পা ধোয়ার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার অনেকে পরে পা ধোয়ার বিষয়টিকে। তত্ত্বজ্ঞানী হানাফিগণ সামঞ্জস্য বিধানের পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বলেছেন, যদি গোসলের স্থানে পানি জমা হয়ে যায় তাহলে পা ধুবে পরে। আর হজরত মায়মুনা (রা.)-এর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি এ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। আর যদি গোসলের স্থানে পানি জমা না হয়, তাহলে ওজুর সাথে সাথে পা ধুবে। হজরত আয়েশা (রা.)-এর হাদিস প্রযোজ্য এ ক্ষেত্রেই।

ان انغمس الجنب فى الماء : গোসলে শুধু সম্পূর্ণ শরীরে পানি পৌঁছানো আবশ্যক জমহুরের মতে। এজন্য শুধু ডুব দেওয়ার ফলে জমহুরের মতে গোসল হয়ে যায়। অবশ্য ইমাম মালেক (র.)-এর বক্তব্য হলো, শুধু ডুব দেওয়ার ফলে গোসল পরিপূর্ণ হবে না, বরং গা ডলার প্রয়োজন।

بَابُ هَلْ تَنْقُضُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ؟ (ص ٢٩)

অনুচ্ছেদ- ৭৭ : মহিলা গোসলের সময় কি চুলের বাঁধন খুলবে? (মতন ২৯)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ لَا إِنَّمَا يَكْفِيْكِ أَنْ تَحْثِي (في ن ب تفضين) عَلَى جَسَدِكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ أَوْ قَالَ فَإِذًا أَنْتِ قَدْ تَطَهَّرْتِ .

১০৫. অর্থ : হজরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমার মাথার চুল শক্ত করে বেঁধে রাখি (বেনি বাঁধি)। ফরজ গোসলের জন্য তা কি খুলে ফেলবো? জবাবে তিনি বললেন, না। তোমার জন্য যথেষ্ট হলো, মাথায় তিন অঞ্জলি পানি ঢেলে দেওয়া। তারপর বাকি শরীরে পানি পৌঁছানো। এভাবে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে। অথবা তিনি বলেছেন, তুমি এভাবে নিজে পবিত্র হয়ে গেলে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, মহিলা যখন ফরজ গোসল করবে তখন চুলের বেনি না খুলে মাথায় পানি পৌঁছালে তা তার জন্য যথেষ্ট।

দরসে তিরমিযী

اشد ضفر رأسي : ضفر শব্দটিতে মুহাক্কিকিন ض এর ওপর যবর, আর ف এর ওপর সাকিন লিখেছেন। তবে আল্লামা ইবনে বাররি (র.) سفن-এর ওজনে ضفر সহিহ সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, এ শব্দটি ضفيرة -এর বহুবচন। কিন্তু ইবনে বাররির এই বক্তব্য জমহুরের পরিপন্থি। প্রথম বক্তব্যটিই বিশুদ্ধ। মূলত ضفر শব্দটিও একটি ভাষা। যেটি ব্যবহৃত একবচনের অর্থে মানে বেনিকৃত কেশ।

لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات : এ হাদিস দ্বারা জমহুর প্রমাণ পেশ করে, চুলের বেনি না খোলা জায়েজ বলেন। অবশ্য দাউদ জাহেরি চুলের বেনি খোলা ওয়াজিব বলেন বলে বর্ণিত আছে। তাঁর প্রমাণ হজরত আয়েশা (রা.)-এর হাদিস।[১] যাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে انقضى رأسك। বা খুলে ফেল তোমার মাথার বেনি।

তবে জমহুর জবাব দেন যে, এই বলা হয়েছিলো হজের আহকাম পালনের পর ফেরার সময়। ঐ সময় শুধু পবিত্রতাই উদ্দেশ্য ছিলো না; বরং পরিচ্ছন্নতাও উদ্দেশ্য ছিলো। কাজেই চুল খোলার নির্দেশ পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[২]

টীকা- ১. সহিহ বোখারি : ১/৪৩ كتاب الحيض باب نقض المرأة شعرها عند غسل الحيض

টীকা- ২. ওপরযুক্ত বিষয়ে ইমামগণের মতানৈক্য রয়েছে। এখানে চারটি মাজহাব আছে,

১. হায়েজের গোসল ও ফরজ গোসলে মাথার বেনি খোলা ওয়াজিব নয়, যদি পানি সমস্ত চুলের উপরে ও ভেতরে পৌঁছে যায়। এটা হলো, অধিকাংশের মত।

২. সর্বাবস্থায় চুলের বেনি খুলে ফেলবে। এটা ইবরাহিম নাখয়ি (র.)-এর মাজহাব।

৩. হায়েজের গোসলে বেনি খুলে ফেলা ওয়াজিব, অন্য ফরজ গোসলে নয়। এটা হাসান, তাউস ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মাজহাব।

৪. মহিলাদের ওপর চুলের বেনি খোলা ওয়াজিব নয়; যদিও পানি বাধা চুলের ভেতর না পৌঁছে। আর পুরুষের ওপর ওয়াজিব। যদি বেনি খোলা ব্যতিত সমস্ত চুলের ভেতরে ও বাইরে পানি প্রবেশ না করে। এটা কোনো কোনো আহলে জাহেরের মাজহাব।

–আউনুল মা'বুদ : ১/১০৫-১০৬

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً (صـ ٢٩)

অনুচ্ছেদ- ৭৮ : প্রতিটি চুলের নিচে নাপাক রয়েছে (মতন ২৯)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَاَنْقُوا الْبَشَرَةَ ـ

১০৬. অর্থ : হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ বলেছেন যে, প্রতিটি চুল বা লোমকূপের নিচে অপবিত্রতা রয়েছে। সুতরাং তোমরা চুল ধোও এবং ভালো করে শরীরের চামড়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কর।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আলি ও আনাস (রা.) থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, হারেস ইবনে ওয়াজিহ-এর হাদিসটি غريب। এটি তাঁর হাদিস ব্যতিত অন্যদের কাছ থেকে আমরা জানি না। তিনি একজন জয়িফ বৃদ্ধ। একাধিক ইমাম তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এ হাদিসটি মালেক ইবনে দিনার থেকে একা বর্ণনা করেছেন। তাঁকে হারেস ইবনে ওয়াজিহ বলা হয় এবং এমনিভাবে ابن واجيه ইবনে ওয়াজিহও বলা হয়।

দরসে তিরমিযী

عن محمد بن سيرين : সর্বসম্মতিক্রমে সিরিন শব্দটি غير منصرف (রূপ অপরিবর্তনশীল শব্দ)। তারপর অনেকে এর কারণ বর্ণনা করেছেন, علميت -এর সাথে تانيث পাওয়া যায়। কারণ, সিরিন ছিলো তাঁর মাতার নাম। কিন্তু এ কথাটি ভুল। সহিহ হলো সিরিন তাঁর পিতারই নাম। অতএব, গায়রে মুনসারিফ হওয়ার কারণ হলো, আখফাশের বক্তব্য মুতাবেক زايدتان -এর মতে يا نون زائدتان ও গায়রে মুনসারিফের কারণ।

تحت كل شعرة جنابة : গোসলের পুরা শরীরে পানি পৌঁছানো ফরজ হাদিসের ভিত্তিতে ইজমা। কিন্তু এই হাদিসের ওপর প্রশ্ন হয় যে, এর রাবি হারেস ইবনে দিহইয়া জয়িফ। যেমন স্বয়ং ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন,

قال ابو عيسى حديث الحارث ابن وجيه حديث غريب لا نعرفه الا من حديثه وهو شيخ ليس بذلك ـ

তবে এই প্রশ্নের জবাব হলো, এই হাদিসটি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও দুই কারণে মকবুল। প্রথমতো এই কারণে যে, وان كنتم جنبا فاطهروا (যদি তোমরা অপবিত্র (গোসল ফরজ হয়) তবে তোমরা ভালো করে পবিত্রতা অর্জন করো।) আয়াতের সত্যায়ন ও সহায়তা করছে। দ্বিতীয়তো এই অর্থটি হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে মওকুফ সূত্রে বর্ণিত আছে। আর আলি (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত আছে।

عن علي (رضـ) عن النبى صلى الله عليه وسلم من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار، قال علي (رضـ) فمن ثم عاديت رأسي وكان يجز شعره

(معارف السنن ج١، صـ٣٦٦-٣٦٧)-

'হজরত আলি (রা.) নবী করিম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি ফরজ গোসলের একটি চুল পরিমাণ জায়গা না ধোয়া, তবে তাকে জাহান্নামে এমন এমন শাস্তি দেওয়া হবে। আলি (রা.) বলেছেন, তাই আমি আমার মাথার প্রতি শত্রুতা পোষণ করেছি। তিনি তাঁর চুল মুণ্ডিয়ে ফেলতেন।'

অনেকে এটাকেও হজরত আলি (রা.)-এর ওপর মওকুফ সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু সহিহ হলো, এটা মারফু। ইমাম নববি (র.) এক স্থানে যদিও এ হাদিসটিকে জয়িফ বলেছেন, কিন্তু অন্যত্র এটাকে হাসানও বলেছেন। সংক্ষিপ্ত কথা হলো এ হাদিসটি প্রমাণিত।

بَابُ فِى الْوُضُوْءِ بَعْدَ الْغُسْلِ (٢٩)

অনুচ্ছেদ- ৭৯ : গোসলের পর ওজু করা প্রসঙ্গে (মতন ২৯)

عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ ـ

১০৭. **অর্থ :** হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করিম ﷺ গোসলের ওপর ওজু করতেন না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এটা একাধিক সাহাবি ও তাবেয়ির মাজহাব যে, গোসলের পর ওজু করবে না।

দরসে তিরমিযী

كان يتوضأ بعد الغسل : ফুকাহায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে এ ব্যাপারে যে, গোসলে ওজু ওয়াজিব নয়; বরং মাসনুন। শুধু দাউদ জাহেরি থেকে ওয়াজিব হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু গোসলের পর ওজুর প্রয়োজন নেই এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। বরং মু'জামে তাবারানি কাবির, আওসাত, সগিরে একটি হাদিস নিম্নেযুক্ত বর্ণনা করেছেন,

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ بعد الغسل فليس منا-

'হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন গোসলের পর যে ওজু করবে সে আমার দলভুক্ত নয়।'

তবে এর সনদ জয়িফ। আল্লামা হায়সামি (র.) মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ১/২৭৩ এ এ হাদিসটি উল্লেখ করত: বলেন,

وفى اسناد الأوسط سليمان بن أحمد كذبه ابن معين وضعفه غيره ووثقه عبدان ـ

'আওসাতের সনদে সুলায়মান ইবনে আহমদ নামক বর্ণনাকারি রয়েছেন। ইবনে মাইন তাঁকে মিথ্যুক বলেছেন। অন্য কেউ তাঁকে জয়িফ বলেছেন। আর আবদান তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।'

بَابُ مَاجَاءَ اِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ

অনুচ্ছেদ- ৮০ : স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ একত্রিত হলে গোসল ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে (মতন ৩০)

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ اِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَاغْتَسَلْنَا ـ

১০৮. **অর্থ :** হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যখন পুরুষের খতনার স্থল রমণীর খতনার স্থল অতিক্রম করে তখন গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুরূপ করে আমরা গোসল করেছি।

আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও রাফে' ইবনে খাদিজ (র.) থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (وفى ن بـ النبى) صلى الله عليه وسلم اِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ ـ

১০৯. অর্থ : হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন পুরুষের খতনার স্থল রমণীর যৌনাঙ্গের খতনার স্থল অতিক্রম করে তখন গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আয়েশা (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح। তিনি বলেছেন, এই হাদিসটি একাধিক সূত্রে হজরত আয়েশা (রা)-এর সনদে নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন পুরুষের খতনার স্থল নারীর খতনার স্থল অতিক্রম করবে, তখন গোসল আবশ্যক হবে। এটা অধিকাংশ সাহাবির মত। তন্মধ্যে রয়েছে আবু বকর, উমর, উসমান, আলি ও আয়েশা (রা.)। এমনভাবে তাবেয়িন ও তৎপরবর্তী অধিকাংশ ফুকাহার মাজহাব। যেমন, সুফিয়ান সাওরি, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর মাজহাব। তাঁরা বলেছেন, গোসল ওয়াজিব হয়ে যায় দুই খতনার স্থল মিলিত হলে।

দরসে তিরমিযী

اذا جاوز الختان الختان : প্রথম ختان দ্বারা উদ্দেশ্য পুরষের খতনার স্থান। আর দ্বিতীয় ختان দ্বারা উদ্দেশ্য রমণীর খতনা জায়গা।

وهو لحمة فى اعلى الفرج عند ثقب البول كعرف الديك وكانت العرب تختن المرأة وتعدها مكرمة لها لكون الجماع بالمختونة الذ .

তা হলো, পেশাবের ছিদ্রের নিকট লজ্জাস্থানের ওপরের অংশে মোরগের চুটের মতো একটি মাংসের টুকরা। আরবরা মহিলাদের খতনা করতেন এবং এটাকে তার জন্য সম্মানের বিষয় মনে করতেন। কেনোনা, খতনাকৃত রমণীর সাথে সহবাসের স্বাদ উপভোগ বেশি হয়।

খিতানের পরিবর্তে আরবিতে خفاض শব্দ ব্যবহৃত হয় মহিলাদের জন্য; কিন্তু এখানে তাগলিব বা প্রবলতার ভিত্তিতে ختان শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর খতনার স্থান অতিক্রম দ্বারা ইঙ্গিত হলো, সুপারি ভেতরে প্রবিষ্ট করা, লজ্জাস্থানের মাথা নারীর যৌনাঙ্গে ঢুকে যাওয়া।

উল্লেখিত হাদিসে এ কথার ওপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, গোসল ওয়াজিব হওয়ার জন্য বীর্যপাত জরুরি নয়; বরং যদি সুপারি ভেতরে ঢুকে তবে বীর্যপাত ব্যতিত গোসল ওয়াজিব হয়। অবশ্য সাহাবিযুগে এ সম্পর্কে কিছু মতানৈক্য ছিলো। প্রথমদিকে সাহাবায়ে কেরামের একদল বলতেন যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত বীর্যপাত না হবে, শুধুমাত্র খতনার স্থল মিলিত হলে গোসল ওয়াজিব নয়। কিন্তু হজরত উমর (রা.)-এর জামানায় প্রিয়নবী (স.)-এর পবিত্র স্ত্রীগণের শরণাপন্ন হওয়ার পর সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, গোসল ওয়াজিব হবে শুধু খতনার স্থলে মিলিত হলে।

যারা গোসল ওয়াজিব নয় বলতেন, তাদের প্রমাণ ছিলো সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হজরত আবু সায়িদ খুদরি (রা.)-এর বর্ণনা,

عن عبد الرحمن بن سعيد الخدرى عن ابيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين إلى قباء حتى اذا كنا فى بنى سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر ازاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله! أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء ـ (صحيح مسلم جـ١، صـ١٥٥)

'আব্দুর রহমান ইবনে, সাইদ আল খুদরি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সোমবার দিন কিংবা এলাকার দিকে বেরিয়ে গেলাম। আমরা বনু সালেম গোত্রে গিয়ে পৌছলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতবান (রা.)-এর দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলেন। তিনি তাঁর চাদর হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বেরিয়ে এলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লোকটিকে আমরা তাড়াহুড়ায় ফেলে দিয়েছি। তখন ইতবান (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে বলুন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করে ফেলেছে, বীর্যপাত করেনি। তার ওপর কি (গোসল ফরজ)? জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, গোসল তো ফরজ হয়ে থাকে কেবল বীর্যপাতের ফলে।

তেমনি সহিহ মুসলিমে হজরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) থেকে বর্ণনা রয়েছে,

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في الرجل يأتي اهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ ۔ (مسلم ج١ ص١٥٥)

'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকট গমন করে (যৌন কর্মে মিলিত হয়) তারপর বীর্যপাত না করে (তার হুকুম তিনি বর্ণনা করেছেন)। লোকটি তার পুরুষাঙ্গ ধুবে এবং ওজু করে নেবে।

কিন্তু এসব প্রমাণাদির জবাব উবাই ইবনে কা'ব (রা)-এর অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে। যেটি পরবর্তী অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে,

عن ابى بن كعب (رضـ) قال انما كان الماء من الماء رخصة فى اول الإسلام ثم نهى عنه ۔

'হজরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেছেন, শুধু বীর্যপাতের কারণে গোসলের সুযোগ ছিলো ইসলামের প্রথম দিকে। তারপর তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।'

এ থেকে বোঝা গেলো, انما الماء من الماء -এর হুকম মনসুখ হয়ে গেছে। হজরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) ব্যতিত হজরত রাফে' ইবনে খাদিজ (রা.) ও স্পষ্ট ভাষায় রহিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। মুসনাদে আহমদ এবং মু'জামে তাবারানি আওসাতে তাঁর বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে এভাবে,

قال نادانى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على بطن إمرأتى فقمت ولم انزل فاغتسلت وخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنك دعوتنى وانا على بطن امرأتى فقمت ولم انزل فاغتسلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، عليك الماء من الماء ۔ قال رافع ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل ۔

(مجمع الزوائد ج١، باب فى قول الماء ص٢٦٦)-

'তিনি বলেছেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ডাক দিলেন। তখন আমি ছিলাম আমার স্ত্রীর পেটের ওপর (সহবাস রত)। ফলে আমি উঠে চলে এলাম, বীর্যপাত করলাম না। তারপর গোসল করলাম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বেরিয়ে এলাম। এসে তাঁকে সব বলে দিলাম। আপনি আমাকে ডেকেছিলেন, আমি তখন ছিলাম আমার অর্ধাঙ্গিনীর পেটের ওপর। ফলে সেখান থেকে উঠে চলে এলাম বীর্যপাত ছাড়াই। তারপর গোসল করলাম। এ শুনে রাসূল ﷺ বললেন না, তোমার ওপর গোসল ফরজ কেবল বীর্যপাতের কারণেই। রাফে' বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পরবর্তীতে আমাদেরকে গোসলের নির্দেশ দিলেন।'

তা ছাড়া সহিহ ইবনে হাব্বানে হজরত আয়েশা (রা.)-এর হাদিস আছে,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولا يغتسل وذلك قبل فتح مكة ثم اغتسل بعد ذلك ۔ (معارف السنن ج١، ص٣٨١)

'রাসূলুল্লাহ ﷺ তা করতেন; কিন্তু গোসল করতেন না। এটা ছিলো মক্কা বিজয়ের পূর্বেকার ব্যাপার। তারপর গোসল করেছেন।'

এ সকল হাদিস الماء من الماء হাদিস রহিত হওয়ার প্রমাণ। এটাই ফারুকে আজম (রা.)-এর যুগে পুরুষের খতনার স্থল রমণীর খতনার স্থলের সাথে মিলিত হওয়ার ফলে গোসল ওয়াজিব হওয়ার ওপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[১]

ইমাম তিরমিযী (র.) পরবর্তী অধ্যায়ে হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন قال انما الماء من الماء فى الإحتلام তথা বীর্যপাতের কারণে গোসল ফরজ হওয়ার বিষয়টি স্বপ্নদোষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অনেকে হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বক্তব্যের অর্থ এই বলেছেন যে, হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) الماء من الماء হাদিসের এই ব্যাখ্যা করতেন যে এটি মানসুখ নয়, বরং স্বপ্নদোষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; কিন্তু এটা ঠিক নয়। কারণ, الماء من الماء হাদিস স্বপ্নদোষ সংক্রান্ত নয়; বরং জাগ্রত অবস্থায় সহবাস সংক্রান্ত। যেমন, হজরত আবু সায়িদ খুদরি (রা.)-এর বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়। অতএব, হজরত শাহ সাহেব (র.)-এর বক্তব্য মুতাবেক হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, انما الماء من الماء হাদিস জাগ্রত অবস্থায় সহবাসের ক্ষেত্রে রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু স্বপ্নদোষের ক্ষেত্রে নয়, বরং এ ক্ষেত্রে এ হুকুম তামিল করা এখনও ওয়াজিব। এখনও এ হুকুম বহাল। অনেক সময় এমন হয়ে থাকে যে, একটি হাদিসের ওপর কোনো কোনো শাখাগত বিষয়ে আমল করা ওয়াজিব থেকে যায়।

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ (صـ ٣١)

অনুচ্ছেদ- ৮১ : বীর্যপাতের কারণে গোসল ফরজ হওয়া প্রসঙ্গে (মতন ৩১)

عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ اِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِى اَوَّلِ الْاِسْلَامِ ثُمَّ نُهِىَ عَنْهَا ـ

১১০. অর্থ : হজরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, শুধু বীর্যপাতের কারণে গোসলের অনুমতি ছিলো ইসলামের প্রাথমিক যুগে, তারপর তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ ـ

১১১. অর্থ : হজরত জুহরি হতে এই সনদে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। (পূর্বেযুক্ত হাদিসের বরাত দ্রষ্টব্য)

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। শুধু বীর্যপাতের কারণে গোসল ছিলো ইসলামের প্রথমদিকে, তারপর তা রহিত হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে একাধিক সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে

টীকা- ১. এর বিস্তারিত বিবরণ তাহাবি শরহে মা'আনিল আছারে باب الذى يجامع ولا يكسل তে দিয়েছেন। তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন রাওহ ইবনুল ফারাজ-ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বুকাইর-লাইস-মা'মার ইবনে আবু হাবিবা-উবায়দুল্লাহ ইবনে আদি ইবনুল খিয়ার সূত্রে, তিনি বলেছেন, একবার সাহাবায়ে কেরাম উমর ইবনুল খাত্তাবের নিকট ফরজ গোসল সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। অনেকে বললেন, যখন পুরুষের খতনার স্থল মহিলাদের খতনার স্থল অতিক্রম করবে তখন গোসল ওয়াজিব হবে। আর অনেকে বললেন, বীর্যপাত হলেই কেবল গোসল ফরজ। তখন উমর (রা.) বললেন, তোমরা আমার সামনে মতবিরোধ করেছ। অথচ, তোমরা হলে বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তবে তোমাদের পরবর্তী লোকজনের কি অবস্থা হবে? তখন আলি ইবনে আবু তালেব (রা.) বললেন, আমিরুল মু'মিনিন! আপনি যদি বিষয়টি জানতে চান তাহলে নবী করিম ﷺ-এর সহধর্মিনিগণের নিকট সংবাদ পাঠান। এ ব্যাপারে তাঁদের জিজ্ঞেস করুন। ফলে আয়েশা (রা.)-এর নিকট তিনি লোক পাঠালে তিনি বললেন, পুরুষের খতনার স্থান নারীর খতনার স্থান অতিক্রম করলে গোসল ওয়াজিব হবে। ফলে উমর (রা.) বললেন, এরপরে আমি যদি কাউকে বলতে শুনি, বীর্যপাত হলেই গোসল ফরজ হবে, তবে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবো। ইমাম তাহাবি (র.) বলেছেন,এখানে উমর (রা.) লোকজনকে সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। এর বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করেননি বা তা অস্বীকার করেননি। –সংকলক।

রয়েছেন উবাই ইবনে কা'ব, রাফে' ইবনে খাদিজ (রা.)। অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, কেউ যদি তার স্ত্রীর যৌনাঙ্গে সহবাস করে তাহলে উভয়ের ওপর গোসল ওয়াজিব, তাদের বীর্যপাত যদিও না হয়ে থাকে।

عن ابن عباس (رضـ) قال : انما الماء من الماء فى الاحتلام .

১১২. অর্থ : হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, শুধুমাত্র বীর্যপাতের কারণে গোসলের হুকুম স্বপ্নদোষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, জারূদকে আমি বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ওয়াকি'কে বলতে শুনেছি, এ হাদিসটি আমরা শরিক ব্যতিত অন্য কারো নিকট পাইনি। এ অনুচ্ছেদে উসমান ইবনে আফ্ফান, আলি ইবনে আবু তালেব, জুবায়র, ত্বালহা, আবু আইয়ুব ও আবু সায়িদ (রা.) সূত্রে নবী করিম ﷺ থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি এরশাদ করেছেন, বীর্যপাতের কারণেই গোসল ফরজ। দাউদ ইবনে আবু আউফ আবুল হাজ্জাফের নাম।

হজরত সুফিয়ান সাওরি হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমাদেরকে আবুল হাজ্জাফ হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর তিনি ছিলেন পছন্দসই সন্তোষজনক ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি।

بَابُ فِيْمَنْ يَسْتَيْقِظُ وَيَرٰى بَلَلًا وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا

অনুচ্ছেদ- ৮২ : নিদ্রা থেকে উঠে ভেজা দেখে স্বপ্ন স্মরণ না থাকলে সে কী করবে?

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا ؟ قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ يَرٰى اَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا ؟ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرٰى ذٰلِكَ غُسْلٌ؟ قَالَ نَعَمْ اِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ .

১১৩. অর্থ : হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'এক ব্যক্তি ভেজা পেয়েছে কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ নেই'– এমন ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলে আকরাম ﷺ জিজ্ঞেসিত হলে তিনি জবাবে বললেন, সে গোসল করবে। আরেক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তার উপর গোসল ফরজ নয়। সে ব্যক্তি হলো যে স্বপ্নে দেখে তার স্বপ্নদোষ হয়েছে, অথচ ভেজা পায়নি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

উম্মে সালামা (রা.) বলেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মহিলা যদি এমন স্বপ্ন দেখে তাহলে তার ওপর কি গোসল ফরজ? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, মহিলারা পুরুষদেরই মতো।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, শুধু আবদুল্লাহ ইবনে উমর উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, আয়েশা (রা.)-এর হাদিস যে, পুরুষ ভেজা পাবে অথচ স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ থাকবে না। আর আবদুল্লাহকে স্মরণশক্তির দিক দিয়ে হাদিসের ব্যাপারে ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। এটা একাধিক সাহাবি ও তাবেয়ি আলেমের মত। কোনো ব্যক্তি যদি ঘুম থেকে উঠে ভেজা দেখে তবে সে গোসল করবে। এটা সুফিয়ান ও আহমদ (র.)-এর মাজহাব। কোনো কোনো তাবেয়ি আলেম বলেছেন, তার ওপর গোসল ওয়াজিব হবে শুধুমাত্র তখনই, যখন এই সিক্ততা বীর্যের ভিজা হয়। শাফিঈ ও ইসহাক (র.)-এর মাজহাব এটাই।

যখন স্বপ্নদোষ থেকে দেখবে তবে (কাপড় বা বিছানা) ভেজা না দেখে তবে অধিকাংশ আলেমের মতে তার ওপর গোসল ওয়াজিব নয়।

দরসে তিরমিযী

يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغسل : এ হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে দুটি মাসআলা।

১. যদি স্বপ্নের কথা মনে হয় কিন্তু কাপড়ে ভিজা ইত্যাদি না থাকে, তাহলে এর দ্বারা গোসল ওয়াজিব নয়। এই মাসআলাতে না কোনো মতভেদ রয়েছে, না কোনো বিবরণ।

২. দ্বিতীয় মাসআলা হলো, জাগ্রত হওয়ার পর কাপড়ে সিক্ততা নজরে এলো, তাহলে এতে কিছু তাফসিল এবং সামান্য ইখতেলাফ রয়েছে। আল্লামা ইবনে আবিদিন শামি (র.) এই মাসআলাটিতে চৌদ্দটি পদ্ধতি লিখেছেন,

এক. ভিজা জিনিসটি বীর্য হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান বা একিন হবে।

দুই. মজি হওয়া নিশ্চিত হবে।

তিন. অদি হওয়া নিশ্চিত হবে।

চার. প্রথমোক্ত দুটির ব্যাপারে সংশয় হবে।

পাঁচ. শেষোক্ত দুটির ব্যাপারে সংশয় হবে।

ছয়. প্রথম এবং শেষটির ব্যাপারে সংশয় হবে।

সাত. তিনটির ব্যাপারেই সংশয় হবে।

তারপর এ প্রত্যেকটি সুরতে স্বপ্নের কথা মনে হবে অথবা হবে না। এমনভাবে মোট চৌদ্দটি সুরত হলো। তার মধ্যে নিম্নেযুক্ত সাতটি সুরতে গোসল আবশ্যক,

১. মণি বা বীর্য হওয়ার একিন হবে এবং স্বপ্ন স্মরণ থাকবে।

২. মণি হওয়ার নিশ্চিত হবে কিন্তু স্বপ্ন স্মরণ হবে না।

৩. মজি হওয়া নিশ্চিত হবে এবং স্বপ্ন স্মরণে আসবে এবং ৪, ৫, ৬ ও ৭ তথা চার নম্বর থেকে সাত নম্বর পর্যন্ত সন্দেহের চারটি সুরত যখন স্বপ্ন মনে আসবে।

নিম্নেযুক্ত চারটি সুরতে গোসল সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব নয়।

এক. অদি হওয়া নিশ্চিত হবে স্বপ্ন মনে আসবে।

দুই. অদি হওয়া নিশ্চিত হবে এবং স্বপ্ন মনে আসবে না।

তিন. মজি হওয়া নিশ্চিত হবে এবং স্বপ্ন মনে আসবে না।

চার. মজি এবং অদি হওয়া ব্যাপারে সন্দেহ হবে এবং স্বপ্ন মনে আসবে না।

নিম্নেযুক্ত সুরতগুলোতে মতবিরোধ রয়েছে,

১. মণি এবং মজির ব্যাপারে সন্দেহ হবে এবং স্বপ্ন মনে আসবে না।

২. মণি এবং অদির ব্যাপারে সন্দেহ হবে, স্বপ্ন মনে আসবে না।

৩. তিনটির ব্যাপারে সন্দেহ হবে এবং স্বপ্ন মনে আসবে না।

ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এসব সুরতে সতর্কতামূলক গোসল ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে গোসল ওয়াজিব নয়। কেনোনা, গোসল ওয়াজিবের কারণে সন্দেহ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ (র.) হাদিসটির ব্যাপকতা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এটাকে সে সাতটি সুরতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরেন, যেগুলোতে তার নিকট গোসল আবশ্যক। কিন্তু ফতওয়া হলো, আবু হানিফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর বক্তব্যের ওপর।

ان النساء شقائق الرجال : এর দ্বারা বোঝায়, রমণীরা পুরুষদের মতোই তাদেরও স্বপ্নদোষ হয়। বাস্তবে যদিও তা কম হয়। যখন মোটামুটি বয়স হয়ে যায় অধিকাংশ মহিলার তখন স্বপ্নদোষ হয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمَنِىِّ وَالْمَذْىِ[1] (ص ٣١)

অনুচ্ছেদ-৮৩ : বীর্য এবং মজি প্রসঙ্গে (মতন ৩১)

عَنْ عَلِىٍّ (رض) قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَذْىِّ؟ فَقَالَ مِنَ الْمَذْىِّ الْوُضُوْءُ وَمِنَ الْمَنِىِّ الْغُسْلُ .

১১৪. অর্থ : হজরত আলি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি মজি বা রস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে তিনি বলেছেন, মজির ফলে ওজু ওয়াজিব, আর মণির ফলে গোসল ওয়াজিব।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ ও উবাই ইবনে কা'ব (রা.) থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। হযরত আলি (রা.) সূত্রে নবী করিম ﷺ হতে একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, মজির কারণে ওজু আর বীর্যের ফলে গোসল ওয়াজিব। এটা সাহাবি ও তাবেয়িন অধিকাংশ আলেমের বক্তব্য। শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক (র.)ও পোষণ করেন এ মতই।

দরসে তিরমিযী

ومنى المرأة ماء أبيض لا مثل بياض مائه : পুরুষাঙ্গ থেকে যা স্বভাবত বের হয় তা পেশাব ছাড়া মোট তিন প্রকার– মণি, মজি, অদি।

মণির ব্যাপক সংজ্ঞা হলো,

ماء أبيض ثخين يتولد منه الولد وهم يتدفق فى خروجه ويخرج بشهوته من بين صلب الرجل وترائب المرأة ويستعقبه الفتور وله رائحة كرائحة الطلع . (ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين)

'শুভ্র, ঘনরস যা থেকে সন্তান জন্ম নেয়। এটি সবেগে বের হয়। যৌন চাহিদা সহকারে পুরুষের পৃষ্ঠদেশ ও মহিলার বক্ষ পাঁজড়ের মধ্য থেকে বের হয়। এরপর দুর্বলতা নেমে আসে। এতে খেজুরের রসের দুর্গন্ধের মতো দুর্গন্ধ আছে। এটির দুর্গন্ধ আটার দুর্গন্ধের মতো।'

টীকা- ১. ইমাম খাত্তাবি (র.) বলেছেন, অধিকাংশ আলেমের মতে مذى শব্দটির ذال -এর মধ্যে যের ইয়ার মধ্যে তাশদিদ। অথচ মূলত শব্দটি المذى তথা ذال -এর ওপর সাকিন।

মজি বলা হয়, মানুষের সামনের রাস্তা তথা যৌনাঙ্গ থেকে নিঃসৃত পদার্থকে, যেটি বের হয় ফুর্তির সময় অথবা স্ত্রীর সাথে বিনোদন বা শৃংগার ইত্যাদির সময়। আর ودى শব্দটির و -এর ওপর যবর, دال -এর ওপর সাকিন। এটি বের হয় প্রস্রাবের পর। আর منى শব্দটির يا -এর মধ্যে তাশদিদ। মণি হচ্ছে সবেগে স্খলিত রস, তথা বীর্য। مذى ,ودى আলিফ ছাড়া, আর امنى আলিফ সহকারে বলা হয়। -ইসলাহু খাতায়িল মুহাদ্দিসিন, ছাপা কায়রো।

এর টীকাকার বলেছেন, গ্রন্থকার মজি এবং অদি শব্দটির যে হরকত উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে আবু উবায়দার রায়। আল্লামা আজহারি (র.) উমারি থেকে তিনটি শব্দের يا -এর মধ্যেই তাশদিদও উদ্ধৃত করেছেন। শায়খ বিন্নৌরি (র.) মা'আরিফুস্ সুনান : ১/৩৭৬ তে বলেছেন, মজি শব্দটির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কেরাত রয়েছে। সবচেয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ (আফসাহ) হলো মীমের ওপর যবর 'যাল' সাকিন, ইয়া সাকিন। তারপর হলো, যালের ওপর যের ইয়ার ওপর তাশদিদ।

অভিধানবিদ সায়িদ ইবনে ইয়াহইয়া বলেছেন, মজি, মণি, অদি সবগুলোতে ইয়া তাশদিদযুক্ত। আবু উবায়দা বলেছেন, শুধু মণি শব্দটি ইয়া তাশদিদ যুক্ত। অবশিষ্ট দুটি তাশদিদ বিহীন। –ফাতহুল বারি, আরিয়া। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বাহরুর রায়েক' : ১/৬২, শরহুল মুহাজ্জাব : ২/১৪০

ইবনে হাজার (র.) বলেছেন– ومنى المرأة ماء أبيض لا مثل بياض مائه رقيق وليس له رائحة

'রমণীর বীর্য সাদা রস। পুরুষের রসের মতো সাদা নয়। এটি তরল। তাতে দুর্গন্ধ নেই।'

কোনো কোনো ফকিহ এটাকেই ব্যক্ত করেছেন এভাবে,

ومنى المرأة اصفر رقيق وقد يبيض لفضل قوتها : রমণীর বীর্য হলুদ তরল। কখনও সাদা হয়, নারীর শক্তির দাপটে।

মজির সংজ্ঞা,

هو ماء أبيض رقيق وقد لزج يخرج عند الملاعبة او تذكر الجماع او ادارته من غير شهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه وهو اغلب فى النساء من الرجال ـ {هذا ملخص ما قاله ابن حجر (رحـ) وابن نجيم (رحـ)}

'তা হলো শুভ্র তরল লাসা জাতীয় রস। এটি নির্গত হয় শৃঙ্গারের সময় অথবা সঙ্গমের কথা খেয়াল করলে বা তার ইচ্ছা করলে যৌন চাহিদা ও বেগ ব্যতিত। এরপর দুর্বলতা নেমে আসে না। অনেক সময় তা নির্গত হওয়ার বিষয়টি অনুভূতও হয় না। এটি মহিলাদের মধ্যে বেশি ও প্রবল হয়ে থাকে পুরুষদের তুলনায়।'

অদির সংজ্ঞা,

هو ماء أبيض كدر ثخين يشبه المنى فى الثخانة ويخالفه فى الكدورة ولا رائحة له ويخرج عقيب البول اذا كانت الطبيعة مستمسكة وعند حمل شئ ثقيل ويخرج قطرة او قطرتين ونحوهما ـ (البحر الرائق جـ١، صـ٢٦)

'তা হলো, মলিন সাদা ঘন রস। ঘনত্বের দিক দিয়ে এটি বীর্যের মতো, কিন্তু মলিনতার দিক দিয়ে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এর কোনো দুর্গন্ধ নেই। এটি পেশাবের পর নির্গত হয়, যখন স্বভাব মজবুত ও সুঠাম থাকে। ভারি জিনিস বহন করার সময়ও এটি বের হয়। এটি একফোঁটা দু'ফোঁটা বা অনুরূপ বেরোয়।

অদি বের হয় কখনো পেশাবের পূর্বে আবার কখনও পেশাবের সাথে। কোনো কোনো ফকিহ এজন্য বলেছেন, يخرج مع البول (পেশাবের সাথে নির্গত হয়।) আবার কেউ বলেছেন, يسبق البول (পেশাবের আগে বের হয়।) এ দুটোতে কোনো বৈপরীত্য নেই।

মণি কামনাসহ বের হলে তখন সর্বসম্মতিক্রমে তা গোসল ওয়াজিবের কারণ হয়। আর যদি যৌন আবেদন ছাড়া বের হয়, তবে তাতে রয়েছে মতবিরোধ। হানাফিদের নিকট তা গোসল ওয়াজিবের কারণ নয়। কোনো কোনো ফকিহের মতে গোসল ওয়াজিব হবে।

এমন করে বীর্যের পবিত্রতা ও অপবিত্রতা সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। এ আলোচনা পরবর্তীতে হবে। মজির অপবিত্রতা এবং ওজু ভঙ্গের কারণ হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। অবশ্য পবিত্র করার পদ্ধতিতে মতানৈক্য রয়েছে, যার বিবরণ পরবর্তী অনুচ্ছেদ আসবে। আর অদি যে নাপাক এবং ওজু ভঙ্গকারি এবং এর পবিত্রকরণের পদ্ধতি সবগুলোতে ঐকমত্য রয়েছে।

سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن المذى ـ

এ বিষয়টি এখানে লক্ষণীয় যে, হযরত আলি (রা.)-এর বক্তব্য দ্বারা এই হাদিসে বোঝা যায় যে, মজি সম্পর্কে তিনি নিজেই প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু সহিহ বোখারির[১] বর্ণনায় এসেছে– أمرت رجلا أن يسأل (আমি এক ব্যক্তিকে

টীকা- ১. ১/৪১. باب غسل المذى والوضوء منه

জিজ্ঞেস করার নির্দেশ দিয়েছিলাম) নাসায়ির[১] এক বর্ণনায় হজরত আম্মার (রা.)-কে আর দ্বিতীয় এক বর্ণনায় মিকদাদ (রা.)-কে প্রশ্নকারি বলা হয়েছে। এসব বর্ণনা বিশুদ্ধ। এমনভাবে আবু দাঊদের[২] বর্ণনাগুলোতে আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ (রা.) এবং সাহল ইবনে হুনাইফ (রা.)-কে এবং তাবারানির[৩] বর্ণনায় হজরত উসমান (রা.)-কে প্রশ্নকারি সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু এ তিনটি বর্ণনা জয়িফ। সুতরাং এগুলোর ইখতেলাফ গ্রহণযোগ্য হবে না।[৪] অবশ্য আগের বিশুদ্ধ বিরোধ রয়েছে।

আল্লামা ইবনে হাব্বান (র.)-এর জবাব এই দিয়েছেন যে, প্রশ্নকারি হজরত আলি (রা.) এবং প্রশ্নের মজলিসে হজরত আম্মার ও মিকদাদ (রা.)-ও ছিলেন। তাই কখনও সম্বোধন করা হয়েছে তাদের দিকেও। তবে হাফেজ ইবনে হাজার (র.) এই জবাবটি প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন এই জবাবটি নাসায়ির বর্ণনার বিপরীত। যাতে হজরত আলি (রা.) বলেছেন,

كنت رجلا مذاء وكانت ابنة النبى صلى الله عليه وسلم تحتى فاستحييت أن أسأله فقلت لرجل جالس إلى جنبه سله... الخ

'আমি ছিলাম প্রচুর মজিসম্পন্ন পুরুষ। রাসূল ﷺ-এর কন্যা ছিলেন আমার স্ত্রী। সুতরাং আমি তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করছিলাম। ফলে আমার পাশে বসা এক ব্যক্তিকে বললাম, তুমি জিজ্ঞেস করো।'

এ থেকে বোঝা যায় যে, স্বয়ং তিনি প্রশ্ন করেননি। হাফেজ (র.) বলেছেন, ইমাম নববি (র.)-এর জবাবটি বিশুদ্ধ যে, হজরত আলি (রা.) এ মাসআলাটি হজরত মিকদাদ এবং হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) উভয়ের মাধ্যমে হয়তো জিজ্ঞেস করেছিলেন। যেহেতু হজরত আলি (রা.) নির্দেশদাতা, আর ক্রিয়ার সম্বোধন যেমনভাবে আদিষ্ট ব্যক্তির দিকে হয়, এমনভাবে নির্দেশদাতার দিকেও হয়, এজন্য প্রশ্নের সম্বোধন হজরত আলি, হজরত আম্মার, হজরত মিকদাদ (রা.) তিন জনের দিকে একই সময়ে সঠিক এবং বিশুদ্ধ। সুতরাং কোনো বিরোধ অবশিষ্ট নেই।

بَابٌ فِى الْمَذِىِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ (صـ ٣١)

অনুচ্ছেদ-৮৪ : কাপড়ে মজি লাগলে কী করণীয়? (মতন ৩১)

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنْتُ اَلْقَى مِنَ الْمَذِىِّ شِدَّةً وَعَنَاءً فَكُنْتُ اُكْثِرُ مِنْهُ الْغُسْلَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَسَأَلْتُهُ عَنْهُ؟ فَقَالَ اِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذٰلِكَ الْوُضُوْءُ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! كَيْفَ بِمَا يُصِيْبُ ثَوْبِىْ مِنْهُ؟ قَالَ يَكْفِيْكَ اَنْ تَاْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهٖ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرٰى اَنَّهٗ اَصَابَ مِنْهُ.

১১৫. অর্থ : সাহল ইবনে হুনাইফ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মজির কারণে অনেক দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতাম। তাই আমি অনেক বার গোসল করতাম। সুতরাং এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে আলোচনা করলাম। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি জবাবে বললেন, এর ফলে তোমার জন্য ওজুই যথেষ্ট হবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমার কাপড়ে মজি লেগে যায়? তাহলে তবে কি করবো? জবাবে তিনি বললেন, তোমার জন্য যথেষ্ট হবে যেখানে মজি লেগেছে এক অঞ্জলি পানি দিয়ে সাধারণভাবে তা দ্বারা তোমার কাপড়ের সেই অংশ ধোয়া।

টীকা- ১. ১/৩৬, باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذى

টীকা- ২. ১/২৮, باب فى المذى

টীকা- ৩. নসবুর রায়াহ : ১/৪৯, গোসল অনুচ্ছেদের শেষাংশ।

টীকা- ৪. তাছাড়া হজরত উসমান এবং হজরত সাহল ইবনে হুনাইফ (রা.)-এর প্রশ্ন স্বয়ং নিজস্ব সাধারণ অবস্থা সংক্রান্ত ছিলো, হজরত আলি (রা.)-এর ঘটনার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। –সকংলক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের হাদিসেই মজি সম্পর্কে কেবল অনুরূপ বিবরণ আমরা জানি, অন্য কারও বর্ণনায় না।

কাপড়ে মজি লেগে গেলে কি করতে হবে, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম মতবিরোধ করেছেন। অনেকে বলেছেন, ধোয়া ব্যতিত যথেষ্ট হবে না। এটা শাফেয়ি ও ইসহাক (রা.)-এর মাজহাব। আর অনেকে বলছেন, হালকাভাবে ধুলেই চলবে। ইমাম আহমদ (র.) বলেছেন, আমি আশা করি তা পানি দিয়ে হাল্কাভাবে ধৌত করলেই হবে।

দরসে তিরমিযী

يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك : ইমাম আহমদ (র.) এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করে বলেন, শুধু পানির ছিটা মারলেই মজি থেকে পবিত্রতা অর্জিত হয়। যেমন, দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাবেও পানির ছিটা মারা যথেষ্ট। ইমামত্রয় এবং জমহুরের মাজহাব হলো, মজি থেকে পবিত্রতা শুধু ধোয়ার মাধ্যমেই হবে। জমহুর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে تنضح শব্দটিকে সাধারণ ধোয়া অথবা হালকা ধোয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করেন। তাঁদের প্রমাণ সহিহ বোখারিতে আছে اغسل ذكرك (তোমার যৌনাঙ্গ ধোও) শব্দ।

পুরুষাঙ্গ ধোয়ার হুকুমে কারণ হলো, মজি লাগা। সুতরাং কাপড়ের হুকুমই হবে তাই।

বোখারির বর্ণনায় শুধু পুরুষাঙ্গ ধোয়ার নির্দেশ আছে। আর আবু দাউদের[২] বর্ণনায় পুরুষাঙ্গ এবং অণ্ডকোষ উভয়টি ধোয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে এটাও প্রকাশ্য অর্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং সর্বাবস্থায় পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডদ্বয়ও ধোয়া হয়ে যাবে। ইমাম তাহাবি (র.) বলেছেন, অণ্ডদ্বয় ধোয়ার হুকুম শরয়ি নয়, বরং চিকিৎসার্থে। কেনোনা ঠাণ্ডা পানি যেমনভাবে পেশাব ও দুধ বন্ধ করে, এমনভাবে মজিও বন্ধ করে। কেনোনা মজির সম্পর্ক অণ্ডদ্বয়ের সাথেই।

بَابُ فِى الْمَنِيِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ (صـ ٣١)

অনুচ্ছেদ- ৮৫ : কাপড়ে মণি লাগলে কী করবে (মতন ৩১)

عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ ضَافَ عَائِشَةَ (رضـ) ضَيْفٌ فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ فَنَامَ فِيْهَا فَاحْتَلَمَ فَاسْتَحْيٰ اَنْ يُّرْسِلَ اِلَيْهَا وَبِهَا اَثَرُ الْاِحْتِلَامِ فَغَمَسَهَا فِى الْمَاءِ ثُمَّ اَرْسَلَ بِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ (رضـ) لِمَ اَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا؟ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ اَنْ يَفْرُكَهُ بِاَصَابِعِهِ وَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِاَصَابِعِىْ .

১১৬. অর্থ : হজরত হাম্মাম ইবনুল হারেস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে একবার একজন মেহমান এলেন। তিনি তাঁর জন্য একটি হলুদ চাদরের নির্দেশ দিলেন। মেহমান তাতে ঘুমালেন। ঘটনাক্রমে তাঁর স্বপ্নদোষ হয়ে গেলো। তিনি লজ্জাবোধ করলেন আয়েশা (রা.)-এর কাছে স্বপ্নদোষের নিদর্শনসহ এই চাদর প্রেরণ করতে। ফলে তিনি তা পানিতে ডুবালেন। তারপর (ধুয়ে) এটি তাঁর কাছে প্রেরণ করলেন। এ দেখে আয়েশা (রা.) বললেন, মেহমান লোকটি কেনো আমাদের চাদরটি খারাপ করে ফেললেন? তার জন্য তো আঙুল দিয়ে এটি ডলে তুলে ফেলাই যথেষ্ট ছিলো। অনেক সময় আমি এই বীর্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে আমার আঙুলে ডলে তুলে ফেলেছি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। এটা একাধিক ফকিহ যেমন, সুফিয়ান, আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর মাজহাব।

মণি কাপড়ে লেগে গেলে তাদের মতে ডলে তুলে ফেললেই যথেষ্ট, যদিও তা না ধোয়া। তেমনি করে মানসুর-ইবরাহিম-হাম্মাম ইবনুল হারিস-আয়েশা (রা.) থেকে আ'মাশের বর্ণনার মতো হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আবু মা'শার বর্ণনা করেছেন, এ হাদিসটি ইবারাহিম-আসওয়াদ-আয়েশা (রা.) সূত্রে। অবশ্য আ'মাশের হাদিসটি বিশুদ্ধতম।

بَابُ غَسْلِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ (صـ ٣١)

অনুচ্ছেদ- ৮৬ : কাপড় থেকে মণি ধোয়া প্রসঙ্গে (মতন ৩১)

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّهَا غَسَلَتْ مَنِيًّا مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم -

১১৭. অর্থ : হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে মণি ধুইলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। আর আয়েশা (রা.)-এর এ হাদিস যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে বীর্য ধৌত করছেন।' এটি ডলে তুলে ফেলার হাদিসের বিপরীত নয়। যদিও ডলে তুলে ফেলা যথেষ্ট, তা সত্ত্বেও একজন ব্যক্তির জন্য মোস্তাহাব হলো, তার কাপড়ে মণির চিহ্ন দেখা না যায়। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, বীর্য হলো, নাকের শ্লেষ্মার পর্যায়ের। অতএব, এটি তোমার থেকে ইজখির ঘাস দিয়ে হলেও পরিষ্কার করে ফেলো।

দরসে তিরমিযী

মণির পবিত্রতা অপবিত্রতা সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। এই ইখতেলাফ সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই চলে আসছে। সাহাবিগণের মধ্যে হজরত ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস এবং ইমামগণের মধ্যে শাফেয়ি এবং আহমদ (র.)-এর মতে মণি পবিত্র। আল্লামা নববি (র.) বলেছেন, মণি সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর বিবরণ রয়েছে তিনটি,

১. পুরুষ-মহিলা উভয়ের মণি অপবিত্র।

২. পুরুষেরটি পবিত্র, মহিলারটি অপবিত্র।

৩. উভয়ের মণি পবিত্র।

ইমাম নববি (র.) বলেছেন, এই তৃতীয় বর্ণনাটি বিশুদ্ধতম এবং পছন্দনীয়। অনুরূপভাবে জীবজন্তুর মণি সম্পর্কে তার মতে তাফসিল রয়েছে। সেটি হচ্ছে, কুকুর এবং শূকরের মণি নাপাক। অন্যান্য জীবজন্তুর মণি সম্পর্কে তিনটি বর্ণনা রয়েছে,[১]

১. সমস্ত জীবজন্তুর মণি পবিত্র।

২. ব্যাপকভাবে অপবিত্র।

৩. গোশত খাওয়া যেগুলোর হালাল সেগুলোর মণি পবিত্র, যেগুলোর গোশত খাওয়া হালাল নয় সেগুলোর মণি নাপাক।

তার মধ্যে প্রথম বর্ণনাটি ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর কাছে পছন্দনীয় এবং প্রধান। (ইমাম নববি র.) এই তাহকিক পেশ করেছেন শরহে মুসলিমে-১/১৪০।)

টীকা- ১. প্রথম বর্ণনাটিকে ইমাম নববি (র.) শাজ (নগণ্য) এবং দ্বিতীয় বর্ণনাটিকে তার চেয়েও নগণ্যতম (আশাজ) সাব্যস্ত করেছেন। শরহে মুসলিম : ১/১৪০

হজরত উমর, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, আয়েশা, আবু হুরায়রা, আনাস (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এবং ইমামগণের মধ্যে সুফিয়ান সাওরি, ইমাম আওজায়ি, ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক (র.)-এর মতে মণি অপবিত্র।

লাইছ ইবনে সা'দের মাজহাব হলো, যদিও মণি নাপাক, কিন্তু যদি মণিযুক্ত কাপড়ে নামাজ পড়ে ফেলে, তবে দোহরানো ওয়াজিব নয়। হাসান বসরি (র.) বলেন, যদি মণি কাপড়ে লাগে,তাহলে নামাজ দোহরানো ওয়াজিব নয়। চাই মণি যতো বেশিই হোক না কেনো। যদি শরীরে লাগে তাহলে নামাজ দোহরানো ওয়াজিব, যতো কমই হোক।

মালেক (র.)-এর মতে মণি যেহেতু নাপাক এজন্য শুধু ধুলেই পবিত্রতা অর্জিত হবে, ডলে তোলা বা ঘষা যথেষ্ট হবে না।

হানাফিদের কাছে এর তাফসিল রয়েছে। 'দুর্‌রে মুখতার' গ্রন্থকার লিখেছেন,

الغسل ان كان رطبا والفرك ان كان يابسا

ধুতে হবে যদি মণি সিক্ত হয়ে থাকে। আর তবে ডলে-ঘষে তুললে যথেষ্ট হবে যদি শুষ্ক হয়। তিনি এর বেশি কোনো তাফসিল বর্ণনা করেননি। যা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত হলো যে, মণি চাই শুষ্ক তরল হোক অথবা ঘন, পুরুষের হোক বা মহিলার, ডলা বা খুঁচিয়ে তোলার দ্বারা পবিত্রতা লাভ হবে। কিন্তু আল্লামা শামি (র.) বলেছেন, ডলে বা ঘষে তোলা শুষ্ক ঘন বীর্যে যথেষ্ট, অন্যথায় ধোয়া জরুরি হবে। তারপর, 'দুররে মুখতার' গ্রন্থকার বলেছেন, ঢলে বা খুঁচিয়ে তোলা তখন যথেষ্ট হবে, যখন মণি স্খলনের পূর্বে পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করে নিবে। অন্যথায় ধোয়া জরুরি হবে। শামসুল আয়িম্মা সারাখসি (র.) বলেন, ডলে বা খুঁচিয়ে তোলার ব্যাপারে আমার দোদুল্যমানতা রয়েছে। কারণ, মণি বের হওয়ার পূর্বে অবশ্যই মজি বের হবে। আর মজি সর্বসম্মতিক্রমে নাপাক। যার জন্য ধোয়া জরুরি। অতএব, সে মণি মজির সাথে মিশ্রিত হয়ে কাপড়ে লেগে যাবে। কাজেই ডলা বা খুঁচিয়ে তোলা জায়েজ না হওয়ার কথা। কিন্তু আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেছেন, এতে দোদুল্যমানতার কোনো কারণ নেই। কেনোনা মজির পরিমাণ এতোটা কম হবে যে, এক দিরহাম থেকে অতিক্রম করবে না। অতএব, ঘষা বা খুঁচিয়ে তোলা যথেষ্ট।

ইমাম শাফেয়ি (র.) বীর্যের পবিত্রতার ওপর আলোচ্য অধ্যায়ের হাদিসে বর্ণিত হজরত আয়েশা (রা.)-এর দলিল হিসেবে নিম্নেযুক্ত শব্দ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন,

انما كان يكفيه ان يفركه بأصابعه وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعى -

সেসব হাদিস দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেন, যেগুলোতে মণি খুঁচিয়ে বা ঘষে তোলার বিবরণ রয়েছে। কেনোনা যদি মণি নাপাক হতো তাহলে খুঁচিয়ে তোলা বা ঘষে তোলা যথেষ্ট হতো না; বরং রক্তের ন্যায় ধোয়া জরুরি হতো। তিনি বলেন, ডলে তোলা বা খুঁচিয়ে তোলাও পরিচ্ছন্নতার জন্য। এমনভাবে যেসব বর্ণনায় ধোয়ার হুকুম এসেছে সেটাও পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাঁর প্রমাণ হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি আছরও। যেটি প্রাসঙ্গিকভাবে ইমাম তিরমিযী (র.) উল্লেখ করেছেন,

قال ابن عباس (رض) المنى بمنزلة المخاط فأمطه عنك ولو بازخرة -

এ 'হাদিসটি মারফু[১] এবং মওকুফ উভয়ভাবে দারাকুতনিতে বর্ণিত হয়েছে। এতে ইমাম শাফেয়ি (র.) بمنزلة المخاطب বা নাকের শ্লেষ্মার ন্যায় বলে পবিত্রতা সাব্যস্ত করেছেন। আর أمطه عنك এর নির্দেশকে পরিচ্ছন্নতার

টীকা- ১. মু'জামে কাবিরে ইবনে আব্বাস (রা,) তাবারানি (র.)-ও মারফু আকারে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, মণি (যদি) কাপড়ে লেগে যায় (তাহলে কি করবে?) জবাবে তিনি বললেন, এটাতো শ্লেষ্মা অথবা কফ বা থুতুর ন্যায়। কাপড়ের টুকরা অথবা ইজখির ঘাস দিয়ে এটা পরিষ্কার করে ফেলো। (ইজখির এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত ঘাস। এটি সাধারণত ঘরের ছাদে কাঠের ওপর ব্যবহার করা হয়।) হায়সামি (র.) মাযমাউজ জাওয়ায়িদ : ১/২৭৯ মণি অনুচ্ছেদে এ হাদিসটির পর বলেছেন যে, এ হাদিসটিতে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ 'আরজামি নামক একজন রাবি রয়েছেন। তিনি সর্বসম্মতিক্রমে জয়িফ। –সংকলক।

ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেছেন। কিয়াস দ্বারা প্রমাণ করতে গিয়ে ইমাম শাফেয়ি (র.) 'কিতাবুল উম্ম'-এ বলেছেন, আমরা মণিকে কিভাবে নাপাক বলতে পারি? অথবা আম্বিয়ায়ে কেরামের ন্যায় পবিত্র ব্যক্তিগণের সৃজন হয়েছে এর দ্বারা! আল্লাহ তা'আলা মাটি এবং পানি তথা দুই পবিত্র জিনিস দ্বারা হজরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তাদের বংশও সৃজিত হবে পবিত্র জিনিস দ্বারা, যেটি হচ্ছে মণি।

হানাফিদের প্রমাণাদি নিম্নেযুক্ত,

১. সহিহ ইবনে হাব্বানে হজরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত,

قال سأل رجل النبى صلى الله عليه وسلم اصلى فى الثوب الذى اتى فيه اهلى؟ قال نعم الا ان ترى فيه شيئا فتغسله (موارد الظمان ج۱، ص۸۲) قلت وهذا اصرح شئ على مذهب الحنفية من المرفوعات .

'নবী করিম ﷺ-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, আমি কি সে কাপড়ে নামাজ পড়বো, যে কাপড় নিয়ে আমি আমার স্ত্রীর নিকট গমন করি (সহবাসে রত হই)। জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে তাতে কোনো কিছু (নাপাক) দেখতে পেলে তা ধৌত করবে।'

আমি বলি, মারফু বর্ণনাগুলোর মধ্যে এটা হানাফিদের মতো স্বপক্ষে স্পষ্ট।

২. আবু দাউদে باب الصلوة فى الثوب الذى يصيب أهله فيه তে একটি হাদিস রয়েছে,

عن معاوية بن ابى سفيان انه سئل اخته ام حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى الثوب الذى يجامعها فيه فقالت نعم اذا لم ير فيه اذى .

'মু'আবিয়া (রা.) তাঁর বোন রাসূলে আকরাম ﷺ-এর স্ত্রী উম্মে হাবিবা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রাসূলে আকরাম ﷺ কি সে কাপড়ে নামাজ পড়তেন, যেটি পরিহিত অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মিলিত হতেন? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন তার মধ্যে নাপাক না দেখতেন।'

৩. সুনানে আবু দাউদের باب المنى يصيب তে হজরত আয়েশা (রা.)-এর হাদিস আছে,

انها كانت تغسل المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ثم اراه فيه بقعة او بقعا .

'তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে মণি ধুইতেন। তিনি বলেছেন, তারপর আমি তাতে দেখতাম তার এক বা একাধিক নিদর্শন।'

এমন করে সহিহ মুসলিম ১/১৪০ باب حكم المنى তে হজরত আয়েশা (রা.)-এর একটি বর্ণনা আছে,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المنى ثم يخرج الى الصلوة فى ذلك الثوب وانا انظر الى أثر الغسل فيه .

'রাসূলুল্লাহ ﷺ মণি ধৌত করতেন, তারপর সে কাপড় নিয়ে নামাজের দিকে বেরিয়ে যেতেন। আর তাতে ধোয়ার নিদর্শনের প্রতি আমি তাকিয়ে থাকতাম।'

৪. সেসব বর্ণনাও হানাফিদের প্রমাণ যেগুলোতে মণি ডলে তোলা অথবা ধোয়া খুঁচিয়ে তোলা কিংবা অথবা ঘষে তুলে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সমষ্টি থেকে প্রমাণিত হলো যে, মণি কাপড়ে রেখে দেওয়া তিনি বরদাশত করতেন না। যদি এটা নাপাক না হতো তাহলে তো কোথাও না কোথাও বৈধতার বিবরণের জন্য এটা প্রমাণিত হতো যে, মণি কাপড় অথবা দেহে রেখে দেওয়া হয়েছে।

শাফেয়িদের ঘষে উঠানোর বিষয়টিকে পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলা এজন্য অযৌক্তিক যে, মণি যদি পবিত্র হতো তাহলে গোটা হাদিস ভাণ্ডারে কোথাও না কোথাও ন্যূনতম পক্ষে বৈধতার বিবরণের জন্য এটাকে বাচনিক বা ক্রিয়াগতভাবে পবিত্র সাব্যস্ত করা হতো। যেহেতু তা করা হয়নি, সুতরাং মণি অপবিত্র।

৫. কোরআনে কারিমে মণিকে তুচ্ছ পানি বলা হয়েছে। অপবিত্র হওয়ার সহায়ক এটাও।

৬. হানাফিদের মাজহাবকে কিয়াসও প্রাধান্য দেয়। কারণ, পেশাব, মজি ও অদি সর্বসম্মতিক্রমে নাপাক। অথচ এগুলো বের হওয়ার ক্ষেত্রে শুধু ওজু ওয়াজিব। অতএব, মণি উত্তমরূপে অপবিত্র হওয়া উচিত। কারণ, এর ফলে গোসল ওয়াজিব হয়।

ইমাম শাফেয়ি (র.) কর্তৃক মণি খুঁচিয়ে বা ঘষে তুলে ফেলার দ্বারা প্রমাণ পেশ সম্পর্কে ইমাম তাহাবি (র.) জবাব দিয়েছেন যে, খুঁচিয়ে বা ঘষে তুলে ফেলা শুধু নিদ্রার কাপড় সম্পর্কে প্রমাণিত আছে, নামাজের কাপড় সম্পর্কে নয়। আর ধোয়ার কথা নামাজের কাপড় সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। (বজলুল মাজহুদ : ১/২১৮)। কিন্তু ইমাম তাহাবি (র.)-এর জবাব জয়িফ। এজন্য ফাতহুল বারী : ১/২৬৫তে এটা হাফেজ ইবনে হাজার (র.) প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে, সহিহ মুসলিম : ১/১৪০ باب حكم المنى তে একটি হাদিসের আওতায় হজরত আয়েশা (রা.)-এর নিম্নেযুক্ত শব্দ রয়েছে,

لقد رأيتنى افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلى فيه ـ

'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে আমি নিজে ঘষে (মণি) তুলে ফেলতাম। তারপর তিনি সে কাপড় নিয়ে নামাজ পড়তেন।' তারপর হাফেজ ইবনে (র.) বলেন,

واصرح منه رواية ابن ابى خزيمة انها كانت تحكه من ثوب صلى الله عليه وسلم وهو يصلى ـ

'এর চেয়ে বেশি স্পষ্ট ইবনে আবু খুজায়মার বর্ণনা, হজরত আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে মণি ঘষে তুলতেন, অথচ তিনি তখন রত থাকতেন নামাজে।

আমি বলছি যে, ইবনে খুজায়মা (র.) এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন নিম্নেযুক্ত সূত্রে,

حسن بن محمد حدثنا اسحاق يعنى الأزرق حدثنا محمد بن قيس عن محارب بن دثار عن عائشة رضى الله عنه انها كانت تحت المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى ـ (صحيح بن خزيمة جا، ص١٤٧ حديث رقم٢٩٠)

'আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় হতে তাঁর নামাজ পড়া অবস্থায় মণি খুঁচিয়ে তুলে ফেলতেন।'

অতএব, এসব বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, নামাজের কাপড়েও মণি খুঁচিয়ে বা ঘষে তুলে ফেলা হয়েছিলো। অতএব, বিশুদ্ধ জবাব হলো, নাপাক জিনিস পবিত্র করার বিভিন্ন পদ্ধতি হয়ে থাকে। কোনো কোনো স্থানে পবিত্রতার জন্য ধোয়া জরুরি হয়, আবার কোথাও হয় না। যেমন তুলা পাক করার পদ্ধতি হলো, সেটাকে ধুনে ফেলা। এমনভাবে জমিন পবিত্র হয় শুকিয়ে গেলে। সম্পূর্ণ এমনভাবে মণি থেকে পবিত্রতা অর্জনের একটি পদ্ধতি হলো খুঁচিয়ে বা ঘষে ফেলা। তবে শর্ত হলো সেটি শুষ্ক হয়ে যেতে হবে। এর প্রমাণ সুনানে দারাকুতনি, শরহে মা'আনিল আছার এবং সহিহ আবু আওয়ানাতে হজরত আয়েশা (রা.)-এর হাদিস রয়েছে,

قالت كنت افرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يابسا واغسله اذا كان رابطا ـ (سنن دار قطنى مع التعليق المغنى جا ص١٢٥ واثار السنن جا ص١٥)

'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে আমি মণি ঘষে তুলে ফেলতাম, যখন সেটি শুষ্ক হতো। আর ধুয়ে ফেলতাম, যখন সেটি হতো ভেজা।'

এর সনদ সহিহ। কারণ এটি বর্ণিত আছে সহিহ 'আবু আওয়ানা'তেও। তাতে মুসলিমের শর্ত-শরায়েতের বাধ্যবাধকতা অবলম্বন করা হয়েছে।

অবশিষ্ট আছে, হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর আছর দ্বারা প্রমাণ-এর জবাব হলো, এই বক্তব্যটি দারেকুতনিতে মারফু এবং মওকুফ দু'ভাবেই বর্ণিত হয়েছে। মুহাদ্দিসিন মারফুকে জয়িফ মওকুফকে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন। এজন্য ইমাম দারেকুতনি (র.) এটাকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করে বলেন,

لم يرفعه غير اسحاق الازرق عن شريك : ইসহাক আল-আজরাক ব্যতীত শরিক থেকে আর কেউ এ হাদিসটি মারফুরূপে বর্ণনা করেননি। আর শরীক দুর্বল রাবি। তিনি নির্ভরযোগ্য রাবিদের বিরোধিতা করছেন। তারপর স্বয়ং শরিক এটা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লা থেকে বর্ণনা করেছেন, অথচ তাঁর স্মরণশক্তি ভালো নয়। ইমাম দারেকুতনি এবং 'তাকবিরে' হাফেজ (র.) এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন।

ملخص من اثار السنن صـ١٤ وسنن الدار قطني جـ١ صـ١٢٤

মওকুফ সূত্রটির জবাব হলো, হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর দ্বিতীয় একটি বক্তব্য মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে : ১/৮২ বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে,

حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس (رضـ) قال اذا اجنب الرجل فى ثوبه فرأى فيه أثر فليغسله وان لم ير فيه اثرا فلينضحه ـ (ومثله فى مصنف عبد الرزاق جـ١ صـ٣٧٢)

'হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যখন কেউ তার কাপড় পরে অপবিত্র হয়, তারপর তাতে এর নিদর্শন দেখে তবে সে যেনো অবশ্যই তা ধৌয়া। আর যদি তাতে নিদর্শন না দেখে তাহলে যেনো হালকা করে ধুয়ে নেয়।'

এ থেকে বোঝা যায়, তাঁর নিকট মণি নাপাক। এই বৈপরীত্য অবসানের জন্য জরুরি হলো, المنى بمنزلة المخاط বাক্যটিতে তাবিল করা। এজন্য অনেকে এ তাবিল বা ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্দেশ্য বীর্যের পবিত্রতা বর্ণনা করা নয়; বরং উপমার কারণ হলো, লাসাযুক্ত হওয়া। অনেকে বলেছেন, উপমার কারণ হলো, ঘৃণার্হ হওয়া। অনেকে সহজে দূর করতে পারাকেও উপমার কারণ সাব্যস্ত করেছেন। আর অনেকে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এখানে মণি দ্বারা উদ্দেশ্য এক দিরহাম থেকে কম পরিমাণ। কিন্তু বিশুদ্ধতম কথা মনে হচ্ছে, হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্দেশ্য হলো, এ কথা বর্ণনা করা যে, মণিকে ঘষে বা খুঁচিয়ে দূর করা যায়। যেমন, নাকের শ্লেষ্মা ঘন ও শুষ্ক হলে খুঁচিয়ে বা ঘষে তুলে ফেলা যায়। এজন্য হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, فامطه عنك ولو باذخرة 'ইজখির ঘাস দিয়ে হলেও তা তোমার থেকে পরিষ্কার করে ফেলো।

আর হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এই একটি আছরের বিপরীতে অন্য বহু সাহাবির আছর আছে, যেগুলোতে ধোয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হজরত আবু হুরায়রা, ইবনে উমর, আনাস (রা.) প্রমুখ থেকে এ ধরনের আছর বর্ণিত আছে এবং এ সম্পর্কে সবচেয়ে বিশুদ্ধতম আছর হলো হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর, যেটি 'মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বায়' : ১/৮৫ রয়েছে,

عن خالد بن ابى غزة قال سئل رجل عن عمر بن الخطاب فقال انى احتلمت على طنفسة فقال ان كان رطبا فاغسله وان كان يابسا فاحككه وان خفى عليك فارششه ـ

'হজরত খালেদ ইবনে আবু ইজ্জা বলেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, আমি একটি কাপড় বা চাটাইয়ের ওপর থাকা অবস্থায় আমার স্বপ্নদোষ হয়েছে। (আমি কি করবো?) জবাবে তিনি বললেন, ভেজা হলে তা ধুয়ে ফেলো, আর শুষ্ক হলে তা ঘষে তুলে ফেলো। আর যদি তা তোমার কাছে অস্পষ্ট থাকে, তবে তা পানি ছিটিয়ে (হালকাভাবে) ধুয়ে ফেলো।'

০ ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর তৃতীয় প্রমাণ ছিলো কিয়াস যে, মণি দ্বারা যেহেতু আম্বিয়ায়ে কেরামের মতো পবিত্র সত্তাগণের সৃজন হয়েছে, এজন্য মণি নাপাক পারে না। কিন্তু এই প্রমাণ তাঁর শান পরিপন্থি এবং স্বতঃসিদ্ধরূপে ভ্রান্ত। কারণ, এটি সিদ্ধান্তকৃত ও ঐকমত্য বিষয় যে, হাকিকত বা মূলবস্তু পরিবর্তন হয়ে নাপাক জিনিসও পবিত্র হয়ে যায়। অতএব, মণি যখন গোশতে রূপান্তরিত হয়ে পেটের (গর্ভজাত) শিশু হয়ে গেছে তখন মূল পরিবর্তিত হওয়ার কারণে তাতে পবিত্রতা এসে গেছে। যদি মূল বস্তুর পরিবর্তনের পর পবিত্রতা অপবিত্রতার ওপর প্রভাব না পড়তো, তাহলেও মণি রক্ত থেকে সৃষ্ট। আর রক্ত সর্বসম্মতিক্রমে নাপাক; এ হিসেবেও মণি নাপাক হওয়া উচিত। অন্যথায় রক্তকেও পবিত্র বলতে হবে। যেহেতু এর কোনো প্রবক্তা নেই, সেহেতু নাপাক হওয়ার সুরতে রক্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস্সালামের মূল সাব্যস্ত হয়। কাজেই এখানে আপনাদের যে জবাব সেটিই আমাদের জবাব। তাছাড়া মণি দ্বারা যেরূপভাবে আম্বিয়ায়ে কেরাম সৃজিত হয়েছেন, এমনভাবে কাফের, কুকুর, শূকর ইত্যাদিও সৃজিত হয়েছে। যদি প্রথম কিয়াসের আবেদন অনুসারে মণিকে পাক মেনে নেওয়া হয়, তাহলে এই দ্বিতীয় কিয়াসটির ভিত্তিতে এটাকে নাপাক মানা উচিত। মোটকথা, এসব কিয়াস সম্পর্কে আমাদের ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, এগুলো ওজনি নয়; বরং স্বয়ং শাফেয়ি মুহাক্কিকিনও তা পছন্দ করেন না। তাই 'শরহুল মুহাজ্জাব' : ২/৫৫৪ তে আল্লামা নববি শাফেয়ি (র.) এদিকে ইঙ্গিত করে লিখেছেন,

وذكر اصحابنا اقيسة ومناسبات كثيرة غير طائلة ولا نرتضيها ولا نستحل الاستدلال بها ولا نسمح بتضييع الوقت فى كتابتها... الخ -

'এ প্রসঙ্গে আমাদের মাজহাবপন্থি অনেক সঙ্গী অনেক অনুপকারি কিয়াস ও অনর্থক যোগসূত্রের কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলো আমরা পছন্দ করি না এবং এগুলো দ্বারা প্রমাণ পেশ করা বৈধ মনে করি না। এগুলো লিখে সময় নষ্ট করা করতে চাই।'

০ শুষ্ক মণি পবিত্র করার হানাফিদের নিকট একটি পদ্ধতি হলো, খুঁচিয়ে বা ঘষে তুলে ফেলা। কিন্তু প্রকাশ থাকে যে, মণি ঘষে বা খুঁচিয়ে তুলে ফেলা বৈধ ছিলো তখন যখন মণি ঘন হতো। কিন্তু যখন থেকে বীর্যের তরলতা ব্যাপকতা লাভ করেছে তখন থেকে হানাফিগণ ফতওয়া দিয়েছেন যে, এখন সর্বাবস্থায় ধুয়ে ফেলা জরুরি। ঘষে বা খুঁচিয়ে মণি তুলে ফেলার বৈধতা সম্পর্কিত উপরিউক্ত বিস্তারিত বিবরণ ছিলো কাপড়-সংক্রান্ত। কিন্তু যদি শরীরে মণি শুকিয়ে যায়, তবে তাতে হানাফিদের মতবিরোধ রয়েছে। হিদায়া গ্রন্থকার দু'টি বক্তব্য বর্ণনা করেছেন, প্রথম বক্তব্য (খুঁচিয়ে বা ঘষে তোলার) বৈধতার। আর এটাই অবলম্বন করেছেন দুর্‌রে মুখতার গ্রন্থকার। দ্বিতীয় বক্তব্য অবৈধতার। কারণ, বর্ণনাগুলোতে খুঁচিয়ে বা ঘষে তোলার ব্যাপারে শুধু কাপড়ের আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া দেহের উষ্ণতা চোষক হয়ে থাকে। যার ফলে বীর্যের ঘনত্ব শেষ হয়ে যায়। এজন্য সেখানে ধোয়ার ফলেই পবিত্রতা অর্জিত হবে। আল্লামা শামি (র.) এটাই পছন্দ করেছেন। আমাদের মাশায়িখও তাই অবলম্বন করেছেন। এই তাফসিরও সে সুরতের যখন মণি ঘন হয়। অন্যথায় মণির তরলতা ব্যাপক হওয়ার পর ধোয়া প্রসঙ্গে কোনো ভিন্নমত নেই।

بَابٌ فِى الْجُنُبِ يَنَامُ قَبْلَ اَنْ يَّغْتَسِلَ (ص ٣٢)

অনুচ্ছেদ-৮৬ : গোসল ফরজ বিশিষ্ট ব্যক্তি গোসলের পূর্বে ঘুমাতে পারবে (মতন ৩২)

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءً ـ

১১৮. অর্থ : হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অপবিত্র অবস্থায় পানি স্পর্শ না করে ঘুমাতেন।

حدثنا هناد نا وكيع عن سفيان عن ابى اسحق نحوه قال ابو عيسى وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره وقد روى غير واحد عن الاسود عن عائشة (رضـ) عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضاء قبل ان ينام ـ

১১৯. অর্থ : হান্নাদ... আবু ইসহাক হতে এমন হাদিস বর্ণনা করেছেন। হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম ﷺ ঘুমানোর পূর্বে ওজু করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা (র.) বলেছেন, এটা সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব প্রমুখের মাজহাব। আসওয়াদ সূত্রে একাধিক ব্যক্তি হজরত আয়েশা (রা.)-এর সনদে নবী করিম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ঘুমানোর পূর্বে ওজু করে নিতেন। এটি আবু ইসহাক সূত্রে আসওয়াদ থেকে বর্ণিত হাদিস অপেক্ষা বিশুদ্ধতম। আবু ইসহাক হতে শো'বা ও সাওরি এবং আরও একাধিক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। তারা মনে করেন, এটা আবু ইসহাক থেকে ভুল হয়েছে।'

দরসে তিরমিযী

সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, ঘুমানোর পূর্বে গোসল ওয়াজিব নয়, গোসল ব্যতিত ঘুমিয়ে পড়া জায়েজ আছে। অবশ্য ওজু সম্পর্কে ইখতেলাফ রয়েছে। দাউদ জাহেরি এবং ইবনে হাবিব মালেকির মাজহাব হলো, ঘুমানোর পূর্বে ওজু করা ওয়াজিব। তাঁদের প্রমাণ সহিহ বোখারি ও মুসলিমের প্রসিদ্ধ হাদিসটি এই,

عن عبد الله بن عمر (رضـ) انه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم ـ (لفظه للبخارى)

'হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আলোচনা করলেন যে, রাত্রে তাঁর ওপর গোসল ফরজ হয়ে যায়। এ শুনে রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি লজ্জাস্থান ধৌত করো, ওজু করো তারপর ঘুমিয়ে পড়ো।'

এতে তারপর ঘুমাও শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যেটি ওয়াজিব বোঝায়। তাছাড়া তাদের আরেকটি দলিল হলো, পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হজরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত,

انه سأل النبى صلى الله عليه وسلم اينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ ـ

'নবী করিম ﷺ-কে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কেউ কি গোসল ফরজ অবস্থায় ঘুমাবে? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন ওজু করে।'

সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব, সুফিয়ান সাওরি, ইমাম আবু ইউসুফ, হাসান ইবনে হাইয়ের যার ওপর গোসল ফরজ তার জন্য ঘুমের আগে ওজু করা মুবাহ। অর্থাৎ, করা না করা উভয়টি সমান। তাদের প্রমাণ, হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আলোচ্য হাদিসটি,

قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء ـ

'তিনি বলেছেন, নবী করিম ﷺ গোসল ফরজ অবস্থায় পানি স্পর্শ না করে (ওজু গোসল না করে কখনো কখনো) ঘুমাতেন।'

ماء শব্দটি এ হাদিসে نفى -এর আওতায় এসেছে, যা ওজু এবং গোসল উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং ওজু মুবাহ প্রমাণিত হবে।

চার ইমাম ও জমহুরে ফুকাহার মতে গোসল ফরজ বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য ঘুমানোর পূর্বে ওজু করা মোস্তাহাব। সুতরাং হজরত উমর (রা.)-এর যে হাদিস দ্বারা দাউদ জাহেরি প্রমাণ পেশ করেছেন, সেটি সহিহ ইবনে খুজায়মা : ১/১০৬, হাদিস নং ২১১ এবং সহিহ ইবনে হাব্বানে[১] হজরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে এমনভাবে।

عن ابن عمر (رض) انه سأل النبى صلى الله عليه وسلم اينام احدنا وهو جنب قال نعم ويتوضأ ان شاء - (اسناده صحيح)

'নবী করিম ﷺ-কে হজরত ইবনে উমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কেউ কি গোসল ফরজ অবস্থায় ঘুমাবে? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, ইচ্ছে করলে ওজু করে নেবে।'

এ থেকে বোঝা গেলো, যেখানে ওজুর হুকুম এসেছে সেটি মোস্তাহাবরূপে এসেছে। এ হাদিসটি যেখানে জমহুরের মাজহাবের প্রমাণ, সেখানে জাহেরি সম্প্রদায়ের দলিলের জবাবও। তাছাড়া ওজু মোস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় হাদিসটিও জমহুরের প্রমাণ।

عن عائشة (رض) عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ قبل ان ينام -

'হজরত আয়েশা (রা.) নবী করিম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ঘুমানোর পূর্বে ওজু করে নিতেন।'

০ আবু ইউসুফ (র.) প্রমুখের দলিলের জবাব দেওয়া হলো, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে ولا يمس ماء বাক্যটি শুধু আবু ইসহাক বর্ণনা করেছেন। ইবরাহিম নাখয়ি, শো'বা এবং সুফিয়ান সাওরির মতো সুমহান মুহাদ্দিসিন এ বাক্যটি বর্ণনা করেন না। এ জন্য মুহাদ্দিসিন এটাকে আবু ইসহাকের ভুল সাব্যস্ত করেছেন। তাই ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন,

ويرون ان هذا غلط من ابى اسحاق - 'তারা মনে করেন, এটা আবু ইসহাক থেকে ভুল হয়েছে।'

ইমাম আবু দাউদ (র.)-ও এটাকে ভ্রম সাব্যস্ত করেছেন। ইয়াজিদ ইবনে হারুন এটাকে ভুল বলেছেন। ইমাম আহমদ (র.) এই সূত্রের বর্ণনাকে নাজায়েজ সাব্যস্ত করেছেন। এমনকি ইবনুল মুফাওওয়াজ (র.) বলেছেন,

اجمع المحدثون على خطاء ابى اسحاق - 'আবু ইসহাকের ভুল সম্পর্কে সমস্ত মুহাদ্দিসিন একমত হয়েছেন।'

ইমাম মুসলিম (র.) ও হজরত আয়েশা (রা.)-এর এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন; কিন্তু ولا يمس ماء শব্দ উল্লেখ করেননি। বরং নিজ গ্রন্থ 'আত্ তাময়িজে' এটাকে ভুল সাব্যস্ত করেছেন। এর বিপরীতে মুহাদ্দিসিনের একটি দল এই অতিরিক্ত অংশটুকুকে বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম বায়হাকি (র.) এর দুটি সূত্রকে সহিহ সাব্যস্ত করেন। দারাকুতনিও এই অতিরিক্ত অংশটুকুকে সহিহ বলেছেন। ইমাম নববি (র.) ও আবুল ওয়ালিদ এবং আবুল আব্বাস ইবনে সুরায়জ থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং এ অংশটুকুকে 'হাসান' বলেছেন।

আর মুয়াত্তায়[২] ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবু হানিফা সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। সেখানেও ولا يمس ماء শব্দটি আছে। আর এলমে উসুলে হাদিসের মূলনীতির আবেদনও হলো এই অতিরিক্ত অংশটুকুকে সহিহ মেনে নেওয়া। কারণ আবু ইসহাক নির্ভরযোগ্য রাবি। পক্ষান্তরে নির্ভরযোগ্য রাবির অতিরিক্ত অংশ গ্রহণযোগ্য। এজন্য আমাদের মাশায়েখের ঝোঁকও এদিকে যে, এই অতিরিক্ত অংশটুকু সহিহ।

এই অতিরিক্ত অংশটুকুকে বায়হাকি (র.) সহিহ সাব্যস্ত করার পর বলেছেন, ولا يمس ماء -এ গোসল না করার উদ্দেশ্য, ওজু না করা নয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এই কৃত্রিমতা-লৌকিকতার প্রয়োজন নেই। কারণ, আমাদের দাবি ঘুমের পূর্বে ওজু করা মোস্তাহাব। আর সুন্নত মোস্তাহাব কোনো কোনো সময় তরকের দ্বারা প্রমাণিত হয়। আবু ইসহাকের এই বর্ণনা এই তরকই প্রমাণ করছে যে, এই বর্ণনা ব্যতিত এমন কোনো হাদিস নেই যেটি ওজু তরক বোঝায়। এই বর্ণনাটি আমাদের বিরুদ্ধে নয়, বরং যারা ওজু ওয়াজিব বলেন প্রমাণ তাদের বিরুদ্ধে।

টীকা- ১. মাওয়ারিদুজ্ জাম'আন : ১/৮১, হাদিস-২৩২
টীকা- ২. ২/৫৭২ كتاب اللباس باب فى الصور

হজরত আলি (রা.) এর বর্ণনা দ্বারা ওজু মোস্তাহাব বক্তব্যর ওপর প্রশ্ন হয় যেটি আবু দাউদ, নাসায়ি এবং ইবনে হাব্বানে বর্ণিত আছে,

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب وجنب .

হজরত নবী করিম ﷺ বলেছেন, যে ঘরে ছবি সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতারা প্রবেশ করে না এবং না সে ঘরে, যে ঘরে রয়েছে কুকুর ও গোসল ফরজ বিশিষ্ট অপবিত্র ব্যক্তি।'

এমন করে মু'জামে তাবারানি কাবিরে মায়মুনা বিনতে সা'দ (রা.)-এর বর্ণনা আছে,

قالت قلت يا رسول الله هل يأكل احدنا وهو جنب قال لا يأكل حتى يتوضأ قالت قلت يا رسول الله! هل يرقد الجنب قال ما احب ان يرقد وهو جنب حتى يتوضأ فانى اخشى ان يتوفى فلا يحضره جبرئيل عليه السلام[1] .

'তিনি বলেছেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ কি গোসল ফরজ অবস্থায় খানা খেতে পারবে? জবাবে তিনি বললেন, না ওজু করার আগে খানা খাবে না। তিনি বললেন, আমি প্রশ্ন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গোসল ফরজ বিশিষ্ট ব্যক্তি কি ঘুমাতে পারবে? জবাবে তিনি বললেন, গোসল ফরজ বিশিষ্ট ব্যক্তি ওজু করার পূর্বে ঘুমাবে– এটা আমি পছন্দ করি না। কারণ, আমি আশঙ্কা করি তখন তার মৃত্যু হয়ে যাবে, অথচ জিবরাইল (আ.) তার কাছে উপস্থিত হতে পারবেন না।'

এই বর্ণনাগুলোর আবেদন হলো, ওজু ওয়াজিব হওয়া উচিত। এর জবাব, ফেরেশতা দ্বারা উদ্দেশ্য রহমতের ফেরেশতা, রক্ষক ফেরেশতা নয়। কেনোনা তারা কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। এ ব্যাপারে আল্লামা খাত্তাবি (র.) সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন। রহমতের ফেরেশতা ঘরে প্রবেশ না করার দ্বারা ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ মোস্তাহাব, মুস্তাহসান প্রমাণিত হয়। এটাই উদ্দেশ্য। আল্লামা নববি (র.) বর্ণনাগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন এভাবে।

০ এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে যে, ওজু দ্বারা কোন্ ওজু উদ্দেশ্য? ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর নিকট পূর্ণাঙ্গ ওজু উদ্দেশ্য নয়; বরং কোনো কোনো অঙ্গ ধৌত করা উদ্দেশ্য। কারণ তাহাবি[2] ইত্যাদিতে হজরত ইবনে উমর (রা.)-এর ক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে। তিনি গোসল ফরজ অবস্থায় ঘুমের আগে ওজু করেছেন এবং পা ধৌত করেননি। তাছাড়া নামাজের ওজু জানাবাত বা অপবিত্রতা বিদূরিত করে না। অতএব, শুধু কোনো অঙ্গ ধোয়া যথার্থ হবে। জমহুরের মতে নামাজের ওজুর উদ্দেশ্য। কেনোনা সহিহ মুসলিম : ১/১৪৪ এ হজরত আয়েশা (রা.)-এর হাদিস,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا وأراد ان يأكل وينام توضأ وضوءه للصلوة .

'যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ অপবিত্র হতেন, (গোসল ফরজ হতো) এবং খেতে অথবা ঘুমাতে চাইতেন, তখন নামাজের ওজুর ন্যায় ওজু করতেন।'

আর দারাকুতনি : ১/১২৬ باب الجنب اذا اراد ان ينام... الخ এবং মু'জামে তাবারানি কাবির ও আল-মুনতাকা : ১/২০৮ ইত্যাদিতে হজরত আয়েশা (রা.)-এর হাদিসগুলো বর্ণিত হয়েছে। যেগুলোতে স্পষ্টভাবে নামাজের ওজু করার সুস্পষ্ট বিবরণ বিদ্যমান। তাছাড়া নামাজের ওজু যদিও জানাবাত দূর করতে পারে না, কিন্তু যেসব কাজে পবিত্রতা শর্ত নয়, সেসব কাজে তা উপকারি অবশ্যই। শরিয়ত প্রবর্তকের নির্দেশ এর প্রমাণ।

টীকা- ১. মাজমাউজ জাওয়ায়িদে' (১/২৭৫) হায়সামি (র.) '(যে গোসল ফরজ অবস্থায় ঘুমাতে ও খানাপিনা করতে চায়' অধ্যায়ে) বলেছেন, এ হাদিসের সনদে উসমান ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াজিদ ইবনে আব্দুর রহমান, আব্দুল হামিদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে উসমান ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণনা করেছেন, উসমান ইবনে আব্দুর রহমান হচ্ছেন, হাররানি তারায়িফি। তিনি নির্ভরযোগ্য। –ইয়াহইয়া ইবনে মাইন। আবু হাতেম (র.) বলেছেন, 'তিনি সত্যবাদী (মা'মুলি ধরনের রাবি)।' আবু আরুবা আল-হাররানি ও ইবনে আদি বলেছেন, 'তাঁর মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই। তিনি অজ্ঞাত রাবিদের থেকে বর্ণনা করেন।' বোখারি ও আবু আহমদ আল-হাকেম বলেছেন, 'তিনি জয়িফ সম্প্রদায় থেকে বর্ণনা করেন।' আবু হাতেম বলেছেন, জয়িফদের থেকে হাদিস বর্ণনা করার ব্যাপারে তিনি বাকিয়্যার মতো।

টীকা- ২. ৭২. باب الرجل تصيبه الجنابة من الليل

بَابُ فِى الْوُضُوْءِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّنَامَ (صـ ٣٢)

অনুচ্ছেদ- ৮৮ : ঘুমানোর ইচ্ছা করলে ওজু করা প্রসঙ্গে (মতন ৩২)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ (رض) أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ نَعَمْ اِذَا تَوَضَّأَ .

১২০. অর্থ : হজরত উমর (রা.) হতে বর্ণিত যে, তিনি নবী করিম ﷺকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমাদের কেউ কি অপবিত্র (গোসল ফরজ) অবস্থায় ঘুমাতে পারবে? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন ওজু করবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ (صـ ٣٢)

অনুচ্ছেদ- ৮৯ : জুনুবি ব্যক্তির সাথে মুসাফাহা করা প্রসঙ্গে (মতন ৩২)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ فَانْخَنَسْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ اَيْنَ كُنْتَ اَوْ اَيْنَ ذَهَبْتَ؟ قُلْتُ اِنِّىْ كُنْتُ جُنُبًا قَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ

১২১. অর্থ : হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি অপবিত্র ছিলেন। এ অবস্থায় নবী করিম ﷺ-এর সাথে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি বলেন, ফলে আমি পেছন দিকে সরে গিয়ে গোসল করলাম। তারপর তাঁর কাছে এলাম। প্রিয়নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় ছিলে অথবা জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় গিয়েছিলে? আমি বললাম, আমি অপবিত্র ছিলাম। তথা আমার ওপর গোসল ফরজ হয়েছিলো। এ শুনে প্রিয়নবী ﷺ বললেন, মুমিন নাপাক হয় না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হুজায়ফা (রা.) থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح। একাধিক আলেম জুনুবি ব্যক্তির সাথে মুসাফাহার অনুমতি দিয়েছেন এবং তাঁরা অপবিত্র তথা গোসল ফরজ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ঋতুবতী মহিলার ঘামে কোনো অসুবিধা মনে করেন না।'

দরসে তিরমিযী

এই অনুচ্ছেদের মূল উদ্দেশ্য হলো জানাবাত হুকমি অপবিত্রতা, যা দেহের ওপর প্রকাশমান হয় না। এই হুকুমই ঋতুবতী এবং নিফাসওয়ালি রমণীরা।

ইমাম নববি (র.) বলেন,

واجتمعت الأمة على ان اعضاء الجنب والحائض والنفساء وعرقهم وسورهم طاهر .

'এ ব্যাপারে উম্মত একমত যে, গোসল ফরজ বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ঋতুবতী ও নিফাসওয়ালি মহিলার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ঘাম এবং তাদের উচ্ছিষ্ট পবিত্র।'

'বাহরুর রায়েক' গ্রন্থকার বলেন, মৃতব্যক্তির গোসল দেওয়া পানির হুকুম এটাই। অবশ্য ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে মাবসুতে এর অপবিত্রতার কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু মূলত এটা তখনকার জন্য প্রযোজ্য যখন মৃতের পেট থেকে কোনো নাপাক জিনিস বের হয় এবং সাধারণত এমন হয়ে থাকে। এ কারণে মৃতকে গোসল দেওয়া পানি নাপাক হয়ে যাবে। অন্যথায় সত্তাগতভাবে এটি পবিত্র; কিন্তু পবিত্রকারি নয়। 'বাহরুর রায়েক' গ্রন্থকার বলেছেন, কাফের মৃতের ধৌত করা পানির হুকুমও এটাই। ইমাম আবু হানিফা (র.) থেকে এটি নাপাক হওয়ার ব্যাপারে একটি বর্ণনা রয়েছে। এটাও তখনকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে, সাধারণত কাফেরের দেহ প্রকৃত নাপাকিযুক্ত হয়ে থাকে। যার কারণে কাফেরকে ধোয়ানো পানি অপবিত্র হয়ে থাকে, অন্যথায় সত্তাগতভাবে এটি পবিত্র।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ (ص ٣٢)

অনুচ্ছেদ- ৯০ : পুরুষের মতো রমণীরও যদি স্বপ্নদোষ হয় তাহলে কী করণীয়? (মতন ৩২)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ ابْنَةُ مِلْحَانَ (رضـ) اِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِيْ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَعْنِيْ غُسْلًا اِذَا هِيَ رَأَتْ فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ قَالَ نَعَمْ اِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قُلْتُ لَهَا فَضَحْتِ النِّسَاءَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ!

১২২. অর্থ : হজরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একবার হজরত উম্মে সুলায়ম বিনতে মিলহান নবী করিম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলেন, তারপর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সত্যের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সংকোচবোধ করেন না। সুতরাং মহিলার যখন পুরুষের ন্যায় স্বপ্নদোষ হয় তবে কি তার ওপর অর্থাৎ, গোসল ফরজ? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন সে তরল পদার্থ বা পানি দেখে, তখন যেনো সে গোসল করে নেয়। উম্মে সালামা (রা.) বলেন, আমি তাঁকে বললাম, উম্মে সুলায়ম! আপনিতো নারী জাতিকে অপমান করলেন!

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। এটা অধিকাংশ ফকিহের মত যে, মহিলা যখন পুরুষের ন্যায় স্বপ্নদোষ হতে দেখে এবং পুরুষের ন্যায় তার মণিপাত হয় তখন তার ওপর গোসল ওয়াজিব। সুফিয়ান সাওরি এবং শাফেয়ি (র.) এই মতই পোষণ করেন।

উম্মে সুলায়ম, খাওলা, আয়েশা ও আনাস (রা.) থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

দরসে তিরমিযী

نعم اذا هى رأت الماء : এ মাসআলাটি باب فيمن يستيقظ ويرى بللا-এর অধীনে পেছনে গেছে। কিন্তু সেখানে বিষয়টি ছিলো প্রাসঙ্গিক। আর এখানে ইমাম তিরমিযী (র.) মূল লক্ষ্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, যৌন আবেদন সহকারে যদি মহিলা থেকে কোনো যৌন রস বের হয়, তবে এর দ্বারা তার ওপর গোসল ওয়াজিব হয়। শুধু ইবরাহিম নাখয়ি থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁর মতে ওয়াজিব নয়। ইবনুল মুনজির (র.) বলেছেন, যদি তাঁর প্রতি এই বক্তব্যটির সম্বোধন বিশুদ্ধ হয়, তবে এর খেলাফ উম্মে সুলায়ম (রা.) থেকে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি প্রমাণ। আমাদের মাশায়েখে কেরাম বলেছেন যে, ইমাম নাখয়ি (র.)-এর বক্তব্য সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন যৌনরস যৌনাঙ্গ থেকে বাইরে বেরিয়ে না আসে; বরং শুধু স্বাদ উপভোগ অনুভূত হয়। তাই 'দুররে মুখতার' গ্রন্থকার বলেছেন, যদি যৌন রস বের হওয়ার বিষয় অনুভূত হয়, কিন্তু যৌনাঙ্গের বাইরের দিক পর্যন্ত না পৌঁছে, তাহলে তখন কোনো কোনো হানাফির মতে গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু পছন্দনীয় বক্তব্য হলো, গোসল ওয়াজিব হয় না। কেনোনা মহিলার ক্ষেত্রেও গোসলের আবশ্যকতা নির্ধারণ করে যৌন রস যৌনাঙ্গের বাইরে বেরিয়ে আসার ওপর।

০ উক্ত আয়াতের হাদিস এবং অন্যান্য অনেক হাদিস দ্বারা বোঝা যায় যে, মহিলাদের মধ্যেও মণি উপকরণ বিদ্যমান আছে, যা বেরও হয়। কিন্তু প্রাচীন ও আধুনিক চিকিৎসাবিদদের একটি বিরাট দল বলেন যে, মহিলাদের মধ্যে মণি একেবারেই হয় না। আর রমণীর ক্ষেত্রে মণিপাতের অর্থ হলো, শুধুমাত্র পূর্ণাঙ্গরূপে স্বাদ উপভোগ অনুভব করা। তারপর চিকিৎসাবিদগণ স্বীকার করেন যে, মহিলাদের মধ্যে এক প্রকার সিক্ততা রয়েছে। এ দুটো

বক্তব্যের মাঝে পরস্পর বিরোধ বোঝা যায়। কিন্তু মূলত কোনো বিরোধ নেই। মূলত বাস্তব সত্য হলো, মহিলাদেরও মণি হয়ে থাকে। অবশ্য সেটি বাইরে বের হয় না; বরং সাধারণত এই মণিপাত গর্ভাশয়ের মধ্যেই হয়ে থাকে। অবশ্য কোনো কোনো অস্বাভাবিক অবস্থায় এই মণিপাত বাইরেও হয়ে থাকে। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে এই অস্বাভাবিক সুরতই বর্ণিত হয়েছে। আর চিকিৎসাবিদগণ মণি নেই বলে যে উল্লেখ করেছেন, তার উদ্দেশ্য হলো, রমণীর মণি পুরুষের মণির মতো হয় না। শায়খ আবু আলি ইবনে সিনার বক্তব্য দ্বারা এ তাহকিকের সহায়তা হয়। ইবনে সিনা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, রমণীর মধ্যে মণি না হওয়ার অর্থ হলো, তার মণি বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে না। তা ছাড়া নারীর মণির অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। কেনোনা, আমি নিজে নারীর মণি জমা হওয়ার স্থানে তা দেখেছি।

قالت أم سلمة : এই বর্ণনায় এই বক্তব্যের প্রবক্তা সাব্যস্ত করা হয়েছে হজরত উম্মে সালামা (রা.)-কে। অথচ মুয়াত্তার[১] বর্ণনায় হজরত আয়েশা (রা.)-কে সাব্যস্ত করা হয়েছে। কাজি আয়াজ এবং হাফেজ ইবনে হাজার (র.) প্রমুখ এই বিরোধ অবসান এভাবে করেছেন যে, তখন হজরত আয়েশা এবং উম্মে সালামা (রা.) উভয়েই উপস্থিত ছিলেন এবং উভয়েই এ কথা বলেছিলেন। অতএব, প্রত্যেক রাবি এমন কথা উল্লেখ করেছেন, যা অন্যজন উল্লেখ করেননি।

قلت لها فضحت النساء يا ام سليم : রাসূলে আকরাম ﷺ-এর নিকট আপনি এমন একটি কথা জিজ্ঞেস করেছেন, যা রমণীদের যৌন চাহিদার আধিক্য বোঝায়। তাই আপনি নারী জাতিকে অপদস্থ করেছেন। এমন ক্ষেত্রে গোপনীয়তা মহিলাদের স্বভাব গোপনীয়তা।

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন হয় যে, باب فيمن يستيقظ ويرى بللا -এ গেছে যে, স্বয়ং উম্মে সালামা (রা.)-ই এই প্রশ্ন প্রিয়নবী ﷺ-এর নিকট করেছিলেন। অতএব, হজরত উম্মে সুলায়ম (রা.)-এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপনের বৈধতা কোথায়?

জবাব : প্রশ্নকারিনী সাব্যস্ত করা হয়েছে আবদুল্লাহ-এর বর্ণনা দ্বারা হজরত উম্মে সালামা (রা.)-কে। এই বর্ণনাটি আবদুল্লাহর কারণে দুর্বল। ইমাম তিরমিযী (র.) এই জন্যই বলেছেন, আবদুল্লাহকে ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ (র.) জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন, হাদিস মুখস্থ রাখার ব্যাপারে দুর্বলতার কারণে। অতএব, এখানে শক্তিশালী সম্ভাবনা রয়েছে যে, সেখানেও মূল প্রশ্নকারিণী ছিলেন হজরত উম্মে সুলায়ম (রা.)। যাঁর নাম জয়িফ রাবির স্মরণ ছিলো না। তিনি উম্মে সালামার নাম উল্লেখ করেছেন। এর সহায়তা এই কারণেও হয় যে, উম্মে সালামা ও উম্মে সুলায়ম দুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ নাম। যাতে জয়িফ রাবির ভ্রমের দৃঢ় সম্ভাবনা রয়েছে।

بَابُ فِى الرَّجُلِ يَسْتَدْفِئُ بِالْمَرْأَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ (٣٢)

অনুচ্ছেদ- ৯১ : রমণীর সান্নিধ্যে এসে গোসলের পর পুরুষ উষ্ণতা লাভ করবে (মতন ৩২)

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ رُبَّمَا اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ جَاءَ فَاسْتَدْفَأَبِىْ فَضَمَمْتُهُ اِلَىَّ وَلَمْ اَغْتَسِلْ ـ

১২৩. অর্থ : হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, অনেক সময় নবী করিম ﷺ অপবিত্রতা থেকে গোসল করেছেন। তারপর তিনি উষ্ণতা লাভ করেছেন আমার সান্নিধ্যে এসে। আমিও গোসলের পূর্বেই তাঁকে জড়িয়ে ধরেছি।

টীকা- ১. মুয়াত্তা ইমাম মালেক : ৩৭ غسل المرأة اذا رأت فى المنام مثل ما يرى الرجل

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এই হাদিসের সনদে কোনো অসুবিধা নেই। এটা একাধিক আলেম সাহাবি ও তাবেয়িনের মাজহাব যে, কোনো পুরুষ যখন গোসল করবে তখন তার স্ত্রীর সান্নিধ্যে এসে উষ্ণতা লাভ করা এবং স্ত্রীর গোসলের পূর্বে তার সাথে ঘুমানোতে কোনো দোষ নেই। সুফিয়ান সাওরি, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক (র.) এ মতই পোষণ করেন।

بَابُ التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ اِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ (ص ـ ٣٢)

অনুচ্ছেদ- ৯২ : পানি না পেলে জুনবি ব্যক্তির তায়াম্মুম প্রসঙ্গে (মতন ৩২)

عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَاِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشَرَ سِنِيْنَ فَاِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمَسَّهُ بَشَرَتَهُ فَاِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَقَالَ مَحْمُوْدٌ فِيْ حَدِيْثِهِ اِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ ـ

১২৪. **অর্থ :** হজরত আবু জর (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করিম ﷺ বলেছেন, পাক মাটি মুসলমানের পবিত্রতার উপকরণ, যদিও দশ বছর সে পানি না পায়। সুতরাং, যখন সে পানি পায় তখন যেনো সে পানি দ্বারা তার শরীর ধুয়ে নেয়। কেনোনা এটা তার জন্য আফজাল।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

মাহমুদ তাঁর হাদিসে বলেন, পবিত্র মাটি মুসলমানের ওজুর উপকরণ। আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এমন করে একাধিক ব্যক্তি খালেদ হাজ্জা থেকে আবু কিলাবা-আমর ইবনে গুজদান-আবু জর সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এ হাদিসটি আইয়ুব আবু কিলাবা সূত্রে বনি আমেরের এক ব্যক্তির সনদে আবু জর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু সে ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেননি। এ হাদিসটি حسن। অধিকাংশ ফকিহের মত এটা যে, গোসল ফরজ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ঋতুবতী মহিলা যখন পানি পাবে না তখন তারা তায়াম্মুম করবে এবং নামাজ আদায় করবে।

হজরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি গোসল ফরজ বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য পানি না পেলেও তায়াম্মুমের মত পোষণ করতেন না। ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে আরেকটি বিবরণ রয়েছে যে, তিনি তাঁর এ বক্তব্য থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। (মত প্রত্যাহার করেছেন।) তিনি বলেছেন, পানি না পেলে ওজু করবে। সুফিয়ান সাওরি, মালেক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক (র.) এমতই পোষণ করেন।

দরসে তিরমিযী

وان لم يجد الماء عشر سنين : শিরোনামের প্রমাণ ক্ষেত্র এই বাক্যটি। কেনোনা দশ বছর পর্যন্ত তায়াম্মুমকে যথেষ্ট সাব্যস্ত করার স্পষ্ট অর্থ হলো, গোসল ফরজ হলেও তায়াম্মুম জায়েজ। এ কারণেই যেমনিভাবে ছোট নাপাকির কারণে তায়াম্মুমের বৈধতার ওপর ইজমায়ে উম্মত রয়েছে, এমনিভাবে বড় নাপাকি থেকে তায়াম্মুমের বৈধতার ওপরও ওলামা ও ফুকাহার ঐকমত্য রয়েছে। অবশ্য প্রথম শতাব্দিতে এ সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ ছিলো। হজরত উমর (রা.) এবং ইবনে মাসউদ (রা.) হতে গোসল ফরজ বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য অবৈধতার বক্তব্য বর্ণিত ছিলো। যেমন সহিহ বোখারির অনেক বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়- কিন্তু বোখারি ইত্যাদির বর্ণনাগুলো

দ্বারাই উভয়ের এই বক্তব্য থেকে প্রত্যাবর্তনও প্রমাণিত আছে। হজরত উমর (রা.) হজরত আম্মার (রা.)-এর জিজ্ঞাসার পর জবাবে বলেছিলেন[১] نوليك ما توليت। অর্থাৎ, তুমি যার দায়দায়িত্ব নিয়েছো সেটার জিম্মাদার আমি তোমাকে বানিয়েছি। ফোকাহায়ে কেরাম এই বাক্যটিকে সাব্যস্ত করেছেন প্রত্যাবর্তন। এমন করে ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন,

ويروى عن ابن مسعود (رضـ) أنه كان لا يرى التيمم للجنب وان لم يجد الماء ويروى عنه انه رجع عن قوله فقال تيمم اذا لم يجد الماء .

হজরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণনা করা হয় যে, তিনি গোসল ফরজ বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য পানি না পেলেও তায়াম্মুমের মত পোষণ করতেন না। তাঁর হতে আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তাঁর এ মত তিনি প্রত্যাহার করেছেন। তিনি বলেছেন, জুনুবি ব্যক্তি পানি না পেলে তায়াম্মুম করে নেবে।

এমনভাবে বাদায়ে' গ্রন্থকার জাহ্হাক থেকে বর্ণনা করেছেন– ان ابن مسعود (رضـ) رجع عن قوله .

আর সহিহ বোখারিতে[২] হজরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যদি আমরা গোসল ফরজ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তায়াম্মুমের অনুমতি দেই, তাহলে সাধারণ ঠাণ্ডায়ও গোসল থেকে দূরে থাকবে। এতে বোঝা যায়, তিনি একটি সাময়িক কারণে বৈধতার ঘোষণা দিতেন না, যদিও তিনি ছিলেন বৈধতার প্রবক্তা। বরং পরবর্তীতে তিনি অনমুতিও দিতে আরম্ভ করেন যে, تيمم اذا لم يجد الماء । তথা পানি না পেলে তায়াম্মুম করবে। সুতরাং এ মাসআলাটি এখন হয়ে গেলো ইজমায়ি।[৩]

بَابٌ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ (صـ ٣٢)

অনুচ্ছেদ- ৯৩ : মুস্তাহাজার বর্ণনা প্রসঙ্গে (মতন ৩২)

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَلَتْ جَائَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِىْ حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّى امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلٰوةَ؟ قَالَ لَا إِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلٰوةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِىْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّىْ . قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ فِىْ حَدِيْثِهِ وَقَالَ تَوَضَّئِىْ لِكُلِّ صَلٰوةٍ حَتّٰى يَجِئَ ذٰلِكَ الْوَقْتُ .

১২৫. অর্থ : হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একবার ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা.) নবী করিম ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইস্তেহাজার রোগে আক্রান্ত মহিলা। অতএব, আমিতো পবিত্র থেকে পারি না। তবে কি আমি নামাজ ছেড়ে দিব? জবাবে তিনি বললেন, না। এটাতো শিরা (-এর রক্ত)। এটা মাসিক নয়। সুতরাং যখন হায়জ আসবে তখন তুমি নামাজ ছেড়ে দাও। আর যখন মাসিক শেষ হয়ে যায় তখন তোমার থেকে রক্ত ধুয়ে ফেলো এবং নামাজ পড়ো। আবু মু'আবিয়া তাঁর হাদিসে বলেছেন, প্রিয়নবী ﷺ তাঁকে আরও বলেছেন, প্রত্যেক নামাজের জন্য ওজু করো, সে ওয়াক্ত আসার আগে।

টীকা- ১. সহিহ মুসলিম : ১/১৬১ باب التيمم

টীকা- ২. ১/৫০, باب اذا خاف الجنب على نفسه المرض او الموت... الخ

টীকা- ৩. হাকেম ইবনে মু'আবিয়া হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একমাস পর্যন্ত পানি থেকে দূরে থাকি, আমার সাথে আমার পরিবার থাকে। তার সাথে আমি মিলিত হব? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ আমি তো একমাস পর্যন্ত (পানি থেকে) দূরে থাকি। তিনি বললেন, যদিও তুমি তিন বছর পর্যন্ত দূরে থাক না কেনো। -তাবারানি কাবির। হাদিসটির সনদ হাসান। (মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ১/২৬২, তায়াম্মুম استحاضة অধ্যায়ের শেষ দিক)

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

উম্মে সালামা (রা.) থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আয়েশা (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح। এটা একাধিক আলেম সাহাবি ও তাবেয়িনের মাজহাব। এমতই পোষণ করেন সুফিয়ান সাওরি, মালেক ইবনে মুবারক ও শাফেয়ি (র.) যে, ইস্তেহাজা বা রক্ত প্রদর মহিলার মাসিকের সময় অতিক্রান্ত হলে সে গোসল করবে এবং ওজু করবে প্রতি নামাজের জন্য।

দরসে তিরমিযী

حيض এবং استحاضه বিষয়গুলো ফিক্হ এবং হাদিসের জটিলতম মাসায়িলের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য সর্বযুগে ওলামায়ে কেরাম এগুলোর সমাধানের চেষ্টা করেছেন। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত গ্রন্থাবলি লিখেছেন। 'বাহরুর রায়েক' গ্রন্থকার বলেছেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) এই দু'টি বিষয়ের ওপর দুইশত পৃষ্ঠার একটি পুস্তক রচনা করেছেন। যেটি প্রবল ধারণা মুতাবেক এ বিষয়ে সর্বপ্রথম পুস্তক। ইমাম তাহাবি (র.) ৫০০ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইবনুল আরাবি (র.) এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ সংকলন করেছেন। আল্লামা নববি (র.) বলেছেন, একটি পুস্তক রচনা করেছেন আল্লামা দারেমি শাফেয়ি (র.)। এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠগ্রন্থ এটি। তাতে পৃষ্ঠা সংখ্যা রয়েছে পাঁচশত। স্বয়ং আল্লামা নববি (র.) আল-মুহাজ্জাবের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হায়জ ইস্তেহাজার মাসায়িল লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। এটাও এক বিশাল ভলিয়ম হয়ে গেছে। তারপর তিনি এটাকেও সংক্ষিপ্ত রূপ দিয়েছেন যা বর্তমান শরহুল মুহাজ্জাবের ২০০ পৃষ্ঠায় এসেছে। হানাফিদের মধ্য থেকে এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন 'বাহরুর রায়েক' গ্রন্থকার আল্লামা ইবনে নুজায়ম (র.)। আল্লামা নববি এবং 'বাহরুর রায়েক' গ্রন্থকার নিজ যুগে ইলমের ঘাটতি এবং ব্যাপক অজ্ঞতার অভিযোগ করেছেন এবং বলেছেন যে, এসব মাসায়িলের ব্যাপারে যেরূপ দৃষ্টিপাত করা উচিত ছিলো এখন তা অসম্ভব।

মহিলার আলোচনায় অনেকগুলো মোস্তাহাব মাসাআলা এবং আলোচ্য বিষয় রয়েছে। যেগুলো হাদিসসমূহের ব্যাখ্যার অধীনে বর্ণিত হবে ইনশাআল্লাহ।

جائت فاطمة بنت أبى حبيش : ইবনে হাজার (র.) এবং আল্লামা আইনি (র.) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামানায় যেসব মহিলা ইস্তেহাজায় আক্রান্ত হওয়ার আলোচনা হাদিসসমূহে এসেছে তাদের সংখ্যা মোট এগার।

এক) ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ, **দুই)** উম্মুল মুমিনিন হজরত জয়নাব, **তিন)** উম্মুল মু'মিনিন হজরত সাওদা বিনতে জামআ (রা.), **চার)** জয়নাব বিনতে জাহাশ (রা.), **পাঁচ)** আবু তলহার স্ত্রী হজরত হামনা বিনতে জাহাশ (রা.), **ছয়)** আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-এর স্ত্রী হজরত হাবিবা বিনতে জাহাশ (রা.), **সাত)** হজরত মায়মুনা (রা.)-এর আপন বোন আসমা (রা.), **আট)** জয়নাব বিনতে আবু সালামা, **নয়)** আসমা বিনতে হারিসিয়্যাহ, **দশ)** বাদিয়া বিনতে গায়লান আস্ সাকাফিয়্যাহ, **এগার)** সাহলা বিনতে সুহাইল।

(সংক্ষিপ্ত আকারে উমদাতুল কারি-আল্লামা আইনি : ২/১০৫, ফাতহুল বারি, হাফেজ ইবনে হাজার : ১/২৮২)

انى إمرأة استحاض : হায়জ শব্দটি মূলত حاض يحيض থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ প্রবাহিত হওয়া। বলা হয় حاض الوادى اذا جرى وسال (উপত্যকা চালু ও প্রবাহিত হয়েছে) ফিক্হের পরিভাষায় হায়জের সংজ্ঞা হলো,

هو دم يسيل من العاذل من امرأة لداء بها - (والعاذل عرق خارج الرحم عند فمه)

'এটি মহিলার একটি শিরায় সৃষ্ট রোগের ফলে এক প্রকার প্রবাহিত রক্ত।' (আজেল শব্দের অর্থ জরায়ুর বাইরে জরায়ুর মুখের নিকট অবস্থিত একটি শিরা) حيض থেকে استحاضة শব্দটি উদ্ভূত। বাবে ইস্তিফ'আল। বাবে ইস্তিফ'আলে আসার পর তার মধ্যে আতিশয্যের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে। বাবে ইস্তিফ'আলের একটি বৈশিষ্ট্য হাকিকত পরিবর্তিত হয়ে যাওয়াও। যেমন, استنوق الجمل তথা উট উটনীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যটিও এখানে লক্ষণীয় হতে পারে যে, হায়জের মূল হাকিকত পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সেটি ইস্তেহাজা হয়ে গেছে।

বাহরুর রায়েক এর লেখক লিখেছেন,

هو دم يسيل من العاذل من امرأة لداء بها .

অর্থাৎ, রমণীর রোগের কারণে জরায়ুর বাইরে তার মুখের নিকট অবস্থিত একটি শিরা থেকে যে রক্ত প্রবাহিত হয়, সেটাকে বলা হয় استحاضة। এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, عاذل শব্দটি এই শিরার ডাক্তারি নাম নয়; বরং যেহেতু এর থেকে রক্ত বের হওয়া নিন্দা ও ভর্ৎসনার কারণ এজন্য এটাকে বলা হয় عاذل।

انما ذلك عرق وليست بالحيض : অনেক বর্ণনায় এসেছে انما هو عرق এ শব্দগুলোর বাহ্যিক অর্থ হলো, এই রক্ত হায়জের ন্যায় জরায়ু থেকে আসে না; বরং عاذل একটি রগ জরায়ুর বাইরে যেটি অবস্থিত, এসব হয়তা ফেটে যাওয়ার কারণে।

প্রশ্ন : এর ওপর শক্তিশালী প্রশ্ন হয় যে, এ ব্যাপারে আধুনিক ও প্রাচীন সমস্ত চিকিৎসক প্রায় একমত যে, মাসিকের রক্ত ইস্তেহাজার রক্তের ব্যাপারে বের হওয়ার স্থান নিয়ে কোনো পার্থক্য নেই; বরং উভয়ের উৎসস্থল বা বের হওয়ার জায়গা জরায়ুর গভীরস্থল। পার্থক্য শুধু সময়ের। নির্ধারিত সময়ের ভেতর এলে সেটি মাসিকের রক্ত। আর এ সময়ের পরে যে রক্ত বের হয় সেটাকে বলে استحاضه খুন। হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি (র.) ও মুসাফ্‌ফা শরহে মুয়াত্তায় এই মত প্রকাশ করেছেন। এর পরিপন্থি হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, উভয়ের বের হওয়ার স্থানেও পার্থক্য আছে।

জবাব : এই প্রশ্নের সর্বোত্তম জবাবে দিয়েছেন হজরত বিন্নৌরি (র.) মা'আরিফুস্ সুনান : ১/৪০৯ এ। বলেছেন এ হাদিসটি সংক্ষিপ্ত। এর পূর্ণ বিস্তারিত বিবরণ মুসনাদে আহমদের অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে। তাতে বলা হয়েছে,

فإنما ذلك ركضة من الشيطان او عرق انقطع او داء عرض لها .

'এটাতো শয়তানের পদাঘাতের ফল, অথবা রগ ফেটে গেছে কিংবা তার সাথে কোনো রোগ নতুন সৃষ্টি হয়েছে।'

এতে বোঝা গেলো যে, ইস্তেহাজার বিভিন্ন কারণ হয়ে থাকে। কখনও কোনো রগ ফেটে যায়, তখন استحاضة রক্তের বের হওয়ার স্থল জরায়ুর বাইরে অন্য কোনো স্থলও হতে পারে। আবার কোনো কোনো সময় কোনো রোগের কারণে জরায়ুর অভ্যন্তর থেকেই অস্বাভাবিক রক্ত বের হয়। অতএব, রাসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্য আলোচ্য হাদিসে শুধু এই নয় যে, استحاضة শুধু শিরা ফেটে যাওয়ার কারণেই হয়ে থাকে; বরং প্রিয়নবী ﷺ এখানে অনেকগুলো কারণের একটি বর্ণনা করেছেন। মোটকথা, চিকিৎসকদের বক্তব্য داء عرض-এর একটি ব্যাখ্যা এবং ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য استحاضة রক্ত জরায়ুর বাহির থেকে আসে عرق انقطع -এর ব্যাখ্যা হলো।

অবশিষ্ট, ركضة من الشيطان –এটি মূলত একটি রূপক বিষয়। এর উদ্দেশ্য হলো, ইস্তেহাজার মাধ্যমে শয়তানি ধোঁকার একটি দরজা উন্মুক্ত হয় এবং মহিলার জন্য নিজ নামাজ ও পবিত্রতার বিষয়াবলি বোঝা ও এগুলোর ওপর আমল করা মুশকিল হয়ে যায়।

فإذا اقبلت الحيضة فدعى الصلوة : যখন حيض এর দিনগুলো শুরু হয়ে যায় তখন নামাজ-রোজা ছেড়ে দিবে। আর যখন এই দিনগুলো শেষ হয়ে যাবে তখন গোসল করে নামাজ শুরু করে দিবে। হজরত ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ যেহেতু মু'তাদা ছিলেন এজন্য প্রিয়নবী ﷺ এখানে মু'তাদারই হুকুম বর্ণনা করেছেন।

حيض এবং استحاضة মাসআলাগুলো অনুধাবনের জন্য কয়েকটি বুনিয়াদি বিষয় বুঝে নেয়া প্রয়োজন,

০ **প্রথম বিষয় :** হায়জের সর্বনিম্ন কাল সম্পর্কে ইখতেলাফ রয়েছে। ইবনুল মুনজির (র.) বলেছেন, ফুকাহায়ে কেরামের একটি দলের মতে হায়জের সর্বনিম্ন সময় সুনির্দিষ্ট নয়; বরং এক ফোঁটা বা একবার রক্ত প্রবাহও হায়জে গণ্য। ইমাম মালেক (র.)-এর মতও এটাই। অধিকাংশের মতে হায়জের সর্বনিম্ন সময় সুনির্দিষ্ট। তারপর এর সীমা সম্পর্কেও মতপার্থক্য আছে। একদিন একরাত ইমাম শাফেয়ি (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে

হাম্বল (র.)-এর মতে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে দু'দিন ও তৃতীয় দিনের অধিকাংশ। আর ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তিনদিন তিনরাত সর্বনিম্ন সময়।

০ **২য় বিষয় :** এ সম্পর্কেও মতানৈক্য রয়েছে যে, মাসিকের সর্বোচ্চকাল কতোটুকু। হানাফিদের নিকট দশদিন দশরাত। ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মতে পনের দিন। ইমাম মালেক (র)-এর মতে সতেরো দিন। আর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মাজহাবত্রয়ের ন্যায় তিনটি বর্ণনা আছে। আল্লামা কারখি (র.) প্রাধান্য দিয়েছেন পনের দিনের ও ইবনে কুদামা (র.) দশ দিনের বর্ণনাকে।

০ **৩য় বিষয় :** পবিত্রতার সর্বনিম্ন সময় সম্পর্কেও মতপার্থক্য আছে। আল্লামা নববি (র.) বলেন, অনেক আলেমের মতে এর কোনো সীমা নির্দিষ্ট নেই। এটাই হলো ইমাম মালেক (র.)-এর একটি বর্ণনা। তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনাটি হলো ৫ দিন। তৃতীয় বর্ণনা হলো ১০ দিনের, চতুর্থ বর্ণনা ১৫ দিনের। ইমাম আবু হানিফা ও শাফেয়ি (র.)-এর মতে পবিত্রতার সর্বনিম্নকাল হলো ১৫ দিন। এটাই হলো ইমাম আহমদ (র.)-এর একটি বর্ণনা। তার দ্বিতীয় বর্ণনা হলো ১৩ দিনের। যেটা ইবনে কুদামা (র.) অবলম্বন করেছেন। মোটকথা, অধিকাংশের মতে পবিত্রতার সর্বনিম্নকাল হলো ১৫ দিন। আল্লামা নববি (র.) বলেছেন, পবিত্রতার সর্বোচ্চ সময়ের কোনো সীমা নেই। এ ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইমাম ইবনে রুশদ, ইবনে কুদামা এবং আল্লামা নববি (র.) লিখেছেন যে, অজু এবং পবিত্রতার সময় সম্পর্কে এই মতবিরোধের কারণ হলো, বর্ণনাগুলো এ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট বিবরণ নেই। এজন্য ফুকাহায়ে কেরাম স্ব-স্ব পরিবেশের অভিজ্ঞতা, চাক্ষুস দর্শন এবং ওরফের দিকে লক্ষ্য করে সময় নির্ধারণ করেছেন। আল্লামা জায়লায়ি (র.) বলেছেন, ঋতু এবং পবিত্রতা সম্পর্কে হানাফিদের প্রমাণ হজরত আয়েশা, মু'আজ ইবনে জাবাল, হযরত আনাস, ওয়াসিলা ইবনে আসকা' এবং হযরত আবু উমামা (রা.)-এর বর্ণনা। এই বর্ণনাগুলো যদিও জয়িফ, কিন্তু সূত্রাধিক্যের কারণে পৌঁছে যায়– হাসানের স্তর পর্যন্ত।[১]

ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর স্বপক্ষে ঋতুর সর্বোচ্চকাল এবং পবিত্রতার সর্বনিম্ন সময় সম্পর্কে একটি মারফু বর্ণনা তুলে ধরা হলো,

تمكث احديكن شطر عمرها لا تصلى [٢] ـ

'তোমাদের একজন মহিলা তার জীবনের অর্ধেক সময় কাটিয়ে দেয় এভাবেই নামাজ না পড়ে।'

এ হাদিস সম্পর্কে কিন্তু আল্লামা ইবনুল জাওজি (র.) বলেছেন, هذا حديث لا يعرف -এ হাদিসটি অজ্ঞাত।

ইমাম বায়হাকি (র.) বলেছেন, لم نجده তথা আমরা এটি পাইনি। স্বয়ং 'আল-জুমু নামক গ্রন্থে আল্লামা নববি শাফেয়ি (র.) বলেছেন, حديث باطل لا يعرف (হাদিসটি বাতিল, অজানা)। যদি এটি সঠিক বলেও মেনে নেওয়া হয় তবেও شطر শব্দের প্রয়োগ যেভাবে অর্ধেকের ক্ষেত্রে হয়, এভাবে একটি সাধারণ অংশের ওপরেও হয়। চাই সেটি অর্ধেক থেকে কম হোক না কেনো। আর এখানে এ অর্থ উদ্দেশ্য অবশ্যই। কারণ, শাফেয়ি (র.)-এর মাজহাব মুতাবেক যদি ১৫ দিন সময় মাসিক গণ্য করা হয় তখনও পুরা জীবনের ঋতুর অর্ধেক থেকে পারে না। কারণ, বালেগ হওয়ার আগে এবং ঋতু বন্ধ হওয়ার পরে পুরো সময় মাসিক থাকে না। তাই ইমাম নববি (র.) স্বীয় মাজহাবের ওপর হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ না করে কিয়াসি প্রমাণের ওপর আমল করেছেন যে, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, বহু মহিলার রক্ত এসেছে দশ দিনের বেশি। অথচ হানাফিগণ এই অতিরিক্ত অংশকে ইস্তেহাজা গণ্য করেন। এই আলোচনা দ্বারা বোঝা গেলো, মাসিকের মুদ্দত সংক্রান্ত বিষয়ে হানাফিদের প্রমাণ জয়িফ রেওয়ায়েত আর শাফেয়িদের প্রমাণ কিয়াস। প্রথমতো কথা হলো যে, অন্যান্য সহায়ক থাকার কারণে হাদিসগুলোতে এক ধরনের শক্তি সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয়তো কিয়াসের মুকাবেলায় এসব বর্ণনা সর্বদাই প্রাধান্যের উপযোগী। বিশেষতো শরয়ি সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিয়াসের ওপর আমল জয়িফ হাদিসের ওপর আমলের মুকাবেলায় ক্ষতিকারক।

টীকা- ১. দ্র. জায়লায়ি : ১/১৯১ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

টীকা- ২. তালখিসুল হাবির : ১/১৬২, হাদিস নং ২২২, তবে তাতে شطر عمرها *-এর স্থলে* شطر دهرها *আছে। -সংকলক।*

৪র্থ বিষয় : মতবিরোধ আছে মাসিকের রক্তের রঙ সম্পর্কেও। হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন, হায়জের রক্ত ছয় প্রকার। কালো, লাল, হলুদ, মলিন, সবুজ ও মাটিয়া। মোটকথা এ ব্যাপারে ইমামগণের মত হচ্ছে, ১. ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে যে রঙের রক্তই আসুক না কেনো সেটি হায়জ। তবে শর্ত হলো, মাসিকের সময়েই আসতে হবে। পরিষ্কার সাদা স্রাব বের হলে সেটা حيض নয়।

০ যেটি মুয়াত্তায়ে মালেক ও মুহাম্মদে মুত্তাসিল সনদে এবং বোখারিতে প্রাসঙ্গিকভাবে সুনিশ্চিত শব্দে বর্ণিত হয়েছে হানাফিদের প্রমাণ সে বর্ণনাটি।

عن علقمة بن أبى علقمة عن امه مولاة عائشة (رض) أم المؤمنين (رض) أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة (رض) بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض ليسألنها عن الصلوة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض ـ (رواه ايضا عبد الرزاق وابن ابى شيبة واللفظ لفظ مالك)

'আয়েশা (রা.)-এর আজাদকৃত দাসী বলেন, মহিলারা হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে ডিব্বা পাঠাতেন। তাতে থাকতো কাপড়ের টুকরা, এতে মাসিকের রক্তের হলুদ রং থাকতো। তারা নামাজ সম্পর্কে আয়েশা (রা.)-এর নিকট জিজ্ঞেস করার জন্য তা পাঠাতেন। তিনি তাদের বলতেন, পরিষ্কার স্বচ্ছ সাদা স্রাব দেখার পূর্ব পর্যন্ত তোমরা তাড়াহুড়া করো না। এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হতো হায়জ থেকে পাক হওয়া।'

এ থেকে বোঝা গেলো, যতোক্ষণ পর্যন্ত পরিষ্কার সাদা স্রাব না আসবে ততোক্ষণ পর্যন্ত সব ধরনের রক্তই حيض হবে।

২. ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মতে শুধু লাল এবং কালো রঙের রক্ত حيض। বাকিগুলো ইস্তিহাজার রং। হাম্বলীদের মাজহাবও এটাই। ৩. ইমাম মালেক (র.) হলুদ এবং মলিন রঙকেও حيض সাব্যস্ত করেন। আল্লামা নববি (র.) বলেছেন, হলুদ এবং মলিন রং হায়জকালে মাসিক। কিন্তু 'হিদায়া' গ্রন্থকার বলেছেন যে, ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে যখন এটা মাসিকের শেষ দিকে বের হবে তখন মাসিক গণ্য করা হবে তা ছাড়া না।

৫ম বিষয় : বাহরুর রায়েক গ্রন্থকার বলেছেন, বিশিষ্ট মহিলার ইস্তেহাজা তিন প্রকার,

এক. মুবতাদিয়া। অর্থাৎ, এমন মহিলা যার জীবনের প্রথমবার মাসিক আরম্ভ হয়েছে। অতঃপর এই রক্ত স্থায়ী হয়ে গেছে।

দুই. মু'তাদা। অর্থাৎ, সে মহিলা যার কিছুকাল পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিকভাবে মাসিক হয়েছে। অতঃপর রক্ত স্থায়ী হয়ে গেছে। অতঃপর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে এক হায়জ নিয়মতান্ত্রিকভাবে আসাই যথেষ্ট। আর আবু হানিফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট কমপক্ষে দুই হায়জ নিয়মতান্ত্রিকভাবে আসা জরুরি। তাঁদের দু'জনের বক্তব্যের ওপরই ফতওয়া।

তিন. মুতাহায়্যিরা। অর্থাৎ, সে মহিলা যে মু'তাদা ছিলো অতঃপর রক্ত স্থায়ী হয়ে গেছে। কিন্তু সে তার পুরাতন অভ্যাসের কথা ভুলে গেছে। মুতাহায়্যিরাকে متحرية، مضلة، ضالة، ناسية-ও বলে। বাহরুর রায়েক গ্রন্থকার বলেছেন– মুতাহায়্যিরা তিন প্রকার,

এক. সংখ্যাগতভাবে মুতাহায়্যিরা। অর্থাৎ, ওই মহিলা যার হায়জের দিনের সংখ্যা স্মরণ নেই যে, পাঁচ দিন, না সাত দিন ইত্যাদি।

দুই. সময়ের দিক দিয়ে মুতাহায়্যিরা। অর্থাৎ, যার হায়জের সময়ের কথা স্মরণ নেই। সেটি কি মাসের শুরুতে ছিলো, না মধ্যভাগে, না শেষে।

তিন. উভয়ের দিকে লক্ষ্য করে মুতাহায়্যিরা। অর্থাৎ, ওই মহিলা যে সংখ্যা এবং সময় উভয় দিকেই লক্ষ্য করলে মুতাহায়্যিরা।

মুবতাদিয়ার হুকুম : মুবতাদিয়ার হুকুম সর্বসম্মতিক্রমে এই যে, সে হায়জের সর্বোচ্চকাল অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত রক্তকে মাসিক গণ্য করবে। আর এই সময়ে নামাজ রোজা ত্যাগ করবে। আর সর্বোচ্চ মেয়াদের পর গোসল করে নামাজ শুরু করে দিবে। অতঃপর পবিত্রতার সর্বনিম্ন সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর দ্বিতীয়বার মাসিককাল গণ্য করবে।

মু'তাদার আহকাম : হানাফিদের নিকট মু'তাদার হুকুম হলো, যদি অভ্যাসের দিনগুলো পরিপূর্ণ হওয়ার পরও রক্ত প্রবাহ অব্যাহত থাকে, তাহলে দশদিন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত নামাজ রোজা মওকুফ করবে। যদি দশ দিনের পূর্বেই রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে এই পুরা রক্ত হায়জ গণ্য হবে এবং মনে করা হবে তার অভ্যাস পরিবর্তিত হয়ে গেছে। অতএব, এ দিনগুলোর নামাজ ওয়াজিব হবে না। আর যদি দশদিনের পরও রক্ত প্রবাহ অব্যাহত থাকে, তাহলে অভ্যাসগত দিনগুলো থেকে অতিরিক্ত পূর্ণ দিনগুলোর রক্তকে সাব্যস্ত করা হবে استحاضه। অভ্যাসের দিনগুলোর পর যতো নামাজ সে ত্যাগ করেছে এগুলোর সবগুলোর কাজা আবশ্যক হবে। অবশ্য কাযা করার গোনাহ হবে না। আলোচ্য অধ্যায়ের হাদিস-

فاذا اقبلت الحيضة فدعى الصلوة واذا ادبرت فاغسلى عنك الدم وصلى এর অর্থও এটাই। এরূপভাবে পরবর্তী অধ্যায়ের হাদিস تدع الصلوة ايام اقرائها التى كانت تحيض فيها... الخ দ্বারাও এ বিষয়টিকে বর্ণনা করা হয়েছে আরও স্পষ্ট করে।

০ ইস্তেহাজা বিশিষ্ট মহিলার ইমামত্রয় আরেক প্রকার বর্ণনা করেন, যাকে বলা হয় মুমায়্যিজা। অর্থাৎ, এমন মহিলা যে রক্তের রং দেখে বুঝতে পারে কোনটি হায়জের রক্ত আর কোনটি ইস্তেহাজার। এমন মহিলার ক্ষেত্রে ইমামত্রয়ের মাজহাব হলো, সে তার পরিচয়ের ওপর নির্ভর করবে। যতোদিন তার নিকট হায়জের রং মনে হবে ততোদিনকে মাসিক কাল মনে করবে, আর যতোদিন ইস্তেহাজার রং অনুভব করবে ততো দিনকে ইস্তেহাজার সময়।

এখানে বিস্তারিত বিবরণ হলো, হানাফিদের নিকট রং দেখে পার্থক্য করার কোনো মূল্য নেই। এটা ধর্তব্য নয়; বরং শুধু অভ্যাসই ধর্তব্য। এটাই হলো সুফিয়ান সাওরি (র.)-এর মাজহাব। এর সম্পূর্ণ বিপরীত ইমাম মালেক (র.)-এর মতে শুধু রঙ দেখে পার্থক্য করাই ধর্তব্য; অভ্যাস ধর্তব্য নয়। ইমাম শাফেয়ি ও আহমদ (র.)-এর মতে যদি শুধু অভ্যাস থাকে, তবে সেটাও ধর্তব্য। আর যদি শুধু রং দেখে পার্থক্য করতে পারে, তবে সেটা ধর্তব্য। আর যদি কোনো মহিলার ক্ষেত্রে এ দুটি বিষয়ই একত্রিত হয়, তাহলে ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মতে রক্ত দেখে পার্থক্য করার বিষয়টি প্রাধান্য পাবে। ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে অভ্যাস, ইমামত্রয়ের মতে রং দেখে পার্থক্য মুবতাদিয়াহ, মু'তাদা এবং মুতাহায়্যিরা সবার ক্ষেত্রে ধর্তব্য। ইমামত্রয়ের মতে রং দেখে পার্থক্য করার বিধিবদ্ধতা সম্পর্কে প্রমাণ হলো, আবু দাউদে باب من قال توضأ لكل صلوة এ বর্ণিত হযরত ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশের বর্ণনা।

أنها كانت تستحاض فقال له النبى صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه دم أسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكى عن الصلوة فاذا كان الاخر فتوضئ وصلى -

'তিনি রক্ত প্রদরে আক্রান্ত মহিলা ছিলেন। তাঁকে নবী করিম ﷺ বললেন, যখন মাসিকের রক্ত আসে তখন সেটি কালো রক্ত দেখে চেনা যায়। যখন এই রক্ত আসবে তখন নামাজ থেকে বিরত থাক। যখন অন্য স্রাব আসে তখন ওজু করো তারপর নামাজ আদায় করো।'

প্রশ্ন : فانه دم أسود يعرف (এটি কালো রক্ত, চেনা যায়।) শব্দ এখানে প্রমাণের স্থান। এ থেকে তো বোঝা যায়, রঙ দ্বারা হায়জ অনুভব করা যায়।

জবাব : হানাফিদের পক্ষ থেকে এর জবাব দেওয়া হয়েছে, এ হাদিসটির সনদের ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে। প্রথমতো এ কারণে যে, ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেন, এই বর্ণনাটি ইবনে আবু আদি (র.) একবার স্বীয় কিতাব

থেকে শুনিয়েছেন, আরেকবার স্মরণশক্তি থেকে। যখন কিতাব থেকে শুনিয়েছেন তখন এটাকে ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশের বর্ণনা সাব্যস্ত করেছেন। আর যখন স্মরণশক্তি থেকে শুনিয়েছেন তখন এটাকে সাব্যস্ত করেছেন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর বর্ণনা।

দ্বিতীয়তো আবু দাউদ বলেন, আ'লা ইবনুল মুসাইয়িব এ হাদিসটি থেকে বর্ণিত এবং শো'বা থেকেও। আলা ইবনুল মুসাইয়িব থেকে বর্ণিত মারফু সূত্রে আর শো'বা থেকে বর্ণিত মওকুফ সূত্রে। এভাবে এ হাদিসটি মুজতারিব। এভাবে ইমাম বায়হাকি (র.)ও সুনানে কুবরা : ১/৩২৫-৩২৬ এ এই হাদিসটির সনদগত ইজতেরাবের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ইবনে আবু হাতেম (র.) নিজ 'ইলালে' লিখেছেন যে, আমি নিজ পিতা আবু হাতেম হতে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তখন তিনি বলেছেন– هو منكر (এটি মুনকার)। 'আল-জাওয়ারুন নাকি' : ১/৮৬ তে আল্লামা মারদিনি (র.) বর্ণনা করেছেন যে, ইবনুল কাত্তান (র.) বলেছেন, এটি আমার মতে মুনকাতি'। সুতরাং এ হাদিসটি হয়তো শক্তি ও বিশুদ্ধতার দিকে লক্ষ্য করলে হানাফিদের সেসব দলিলের মুকাবেলা করতে পারে না যেগুলো পরবর্তীতে আসছে। তাছাড়া মোল্লা আলি কারি (র.) বলেন, যদি হাদিসটিকে সহিহ মেনে নেওয়া হয়, তাহলে এটি তখনকার জন্য প্রযোজ্য থেকে পারে, যখন রং দ্বারা পার্থক্য করার বিষয়টি অভ্যাস মতো হবে।

হানাফিদের দলিলগুলো নিম্নেযুক্ত

১. মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদে মুত্তাসিল সনদে এবং বোখারিতে باب اقبال الحيض وادباره তে প্রাসঙ্গিকভাবে সুনিশ্চিত শব্দে বর্ণিত আছে (যেটি প্রথমে মুয়াত্তা মালেকের ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে।)

كن نساء يبعثن الى عائشة (رض) بالدرجة فيها الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة -(لفظه للبخارى)

'মাসিককালে মহিলারা আয়েশা (রা.)-এর নিকট ব্যবহৃত হলুদ রঙের কাপড়ের টুকরা বিশিষ্ট বাক্স পাঠাতেন। তখন তিনি বলতেন, পরিষ্কার সাদা স্রাব দেখা পর্যন্ত তোমরা তাড়াহুড়া করো না। এর দ্বারা বোঝা গেলো, যতোক্ষণ পর্যন্ত পরিষ্কার সাদা স্রাব না আসবে ততোক্ষণ পর্যন্ত সর্বপ্রকার রক্ত হায়জই গণ্য হবে।' সুতরাং রং দ্বারা পার্থক্য করার প্রশ্নই উঠে না।

২. সহিহ বোখারির باب اذا حاضت فى شهر ثلاث حيض-এ হযরত ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা.)-এর বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে এভাবে,

عن عائشة (رض) أن فاطمة بنت أبى حبيش سألت النبى صلى الله عليه وسلم قالت انى استحاض فلا اطهر فادع الصلوة؟ فقال لا ان ذلك عرق ولكن دعى الصلوة قدر الأيام التى كنت تحيضين فيها ثم اغتسلى وصلى -

'হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা.) নবী করিম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি রক্ত প্রদরে আক্রান্ত, ফলে পবিত্র হই না। তবে কি আমি নামাজ ছেড়ে দিব? জবাবে তিনি বললেন, না, এটা শিরা (-এর রক্ত)। তবে তুমি যে সময় পর্যন্ত ঋতুবতী থাকবে সে পরিমাণ সময়ে নামাজ ছেড়ে দাও। তারপর গোসল করো এবং নামাজ আদায় করো।'

এখানে قدر শব্দটি এর প্রমাণ যে, দিনের পরিমাণ গ্রহণযোগ্য, রঙের নয়।

৩. আবু দাউদ ইত্যাদিতে হজরত উম্মে সালামা (রা.)-এর রেওয়ায়াতে আছে রাসূলে আকরাম ﷺ বলেছেন,

لتنظر عدة الليالى والايام التى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذى [illegible] فلتترك الصلوة قدر ذلك من الشهر... الخ

'ওই রমণী প্রতিমাসে তার যে মাসিক হতো এর দিন রাতের সংখ্যা নিয়ে ভাববে, তার রক্ত প্রদর আসার আগে। ফলে নামাজ ছেড়ে দিবে মাসের ওই পরিমাণ সময়ে।'

এতে হুকুম দেওয়া হয়েছে স্পষ্ট ভাষায় অভ্যাস মুতাবেক দিনগুলো গণ্য করার।

৪. আবু দাউদ শরিফে باب فی المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلوة فی الأيام التی كانت تحيض তে একটি হাদিসে আছে,

عن عروة بن الزبير قال حدثتنى فاطمة بنت أبى حبيش أنها امرت اسماء او اسماء حدثنى انها امرتها فاطمة بنت ابى حبيش ان تسئل (اى اسماء) رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تقعد الايام التى كانت تقعد ثم تغتسل .

'হজরত ওরওয়া ইবনে জুবায়র (রা.) বলেন, ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ আমাকে বর্ণনা করেনে যে, তিনি আসমা (রা.)-কে নির্দেশ দিয়েছেন। অথবা আসমা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, তাঁকে ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে নবীজি ﷺ তাঁকে যে সময়টুকু পরিমাণ বসে থাকতো ওই সময়টুকু পরিমাণ অপেক্ষা করে গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৫. পূর্বের অনুচ্ছেদে ইমাম তিরমিযী (র.) বর্ণনা করেছেন,

عن عدى بن ثابت عن ابيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى المستحاضة تدع الصلوة ايام اقرائها التى كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتوضأ عند كل صلوة وتصوم وتصلى .

'রক্ত প্রদর বিশিষ্ট মহিলা সম্পর্কে নবী করিম ﷺ বলেছেন, সে যেনো তার পূর্ববর্তী অভ্যাস মুতাবেক মাসিকের সে দিনগুলোতে নামাজ ছেড়ে দেয়। অতঃপর গোসল করে ও প্রত্যেক নামাজের জন্য ওজু করে এবং রোজা রাখে ও নামাজ পড়ে।'

দিনগুলোর সংখ্যা গণ্য করা হয়েছে এতেও।

৬. আবু দাউদে باب اذا اقبلت الحيضة تدع الصلوة তে হজরত বুহাইয়া (রা.)-এর বর্ণনায় রয়েছে,

قالت سمعت إمرأة تسأل عائشة (رض) عن امرأة فسد حيضها واهريقت دما فامرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض فى كل شهر وحيضها مستقيم فلتعد بقدر ذلك من الأيام ثم لتدع الصلوة فيهن او بقدرهن ثم لتغتسل ثم لتستذفر بثوب ثم تصلى . (ج١، ص٣٨)

'হজরত বুহাইয়া বলেন, আমি এক মহিলাকে আয়েশা (রা.)-এর কাছে এক নারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি, যার মাসিক খারাপ হয়ে গেছে এবং রীতিমতো তার রক্ত প্রদর হয়, তখন আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিলেন, আমি যেনো তাকে আদেশ দেই, সে যেনো প্রত্যেক মাসে যে পরিমাণ মাসিক হতো সে সময়টুকু নিয়ে ভাবে যখন তার হায়জ ছিলো সঠিক। কাজেই সে সে পরিমাণ দিন গণনা করবে, সেগুলোতে নামাজ বাদ দিবে। কিংবা বলেছেন, সে পরিমাণ সময়ে তারপর সে গোসল করবে। গোসল সেরে একটি কাপড় লজ্জাস্থানে বাঁধবে, তারপর নামাজ আদায় করবে।'

৭. মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ১/১৪ فى الطهر ماهو ولم يعرف তে একটি বর্ণনা রয়েছে,

عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت ابى بكر قالت كنا فى حجرها مع بنات ابنتها فكانت احدانا تطهر ثم تصلى ثم تنكس بالصفرة اليسيرة فتسئلها فتقول اعتزلن الصلوة ما رأيتن ذلك حتى لا ترين الا البياض خالصا .

(واخرجه اسحق بن راهويه بلفظ اخر، المطالب العالية ـ ج۱، ص۶۰)

'ফাতেমা বিনতুল মুনজির হতে বর্ণিত, তিনি আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) হতে বর্ণনা করেন, আমরা তাঁর রুমে তাঁর নাতনীদের সাথে থাকতাম। আমাদের কেউ পবিত্র হতো অতঃপর নামাজ পড়তো। অতঃপর সামান্য হলুদ রঙের স্রাব দেখা দিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়তো। এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করতো। আরেক কপিতে আছে, আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম। তখন তিনি বলতেন, নামাজ থেকে তোমরা ততোক্ষণ পর্যন্ত দূরে থাক যতোক্ষণ পূর্ণ সাদা স্রাব না দেখ।'

এসব বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, রং দ্বারা পার্থক্য ধর্তব্য নয়। অতএব, ওপরযুক্ত সবগুলো হাদিস তাদের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ।

متحيرة -এর বিধিবিধান : ইমামত্রয়ের নিকট মুতাহায়্যিজা যদি মুমায়্যিজা হয়, তাহলে রঙের মাধ্যমে মাসিক ও ইস্তেহাজার মধ্যে পার্থক্য করবে। যার দীর্ঘ বিবরণ রয়েছে। 'শরহুল মুহাজ্জাবে' আল্লামা নববি (র.) সবিস্তারে তা বর্ণনা করেছেন।

متحيرة -এর হুকুম হলো, সে ভালো করে চিন্তা করবে। যদি এভাবে তার নিজের অভ্যাসের দিনগুলো স্মরণে এসে যায় অথবা কোনোরূপে প্রবল ধারণা হয়, তবে সে সে মুতাবেক মু'তাদার ন্যায় আমল করবে। আর যদি কোনো দিকে প্রবল ধারণা না হয় বরং সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে, তবে এর বিভিন্ন সুরত রয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ আল্লামা ইবনে নুজাইম (র.) 'বাহরুর রায়েকে' এভাবে দিয়েছেন যে, ইস্তেহাজা বিশিষ্ট মহিলার তিন প্রকারের সবচেয়ে মৌলিক বিষয় হল যে, যেসব দিন সম্পর্কে মুতাহায়্যিরার একিন হয়ে যাবে যে এগুলো মাসিকের দিন সেগুলোতে নামাজ ছেড়ে দিবে। আর যেসব কাল সম্পর্কে একিন হয়ে যাবে যে, এগুলো পবিত্রতার কাল, সেগুলোতে প্রত্যেক নামাজের জন্য ওজু করে নামাজ পড়বে। আর যেসব দিন সম্পর্কে সন্দেহ হয় যে, এগুলো কি পবিত্রতার দিন না মাসিকে প্রবেশ করার সময়, এগুলোতে প্রত্যেক নামাজের জন্য ওজু করতে থাকবে যতোক্ষণ পর্যন্ত এ সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে। আর যেসব দিন সম্পর্কে সন্দেহ হয় যে, এটা পবিত্রতা না হায়জ, না হায়জ থেকে বের হওয়ার সময়, সেগুলোতে প্রত্যেক নামাজের জন্য গোসল করবে যতোক্ষণ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে হায়জ হওয়ার সন্দেহ।

০ এবার সংখ্যা সম্পর্কে متحيرة -এর হুকুম হলো, সে তার হায়জের শুরু তারিখ থেকে তিনদিন পর্যন্ত নামাজ রোযা ছেড়ে দিবে। কারণ, এসব দিন সম্পর্কে একিন রয়েছে যে, এগুলো হায়জ কাল। এরপর সাতদিন প্রত্যেক নামাজের জন্য গোসল করবে। কারণ এখন প্রতিদিন প্রতিটি সময় সম্ভাবনা রয়েছে যে, এই সময় حيض শেষ হয়ে গেছে। অতঃপর হায়জের পরবর্তী তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক নামাজের জন্য ওজু করবে। কারণ, সেতো এসব দিনে সুনিশ্চিতরূপে পাক।

০ সময়ের দিক দিয়ে متحيرة-এর হুকুম হলো, সে প্রত্যেক মাসের শুরুতে (মাসের শুরু দ্বারা উদ্দেশ্য সেদিন যেদিন থেকে রক্ত স্থায়ী হয়ে গেছে।) নিজের অভ্যাসের দিনগুলো পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক নামাজের জন্য ওজু করবে। উদাহরণস্বরূপ তার অভ্যাসের দিন ছিলো ৫টি। অতএব, মাসের প্রথম তারিখ থেকে ৫ম দিন পর্যন্ত প্রত্যেক নামাজের জন্য ওজু করবে। কেনোনা তার মধ্যে পবিত্র অথবা ঋতুবতী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। অতঃপর ২৫ দিন প্রত্যেক নামাজের জন্য গোসল করবে। কারণ, এগুলোতে প্রতিটি দিনে সম্ভাবনা রয়েছে حيض থেকে পবিত্র হওয়ার।

সংখ্যা এবং কাল উভয়দিক দিয়ে যে متحيرة তার হুকুম হলো, প্রতিটি মাসের প্রথম তিনদিন প্রত্যেক

নামাজের জন্য ওজু করবে। আর বাকি ২৭ দিন নামাজের জন্য গোসল করবে। কারণ, ওই সব দিনে حيض হতে পবিত্র হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ইস্তেহাজা বিশিষ্ট মহিলার জন্য হাদিসগুলোতে তিনটি আহকাম রয়েছে,

এক. প্রত্যেক নামাজের জন্য গোসল করা। **দুই.** এক গোসলে দুই নামাজ আদায় করা। **তিন.** প্রতিটি নামাজের জন্য ওজু করা। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর মতে সবচেয়ে উত্তম হলো, প্রত্যেক নামাজের জন্য গোসল করা এবং অন্যান্য আহকামের ওপর আমল করাও জায়েয আছে। ইমাম তাহাবি (র.) প্রত্যেক নামাজের জন্য গোসলকে সাহলা বিনতে সুহাইল (রা.)-এর বর্ণনা[১] দ্বারা মানসুখ বা রহিত সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, যখন প্রতিটি নামাজের জন্য গোসল করা তার জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালো, তখন প্রিয়নবী ﷺ দুই নামাজ এক গোসলে পড়ার নির্দেশ দিলেন। অন্যথায় চিকিৎসার জন্য প্রযোজ্য ধরা হবে। কেনোনা, পানির ঠাণ্ডা রক্ত বন্ধ করে দেয়। অথবা এটা মোস্তাহাব হুকুম। অথবা এটা সেই মুতাহায়্যিরার সাথে বিশেষিত যার حيض বন্ধ হওয়ার সংশয় আছে।

এক গোসলে দুই নামাজ পড়ার হুকুমকেও ইমাম তাহাবি (র.) মানসুখ বলেছেন এবং প্রতিটি নামাজের জন্য ওজুর বর্ণনাগুলোকে এগুলোর জন্য রহিতকারি সাব্যস্ত করেছেন। কোনো কোনো হানাফি এটাকে চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরেছেন। কিন্তু মূলত এক গোসলে দুই নামাজ পড়ার হুকুম সেই মুতাহায়্যিরার জন্য যাকে প্রতিটি নামাজের জন্য গোসলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, সে মুতাহায়্যিরা যার হায়জ বন্ধ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। তার জন্য আসল হুকুম প্রতিটি নামাজের জন্য গোসল। কিন্তু সাথে সাথে তার জন্য এই আসান সুযোগ রয়েছে যে, সে এক গোসলে দুই নামাজ আদায় করতে পারে। অর্থাৎ, জোহর এবং আসার একত্রে পড়বে। উভয়টির জন্য এক গোসল করবে। এমনভাবে মাগরিব ও এশা একত্রিত করবে এবং উভয়ের জন্য একবার গোসল করবে। এভাবে তাকে একদিনে গোসল করতে হবে তিনবার।

بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ (ص ٣٣)

অনুচ্ছেদ- ৯৪ : মুস্তাহাজা মহিলা ওজু করবে প্রতিটি নামাজের জন্য (মতন ৩৩)

عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَدَعُ الصَّلٰوةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي -

১২৬. অর্থ : হজরত সাবেতের পিতা থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ বলেছেন, ইস্তেহাজা তথা রক্ত প্রদরে আক্রান্ত মহিলা তার যে হায়জে অভ্যস্ত ছিলো সেদিনগুলোতে নামাজ ছেড়ে দিবে। তারপর গোসল করবে ও প্রতিটি নামাজের সময় ওজু করবে এবং রোজা রাখবে ও নামাজ আদায় করবে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَنَا شَرِيكٌ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ -

১২৭. অর্থ : অনুরূপ অর্থবোধক হাদিস আলি ইবনে হুজর শরিক সুত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি এককভাবে শরিক আবুল ইয়াকজান থেকে বর্ণনা করেছেন। আমি মুহাম্মদকে এ হাদিসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। বলেছি, 'আদি ইবনে সাবেত তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা হতে' (বর্ণনা করেছেন) এই সূত্রে আদি-এর দাদার নাম কি? মুহাম্মদ (ইমাম বোখারি) তাঁর নাম জানলেন না। আমি মুহাম্মদ (র.)-এর কাছে ইয়াহইয়া ইবনে মাইনের বক্তব্য উল্লেখ করলাম যে, তাঁর নাম দিনার। তখন

তিনি তা ধর্তব্যে আনলেন না। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.) ইস্তেহাজা বিশিষ্ট মহিলা সম্পর্কে বলেছেন, সে প্রতিটি নামাজের জন্য গোসল করবে, সেটা তার জন্য অধিক সতর্কতার বিষয় হবে। আর যদি সে প্রতিটি নামাজের জন্য ওজু করে তবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। আর যদি দুটি নামাজের জন্য ওজু করে তবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। আর যদি এক গোসলে একত্রে দুটি নামাজ আদায় করে তাহলে তার জন্য হবে যথেষ্ট।

দরসে তিরমিযী

و تتوضأ عند كل صلوة : শুধু ইস্তেহাজা বিশিষ্ট মহিলার এটা নয়; বরং সমস্ত মা'জুরের হুকুম, যারা ধারাবাহিকভাবে নাপাকির শিকার। অর্থাৎ, তাদের ওজু থাকে না এবং চার রাকাতও ওজু ছোটা ব্যতিত পড়তে পারে না।

০ সবাই একমত এ ব্যাপারে যে, মা'জুরের ওপর ওজু করা জরুরি অবশ্য রবি'আতুর রায় এবং দাউদ জাহেরির মতে ইস্তিহাজার রক্ত ওজু ভঙ্গকারি নয়। এজন্য তাদের মতে ইস্তেহাজা বিশিষ্ট মহিলার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নামাজের জন্য ওজুর হুকুম মোস্তাহাবরূপে প্রযোজ্য। ইমাম মালেক (র.)-এর মতেও কিয়াস হিসেবে ওজু না ভাঙার কথা। কেনোনা এটি দেহ থেকে অস্বাভাবিকরূপে বের হয়, কিন্তু তা'আব্বুদি বিষয় হিসেবে তিনিও ইস্তেহাজার রক্তকে ওজু ভঙকারি মনে করেন। যেমন باب الوضوء من القئ والرعاف -এর ব্যাখ্যায় আলোচনা হয়েছে।

০ তারপর প্রতিটি নামাজের জন্য ওজুর ব্যাখ্যায় মতানৈক্য আছে। সুফিয়ান সাওরি এবং আবু সাওরের মতে এক ওজু দ্বারা শুধু ফরজ পড়া যায়, নফলগুলোর জন্য আলাদা ওজুর প্রয়োজন হবে। যেনো প্রতিটি স্বতন্ত্র নামাজের জন্য ওজু জরুরি। তাঁরা لكل صلوة -এর বাহ্যিক শব্দ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন যে, এর আবেদন হলো, প্রতিটি নামাজের জন্য স্বতন্ত্র ওজু করা। ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মতে এই এক ওজু দ্বারা ফরজ এবং এর অধীনস্থ সুন্নত এবং নফলগুলো আদায় করা যেতে পারে। কিন্তু এগুলো আদায় করার পর ওজু ভেঙে যাবে এবং এরপর যদি কোরআন তেলাওয়াত করতে চায় কিংবা অন্য কোনো নফল পড়তে চায়, তাহলে আলাদা ওজু করার প্রয়োজন হবে। তাদের মতে 'প্রতিটি নামাজের জন্য' ওজুর অর্থ 'প্রতিটি নামাজ ও তার অধীনস্থ নামাজসহ'। হানাফিদের মতে এই ওজু শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে এবং এর দ্বারা ফরজসমূহ ও এগুলোর অধীনস্থ নামাজ ছাড়াও অন্যান্য নফল পড়া, কোরআন তেলাওয়াত করা জায়েজ আছে। অবশ্য যখন নতুন ওয়াক্ত আসবে তখন ওজু করতে হবে। অতঃপর এর বিস্তারিত বিবরণে হানাফিদের মাঝেও মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া ওজু ভঙ্গের কারণ। চাই নতুন ওয়াক্ত আসুক বা না আসুক। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে সর্বশেষ ওয়াক্তের আগমন ওজু ভঙের কারণ। ইমাম জুফার (র.)-এর মতে ওয়াক্ত আসা এবং ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া উভয়টি ওজু ভঙ্গের কারণ। এই মতবিরোধের ফল প্রকাশ পাবে ফজর এবং জোহারের মধ্যবর্তী সময়ে। কারণ, ফজরের ওজু সূর্যোদয়ের ফলে ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ (র.) এবং জুফার (র.)-এর মতে ভেঙে যাবে। অথচ ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে এই ওজু সূর্য হেলা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। এমনভাবে যদি সূর্যোদয়ের পর ওজু করা হয়, তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ ও জুফার (র.)-এর মতে জোহরের সময় আসার সাথে সাথে ওজু ভেঙে যাবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে জোহরের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত এই ওজু অবশিষ্ট থাকবে।

সারকথা, تتوضأ لكل صلوة হানাফিগণ تتوضأ لوقت كل صلوة এর পর্যায়ে সাব্যস্ত করেন। তাই ইমাম মুহাম্মদ (র.) কিতাবুল আছার : ১/৮৮ باب غسل المستحاضة والحائض এর অধীনে একটি হাদিস উল্লেখ করে বলেন,

ولسنا نأخذ بهذا ولكن ناخذ بالحديث الاخر أنها تتوضأ لكل وقت صلوة وتصل فى الوقت الاخر .

এটি গ্রহণ করি না; বরং গ্রহণ করি পরবর্তী হাদিসটি। সেটি হচ্ছে, এমন মহিলা প্রতিটি নামাজের ওয়াক্তে ওজু করবে এবং নামাজ পড়তে পারবে পরবর্তী ওয়াক্তে।

'আবুল ওয়াফা আফগানি (র.) কিতাবুল আছারের ব্যাখ্যা এবং টীকায় লিখেছেন,

وفی شرح مختصر الطحاوی روی ابو حنیفة عن هشام بن عروة عن عائشة ان النبی صلی الله علیه وسلم قال لفاطمة بنت ابی حبیش وتوضئی لوقت کل صلوة ذکره محمد فی الاصل معضلا وقال ابن قدامة فی المغنی وروی فی بعض الفاظ حدیث فاطمة بنت ابی حبیش وتوضئی لوقت کل صلوة - (کتاب الاثار ج۱، ص۹۱، باب غسل المستحاضة والحائض فی تعلیقات ابی الوفاء الافغانی)

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশকে বলেছেন, তুমি প্রতিটি নামাজের ওয়াক্তে ওজু কর। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এটিকে মু'দাল রূপে উল্লেখ করেছেন। ইবনে কুদামা মুগনিতে বলেন, ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশের হাদিসের কোনো কোনো শব্দে আছে যে, তুমি প্রতি নামাজের ওয়াক্তে ওজু করো।'

আর এ অধ্যায়ের হাদিসে এসেছে, تتوضأ عند كل صلوة (প্রতিটি নামাজের সময় ওজু করবে।) যেটা ওয়াক্তের অর্থ বোঝায়। এমনিভাবে যেসব রেওয়ায়াতে تتوضأ لكل صلوة শব্দ এসেছে সেগুলোতেও لام টিকে ওয়াক্তের অর্থে সাব্যস্ত করা যায়। ওরফ দ্বারাও এর সহায়তা হয়। এজন্য বলা হয় اتيك لصلوة الظهر اى لوقتها

ইমাম তাহাবি (র.) বলেছেন যে, নজর ও কিয়াস দ্বারাও হানাফিদের মাজহাবের সহায়তা হয়। কারণ, ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া কোনো কোনো স্থানে মা'জুরদের ক্ষেত্রে ওজু ভঙ্গের কারণ, নামাজ থেকে বের হওয়া নয়। যেমন, কোনো মা'জুর জোহরের ওয়াক্তে ওজু করল কিন্তু নামাজ পড়তে পারলো না, এমতাবস্থায় আসরের সময় হয়ে গেলো, এবার সে নামাজ পড়তে চায়, এমতাবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে তার ওপর নতুন ওজু আবশ্যক। এই মাসআলাটিতে নামাজ থেকে বের হওয়ার বিষয়টি পাওয়া যায়নি; বরং সময় শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে ওজু ভেঙে গেছে। অনুরূপভাবে সময় শেষ হয়ে যাওয়া মোজার ওপর মাসেহকারির ক্ষেত্রে ওজু ভঙ্গের কারণ। কিন্তু নামাজ থেকে বের হয়ে আসা কোনো ক্ষেত্রেই ওজু ভঙ্গের কারণ হয়নি। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া ওজু ভঙ্গের কারণ এবং এই বক্তব্যটি মূল।

بَابٌ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ (ص ٣٣)

অনুচ্ছেদ- ৯৫ : ইস্তেহাজা বিশিষ্ট নারী দুই নামাজ একত্রে পড়তে পারবে একই গোসলে (মতন ৩৩)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ نَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بن عقيل عن ابراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن امه حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْتَفْتِيْهِ وَأُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِيْ بَيْتِ أُخْتِيْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّيْ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً شَدِيْدَةً فَمَا تَأْمُرُنِيْ فِيْهَا؟ فَقَدْ (فى ن ب قد) مَنَعَتْنِي الصِّيَامَ وَالصَّلٰوةَ؟ قَالَ أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ؟ قَالَ فَتَلَجَّمِيْ قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ؟ قَالَ

فَاتَّخِذِىْ ثَوْبًا قَالَتْ هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ؟ قَالَ فَاتَّخِذِىْ ثوبا قالت هو اكثر من ذلك؟ اِنَّمَا اَثُجُّ ثَجًّا؟ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم سَاٰمُرُكِ بِاَمْرَيْنِ اَيَّهُمَا صَنَعْتِ اَجْزَاَ عَنْكِ ـ فَاِنْ قَوِيْتِ عَلَيْهِمَا فَاَنْتِ اَعْلَمُ ـ فَقَالَ اِنَّمَا هِىَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِىْ سِتَّةَ اَيَّامٍ اَوْ سَبْعَةَ اَيَّامٍ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ ثُمَّ اغْتَسِلِىْ ـ فَاِذَا رَاَيْتِ اَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَاتِ فَصَلِّىْ اَرْبَعَةً وَّ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً اَوْ ثَلٰثَةً وَّ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَاَيَّامَهَا وَصُوْمِىْ وَصَلِّىْ فَاِنَّ ذٰلِكَ يُجْزِئُكِ ـ وَكَذٰلِكِ فَافْعَلِىْ كَمَا تَحِيْضُ النِّسَاءُ وَ كَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيْقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ فَاِنْ قَوِيْتِ عَلٰى اَنْ تُؤَخِّرِى الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِى الْعَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ حِيْنَ تَطْهُرِيْنَ وَتُصَلِّيْنَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ تُؤَخِّرِيْنَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ فَافْعَلِىْ ـ وَتَغْتَسِلِيْنَ مَعَ الصُّبْحِ وَ تُصَلِّيْنَ ـ وَكَذٰلِكَ فَافْعَلِىْ وَصُوْمِىْ اِنْ قَوِيْتِ عَلٰى ذٰلِكِ ـ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ اَعْجَبُ الْاَمْرَيْنِ اِلَىَّ ـ

১২৮. অর্থ : 'হজরত মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার হামনা বিনতে জাহাশ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি গুরুতররূপে অত্যধিক ইস্তেহাজায় আক্রান্ত ছিলাম। ফলে নবী করিম ﷺ-এর দরবারে তাঁর নিকট ফতওয়া জিজ্ঞেস করার জন্য ও তাঁকে এ সম্পর্কে সংবাদ দেওয়ার জন্য আমি এলাম। এসে তাঁকে পেলাম আমার ভগ্নি জয়নাব বিনতে জাহ্‌শের ঘরে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি গুরুতররূপে প্রচুর পরিমাণে ইস্তেহাজায় আক্রান্ত হয়ে গেছি। আপনি এ সম্পর্কে আমাকে কি নির্দেশ দেন? এই ইস্তেহাজা আমাকে রোজা নামাজ থেকে বিরত রেখেছে। তিনি বললেন, আমি কি তোমার জন্য তুলার কাপড়ের টুকরো (যৌনাঙ্গে) ব্যবহার করার জন্য উপদেশ দেবো? কারণ, এটা রক্ত বন্ধ করে দিবে। এ শুনে তিনি বললেন, এতো আরও বেশি গুরুতর। ফলে নবী করিম ﷺ বললেন, অতএব তুমি লেংটির মতো একটি কাপড় বিশেষ স্থানে ব্যবহার করো। তিনি বললেন, এতো এর চেয়েও গুরুতর ও বেশি। ফলে তিনি বললেন, তাহলে লেংটির নিচে আরেকটি কাপড় ব্যবহার করো। তিনি বলেন, এতো আরও অধিক গুরুতর। আমার থেকে প্রচুর পরিমাণে রক্ত প্রবাহিত হয়, রক্তে সব ভেসে যায়। ফলে নবী করিম ﷺ বললেন, শীঘ্রই আমি তোমাকে দুটি নির্দেশ দিবো। এ দুটির যে কোনো একটি করবে তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। যদি এ দুটি করতে পারো তুমি ভালো জ্ঞাত।

তারপর নবী করিম ﷺ বললেন, এ হলো, শয়তানের পদাঘাত (শয়তানের পদাঘাতে এর রক্ত প্রবাহিত হয়)। অতএব, আল্লাহ তা'আলার জানা মুতাবেক তুমি ছয়দিন অথবা সাতদিন মাসিক গণ্য করো। (অর্থাৎ ইস্তেহাজার পূর্বে হায়জের যে মুদ্দত আল্লাহর ইলম মুতাবেক নির্ধারিত সেটাকে মাসিক গণ্য করো।) অতঃপর গোসল করো। যখন দেখবে যে, তুমি পবিত্র হয়ে গেছো এবং পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছো, তখন চব্বিশ (ছয়দিন হায়জ হলে) অথবা তেইশ (৭ দিন হায়জ হলে) দিন রাত নামাজ পড়ো, রোজা রাখো এবং সালাত আদায় করো। কারণ, এটি তোমার জন্য যথেষ্ট। তুমি প্রতি মাসে এমন করতে থাকো। যেভাবে অন্য রমণীরা তাদের মাসিকের সময়েও পবিত্রতার সময়ে হায়জের সময়সীমা ও পবিত্রতার সময়সীমা গণ্য করে থাকে। যদি পারো জোহর দেরি করে ও আসর আগে পড়বে। তারপর যখন তুমি পবিত্র হবে তখন গোসল করবে এবং জোহর ও আসরের নামাজ একত্রে পড়বে, তারপর মাগরিব দেরি করে এবং এশা আগে আগে পড়বে। তারপর গোসল করবে ও দু' নামাজ একত্রে আদায় করবে, তবে তা করো। আর সকালে গোসল করবে ও নামাজ পড়বে। অনুরূপ করো এবং রোজা রাখো যদি তুমি তা করতে পারো। তারপর রাসুলে করিম ﷺ বললেন, এটা আমার নিকট ওপরযুক্ত দুটি নির্দেশের মধ্যে সর্বাধিক পছন্দনীয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'এই হাদিসটি حسن صحيح। এটি উবায়দুল্লাহ ইবনে আমর আর্ রাক্কি, ইবনে জুরাইজ ও শরিক বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে উকাইল-ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে তালহা আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে উকাইল-ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে তালহা-তাঁর চাচা ইমরান-তাঁর মা হামনা সূত্রে। তবে ইবনে জুরাইজ বলেছেন, উমর ইবনে ত্বালহা। সহিহ হলো عمران بن طلحة

'আমি মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এ হাদিস সম্পর্কে তিনি বলেছেন, حسن صحيح। অনুরূপভাবে আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেছেন, 'হাদিসটি حسن صحيح'। আহমদ ও ইসহাক (র.) ইস্তেহাজায় আক্রান্ত মহিলা সম্পর্কে বলেছেন, যদি হায়জের আগমন ও সমাপ্তি সে চিনতে পারে তবে তার আগমন হলো, কালো রং হায়জের আর সমাপ্তি হলো, হলদাটে রঙে পরিণত হওয়া, তবে তার সম্পর্কে হুকুম হলো, ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশের হাদিস মুতাবেক। আর যদি ইস্তেহাজায় আক্রান্ত মহিলার (মাসিকের) দিনগুলো জানা থাকে ইস্তেহাজায় আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে, তবে সে মাসিকের দিনগুলোতে নামাজ ছেড়ে দিবে। তারপর গোসল করবে এবং প্রতিটি নামাজের জন্য ওজু করবে ও নামাজ পড়বে। আর যদি তার রক্তস্রাব স্থায়ী হয়ে যায় অথচ তার (মাসিকের সময়) জানা না থাকে এবং হায়জের সূচনাকাল কালো রং দ্বারা ও সমাপ্তি হলুদ রং দ্বারাও জানতে না পারে, তবে তার জন্য হুকুম হলো, হামনা বিনতে জাহাশের হাদিস অনুযায়ী।'

এটা مستحاضة। বিশিষ্ট মহিলার রক্ত যখন প্রথম দেখার পর থেকে স্থায়ী হয়ে যায়, সব সময় তা লেগেই থাকে, সে নামাজ ছেড়ে দিবে পনের দিন পর্যন্ত। যদি পনের দিনের মধ্যে কিংবা তার আগে পবিত্র হয়ে যায়, তবে সেগুলো হবে মাসিকের সময়। আর যখন পনের দিনের বেশি সে রক্ত দেখবে তবে সে চৌদ্দ দিনের নামাজ কাজা করবে। তারপর মহিলাদের সর্বনিম্ন সময় যে মাসিক হয় তথা সে নামাজ ছাড়বে একদিন একরাত পরিমাণ।'

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'ওলামায়ে কেরাম মাসিকের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মেয়াদ সম্পর্কে মতবিরোধ করেছেন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, মাসিকের সর্বনিম্ন মেয়াদ তিনদিন, আর সর্বোচ্চ মেয়াদ দশদিন। এটা সুফিয়ান সাওরি ও কুফাবাসীর মাজহাব। ইবনে মুবারক (র.) এটাই গ্রহণ করেন। তাঁর থেকে এর পরিপন্থিও বর্ণিত আছে। আর কোনো কোনো আলেম যাদের মধ্যে রয়েছেন আতা ইবনে আবু রাবাহ-বলেছেন, হায়জের সর্বনিম্ন সময় হলো একদিন একরাত, আর সর্বোচ্চ কাল হলো পনের দিন। আওজায়ি, মালেক, শাফেয়ি, আহমদ, ইসহাক ও আবু উবায়দা (র.)-এর মত এটাই।

মূল বিষয়ে আলোচনা ইতোপূর্বে হয়েছে। পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন এখানে নেই।

দরসে তিরমিযী

سامرك بامرين : রাসূলে আকরাম ﷺ হজরত হামনা (রা.) কে এখানে দুটি বিষয়ে এখতেয়ার দিয়েছেন। দ্বিতীয় বিষয়টি স্পষ্ট ও সর্বসম্মত। সেটি হচ্ছে, দুটি নামাজ একত্রে আদায় করা। এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন, وهو أعجب الأمرين إلى। (দুটি নির্দেশ থেকে এটি আমার নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয়।) দ্বারা কিন্তু প্রথম বিষয়টি হাদিসে ভালোরূপে স্পষ্ট নয়। এজন্য এর ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাতাগণের মতবিরোধ হয়েছে। ইমাম শাফেয়ি (র.) 'কিতাবুল উম্মে' বলেছেন, দ্বিতীয় বিষয়টি হলো (ক্রমানুপাতে প্রথম।) প্রতিটি নামাজের জন্য গোসল করা। অধিকাংশ শাফেয়ি মতাবলম্বী এটাই অবলম্বন করেছেন। এবার অর্থ হলো, তোমাদের আসল হুকুম তো হলো প্রতিটি নামাজের জন্য গোসল করা, কিন্তু যদি এতে তোমাদের কষ্ট হয় জটিলতা দেখা দেয়, তাহলে তোমরা একবার গোসল করে দুটি নামাজ একত্রে পড়তে পারো। যা সহজ হওয়ার কারণে আমার নিকটে বেশি পছন্দনীয়। ইমাম তাহাবি (র.) বলেছেন, সে বিষয়টি হলো, প্রতিটি নামাজের জন্য ওজু করা। হানাফিগণ তাই অবলম্বন করেছেন। এবার অর্থ হলো, তোমাদের জন্য আসল হুকুম তো হলো, প্রতিটি নামাজের জন্য ওজু করা, কিন্তু যদি তোমরা এক গোসলে দুটি নামাজ একত্রে পড়ে ফেলো তবে এটা উত্তম।

০ তবে মতপার্থক্য রয়েছে যে, হজরত হামনা বিনতে জাহ্‌শ কোনো প্রকার استحاضة বিশিষ্ট মহিলারা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন? ইমাম নববি, খাত্তাবি, ইবনে রুশদ, ইবনে কুদামা, ইমাম আহমদ এবং আবু দাউদ (র.) প্রমুখের মতে তিনি ছিলেন মুমায়্যিজাহ। ইমাম বায়হাকি বলেছেন, তিনি ছিলেন মুবতাদিয়া। কিন্তু ইবনে কুদামা এই বক্তব্য রদ করে দিয়েছেন। কেনোনা, বহু বর্ণনা দ্বারা তিনি বয়স্কা মহিলা বলে প্রমাণিত হয়। আর বয়স্কা মহিলার ক্ষেত্রে মুবতাদিয়া হওয়া অযৌক্তিক। ইমাম তাহাবি (র.) 'মুশকিলুল আছারে' এবং 'কিতাবুল খিলাফিয়াতে' ইমাম বায়হাকি (র.) বলেছেন যে, তিনি ছিলেন মু'তাদা। হানাফিগণ এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। নিদর্শনাদির আলোকে এটাই প্রধান মনে হয়। এ কারণে প্রথম বিষয়টিতে প্রিয়নবী ﷺ মু'তাদার প্রসিদ্ধ হুকুম বর্ণনা করেছেন। হাদিসের শব্দগুলো দ্বারা এটাই স্পষ্ট হয়। তাই বলা হয়েছে,

فتحيضى ستة أيام او سبعة أيام فى علم الله 'আল্লাহর ইলম মুতাবেক ছয়দিন অথবা সাতদিন হায়েজ গণ্য করো।'

তারপর বলেছেন, فافعلى كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن و طهرن

'তুমি প্রতি মাসে এমন করতে থাকো (গুণতে থাকো) যেমন, মহিলারা ঋতুবতী হয়ে থাকে এবং পবিত্র হয়ে থাকে তারা তাদের হায়জের মেয়াদ ও পবিত্রতার মেয়াদ এমনভাবে গুণে থাকে।'

০ আর দ্বিতীয় বিষয়টিতে এক গোসলে দুটি নামাজ আদায়ের হুকুম থেকে মুস্তাহাবের জন্য অথবা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে। কারণ, বেশি বেশি গোসল ও ঠাণ্ডা লাগানো এই রোগে উপকারি। মোটকথা, সব মু'তাদার ক্ষেত্রে প্রতিটি নামাজের জন্য গোসলের হুকুম নেই।

০ আরেকটি সম্ভাবনা হলো, হজরত হামনা (রা.) ছিলেন متحيرة। তাঁর ছয়দিন হায়জ হওয়ার ব্যাপারে একিন ছিলো। এর অধিকের ক্ষেত্রে তাঁর সন্দেহ ছিলো। এজন্য ছয়দিন পর্যন্ত রাসূলে আকরাম ﷺ তাঁকে ঋতুবতী সাব্যস্ত করে নামাজ ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর দশদিন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাঁর ওপর প্রতিটি নামাজের জন্য গোসল ওয়াজিব ছিলো। কারণ, প্রতিটি ওয়াক্তে হায়জ বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। এজন্য প্রথম বিষয়টিতে নবীজি ﷺ-এর উদ্দেশ্য এটাই ছিলো যে, তিনি যেনো প্রতিটি নামাজের জন্য গোসল করেন। আর দ্বিতীয় নির্দেশটিতে তাঁর জন্য সহজ করা হয়েছে, দুই নামাজ একত্রে পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ জবাবে প্রিয়নবী ﷺ এটাকে সবচেয়ে পছন্দনীয় সাব্যস্ত করেছেন দুটি নির্দেশের মধ্যে।

وتجمعين بين الصلوتين : এখানে হানাফিদের ওপর প্রশ্ন হয় যে, তাদের মতে দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্র আদায় করা হবে শুধু বাহ্যিক আকারে। সুতরাং গোসল অবশ্যই জোহরের সময় করা হবে। এরপর যখন আসরের ওয়াক্ত শুরু হবে তখন ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া আরেক ওয়াক্ত এসে যাওয়া দুটিই বিদ্যমান হবে। অতএব, হানাফিদের মূলনীতি মুতাবেক সর্বসম্মতিক্রমে ওজু ভেঙে যাবে। এজন্য উভয় নামাজের মাঝে কমপক্ষে একবার ওজু করা অবশ্যই দরকার ছিলো। তা ছাড়া মা'জুরের ক্ষেত্রে এক ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া এবং অন্য ওয়াক্ত আসা ওজু ভঙ্গ না হওয়ার কারণ মানতে হবে। অথচ রাসূলে আকরাম ﷺ দুই নামাজের মাঝে ওজু করার নির্দেশ দেননি।

এই প্রশ্নের বিভিন্ন জবাব দেওয়া হয়েছে,

১. আবু দাউদে باب من قال تجمع بين صلوتين وتغتسل لهما غسلا-তে হজরত আসমা বিনতে উমাইস (রা.)-এর রেওয়ায়াতে এসেছে,

قالت قلت يا رسول الله ان فاطمة بنت أبى حبيش استحيضت مند كذا وكذا فلم تصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه إن هذا من الشيطان ليجلس فى مركن (انا ء

كبير) فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر واحدا وتوضأ فيما بين ذلك.

'তিনি বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ ইস্তেহাজায় আক্রান্ত এতো এতো দিন থেকে। সে নামাজ পড়ে না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সুবহানাল্লাহ! এটাতো শয়তানের কাজ। সে একটি বড় পাত্রে বসবে, যখন পানির ওপর হলুদ রং দেখবে তখন জোহর ও আসরের জন্য একবার গোসল করবে; মাগরিব ও এশার জন্য একবার গোসল করবে; ফজরের জন্য একবার গোসল করবে। এর মাঝখানে ওজু করবে।'

এই হাদিসের সর্বশেষ বাক্য প্রমাণ করছে যে, এই মহিলা দুই নামাজের মাঝে ওজু করবেন। সুতরাং হজরত হামনা (রা.)-এর বর্ণনাকেও এর ওপর প্রযোজ্য ধরা হবে এবং হুকুম হবে উভয় নামাজের মাঝে তার জন্য ওজু করা আবশ্যক।

২. অনেক হানাফি এর জবাব দিয়েছেন এই যে মহিলার ওপর প্রতিটি নামাজের জন্য গোসল ওয়াজিব এবং এক গোসলে তিনি দুই নামাজ পড়ছেন সহজের জন্য, তিনি ওজু ভঙ্গের হুকুম থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত। সুতরাং তার জন্য একবার গোসল করাই যথেষ্ট হবে।

৩. হজরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, ওপরযুক্ত দুটি জবাবের ভিত্তি হলো, দুই নামাজ একত্রে পড়ার দ্বারা উদ্দেশ্য বাহ্যিক আকারে একত্রিত করা। অথচ বাস্তবতা হলো, এখানে প্রকৃতরূপেই দুই নামাজ একত্র করা উদ্দেশ্য। (মুশকিলুল আছার : ৩/৩০২ এ ইমাম তাহাবি (র.)-এর বক্তব্য দ্বারা তাই স্পষ্ট হয়।) এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, ইস্তেহাজা বিশিষ্ট মহিলার জন্য দুই নামাজ একত্র করার জন্য একবার গোসল করতে হবে জোহর এবং আসরের মাঝে, দ্বিতীয়বার মাগরিব ও এশার মাঝে, তৃতীয়বার ফজর নামাজের জন্য। ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে সূর্য হেলার পর প্রথম মিছল জোহরের জন্য বিশেষিত। তৃতীয় মিছল আসরের সাথে বিশেষিত। আর দ্বিতীয় মিছ্‌ল মা'জুর ও মুসাফিরের জন্য জোহর ও আসর নামাজের মাঝে যৌথ। এমনভাবে সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর আকাশে লালিমা ডোবার পূর্ব পর্যন্ত সময় মাগরিবের জন্য খাস। শুভ্রতা আসার পর এশার জন্য খাস। আর এ দুটির মাঝখানের ওয়াক্তটুকু উভয়ের মাঝে যৌথ। এজন্য 'বাহরুর রায়েক' গ্রন্থকার স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে এক রেওয়ায়াতে মুসাফিরের জন্য লালিমা অস্তমিত হওয়ার পর মাগরিব ও এশা দুটিকে প্রকৃত অর্থে একত্রিত করা জায়েজ। যেহেতু মুসাফিরের ক্ষেত্রে এ বর্ণনা বিদ্যমান আছে; সেহেতু মা'জুরের ক্ষেত্রেও এই হুকুমই হবে। অতএব, ইস্তেহাজা বিশিষ্ট মহিলা দ্বিতীয় মিছ্‌ল-এ গোসল করে দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রে পড়বে। এমনভাবে মাগরিবে লালিমা অস্তমিত হওয়ার পর এবং শুভ্রতা অস্তমিত হওয়ার পূর্বে গোসল করে একসাথে দু' নামাজ পড়বে। এভাবে নতুন ওজুর প্রয়োজন হবে না। কারণ, এখানে কোনো ওয়াক্ত শেষও হয়নি আবার কোনো স্বতন্ত্র ওয়াক্তও এসে যায়নি। রাসূল ﷺ এই যৌথ সময়ে গোসল করে দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যার ফলে প্রতিটি নামাজ নিজস্ব ওয়াক্তেই আদায় হলো এবং ওয়াক্ত শেষ না হওয়ার ফলে ওজুর প্রয়োজনও নেই।

قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح : বর্ণিত আছে ইমাম বোখারি (র.) থেকেও তিনি এ হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। কিন্তু অন্যান্য কোনো কোনো মুহাদ্দিস এটাকে জয়িফ বলেছেন। এর কারণ বর্ণনা করেছেন এই যে, ইবনে আকিল এই হাদিসটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে একা এবং তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তিও রয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ইবনে আকিল মুহাক্কিকিনের মতে গ্রহণযোগ্য রাবি। সুতরাং এ হাদিসটি অবশ্যই কমপক্ষে حسن।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ اَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ (٣٣)

অনুচ্ছেদ- ৯৬ : প্রত্যেক নামাজের সময় ইস্তেহাজায় আক্রান্ত মহিলা গোসল করবে (মতন ৩৩)

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اِسْتَفْتَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ ابْنَةُ جَحْشٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ اِنِّى اُسْتَحَاضُ فَلَا اَطْهُرُ اَفَادَعُ الصَّلٰوةَ؟ فَقَالَ لَا اِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِىْ ثُمَّ صَلِّىْ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ اللَّيْثُ لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَمَرَ اُمَّ حَبِيْبَةَ (رض) اَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ وَلٰكِنَّهُ شَيْئٌ فَعَلَتْهُ هِىَ -

১২৯. অর্থ : হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একবার উম্মে হাবিবা বিনতে জাহ্শ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফতওয়া চান। তিনি জিজ্ঞেস করেন, আমি ইস্তেহাজায় আক্রান্ত হই। আমি পবিত্র হই না। তবে কি আমার নামাজ ছেড়ে দিব? জবাবে তিনি বললেন, এটাতো শিরা (-এর রক্ত)। অতএব, তুমি গোসল কর, এরপর নামাজ পড়। তারপর তিনি গোসল করতেন প্রত্যেক নামাজের জন্য।

হজরত কুতায়বা বলেছেন, লাইছ বলেছেন, ইবনে শিহাব এ কথা উল্লেখ করেননি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মে হাবিবাকে এই নির্দেশ দেননি যে, সে প্রতিটি নামাজের সময় গোসল করবে, বরং এটি সে করেছে নিজ থেকে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি জুহরি থেকে আমরা সূত্রে আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করা হয় যে, উম্মে হাবিবা বিনতে জাহ্শ (রা.) এ ফতওয়া চেয়েছিলেন। অনেক আলেম বলেছেন, ইস্তেহাজা রোগে আক্রান্ত মহিলা প্রত্যেক নামাজের সময় গোসল করবে।

আওজায়ি জুহরি থেকে-ওরওয়া ও আমরা-আয়েশা সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْحَائِضِ اَنَّهَا لَا تَقْضِى الصَّلٰوةَ

অনুচ্ছেদ- ৯৭ : ঋতুবতী রমণী নামাজ কাজা করবে না

عَنْ مُعَاذَةَ اَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ اَتَقْضِىْ اِحْدَانَا صَلٰوتَهَا اَيَّامَ مَحِيْضِهَا؟ فَقَالَتْ اَحَرُوْرِيَّةٌ اَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ اِحْدَانَا تَحِيْضُ فَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ -

১৩০. অর্থ : হজরত মু'আজ (রা.) হতে বর্ণিত যে, হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-কে এক মহিলা জিজ্ঞেস করলো, আমাদের কেউ কি তার মাসিককালীন নামাজগুলো কাজা করবে? জবাবে তিনি বললেন, তুমি কি (হারুরি তথা খারেজি সম্প্রদায়ের মহিলা? আমাদের অনেকের মাসিক হতো কিন্তু তাকে (মাসিককালীন) নামাজ কাজা করার নির্দেশ দেওয়া হতো না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'এ হাদিসটি حسن صحيح। হজরত আয়েশা (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, ঋতুবতী মহিলার ঋতুকালীন নামাজ কাজা করবে না। এটা হলো অধিকাংশ ফকিহের মত। এ ব্যাপারে তাঁদের কোনো মতবিরোধ নেই যে, ঋতুবতী মহিলা রোজা কাজা করবে, নামাজ কাজা করবে না।

দরসে তিরমিযী

ইমাম নববি (র.) বলেছেন, ওলামায়ে আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, ঋতুবতী মহিলার জন্য নামাজ কাজার প্রয়োজন নেই; রোজা কাজা করতে হবে। এ ব্যাপারে শুধু খারেজিদের মতবিরোধ আছে, তারা রোজার কাজার ন্যায় নামাজ কাজা করাকেও জরুরি সাব্যস্ত করে। যেমন, ইবনে কুদামা (র.) আল মুগনিতে (১/৩১৯) বর্ণনা করেছেন। মোটকথা খারেজিদের এই এখতেলাফ সুন্নত অস্বীকারের ফল। কারণ, এই মাসআলাটি সুন্নত দ্বারাই প্রমাণিত। আর খারেজিরা সুন্নতের প্রামাণিকতার প্রবক্তা নন।

তারপর নামাজ কাজা বাদ হওয়ার কারণ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মতানৈক্য আছে। ইমামুল হারামাইনের মতে এই হুকুমটি কিয়াস দ্বারা অনুধাবনযোগ্য নয়। এর কারণ, শরিয়ত প্রবর্তকের নির্দেশ। ইমাম নববি (র.)-এর মতে হায়জকালে নামাজ আধিক্যের সীমায় পৌঁছে যায়। যেগুলো আদায় করতে কষ্ট হয়। অথচ এমন কষ্ট শরিয়তের পক্ষ থেকে বিদূরিত। কিন্তু রোজা এর পরিপন্থি। সেটি আধিক্যের সীমায় পৌঁছে না। 'বাদায়ে' গ্রন্থকার বলেছেন, হায়েজ হতে পবিত্রতা নামাজ ওয়াজিব হওয়ার শর্তও এবং আদায়ের জন্য শর্ত। কিন্তু রোজার ক্ষেত্রে শুধু আদায়ের শর্ত। অতএব, ঋতু জানাবাত থেকে আরও মারাত্মক হওয়ার কারণে নামাজ ওয়াজিবকারি হবে না। আর ওয়াজিবের শর্ত ফওত হওয়ার কারণে কাজা ওয়াজিব হয় না। বস্তুত এটা রোজার ক্ষেত্রে ওয়াজিবকারি হবে; তবে এর ফলে আদায় বিশুদ্ধ হবে না। আর আদায়ের শর্ত ফওত হওয়ার সময় কাজা আবশ্যক হয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ اَنَّهُمَا لَا يَقْرَأْنِ الْقُرْاٰنَ (صـ ٣٤)

অনুচ্ছেদ- ৯ : জুনুবি ব্যক্তি ও ঋতুবতী মহিলা কোরআন তেলাওয়াত করবে না (মতন ৩৪)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِّنَ الْقُرْاٰنِ

১৩১. অর্থ : হজরত ইবনে উমর (রা.) সূত্রে নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, হায়জগ্রস্ত মহিলা ও গোসল ফরজবিশিষ্ট ব্যক্তি কোরআনের কোনো অংশ তেলাওয়াত করবে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আলি (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, ইবনে উমর (রা.)-এর হাদিসটি জানি আমরা শুধু ইসমাইল ইবনে আইয়াশ-মূসা ইবনে উকবা-নাফে'-ইবনে উমর-নবী কারিম ﷺ সূত্রে বর্ণিত হাদিস থেকেই। তিনি এরশাদ করেছেন, গোসল ফরজ বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ঋতুবতী মহিলা কোরআন তিলাওয়াত করবে না। এটা অধিকাংশ আলেম সাহাবি, তাবেয়ি ও তৎপরবর্তী যেমন সুফিয়ান সাওরি, ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর মাজহাব। তাঁরা বলেছেন, ঋতুবতী এবং গোসল ফরজ বিশিষ্ট ব্যক্তি শুধুমাত্র আয়াতের একটি অংশ এবং হরফ ও অনুরূপ কিছু ছাড়া কোরআনের কিছুই তেলাওয়াত করবে না। তবে তারা গোসল ফরজ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ঋতুবতীর জন্য অনুমতি দিয়েছেন তাসবিহ-তাহলিলের।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইলকে বলতে শুনেছি, ইসমাইল ইবনে আইয়াশ হিজাজবাসী ও ইরাকবাসিদের থেকে অনেক মুনকার হাদিস বর্ণনা করেন। যেনো তিনি তাদের সূত্রে বর্ণিত তার একক বর্ণনাগুলোকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, শামবাসীদের সূত্রেই ইসমাইল ইবনে আইয়াশের হাদিস গ্রহণীয়।

আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, ইসমাইল ইবনে আইয়াশ বাকিয়্যাহ অপেক্ষা ভালো। বাকিয়্যাহর অনেক মুনকার হাদিস রয়েছে নির্ভরযোগ্য রাবিদের সূত্রে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'আমাকে তা বর্ণনা করেছেন আহমদ ইবনুল হাসান। তিনি বলেছেন, আমি আহমদ ইবনে হাম্বলকে এই বক্তব্য রাখতে শুনেছি।

দরসে তিরমিযী

ইমাম নববি (র.) বলেছেন, ঋতুবতী এবং গোসল ফরজ বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য জিকির, তাসবিহ-তাহলিল ইত্যাদির বৈধতার ওপর ঐকমত্য রয়েছে। অবশ্য তেলাওয়াতে কোরআন সম্পর্কে কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে। ইমামত্রয় এবং অধিকাংশ সাহাবি ও তাবেইনের মতে তিলাওয়াত নাজায়েজ। ইমাম মালেক (র.) বলেন, يقرأ الجنب الايات اليسيرة للتعوذ (গোসল ফরজ বিশিষ্ট ব্যক্তি সামান্য কয়টি আয়াত পানাহ চাওয়ার উদ্দেশে তেলাওয়াত করতে পারবে।) অথচ ঋতুবতী সম্পর্কে তাঁর দুটি বর্ণনা রয়েছে। একটি বৈধতার অপরটি অবৈধতার। শরহে মুহাজ্জাব : ২/১৫৮ তে ইমাম মালেক (র.) হতে ব্যাপক আকারে বৈধতা বর্ণিত আছে। ইমাম বোখারি, ইবনুল মুনজির, দাউদ জাহেরির মতেও গোসল ফরজ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ঋতুবতী মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে তেলাওয়াত সাধারণত জায়েজ। যারা তেলাওয়াতে কোরআনকে জায়েজ বলেন, তাদের প্রমাণ হজরত আয়েশা (রা.)-এর প্রসিদ্ধ হাদিস সহিহ মুসলিম : ১/১৬২ তে باب ذكر الله تعالى فى حال الجنابة وغيرها এ রয়েছে–

عن عائشة (رضـ) قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه .

'হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা আল্লাহর জিকির করতেন।'

তবে জমহুরের পক্ষ থেকে এর উত্তর হলো, প্রথমতো এর দ্বারা উদ্দেশ্য আন্তরিক জিকির। (জবানের জিকির উদ্দেশ্য নয়।) আর যদি জবানের জিকিরই উদ্দেশ্য হয় তাহলে এটা মুতাওয়ারিদ জিকিরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর যদি এটাকে প্রকৃত অর্থে প্রযোজ্য করে তেলাওয়াতে কোরআনকেও তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে এটি একটি সাধারণ প্রমাণ। যেটি জমহুরের প্রমাণ তা হজরত ইবনে উমর (রা.)-এর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের মুকাবেলা করতে পারে না, সেটি একটি খাস দলিল।

عن ابن عمر رضـ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القران

'হজরত ইবনে উমর (রা.) রাসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি এরশাদ করেছেন, ঋতুবতী ও গোসল ফরজ বিশিষ্ট ব্যক্তি কোরআনের কোনো অংশ তেলাওয়াত করবে না।'

প্রশ্ন : ইমাম বোখারি (র.)-এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, ইসমাইল ইবনে আইয়াশ-মূসা ইবনে উকবা সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণিত। আর ইসমাইল ইবনে আইয়াশের হাদিসগুলো শামিদের ব্যতীত অন্যদের সূত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। মূসা ইবনে উকবা শামি নন।

জবাব : এ হাদিসে অন্যান্য মুতাবে' বিদ্যমান রয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার (র.)ও তা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এ হাদিসটি প্রামাণ্য।

০ সুতরাং এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে যে, গোসল ফরজবিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ঋতুবতী মহিলার জন্য কতোটুকু পরিমাণ তেলাওয়াত করা নাজায়েজ। এক আয়াত বা ততোধিক নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে জমহুরের ঐকমত্য রয়েছে। এক আয়াতের কমের ক্ষেত্রে হানাফিদের থেকে দুটি বর্ণনা রয়েছে। ইমাম কারখি (র.)-এর বর্ণনা মুতাবেক এটা নাজায়েজ। হিদায়া গ্রন্থকার 'আত্ তাজনিস' নামক কিতাবে আল্লামা নাসাফি (র.) কানজ এবং আল-কাফিতে এবং আল্লামা ইবনে নুজায়ম বাহরুর রায়েকে এটাই অবলম্বন করেছেন, 'বাদায়ে' গ্রন্থকার বলেছেন, অধিকাংশ মাশায়েখ এর উপরেই রয়েছেন। দ্বিতীয় বর্ণনাটি হলো, ইমাম তাহাবি (র.)-এর। তিনি এক আয়াতের

কম তেলাওয়াতকে জায়েজ সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, এতোটুকু পরিমাণ চ্যালেঞ্জের বিষয় নয়। ফখরুল ইসলাম বাজদুবি (র.) এটাই অবলম্বন করেছেন। 'খুলাসা' গ্রন্থকার বলেছেন, এর ওপরই ফতওয়া। আল্লামা শামি (র.) ফয়সালা করেছেন যে, গোসল ফরজবিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য জায়েজ নয়, আর ঋতুবতী মহিলার জন্য টুকরো টুকরো করে পাঠ করা বৈধ।

অবৈধতা আর ওপরযুক্ত আলোচনা আসবে তখনই যখন তেলাওয়াতের উদ্দেশে পাঠ করবে। আর যদি বরকত অথবা দোয়ার জন্য তেলাওয়াত করে তবে তাতে এখতেলাফ রয়েছে। ইমাম নববি (র.) বলেছেন, পাঠ আরম্ভ করার জন্য বিসমিল্লাহ তেলাওয়াতের বৈধতা সম্পর্কে ঐকমত্য রয়েছে। এছাড়া অন্য কোনো আয়াত পাঠ করা ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মতে বৈধ নয়। চাই যে কোনো উদ্দেশেই হোক না কেনো। হানাফিদের মতে তা বৈধ।

তারপর হানাফি ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে দোয়া হিসেবে ফাতেহা পাঠ করা সম্পর্কে মতপার্থক্য। কারও কারও মতে এটাও জায়েজ। কারণ, উদ্দেশ্য তেলাওয়াত নয়। তবে মুহাক্কিকিনের মতে জায়েজ নয়। কারণ, একটি স্বতন্ত্র সূরা কোরআন হওয়া থেকে খারেজ হতে পারে না। বিশেষতো যখন সূরা ফাতেহার দোয়া কোরআনের শব্দ ছাড়া অন্য শব্দেও সম্ভব। 'বাহরুর রায়েক' গ্রন্থকার বলেছেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে দোয়ায়ে কুনুতের তেলাওয়াতও অবৈধ। কেনোনা এটি কোরআনের শব্দের নিকটতম। আবার অনেক বর্ণনা দ্বারা এটা কোরআন বলে বোঝা যায়। কিন্তু অধিকাংশের মতে বৈধ। কেনোনা কোরআন প্রমাণিত হওয়ার জন্য শর্ত মুতাওয়াতির হওয়া।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ (صـ ٣٥)

অনুচ্ছেদ- ৯৯ : মাসিকগ্রস্ত মহিলার সাথে গা মিলন প্রসঙ্গে (মতন ৩৫)

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِذَا حِضْتُ يَأْمُرُنِىْ اَنْ اَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُنِىْ

১৩২. অর্থ : হজরত আয়েশা (রা.) হতে হাদিস বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি যখন ঋতুবতী হতাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পেডিকোট পরার নির্দেশ দিতেন। তারপর আমার গায়ের সাথে গা মিলাতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

উম্মে সালামা ও মায়মুনা (রা.) থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আয়েশা (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح। এটা একাধিক আলেম সাহাবি ও তাবেয়ির মাজহাব। শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক (র.) পোষণ করেন এ মতই।

দরসে তিরমিযী

مباشره শব্দের আভিধানিক অর্থ চামড়ার সাথে চামড়া মিলানো। ঋতুবতী মহিলার ক্ষেত্রে এর তিনটি পদ্ধতি রয়েছে,

১. যৌন মিলন বা সহবাসের দ্বারা উপকৃত হওয়া, (যাকে বলে যৌন সম্ভোগ)। এটা উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। এমনকি ইমাম নববি (র.) যে এটাকে হালাল মনে করবে তার প্রতি কুফরের হুকুম লাগিয়েছেন। যা দ্বারা বোঝা যায়, শাফেয়ি মতাবলম্বীদের মতে যে এটাকে হালাল মনে করবে সে কাফের। 'বাহরুর রায়েক' এর লেখক লিখেছেন, হানাফি ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে এর কুফরি সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। আমার মতে কাফের সাব্যস্ত না করাই প্রধান। কারণ, কাফের সাব্যস্ত করার বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন। এমনকি কোনো কোনো ফকিহ বলেছেন যে, যদি দশটি কারণের মধ্যে নয়টি কারণ কুফরের আর একটি কারণ ঈমানের হয়, তাহলে ঈমানের কারণটিই প্রাধান্য পাবে। لأن الاسلام يعلو ولا يعلى অর্থাৎ, এ জন্যেই ইসলাম বিজয়ী হয়, পরাভূত হয় না। আল্লামা শামি (র.) বলেছেন, হানাফি ফুকাহায়ে কেরাম কাফের সাব্যস্ত করার বিষয়ে খুব সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।

আর এই মাসআলায় কাফের সাব্যস্ত না করার কারণ হলো, যখন কোনো জিনিসের হারাম হওয়ার বিষয়টি অকাট্য নস দ্বারা প্রমাণিত হয়, আর সে হারাম হওয়ার বিষয়টিও সত্তাগত কারণেই হয়, তবে যে এটাকে হালাল মনে করবে তার ওপর কুফরের হুকুম লাগানো হয়। আর যদি এটা অকাট্য নস দ্বারা প্রমাণিত না হয়, অথবা এর হারাম হওয়ার বিষয়টি সত্তাগত কারণে নয় বরং ভিন্ন কারণে হয়, তাহলে কুফরের হুকুম হয় না। এ মাসআলাটিতে অকাট্য নস বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু হারাম হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন কারণে, সত্তাগত কারণে নয়। সুতরাং সাব্যস্ত করা যাবে না কাফের হিসেবে।

২. সঙ্গম ব্যতিত নাভির ওপর থেকে সম্ভোগ করা। এতে মতানৈক্য আছে। অধিকাংশ ইমামের মতে এটা নাজায়েজ। ইমাম আহমদ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে জায়েজ। তাঁদের প্রমাণ সহিহ মুসলিম : ১/১৪৩ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها... الخ -এর অধীনে হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত দীর্ঘ একটি হাদিস। তাতে রাসূলে আকরাম ﷺ-এর এরশাদ বর্ণিত হয়েছে, اصنعوا كل شئ الا النكاح (الجماع) তথা তার সাথে সহবাস ব্যতিত আর সবকিছুই করতে পার। এই বর্ণনাটি প্রত্যক্ষ বাচনিকতার সাথে সহবাস ব্যতিত অন্য ধরনের সম্ভোগ হালাল বলে প্রমাণ করে। জুমহুরের প্রমাণ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ি, ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে আহমদে হজরত আয়েশা, উম্মে সালামা, উম্মে হাবিবা, হজরত আনাস এবং হজরত মু'আজ ইবনে জাবাল (রা.) প্রমুখের বর্ণনা। সবগুলোর যৌথ অর্থ হলো, রাসূলে আকরাম ﷺ চামড়ার সাথে চামড়া মিলিয়েছেন লুঙ্গি কিংবা ছায়ার ওপর।

আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেছেন, বিরোধের জন্য দুটি দলিল সমপর্যায়ের হওয়া শর্ত। এখানে সমতা নেই। কারণ, মুসলিমের বর্ণনা মানতূক (বাক্যের মূল উদ্দেশ্য) হিসেবে সম্ভোগ হালাল হওয়ার প্রমাণ করে। আর জমহুরের বর্ণনাগুলো অর্থগতভাবে হারাম প্রমাণ করে। বস্তুত মানতূক অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে। তারপর জবাব দিয়েছেন যে, এ বর্ণনাগুলোও মানতূকরূপে হারাম প্রমাণ করে। কেনোনা আবু দাউদে[১] রয়েছে,

حرام بن حكيم عن عمه (عبد الله بن سعد) أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لى من امرأتى وهى حائض قال لك ما فوق الازار ـ

হজরত হারাম ইবনে হাকিম তাঁর চাচা (আবদুল্লাহ) হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছেন, আমার স্ত্রী ঋতুবতী থাকা অবস্থায় তার সাথে আমার কি করা হালাল? জবাবে তিনি বললেন, লুঙ্গির (ছায়ার) ওপরের অংশ তোমার জন্য (ব্যবহার করা) হালাল।'

এই হাদিসটি সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ (র.) নীরবতা অবলম্বন করেছেন। এ হাদিসটিতে প্রশ্নের মধ্যে উল্লিখিত ما শব্দটি ব্যাপক। অতএব, জবাবেও لك ما فوق الازار এ ব্যাপকতা হবে। আর এই বর্ণনাটি মানতূকরূপে ছায়ার নিচে তথা নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ সম্ভোগ করা হারাম বুঝাবে। অথবা এই জবাব দেওয়া যে, জমহুরের বর্ণনাগুলো বাধ্যতামূলক পদ্ধতিতে হারাম প্রমাণ করে। আর বাধ্যতামূলক অর্থ মানতূকের পর্যায়ভুক্ত। আল্লামা কাশ্মীরি (র.) বলেছেন, এই মতানৈক্য ইজতেহাদের ক্ষেত্রে মর্তবার পার্থক্যের ফল রূপে হয়েছে। কেনোনা, মুসলিমের রেওয়ায়াতে এক দল نكاح শব্দ দ্বারা সহবাস উদ্দেশ্য করেছেন। আর অন্য দল উদ্দেশ্য করেছেন ما يجاوره তথা সহবাসের আনুষঙ্গিক বিষয়ও। অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা দ্বিতীয় দলের উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয়। সুতরাং এটারই প্রাধান্য হবে। বিশেষতো এ কারণেও হারাম প্রাধান্য পায়।

টীকা- ১. ১/২৮ باب فى مباشرة الحائض ومواكلتها

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مُوَاكَلَةِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ وَسُؤْرِهِمَا

অনুচ্ছেদ- ১০০ : জুনুবি ব্যক্তি ও ঋতুবতী মহিলার সাথে পানাহার এবং তাদের ঝোটা প্রসঙ্গে

عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ (رضـ) قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ؟ فَقَالَ وَاكِلْهَا .

১৩৩. অর্থ : হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি নবী করিম ﷺ-কে ঋতুবতীর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি বললেন, তার সাথে খাও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আয়েশা ও আনাস (রা.) থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে সা'দের হাদিসটি حسن غريب। (বরং হাদিসটি সহিহ। –শাকের) এটি অধিকাংশ আলেমের মত। তাঁরা ঋতুবতী মহিলার সাথে খাওয়া-দাওয়াতে কোনো দোষ মনে করেন না। ওলামায়ে কেরাম তার ওজুর বেঁচে যাওয়া পানি সম্পর্কে মতবিরোধ করেছেন। অনেকে এটার অনুমতি দিয়েছেন। আর অনেকে মনে করেছেন তার পবিত্রতা অর্জনের পর উচ্ছিষ্ট পানি ব্যবহার মাকরূহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّئْ مِنَ الْمَسْجِدِ (صـ ٣٥)

অনুচ্ছেদ- ১০১ : ঋতুবতী নারী মসজিদ থেকে কোনো জিনিস আনতে পারা প্রসঙ্গে (মতন ৩৫)

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ (رضـ) قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم نَاوِلِيْنِى الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ قُلْتُ اِنِّىْ حَائِضٌ قَالَ اِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِيْ يَدِكِ .

১৩৪. অর্থ : হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মসজিদ থেকে আমাকে চাটাইটি এনে দাও। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি তো ঋতুবতী। জবাবে তিনি বললেন, তোমার মাসিক তো তোমার হাতে নয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইবনে উমর ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আয়েশা (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। এ ব্যাপারে তাদের কোনো মতানৈক্য আছে বলে আমি জানি না যে, ঋতুবতী কর্তৃক মসজিদ থেকে কোনো জিনিস আনাতে কোনো দোষ নেই।

দরসে তিরমিযী

প্রায় সবার ঐকমত্য রয়েছে এ ব্যাপারে যে, ঋতুবতী মহিলার জন্য মসজিদে প্রবেশ করা হারাম।[১] সাধারণ ওরফে যাকে প্রবেশ বলা হয় সেটাই এখানে উদ্দেশ্য, হাত বা মাথা ঢুকিয়ে দেওয়া নয়। যেহেতু ওরফে এটাকে প্রবেশ বলা হয় না। এজন্য সর্বসম্মতিক্রমে এটা বৈধ।

টীকা- ১. শায়খ বিন্নৌরি (র.) বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা, মালেক, সুফিয়ান সাওরি (র.) এবং অধিকাংশ উম্মতের (অপর পৃষ্ঠায়)

قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولينى الخمرة من المسجد কাজি আয়াজ (র.) বলেছেন যে, من المسجد মুতাআল্লিক قال -এর সাথে। রাসূল ﷺ-এর ইতিকাফকালের ঘটনা যে, তিনি মসজিদ থেকে আওয়াজ দিয়ে হজরত আয়েশা (রা.)-কে এটা বলেছেন। এর সহায়তা হয় ইবনে হাজম কর্তৃক মুহাল্লা : ২/১৮৪ গ্রন্থে বর্ণিত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিস দ্বারা। হাদিসটি হলো,

عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى المسجد فقال يا عائشة (رضـ) ناولينى الثوب فقالت انى حائض فقال ان حيضتك ليست فى يدك... الخ [১].

'আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে ছিলেন। তিনি বললেন, আয়েশা! আমাকে কাপড়টি দাও। তখন তিনি বললেন, আমি ঋতুবতী। জবাবে তিনি বললেন, তোমার হায়জ তোমার হাতে নয়।'

ইমাম নববি (র.) ও কাজি ইয়াজ (র.)-এর এ কারণেই ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছেন এবং এই ব্যাখ্যা হিসেবে আলোচ্য অনুচ্ছেদের শিরোনাম প্রমাণিত হবে না। কিন্তু ইমাম তিরমিযী (র.) আবু দাউদ (র.) এবং অন্যান্য মুহাদ্দিস من المسجد কে ناولينى -এর সাথে মুতাআল্লিক (সম্পৃক্ত) সাব্যস্ত করেছেন। এর সহায়তা হয় নাসায়ি ও মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হজরত মায়মুনা (রা.)-এর হাদিস দ্বারা। তাতে তিনি বলেন,

ثم تقوم احدانا بخمرته فتضعها فى المسجد وهى حائض .

'অতঃপর আমাদের একজন তার চাটাই নিয়ে প্রস্তুত হতো। তারপর তা নিয়ে মসজিদে রাখতো। অথচ সে তখন ছিলো ঋতুবতী।'[২]

এর সহায়তা হজরত মায়মুনা (রা.)-এর একটি হাদিস দ্বারাও হয়। তাতে তিনি বলেছেন[৩]

كنا نتناول الشئ من المسجد ونحن حيض

'আমরা মসজিদ থেকে কোনো জিনিস ধরতাম ঋতুবতী অবস্থায়।'

আলোচ্য অনুচ্ছেদের শিরোনাম এই ব্যাখ্যা হিসেবে প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, রাসূল ﷺ এবং আয়েশা (রা.) হুজরাতে ছিলেন, আর চাটাই ছিলো মসজিদে। এ অবস্থায় প্রিয়নবী ﷺ এ নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মাজহাব হলো, গোসল ফরজ বিশিষ্ট ব্যক্তিও ঋতুবতী মহিলার জন্য মসজিদে প্রবেশ করা না জায়েজ। তারা মসজিদে অবস্থানও করবে না এবং মসজিদ দিয়ে অতিক্রমও করবে না। ইমাম শাফেয়ি (র.) বলেছেন, গোসল ফরজ বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য মসজিদের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করা জায়েজ, অবস্থান করা নয়। অনুরূপভাবে ঋতুবতী মহিলার জন্য এক বর্ণনা মুতাবেক অতিক্রম করা জায়েজ; কিন্তু মসজিদে প্রবেশ করা ও অবস্থান করা নয়। আরেকটি বর্ণনা হলো, জমহুরের ন্যায়। ইমাম আহমদ (র.) বলেছেন, ঋতুবতী মহিলার জন্য জায়েজ নেই। কিন্তু গোসল ফরজবিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য মসজিদে ঢোকা ও তাতে অবস্থান করা জায়েজ, যদি নাপাকি দূর করার জন্য ওজু করে নেয়।

দাউদ আল-মুজানি এবং ইবনুল মুনজির বলেছেন, উভয়ের জন্য ব্যাপকভাবে মসজিদে প্রবেশ করা জায়েজ। (শরহে মুহাজ্জাব ইত্যাদি থেকে চয়নকৃত) জমহুরের প্রমাণ হলো, আবু দাউদে বর্ণিত হজরত আয়েশা (রা.)-এর হাদিস- فانى لا احل المسجد لحائض ولا جنب তথা আমি কোনো ঋতুবতী মহিলা এবং গোসল ফরজ বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য মসজিদ (এ প্রবেশ)-কে হালাল করি না। (মা'আরিফুস্ সুনান : ১/৪৫৪-৪৫৫ সংকলক)

টীকা- ১. *হাদিসটি ইমাম মুসলিম (র.) ও সহিহ মুসলিম : ১/১৪৩* باب غسل جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سورها... الغ *তে বর্ণনা করেছেন।*

টীকা- ২. *অধম এই শব্দগুলোসহকারে হাদিসটি পায়নি। –রশিদ আশরাফ*

টীকা- ৩. *মুসনাদে আহমদ : ৬/৩৩১; নাসায়ি : ১/৫৩* (باب بسط الحائض الخمرة فى المسجد।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ إِتْيَانِ الْحَائِضِ (ص ٣٥

অনুচ্ছেদ- ১০২ : ঋতুবতী মহিলার সাথে যৌন সঙ্গম নিষিদ্ধ (মতন ৩৫)

حكيم الاثرم عن ابى تميمة الهجيمى عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَتٰى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِيْ دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ـ

১৩৫. অর্থ : হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত নবী করিম ﷺ বলেছেন, যে কোনো ঋতুবতী মহিলার সাথে সহবাস করলো, অথবা মহিলার গুহ্যদ্বারে যৌন কর্ম সম্পাদন করলো অথবা কোনো গণকের কাছে গেলো, তবে সে কুফরি করলো মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি নাজিলকৃত বিষয়ের প্রতি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এটি আমরা হুকায়ম আল-আছরাম-আবু তামিমা আল হুজায়মি আবু হুরায়রা সূত্রে বর্ণিত হাদিস হতেই জানি। এ হাদিস দ্বারা ওলামায়ে কেরামের মতে উদ্দেশ্য হলো, এসব কর্মের মারাত্মকতা বর্ণনা করা। নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি এরশাদ করেছেন, কেউ যদি ঋতুবতী মহিলার সঙ্গে সহবাস করে তবে যেনো এক দিনার সদকা করে দেয়। যদি ঋতুবতী মহিলার সঙ্গে সঙ্গম করা কুফরি হতো তাহলে কাফ্ফারার নির্দেশ দেওয়া হতো না এ ব্যাপারে।

হজরত মুহাম্মদ (র.) সনদগতভাবে এ হাদিসটিকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। আবু তামিমা আল-হুজায়মির নাম হলো, তারিফ ইবনে মুজালিদ।

দরসে তিরমিযী

মাকরূহ বলতে হারাম এবং কুফরও অন্তর্ভুক্ত ছিলো মুতাকাদ্দিমিনের পরিভাষায়। ইমাম তিরমিযী (র.)-এরও এই পরিভাষাই।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের রেওয়ায়াতে তিনটি মাসআলা রয়েছে,

১. **من اتى حائضا :** باب ماجاء فى مباشرة الحائض -এর অধীনে এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে।

২. **او امرأة فى دبرها :** ইমাম নববি (র.) স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাস হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইজমা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু 'হিদায়া' গ্রন্থকার হজরত ইবনে উমর (রা.) থেকে এর বৈধতার বক্তব্য বর্ণনা করেছেন। তারপর বলেছেন যে, এই বক্তব্যটি অনির্ভরযোগ্য। কারণ, এটা অকাট্য নসের পরিপন্থি। হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেছেন যে, ইবনে উমর (রা.) এর এই বক্তব্য থেকে প্রত্যাবর্তনও প্রমাণিত আছে। ইমাম তাহাবি (র.) শরহে মা'আনিল আছারে ইমাম দারেমি (র.) স্বীয় মুসনাদে : ১৩৫ এবং ইবনে জারির (র.) স্বীয় তাফসিরে : ১/২২২ এ সহিহ সনদে হজরত সাইদ ইবনে ইয়াসার (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে উমর (রা.)-কে তিনি জিজ্ঞেস করলেন,

يا ابا عبد الله انا نشترى الجوارى فنمحض تمحيضا فقال وما التحميض قال الدبر فقال ابن عمر اف اف يفعل ذلك مؤمن او مسلم ـ

'হে আবু আবদুল্লাহ! আমরা কুমারি বাঁদিদের ক্রয় করি, তারপর তাদের সাথে تمحيض করি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, تمحيض কি জিনিস? তিনি বললেন, গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করা। তখন ইবনে উমর (রা.) বললেন, উফ্! উফ্! কোনো মুসলমান অথবা মু'মিন কি এ কাজ করে?'

স্পষ্টভাবে এই বর্ণনা দ্বারা হারাম প্রমাণিত হয় এবং এটা পূর্বের বক্তব্য থেকে প্রত্যাবর্তনের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং এখন এ বিষয়টি কোনো ব্যাতিক্রমভুক্তি ব্যতিত সর্বসম্মত হয়ে গেলো।

৩. **او كاهنا** : এমন ব্যক্তিকে كاهن বলা হয়, যে ভবিষ্যতের সংবাদ বর্ণনা করে এবং সৃষ্টির গোপন রহস্য জানার দাবিদার। এ ধরনের কাহানত (ভবিষ্যতের সংবাদ প্রদান) দুই প্রকার– এক. অর্জিত, দুই. স্বভাবজাত। ইবনে খালদুন (র.) বলেছেন, আরবদের মধ্যে স্বভাবজাত কাহানত পাওয়া যেতো। ফুকাহায়ে কেরামের মতে এর দুটো প্রকারই حرام।[১]

فقد كفر بما انزل على محمد : হালাল মনে করে যদি এসব কাজ করে তাহলে এর কুফরি স্পষ্ট। যদিও কোনো কোনোটি সম্পর্কে মতবিরোধ থাকবে। যেমন, ঋতুবতী মহিলার সাথে সহবাস সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। আর হালাল মনে করে না করলে এটা কঠোরতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইমাম তিরমিযী (র.) দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি অবলম্বন করেছেন। এর প্রমাণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে, ঋতু অবস্থায় সহবাস করার ক্ষেত্রে সদকা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর সদকা করার নির্দেশ মু'মিনকেই দেওয়া যেতে পারে। এতে প্রমাণিত হলো, ঋতুবতী মহিলার সাথে সহবাস কুফরি না।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْكَفَّارَةِ فِىْ ذٰلِكَ (صـ ٣٥)

অনুচ্ছেদ- ১০৩ : মাসিকগ্রস্ত রমণীর সাথে সঙ্গমের কাফ্ফারা প্রসঙ্গে (মতন ৩৫)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى الرَّجُلِ يَقَعُ عَلٰى امْرَأَتِهٖ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ ـ

১৩৬. **অর্থ** : হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ ঋতুবতী মহিলার সাথে সঙ্গম করে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন, সে অর্ধ দিনার সদকা করে দিবে।

عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا كان دما احمر فدينار وان كان دما اصفر فنصف دينار ـ

১৩৭. **অর্থ** : হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেছেন, যদি লাল রক্ত হয়, তাহলে এক দিনার আর যদি হলুদ রক্ত হয় তবে অর্ধ দিনার।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, ঋতুবতীর সাথে সঙ্গমের কাফফারার হাদিসটি ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে মওকুফ এবং মারফু দু'ভাবেই বর্ণিত হয়েছে। এটা কোনো কোনো আলেমের মত। আহমদ (র.)-ও এই মতই পোষণ করেন।

হজরত ইবনুল মুবারক বলেছেন, সে আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার-ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তার ওপর কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়। ইবনে মুবারক (র.)-এর মতের অনুরূপ কোনো কোনো তাবেই থেকে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছেন সায়িদ ইবনে জুবায়র ও ইবরাহিম।

দরসে তিরমিযী

يتصدق بنصف دينار : ইমাম আহমদ, ইসহাক, আওজায়ি (র.)-এর নিকট সদকার নির্দেশ ওয়াজিবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ, তওবা কবুল করা সদকা ব্যতিত সম্ভব নয়। এর পদ্ধতি এই হবে যে, হায়জের প্রথম দিকে এক দিনার আর শেষের দিকে হলে অর্ধ দিনার ওয়াজিব হবে। জমহুরের মতে তওবার আয়াত দ্বারা এটা মনসুখ অথবা মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাকে শুধু তওবা ইস্তেগফার করতে হবে। ইমাম আহমদ (র.)-এর একটি বর্ণনা জমহুরের মতো।

টীকা- ১. স্বভাবজাতভাবে ভবিষ্যত সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করার বিষয়টি তো ঐচ্ছিক নয়। অতএব, তা থেকে দূরে থাকার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি। অবশ্য এই স্বভাবজাত ভবিষ্যৎ বক্তাগিরির প্রকাশ ও বর্ণনা এবং তা দ্বারা কার্য উদ্ধার করা হারাম।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ غَسْلِ دَمِ الْحَيْضِ مِنَ الثَّوْبِ (صـ ٣٥)

অনুচ্ছেদ- ১০৪ : কাপড় থেকে হায়েজের রক্ত ধুয়ে ফেলা প্রসঙ্গে (মতন ৩৫)

عَنْ اَسْمَاءَ ابْنَةِ اَبِيْ بَكْرِ دِالصِّدِّيْقِ اَنَّ اَمْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حُتِّيْهِ ثُمَّ اقْرُصِيْهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ رُشِّيْهِ وَصَلِّىْ فِيْهِ.

১৩৮. অর্থ : হজরত আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দিক (রা.) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা নবী করিম ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করলো, কাপড়ে (যদি) মাসিকের রক্ত লেগে যায় (তাহলে কী করবো?) এ শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটাকে আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে তুলে ফেলো। তারপর তাতে পানি দিয়ে ডলে নাও। তারপর তাতে নামাজ পড়ো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হযরত আবু হুরায়রা ও উম্মে কায়স বিনতে মিহসান (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। রক্ত ধোয়া সংক্রান্ত আসমার হাদিসটি حسن صحيح। ওলামায়ে কেরাম কাপড়ে রক্ত লাগার পর ধোয়ার আগে সে কাপড় দিয়ে নামাজ পড়তে পারবে কি না– এ নিয়ে মতানৈক্য করেছেন। অনেক তাবেয়ি আলেম বলেছেন, যদি এক দিরহাম পরিমাণ রক্ত লাগার পর না ধুয়ে তাতে নামাজ পড়ে তবে নামাজ দোহরাতে হবে। আর অনেক আলেম বলেছেন, যদি এক দিরহাম পরিমাণের চেয়ে বেশি রক্ত লাগে তবে নামাজ দোহরাবে। এটা সুফিয়ান সাওরি ও ইবনে মুবারক (র.)-এর মাজহাব। আর তাবেয়ি ও অন্যান্য কোনো কোনো আলেম তাতে নামাজ দোহরানো ওয়াজিব সাব্যস্ত করেননি; যদিও এক দিরহামের চেয়ে বেশিই হোক না কেনো। এ মতই পোষণ করেন আহমদ ও ইসহাক (র.)। ইমাম শাফেয়ি (র.) বলেছেন, তার ওপর ধুয়ে নেওয়া ওয়াজিব; যদিও রক্ত এক দিরহামের চেয়ে কম পরিমাণ লাগুক না কেনো। কঠোরতা আরোপ করেছেন এ ব্যাপারে।

দরসে তিরমিযী

حتيه ثم اقرصيه بالماء : সর্বসম্মত বিষয় প্রবাহিত রক্ত নাপাক। হায়জের রক্ত এরই অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য যে পরিমাণ মাফ তাতে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরি (র.) ও কুফাবাসীর মতে সামান্য রক্ত মাফ। অর্থাৎ সুফিয়ান সাওরি (র.) ও কুফাবাসীর মতে সামান্য রক্ত মাফ। অর্থাৎ, তা নিয়ে নামাজ পড়লে নামাজ আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু বেশি রক্ত হলে তা ধৌত করা ওয়াজিব। এটাই হলো ইমাম আহমদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ (র.)-এর মত। ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মতে কমবেশিতে কোনো পার্থক্য নেই। এমনকি এক ফোঁটাও তার মতে নাপাক এবং এর বর্তমানে নামাজ হবে না। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, তার ওপর ধৌত করা ওয়াজিব; যদিও তা এক দিরহাম অপেক্ষা কম পরিমাণেই হোক না কেনো। এ ব্যাপারে তিনি কড়াকড়ি করেছেন। তারপর প্রথম দলের মাঝেও কম এবং বেশির পরিমাণে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (র.) প্রমুখের মতে এক দিরহাম পরিমাণ হলো মাপকাঠি। এক দিরহামের কম হলে তা ধৌত করা মোস্তাহাব এবং তা নিয়ে নামাজ পড়া মাকরূহে তানজিহি। কিন্তু এক দিরহাম বা ততোধিক হলে তা ধৌত করা ওয়াজিব। তা নিয়ে নামাজ আদায় করা মাকরূহে তানজিহি।

ইমাম আহমদ (র.)-এর এ প্রসঙ্গে তিনটি মাজহাব রয়েছে।

১. চতুর্দিকে এক বিঘত এক বিঘত করে হলে কম। এর চেয়ে অধিক হলে বেশি।

২. হাতের তালুর পরিমাণ হলে কম। অন্যথায় বেশি। এই বর্ণনাটি হানাফিদের মাজহাবের অধিক নিকটবর্তী। কেনোনা তালুর গভীরতা এক দিরহামেরই সমান হয়।

৩. মুবতালা বিহির রায় ধর্তব্য। এই তৃতীয় বর্ণনাটিকে আল্লামা ইবনে কুদামা (র.) প্রাধান্য দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে মূলত কোনো স্পষ্ট বর্ণনা নেই। এজন্য মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। ফুকাহায়ে কেরাম কিয়াস ও সাহাবিগণের বক্তব্য মুতাবেক সীমা নির্ধারণ করেছেন। অবশ্য আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত হজরত আসমা (রা.)-এর হাদিস দ্বারা বাহ্যত বোঝা যায় যে, রক্ত বেশি হলে তা ধৌত করা ওয়াজিব। কেনোনা প্রশ্ন করা হয়েছে– হায়জের রক্ত সম্পর্কে যা বেশি হয়ে থাকে। এতে এদিকে ইঙ্গিত হয় যে, কম রক্ত ধৌত করা আবশ্যক না। ইমাম নববি (র.) বলেছেন, প্রথম শতাব্দি থেকেই প্রবাহিত রক্ত বিশেষতো মাসিকের রক্ত নাপাক হওয়ার বিষয়টি সর্বসম্মত। হজরত আসমা (রা.) তাহলে প্রশ্ন করেছিলেন কেনো?

ইমাম নববি (র.) জবাব দিয়েছেন যে, আসলে প্রশ্নের কারণ ছিলো মহিলাদের হায়েজের রক্ত আসার ব্যাপারটি ব্যাপক। আর উমুমে বালওয়া (ব্যাপক লিপ্ততা) অপবিত্রতার ক্ষেত্রে সহজের জন্য ক্রিয়াশীল হয়। যেমন, মণির ক্ষেত্রে উমুমে বালওয়ার কারণেই পুরুষের ক্ষেত্রে খুঁচিয়ে তুলে ফেলা জায়েজ। তাই হজরত আসমা (রা.) হায়েজের ক্ষেত্রে কোনো সহজ সুরত কামনা করেছিলেন। কিন্তু রাসূল ﷺ-এর জবাব হতে বোঝা গেলো, উমুমে বালওয়ার মূলনীতি হতে মাসিকের রক্ত ভিন্ন।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ كَمْ تَمْكُثُ النُّفَسَاءُ (ص ٣٥)

অনুচ্ছেদ- ১০৫ : নেফাসগ্রস্ত মহিলা কতো দিন পর্যন্ত (নামাজ-রোজা থেকে) বিরত থাকবে (মতন ৩৫)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا وَ كُنَّا نَطْلِيْ وُجُوْهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ .

১৩৯. অর্থ : হজরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নিফাস বিশিষ্ট মহিলা রাসূল ﷺ-এর জমানায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত বসে থাকতো তথা অপেক্ষা করতো। আমরা ওয়ারস ঘাস পিষে তার প্রলেপ দিয়ে আমাদের মুখমণ্ডলের দাগ উঠাতাম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি আমরা আবু সাহল-মুস্‌সাহ আল-আজদিয়াহ-উম্মে সালামা সূত্রে বর্ণিত হাদিস ব্যতিত অন্য কোনোভাবে জানি না। আবু সাহলের নাম كثير بن زياد।

সাহাবা, তাবেয়িন ও তৎপরবর্তী ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, নিফাস বিশিষ্ট মহিলা চল্লিশ দিন নামাজ ছেড়ে দিবে। অবশ্য এর পূর্বে যদি পবিত্রতা দেখে তবে ভিন্ন কথা। কারণ, তখন সে গোসল করে নামাজ পড়বে। তারপর যখন চল্লিশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর রক্ত দেখবে তখন অধিকাংশ আলেমের মতে সে আর চল্লিশ দিনের পর নামাজ ছাড়বে না। এটা অধিকাংশ ফকিহের মত। সুফিয়ান সাওরি, ইবনুল মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক (র.) এ মতই পোষণ করেন। হাসান বসরি (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, উক্ত মহিলা পবিত্র না হলে পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত নামাজ রোজা ছেড়ে দিবে। আর ষাট দিনের কথা বর্ণনা করা হয় আতা ইবনে আবু রাবাহ ও শা'বি থেকে।

দরসে তিরমিযী

كانت النفساء : এ শব্দটি نفس ينفس থেকে সিফাতের সীগা। যার অর্থ হলো নেফাসগ্রস্ত মহিলা। نفست المرأة، نفست المرأة মা'রূফ-মাজহুল উভয় অবস্থাতে নিফাসের অর্থে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য نفست المرأة। মা'রূফ অবস্থায় হায়েজের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মাজহুল শব্দটি নিফাসের সাথে বিশেষিত।

من الكلف : كلف শব্দটির অর্থ হচ্ছে, ছোট ছোট দাগ, যা গোসল না করার কারণে চেহারায় পড়ে থাকে। এগুলো কালো, লাল আবার কখনো মাটি রঙের হয়ে থাকে। উর্দুতে এগুলোকে جهائیان বলে। অর্থাৎ, চল্লিশ দিন পর্যন্ত এভাবে অবস্থান করার কারণে চেহারাতে বিভিন্ন প্রকার দাগ পড়ে। এগুলো দূর করার জন্য আমরা ورس (তিলের মতো এক ধরনের ঘাসবিশেষ যা দ্বারা রঙ এর কাজ নেওয়া হয়।) এর চারা ব্যবহার করতাম এবং চেহারায় মালিশ করতাম।

এ ব্যাপারে ইজমা যে, নিফাসের সর্বনিম্ন কোনো সময় নির্ধারিত নেই। এমনকি নিফাস সম্পূর্ণ না হওয়ায়ও সম্ভব। কিন্তু নিফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরি, ইবনে মুবারক, আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইসহাক (র.)-এর মতে সর্বোচ্চ মেয়াদ চল্লিশ দিন। এটাই হলো ইমাম মালেক (র.)-এর এক বর্ণনা। তিরমিযী (র.)-এর বক্তব্য মুতাবেক ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মাজহাব এটাই। ইমাম মালেক (র.)-এর মাজহাব। আর তাঁর তৃতীয় বর্ণনা হলো, ষাট দিন। ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর দ্বিতীয় বর্ণনাও এটাই। ইমাম শা'বি ও আতা ইবনে আবু রাবাহ-এর মাজহাবও অনুরূপ। মূলত এ ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট মারফু হাদিস নেই। ফুকাহায়ে কেরাম নিজ নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে এসব সময় নির্ধারণ করেছেন। অবশ্য হানাফিগণ শুধু কিয়াসের পরিবর্তে আমল করেছেন– হজরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদে হাদিসের ওপর।

قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما .

'নেফাসগ্রস্ত মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বিরত থাকতো।'

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّجُلِ يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

অনুচ্ছেদ- ১০৬ : এক গোসলে একাধিক স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করা (মতন ৩৬)

عَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوْفُ عَلٰى نِسَائِهٖ فِىْ غُسْلٍ وَاحِدٍ-

১৪০. **অর্থ :** 'আনাস (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ একই গোসলে তাঁর অর্ধাঙ্গিনীদের সাথে সঙ্গম করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু রাফে' (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আনাস (রা.)-এর হাদিসটি বিশুদ্ধ। এটা একাধিক আলেমের মাজহাব। তন্মধ্যে রয়েছেন হাসান বসরি (র.)। তাঁদের মতে ওজু করার পূর্বে এক স্ত্রীর সাথে সহবাসে মিলিত হয়ে অপর স্ত্রীর সাথে সহবাসে কোনো অসুবিধা নেই। এ হাদিসটি মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি সূত্রটি বলেছেন, আবু ওরওয়া-আবুল খাত্তাব-আনাস হতে। আবু ওরওয়া হলেন মা'মার ইবনে রশিদ। আর আবুল খাত্তাব হলেন, কাতাদা ইবনে দি'আমা।

দরসে তিরমিযী

كان يطوف على نسائه فى غسل واحد : দুই সঙ্গমের মাঝে গোসল করা আবশ্যক না। এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে। এ কারণে রাসূল ﷺ-এর আমল ছিলো এ বৈধতার বিবরণের জন্য। তা ছাড়া রাসূল ﷺ-এর সাধারণ রীতি অনুরূপ ছিলো না। তাঁর সাধারণ নিয়ম সুনানে আবু দাউদে[১] হজরত আবু রাফে' (র.)-এর হাদিসে রয়েছে,

ان النبى صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه فقلت له يارسول الله الا تجعله غسلا واحدا فقال هذا ازكى واطيب واطهر .

টিকা–১. ১/২৯, باب الوضوء لمن اراد ان يعود

'একদিন নবী করিম ﷺ একদিন তাঁর স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়েছেন। এর কাছেও গোসল করতেন অপর জনের কাছেও গোসল করতেন। রাবি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! একবার গোসল করলে ভালো হতো না? জবাবে তিনি বললেন, এটা পরিচ্ছন্নতম, আফজাল ও পবিত্রতম।'

এতে বোঝা গেলো, প্রতিবার গোসল করা আফজাল।

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, একই রাত্রে সমস্ত স্ত্রীদের কাছে গমন করা বাহ্যত স্ত্রীদের মাঝে যে দিন বণ্টন আছে তার বিপরীত।

জবাব : ১. অনেকে বলেছেন, রাসূল ﷺ-এর ওপর এ বণ্টন ওয়াজিব ছিলো না। যেমন, কোরআনের আয়াত, ترجى من تشاء منهن و تووى اليك من تشاء দ্বারা বোঝা যায়। কিন্তু এই জবাব এজন্য জয়িফ যে, যদি নবীজি ﷺ-এর ওপর এই বণ্টন ওয়াজিব নয় বলেও স্বীকার করে নেওয়া হয়, তবুও এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, প্রিয়নবী ﷺ সর্বদা বণ্টনের বিধানের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন; কখনও এই সুযোগ-সুবিধার ফায়দা ওঠাননি।

২. অনেকে এই জবাব দিয়েছেন যে, সব স্ত্রীর নিকট গমন সেদিন যার পালা ছিলো তার অনুমতিতে করেছিলেন।

৩. অনেকে বলেছেন, এই ঘটনা সফরের সঙ্গে সঙ্গে ঘটেছিলো, পালা যখন শুরু হয়নি।

৪. অনেকে বলেছেন, এটা পালা বণ্টন ওয়াজিব হওয়ার আগের ঘটনা।

৫. আর অনেকে বলেছেন, এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো পালা বণ্টন পরিপূর্ণ আদায়ের পর। তারপর পুনরায় নতুনভাবে পালা বণ্টন শুরু হয়েছে। তাছাড়া আরো অনেক জবাব দেয়া হয়েছে।

৬. তবে সবচেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা দিয়েছেন হজরত শাহ সাহেব (র.)। সেটা হচ্ছে, এই ঘটনা শুধু দুই বার সংঘটিত হয়েছিলো। একবার ঘটেছিলো বিদায় হজের সময় ইহরাম বাঁধার আগে। আরেকবার ঘটেছিলো তাওয়াফে জিয়ারতের পর হালাল হওয়ার সময়। ইহরাম বাঁধার পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য হক আদায় করে তথা স্বামী-স্ত্রী মিলন থেকে অবসর হওয়া সুন্নত। আর এ সফরে যেহেতু সকল পবিত্র স্ত্রীগণ সঙ্গে ছিলেন, এজন্য রাসূল ﷺ সবাইকে এ সুন্নতের ওপর আমল করানোর উদ্দেশে এমন করেছেন। এ অবস্থা ছিলো সফরের। তাই পালা বণ্টন ওয়াজিব ছিলো না। এমনকরে তাওয়াফে জিয়ারতের পর পূর্ণাঙ্গভাবে হালাল হওয়া যায় সঙ্গমের মাধ্যমে। আর রাসূল ﷺ সেখানেও অনুরূপ করেছিলেন এ উদ্দেশেই।

بَابُ مَا جَاءَ اِذَا أَرَادَ اَنْ يَّعُوْدَ تَوَضَّأَ (صـ ٣٦)

অনুচ্ছেদ- ১০৭ : পুনরায় সঙ্গম করতে চাইলে ওজু করে নেবে (মতন ৩৬)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمْ اَهْلَهٗ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يَّعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوْءً.

১৪১. অর্থ : আবু সায়িদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ স্ত্রীর নিকট গমন করে (সঙ্গম করে) তারপর পুনরায় সঙ্গম করতে চায়, তবে মাঝখানে যেনো সে ওজু করে নেয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

উমর (রা.) থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'আবু সায়িদের হাদিসটি حسن صحيح। এটা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর মত। এ মতই পোষণ করেন একাধিক আলেম। তাঁরা বলেছেন, যখন কেউ স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে তারপর পুনরায় তা করতে চায়, তবে পুনরায় মিলিত হওয়ার আগে ওজু করে নেবে।

আবুল মুতাওয়াক্কিলের নাম হলো আলি ইবনে দাউদ। আবু সায়িদ খুদরির নাম হলো, سعد بن مالك بن سنان।

দরসে তিরমিযী

فليتوضأ بينهما وضوء : জমহুরের মতে এই নির্দেশটি প্রযোজ্য মোস্তাহাবের ক্ষেত্রে। অবশ্য কোনো কোনো আহলে জাহের এবং ইয়াজিদ ইবনে হারুন মালেকি (র.) এটাকে ওয়াজিবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরেন। জমহুরের প্রমাণ হলো, এই বর্ণনাটি সহিহ ইবনে খুজায়মাতে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা সূত্রে বর্ণিত আছে, তাতে এই নির্দেশসূচক শব্দের পর নিম্নেযুক্ত বাক্যটিও রয়েছে,

فإنه انشط له في العود [১] . 'কেনোনা, এটি পুনরায় সহবাসে অধিক স্বতঃস্ফূর্ততা-ফূর্তি তৈরি করে।'

যা দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এ ওজু মনে আনন্দ-ফূর্তি সৃষ্টি করার জন্য। সুতরাং এ হুকুম মোস্তাহাবের জন্য হবে, ওয়াজিব বোঝানোর জন্য নয়। তাছাড়া ইমাম তাহাবি[২] (র.) হজরত আয়েশা (রা.)-এর হাদিস বর্ণনা করেছেন,

قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ . (معارف السنن ج١، ص٤٦٩)

'রাসূলুল্লাহ ﷺ সঙ্গম করতেন তারপর পুনরায় মিলিত হতেন, কিন্তু ওজু করতেন না।'

এতেও বোঝা যায়, এ অনুচ্ছেদের হাদিসটির নির্দেশ মুস্তাহাবের জন্য। অনেক আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটিতে ওজু দ্বারা উদ্দেশ্য আভিধানিক অর্থ তথা লজ্জাস্থান ধৌত করা নিয়েছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি ঠিক নয়। কেনোনা সহিহ ইবনে খুজায়মা : ১/১১০-এর বর্ণনায় فليتوضأ وضوئه للصلوة শব্দ এসেছে, যা এই ব্যাখ্যাটি রদ করে দিচ্ছে স্পষ্ট ভাষায়।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ وَوَجَدَ اَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ (صـ ٣٦)

অনুচ্ছেদ- ১০৮ : নামাজের সময় কারও পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন হলে প্রথমে তা সেরে নিবে (মতন ৩৬)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَرْقَمِ قَالَ أُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَاَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهٗ وَكَانَ اِمَامَ الْقَوْمِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ وَجَدَ اَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ .

১৪২. অর্থ : হজরত আবদুল্লাহ ইবনুল আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত, ওরওয়া বলেছেন, একবার নামাজের ইকামত বলা হলো, তারপর আবদুল্লাহ ইবনুল আরকাম (রা.) এক ব্যক্তির হাতে ধরে সামনে এগিয়ে দিলেন। অথচ আবদুল্লাহ ছিলেন কওমের ইমাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যখন নামাজের ইকামত বলা হয় আর কোনো ব্যক্তি পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন অনুভব করে, তখন যেনো সে আগে পেশাব-পায়খানার জরুরত পূরণ করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আয়েশা, আবু হুরায়রা, সাওবান ও আবু উমামা (রা.) থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনুল আরকামের হাদিসটি حسن صحيح। মালেক ইবনে আনাস ও ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল-কাত্তান প্রমুখ হাফেজ হিশাম ইবনে ওরওয়া সূত্রে ওরওয়ার সনদে আবদুল্লাহ ইবনুল আরকাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

টীকা- ১. সহিহ ইবনে খুজায়মা : ১/১১০, হাদিস নং ২২১। এই অতিরিক্ত অংশটুকু ইবনে হাব্বান, হাকেম এবং বায়হাকি (র.) ও বর্ণনা করেছেন। –হাশিয়া ইবনে খুজায়মা-জাহরুর রুবার বরাতে : ১/১১৭।

টীকা- ২. ১/৬২, باب الجنب يريد النوم او الاكل او الشرب او الجماع

হাদিসটি উহাইব প্রমুখ হিশাম ইবনে ওরওয়া-তার পিতা-জনৈক ব্যক্তি-আবদুল্লাহ ইবনুল আরকাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটা একাধিক সাহাবি ও তাবেয়ির মত। এ মতই পোষণ করেন, আহমদ ও ইসহাক (র.)। তাঁরা বলেছেন, পেশাব-পায়খানার হাজত সামান্য অনুভব করলে নামাজে দাঁড়াতে যাবে না। তাঁরা আরও বলেছেন, যদি নামাজ আরম্ভ করে তারপর তা অনুভব করে তবে নামাজ থেকে ফিরে আসবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত পেশাব-পায়খানার হাজত তাকে নামাজ থেকে বিরত না রাখে।

অনেক আলেম বলেছেন, পেশাব-পায়খানার হাজত হলে যতোক্ষণ পর্যন্ত নামাজ থকে তা এদিকে মশগুল না করে ততোক্ষণ পর্যন্ত নামাজ পড়াতে কোনো দোষ নেই।

দরসে তিরমিযী

فليبدأ بالخلاء : ইমাম মালেক (র.) থেকে এই হাদিসের ভিত্তিতে এই বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে যে, পেশাব-পায়খানার চাপের সময় যদি নামাজ পড়া হয় তবে তা আদায় হয় না। কিন্তু জমহুরের মতে আদায় তো হয়ে যায়, কিন্তু মাকরূহ থেকে যায়। হানাফিদের মতে এ ব্যাপারে তাফসিল রয়েছে। যদি পেশাব-পায়খানার চাপ অস্থিরতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তবে এটি জামাত তরক করার জন্য ওজর। আর এ অবস্থায় নামাজ আদায় করা মাকরূহে তাহরিমি। আর যদি অস্থিরতার পর্যায়ে না পৌঁছে, কিন্তু এমন চাপ হয় যার ফলে নামাজ থেকে মনোযোগ হটিয়ে দেয় এবং নামাজের একাগ্রতা শুধু ছুটে যেতে শুরু হয়, তাহলে এটাও জামাত তরক করার ওজর। আর এমন অবস্থায় নামাজ মাকরূহে তানজিহি। আর যদি প্রস্রাব-পায়খানার চাপ এতোটা স্বাভাবিক হয় যে, তা নামাজ থেকে মনোযোগ সরায় না, তবে এটা জামাত তরক করার মতো না।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْوُضُوْءِ مِنَ الْمَوْطِى (٣٦)

অনুচ্ছেদ- ১০৯ : পথের ময়লা লাগলে ওজু করা প্রসঙ্গে (মতন ৩৬)

عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَتْ قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ إِنِّى امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِى وَأَمْشِى فِى الْمَكَانِ الْقَذِرِ؟ فَقَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ.

১৪৩. অর্থ : হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ-এর উম্মে ওয়ালাদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি উম্মে সালামা (রা.)কে বললাম, আমি আমার কাপড়ের আঁচল লম্বা করে দেই এবং ময়লা স্থান দিয়ে হাঁটি (এখন করণীয় কি?)। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তার পরবর্তী স্থান তাকে পবিত্র করে দেয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এ হাদিসটি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বর্ণনা করেছেন, মালেক ইবনে আনাস-মুহাম্মদ ইবনে উমারা-মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম-হুদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আউফের উম্মে ওয়ালাদ-উম্মে সালামা সূত্রে।

তবে এটি ভুল। আসলে রাবি হলেন, ইবরাহিম ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আউফের উম্মে ওয়ালাদ। তিনি উম্মে সালামা থেকে বর্ণনা করেন, এটাই হলো আসাহ।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে এর অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামাজ পড়তাম কিন্তু রাস্তার ময়লার কারণে ওজু করতাম না।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এটা একাধিক আলেমের বক্তব্য। তাঁরা বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি ময়লা স্থান মাড়িয়ে যায় তার ওপর পা ধোয়া ওয়াজিব নয়, যদি সে নাপাক স্থান ভিজা না হয়। যদি ভেজা হয়, তবে যে নাপাক লাগবে তা ধৌত করবে।

প্রশ্ন : সমস্ত ওলামায়ে উম্মতের ঐকমত্যে এই হাদিসটি তাবিলকৃত। কেনোনা মোজা এবং না'লাইন (নিচে চামড়াযুক্ত মোজা) সম্পর্কে এ বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত যে, এগুলোর ওপর লাগা নাপাক পাক মাটিতে ঘর্ষণ দেওয়ার ফলে পাক হয়ে যায়। কিন্তু দেহ এবং কাপড় সম্পর্কে ঐকমত্য রয়েছে যে, যদি এগুলোতে কোনো ভিজা নাপাক লাগে তবে ধোয়া ব্যতিত পাক হয় না। অথচ এখানে আঁচলেরও উল্লেখ রয়েছে। যা দ্বারা বোঝা যায়, পাক জমিনে ঘর্ষণের পর এটাও পবিত্র হয়ে যায়।

জবাব : অনেকে এর জবাবে বলেছেন যে, হাদিসটি জয়িফ। কেনোনা এটি আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-এর উম্মে ওয়ালাদ থেকে বর্ণিত। যিনি অজ্ঞাত। তাছাড়া কোনো কোনো বর্ণনায় তাঁকে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-এর উম্মে ওয়ালাদ সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের বর্ণনায় রয়েছে, আর কোনো কোনো বর্ণনায় ইবরাহিম ইবনে আউফ (রা.)-এর উম্মে ওয়ালাদ। যেমন আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে। কিন্তু সহিহ হলো, এ হাদিসটি জয়িফ না।

০ অবশিষ্ট রইলো, উম্মে ওয়ালাদ সংক্রান্ত ইজতেরাব। স্বয়ং স্পষ্ট ভাষায় ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন যে, ইনি ইবরাহিম ইবনে আবদুর রহমানের উম্মে ওয়ালাদ। আর অবশিষ্ট বর্ণনা وهام।

০ অবশিষ্ট আছে তাঁর ব্যাপারে অজ্ঞাত হওয়ার প্রশ্ন। এটাও এভাবেই খতম হয়ে যায় যে, তিনি ইবরাহিম ইবনে আবদুর রহমানের উম্মে ওয়ালাদ। তাছাড়া হাফেজ ইবনে হাজার (র.) প্রমুখ তাঁকে তাবেয়ি সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন হামিদা। অতএব, এই হাদিসের ওপর দুর্বলতার প্রশ্ন উত্থাপন করা যুক্তিযুক্ত নয়।

০ অনেকে এই জবাব দিয়েছেন যে, এখানে নাপাক স্থান দ্বারা উদ্দেশ্য এমন জায়গা যেখানে শুষ্ক নাপাক পড়ে থাকে, ভিজা নাপাক নয়। আর শুকনা নাপাক থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য ধোয়ার প্রয়োজন নেই। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে শুষ্ক নাপাক কোনো জায়গা থেকে আঁচলে লেগে গেছে পরবর্তী জমিনে ঘর্ষণের পর সেটি নিজেই পড়ে যাবে।

০ তবে হজরত শাহ সাহেব (র.) মূলত বলেছেন, এই জবাবটি হলো দার্শনিক সুলভ। ঘটনা হলো, প্রশ্নকারিণীর আঁচল নাপাক মিশ্রিত হওয়ার ইয়াকিন ছিলো না; বরং তাঁর ধারণা ছিলো অপবিত্র জায়গা অতিক্রমকালে অপবিত্র না লাগলেও সেখানের পরিবেশ এর কাপড়ে ক্রিয়াশীল হবে। এই ধারণার অবসান ঘটানোর জন্য রাসূল ﷺ বললেন যে, পরবর্তীতে পবিত্র জমিনের পরিবেশের ক্ষতিপূরণ করে দিবে। তবে এই জবাবের ওপরও মানসিক প্রশান্তি আসে না। কেনোনা প্রশ্নকারিণী বিশেষভাবে আঁচল দীর্ঘ হওয়ার আলোচনা নিম্নেযুক্ত ভাষায় করেছেন, انى امرأة اطيل ذيلى। যদি শুধু পরিবেশের অপবিত্রতা প্রশ্নকারিণীর প্রশ্নের কারণ হতো তবে এতে আঁচলের কোনো বৈশিষ্ট্য ছিলো না।

০ সুতরাং অধমের (উস্তাদ মুহতারাম আল্লামা মুহাম্মদ তাকি উসমানির(বুঝে আসলো যে, প্রশ্নকারিণীর উদ্দেশ্য শুধু পরিবেশের অপবিত্রতা সম্পর্কে প্রশ্ন করাই ছিলো না; বরং কাদা ইত্যাদির ছোট ছোট ছিটা সম্পর্কে প্রশ্ন করা উদ্দেশ্য ছিলো, যা চলার পথে আঁচলে লেগে যেতো। আল্লামা শামির সুস্পষ্ট বিবরণ মুতাবেক শরয়ি মতে এসব ছিটা ক্ষমা করা হয়েছে। কিন্তু রাসূল ﷺ প্রশ্নকারিণীকে প্রশান্ত করার জন্য শুধু ক্ষমার কথাই উল্লেখ করেননি, বরং পবিত্র জমিনকে পবিত্র করার কথা আলোচনা করেছেন, যাতে তিনি পুরোপুরি প্রশান্ত হয়ে যান।

عن عبد الله بن مسعود رض قال كنا نصلى مع رسول الله صلى عليه وسلم ولا نتوضأ من الموطى

'হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামাজ পড়তাম; অথচ ময়লা স্থান মাড়িয়ে ওজু করতাম না।'

موطى শব্দটির ميم مصدري। যার অর্থ হলো মাড়ানো। উদ্দেশ্য এমন নাপাক যেগুলো পা দিয়ে মাড়ানো হয়েছে। এখানে উদ্দেশ্য হলো, যদি চলার সময় পায়ে কোনো নাপাক লেগে যায় এর ফলে আমরা ওজু করি না। এ কারণে এ ব্যাপারে সমস্ত ফুকাহার ইজমা রয়েছে যে, এর দ্বারা ওজু ওয়াজিব হয় না। অবশ্য যদি ভেজা নাপাক লাগে তবে ধোয়া আবশ্যক।

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّيَمُّمِ (ص ٣٦)

অনুচ্ছেদ- ১১০ : তায়াম্মুম প্রসঙ্গে (মতন ৩৬)

عن ابيه عَنْ "عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ .

১৪৪. **অর্থ :** হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ তাঁকে চেহারা এবং দুই হাতের তালুতে (কব্জি পর্যন্ত) তায়াম্মুম করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আয়েশা ও ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আম্মারের হাদিসটি حسن صحيح। হজরত আম্মার (রা.) থেকে এটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এটা একাধিক আলেম সাহাবির মত। তার মধ্যে রয়েছেন, আলি, আম্মার, ইবনে আব্বাস (রা.)। একাধিক তাবেয়িরও এই মত। তার মধ্যে রয়েছেন শা'বি, আতা ও মাকহুল (র.)। তাঁরা বলেছেন, তায়াম্মুম করবে চেহারা ও দু'হাতের (কব্জি) পর্যন্ত একবার হাত মেরে। এ মতই পোষণ করেন আহমদ ও ইসহাক (র.)। আর কোনো কোনো আলেম বলেছেন, তন্মধ্যে রয়েছেন ইবনে উমর, জাবের, ইবরাহিম ও হাসান (র.) যে, তায়াম্মুম একবার চেহারার জন্য হাত মেরে আর একবার কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয়ের জন্য হাত মেরে করতে হয়। এমতই পোষণ করেন, সুফিয়ান সাওরি, মালেক, ইবনে মুবারক ও শাফেয়ি (র.)। আম্মার (রা.) হতে তায়াম্মুম সম্পর্কে এ পদ্ধতিটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, 'চেহারা এবং দুই হাতের তালু (কব্জি)।'

হজরত আম্মার (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমরা নবী করিম ﷺ সাথে কাঁধ এবং বগল পর্যন্ত তায়াম্মুম করেছি। সুতরাং অনেক আলেম হাত এবং হাতের তালুদ্বয় (কব্জিদ্বয়) পর্যন্ত তায়াম্মুম সংক্রান্ত নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণিত আম্মার (রা.)-এর হাদিসটিকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। কেনোনা আম্মার (রা.) থেকে কাঁধ এবং বগল পর্যন্ত (তায়াম্মুমের) হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

হজরত ইসহাক ইবনে ইবরাহিম বলেছেন, চেহারা এবং তালুদ্বয় তায়াম্মুম সংক্রান্ত আম্মার (রা.)-এর হাদিসটি বিশুদ্ধ। আর আম্মার (রা.)-এর হাদিস-'আমরা নবী করিম ﷺ-এর সাথে কাঁধ এবং বগল পর্যন্ত তায়াম্মুম করেছি,' এটি চেহারা এবং তালুদ্বয় সংক্রান্ত হাদিসের বিপরীত নয়। কেনোনা আম্মার (রা.) এ কথা উল্লেখ করেননি যে, নবী করিম ﷺ তাঁদেরকে এটা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি শুধু বলেছেন, এমন আমরা করেছি। যখন নবী করিম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছেন, তখন তিনি তাঁকে চেহারা এবং তালুদ্বয়ের (কব্জিদ্বয় পর্যন্ত মাসেহের) নির্দেশ দিয়েছেন। এর প্রমাণ, নবী করিম ﷺ-এর বক্তব্য, তায়াম্মুম সম্পর্কে আম্মার (রা.)-এর ফতওয়া। তিনি বলেছেন, এতে 'চেহারা এবং তালুদ্বয় (কব্জিদ্বয়)' এ বিষয়ে দলিল যে, তিনি ততোটুকু পর্যন্ত পৌছেছেন, যতোটুকু নবী করিম ﷺ তাঁকে শিখিয়েছেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ؟ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَالَ فِيْ كِتَابِهٖ حِيْنَ ذَكَرَ الْوُضُوْءَ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَقَالَ فِى التَّيَمُّمِ فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِنْهُ وَقَالَ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا فَكَانَتِ السُّنَّةُ فِى الْقَطْعِ الْكَفَّيْنِ اِنَّمَا هُوَالْوَجْهُ وَالْكَفَّيْنِ يَعْنِى التَّيَمُّمَ قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ

১৪৫. **অর্থ :** হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, তাঁকে তায়াম্মুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। জবাবে তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ওজুর আলোচনাকালে তাঁর কিতাবে বলেছেন, তোমরা তোমাদের চেহারা ও হাত কনুই পর্যন্ত ধোও। আর তায়াম্মুম সম্পর্কে বলেছেন, তোমারা মাসেহ করো তোমাদের চেহারা ও হাত।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন, চোর এবং চোরনীর হাত কেটে ফেলো। সুতরাং সুন্নত হলো হস্ত কর্তনের ক্ষেত্রে দুই কব্জি। সুতরাং চেহারা এবং দুই কব্জি অর্থাৎ (এ দুটি মাসেহ করবে।) তায়াম্মুমে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح غريب।

দরসে তিরমিযী

০ তায়াম্মুমের পদ্ধতিতে দুটি মাসআলা বিতর্কিত।

এক. তায়াম্মুমে কতবার হাত মারতে হবে। **দুই.** হস্তদ্বয় মাসেহ কতোটুকু হবে।

আল্লামা আইনি (র.) প্রথম মাসআলাটিতে পাঁচটি মাজহাব বর্ণনা করেছেন।

এক. তায়াম্মুমের জন্য দু'বার হাত মারতে হবে। একবার চেহারার জন্য, আরেকবার হস্তদ্বয়ের জন্য। এটি ইমাম আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ি, লাইছ ইবনে সাদ (র.) এবং জমহুরের মাজহাব।

দুই. একবারই হাত মারতে হবে। যা দ্বারা চেহারা এবং হস্তদ্বয় মাসেহ করা হবে ইমাম আহমদ, ইসহাক, আওজায়ি (র.) এবং কোনো কোনো আহলে জাহেরের মতে। ইমাম মালেক (র.)-এর একটি বর্ণনাও অনুরূপ।

তিন. হজরত হাসান বসরি এবং ইবনে আবু লায়লা (র.)-এর মাজহাব হলো, দু'বার হাত মারবে। কিন্তু এমনভাবে যে, প্রতিবার মেরে চেহারা এবং হস্তদ্বয় উভয়টি মাসেহ করবে।

চার. মুহাম্মদ ইবনে সিরিনের মাজহাব হলো, তিনবার মারতে হবে। একবার চেহারার জন্য, দ্বিতীয়বার দু'হাতের জন্য, তৃতীয়বার উভয়ের জন্য।

পাঁচ. ইবনে বাজ্জার মাজহাব হলো, চারবার মারতে হবে। দু'বার চেহারার জন্য, দু'বার দু'হাতের জন্য।

০ দ্বিতীয় ইখতেলাফ হলো হস্তদ্বয় মাসেহের পরিমাণ সংক্রান্ত। এতে চারটি মাজহাব রয়েছে।

এক. কনুই পর্যন্ত মাসেহ ওয়াজিব। এ বক্তব্যটি ইমাম আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ি, লাইস ইবনে সাদ (র.) এবং জমহুরের।

দুই. ইমাম আহমদ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, আওজায়ি এবং আহলে জাহেরের মাজহাব শুধু কব্জিদ্বয় পর্যন্ত মাসেহ ওয়াজিব।

তিন. দুই কব্জি পর্যন্ত ওয়াজিব, দুই কনুই পর্যন্ত মাসনুন। আল্লামা ইবনে রুশদ (র.) এটাকে ইমাম মালেক (র.)-এর একটি বর্ণনা সাব্যস্ত করেছেন। আল্লামা জুরকানি (র.) এটাকে ইমাম মালেক (র.)-এর মাজহাব সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম নববি (র.) বলেন, বর্ণনাগুলো মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের সর্বোত্তম পদ্ধতি এটা।

চার. হস্তদ্বয় তায়াম্মুম করতে হবে কাঁধ এবং বগল পর্যন্ত আল্লামা ইবনে শিহাব জুহরি (র.)-এর মাজহাব।

দু'টি মাসআলায় জমহুর এবং ইমাম আহমদ ও ইসহাকের মাঝে বুনিয়াদি এখতেলাফ। জমহুরের মতে তায়াম্মুমে দু'বার হাত মারতে হবে, আর হস্তদ্বয় মাসেহ করতে হবে কনুই পর্যন্ত। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর মতে একবার হাত মারতে হবে, আর হস্তদ্বয় মাসেহ করতে হবে কব্জিদ্বয় পর্যন্ত। তাঁদের প্রমাণ এ দুটি মাসআলায় আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত হজরত আম্মার (রা.)-এর হাদিস। যার দ্বারা প্রমাণ মেলে, একবার হাত মারা এবং শুধু দুই কবজি পর্যন্ত মাসেহের,

ان النبى صلى الله عليه وسلم امره بالتيمم للوجه والكفين -

'তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন চেহারা ও কব্জিদ্বয় তায়াম্মুম করার।'

হস্তদ্বয়ের জন্য এখানে ব্যবহার করা হয়েছে كفين শব্দ। যার প্রয়োগ হয় শুধু কব্জিদ্বয় পর্যন্ত। হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.)-এর এ হাদিস যেহেতু এ অনুচ্ছেদের বিশুদ্ধতম বর্ণনা, সেহেতু ইমাম আহমদ (র.) এটা অবলম্বন করেছেন। এর বিপরীতে জমহুরের প্রমাণাদি নিম্নেযুক্ত,

১. সুনানে দারাকুতনি এবং বায়হাকিতে একটি বর্ণনা আছে এমন,

عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين الى المرفقين ـ رجاله كلهم ثقات والصوات موقوف (دار قطنى ج١، ص١٨١) رقم الحديث ٢٢ باب التيمم ـ

'নবী করিম ﷺ থেকে জাবের (রা.) বর্ণনা করেছেন, তায়াম্মুম করতে হবে একবার চেহারার জন্য হাত মেরে আর একবার হাত মেরে কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয় মাসেহের জন্য। এই হাদিসটির সব বর্ণনাকারি সেকাহ। তবে সঠিক হলো, موقوف।'

প্রশ্ন : এ হাদিসে উসমান ইবনে মুহাম্মদ নামে একজন রাবি আছেন যাঁর সম্পর্কে আল্লামা ইবনুল জাওজি (র.) বলেন যে, উসমান ইবনে মুহাম্মদ সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে।

জবাব : উসমান ইবনে মুহাম্মদ সেকাহ বর্ণনাকারি। ইবনুল জাওজি (র.) কর্তৃক তাঁর ব্যাপারে আপত্তি করা ঠিক নয়। এ কারণে আল্লামা তাকি উদ্দিন ইবনে দাকিকুল ইদ (র.) ইবনুল জাওজির প্রত্যাখ্যান করে লিখেছেন,

ما معناه ان هذا الكلام لا يقبل منه لانه لم يبين من تكلم فيه وقد روى عنه ابو داود وابو بكر بن ابى عاصم وغيرهما وذكره ابن ابى حاتم فى كتابه ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا... الخ ـ (التعليق المغنى على الدار قطنى لابى الطيب محمد شمس الحق العظيم ابادى، ص١٨١-١٨٢

আল্লামা ইবনুল জাওজি (র.)-এর আপত্তি অগ্রহণযোগ্য। কেনোনা তিনি সুস্পষ্ট বিবরণ দেননি কে তাঁর সমালোচনা করেছেন। অথচ তাঁর সূত্রে আবু দাউদ, আবু বকর ইবনে আবু আসেম প্রমুখ হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবি হাতেম তাঁর আলোচনা করেছেন তাঁর গ্রন্থে; অথচ তিনি তাঁর সম্পর্কে সমালোচনা বা নির্ভরযোগ্যতা কিছুই বর্ণনা করেননি।

এ হাদিসের ওপর আরেকটি প্রশ্ন করা হয়েছে যে, এ বর্ণনাটি ইমাম দারাকুতনি (র.) মওকুফ[১] সূত্রেও বর্ণনা করেছেন (দারাকুতনি : ১/১৮২) حدثنا بن مخلد نا ابراهيم ابن حربى نا ابو نعيم نا عزرة بن ثابت عن ابى الزبير عن جابر (رض) সূত্রে।

ইমাম দারাকুতনি (র.) মারফু সূত্র উল্লেখ করার পর বলেছেন– সঠিক হলো, মওকুফ। কিন্তু এই প্রশ্নটিও ঠিক নয়। কারণ, প্রথমতো আবু নু'আইম এবং উসমান ইবনে মুহাম্মদের বর্ণনার মূলপাঠে বিরাট মতপার্থক্য আছে। যা দ্বারা বোঝা যায়, এই দুটি আলাদা আলাদা বর্ণনা। দ্বিতীয়তো উসমান ইবনে মুহাম্মদ এবং আবু নু'আইম দু'জনই নির্ভরযোগ্য রাবি। তাঁদের কোনো একজনের বর্ণনাকেও শাজ বলা যায় না। সুতরাং বাস্তবতা হলো উভয়ের বর্ণনা সহিহ। তাছাড়া উসমান ইবনে মুহাম্মদ অতিরিক্ত বিষয় বর্ণনাকারি। আর নির্ভরযোগ্য রাবির অতিরিক্ত বিষয় গ্রহণযোগ্য। এ জন্যই ইমাম হাকেম (র.) মারফু সূত্র সম্পর্কে বলেছেন, এর সূত্র বিশুদ্ধ। হাফেজ জাহাবি (র.)ও মন্তব্য করেছেন হাসান বলে আল্লামা আইনি (র.) বলেন, এর বিশুদ্ধতা যারা মানেন না, তাদের বক্তব্য ধর্তব্য নয়।

টীকা- ১. মওকুফ সূত্রের শব্দগুলো নিম্নরূপ,

قال جاء رجل فقال اصابتنى جنابة وانى تمعكت فى التراب قال اضرب فضرب بيده فمسح وجهه ثم ضرب بيده اخرى فمسح بهما يديه الى المرفقين ـ مرتب عفى عنه ـ

'এক লোক এসে বললো, আমার ওপর গোসল ফরজ হয়েছে। আমি মাটিতে গড়াগড়ি খেয়েছি। তিনি বললেন, হাত মারো। তখন তিনি হাত মারলেন, তারপর চেহারা মাসেহ করলেন। তারপর আরেকবার হাত মারলেন। এই হস্তদ্বয় দ্বারা কনুই পর্যন্ত দু'হাত মাসেহ করলেন।'

২. জমহুরের দ্বিতীয় দলিল মুসনাদে বাজ্জারে বর্ণিত হজরত আম্মার (রা.)-এর হাদিস। তিনি তাতে বলেছেন,

كنت فى القوم حين نزلت الرخصة فأمرنا فضربنا واحدة من وجه ثم ضربة اخرى لليدين والمرفقين -

'যখন (তায়াম্মুমের) অনুমতি নাজিল হয়, আমি তখন ছিলাম কওমের মাঝে। আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমরা একবার হাত মেলেছি চেহারার জন্য আরেকবার কনুই পর্যন্ত দুহাতের জন্য হাত মেলেছি।'

এ হাদিসটি আল্লামা জায়লায়ি (র.)ও বর্ণনা করেছেন। আর হাফেজ ইবনে হাজার (র.) 'আদ্ দিরায়া ফি তাখরীজি আহাদিসিল হিদায়া' : ৩৬-তে উল্লেখ করেছেন এবং 'তালখিস' : ৫৬তে উল্লেখ করে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। হাফেজ (র.) 'আদ্ দিরায়া'য় ইমাম বাজ্জার (র.)-এর এই বক্তব্যটিও বর্ণনা করেছেন যে, এ হাদিসটি মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ব্যতিত আরও বহু রাবি জুহরি থেকে বর্ণনা করেছেন এবং জুহরি ব্যতিত অনেক রাবি উবায়দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য জুহরি ব্যতিত অন্যান্য রাবি উবায়দুল্লাহ এবং আম্মারের মধ্যে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্র উল্লেখ করেননি। অতএব এ হাদিসটি হাসান এবং প্রামাণ্য।

৩. জমহুরের তৃতীয় প্রমাণ হজরত আবু জুহাইম ইবনুল হারেস ইবনুস সাম্মা আল-আনসারির হাদিস,

قال : اقبل النبى صلى الله عليه وسلم من نحوه بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد النبى صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام

-(رواه البخارى جـ١ صـ٤٨، فى باب التيمم فى الحضر اذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلوة)

'জামাল কূপের দিকে নবী করিম ﷺ এগিয়ে এলেন তারপর একটি লোক তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে সালাম করলো। নবী করিম ﷺ সালামের জবাব দিলেন না। তিনি একটি দেয়ালের কাছে এসে চেহারা এবং দু'হাত মাসেহ করে তারপর তার সালামের জবাব দিলেন।'

এই বর্ণনায় يدين শব্দটি সাধারণভাবে এসেছে। এতে কোনো সীমা বর্ণনা করা হয়নি। কিন্তু এ হাদিসটি 'শরহুস্ সুন্নায় ইমাম বাগবি (র.) الشافعى عن ابرهيم بن يحيى সূত্রে বর্ণনা করেছেন নিম্নেযুক্ত ভাষায়,

مررت على النبى صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد على حتى قام الى جدار فحته بعصا كانت معه ثم وضع يده على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد على -

-(مشكوة المصابيح جـ١، صـ٥٤ فى الفصل الأول من باب التيمم)

হজরত ইবরাহিম ইবনে ইয়াহইয়া বলেন, আমি নবী করিম ﷺ -এর কাছ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যখন তিনি প্রস্রাবে রত। আমি তাঁকে সালাম করলাম; কিন্তু তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন না। তিনি যেয়ে একটি দেয়ালের পাশে দাঁড়ালেন। তারপর তাঁর হাতের একটি লাঠি দ্বারা দেয়ালে খোঁচা মারলেন। তারপর হাত মেরে চেহারা এবং হস্তদ্বয় মাসেহ করলেন। তারপর আমার সালামের জবাব দিলেন।

ذراعين শব্দ এ হাদিসে রয়েছে। যেটি কনুইদ্বয়ের সীমা বর্ণনা করছে।

প্রশ্ন : এর ওপর অনেকে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, এই বর্ণনাটি ইবরাহিম ইবনে আবু ইয়াহইয়ার দুর্বলতার কারণে দুর্বল।

জবাব : এর অনেক মুতাবে' রয়েছে। ইমাম দারাকুতনি (র) নিজ সুনানে (১/১৭৬-১৭৭), বাবুত্ তায়াম্মুম) হজরত আবু জুহাইম (রা.)-এর এই ঘটনাটি বহু সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একাধিক সূত্রে ذراعين শব্দ এসেছে, যেটি স্পষ্টাকারে জমহুরের সহায়তা করছে। মোটকথা অন্যান্য মুতাবে' থাকার কারণে এ হাদিসটি প্রমাণযোগ্য।

৪. জমহুরের চতুর্থ প্রমাণ হলো, মুস্তাদরাকে হাকেম (ছাপা দায়িরাতুল মা'আরিফিন নিজামিয়্যাহ, হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য : ১/১৭৯) এবং সুনানে দারাকুতনি (১/১৮০) তে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর একটি বর্ণনা,

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين -

'নবী করিম ﷺ এরশাদ করেছেন, তায়াম্মুম হলো, দু'বার হাত মারা। একবার চেহারার জন্য, আরেকবার কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয়ের জন্য।'

প্রশ্ন : একটা প্রশ্ন করা হয় যে, আলি ইবনে জাবইয়ান থেকে এ হাদিসটি বর্ণিত। তিনি ব্যতিত আর কেউ এটাকে মারফু আকারে বর্ণনা করেননি। আর আলি ইবনে জাবইয়ানকে শুধু ইমাম হাকেম (র.) সত্যবাদী বলেছেন (তাঁর নম্রতা প্রসিদ্ধ)। অথচ বেশির ভাগ মুহাদ্দিস তাঁকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে নুমাইর (র.) বলেন, তাঁর সব হাদিসে তিনি ভুল করেন। ইয়াহয়া ইবনে সায়িদ এবং ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেন, অপাংক্তেয়। ইমাম আবু জুর'আ (র.) বলেন, তাঁর হাদিস জয়িফ। ইমাম ইবনে হাব্বান (র.) বলেন, তাঁর হাদিস দ্বারা প্রমাণ ঠিক নয়। এজন্য ইমাম দারাকুতনি (র.) এটাকে ইবনে উমর (রা.)-এর ওপর মওকুফ সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম বায়হাকি (র.) যদিও এটাকে মওকুফ এবং মারফু দু'ভাবে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনিও মওকুফ সূত্রটিকে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন।

আলি ইবনে জাবইয়ান এ হাদিসের বিবরণে একা নন; বরং তাঁর অনেক মুতাবে' রয়েছে। এজন্য তাঁর সবচেয়ে বড় মুতাবে' হলেন হজরত ইমাম আবু হানিফা (র.)। তিনিও স্বীয় মুসনাদে এ হাদিসটি মারফু আকারে বর্ণনা করেছেন এই সূত্রে,

عن عبد العزيز بن ابى رواد عن نافع عن ابن عمر (رضـ) قال كان تيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربتين ضربة لليدين الى المرفقين (عقود الجواهر النيفة للزبيدى صـ٤٠)

'ইবনে উমর (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তায়াম্মুম ছিলো দু'বার হাত মারা। একবার চেহারার জন্য, কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয়ের জন্য আরেকবার।'

সূত্রগতভাবে এ হাদিসটি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। আব্দুল আজিজ ইবনে আবু রাওয়াদ সুনান চতুষ্টয়ের রাবি। তাঁর সূত্রে ইমাম বোখারি (র.) প্রাসঙ্গিকভাবে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া 'মুসনাদে বাজ্জারে' সুলায়মান ইবনে আবু দাউদ সূত্রেও এ বর্ণনাটি বর্ণিত হয়েছে। (কাশফুল আসতার : ১/১৫৮) এবং আল্লামা জাজরি যদিও জয়িফ কিন্তু মুতাবা'আত ও সহায়তার জন্য যথেষ্ট।

ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.) হজরত আম্মার (রা.) থেকে বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদে যে হাদিসটি দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন।

জবাব : এখানে হাদিসটি সংক্ষিপ্ত। বোখারি এবং মুসলিমে এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে এসেছে যে, হজরত আম্মার (রা.) ওয়াকিফহাল না হওয়ার কারণে গোসল ফরজ অবস্থায় জমিনের ওপরে গড়াগড়ি খেয়েছেন। রাসূলে আকরাম ﷺ-কে যখন অবহিত করা হয় তখন তিনি এরশাদ করলেন,

انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك -

-(مسلم، جـ ١ صـ١٦١)

'তোমার জন্য যথেষ্ট একবার দু'হাত জমিনে মারা তারপর ফুঁক দিয়ে দু'হাত দ্বারা চেহারা মাসেহ করা।'

রাসূল ﷺ-এর আসল উদ্দেশ্য তায়াম্মুমের পূর্ণ পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া ছিলো না; বরং তায়াম্মুমের প্রসিদ্ধ পদ্ধতির দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য ছিলো। এ হাদিসের পূর্বাপর স্পষ্টাকারে বলছে যে, জমিনের ওপরে গড়াগড়ি

খাওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং গোসল ফরজ হওয়া অবস্থায় তায়াম্মুমের সেই পদ্ধতি যথেষ্ট যা ছোট নাপাকির সময় যথেষ্ট। এর নজির আরেকটি ঘটনাও যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছলো যে, হজরত ইবনে উমর (রা.) ফরজ গোসলে ভীষণ সূক্ষ্ম দৃষ্টি দান (কঠোরতা অবলম্বন) করতেন। তখন রাসূল ﷺ তাঁকে সম্বোধন করে এরশাদ করলেন,

ما أزيد على ان احثى على رأسى ثلث حثيات او كما قال عليه السلام -

'আমি আমার মাথায় তো তিন অঞ্জলি পানি ঢালার চেয়ে বেশি কিছু করি না।'

আবু দাউদ : ১/৩২ باب فى الغسل من الجنابة-এ হজরত জুবায়র ইবনে মুতয়িম (রা.)-এর বর্ণনায় আছে,

انهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فافيض على رأسى ثلثا واشار بيديه كلتيهما -

'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তারা ফরজ গোসল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিন্তু আমি তো আমার মাথায় তিনবার পানি প্রবাহিত করি এবং তিনি তাঁর দু'হাত দ্বারা ইঙ্গিত করে বুঝালেন এটি।'

প্রকাশ থাকে যে, এর অর্থ এই নয় যে ফরজ গোসলেও শুধু মাথা ধোয়া যথেষ্ট, অবশিষ্ট শরীর ধোয়া আবশ্যক। এমনভাবে হজরত আম্মার (রা.)-এর হাদিসেও এই উদ্দেশ্য নয় যে, একবার হাত মারা অথবা দুই হাতের তালু মাসেহ করা যথেষ্ট; বরং ওপরযুক্ত শব্দ দ্বারা প্রসিদ্ধ পদ্ধতির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মুসনাদে বাজ্জারে বর্ণিত এই ব্যাখ্যার সহায়তা হজরত আম্মার (রা.)-এরই বর্ণনা দ্বারা হয়,

عن عمار (رض) (قال) كنت فى القوم حين نزلت الرخصة فى المسح بالتراب اذا لم نجد الماء فامرنا فضربنا واحدة للوجه ثم ضربة اخرى لليدين الى المرفقين -

-(رواه البزار وقال الحافظ فى الدراية باسناد حسن اثار السنن ص ٤٠، باب التيمم)

হজরত আম্মার (রা.) হতে বর্ণিত, (তিনি বলেন) পানি না পাওয়া অবস্থায় মাটি দ্বারা মাসেহ করার অনুমতি যখন নাজিল হয় তখন আমি কওমের মাঝে ছিলাম। তারপর আমাদেরকে (তায়াম্মুমের) নির্দেশ দেওয়া হলো। সুতরাং আমরা একবার হাত মারলাম চেহারার জন্য, আরেকবার কনুই পর্যন্ত দু'হাতের জন্য।'

আর যদি অবলম্বন করা হয় প্রাধান্যের পদ্ধতি, তাহলেও হজরত জাবের (রা.)-এর বর্ণনা এজন্য প্রাধান্য পাবে যে, তাতে একটি ব্যাপক মূলনীতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ইমাম জুহরি (র.) তায়াম্মুম বগল এবং কাঁধ পর্যন্ত বিধিবদ্ধ হওয়ার ওপর হজরত আম্মার (রা.)-এর সে হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন যা ইমাম তিরমিযী (র.) আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন।

تيممنا مع النبى صلى الله عليه وسلم الى المناكب والاباط -

'আমরা নবী করিম ﷺ-এর সাথে কাঁধ এবং বগল পর্যন্ত তায়াম্মুম করেছি।'

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলা হয় জমহুরের পক্ষ থেকে, তায়াম্মুমের হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার প্রথম দিকে এটা সাহাবায়ে কেরামের নিজস্ব ইজতেহাদ ছিলো। যার ওপর রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে অনুমোদনের বিষয়টি প্রমাণিত নয়। অতএব, স্পষ্ট এবং বিশুদ্ধ বর্ণনাগুলোর বিপরীতে এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় না।

قال اسحق بن ابراهيم : ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ এর দ্বারা উদ্দেশ্য। কারণ, ইমাম ইসহাক (র.)-এর পিতার নাম ছিলো ইবরাহিম, উপাধি রাহওয়াইহ। এই উপাধি রাখার কারণ হলো, তিনি মক্কা মুকাররামার পথে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কোনো মারওয়াজি সঙ্গী তাঁর উপাধি দিয়েছিলেন রাহওয়াইহ।

وقال السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما : হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এই কিয়াসের অর্থ অনেকে এই মনে করেছেন যে, তিনি তায়াম্মুমকে চুরিতে হস্তদ্বয় কর্তনের ওপর কিয়াস করেছেন; কিন্তু এটা ঠিক নয়। বাস্তবতা হলো, হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) তায়াম্মুমের আয়াতে ايدى শব্দের ব্যাপকতা দ্বারা প্রমাণ পেশ করছেন এবং এর নজির পেশ করতে গিয়ে চুরি সংক্রান্ত আয়াত উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এটি হলো শব্দের ওপর শব্দকে কিয়াস করা।

ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এই কিয়াসের মুকাবেলায় জমহুর তায়াম্মুমকে ওজুর ওপর কিয়াস করেছেন। আর এটা হলো অর্থের ওপর অর্থের কিয়াস। এই কিয়াসটি এজন্য প্রাধান্যপ্রাপ্ত যে, তায়াম্মুম হলো ওজুর স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং ওজুতে কনুইদ্বয় উল্লেখ করে তায়াম্মুমকেও তার হাওয়ালা করে দেওয়া হয়েছে বলাই অধিক মানানসই। তাছাড়া 'মাবসুতে' শামসুল আয়িম্মাহ সারাখসি (র.) হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এই প্রমাণের আরেকটি জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, ايدى শব্দটি তায়াম্মুম এবং চুরি সংক্রান্ত উভয় আয়াতে মুজমাল বা সংক্ষিপ্ত। আর মুজমালের কোনো ব্যাখ্যা না থাকলে সবচেয়ে বেশি সতর্কতার ওপর আমল করা হয়। বস্তুত হস্ত কর্তনের ক্ষেত্রে কব্জির সীমা হলো সবচেয়ে সতর্কতাপূর্ণ। আর তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে কনুইয়ের সীমা হলো অধিক সতর্কতাপূর্ণ।

باب بلا ترجمة (صـ ٣٨)

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ (মতন ৩৮)

عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يُقْرِئُنَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى كُلِّ حَالٍ مَالَمْ يَكُنْ جُنُبًا ـ

১৪৬. অর্থ : হজরত আলি (রা.) হতে বর্ণিত, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বাবস্থায় কোরআন শিখাতেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত তাঁর ওপর গোসল ফরজ না হতো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'আলি (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح। একাধিক সাহাবি ও তাবেয়িন এ মতই পোষণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, ওজু ব্যতিত কেউ (মুখস্থ) কোরআন তেলাওয়াত করতে পারবে। কিন্তু কোরআন মাজিদ দেখে পড়তে হলে (ওজু করে) পবিত্র হতে হবে। এ মতই পোষণ করেন সুফিয়ান সাওরি, আহমদ ও ইসহাক (র.)।

দরসে তিরমিযী

এ অনুচ্ছেদের কোনো কোনো কপিতে শিরোনাম আছে,

باب ماجاء فى الرجل يقرأ القران على كل حال مالم يكن جنبا ـ

'সর্বাবস্থায় গোসল ফরজ হওয়ার আগ পর্যন্ত কোরআন শরিফ পাঠ করতে পারবে।'

عن على (رضـ) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القران على كل حال مالم يكن جنبا ـ

এ বিষয়ে এ হাদিসটি জমহুরের প্রমাণ যে, গোসল ফরজ অবস্থায় কোরআন পাঠ অবৈধ। অথচ ইমাম বোখারি, ইবনুল মুনজির এবং ইমাম তাবারি (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, গোসল ফরজ হওয়া অবস্থায়ও কোরআন তেলাওয়াত করা জায়েজ। এর বিস্তারিত বিবরণ, باب ماجاء فى الجنب والحائض انهما لا يقرأن القران এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

حديث على (رض) حديث حسن صحيح : ইমাম তিরমিযী (র.) ব্যতিত হাকেম, হাফেজ জাহাবি, ইবনুস্ সাকান এবং বাগাবি (র.) প্রমুখ এ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ি (র.) এবং ইমাম আহমদ (র.) থেকে এটাকে জয়িফ বলেছেন বলে বর্ণিত আছে। কারণ, এর সনদে আবদুল্লাহ ইবনে সালামা নামক একজন রাবি তাঁদের মতে জয়িফ। কিন্তু যাঁরা এটাকে সহিহ বলেছেন, তাঁদের বক্তব্য প্রাধান্যের অধিক উপযোগ্য বলে মনে হয়। প্রথমতো এ কারণে যে, ইমাম আজালি, ইয়াকুব ইবনে শায়বা, আবদুল্লাহ ইবনে সালামাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। এ কারণে 'তাহজিবুত্ তাহজিবে' : ৫/২৪২ হাফেজ ইবনে হাজার (র.) ইয়াকুব ইবনে শায়বা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে সালামা নির্ভরযোগ্য এবং সাহাবির পরে ফুকাহায়ে কুফার প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া মুসনাদে আহমদে এ হাদিসের একটি মুতাবে' রয়েছে, তাতে আবুল গারিফ উবায়দুল্লাহ ইবনে খলিফা আল-মুরাদি হজরত আলি (রা.) হতে একটি লম্বা হাদিস বর্ণনা করেছেন,

هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القران ثم قال هذا لمن ليس بجنب فاما الجنب فلا ولا اية - (انظر ترتيب المسند ج٢ ص١٢١)

'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমন দেখেছি। তিনি ওজু করেছেন, তারপর কোরআন শরিফের কিছু অংশ পাঠ করেছেন। তারপর তিনি বলেছেন, এই অধিকার তার জন্য যার ওপর গোসল ফরজ হয়নি। কিন্তু যার ওপর গোসল ফরজ হয়েছে তার জন্য নয়। এমনকি একটি আয়াত পাঠ করতে পারবে না।'

হজরত আবুল গারিফও কারও কারও মতে যদিও জয়িফ, কিন্তু ইবনে হাব্বান তাঁকে সেকাহ বলেছেন। এজন্য তাঁর হাদিস হাসানের স্তরের চেয়ে নিম্নপর্যায়ের নয়। সুতরাং, মুতাবা'আতের জন্য যথেষ্ট।

ولا يقرأ فى المصحف الا وهو طاهر : জমহুরের মাজহাব এটা। অবশ্য ইমাম মালেক (র.)-এর সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলেন যে, কোরআন শরিফ স্পর্শ করার জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়। জমহুরের প্রমাণ হজরত আমর ইবনে হাজমের সহিহ মারফু বর্ণনা- ولا يمس القران الا طاهر (পবিত্র ব্যক্তি ব্যতিত আর কেউ কোরআন স্পর্শ করতে পারবে না।) এ হাদিসটি ইমাম ইবনে হাব্বান ও হাকেম উভয়ে বর্ণনা করেছেন।[১] তাছাড়া 'নসবুর রায়া'তে এ বিষয়টি হাফেজ জামালুদ্দিন জায়লায়ি (র.) হজরত উসমান, সাওবান এবং হাকিম ইবনে হিজাম (রা.)-এর সূত্রেও মারফু আকারে বর্ণনা করেছেন (نصب الراية، باب الحيض ص١٠٣ طبع المطبع العلوى، هند) প্রকাশ থাকে যে, জমহুরের মাজহাবের স্বপক্ষে لا يمسه الا المطهرون (পবিত্র ব্যক্তিরা ব্যতিত আর কেউ কোরআন স্পর্শ করে না।) আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করা জয়িফ। কেনোনা এখানে مطهرون দ্বারা উদ্দেশ্য ফেরেশতা। এ আয়াতটিকে সহায়ক হিসেবে অবশ্যই পেশ করা যায়।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْبَوْلِ يُصِيْبُ الْاَرْضَ (ص ٣٨)

অনুচ্ছেদ-১১২ প্রসঙ্গ : জমিনে পেশাব লাগলে কি করণীয়? (মতন ৩৬)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ دَخَلَ اَعْرَابِىٌّ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ فَصَلّٰى فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا اَحَدًا فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا، فَلَمْ يَلْبَثْ اَنْ بَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَاَسْرَعَ اِلَيْهِ النَّاسُ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم اَهْرِيْقُوْا عَلَيْهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ اَوْ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ -

---

টীকা- ১. আব্দুর রাজ্জাকও এ হাদিসটি মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাকে বর্ণনা করেছেন। ১/৩৪১, ৩৪২, হাদিস নং ১৩২৮, باب مس المصحف والدراهم التى فيها القران ولفظه لا يمس القران الا على طهر - رشيد اشرف عفى عنه

১৪৭. অর্থ : হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মসজিদে এক বেদুইন প্রবেশ করলো। রাসূল ﷺ তখন সেখানে উপবেশন করে আছেন। বেদুইনটি নামাজ পড়লো। নামাজ শেষে সে দোয়া করলো, হে আল্লাহ, আমার প্রতি ও মুহাম্মদের প্রতি রহম করো। আমাদের সাথে আর কারও প্রতি রহম করো না। শুনে নবী করিম ﷺ তার দিকে তাকিয়ে বললেন, প্রশস্ত জিনিসকে তুমি সংকীর্ণ করে ফেলেছো। তারপর বেদুইনটি দেরি না করে মসজিদেই পেশাব করে দিলো। লোকজন তার দিকে দৌড়ে গেলো। তখন নবী করিম ﷺ বললেন, এর ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। (রাবি সাজলান অথবা দালওয়ান শব্দ সন্দেহের কারণে উল্লেখ করেছেন। উভয়ের অর্থ বালতি)। তারপর তিনি বললেন, তোমরা প্রেরিত হয়েছো মানুষের প্রতি সহজ করার জন্য। তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়নি মানুষের ওপর কঠোরতা আরোপ করার জন্য।

قال سعيد قال سفيان وحدثني يحيى بن سعيد عن انس بن مالك (رض) نحو هذا ـ

১৪৮. অর্থ : হজরত সায়িদ বলেছেন, সুফিয়ান বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদও আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে আমার কাছে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস ও ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'এ হাদিসটি حسن صحيح। কোনো কোনো আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এটা আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর মত। ইউনুস এ হাদিসটি জুহরি থেকে উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।'

দরসে তিরমিযী

دخل اعرابى فى المسجد : এই বেদুইনের নাম সম্পর্কে অনেক মতপার্থক্য। অনেকে তার নাম আকরা ইবনে হাবিস, আর অনেকে তার নাম উয়াইনা ইবনে হিসন, অনেকে জুল খুয়াইসিরা তামিমি, ইয়ামানি উল্লেখ করেছেন। সর্বশেষ বক্তব্যটিই প্রধান।

فقال النبى صلى الله عليه وسلم اهريقوا عليه سجلا من ماء ـ

'নবী করিম ﷺ বলেছেন, এর পেশাবের ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও।'

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করে ইমাম শাফেয়ি, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.) বলেন যে, জমিন পাক করা যায় শুধু পানি প্রবাহিত করে। হানাফিদের মাজহাব হলো, পানি প্রবাহিত করা ব্যতিত খনন করা এবং শুকানোর দ্বারাও জমিন পবিত্র হয়ে যায়।

আবু দাউদ : ১/৫৫ باب فى الطهور الارض এ হজরত ইবনে উমর (রা.)-এর বর্ণনা হানাফিদের প্রমাণ।

كنت ابيت فى المسجد فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شابا عزبا وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر فى المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك ـ

'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মসজিদে রাত্রি যাপন করতাম। আমি ছিলাম অবিবাহিত তাগড়া যুবক। মসজিদে তখন কুকুরগুলো পেশাব করতো ও আসা-যাওয়া করতো। তখন তাতে সাহাবায়ে কেরাম কোনো পানি ব্যবহার করে তা করতেন না।'

এই হাদিসটি ইমাম বায়হাকি (র.) ও নিজ 'সুনানে কুবরা' : ২/৪২৯ কিতাবুস্ সালাতে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া এ হাদিসটি ইমাম বোখারি (র.)ও সহিহ বোখারিতে : ১/২৯ প্রাসঙ্গিকভাবে সুদৃঢ় শব্দে বর্ণনা করেছেন,

قال كانت الكلاب تقبل وتدبر فى المسجد فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك ـ (كتاب الوضوء باب اذا شرب الكلب فى الإناء)

'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে কুকুরগুলো মসজিদে আসা-যাওয়া করতো, লোকজন তখন মসজিদে পানি নিক্ষেপ করতেন না।'

তবে বোখারির এ বর্ণনায় تبول শব্দ নেই। কিন্তু এটা ছাড়াও প্রমাণ পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কারণ, অবিবাহিত যুবক হওয়ার বিবরণ দ্বারা হজরত ইবনে উমর (রা.)-এর উদ্দেশ্য এটাই হতে পারে যে, সেখানে হয়তো স্বপ্নদোষও হয়ে যেতো। তাছাড়া কুকুরগুলোর প্রচুর যাতায়াত দ্বারা এটাই স্পষ্ট যে, এগুলো পেশাবও করে থাকবে। যেমন আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে। তাছাড়া 'মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা'তে ইবনে আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে আলি আল-বাকির-এর বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে–[১] قال زكوة الأرض يبسها তথা জমিন শুকিয়ে যাওয়া তার পবিত্রতার কারণ। মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া এবং আবু কিলাবার বক্তব্যও 'মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা'তে[২] রয়েছে– اذا جفت الأرض فقد زكت। আবু কিলাবার আরেকটি বক্তব্য 'মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে' বর্ণিত আছে,[৩] جفوف الأرض طهورها। তাছাড়া অন্যান্য কোনো কোনো সাহাবি এবং তাবেয়ি থেকে এই ধরনের অর্থবোধক বক্তব্য বর্ণিত আছে। এসব বক্তব্য কিয়াসের পরিপন্থি হওয়ার কারণে مرفوع।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব হলো, এখানে পবিত্রকরণের একটি উত্তম পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। কিন্তু এর দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে, পবিত্র করার জন্য এছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি অবৈধ।

أَبْوَابُ الصَّلٰوةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم (صـ ٣٨)

রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত সালাত অধ্যায় (মতন ৩৮)

দরসে তিরমিযী

এ ব্যাপারে সমস্ত সিরাত ও হাদিস বিশারদগণ একমত যে, মি'রাজ রজনীতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হয়েছিলো। অবশ্য মি'রাজ কোন বছর হয়েছিলো এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতপার্থক্য আছে। পাঁচ নববি সন থেকে নিয়ে দশ নববি সন পর্যন্ত বিভিন্ন রকমের বক্তব্য রয়েছে। অধিকাংশের বক্তব্য হলো পাঁচ নববি সন। তারপর এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে যে, মিরাজ রজনীর আগে কোনো নামাজ ফরজ ছিলো কি না। অধিকাংশ আলেমের ধারণা হলো, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আগে কোনো নামাজ ফরজ ছিলো না। তবে ইমাম শাফেয়ি (র.) বলেন যে, তাহাজ্জুদের নামাজ এর আগে ফরজ হয়েছিলো। যার প্রমাণ সূরা মুজ্জাম্মিলের আয়াতগুলো এই সূরাটি মক্কা মুকার্‌রামায় একেবারে প্রাথমিক দিকে অবতীর্ণ হয়েছিলো। অনেকে জবাব দিয়েছেন যে, সূরা মুজ্জাম্মিলে নামাজের হুকুম মাদানি। যার প্রমাণ হলো, এই সূরার শেষে এসেছে واخرون يقاتلون فى سبيل الله আর জিহাদ আরম্ভ হয়েছে মদিনা তাইয়্যিবায়। কিন্তু এ কথাটি ঠিক নয়। কেনোনা জিহাদের আলোচনা এই ধাঁচে এসেছে,

علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون فى الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون فى سبيل الله ـ

'আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে, অনেকে আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং অনেক আল্লাহর পথে সংগ্রাম লিপ্ত হবে। –সূরা মুজ্জাম্মিল : ২০

টীকা- ১. মা'আরিফুস্ সুনান : ১/৫০৫।

টীকা- ২. ১/৫৭ من قال اذا كانت جافة فهو زكوتها

টীকা- ৩. মা'আরিফুস্ সুনান : ১/৫০৫

'শব্দ রয়েছে এতে স্পষ্টাকারে ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক। যা এ কথার প্রমাণ যে, এ হুকুম আগে দেওয়া হয়েছে এবং আয়াত নাজিল হওয়ার সময় জিহাদ ছিলো না। এজন্য সূরাটিকে মক্কি স্বীকার করাতে কোনো সমস্যা নেই। হজরত ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর প্রমাণ সঠিক। অবশ্য অনেকে আলেম বলেছেন, তাহাজ্জুদের নামাজ শুধু রাসূল ﷺ-এর ওপর ফরজ ছিলো, সাধারণ মুসলমানদের ওপর নয়।

সাধারণ মুসলমানরাও কি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আগে কোনো নামাজ পড়তেন? ওলামায়ে কেরামের একটি দল এই মত প্রকাশ করেছেন যে, ফরজ এবং এশার নামাজ মি'রাজ রজনীর পূর্বে ফরজ হয়েছিলো। যার প্রমাণ কোরআনের আয়াত, وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار এই আয়াতটি ইসরার আগে নাজিল হয়েছে। এতে উক্ত দুটি নামাজের কথা আলোচিত হয়েছে। এ সম্পর্কে তাহকিকি বক্তব্য হলো, এতোটুকু বিষয়তো বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূল ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম মিরাজের আগেও ফরজ এবং এশার নামাজ পড়তেন। সুরা জ্বিনের মধ্যে জ্বিনদের সম্পর্কে কোরআন শ্রবণের আলোচনা রয়েছে। এটা ফরজ নামাজের মধ্যেই ঘটেছিলো আর এই ঘটনাটি প্রবল ধারণা মুতাবেক মি'রাজের পূর্বেকার। কিন্তু এই দুটি নামাজ রাসূল ﷺ-এর প্রতি ফরজ ছিলো না। তিনি নফলরূপে পড়তেন এর কোনো দলিল এবং সুস্পষ্ট বর্ণনা হাদিসসমূহে অনুপস্থিত।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ مَوَاقِيْتِ الصَّلٰوةِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (صـ ٣٨)

অনুচ্ছেদ- ১ : রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত নামাজের ওয়াক্তসমূহ প্রসঙ্গে (মতন ৩৮)

نافع بن جبير بن مطعم قال أَخْبَرَنِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اَمَّنِيْ جَبْرَئِيْلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِى الْاُوْلٰى مِنْهُمَا حِيْنَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهٖ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِيْنَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَاَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحُرِّمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ وصلى المرة الثانية الظهر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهٗ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْاَمْسِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الْاَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِيْنَ اَسْفَرَتِ الْاَرْضُ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَيَّ جِبْرَئِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هٰذَا وَقْتُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ فِيْمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ .

১৪৯. অর্থ : ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী আকরাম ﷺ বলেছেন, জিবরাইল (আ.) বায়তুল্লাহ শরিফের কাছে দু'বার নামাজে আমার ইমামতি করেছেন। তার মধ্যে প্রথমবার তিনি জোহরের নামাজ পড়লেন, যখন প্রতিটি জিনিসের ছায়া জুতার একটি ফিতার মতো হয়েছিলো। তারপর আসরের নামাজ আদায় করলেন, যখন প্রতিটি জিনিসের ছায়া এক মিছ্ল পরিমাণ হয়েছিলো। তারপর মাগরিবের নামাজ পড়লেন, যখন সূর্য অস্তমিত হলো এবং রোজাদারের ইফতারের সময় হলো। তারপর এশার নামাজ আদায় করলেন, যখন শাফাক অদৃশ্য হয়ে গেলো।

তারপর ফজরের নামাজ আদায় করলেন যখন ফজর উদিত হলো (সকাল হলো) এবং রোজাদারের ওপর খাওয়া-দাওয়া হারাম হলো। আর দ্বিতীয়বার তিনি জোহরের নামাজ আদায় করলেন, যখন প্রতিটি জিনিসের ছায়া এক মিছ্ল বরাবর হলো এবং আগের দিন যে সময় আসরের নামাজ পড়েছিলেন। তারপর আসরের নামাজ পড়লেন, যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া দুই মিছ্ল বরাবর হলো। তারপর মাগরিবের নামাজ আদায় করলেন, শুরু ওয়াক্তের সময়। তারপর শেষ এশা তথা এশার নামাজ আদায় করলেন যখন রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ সমাপ্ত হলো।

তারপর ফজরের নামাজ পড়লেন, যখন পৃথিবী ফর্সা হলো। তারপর জিবরাইল (আ.) আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ! এ হলো আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের ওয়াক্ত। আর এই দুই ওয়াক্তের মাঝখানে হচ্ছে নামাজের ওয়াক্ত।

দরসে তিরমিযী

আবু হুরায়রা, বুরায়দা, আবু মূসা, আবু মাসউদ, আবু সায়িদ, জাবের, আমর ইবনে হাজম, বারা ও আমর (রা.) থেকে এই অনুচ্ছেদের হাদিস বর্ণিত রয়েছে।

عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امنى جبرئيل فذكر نحو حديث ابن عباس بمعناه لم يذكر فيه لوقت العصر بالامس .

১৫০. অর্থ : হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, জিবরাইল (আ.) নামাজে আমার ইমামতি করেছেন। তারপর ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদিসের সমার্থবোধক হাদিস উল্লেখ করেছেন। তবে 'গতকালের আসরের ওয়াক্তে' শব্দটি এটাতে তিনি উল্লেখ করেননি।

ওয়াক্ত সংক্রান্ত জাবের (রা.)-এর হাদিসটি আতা ইবনে আবু রাবাহ ও আমর ইবনে দিনার এবং আবুজ জুবায়র জাবের ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে নবী করিম ﷺ থেকে এমন বর্ণনা করেছেন, যেমন ওহাব ইবনে কায়সান জাবের (রা.) সূত্রে নবী করিম ﷺ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদিসটি حسن। মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, নামাজের ওয়াক্ত সম্পর্কে জাবের (রা.) সূত্রে বর্ণিত নবী কারিম ﷺ-এর হাদিসটি আসাহ।

দরসে তিরমিযী

أمنى جبرئيل : এই বর্ণনাটিকে বলা হয় حديث امامت جبريل। এটি নামাজের ওয়াক্তের ব্যাপারে মূল উৎস। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে মৌখিকভাবে নামাজের ওয়াক্ত শিক্ষা দেওয়া যেতো; কিন্তু হজরত জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে বাস্তব প্রশিক্ষণ অবলম্বন করা হয়েছে। কারণ, এটা মানুষের অন্তরে অধিক বদ্ধমূল হয়। এখান থেকে আরেকটি বিষয়ও উৎসারিত হয়েছে যে, নিম্নস্তরের কারও জন্য ইমাম হওয়া জায়েজ। বিশেষতো যখন প্রয়োজনের ভিত্তিতে হয়। এখানেও হজরত জিবরাইল (আ.) রাসূল ﷺ-এর তুলনায় নিম্নস্তরের ছিলেন এবং একটি প্রয়োজনের খাতিরে রাসূল ﷺ -এর দ্বারা ফরজ আদায়কারি কর্তৃক নফল আদায়কারির পেছনে ইকতিদা করার বৈধতার ওপর প্রমাণ পেশ করেছেন। কিন্তু এই প্রমাণ এজন্য সঠিক নয় যে, হজরত জিবরাইল (আ.)-কে যখন ইমামতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে– সে দুই দিনের নামাজ তাঁর ওপরও ফরজ হয়েছিলো এবং তিনি নফল আদায়কারি ছিলেন না; বরং ফরজ আদায়কারি ছিলেন।

عند البيت : দ্বারা সেসব লোকের মত খণ্ডন হয়ে গেছে যারা ইমামতে জিবরাইলের ঘটনাকে মাদানি সাব্যস্ত করেন। বায়তুল্লাহর দরজার নিচে ডান দিকের ফরশের ওপর আজও একটি কালো নিশান তৈরি হয়ে আছে। যার সম্পর্কে প্রসিদ্ধ হলো জিবরাইল (আ.)–এর ইমামতির ঘটনা এখানেই সংঘটিত হয়েছিলো।

فصلى الظهر فى الاولى منهما : ইমামতে জিবরাইলের বেশির ভাগ বর্ণনা এ ব্যাপারে একমত যে, হজরত জিবরাইল (আ.)-এর ইমামতির সূচনা হয়েছিলো জোহর নামাজ থেকে। অবশ্য সুনানে দারাকুতনিতে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে একটি হাদিস বর্ণিত আছে, যা দ্বারা বোঝা যায় এর সূচনা হয়েছিলো ফজর নামাজ থেকে। কিন্তু এ বর্ণনাটি জয়িফ কারণ, এ বর্ণনাটি নির্ভর করে মাহবুব ইবনুল জাহম নামক রাবির ওপর, যিনি জয়িফ। সুতরাং সহিহ হলো জোহর থেকেই এর সূচনা হয়েছে। এর কারণ, ওলামায়ে কেরাম এই বলেছেন যে, মূলত এটা মিরাজ রজনীর একদিন পরের ঘটনা। সেদিনের ফজরের নামাজ রাসূল ﷺ আম্বিয়ায়ে

কেরাম (আ.)-এর সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসে আদায় করেছিলেন। এ জন্যই জোহর নামাজ থেকে ইমামতে জিবরাইলের সূচনা করা হয়।

حين كان الفيئ مثل الشراك : এর দ্বারা সূর্য হেলার সাথে সাথে তার পরে উদ্দেশ্য। কেনোনা এই সময় ছায়া জুতার ফিতার মতো খুবই ছোট হয়। অর্থাৎ, সূর্য হেলার তৎক্ষণাত পর জোহর নামাজ আদায় করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রথম মিছ্‌ল এবং দুই মিছ্‌ল ধর্তব্য হয় মূল ছায়া বাদ দিয়ে। যেনো মূল ছায়া প্রথম মিছ্‌ল এবং দুই মিছ্‌লের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ জন্য হানাফিদের কিতাবগুলোতে অনেক জায়গায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে একথা।

প্রশ্ন : কোনো কোনো গায়রে মুকাল্লিদ এখানে প্রশ্ন করেন যে, আসল ছায়াকে বাদ দেওয়ার ওপর কিতাব ও সুন্নতে কোনো প্রমাণ নেই।

জবাব : এই প্রশ্নটি সম্পূর্ণ অর্থহীন। কারণ, এই ব্যতিক্রমভুক্তির ওপর কোনো নকলি দলিলের প্রয়োজন নেই। কারণ, এটা প্রতিটি মানুষ সাধারণ বিবেক দ্বারা বুঝতে পারে। কারণ, মূলত মৌলিক ছায়া সেটি, যেটি ঠিক সূর্য বরাবর হওয়ার সময় বিদ্যমান থাকে। এই ছায়া বিভিন্ন দেশে এবং এলাকায় ছোট বড় হয়ে থাকে। যেসব এলাকা সমতল রেখার সম্পূর্ণ নিচে সেগুলোতে ছায়া একেবারেই হয় না। এরপর যতোগুলো দেশ সমান্তরাল রেখার একেবারে নিকটবর্তী সেগুলোতে এই ছায়া ছোট হয়। আর যতোই দুই মেরুর দিকে অগ্রসর হতে থাকবে ততোই এই ছায়া বাড়তে থাকবে। এমনকি দুই মেরুর কোনো কোনো স্থান এমন রয়েছে যেখানে পূর্ণ দুপুরে ছায়া এক মিছ্‌ল বা দুই মিছ্‌ল হয়। অতএব, যদি মূল ছায়ার ব্যতিক্রমভুক্তি ধর্তব্য না হয়, তাহলে আপনার মতে সেখানে কখনও জোহরের ওয়াক্ত না আসার কথা ছিলো এবং পূর্ণ দ্বিপ্রহরের সময় আসরের ওয়াক্ত হওয়া উচিত এবং এটা যে অযৌক্তিক এ বিষয়টিও স্পষ্ট। তাছাড়া ছায়ায়ে আসলি ব্যতিক্রমভুক্ত হওয়ার ওপর সুনানে নাসায়িতে[১] একটি প্রমাণ আছে। হজরত জাবের (রা.) বলেন,

ثم صلى العصر حين كان الفيئ قدر الشراك وظل الرجل ـ

'এরপর তিনি আদায় করলেন আসরের নামাজ, যখন ছায়া জুতার ফিতা ও ব্যক্তির ছায়া বরাবর হলো।'

এতে প্রথম মিছ্‌লকে গণ্য করা হয়েছে জুতার ফিতা পরিমাণের পর।

ثم صلى العصر حين كان كل شئ مثل ظله : সূর্য হেলার তৎক্ষণাত পর থেকে জোহরের ওয়াক্ত শুরু হয় এ ব্যাপারে সবাই একমত। অবশ্য জোহরের শেষ সময় এবং আসরের শুরু কখন হয় এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম শাফেয়ি, ইমাম মালেক (র.) এবং জমহুরের মতে এক মিছ্‌লের পর জোহরের ওয়াক্ত খতম হয়ে যায় এবং আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। অবশ্য ইমাম মালেক (র.)-এর একটি বর্ণনা হলো, প্রথম মিছ্‌লের পর চার রাকাতের ওয়াক্ত জোহর এবং আসরের মাঝে যৌথ, এর পর শুরু হয়ে যায় আসরের ওয়াক্ত।

এ ব্যাপারে ইমাম আজম আবু হানিফা (র.) থেকে বিভিন্ন বর্ণনা আছে। এক বর্ণনা জমহুরের ন্যায়। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) এটাই অবলম্বন করেছেন। দ্বিতীয় বর্ণনা ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, দু'মিছ্‌ল পর্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত, এর পরের আসরের ওয়াক্ত হয়ে যায়। তৃতীয় বর্ণনা হাসান ইবনে জিয়াদ থেকে বর্ণিত যে, প্রথম মিছ্‌ল থেকে দ্বিতীয় মিছ্‌ল পর্যন্ত সময়টুকু বেকার। আর চতুর্থ বর্ণনা হলো, প্রথম মিছ্‌ল থেকে দ্বিতীয় মিছ্‌ল পর্যন্ত সময়টুকু জোহর ও আসরের মাঝে যৌথ। হজরত শাহ সাহেব (র.) মা'জুর এবং মুসাফিরদের জন্য এ বর্ণনাটিকেই মুফতাবিহি (যার ওপর ফতওয়া) সাব্যস্ত করেছেন। তা সত্ত্বেও ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মশহুর বর্ণনা হলো দ্বিতীয়টি। অর্থাৎ, দু'মিছ্‌ল। অধিকাংশ হানাফি এর ওপর ফতওয়া দিয়েছেন। জমহুর এর পরিপন্থী আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। যাতে প্রথম মিছ্‌লের সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর দ্বিতীয় বর্ণনার সহযোগিতায় পেশ করা হয় নিম্নেযুক্ত বর্ণনাগুলো,

১. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে তিরমিযীতে[২] বর্ণিত একটি مرفوع হাদিস রয়েছে,

---

টীকা- ১. ১/৯১. ছাপা নূর মুহাম্মদ, كتاب المواقيت اخر وقت المغرب

টীকা- ২. ১ম খ/৩ ابواب الصلوة فى تاخير الظهر فى شدة الحر

اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلوة فإن شدة الحر من فيح جهنم ـ

'প্রচণ্ড গরম পড়ে যখন তোমরা তখন ঠাণ্ডা সময়ে নামাজ পড়ো। কেনোনা গরমের প্রচণ্ডতা হয় জাহান্নামের প্রভাব বিস্তারের কারণে হয়।'

প্রমাণের কারণ হলো, হিজাজ অঞ্চলে গরমের সময় এক মিছ্ল কালে ঠাণ্ডা হয় না।

২. তিরমিযীতে[১] হজরত আবু জর (রা.)-এর বর্ণনা আছে,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى سفر ومعه بلال فاراد ان يقيم فقال ابرد ثم اراد ان يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابرد فى الظهر قال حتى رأينا فيئ التلول ثم اقام فصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شدة الحر من فيح جهنم فابردوا عن الصلوة ـ

'রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন কোনো এক সফরে। তাঁর সাথে বিলাল (রা.) ছিলেন। তিনি নামাজের ইকামত দেওয়ার জন্য মনস্থ করলেন। তখন নবী করিম ﷺ বললেন, একটু ঠাণ্ডা করো (ঠাণ্ডা হোক)। তারপর পুনরায় ইকামত দেওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, জোহরের নামাজ পড়ো ঠাণ্ডার সময়ে। বর্ণনাকারি বললেন, এমনকি আমরা তখন টিলার ছায়া দেখলাম। তারপর বিলাল (রা.) ইকামত দিলেন, সুতরাং তিনি নামাজ আদায় করলেন। তারপর রাসূল ﷺ বললেন, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের প্রভাব বিস্তৃতির কারণে। অতএব, এই নামাজটি পড়ো ঠাণ্ডার সময়।

সহিহ বোখারিতেও[২] এই বর্ণনাটি এসেছে। তাতে এসেছে حتى ساوى الظل التلول শব্দ। যার অর্থ হলো, টিলাগুলোর ছায়া সেগুলোর সমান হয়ে গেছে। যার সারমর্ম হলো, তিনি এমন সময় জোহরের নামাজ পড়েছেন যখন টিলাগুলোর ছায়া এক মিছ্ল হয়ে গেছে। আরবের টিলাগুলো সাধারণত চ্যাপটা ধরনের হয়ে থাকে। এজন্য এগুলোর ছায়া অনেক দেরিতে প্রকাশ পায় এবং এগুলোর ছায়া এক মিছ্ল তখন হয় যখন অন্য জিনিসগুলোর ছায়া হয়ে যায় এক মিছ্ল অপেক্ষা অনেক বেশি।

সহিহ বোখারিতে[৩] হজরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) হতে মওকুফ সূত্রে রয়েছে,

أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما بقائكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلوة العصر الى غروب الشمس، اوتى اهل التوراة، فعملوا حتى انتصف النهار عجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا ثم اوتى اهل الإنجيل الإنجيل فعملوا الى صلوة العصر ثم عجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا ثم اوتينا القران فعملنا الى غروب الشمس فاعطين قيراطين قيراطين فقال اهل الكتابين اى ربنا اعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين واعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجركم من شئ؟ قالوا لا قال وهو فضل اوتيه من اشاء ـ

'রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিনি বলতে শুনেছেন, তোমাদের আগের উম্মতদের তুলনায় তোমাদের স্থায়িত্ব আসরের নামাজ থেকে সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত। তাওরাত ওয়ালাদেরকে দেওয়া হয়েছে তাওরাত। এর ওপর তারা

টীকা- ১. باب ماجاء فى تاخير الظهر فى شدة الحر

টীকা- ২. كتاب الاذان باب الاذان للمسافر اذا كانوا جماعة الخ جا ، ص٨٧-٨٨

টীকা- ৩. ১/৭৯. كتاب مواقيت الصلوة باب من ادرك ركعة من العصر قبل الغروب

তাওরাত আমল করেছে। এরপর যখন অর্ধ দিবস হলো, তখন তারা অক্ষম হয়ে পড়লো। ফলে তাদেরকে এক কিরাত্ব এক কিরাত্ব করে প্রতিদান দেওয়া হলো। তারপর ইঞ্জিল ওয়ালাদেরকে দেওয়া হলো ইঞ্জিল। তারা আমল করলো আসরের নামাজ পর্যন্ত। তারপর তারা অক্ষম হয়ে গেলো। ফলে তাদেরকে এক কিরাত্ব এক কিরাত্ব করে প্রদান করা হলো। তারপর আমাদেরকে কোরআন দান করা হলো, আমরা আমল করলাম সূর্যাস্ত পর্যন্ত। ফলে আমাদেরকে দু'কিরাত্ব দু'কিরাত্ব করে প্রদান করা হলো। ফলে প্রথম দুই কিরাতধারীরা বললো, হে আমাদের প্রতিপালক! এদেরকে দুই কিরাত্ব দুই কিরাত্ব করে দিলেন আর আমাদেরকে দিলেন এক কিরাত্ব এক কিরাত্ব করে। অথচ আমাদের আমল ছিলো বেশি। আল্লাহ তা'আলা জবাবে বললেন, আমি কি তোমাদের প্রতিদানে কোনো জুলুম করেছি? তারা জবাব দিলো, না। এ শুনে আল্লাহ তা'আলা বললেন, এটা আমার অনুগ্রহ, আমি যাকে ইচ্ছা তা দান করি।'

ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও এই অর্থের বর্ণনা মুয়াত্তায় তাফসির অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

আসর এবং মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়কে এই হাদিসে জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ের বিপরীতে কম সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর এটা তখনই সম্ভব যখন আসরের সময় দুই মিছ্ল মানা হবে। প্রথম মিছ্ল যদি মানা হয়, তাহলে আসর পরবর্তী সময় জোহর পরবর্তী সময় থেকে বেড়ে যাবে।

দুই মিছ্লের পর জোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সাধারণত হানাফিদের পক্ষ থেকে তিনটি দলিল পেশ করা হয়। কিন্তু ইনসাফের কথা হলো, এগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি হাদিসও ওয়াক্তের সীমা নির্ধারণে স্পষ্ট নয়। এর পরিপন্থি হাদিসে জিবরাইলে স্পষ্টাকারে প্রথম দিন আসরের নামাজ এক মিছ্লে পড়ার আলোচনা রয়েছে।

এজন্য এ হাদিসগুলো হাদিসে জিবরাইলের মুকাবেলা করতে পারে না। তাই কোনো কোনো হানাফি প্রথম মিছ্ল বিশিষ্ট বর্ণনাটি গ্রহণ করেছেন, যেমন দুররে মুখতারে। আর অনেকে প্রাধান্য দিয়েছেন বেকার সময়কে। হজরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, এ বিষয়ে সহিহ এটাই যে, দুই মিছলের মধ্যবর্তী সময়টুকু জোহর ও আসর নামাজের মাঝে যৌথ। আর মা'জুর ও মুসাফিরদের জন্য বিশেষভাবে তখন উভয় নামাজ বৈধ।

وصلى العشاء حين غاب الشفق : ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর একটি মাগরিবের শেষ সময় সম্পর্কে বর্ণনা এই, মাগরিবের ওয়াক্ত শুধু এতোক্ষণ পর্যন্ত বাকি থাকে, যতোক্ষণ পাঁচ রাকাত নামাজ পড়া যায়। এর প্রমাণ তিনি এই বর্ণনা করেছেন যে, হজরত জিবরাইল (আ.) উভয় দিন সূর্য অস্তমিত হওয়ার তৎক্ষণাত পর মাগরিবের নামাজ আদায় করেছেন।

০ জমহুর এর জবাব দেন যে, এই আমলের উদ্দেশ্য ছিলো মাগরিবের নামাজ তাড়াতাড়ি পড়ার প্রতি গুরুত্ব প্রকাশ করা। আর এ থেকে এ জিনিসটিও জানা গেলো, হজরত জিবরাইল (আ.) ওয়াক্তসমূহের পরিপূর্ণ সীমা নির্ধারণের পরিবর্তে মোস্তাহাব ওয়াক্তের সীমা নির্ধারণও করেছেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মুফতাবিহি (যার ওপর ফতওয়া) উক্তি হলো, শাফাক অস্তমিত হওয়ার পর। আর এটাই এশার ওয়াক্তের সূচনা। জমহুরেরও এটি একটি মত। কিন্তু তারপর শাফাক নির্ণয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইমামত্রয় এবং ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) শাফাক দ্বারা লালিমা উদ্দেশ্য করেছেন। এটাই হলো হজরত উমর, আলি ইবনে আব্বাস, উবাদা ইবনুস্ সামেত, হজরত আবু মূসা আশআরি ও আবু হুরায়রা (রা.)-এর মত এবং শাদ্দাদ ইবনে আওসও এর পক্ষে।

আবু হানিফা (র.)-এর মতে শাফাক দ্বারা শুভ্রতা উদ্দেশ্য। এই বক্তব্যটিই সাহাবিগণের মধ্য থেকে হজরত আবু বকর, আয়েশা, মু'আজ ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব এবং আবদুল্লাহ ইবনুজ জুবায়ির (রা) হতে বর্ণিত।

পরবর্তী ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে হজরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, আবু সাওর, আরেক বর্ণনা মুতাবেক ইমাম আওজায়ি, আরেক বর্ণনা মুতাবেক ইমাম মালেক (র.) ও এরই পক্ষে।

এসব মতবিরোধের কারণ হলো, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটিতে শাফাক শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ব্যাপকরূপে এবং এতে অভিধানবিদদের মতানৈক্য আছে যে, এই শব্দটির প্রয়োগ শুধু লালিমার ক্ষেত্রে হয়, না শুভ্রতার ক্ষেত্রে। খলিল ইবনে আহমদের বক্তব্য হলো, শাফাক শুধু লালিমাই। এ জন্য জমহুর তাঁর বক্তব্য দ্বারা প্রমাণ পেশ করে এখানে লালিমা উদ্দেশ্য করেছেন।

আবু হানিফা (র.)-এর প্রমাণ হলো, মুবার্‌রাদ, ফার্‌রা এবং সা'লাবের মতে শাফাকের প্রয়োগ লালিমা এবং শুভ্রতা হয় উভয়টির ওপর। কিন্তু বাস্তবে শাফাক অস্তমিত তখন হয়, যখন উভয়টি অদৃশ্য হয়ে যায়। এর সহায়তা হয় পরবর্তী অধ্যায়ে[১] বর্ণিত হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিস দ্বারা, যাতে বলা হয়েছে, ان اول وقت العشاء الأخيرة حين يغيب الافق। এখানে শাফাকের পরিবর্তে উফুক (দিগন্ত তথা এর আলো) অস্তমিত হওয়ার আলোচনা রয়েছে। আর এটা তখনই সম্ভব যখন শুভ্রতা অস্তমিত হয়ে যায়। আর আবু দাউদের[২] একটি বর্ণনায় মাগরিবের শেষ সময়ের বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, حين يسود الافق 'দিগন্ত যখন কালো হয়ে যায়।'

প্রশ্ন : প্রকাশ থাকে যে, শুভ্রতার বর্তমানে বাস্তবে দিগন্ত কালো হয় না। আর এর চেয়ে বেশি স্পষ্ট বর্ণনা 'মু'জামে আওসাতে' ইমাম তাবারানি (র.) হাসান সনদে হজরত জাবের (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন ثم[৩] اذن للعشاء حين ذهب بياض النهار وهو الشفق (এশার আজান দিয়েছেন তখন, যখন দিনের শুভ্রতা বিদায় নিয়েছে। আর শাফাক হলো দিনের শুভ্রতা।)

জবাব : যে শুভ্রতা খলিল ইবনে আহমদ দেখেছেন সেটি অন্য কোনো বহির্গত আলো ছিলো, সূর্যের রশ্মি ছিলো না। কারণ, এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, সূর্য ১৫ ডিগ্রী নিচের দিগন্তে চলে যাওয়ার পর এর কোনো রশ্মি দিগন্তে থাকে না। অবশ্য কোনো কোনো সময় অন্য কোনো কারণে আকাশে শুভ্রতা পরিলক্ষিত হয়। মাগরিবের সময় অবশিষ্ট থাকার ক্ষেত্রে এটা ধর্তব্য নয়। অতএব শাফাক সম্পর্কে দলিল-প্রমাণাদির দিকে লক্ষ্য করলে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মাজহাব দুই মিছলের মাজহাবের তুলনায় অধিক শক্তিশালী মনে হয়। কিন্তু এতেও ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর কয়েকটি বর্ণনা রয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় জমহুরের বক্তব্যের দিকে প্রত্যাবর্তনও প্রমাণিত আছে। সদরুশ শরিয়তও এর ওপর ফতওয়া দিয়েছেন। কিন্তু হজরত শাহ সাহেব (র.) এখানে সেই বক্তব্য অবলম্বন করেন যে, দু'শাফাকের মধ্যবর্তী সময় মা'জুর এবং মুসাফিরদের জন্য যৌথ এশা ও মাগরিবের মাঝে।

ثم صلى العصر حين كان ظل شيئ مثليه : করে ইমাম আওজায়ি এবং আসতাখরি (র.) এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করে বলেন যে, আসরের সময় সূর্য হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করার সময় খতম হয়ে যায়। তাঁদের দ্বিতীয় প্রমাণ পরবর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিস, وإن اخر وقتها حين تصفر الشمس এর বিপরীত জমহুরের মতে আসরের সময় বাকি থাকে সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় পর্যন্ত। হজরত জিবরাইল (আ.) দ্বিতীয় দিনের নামাজ সূর্য হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করার পূর্বে এজন্য পড়েছেন যে, এরপর মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। আর হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিসে শেষ ওয়াক্ত দ্বারা উদ্দেশ্য মুস্তাহাব ওয়াক্তের শেষ।

ثم صلى العشاء حين ذهب ثلث الليل : কোনো কোনো আলেম এই হাদিসের ভিত্তিতে বলেন, এশার ওয়াক্ত রাতের এক তৃতীয়াংশে খতম হয়ে যায়। ইমাম শাফেয়ি (র.) বলেন, এশার শেষ ওয়াক্ত অর্ধ রাত পর্যন্ত। তার প্রমাণ পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিস। তাতে প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন,

واخر وقتها حين ينتصف الليل (তার শেষ সময় হলো, রাত অর্ধেক হয়ে যায় যখন।)

টীকা- ১. باب منه بلا ترجمة

টীকা- ২. ج١ كتاب الصلوة، باب المواقيت ص٧٥ فى حديث ابن مسعود الانصارى

টীকা- ৩. মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ১/৩০৪, বাবু বায়ানিল ওয়াক্তি, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)-এর হাদিস। হায়সামি (র) বলেন, হাদিসটির সনদ হাসান।

এশার নামাজ রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করা মোস্তাহাব এটা হানাফিদের মাজহাব। অর্ধ রাত্র পর্যন্ত বৈধ এরপর মাকরূহে তানজিহ। কিন্তু ওয়াক্ত শেষ হয় ফজর উদয়ের পর। হানাফিদের প্রমাণে কোনো একটি ব্যাপক হাদিস পেশ করা যায় না। এর পরিবর্তে হানাফিদের মাজহাব সামগ্রিক বর্ণনাগুলোর ওপর নির্ভরশীল। কেনোনা রাসূল ﷺ থেকে রাতের এক-তৃতীয়াংশের পরেও নামাজ পড়া প্রমাণিত আছে। এমনভাবে অর্ধ রাতের পরেও। ইমাম তাহাবি (র.) এসব হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেমন, হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত,

اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوة ذات ليلة الى شطر الليل ثم انصرف فاقبل عليها بوجهه بعد ما صلى بنا فقال قد صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا فى صلوة ما انتظر تموها[১] .

'এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এশার নামাজ অর্ধ রাত্র পর্যন্ত দেরি করলেন। তারপর আমাদের নামাজ পড়িয়ে আমাদের দিকে চেহারা ফিরালেন। বললেন, লোকজন নামাজ পড়েছে এবং ঘুমিয়ে পড়েছে। তোমরা যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো নামাজের জন্য অপেক্ষারত থাকবে ততোক্ষণ পর্যন্ত গণ্য হবে নামাজে রত।'

আর হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত,

اعتم النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام اهل المسجد ثم خرج[২] فصلى .

'নবী করিম ﷺ এক রাত এমন সময় এশার নামাজ আদায় করলেন, যখন রাতের বেশির ভাগ শেষ হয়ে যায়, মসজিদের লোকজন ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর তিনি নামাজ পড়লেন (ঘর থেকে) বেরিয়ে এসে।'

ইবনে হুমাম (র.) বলেন যে, এসব বর্ণনা প্রমাণযোগ্য এবং ইমাম তাহাবি (র.) বলেন, এসব বর্ণনার দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, এসব নামাজের ওয়াক্ত ফজর পর্যন্ত বাকি থাকে। আর হানাফিদের মাজহাবের সহায়তা হয় অনেক সাহাবির বক্তব্য থেকেও। যেমন,

عن نافع بن جبير قال كتب عمر الى أبى موسى وصل العشاء اى الليل شئت ولا تغفل[৩]

'হজরত নাফে' ইবনে জুবায়ির বলেছেন, উমর (রা.) আবু মূসা (রা.)-এর কাছে চিঠি লিখলেন, 'আর এশার নামাজ রাতের যে কোনো অংশে ইচ্ছা আদায় করো। তবে তা থেকে গাফেল হয়ো না।'

এমনভাবে হজরত উবায়দ ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত আছে,

انه قال لأبى هريرة ما افراط صلوة العشاء؟ قال طلوع الفجر[৪] .

'হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-কে তিনি বললেন, এশার নামাজের মধ্যে সীমালঙ্ঘন কী? জবাবে তিনি বললেন, ফজর উদয় হওয়া।'

হানাফিদের মতে শাফেয়ি মতাবলম্বীদের প্রমাণ, হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিস প্রযোজ্য বৈধতার বিবরণের জন্য।

هذا وقت الانبياء من قبلك : প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন হয় যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তো আগে কোনো উম্মতের ওপর ফরজ ছিলো না, তবে পাঁচ ওয়াক্তকে পূর্ববর্তী নবীদের দিকে সম্বোধন করার কী অর্থ।

জবাবে : আল্লামা ইবনে আরাবি (র.) এর জবাব এই দিয়েছেন যে, এই উপমা শুধু সময় সীমিত হওয়ার ওপরে। অর্থাৎ, রাসূল ﷺ-এর জন্য ওয়াক্তগুলো এমনভাবে সীমিত করে দেওয়া হয়েছে, যেমনভাবে সীমিত করে দেওয়া হয়েছিলো পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের জন্য।

টীকা- ১. ২. باب مواقيت الصلوة فى شرح معانى الاثار

টীকা- ৩. ومثله فى مصنف ابن ابى شيبة ج١، ص٣١٩-٣٢٠

টীকা- ৪. باب مواقيت الصلوة فى شرح معانى الاثار

এর আরেকটি জবাব দেওয়া যায় যে, যদিও তাঁদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ ছিলো না, তবে হতে পারে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এসব ওয়াক্তে নামাজ পড়তেন নফল হিসেবে।

তবে সর্বোত্তম জবাব দিয়েছেন হজরত শাহ সাহেব (র.)। সেটি হচ্ছে, যদিও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পরিপূর্ণভাবে প্রতি শরিয়তে কোনো একজন পয়গম্বরের ওপর ফরজ ছিলো না; কিন্তু এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন নামাজ বিভিন্ন আম্বিয়ায়ে কেরামের ওপর ফরজ ছিলো। এজন্য তাহাবি শরিফে[১] একটি বর্ণনা আছে, যখন হজরত আদম (আ.)-এর তওবা কবুল করা হয়েছে সে ওয়াক্তটি ছিলো ফজরের। এই সময় হজরত আদম (আ.) কৃতজ্ঞতা হিসেবে দু'রাকাত আদায় করেছিলেন। এটা ফজরের নামাজের মূলভিত্তি।

যে সময় হজরত ইসহাক[২] (আ.)-এর বিনিময়ে অবতীর্ণ হয়েছিলো দুম্বা, সেটি ছিলো জোহরের সময়। সে সময় হজরত ইবরাহিম (আ.) চার রাকাত আদায় করেছিলেন। এটা হলো, জোহরের নামাজের মূলভিত্তি। আর যখন হজরত উযাইর (আ.)কে দ্বিতীয়বার জীবিত করা হয়েছিল তখন ছিলো আসরের ওয়াক্ত। তখন তিনি চার রাক'আত আদায় করেছিলেন। এটা ছিলো আসরের মূলভিত্তি। আর যখন হজরত দাউদ (আ.)-এর তওবা কবুল হলো তখন ছিলো মাগরিবের ওয়াক্ত। তিনি তখন শুকরানা হিসেবে তিন রাকাত পড়েছিলেন। মাগরিবের নামাজের মূলভিত্তি ছিলো এটা।

উম্মতে মুহাম্মাদিয়া ব্যতিত এশার নামাজ অন্য কোনো উম্মত পড়েনি। যেমন আবু দাউদের হাদিসে রয়েছে,

اعتموا بهذه الصلوة فانكم قد فضلتم بها على سائر الامم ولم تصليها امة قبلكم[৩] ـ

'এই এশার নামাজ তোমরা আদায় করো। কেনোনা এটি দ্বারা অন্য উম্মতের ওপর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে। তোমাদের আগে কোনো উম্মত এটি আদায় করেনি।'

আর কোনো কোনো নবীর ওপর চার ওয়াক্ত নামাজ কমপক্ষে ওপরযুক্ত তাফসিল মুতাবেক ফরজ হয়ে থাকাও অযৌক্তিক কিছু নয়।

والوقت فيما بين هذين الوقتين : বাহ্যত কোনো ফকিহর মতে এই বাক্যটির ওপর আমল হয় না। সুতরাং, সমস্ত ফুকাহার মতে এর অর্থ হলো, মোস্তাহাব সময় এই দুই ওয়াক্তের মধ্যে।

بَابٌ مِنْهُ (ص ٣٩)

এ বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ (মতন ৩৯)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِنَّ لِلصَّلٰوةِ اَوَّلاً وَاٰخِرًا وَاِنَّ اَوَّلَ وَقْتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ وَاٰخِرُ وَقْتِهَا حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ وَاِنَّ اَوَّلَ الْوَقْتِ الْعَصْرِ حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا وَاِنَّ اٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَاِنَّ اَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَاِنَّ اٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَغِيْبُ الْاُفُقُ وَاِنَّ اٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ وَاِنَّ اَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِيْنَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَاِنَّ اٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ ـ

টীকা- ১. ১/৮৫-৮৬, باب الصلوة الوسطى اى الصلوات

টীকা- ২. সাহাবায়ে কেরাম এবং তৎপরবর্তীগণের মাঝে মতভেদ হয়েছে যে, কাকে জবাই করা হয়েছিলো। তিনি কি ইসমাইল ছিলেন, না ইসহাক (আ.)? ইমামুল আসরের ঝোঁক এদিকে যে, তাঁরা দুজনই জবিহ ছিলেন। জমহুর ইসমাইলের জবিহ হওয়ার বক্তব্যটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সুরা সাফফাতের আয়াতগুলোর পূর্বাপর এরই সহায়ক। (মা'আরিফুস্ সুনান : ২/১৬ থেকে চয়নকৃত। –সংকলক)

টীকা- ৩. আবু দাউদ : ১/৬০-৬১, كتاب الصلوة باب وقت العشاء الاخرة فى حديث معاذ بن جبل

১৫১. অর্থ : হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় নামাজের শুরু ও শেষ সময় রয়েছে। জোহরের নামাজের প্রথম সময় হলো, যখন সূর্য পশ্চিম দিকে হেলতে শুরু করে। আর শেষ সময় হলো, যখন আসরের সময় শুরু হয়। আসরের নামাজের প্রথম সময় হলো, যখন এর সময় প্রবেশ করে। (জোহরের সময় শেষ হওয়ার পরে।) আর এর শেষ ওয়াক্ত হলো, যখন সূর্যের আলো হলুদ রং ধারণ করে। মাগরিবের প্রথম সময় হলো, যখন সূর্য ডুবে যায়। আর শেষ সময় হলো, যখন শাফাক অদৃশ্য হয়ে যায়। এশার প্রথম ওয়াক্ত হলো, যখন শাফাক অদৃশ্য হয়ে যায়। আর শেষ সময় হলো, যখন অর্ধ রাত্র হয়। আর ফজরের প্রথম সময় হলো, যখন ফজর (সুবহে সাদেক) উদিত হয়। আর শেষ ওয়াক্ত হলো, যখন সূর্যোদয় ঘটে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আমি মুহাম্মদকে বলতে শুনেছি, মুজাহিদ হতে ওয়াক্ত সংক্রান্ত আ'মাশের হাদিসটি মুহাম্মদ ইবনে ফুজাইল হতে আ'মাশের হাদিস অপেক্ষা বিশুদ্ধতম। আর মুহাম্মদ ইবনে ফুজাইলের হাদিসটি ভুল। তাতে (এর সনদে) মুহাম্মদ ইবনে ফুজাইল ভুল করেছেন।

'হজরত হান্নাদ-আবু উসামা-আবু ইসহাক আল-ফাজারি-আ'মাশ-মুজাহিদ সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, কথিত আছে নামাজের জন্য শুরু এবং শেষ ওয়াক্ত রয়েছে। তারপর তিনি মুহাম্মদ ইবনে ফুজাইল সূত্রে আ'মাশ হতে বর্ণিত হাদিসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَسَاَلَهُ عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ اَقِمْ مَعَنَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ. فَاَمَرَ بِلَالًا فَاَقَامَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَقَامَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ. ثُمَّ اَمَرَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ اَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ حِيْنَ وَقَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ثُمَّ اَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ فَاَقَامَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ. ثُمَّ اَمَرَهُ مِنَ الْغَدِ فَنَوَّرَ بِالْفَجْرِ. ثُمَّ اَمَرَهُ بِالظُّهْرِ فَاَبْرَدَ وَاَنْعَمَ اَنْ يُّبْرِدَ ثم امره من الغد فنور بالفجر. ثم امره بالظهر فابرد وانعم ان يبرد ثُمَّ اَمَرَهُ بِالْعَصْرِ فَاَقَامَ وَالشَّمْسُ آخِرَ وَقْتِهَا فَوْقَ مَا كَانَتْ. ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَخَّرَ الْمَغْرِبَ اِلٰى قُبَيْلِ اَنْ يَّغِيْبَ الشَّفَقُ ثُمَّ اَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ فَاَقَامَ حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلٰوةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ اَنَا فَقَالَ مَوَاقِيْتُ الصَّلٰوةِ كَمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ.

১৫২. অর্থ : 'বুরায়দা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী করিম ﷺ-এর কাছে এসে নামাজের ওয়াক্তগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। জবাবে তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ তুমি আমাদের সাথে অবস্থান করো, তারপর বিলাল (রা.)-কে তিনি নির্দেশ দিলেন। তিনি ফজর উদয়ের সময় ইকামত দিলেন। তারপর তাঁকে নির্দেশ দিলেন, ফলে তিনি সূর্য হেলার সময় ইকামত দিলেন। তারপর জোহরের নামাজ আদায় করলেন। তারপর তিনি তাঁকে নির্দেশ দিলেন, ফলে তিনি ইকামত দিলেন, তারপর আসরের নামাজ আদায় করলেন। সূর্য তখন শ্বেত শুভ্র এবং অনেক উর্ধ্বে অবস্থানকারি। তারপর মাগরিবের নামাজের নির্দেশ দিলেন, যখন সূর্যের কিনারা ডুবে গেছে। তারপর এশার নামাজের নির্দেশ দিলেন। বিলাল (রা.) ইকামত দিলেন, যখন সূর্যের লালিমা বা শুভ্রতা অদৃশ্য হয়ে গেছে। তারপর নবী কারিম ﷺ পর দিন তাঁকে নির্দেশ দিলেন। ফলে ফজরের নামাজ তিনি দিগন্ত আলোকোজ্জ্বল হওয়ার পর আদায় করলেন। তারপর তিনি তাঁকে জোহরের নামাজের নির্দেশ দিলেন। ফলে খুব ঠাণ্ডা করে তথা ভালোরূপে ঠাণ্ডা হওয়ার পর নামাজ আদায় করলেন। তারপর তিনি তাকে আসরের নির্দেশ

দিলেন, ফলে তিনি ইকামত দিলেন সূর্য তখন শেষ সীমায় এবং পূর্ব দিনের চেয়ে অনেক নিচে নেমে এলো। তারপর তিনি তাঁকে নির্দেশ দিলেন, ফলে তিনি মাগরিবের নামাজ পিছিয়ে দিলেন আকাশের শুভ্রতা অদৃশ্য হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। তারপর নবীজি ﷺ তাকে এশার নামাজের নির্দেশ দিলেন, ফলে তিনি ইকামত দিলেন, যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ শেষ হয়ে যায়। তারপর বললেন, নামাজের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্নকারি কোথায়? এ শুনে সে লোকটি বললো, আমি এখানে। জবাবে নবী করিম ﷺ বললেন, নামাজের সময় এই দুই ওয়াক্তের মাঝখানে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح غريب। শো'বা এ হাদিসটি আলকামা ইবনে মুরসিল থেকেও বর্ণনা করেছেন।

দরসে তিরমিযী

وان وقت العصر حين يدخل وقتها : বাক্যের মুবতাদা-খবর এক হওয়ার সন্দেহ এখানে করবেন না। কেনোনা আসরের ওয়াক্ত ছিলো একটি প্রসিদ্ধ বিষয়। এমন স্থানে কোনো বিষয়কে কোনো বিষয়ের ওপর حمل করা বৈধ হয়। তথা একটি মুবতাদা একটি খবর হতে পারে। যেমন,

انا ابوا النجم وشعرى شعرى .

এ থেকে বোঝা যায় যে, আসরের ওয়াক্ত সাহাবায়ে কেরামের মাঝে কোনো অস্পষ্ট বিষয় ছিলো না; বরং এটা নির্বিশেষে সবাই জানতেন।

وحديث محمد بن فضيل خطأ : এর সারনির্যাস হলো, এ হাদিসটি মারফু হওয়া ভুল এবং মুজাহিদের ওপর মওকুফ হওয়া সহিহ। ইমাম বোখারি (র.) মুহাম্মদ ইবনে ফুজাইলের দিকে ভুলের সম্বোধন করেছেন। কিন্তু অন্যান্য মুহাদ্দিস ইমাম বোখারি (র.)-এর এই প্রশ্ন প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁরা বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনে ফুজাইল সর্বসম্মতিক্রমে নির্ভরযোগ্য রাবি; বোখারি-মুসলিমের রাবি। শুধু এ কারণে তাঁর দিকে ভুলের সম্বোধন ঠিক নয় যে, তিনি এ হাদিসটি মারফু বর্ণনা করেছেন। কেনোনা এটা পুরোপুরি সম্ভব যে, আ'মাশ মুজাহিদ থেকে এ হাদিসটি মওকুফ সূত্রে শুনেছেন। আর আবু সাহেল থেকে আবু হুরায়রা সূত্রে শুনেছেন মারফুভাবে। মূলত মারফু করা এক প্রকার সংযোগ বা বৃদ্ধি। বস্তুত সেকাহ রাবির অতিরিক্ত বিষয় গ্রহণযোগ্য।

والشمس اخر وقتها فوق ما كانت : এ বাক্যটি পড়া যায় দু'ভাবে।

প্রথমতো, والشمس اخر وقتها فوق ما كانت-এর উদ্দেশ্য হলো, রাসূল ﷺ প্রথম দিনের তুলনায় অধিক বিলম্ব করেছেন। আবার দ্বিতীয়তো এভাবেও পড়া যায় والشمس اخر وقتها অর্থাৎ, والشمس فى اخر وقتها এমতাবস্থায় اخر শব্দটি হবে منصوب بنزع الخافض।

بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّغْلِيْسِ بِالْفَجْرِ (ص ٤٠)

অনুচ্ছেদ- ২ : অন্ধকার অবস্থায় ফজরের নামাজ পড়া প্রসঙ্গে (মতন ৪০)

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّى الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ قال الانصارى فَتَمُرُّ النِّسَاءُ مُتَلَفِّفَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ وَقَالَ قُتَيْبَةُ مُتَلَفِّعَاتٍ .

১৫৩. অর্থ : হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাজ আদায় করতেন, তারপর মহিলারা প্রত্যাবর্তন করতেন। আনসারি বলেছেন, তখন মহিলারা অতিক্রম করতেন চাদর মুড়ি দিয়ে। অন্ধকারের কারণে তাদের চেনা যেতো না। متلففات এর স্থলে কুতায়বা বলেছেন متلفعات।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইবনে উমর, আনাস ও কায়লা বিনতে মাখরামা (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আয়েশা (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح। এটাই অবলম্বন করেছেন একাধিক আলেম সাহাবি। তার মধ্যে রয়েছেন, আবু বকর ও উমর (রা.) এবং তৎপরবর্তী তাবেয়িন। এ মতই পোষণ করেন, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক (র.)। তাঁরা বলেন ফজরের নামাজ অন্ধকার অবস্থায় পড়া মোস্তাহাব।

নামাজের মোস্তাহাব ওয়াক্তের বিবরণ আরম্ভ হচ্ছে এখান থেকে। মোস্তাহাব ওয়াক্তগুলো **সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ি** (র.)-এর মাজহাব হলো, প্রতিটি নামাজ আগে আদায় করা উত্তম শুধু মাত্র এশা ব্যতিত। **হানাফিদের** মতে প্রতিটি নামাজে দেরি করা উত্তম শুধু মাগরিব ভিন্ন।

দরসে তিরমিযী

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الصبح فينصرف النساء متلففات .

'রাসূল ﷺ ফজরের নামাজ আদায় করতেন, তারপর মহিলারা চাদর মুড়িয়ে আপাদমস্তক ঢেকে ফিরতেন।'

অনেক বর্ণনায়[১] এখানে متلفعات শব্দ এসেছে। উভয়টির অর্থ এক। অর্থাৎ, চাদর গায়ে দেওয়া।

تلفف : لفافة শব্দ থেকে উদ্ভূত, আর تلفع - لفاع থেকে। উভয়টির অর্থ চাদর। অবশ্য অনেকে পার্থক্য করেছেন যে, لفافة এমন চাদরকে বলে যা দ্বারা মাথা ঢেকে যায়। আর لفاع বলা হয়, যা দ্বারা মাথা ঢাকে না।

بمروطهن : مروط শব্দটি مرط -এর বহুবচন। এর অর্থও চাদর।

ما يعرفن من الغلس : غلس-এর আভিধানিক অর্থ, রাতের অন্ধকার। সে অন্ধকারের ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ হয়, যা ফজর উদয় হওয়ার পর কিছুক্ষণ পর্যন্ত ছেয়ে থাকে। এখানে উদ্দেশ্য সে অন্ধকারই।

ইমাম শাফেয়ি, ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.) এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করে বলেন, ফজর নামাজ অন্ধকারে পড়া উত্তম। হানাফি এবং মালেকিদের মাজহাব হলো, ফজর ফর্সা হলে পড়া উত্তম। অবশ্য ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর এক বর্ণনা এটাও যে, অন্ধকারে শুরু করে ফর্সা হলে শেষ করা উত্তম। এই বর্ণনাটি ইমাম তাহাবি (র.) অবলম্বন করেছেন।

০ হানাফিদের পক্ষ থেকে আলোচ্য আয়াতের হাদিসটির জবাব এই দেওয়া হয়েছে যে, মূলত من الغلس শব্দটি হজরত আয়েশা (রা.)-এর নয়; বরং তাঁর বক্তব্য ما يعرفن পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে এবং তাঁর উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, মহিলারা চাদর গায়ে দিয়ে আসতো, এজন্য তাদেরকে চেনা যেতো না। কোনো রাবি মনে করেছেন, এই চেনা না যাওয়ার কারণ অন্ধকার। এজন্য من الغلس শব্দটি বাড়িয়ে দিয়েছেন। যেনো এটি রাবির পক্ষ থেকে প্রবিষ্ট শব্দ। এর প্রমাণ হলো, এই বর্ণনাটি ইবনে মাজাহ: ৪৯ পৃষ্ঠাতে باب وقت صلوة الفجر -এর অধীনে সহিহ সনদে নিম্নেযুক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে,

عن عائشة (رض) قالت كن نساء المؤمنات يصلين مع النبى صلى الله عليه وسلم صلوة الصبح ثم يرجعن الى اهلهن فلا يعرفهن احد تعنى من الغلس .

'হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমরা ঈমানদার মহিলারা নবী করিম ﷺ-এর সাথে ফজরের নামাজ আদায় করতাম। তারপর মহিলারা তাদের পরিবারের দিকে ফিরে যেতেন। তাদেরকে কেউ চিনতে পারত না। এর দ্বারা আয়েশা (রা.)-এর উদ্দেশ্য, অন্ধকারের ফলে।'

এতে تعنى শব্দ পরিষ্কার বলছে যে, এটি হলো রাবির নিজস্ব ধারণা। তাছাড়া অনেক ইমাম যেমন ইমাম তাহাবি এই বর্ণনাটি এমন শব্দে বর্ণনা করেছেন।

টীকা- ১. বোখারির হাদিস : ১/৮২ باب وقت الفجر

عن عائشة (رضـ) قالت كن نساء المؤمنات يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الصبح متلفعات بمروطهن ثم يرجعن الى اهلهن وما يعرفهن احد ١ -

'আয়েশা (রা.) বলেছেন, মুমিন মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ফজরের নামাজ আদায় করতেন আপাদমস্তক চাদর দিয়ে ঢেকে। তারপর তারা তাদের পরিবারের দিকে ফিরে আসতেন। অথচ তখন তাদের কেউ চিনতে পারতো না।'

শাফেয়িদের দ্বিতীয় প্রমাণ হলো সেসব বর্ণনা, যেগুলোতে ٢ الصلوة لأول وقتها- কে সর্বোত্তম আমল সাব্যস্ত করা হয়েছে। এমনভাবে সেসব বর্ণনা দ্বারাও প্রমাণ পেশ করা হয় যেগুলোতে ভালো কাজে অগ্রগামী হওয়ার ফজিলত বর্ণিত হয়েছে হানাফিদের পক্ষ থেকে এর জবাব হলো যে, সেখানে অগ্রগামী হওয়ার এবং প্রথম ওয়াক্ত দ্বারা উদ্দেশ্য মুস্তাহাব প্রথম ওয়াক্ত। এ জন্য এশা সম্পর্কে স্বয়ং শাফেয়ি মতাবলম্বীগণও বাধ্য হয়ে এই অর্থ উদ্দেশ্য নিতেন।

শাফেয়ি মতাবলম্বীদের তৃতীয় প্রমাণ আবু দাউদ এবং তাহাবি'তে বর্ণিত হজরত আবু মাসউদ আনসারি (রা.)-এর বর্ণনা,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداة فغلس بها ثم صلاها فأسفر ثم لم يعد الى الأسفار حتى قبضه الله عزو جل -

'রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্ধকারের সময় ফজরের নামাজ আদায় করেছেন। তারপর তা আদায় করেছেন ভালো করে ফর্সা হওয়ার পর। এরপর ভালো করে ফর্সা হওয়া পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর পূর্বে আর কখনও আদায় করেননি।'

এ হলো তাহাবির শব্দাবলি[৩]। আর আবু দাউদের[৪] শব্দাবলি নিম্নেযুক্ত,

وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة اخرى فأسفر بها ثم كان الصلوة بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد الى ان يسفر -

'তিনি একবার অন্ধকারে ফজরের নামাজ আদায় করেছেন। তারপর আরেকবার আদায় করেছেন ভালো করে ফর্সা হওয়ার পর। তারপর তাঁর নামাজ ছিলো ওফাতের আগ পর্যন্ত অন্ধকারেই, আর কখনও ভালোরূপে ফর্সা হওয়া পর্যন্ত আদায় করেননি।'

০ এর জবাব হলো, মূলত এটি একটি সুদীর্ঘ হাদিসের অংশ এবং এর নামাজের অংশটিকে স্বয়ং ইমাম আবু দাউদ (র.) মা'লুল (ত্রুটিপূর্ণ) সাব্যস্ত করেছেন এবং এর কারণ বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম জুহরি থেকে এ হাদিসটি উসামা ইবনে জায়দ (রা.) ব্যতিত মা'মার, ইমাম মালেক, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, লাইছ ইবনে সাদ এবং অন্যান্য হাফেজে হাদিসও বর্ণনা করেছেন; তবে তাঁদের মধ্য থেকে শুধু উসামা ইবনে জায়দ লায়ছি[৫] ব্যতিত

টীকা- ১. শরহে মা'আনিল আছার, باب الوقت الذى يصلى فيه الفجر اى وقت هو এতে من الغلس শব্দটির অস্তিত্ব একেবারেই নেই। এটা স্পষ্ট প্রমাণ যে, এ শব্দটি রাবির পক্ষ থেকে অনুপ্রবিষ্ট, যা প্রমাণ নয়। আর যদি অসম্ভবকে মেনে নিয়ে শুধু না চেনার দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হয় তাহলে এর জবাব হলো, এই না চেনার কারণ ছিলো চাদর, অন্ধকার এর কারণ নয়। আর যদি মেনে নেওয়া হয় যে, আসল হাদিসে من الغلس শব্দ আছে তাহলেও এর দ্বারা প্রমাণ পূর্ণাঙ্গ হয় না। কেনোনা অনেকে জবাব দিয়েছেন যে, মূলত তখন মসজিদে নববির দেওয়ালগুলো ছোট ছিলো, ছাদ নিচু ছিলো, তাতে জানালাগুলোও ছিলো না। এজন্য আকাশ ফর্সা হওয়ার পরও সেখানে অন্ধকার থেকে যেতো। যার ফলে মহিলাদেরকে চেনা যেতো না।

টীকা- ২. এই হাদিসটি ইমাম তিরমিযী (র.) বর্ণনা করেছেন, باب ماجاء فى الوقت الأول من الفجر এবং আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, باب المحافظة على وقت الصلوات এর মধ্যে।

টীকা- ৩. শরহে মা'আনিল আছার, اول باب الوقت الذى يصلى فيه الفجر اى وقت هو

টীকা- ৪. আবু দাউদ : ১/৫৭, বাবুল মাওয়াকিত।

টীকা- ৫. ইবনে খুজায়মা বলেন, এই অতিরিক্ত অংশটুকু উসামা ইবনে জায়দ ব্যতিত আর কেউ বর্ণনা করেননি। সহিহ ইবনে খুজায়মা ১/১৮১, হাদিস নং ৩৫২, باب كراهية تسمية صلوة العشاء عتمة দ্রষ্টব্য : ফাতহুল বারি : ২/৫. كتاب مواقيت الصلوة

কেউ নামাজের ওয়াক্ত সংক্রান্ত অংশটুকু বর্ণনা করেননি। এটুকু শুধু উসামা ইবনে যায়দ লায়ছি (র.) বর্ণনা করেছেন, এটুকু শুধু তারই বর্ণনা।

সুতরাং, তাঁর এ বর্ণনা অন্যান্য ইমামের বর্ণনার মুকাবেলায় মা'লূল (ত্রুটিপূর্ণ)। কারণ, উসামা ইবনে জায়দকে (র.) নির্ভরযোগ্য মেনে নিলেও অন্য রাবিগণ তাঁর তুলনায় আরও অধিক সেকাহ। তাছাড়া এই হাদিসে জোহরের নামাজ সম্পর্কে এসেছে,[১] ربما اخرها (الظهر) اذا اشتد الحر ' প্রচণ্ড গরমের সময় কখনও কখনও জোহরের নামাজ দেরি করেছেন।'

শাফেয়ি মতাবলম্বীদের চতুর্থ প্রমাণ হলো, হজরত আবু বকর, উমর (রা.) অন্ধকারে নামাজ পড়তেন। এর জবাব হলো, শাফেয়িদের প্রমাণ তখন পূর্ণাঙ্গ হতে পারে যখন প্রমাণিত হবে যে, তাঁরা অন্ধকারে নামাজ পড়ে অন্ধকারেই শেষ করতেন। অথচ এ বিষয়টি প্রমাণিত নয়; বরং এর উল্টা প্রমাণিত। এ কারণে, মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে[২] বর্ণিত আছে,

عن انس (رضـ) أن بكر قرأ فى صلوة الصبح بالبقرة فقال له عمر حين فرغ كربت الشمس ان تطلع قال لو طلعت لم تجدنا غافلين .

'হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, হজরত আবু বকর (রা.) ফজরের নামাজে সূরা বাকারা পাঠ করলেন। তখন উমর (রা.) তাঁকে নামাজ থেকে অবসর হওয়ার পর বললেন, সূর্য উদিত হওয়ার সময়তো নিকটবর্তী হয়ে গেছে। জবাবে আবু বকর (রা.) বলেছেন, যদি সূর্য উদিত হয়ে যায় তবে তুমি আমাদের উদাসীন পাবে না।'

তার মুকাবেলায় হানাফিদের প্রমাণাদি নিম্নেযুক্ত,

১. পরবর্তী অধ্যায়ে হজরত রাফে' ইবনে খাদিজ (রা.)-এর মারফু বর্ণনা আসছে, যেটি সিহাহ সিত্তার সব গ্রন্থকার লিখেছেন, এই বর্ণনাটি এ অনুচ্ছেদে বিশুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট। আর সেটি হলো, اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر (ফজর নামাজ ভালো করে ফর্সা হলে আদায় কর। কারণ এতে সর্বাধিক সওয়াব রয়েছে।)

শাফেয়ি মতাবলম্বীগণ এর এই ব্যাখ্যা দেন যে, এখানে ইসফারের অর্থ ফজর স্পষ্ট হওয়া। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি প্রথমতো স্পষ্ট বিষয়ের পরিপন্থি। দ্বিতীয়তো এই হাদিসের কোনো কোনো সূত্রে এই ব্যাখ্যার রদ হচ্ছে। কেনোনা নাসায়িতে[৩] সহিহ সনদে এই হাদিসের শব্দগুলো বর্ণিত আছে।

ما اسفرتم بالصبح فانه اعظم للاجر ٤. 'যতো বেশি ফর্সা করে ফজরের নামাজ পড়বে সওয়াব তাতে ততোই বেশি।'

'আল-মাতালিবুল আলিয়াতে' হাফেজ ইবনে হাজার (র.) নিম্নেযুক্ত এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে,

ইবনে হাব্বান[৫] (র.) এ হাদিসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন,

اصبحوا بالصبح فانكم كلما اصبحتم بالصبح كان اعظم لاجوركم .

এর অর্থ হলো, যতো বেশি ফর্সা করবে ততোই সওয়াব বেশি হবে। অথচ ফজর একবার স্পষ্ট হয়ে গেলে তাতে আর কোনো সংযোগ বা বৃদ্ধি হয় না।

২. সহিহ বোখারিতে[৬] হজরত আবু বারজাহ আসলামি (রা.)-এর একটি সুদীর্ঘ হাদিস আছে, তাতে নবী কারিম (সা) বলেছেন,

---

টীকা- ১. আবু দাউদ : ১/৫৭ باب المواقيت
টীকা- ২. ১/৩৫৩, ما يقرأ صلوة الفجر
টীকা- ৩, নাসায়ি ১ম খণ্ড, বাবুল ইসফার।
টীকা- ৪. আল মাতালিবুল আলিয়া : ১/৭৪, হাদিস নং ২৫৮।
টীকা- ৫. মাওয়ারিদুজ্ জম'আন : ৮৯, হাদিস নং ২৬৩।
টীকা- ৬. হায়সামি (র.) বর্ণনা করেছেন, জাওয়ায়িদ : ১/৩১৬, باب وقت صلوة الصبح عن الطبرانى فى الكبير واخرجه ايضا الطيالسى . تعليق المطالب العالية ١/ ٧٤

وكان ينفتل من صلوة الغداة حين يعرف الرجل جليسه -

'ফজর নামাজ থেকে তিনি তখন ফিরতেন, যখন একজন ব্যক্তি তার পাশে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে চিনতে পারতো।'

প্রকাশ থাকে যে, মসজিদে নববির দেওয়ালগুলো ছোট ছিলো এবং ছাদ ছিলো নিচে। সুতরাং মসজিদের ভেতরে পাশের লোকজনকে চেনা তখনই সম্ভব ছিলো যখন বাইরে পূর্ণ ফর্সা হয়ে যায়।

মু'জামে তাবারানি, কামিলে ইবনে আদি, মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, মুসতাদরাকে হাকেম ইত্যাদিতে হাদিস আছে যে, হজরত বিলাল (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

نور بصلوة الصبح حتى يبصر القوم مواقع نبله من الإسفار -[1]

'ফজরের নামাজ পড়ো ভালো করে ফর্সা হলে। যখন কওমের লোকজন ফর্সা হওয়ার কারণে তাদের তীর ছোড়ার স্থান দেখতে পায়।'

এই প্রকার[2] তালখিসুল হাবির : ১/১৮২তে হাফেজ ইবনে হাজার (র.) ও বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদে কোনো রকম আপত্তি তোলেননি। অবশ্য বলেছেন, এ হাদিস হজরত আয়েশা (রা.)-এর সে বর্ণনার বিপরীত যাতে তিনি বলেছেন,

ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوة لوقتها الاخر حتى قبضه الله -[3]

'রাসূলুল্লাহ ﷺ আমৃত্যু শেষ সময়ে নামাজ আদায় করেননি।'

তবে হাফেজ ইবনে হাজার (র.)-এর এ প্রশ্ন এজন্য ঠিক নয় যে, প্রথমতো এ হাদিসটি জয়িফ। আর যদি এর কোনো সূত্র সঠিক হয়, তাহলেও তাতে হজরত আয়েশা (রা.)-এর উদ্দেশ্য রাসূল ﷺ-এর সাধারণ অভ্যাস বর্ণনা করা যে, তিনি নামাজের সম্পূর্ণ শেষ ওয়াক্তে কখনও আদায় করতেন না। আর ইসফার তথা পুরোপুরি ফর্সা হওয়া শেষ ওয়াক্তে হয় না।

৪. শায়খাইন তথা বোখারি ও মুসলিম হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যেটি ইমাম আবু দাউদ (র.) বর্ণনা করেছেন। তাতে হজরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন,

ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلوة الا لوقتها الا بجمع (اى المزدلفة) فانه جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى صلوة الصبح من الغد قبل وقتها[3] -

'রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি কখনও ওয়াক্ত ব্যতিত অন্য কোনো সময়ে নামাজ আদায় করতে দেখিনি, শুধুমাত্র মুজদালিফা ব্যতিত। কেনোনা সেখানে তিনি মাগরিব এবং এশার নামাজ একত্রে আদায় করেছেন। আর পরবর্তী দিন ফজরের নামাজ আদায় করেছেন, ওয়াক্তের আগে।'

এখানে قبل وقتها দ্বারা উদ্দেশ্য সর্বসম্মতিক্রমে قبل وقتها المعتاد (স্বাভাবিক সময়ের আগে) এবং প্রমাণিত যে, মুজদালিফায় সকালে রাসূল ﷺ অন্ধকারে আদায় করেছিলেন। হজরত ইবনে মাসউদ (রা.) এটাকে স্বাভাবিক ওয়াক্তের পূর্বে সাব্যস্ত করেছেন। যা দ্বারা বোঝা গেলো, রাসূল ﷺ-এর সাধারণ রীতি ছিলো ফর্সা হলে নামাজ পড়া।

টীকা- ১. ইমাম তাবারানি (র.)-এর 'আল-কাবিরে' হজরত রাফে (রা.)-এর হাদিস রয়েছে সেটি হলো,

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نوروا بالصبح بقدر ما يبصر القوم مواقع نبله . (مجمع الزوائد : ٣١٦/١ . باب وقت صلوة الصبح . مرتب

'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা ফজরের নামাজ এতোটুকু ফর্সা হওয়ার পর আদায় করো, যখন কওমের লোকজন তাদের তীর নিক্ষেপের স্থল দেখতে পায়।'

টীকা- ২. দারাকুতনি : ১/২৪৯ باب النهى عن الصلوة الفجر وبعد صلوة العصر

টীকা- ৩. হাদিসের শব্দ আবু দাউদের-১/২৬৭ كتاب المناسك باب الصلوة بجمع

৫. ইমাম তাহাবি (র.) হজরত ইবরাহিম নাখয়ি (র.)-এর এই বক্তব্য বর্ণনা করেছেন,

ما اجتمع اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شئ ما اجتمعوا على التنوير[১] -

'অন্য কোনো বিষয়ে সাহাবিগণ এমন একমত হননি, যেমন একমত হয়েছেন ফর্সা হওয়ার পর ফজর আদায়ের ব্যাপারে।'

হানাফিদের প্রাধান্যের একটি কারণ এটাও যে, তাঁদের দলিলগুলো বাচনিকও এবং কর্মবাচকও। কিন্তু শাফেয়িদের প্রমাণগুলো শুধু ক্রিয়াবাচক। অথচ প্রধান হয়ে থাকে বাচনিক হাদিস।

ফর্সা হলে নামাজ পড়বে না অন্ধকারে– এ সম্পর্কে হজরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি (র.) হাদিসের বৈপরীত্য অবসানের জন্য একটি পন্থা অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেন, আসল হুকুম তো এটাই যে, ফর্সা হলে নামাজ পড়া উত্তম। এ কারণে প্রিয়নবী ﷺ হজরত রাফে' (রা.) থেকে বর্ণিত নিজ বাচনিক হাদিসে এই নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু কার্যত তিনি অন্ধকারেও প্রচুর নামাজ পড়েছেন। এর কারণ ছিলো, প্রায় সমস্ত সাহাবি তাহাজ্জুদ নামাজে অভ্যস্ত ছিলেন। আর যেখানে তাহাজ্জুদগুজারদের এতো আধিক্য থাকবে, সেখানে তাদের সহজের খাতিরে অন্ধকারে নামাজ পড়া উত্তম হয়ে থাকে। যেটা হানাফিদের মাজহাব।

অন্ধকারে নামাজ পড়া উত্তম রমজানে। যদি অন্ধকারে জামাত হাজির হয়ে যায়, অথবা অন্ধকারে নামাজিদের সংখ্যা বেশি হয়, তখন হানাফিগণও অন্ধকারে নামাজ পড়া উত্তম বলেন। অতএব, প্রিয়নবী ﷺ-এর আমল এই বিশেষ (তাহাজ্জুদের নামাজ)-এর ভিত্তিতে বেশির ভাগ অন্ধকারের সময় ছিলো। কিন্তু যেখানে এই কারণ বর্তমান থাকবে না, সেখানে আসল হুকুম প্রত্যাবর্তন করবে তথা ফর্সার সময় নামাজ পড়ো।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْاِسْفَارِ بِالْفَجْرِ (ص ٤٠)

অনুচ্ছেদ- ৩ : ফর্সা হলে ফজরের নামাজ পড়া (মতন ৪০)

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ -

১৫৪. অর্থ : হজরত রাফে' ইবনে খাদিজ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, তোমরা ফজরের নামাজ আদায় করো ফর্সা হলে। কেনোনা, তাতে সর্বাধিক সওয়াব রয়েছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু বারজাহ, জাবের ও বিলাল (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। এই হাদিসটি শু'বা এবং সাওরি মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হতে বর্ণনা করেছেন। এ হাদিসটি আর মুহাম্মদ ইবনে আজলানও বর্ণনা করেছেন আসেম ইবনে উমর ইবনে কাতাদা হতে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, রাফে' ইবনে খাদিজের হাদিসটি حسن صحيح। একাধিক আলেম সাহাবি ও তাবেয়ি থেকে ফজরের নামাজ ফর্সা হলে আদায় করার কথা বিবৃত হয়েছে। সুফিয়ান সাওরি (র.) এমতই পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক (র.) বলেছেন, 'ইসফার' শব্দের অর্থ হলো, ফজর স্পষ্ট হয়ে যাওয়া। তাতে কোনো সন্দেহ না থাকা। ইসফারের অর্থ তাঁরা নামাজ দেরি করে পড়া মনে করেন না।

টীকা- ১. শরহে মা'আনিল আছার : ১ম খণ্ড, كتاب الصلوة فى اخر باب الوقت الذى يصلى فيه الفجر اى وقت هو এবং ইবনে আবি শায়বাও এ হাদিসটি মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ১/৩২২তে বর্ণনা করেছেন। كتاب الصلوات من كان ينوربها ويسفر ولا يراى به بأسا

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّعْجِيْلِ بِالظُّهْرِ (ص ٤٠)

অনুচ্ছেদ- ৪ : জোহরের নামাজ তাড়াতাড়ি আদায় করা প্রসঙ্গে (মতন ৪০)

حدثنا هناد نا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن ابراهيم عن الاسود عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ مَا رَأَيْتُ اَحَدًا كَانَ اَشَدَّ تَعْجِيْلاً لِلظُّهْرِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا مِنْ اَبِىْ بَكْرٍ وَلَا مِنْ عُمَرَ (رض) ۔

১৫৫. অর্থ : হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর, উমর (রা.) অপেক্ষা কাউকে আমি জোহর নামাজ এতো আগে পড়তে দেখিনি।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, খাব্বাব আবু বারজাহ, ইবনে মাসউদ, জায়দ ইবনে সাবেত, আনাস ও জাবের ইবনে সামুরা (রা.) থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) **বলেছেন,** আয়েশা (রা.)-এর হাদিসটি حسن। এটাই অবলম্বন করেছেন সাহাবি ও তৎপরবর্তী ওলামায়ে কেরাম। আলি বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ বলেছেন, শো'বা হাকেম ইবনে জুবায়ির সম্পর্কে আপত্তি তুলেছেন ইবনে মাসউদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত তাঁর একটি হাদিসের কারণে। সেটি হলো, যে মানুষের কাছে সওয়াল করবে অথচ, তার কাছে এ পরিমাণ সম্পদ আছে যা তাকে অমুখাপেক্ষী রাখে ভিক্ষা থেকে।

ইয়াহইয়া বলেছেন, সুফিয়ান ও জাইদাও এমন হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া তাঁর হাদিসে কোনো ত্রুটি দেখেননি। মুহাম্মদ বলেছেন, হাকেম ইবনে জুবায়র-সায়িদ ইবনে জুবায়র-আয়েশা (রা.)-এর সনদে নবী করিম ﷺ থেকে জোহরের নামাজ আগে পড়া সংক্রান্ত হাদিস রয়েছে।

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ ۔

১৫৬. অর্থ : হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য হেলার পর জোহরের নামাজ পড়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন, এ হাদিসটি সহিহ।

দরসে তিরমিযী

كان اشد تعجيلا بالظهر : ইমাম শাফেয়ি (র.) এ হাদিস দ্বারা প্রমাণ করে বলেন, জোহর নামাজ আগে পড়া মোস্তাহাব। এর পরিপন্থি হানাফি এবং হাম্বলিদের মতে শীতের সময় আবেগ আগে আর গরমের সময় দেরিতে পড়া উত্তম। হানাফিদের মতে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস এবং আগে পড়া সংক্রান্ত অন্যান্য হাদিস প্রযোজ্য শীতের মৌসুমের ক্ষেত্রে। হানাফিদের প্রমাণাদি নিম্নেযুক্ত,

১. হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিস পরবর্তী অনুচ্ছেদ। এটি বোখারি-মুসলিমেও রয়েছে,

اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلوة فان شدة الحر من فيح جهنم [1] ۔

'নামাজ ঠাণ্ডা সময়ে আদায় করো প্রচণ্ড গরমে। কেনোনা গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের প্রভাব বিস্তারের কারণে।'

টীকা- ১. বোখারি শরিফ : ১/৭৬, كتاب مواقيت الصلوة، باب الابراد بالظهر فى شدة الحر -এর অধীনে এ হাদিসটি হজরত আবু হুরায়রা (রা.) ব্যতীত হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে। –সংকলক

২. সহিহ বোখারিতে[১] বর্ণিত হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)-এর হাদিস,

قال كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا اشتد البرد بكر بالصلوة واذا اشتد الحر ابرد بالصلوة[২].

প্রচণ্ড শীতের সময় রাসূলে আকরাম ﷺ নামাজ আগে পড়তেন, আর প্রচণ্ড গরমের সময় নামাজ ঠাণ্ডা সময়ে পড়তেন।'

এই বর্ণনাটি বিশুদ্ধ এবং স্পষ্ট এবং এর দ্বারা সবগুলো বর্ণনার মাঝে সুন্দররূপে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়। ইমাম বোখারি (র.) এমন অর্থবোধক অনেক বর্ণনা সহিহ বোখারিতে বর্ণনা করেছেন।[৩] ইমাম শাফেয়ি (র) ওপরযুক্ত হাদিসের এই ব্যাখ্যা করেন যে, এটা তখনকার জন্য প্রযোজ্য, যখন লোকজন দূর থেকে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে আসে। তাদের প্রতি লক্ষ্য রেখে নামাজ দেরিতে পড়া উত্তম। কিন্তু স্বয়ং ইমাম তিরমিযী (র.) এই ব্যাখ্যাটি রদ করে দিয়েছেন। প্রমাণস্বরূপ হজরত আবু জর গিফারি (রা.)-এর হাদিস পেশ করেছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ সফরের অবস্থায় হজরত বিলাল (রা.)-কে বারবার পরিবেশ ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কোনো ব্যক্তি দূর থেকে আসার সম্ভাবনাও ছিলো না আর সফরে সমস্ত সাথি তার সাঙ্গে ছিলেন।

قوله ولم يرى يحيى بحديثه بأسا : ইয়াহইয়ার নিচে টীকাকার লিখে রেখেছেন ইয়াহইয়া ইবনে মাইন। কিন্তু হজরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, এটা ভুল। মূলত এখানে ইয়াহইয়া দ্বারা উদ্দেশ্য ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল-কাত্তান। কেনোনা 'তাহজবুত্ তাহজিবে' হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াহইয়া ইবনে মাইন হাকেম ইবনে জুবাইরকে বলেছেন গায়রে সেকাহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ تَاخِيْرِ الظُّهْرِ فِىْ شِدَّةِ الْحَرِّ (ص ٤٠)

অনুচ্ছেদ- ৫ : জোহরের নামাজ প্রচণ্ড গরমে দেরিতে আদায় করা প্রসঙ্গে (মতন ৪০)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلٰوةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

১৫৭. অর্থ : হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যখন গরম প্রচণ্ড আকার ধারণ করে তখন ঠাণ্ডা হলে তোমরা নামাজ পড়। কেনোনা গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের প্রভাব বিস্তারের কারণে হয়।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু সাইদ, ইবনে উমর, মুগিরা, কাসিম ইবনে সাফওয়ানের পিতা আবু মূসা, ইবনে আব্বাস ও আনাস (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। উমর (রা.) সূত্রে নবী কারিম ﷺ থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তবে এটি সহিহ নয়।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح। একদল আলেম প্রচণ্ড গরমকালে জোহরের নামাজ দেরি করে পড়ার বিষয়টি পছন্দ করেছেন। এটা হলো, ইবনে মুবারক, আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর মত। ইমাম শাফেয়ি (র.) বলেছেন, জোহরের নামাজ ঠাণ্ডা সময়ে পড়া কেবল সে ক্ষেত্রেই যখন মসজিদে লোকজন দূর থেকে পালাক্রমে উপস্থিত হয়। কিন্তু একা মুসল্লি আর যে কওমের মসজিদে নামাজ পড়ে তার ক্ষেত্রে আমার কাছে পছন্দনীয় হলো, প্রচণ্ড গরমে নামাজ বিলম্ব না করে আদায় করা।

টীকা- ২. বোখারি : ১/১২৪, كتاب الجمعة باب اذا اشتد الحر يوم الجمعة

টীকা- ৩. বোখারি শরিফে পরবর্তী এই শব্দও বর্ণিত আছে,– يعنى الجمعة কিন্তু এই স্থানে ইউনুস ইবনে বুকাইরের বক্তব্যও বর্ণিত আছে যে, আবু খালদা বলেছেন, রাবি নামাজের কথা উল্লেখ করেছেন, জুম'আর কথা উল্লেখ করেননি। –সংকলক

টীকা- ৪. তাছাড়া নাসায়ি : ১ম খণ্ড كتاب المواقيت، باب تعجيل الظهر فى البرد -এ হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الحر ابرد بالصلوة واذا كان البرد عجل . از مرتب

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, প্রচণ্ড গরমের সময় জোহর দেরি করার মত যারা অবলম্বন করেছেন, তাদের সে মতটি উত্তম এবং অনুসরণের অধিকযোগ্য। আর ইমাম শাফেয়ি (র.) যে মত অবলম্বন করেছেন যে, এই অনুমতি সে ব্যক্তির জন্য যে মসজিদে দূরবর্তী স্থান থেকে পালাক্রমে আসে এবং লোকজনের কষ্ট হওয়ার কারণে প্রমাণিত হয় এটি আবু জর (রা.)-এর হাদিসের বিপরীত।

আবু জর (রা.) বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফরে ছিলাম, বিলাল (রা.) জোহরের নামাজের আজান দিলেন। নবী করিম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, বিলাল! আরেকটু ঠাণ্ডা হতে দাও। তারপর তিনি ঠাণ্ডা সময়ে নামাজ আদায় করেছেন। যদি ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মাজহাব মতোই বিষয়টি হতো তাহলে তখন ঠাণ্ডা সময়ে নামাজ আদায়ের কোনো অর্থ হয় না। কেনোনা, সফরে তারা সকলেই একত্রে ছিলেন। দূরবর্তী স্থান থেকে পালাক্রমে আসার কোনো প্রয়োজন তাঁদের ছিলো না।

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِىْ سَفَرٍ وَمَعَهٗ بِلَالٌ فَاَرَادَ اَنْ يُّقِيْمَ فَقَالَ اَبْرِدْ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُّقِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَبْرِدْ فِى الظُّهْرِ قَالَ حَتّٰى رَاَيْنَا فَيْئَ التُّلُوْلِ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلّٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلٰوةِ .

১৫৮. অর্থ : হজরত আবু জর (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল ﷺ এক সফরে ছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন, হজরত বিলাল (রা.)। তিনি ইকামত দিতে চাইলেন। তাই নবীজি (স.) বললেন, ঠাণ্ডা সময়ে নামাজ আদায় কর। তারপর তিনি পুনরায় ইকামত দিতে চাইলেন। নবী করিম ﷺ বললেন, জোহর নামাজ ঠাণ্ডা সময় পড়ো। বর্ণনাকারি বলেন, এমনকি আমরা তখন টিলাগুলোর ছায়া দেখেছি। এরপর বিলাল (রা.) ইকামত দিলেন এবং নবী করিম ﷺ নামাজ পড়লেন। তারপর তিনি বললেন, নিশ্চয় গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের প্রভাব বিস্তারের কারণে। সুতরাং নামাজ ঠাণ্ডা সময়ে পড়ো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

فان شدة الحر من فيح جهنم : প্রশ্ন : উল্লিখিত হাদিসে গরম ও ঠাণ্ডার কারণ তো সূর্যের নৈকট্য ও দূরত্ব, তাহলে জাহান্নামের প্রভাবকে এর কারণ কিভাবে বলা হলো?

জবাব : তন্মধ্যে এর বিভিন্ন জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রথম জবাব হলো, বিভিন্ন কারণের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ নেই; বরং একই জিনিসের কয়েকটি কারণ হতে পারে। গরমেরও বিভিন্ন কারণ হয়ে থাকে। সূর্যের নৈকট্য ও দূরত্ব ব্যতিত সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে উচ্চতা, জমিন শক্ত-নরম হওয়া, হাওয়া-বাতাসের রুখের প্রতি লক্ষ্য করে মৌসুমের পরিবর্তন হতে থাকে। অন্যথায় যদি সূর্যের নৈকট্য গরমের কারণ হতো তবে সিব্বি ও কোয়েটার মৌসুমগুলোতে এতোটা পার্থক্য হতো না। অথচ দুটি স্থানই কাছাকাছি এবং উভয়ের মধ্যবর্তী রেখার একই পার্শ্বে। সুতরাং যেখানে গরমের আরও অনেক কারণ হতে পারে সেখানে জাহান্নামের প্রভাবও একটি কারণ হলে অযৌক্তিকতার কি আছে?

দ্বিতীয় জবাব হলো, শুধু সূর্যকেই যদি উষ্ণতার কারণ মানা হয় তাহলে সূর্যের মধ্যে উষ্ণতার কারণ জাহান্নামের প্রভাব বলা যায়। এমনভাবে জাহান্নামের প্রভাব পৃথিবীর উষ্ণতার কারণের কারণ হবে। যেনো সূর্য পৃথিবীর উষ্ণতার নিকটবর্তী কারণ, আর জাহান্নাম দূরবর্তী কারণ। এজন্য এমন বলা যায় যে, পৃথিবীতে উষ্ণতার কারণও জাহান্নাম। এসব আলোচনা তখন হবে যখন من فيح جهنم এ من শব্দটিকে কারণের অর্থে সাব্যস্ত করা হবে। কিন্তু অনেকে এখানে من টিকে উপমার অর্থে সাব্যস্ত করেছেন। এ সময় উদ্দেশ্য হবে প্রচণ্ড গরম জাহান্নামের প্রভাবের মতো। এ বিষয়টি আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের লক্ষ্য সাব্যস্ত করলে অধিক যুক্তিযুক্ত হবে। কেনোনা, এ সময় কোনো প্রশ্নোত্তরের প্রয়োজন নেই।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ تَعْجِيْلِ الْعَصْرِ (ص ٤١)

অনুচ্ছেদ- ৬ : আসরের নামাজ তাড়াতাড়ি আদায় করা প্রসঙ্গে (মতন ৪১)

حدثنا قتيبة نا الليث عن ابن شهاب عن عروة عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّهَا قَالَتْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَلْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِىْ حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْئُ مِنْ حُجْرَتِهَا .

১৫৯. অর্থ : হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের নামাজ আদায় করেছেন এমন সময় যখন সূর্যের আলো তাঁর হুজরায়। ছায়া তাঁর হুজরা থেকে সরে দেওয়ালে ওঠেনি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আনাস, আবু ওরওয়া, জাবের ও রাফে' ইবনে খাদিজ (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। আসর নামাজ দেরি করা সম্পর্কে রাফে' (রা.) সূত্রে নবী করিম ﷺ থেকে হাদিস বর্ণিত আছে। তবে এটি বিশুদ্ধ নয়।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আয়েশা (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح। এটাই অবলম্বন করেছেন একাধিক সাহাবি ও তাবেয়ি। এসব সাহাবির মধ্যে রয়েছেন, উমর, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আয়েশা ও আনাস (রা.)। তাঁদের মতে আসরের নামাজ আগে পড়া হবে। এটা দেরি করা তাঁদের মতে মাকরূহ। এ মতই পোষণ করেন আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক (র.)।

عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهٗ دَخَلَ عَلٰى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِىْ دَارِهٖ بِالْبَصْرَةِ حِيْنَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ وَدَارُهٗ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ قُوْمُوْا فَصَلُّوا الْعَصْرَ قَالَ فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا ...الخ

১৬০. অর্থ : হজরত আলা ইবনে আব্দুর রহমান হতে বর্ণিত যে, তিনি আনাস ইবনে মালেক (রা.)-এর বসরায় অবস্থিত বাড়িতে এমন সময় প্রবেশ করেছেন, যখন তিনি জোহর হতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তাঁর বাড়ি ছিলো মসজিদের পার্শ্বে। তারপর তিনি বললেন, তোমরা প্রত্যেকেই আসরের নামাজ আদায় কর। রাবি বলেছেন, তারপর আমরা প্রস্তুতি নিয়ে নামাজ পড়লাম। তারপর প্রত্যাবর্তন করলাম। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, সেটা হলো মুনাফিকের নামাজ। সে বসে অপেক্ষা করতে থাকে, এমনকি যখন সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝে দাঁড়ায় তখন সে দাঁড়িয়ে চারটি ঠোকর মারে। সে আল্লাহর কথা স্মরণ করে খুবই কম।

দরসে তিরমিযী

والشمس فى حجرتها لم يظهر الفئ من حجرتها : لم يظهر শব্দটি ظهر থেকে নির্গত। বাবে فتح হতে। এর অর্থ হলো, পিঠের ওপর আরোহণ করা। উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাসূল ﷺ এমন সময় আসরের নামাজ পড়েছেন যখন সূর্যের তাপ হজরত আয়েশা (রা.)-এর হুজরার মেঝের ওপর ছিলো, দেওয়ালের ওপর উঠেনি। এই হাদিসটিকে শাফেয়ি মতাবলম্বীগণ আসরের নামাজ আগে আদায় করা মোস্তাহাব- এ ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য পেশ করেন। কিন্তু যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করা যায়, তাহলে এর দ্বারা প্রমাণ পূর্ণাঙ্গ হয় না। কারণ, হুজরা শব্দটি মূলত ছাদবিহীন ইমারতের জন্য ব্যবহার হয়। আবার কখনও কখনও ছাদ বিশিষ্ট ইমারতের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ হয়। এখানে দুটি সম্ভাবনাই রয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, এখানে দ্বিতীয় অর্থ তথা ছাদবিশিষ্ট ইমারতই উদ্দেশ্য। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হজরত আয়েশা (রা.)-এর কক্ষ। প্রকাশ থাকে যে, এমতাবস্থায় সূর্যের আলো ঘরে আসার পথ শুধু দরজাই হতে পারে। আর হজরত আয়েশা (রা.)-এর কক্ষের দরজা ছিলো পশ্চিম দিকে। কিন্তু যেহেতু ছাদ ছিলো নিচু এবং দরজাও ছিলো ছোট, এজন্য তাতে সূর্যের আলো তখন ভেতরে আসতে পারে যখন সূর্য পশ্চিম দিকে অনেকটুকু নিচে চলে যায়। সুতরাং হানাফিদের মাজহাব মুতাবেক এ হাদিসটি আসর দেরিতে

পড়ার প্রমাণ হলো, আগে পড়ার নয়। আর যদি এর দ্বারা ছাদবিহীন ইমারত উদ্দেশ্য হয়, যেমন 'ওয়াফাউল ওয়াফা বিআখবারি দারিল মোস্তফা' নামক গ্রন্থে আল্লামা সামহুদি (র.) বলেছেন যে, এই হাদিসে হুজরা দ্বারা উদ্দেশ্য ছাদবিহীন ইমারত এমতাবস্থায় সূর্যের আলো কক্ষে প্রবেশ করার পথ হবে ছাদের দিক, তথা ওপর দিক। কিন্তু যেহেতু দেওয়ালগুলো ছোট ছিলো এজন্য সূর্য অনেক্ষণ পর্যন্ত হুজরার ওপরে থাকতো। আর সূর্যের আলো দেওয়ালের ওপর পড়তো একেবারে শেষ সময়ে। তাই এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় না আসরের নামাজ আগে পড়ার। দেরিতে আসরের নামাজ পড়া মোস্তাহাব এর ওপর হানাফিদের প্রমাণ পরবর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত হজরত উম্মে সালামা (রা.)-এর বর্ণনা,

قالت كان رسول الله لى صلى الله عليه وسلم اشد تعجيلا للظهر منكم وانتم اشد تعجيلا للعصر منه ـ

তোমাদের চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ জোহর আরও অনেক আগে আদায় করতেন। আর তাঁর চেয়েও তোমরা আসর আগে আদায় করো।'

২. মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হজরত রাফে' ইবনে খাদিজ (রা.)-এর বর্ণনা, যা দ্বারা আসর নামাজ দেরি করে পড়া মুস্তাহাব বোঝা যায়। বর্ণনাটি নিম্নেযুক্ত,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتاخير صلوة العصر[১] ـ

'রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিতেন আসরের নামাজ দেরি করে আদায় করতে।'

তবে ইমাম তিরমিযী (র.) এ হাদিসটি সম্পর্কে বলেছেন যে, এটি বিশুদ্ধ নয়। কিন্তু তাঁর এই বক্তব্যের ভিত্তি হলো, তিনি এই বর্ণনার রাবি আব্দুল ওয়াহিদকে জয়িফ মনে করেন। অথচ তিনি একজন বিতর্কিত বর্ণনাকারি। কেউ তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, আর কেউ বলেছেন জয়িফ। ইবনে হাব্বান (র.) 'কিতাবুজ জু'আফা'য় তাঁর আলোচনা করেছেন আবার 'কিতাবুস্ সিকাতে'ও উল্লেখ করেছেন। বরং আব্দুল ওয়াহিদকে যারা নির্ভরযোগ্য বলেছেন, তাদের সংখ্যা সমালোচকদের তুলনায় বেশি। তাই তাঁর হাদিস হাসান থেকেও নিচের না।

৩. মু'জামে তাবারানিতে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর আছর যে, তিনি আসরের নামাজ দেরিতে পড়তেন।[২] আল্লামা হায়সামি (র.) মাজমাউজ জাওয়ায়িদে বলেন, এর রাবিগণ সেকাহ। তাছাড়া মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা ইত্যাদিতে হজরত আলি (রা.)-এর অনুরূপ আমল বর্ণিত আছে।[৩]

قوموا فصلوا العصر : হানাফিদের মত হলো, এই বর্ণনা দ্বারা আসর আগে পড়ার ওপর প্রমাণ পেশ করা এজন্য ঠিক নয় যে, এই ঘটনা হলো হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের যুগের। যার সম্পর্কে এ বিষয়টি প্রসিদ্ধ- সে নামাজ অনেক দেরিতে পড়তো এবং কোনো কোনো সময় ওয়াক্ত পার করে দিতো। এ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, একবার সে জুম'আর খুতবা এতো দীর্ঘ প্রদান করেছিল যে, নামাজ কাজা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হলো। তখন মসজিদে উপস্থিত কোনো কোনো বুজুর্গ বসে বসে ইশারায় জোহর নামাজ আদায় করেছিলেন। সুতরাং আলা

টীকা- ১. মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ১/৩০৭, باب وقت صلوة العصر আল্লামা হায়সামি (র.) বলেন, ইমাম তাবারানি এটি কাবিরে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদও অনুরূপ অর্থবোধক হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাতে একটি ঘটনাও রয়েছে। কিন্তু এর তাবেয়ির নাম উল্লেখ করেননি। কিন্তু ইমাম তাবারানি তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে রাফে'। তাতে আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে নাফে' আল-কিলায়ি নামক একজন রাবিও রয়েছেন, তাঁকে ইবনে হাব্বান নির্ভরযোগ্যদের মধ্যেও লিখেছেন। আবার জয়িফদের অন্তর্ভুক্ত হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। والله اعلم, সংকলক।

টীকা- ২. আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াজিদ থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আসরের নামাজ দেরি করে পড়তেন। رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون (مجمع الزوائد جا صـ٣٠٧، باب وقت صلوة العصر ـ ازمرتب)

টীকা- ৩. হজরত আবু আউন হতে বর্ণিত যে, আলি (রা.) আসরের নামাজ দেরি করে পড়তেন। এমনকি সূর্যের আলো প্রাচীরের ওপর উঠে যেতো। সাওয়ার ইবনে শাইর থেকে বর্ণিত, তিনি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আসরের নামাজ দেরি করে পড়তেন। এমনকি আমি বলতাম সূর্য তো হলুদ বর্ণ ধারণ করে ফেললো। -মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ১/৩২৭ صـ كان يؤخر العصر ويرى تأخيرها ـ از مرتب

ইবনে আব্দুর রহমানের জোহর নামাজ পড়ে আসা এর প্রমাণ নয় যে, সে ওয়াক্তটি আসরের সম্পূর্ণ প্রাথমিক ওয়াক্ত ছিলো। আর যদি সম্পূর্ণ প্রাথমিক ওয়াক্ত হয়ে থাকে তাহলেও হজরত আনাস (রা.)-এর সে সময় নামাজ পড়া এ কথার প্রমাণ নয় যে, আসর আগে পড়া আফজাল।

এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, হজরত আনাস (রা.) আগে নামাজ পড়া মোস্তাহাব মনে করতেন। এজন্য নামাজের জন্য দাঁড়িয়েছেন এবং এটাও হতে পারে যে, হজরত আলা ইবনে আব্দুর রহমান হাজ্জাজের সাথে জোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর জোহর নামাজ কাজা পড়েছেন। আর যখন তিনি হজরত আনাস (রা.)-এর কাছে এসেছেন তখন আসর দেরিতে পড়ার মোস্তাহাব ওয়াক্ত আরম্ভ হয়ে গেছে।[১]

تلك صلوة المنافق : এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় না আসর নামাজ দেরিতে পড়া মাকরূহ-এর ওপর। কেনোনা এর দ্বারা উদ্দেশ্য সূর্য হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত দেরি করা। হানাফিদের মতে হলুদ আকার ধারণের পূর্ব পর্যন্ত দেরি করা মোস্তাহাব।

حتى اذا كان بين قرنى الشيطان : এর দ্বারা উদ্দেশ্য, সূর্য হলুদ আকার ধারণ করার পরবর্তী সময়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝে অবস্থানের কথা বহু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। অনেকে এটাকে উপমা ও রূপক অর্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরেছেন। আর হাদিসের অর্থ তাঁরা বলেছেন, শয়তানের প্রবলতা ও তার চাপ। আর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ের বৈশিষ্ট্য হলো, সূর্যপূজক কাফেররা এই সময়ে সূর্যের উপাসনা করে। এজন্য এই সময়গুলোতে নামাজ পড়া শয়তানের পূজা শামিল হওয়া।

ইমাম খাত্তাবি (র.) বলেছেন, এটি একটি উদাহরণ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যারা নামাজকে এ সময় পর্যন্ত বিলম্ব করে তারা যেনো শয়তানের হাতিয়ার। আর শয়তান নিজের শিংগুলো দ্বারা তাদেরকে মোস্তাহাব ওয়াক্তে নামাজ পড়া থেকে বিরত রেখেছে। কিন্তু অধিকাংশ আলেম এটাকে প্রকৃত অর্থে প্রযোজ্য ধরেন যে, শয়তান বাস্তবেই সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্যকে নিজের শিংয়ের মাঝে নিয়ে নেয়, যাতে সূর্য পূজকদের উপাসনায় শামিল হয়ে যায়।

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন উদয় হয় যে, পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তে সূর্য কোথাও না কোথাও উদয় হচ্ছে আবার কোথাও না কোথাও অস্ত যাচ্ছে। সুতরাং, এর অর্থ এই হয়, শয়তান সর্বদা সূর্যকে দুই শিংয়ের মাঝে নিয়ে রাখে।

জবাব : পৃথিবীতে শয়তান অগণিত রয়েছে। হতে পারে প্রতিটি উদয়স্থলের জন্য আলাদা আলাদা শয়তান আছে। সুতরাং কোনো প্রশ্ন থাকে না।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ تَاخِيْرِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ (ص ٤٢)

অনুচ্ছেদ- ৭ : আসরের নামাজ দেরি করে আদায় করা প্রসঙ্গে (মতন ৪২)

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَشَدَّ تَعْجِيْلًا لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ وَاَنْتُمْ اَشَدُّ تَعْجِيْلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ.

১৬১. অর্থ : হজরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জোহরের নামাজ তোমাদের চেয়ে অনেক আগে পড়তেন। আর তোমরা আসরের নামাজ তাঁর চেয়ে বেশি আগে আদায় করো।

টীকা- ১. এই দ্বিতীয় মাজহাবের ওপর আরেকটি প্রমাণ হলো, ইবনে আসেম হতে বর্ণিত ইবনে আবু শায়বার বর্ণনা। ইবনে আসেম বলেছেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা.)-এর নিকট প্রবেশ করলাম। (তারপর তিনি হাদিস, উল্লেখ করলেন।) বর্ণনাকারি বলেন, তারপর তাঁর নিকট একটি বাঁদি এসে বললো, নামাজ। আল্লাহ তা'আলা আপনার সংশোধন করুন। তিনি বললেন, কোনো নামাজ? বাঁদি বললো, আসরের নামাজ। তিনি বললেন, তুমি কি তা পড়ে ফেলেছো? বাঁদি বলল, আমি আপনার কাছে প্রবেশ করার পূর্বে পড়ে ফেলেছি। তিনি বললেন, পেছনে সরে যাও, এখনও আসরের নামাজের সময় হয়নি। তারপর বাঁদি আবার সে কথার পুনরাবৃত্তি করলো। তিনিও তাঁর প্রথম বক্তব্যের মত বক্তব্য করলেন। এরপর সে আবার তার কথার পুনরাবৃত্তি করলো। তখন আমি আনাস (রা.)-কে বললাম। তিনি বললেন, তুমি যা বলেছ আমি তা শুনেছি। আমাকে ওজুর পানি দাও। কেনোনা, লোকজন এই নামাজটি ওয়াক্ত আসার আগে পড়ে ফেলে। তারপর তিনি নামাজ পড়লেন। —আল মাতালিবুল আলিয়া : ১/৭৮, হাদিস নং ২৭২।

وَوَجَدْتُ فِيْ كِتَابِيْ : أَخْبَرَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ـ

১৬২. অর্থ : (শাকিব) আমার কিতাবে আমি পেয়েছি, আলি ইবনে হুজর আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, ইসমাইল ইবনে ইবরাহিম থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন, ইবনে জুরাইজ হতে।

وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَهٰذَا أَصَحُّ ـ

১৬৩. অর্থ : হজরত বিশর ইবনে মু'আজ আল-বসরি হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমাদেরকে ইসমাইল ইবনে উলাইয়্যাহ ইবনে জুরাইজ হতে এই সনদে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর এটি اصح।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, ইবনে জুরাইজ ইবনে আবি মুলাইকা উম্মে সালামা (রা.) সূত্রে এ হাদিসটি অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ (صـ ٤٢)

অনুচ্ছেদ- ৮ : মাগরিবের ওয়াক্ত প্রসঙ্গে (মতন ৪২)

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى الْمَغْرِبَ اِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ـ

১৬৪. অর্থ : হজরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাগরিবের নামাজ এমন সময়ে পড়তেন যখন সূর্য অস্তমিত হয়ে পর্দার আড়ালে চলে যেতো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এই অনুচ্ছেদে জাবের, জায়দ ইবনে খালেদ, আনাস, রাফে' ইবনে খাদিজ আবু আইয়ূব, উম্মে হাবিবা ও আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.) থেকে হাদিস বর্ণিত আছে। আব্বাস (রা.)-এর হাদিসটি তাঁর থেকে মারফু আকারে বর্ণিত আছে। এটি اصح

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, সালামা ইবনুল আকওয়া এর হাদিসটি حسن صحيح। এটা হলো, অধিকাংশ আলেম সাহাবি ও তৎপরবর্তী তাবেয়িনের মাজহাব। তাঁরা মাগরিবের নামাজ আগে পড়াটাই পছন্দ করেছেন এবং এটাকে দেরি করে পড়া মাকরূহ মনে করেছেন। এমনকি অনেক আলেম বলেছেন, মাগরিবের নামাজের জন্য এটাই ওয়াক্ত। তাঁরা 'জিবরাইল (আ.)-এর ইমামতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ পড়েছেন' সে হাদিস অনুযায়ী মত পোষণ করেছেন। ইবনে মুবারক ও শাফেয়ি (র.)-এর মাজহাব এটাই।

بَابُ مَاجَاءَ فِي وَقْتِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ (صـ ٤٢)

অনুচ্ছেদ- ৯ : এশার নামাজের ওয়াক্ত প্রসঙ্গে (মতন ৪২)

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رض) قَالَ اَنَا اَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيْهَا لِسُقُوْطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ ـ

১৬৫. অর্থ : হজরত নু'মান ইবনে বশির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি তোমাদের তুলনায় এই এশার নামাজের ওয়াক্ত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞান রাখি। তৃতীয়ার চাঁদ ডুবলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই নামাজ পড়তেন।

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ اَبِيْ عَوَانَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ

১৬৬. অর্থ : আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আবান........আবদুর রহমান ইবনে মাহদি-আবু আওয়ানা এই সনদে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, হুশাইম-আবু বিশর-হাবিব ইবনে সালেম-নু'মান ইবনে বশির (রা.) সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটিতে হুশাইম 'বিশর ইবনে সাবিত হতে' উল্লেখ করেননি।

আমাদের মতে আবু আওয়ানার হাদিসটি বিশুদ্ধতম। কেনোনা ইয়াজিদ ইবনে হারূন শো'বা সূত্রে আবু বিশর থেকে আবু আওয়ানার হাদিসের অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

দরসে তিরমিযী

يصليها لسقوط القمر لثالثة : অর্থাৎ, প্রিয়নবী ﷺ এশার নামাজ রাতের তৃতীয় রাতে চন্দ্র অস্তমিত হওয়ার সময় পড়তেন। এর দ্বারা বহু বেশি বিলম্ব প্রমাণিত হয়। কেনোনা জ্যোতিষীগণ বলেছেন যে, চাঁদ প্রতি রাত্রে প্রথম রাত্রের তুলনায় এক ঘণ্টা $\frac{৬}{৭}$(প্রায় ৪৮ মিনিট) আকাশে বেশি থাকে। এমনভাবে তৃতীয় তারিখে চাঁদের অস্তমিত হওয়া সূর্যাস্তের প্রায় আড়াই অথবা পৌণে তিন ঘণ্টা পরে হবে। এর দ্বারা রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরি করা মোস্তাহাব– এর প্রমাণ হতে পারে। অবশ্য চন্দ্রাস্তের এই সময় মৌসুম এবং দেশের পার্থক্যের কারণে সামান্য পরিবর্তিত হতে পারে। সুতরাং দেরি করার জন্য কোনো একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ণয় করা কঠিন।

قال ابو عيسى روى هذا الحديث هشيم عن ابى بشر : উদ্দেশ্য হলো, আবু বিশরের দু'জন শিষ্য এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন– একজন আবু আওয়ানা, দ্বিতীয়জন হুশাইম। উভয়ের মাঝে পার্থক্য হলো, আবু আওয়ানা সূত্রে আবু বিশর এবং হাবিব ইবনে সালেমের মাঝে বশির ইবনে সাবেতের সূত্র রয়েছে। আর হুশাইমের সূত্রে এই মধ্যস্থ রাবি অনুপস্থিত।

আবু আওয়ানার সূত্রটিকে ইমাম তিরমিযী (র.) বিশুদ্ধতম সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, শো'বাও আবু আওয়ায়ানার মুতাবা'আত করেছেন। কিন্তু অন্যান্য মুহাদ্দিস বলেছেন, শুধু প্রাধান্যের এই কারণ যথেষ্ট নয়। কেনোনা, দারাকুতনিতে হুশাইমের বর্ণনার মুতাবে'-এরও বরাত রয়েছে।

তাই হাফেজ মারদিনি (র.) বলেছেন, মূলত এই বর্ণনায় ইজতেরাব আছে। কিন্তু কোনো কোনো আলেম এই ইজতেরাবের অবসান এভাবে ঘটিয়েছেন যে, হুশাইম এবং আবু আওয়ানা উভয়েই নির্ভরযোগ্য। এজন্য হতে পারে আবু বিশর একবার এ হাদিসটি বশির ইবনে সাবেত সূত্রে শুনেছেন, যেটি বর্ণনা করেছেন আবু আওয়ানা। আর দ্বিতীয়বার হাবিব ইবনে সালেম থেকে প্রত্যক্ষভাবে শুনেছেন, যেটি বর্ণনা করেছেন হুশাইম। সুতরাং উভয় সূত্রই সহিহ এবং এ দুটির মাঝে কোনো বিরোধিতা নেই।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ تَاخِيْرِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ (صـ ٤٢)

অনুচ্ছেদ- ১০ : এশার নামাজ দেরি করে আদায় করা প্রসঙ্গে (মতন ৪২)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَاَمَرْتُهُمْ اَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ اَوْ نِصْفِهِ -

১৬৭. অর্থ : হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, আমি অবশ্যই নির্দেশ দিতাম যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম, তাহলে আমি তাদের অবশ্যই এশার নামাজকে রাতের একতৃতীয়াংশ অথবা অর্ধরাত পর্যন্ত দেরি করার জন্য।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

জাবের ইবনে সামুরা, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, আবু বারজাহ, ইবনে আব্বাস, আবু সায়িদ খুদরি, জায়দ ইবনে খালেদ ও ইবনে উমর (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح। এটাই অধিকাংশ সাহাবি ও তাবেয়ি পছন্দ করেছেন। তারা এশার নামাজ দেরিতে পড়ার মত পোষণ করেছেন। এ মতই অবলম্বন করেছেন আহমদ ও ইসহাক (র.)।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالسَّمَرِ بَعْدَهَا (صـ ٤٢)

অনুচ্ছেদ- ১১ : এশারের আগে ঘুমানো অত:পর গল্প-গুজব করা মাকরূহ প্রসঙ্গে (মতন ৪২)

عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا ـ

১৬৮. অর্থ : হজরত আবু বারজাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এশারের আগে নিদ্রা এবং গল্প-গুজব করা পছন্দ করতেন না।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আয়েশা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আনাস (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আবু বারজাহ (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح। অধিকাংশ আলেম এশার নামাজের পূর্বে ঘুমানো মাকরূহ মনে করেছেন। আর অনেকে এর অনুমতি দিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) বলেছেন, অধিকাংশ হাদিস এশার পূর্বে ঘুমানোকে মাকরূহ প্রমাণ করে। আর কোনো কোনো হাদিস রমজানের এশার নামাজের পূর্বে ঘুমানোর অনুমতি দিয়েছে।

দরসে তিরমিযী

قال أحمد وحدثنا : এটা হলো আহমদ ইবনে মানি'-এর পক্ষ হতে সনদ পরিবর্তন। যেনো ইবনে মানি' হুশাই, আব্বাদ এবং ইসমাইল ইবনে উলাইয়্যা তিনজন থেকে এই হাদিসটি শুনেছেন। এরা তিনজন আওফ থেকে বর্ণনা করেছেন। পার্থক্য হচ্ছে, হুশাইম ইখবার শব্দ ব্যবহার করেছেন, আর অন্যরা عن عن করে উল্লেখ করেছেন।

عن عون : ভারতীয় কপিগুলোতে ছাপা আছে অনুরূপ। তবে এটা লিপিগত ভুল। বিশুদ্ধ হলো عن عوف। মিসরি কপিগুলোতে এটাই রয়েছে। এর কারণ হলো, আব্বাদ এবং ইসমাইলের উস্তাদগণের মাঝে আউন নামের কোনো শায়খ নেই। এখানে 'আল-আরকুশশাজি'র লিপিকার থেকেও ভুল হয়েছে যে, তিনি সনদের কেন্দ্রবিন্দু সাইয়ার ইবনে সালামাকে সাব্যস্ত করে– আউফ এবং আউনকে সাব্যস্ত করেছেন আলাদা আলাদা।

كان النبى صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء : এ হাদিসের বাহ্যিক শব্দ দ্বারা অনেকে প্রমাণ পেশ করে এশার পূর্বে ঘুমানো ব্যাপক আকারে মাকরূহ বলেছেন। তবে পছন্দসই মত হলো, যদি এশার নামাজের সময় জাগ্রত হওয়ার একিন হয় অথবা কাউকে জাগানোর জন্য নির্ধারিত করে দেওয়া হয় তাহলে সেটা মাকরূহ না। মাকরূহ অন্য সুরতে। হজরত উমর এবং ইবনে উমর (রা.) হতে ঘুমের কথা উল্লিখিত আছে এবং ঘুম মাকরূহ বলেও উল্লিখিত রয়েছে। এভাবে উভয়ের মাঝে মিল করা সম্ভাব্য।

والحديث بعدها : গল্পগুজব করা এর দ্বারা উদ্দেশ্য। এটাই হলো শিরোনামের ওপর প্রমাণস্থল। যা দ্বারা এশার পর গল্প-গুজব মাকরূহ মনে হয়। মূলত سمر বলা হয় চাঁদনিকে। যেহেতু আরবগণের নিকট চাঁদনি রাতগুলোতে কেচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করার রীতি ছিল, সেহেতু এর প্রয়োগ হতে লাগল কেচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করার ওপর। এই হাদিসে এ কাজ থেকে বারণ করা হয়েছে। হজরত উমর (রা.)-এর বর্ণনা দ্বারা আর পরবর্তী অনুচ্ছেদে এশার পর কেচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করার বৈধতা সাব্যস্ত হয়।

قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع ابى بكر فى الامر من امر المسلمين وانا معهما .

'আবু বকর (রা.)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের ব্যাপারে আলাপ করতেন। তাঁদের সাথে আমিও থাকতাম।'

উভয় হাদিসের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের পদ্ধতি হলো, এশার পর গল্প-গুজব যদি কোনো যথার্থ দ্বীনী উদ্দেশ্যে করা হয় তবে তা জায়েজ। তবে শর্ত হলো, তার প্রবল ধারণা হতে হবে যে, রাত্রি জাগরণের ফলে ফজর নামাজের ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব পড়বে না। এ ক্ষেত্রে হজরত উমর (রা.)-এর বর্ণনা প্রযোজ্য। বস্তুত এটাকে গল্প-গুজব বলা হয়েছে রূপক অর্থে, অন্যথায় سمر শব্দের প্রয়োগ হয় শুধু কেচ্ছা-কাহিনী এ গল্প-গুজবের ক্ষেত্রেই। এরই সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা উদ্দেশ্য আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে।

بَابُ مَاجَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِى السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ (صـ ٤٢)

অনুচ্ছেদ- ১২ : এশার পর গল্প-গুজবের অনুমতি প্রসঙ্গে (মতন ৪২)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَسْمُرُ مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ (رضـ) فِى الْاَمْرِ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَنَا مَعَهُمَا .

১৬৯. অর্থ : হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে এশার পর আবু বকর (রা.)-এর সাথে আলোচনা করতেন। তখন আমি থাকতাম তাঁদের সাথে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, আউস ইবনে হাজায়ফা ও ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'উমর (রা.)-এর হাদিসটি হাসান। এই হাদিসটি হাসান ইবনে উবায়দুল্লাহ-ইবরাহিম-আলকামা-জু'ফি জনৈক ব্যক্তি যাকে বলা হয় কায়স অথবা ইবনে কায়স-উমর-নবী করিম ﷺ সনদে একটি দীর্ঘ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সাহাবি ও তাবেয়িন এবং তৎপরবর্তী তাবেয়িনে কেরামের মাঝে এশার পর গল্প-গুজব সম্পর্কে মতপার্থক্য হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একদল এশার নামাজের পর গল্প-গুজব মাকরূহ মনে করেছেন। আর অনেকে অনুমতি দিয়েছেন যদি এলমি বিষয়ে এবং প্রয়োজনীয় ব্যাপারে আলোচনা হয়। অধিকাংশ হাদিস অনুমতি প্রমাণ করে। নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন (নামাজের জন্য অপেক্ষমাণ) মুসল্লি অথবা মুসাফির ব্যতিত অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য এশার পর গল্প-গুজব বৈধ নয়।'

দরসে তিরমিযী

وقد روى هذا الحديث الحسن بن عبيد الله الخ عن النبى صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فى قصة طويلة .

'নবী করিম ﷺ হতে এই হাদিসটি একটি দীর্ঘ ঘটনায় বর্ণনা করেছেন।'

ধারণা করা হয় ইমাম তিরমিযী (র.) হতে কিছু ভ্রম হয়ে গেছে। কেনোনা হাসান ইবনে উবায়দুল্লাহর এ বর্ণনা মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এতে কোনো দীর্ঘ ঘটনা বিদ্যমান নেই। হ্যাঁ, যে রেওয়ায়াতে এই দীর্ঘ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, সেটি বর্ণিত আবু মু'আবিয়া-আ'মাশ সূত্রে, হাসান ইবনে উবায়দুল্লাহর সূত্রে না।

لا سمر الا لمصل او مسافر : ইমাম মুহাম্মদ (র.) আবু ইয়ালা এবং তাবারানি মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা এই মারফু হাদিসটি করেছেন। এর দ্বারাও বোঝা যায়, প্রয়োজনের সময় আলাপ করা বৈধ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْوَقْتِ الْاَوَّلِ مِنَ الْفَضْلِ (ص ٤٢)

অনুচ্ছেদ- ১৩ : প্রথম ওয়াক্তের ফজিলত প্রসঙ্গে (মতন ৪২)

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ عَنْ عَمَّتِهِ اُمِّ فَرْوَةَ (رض) وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ؟ قَالَ الصَّلٰوةُ لِاَوَّلِ وَقْتِهَا .

১৭০. অর্থ : হজরত কাসেম ইবনে গান্নাম তাঁর ফুফু উম্মে ফারওয়া হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন, রাসূলে আকরাম ﷺ-এর কাছে বায়আত গ্রহণকারিদের একজন। তিনি বলেছেন, রাসূলে আকরাম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন আমলটি সর্বোত্তম? জবাবে তিনি বললেন, প্রথম ওয়াক্তে নামাজ আদায় করা।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَلْوَقْتُ الْاَوَّلُ مِنَ الصَّلٰوةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ وَالْوَقْتُ الْاٰخِرُ عَفْوُ اللّٰهِ .

১৭১. অর্থ : হজরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নামাজের আওয়াল বা প্রথম ওয়াক্ত হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ, আর শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে মাফ করে দেওয়া।

আলি, ইবনে উমর, আয়েশা ও ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهٗ يَا عَلِيُّ ! ثَلٰثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا اَلصَّلٰوةُ اِذَا اَتَتْ وَالْجَنَازَةُ اِذَا حَضَرَتْ وَالْاَيِّمُ اِذَا وَجَدْتَّ لَهَا كُفُوًّا .

১৭২. অর্থ : হজরত আলি ইবনে আবু তালেব (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ তাঁকে বলেছেন, তিনটি কাজ দেরি করো না— ১. নামাজ যখন ওয়াক্ত এসে যায়। ২. জানাজা যখন উপস্থিত হয়। ৩. স্বামীহীন রমণী (এর বিয়ে) যখন তার জন্য পাওয়া যায় উপযুক্ত স্বামী।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, উম্মে ফারওয়ার হাদিসটি মুহাদ্দিসিনে কেরামের মতে শক্তিশালী নন। মুহাদ্দিসিনে কেরামের মাঝে এ হাদিসটির ক্ষেত্রে ইজতেরাব বা গড়মিল আছে।

عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ؟ قَالَ سَاَلْتُ عَنْهُ عَنْ (فى ن ب ليس "عن") رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ اَلصَّلٰوةُ عَلٰى مَوَاقِيْتِهَا قُلْتُ وَمَاذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ وَمَاذَا قَالَ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

১৭৩. অর্থ : হজরত আবু আমর শায়বানি হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ইবনে মাসউদ (রা.)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, কোন আমলটি সর্বশ্রেষ্ঠ? জবাবে তিনি বললেন, এই বিষয়ে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছি। জবাবে তিনি বলেছেন, ওয়াক্ত মতো নামাজ পড়া। আমি বললাম, আর কোন জিনিসটি? জবাবে তিনি বললেন, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার। আমি বললাম, আর কোনটি? জবাবে তিনি বললেন, জিহাদ করা আল্লাহর পথে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। মাসউদি শো'বা, শায়বা ও আরও একাধিক ব্যক্তি ওয়ালিদ ইবনুল আয়জার হতে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم صَلٰوةً لِوَقْتِهَا الْاٰخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ.

১৭৪. অর্থ : হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ওফাত পর্যন্ত কোনো নামাজ শেষ ওয়াক্তে দু'বার আদায় করেননি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি غريب। এর সনদ মুত্তাসিল নয়। ইমাম শাফেয়ি (র.) বলেছেন, নামাজের আওয়াল ওয়াক্ত উত্তম। প্রথম ওয়াক্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণকারি বিষয় হলো, রাসূল ﷺ ও আবু বকর, ওমর (রা.) কর্তৃক তা অবলম্বন করা। তাঁরা সর্বোত্তম ব্যতিত আর কিছু পছন্দ করতেন না। তাঁরা শ্রেষ্ঠত্ব বর্জন করতেন না। তাঁরা প্রথম ওয়াক্তে নামাজ আদায় করতেন। আমাদের নিকট এ কথাটি আবুল ওয়ালিদ মক্কী ইমাম শাফেয়ি (র.) বর্ণনা করেছেন হতে।

দরসে তিরমিযী

এই অনুচ্ছেদটি ইমাম তিরমিযী (র.) কায়েম করেছেন নামাজ আগে আগে পড়া মোস্তাহাব সাব্যস্ত করার জন্য এবং এতে তিনি পাঁচটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফেয়ি (র.) এসব হাদিস হানাফিদের বিরুদ্ধে পেশ করেছেন। তবে হানাফিদের পক্ষ থেকে এর জবাব হলো, এখানে প্রথম ওয়াক্ত দ্বারা মোস্তাহাব ওয়াক্তের শুরু উদ্দেশ্য। আর এই ব্যাখ্যার প্রমাণ হলো, ফজরের নামাজ ফর্সা হলে পড়া ও জোহরের নামাজ ঠাণ্ডার সময়ে পড়ার হাদিসগুলো। স্বয়ং ইমাম শাফেয়ি (র.) এশার ওয়াক্ত সম্পর্কে এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

سئل النبى صلى الله عليه وسلم اى الاعمال افضل؟ قال الصلوة لاول وقتها -

'রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, কোন আমলটি সর্বোত্তম? জবাবে তিনি বলেছেন, প্রথম ওয়াক্তে নামাজ আদায় করা।'

স্বয়ং ইমাম তিরমিযী (র.)-এর সুস্পষ্ট বিবরণ মুতাবেক এই হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে উমর উমরির কারণে জয়িফ। তাছাড়া এতে মূলপাঠেও ইজতেরাব (গড়মিল) রয়েছে। কারণ কোনো কোনো বর্ণনায় الصلوة لاول وقتها আর কোনো কোনো বর্ণনায়[১] الصلوة لوقتها এর স্থানে الصلوة على مواقيتها [২] আর কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে على ميقاتها الأول [৩]।

الوقت الاول من الصلوة رضوان الله : নিজ স্বভাব মুতাবেক ইমাম তিরমিযী (র.) এই হাদিসের ওপর কোনো আপত্তি তোলেননি। সনদগতভাবে অথচ এটিও জয়িফ। কারণ এটিও আবদুল্লাহ ইবনে উমর উমরি হতে বর্ণিত। তাছাড়া এতে ইয়াকুব ইবনুল ওয়ালিদ নামক আরেকজন রাবি রয়েছেন নেহায়েত জয়িফ। এমনকি তাঁকে বড় মিথ্যুক ও হাদিস জালকারি পর্যন্ত বলা হয়েছে। এ জন্যই অনেকে এ হাদিসটিকে মওজু বা জাল হাদিসগুলোর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

টীকা- ১. সুনানে দারাকুতনি : ১/২৪৮ ১৫ باب النهى عن الصلوة بعد الفجر وبعد صلوة العصر رقم الحديث

টীকা- ২. তিরমিযী : ১/৪৪, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস।

টীকা- ৩. দারাকুতনি : ১/২৪৭, باب النهى عن الصلوة بعد صلوة الفجر وبعد صلوة العصر

والجنازة اذا حضرت : হানাফিদের মতে এটি বাহ্যিক অর্থেই প্রযোজ্য। সুতরাং যদি জানাজা মাকরূহ সময়েও এসে যায় তবে নামাজ পড়া বৈধ। বিস্তারিত বিবরণ জানাজা পর্বে আসবে ইনশাআল্লাহ।

ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة لوقتها الاخر مرتين حتى قبضه الله .

বেশিরভাগ কপিতে এমনটিই রয়েছে। এমতাবস্থায় অর্থ হবে, রাসূল ﷺ দু'বারও নামাজ শেষ সময়ে পড়েননি। অথচ ইমামতে জিবরাইলের ঘটনায় মক্কা মুকার্‌রামায় এবং নামাজের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্নকারির হাদিসে[১] মদীনা মুনাওয়ারায় আখেরি ওয়াক্তে নামাজ পড়া প্রমাণিত আছে। এজন্য যদি এ কপিটি বিশুদ্ধ মানা হয় তাহলে বলতে হবে যে, হজরত আয়েশা (রা.)-এর এই উক্তি তাঁর নিজের জানা মুতাবেক। অবশ্য এই হাদিসটি 'নসবুর রায়ায়' আল্লামা জায়লায়ি (র.), 'মিজানুল ই'তিদালে' হাফেজ জাহাবি (র.) ইসহাক ইবনে আমরের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। এতেই তিরমিযীর কোনো কোনো মিসরি কপিতে এখানে الا مرتين শব্দ এসেছে। এমতাবস্থায় কোনো প্রশ্ন হবে না। কারণ তখন অর্থ এই হবে যে, রাসূল ﷺ আখেরি ওয়াক্তে নামাজ পড়েছেন শুধু দু'বার।

وليس اسناده بمتصل : ইসহাক ইবনে আমরের শ্রবণ হজরত আয়েশা (রা.) হতে প্রমাণিত নয়। অবশ্য এই বর্ণনাটি মুস্তাদরাকে হাকেমে আমরা-আয়েশা সূত্রে বর্ণিত। এই সূত্রটি সহিহ এবং মুত্তাসিল।

اختيار النبى صلى الله عليه وسلم وابى بكر (رضـ) وعمر (رضـ) : ইমাম তিরমিযী (র.)-এর এই দাবি, ফর্সা অবস্থায় ফজর নামাজ পড়ার হাদিসগুলো এবং ঠাণ্ডা অবস্থায় জোহরের নামাজ পড়ার হাদিসগুলো এবং যেসব বর্ণনা দ্বারা খুলাফায়ে রাশিদিন কর্তৃক দেরি করে নামাজ পড়া প্রমাণিত নামাজ বাতিল হয়ে যায় সেগুলো দ্বারা।

بَابُ مَاجَاءَ فِى السَّهْوِ عَنْ وَقْتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ (صـ ٤٣)

অনুচ্ছেদ- ১৪ : আসরের নামাজের ওয়াক্ত ভুলে যাওয়া প্রসঙ্গে (মতন ৪৩)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اَلَّذِىْ تَفُوْتُهُ صَلٰوةُ الْعَصْرِ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلَهٗ وَمَالَهٗ .

১৭৫. অর্থ : হজরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ বলেছেন, যার আসরের নামাজ ছুটে গেলো তার যেনো পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

বুরায়দা ও নাওফিল ইবনে মু'আবিয়া (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'ইবনে উমর (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح।' এ হাদিসটি জুহরিও সালেম থেকে তাঁর পিতা সূত্রে নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

দরসে তিরমিযী

فكأنما وتر اهله وماله : বিতর শব্দটির দুই অর্থ– এক. ছিনিয়ে নেওয়া, এটি তখন এক মাফউলের দিকে মুতা'আদ্দি (সকর্মক ক্রিয়া) হয়। এবার যদি এখানে এ অর্থ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে اهله وماله শব্দটিতে পেশ হবে। আর দ্বিতীয় অর্থ হলো, কম করা, হ্রাস করা। এটি তখন দুই মাফউলের দিকে মুতা'আদ্দি হয়। যেমন, لن يتركم اعمالكم। যদি এ দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে وتر- শব্দের জমির হবে নায়েবে ফায়েল। আর اهله وماله দ্বিতীয় মাফউল হিসেবে মানসুব (যবর বিশিষ্ট) হবে।

এ হাদিসের ফওত হওয়া দ্বারা ইমাম আওজায়ি প্রমুখ উদ্দেশ্য করেছেন সূর্য হলদে আকার ধারণ করার সময় পর্যন্ত ফওত হওয়া। কিন্তু জমহুরের মতে উদ্দেশ্য সূর্যাস্ত পর্যন্ত ফওত হওয়া।

টীকা- ১. সুনানে আবু দাউদ : ১/৫৭, باب المواقيت

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ تَعْجِيْلِ الصَّلٰوةِ إِذَا أَخَّرَهَا الْإِمَامُ (ص ٤٣)

অনুচ্ছেদ- ১৫ : ইমাম নামাজ পড়তে বিলম্ব করলে মুক্তাদির জন্য নামাজ আগে আদায় করা প্রসঙ্গে (মতন ৪৩)

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَا أَبَا ذَرٍّ! أُمَرَاءُ يَكُوْنُوْنَ بَعْدِيْ يُمِيْتُوْنَ الصَّلٰوةَ فَصَلِّ الصَّلٰوةَ لِوَقْتِهَا . فَإِنْ صَلَّيْتَ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً وَإِلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلٰوتَكَ .

১৭৬. **অর্থ** : হজরত আবু জর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী করিম ﷺ বলেছেন, আবু জর! আমার পর এমন অনেক আমীর-শাসক আসবে যারা নামাজকে মিটিয়ে ফেলবে। তখন তুমি ওয়াক্ত মতো নামাজ আদায় করে ফেলো। যদি তুমি তা ওয়াক্ত মতো আদায় না করে, তাহলে তোমার জন্য নফল হবে। তা ব্যতিত তুমি তোমার নামাজের হেফাজত করলে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও উবাদা ইবনুস সামিত (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'আবু জরের হাদিসটি حسن। এটি একাধিক আলেমের বক্তব্য। ইমাম যখন নামাজ দেরি করে পড়ে তখন ওয়াক্ত মতো নামাজ আদায় করা, তারপর ইমামের সাথে নামাজ পড়া তাঁরা মোস্তাহাব মনে করেন। আর প্রথম নামাজটিই অধিকাংশ আলেমের মতে ফরয। আবু ইমরান আল-জাওনির নাম হলো, আব্দুল মালেক ইবনে হাবিব।'

দরসে তিরমিযী

فان صليت لوقتها كانت لك نافلة : এখানে দু'টি মাসআলা আছে, **এক.** যদি ইমাম নামাজ দেরিতে পড়েন, অর্থাৎ, ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তাহলে এ অবস্থায় কি করা উচিত?

দুই. যদি কোনো ব্যক্তি ফরজ নামাজ আদায় করে ফেলে, তারপর জামাত দাঁড়ায়, তাহলে তার কি করা উচিত?

প্রথম মাসআলাটিতে হানাফিদের কোনো স্পষ্ট হাদিস বর্ণিত নেই। অবশ্য দ্বিতীয় মাসআলা দ্বারা প্রাসঙ্গিকভাবে এর হুকুমও জানা যেতে পারে।

এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর কয়েকটি বক্তব্য রয়েছে। তারমধ্যে পছন্দনীয় হলো, এ অবস্থায় একাকি নামাজ পড়ে নেওয়া উচিত। এরপর যদি ওয়াক্তের ভেতরে ইমাম নামাজ কায়েম করে, তাহলে তাতে নফলের নিয়তে শামিল হয়ে যাওয়া উচিত। আর এ হুকুম সব ওয়াক্তের ব্যাপারে আম।

২য় মাসআলাটিতে হানাফিদের বক্তব্য হলো, ফরজের পর যদি জামাত দাঁড়ায়, তাহলে শুধু জোহর এবং এশাতে নফলের নিয়তে শামিল হতে পারবে, অন্যগুলোতে নয়। এর ফলে প্রথম মাসআলাটির হুকুমও বেরিয়ে আসে যে, ইমামের দেরির আশঙ্কা হলে একাকি নামাজ পড়ে নিবে। তারপর ওয়াক্তের ভেতরে জামাত দাঁড়ালে জোহর এবং এশাতে ইমামের সাথে শামিল হতে পারবে, অন্যগুলোতে না।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা ইমাম শাফেয়ি (র.) প্রমাণ পেশ করেন যে, তাতে কোনো ওয়াক্ত খাস করা হয়নি। এর উত্তরে হানাফিগণ পেশ করেন মকরূহ ওয়াক্তগুলোতে নামাজ নিষিদ্ধ সংক্রান্ত হাদিস এবং এক রাকাত নামাজ পড়া নিষিদ্ধ সংক্রান্ত হাদিসসমূহ এবং এ অনুচ্ছেদের হাদিসটিকে মানেন সেগুলো দ্বারা বিশেষিত।

بَابُ مَاجَاءَ فِى النَّوْمِ عَنِ الصَّلٰوةِ (ص ٤٣)

অনুচ্ছেদ- ১৬ : নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে থাকা প্রসঙ্গে (মতন ৪৩)

عَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ (رض) قَالَ ذَكَرُوْا لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ اِنَّهُ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِى الْيَقْظَةِ ـ فَاِذَا نَسِىَ اَحَدُكُمْ صَلٰوةً اَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا ـ

১৭৭. অর্থ : হজরত আবু কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, লোকজন রাসূলে আকরাম (সা)-এর কাছে নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে থাকা সম্পর্কে আলোচনা করলো। জবাবে তিনি বললেন, ঘুমের মধ্যে কোনো অপরাধ নেই। ত্রুটি বা শিথিলতা হবে জাগ্রত অবস্থায়। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন কোনো নামাজ ভুলে যাবে অথবা ঘুমিয়ে পড়বে তখন সে নামাজ আদায় করবে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইবনে মাসউদ, আবু মারইয়াম, ইমরান ইবনে হুসাইন, জুবায়র ইবনে মুতয়িম, আবু হুজায়ফা, আমর ইবনে উমাইয়া আজ-জামরি জুমিখয়ার (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি হলেন, নাজ্জাশির ভাতিজা।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'কাতাদার হাদিসটি حسن صحيح। তাবেয়িনে কেরাম সে ব্যক্তি সম্পর্কে মতবিরোধ করেছেন, যে নামাজ না পড়ে ঘুমিয়েছে অথবা নামাজ ভুলে গেছে। তারপর সজাগ হয়েছে কিংবা নামাজের কথা স্মরণ করেছে, এমন সময় যখন নামাজের ওয়াক্ত নয়– সূর্যোদয় অথবা সূর্যাস্তের সময়। এ রকম অবস্থায় অনেক আলেম বলেছেন, যখন জাগ্রত হবে অথবা নামাজ স্মরণ করবে তখনই সে নামাজ আদায় করে ফেলবে। যদিও সে সময়টি সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্তের সময় হোক না কেনো। এটা হলো, আহমদ, ইসহাক, শাফেয়ি ও মালেক (র.)-এর মাজহাব। আর অনেকে বলেছেন, সূর্যোদয় অথবা সূর্যাস্তের আগে নামাজ পড়বে না।'

দরসে তিরমিযী

ليس فى النوم تفريط : হাকিমুল উম্মত হজরত থানবি কুদ্দিসা সিররুহুর কোনো লেখায় দেখেছে, তিনি বলেন, এ হুকুম প্রযোজ্য তখনকার জন্য, যখন নামাজের সময়ে জাগ্রত হওয়ার পুরো ব্যবস্থা করে ঘুমায় এবং তা সত্ত্বেও জাগ্রত হতে পারেনি। কিন্তু যদি এর কোনো ব্যবস্থা না করে এবং জাগ্রত হওয়ার উপকরণ তৈরি না করে, এ হাদিসের আওতায় তাহলে সে অন্তর্ভুক্ত হবে না। তা'রিসের হাদিস[১] প্রমাণ করেছে যে, রাসূল ﷺ হজরত বিলাল (রা.)-কে তাঁকে জাগানোর নির্দেশ দিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। যদিও পরে হজরত বিলাল (রা.) ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এবং কারও চোখ খুলেনি, তথা কেউ টের পাননি।

فليصلها اذا ذكرها : এসব শব্দের ব্যাপকতা দ্বারা প্রমাণ পেশ করে ইমামত্রয়ের মাজহাব হলো, কাজা নামাজ ঠিক তখন পড়া জরুরি যখন কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হবে, অথবা তার স্মরণ যদিও সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দ্বিপ্রহরের মাকরূহ সময়গুলোতেও। তাঁরা মাকরূহ ওয়াক্তে নামাজ নিষিদ্ধ সংক্রান্ত হাদিসগুলোকে এ ব্যাপকতা থেকে ব্যতিক্রম ও খাস মনে করেন। এর বিপরীত হানাফিদের মতে কাজা ওয়াজিব হয় ব্যাপক হিসেবে। অর্থাৎ, স্মরণে আসা ও জাগ্রত হওয়ার পর যে কোনো সময়ে নামাজ পড়া যেতে পারে। অতএব, মাকরূহ সময়গুলোতে তা আদায় করা ঠিক নয়। হানাফিগণ মাকরূহ ওয়াক্তে নামাজ নিষিদ্ধ সংক্রান্ত হাদিসগুলো দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন, আর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটিকে এসব হাদিস দ্বারা বিশেষিত মনে করেন।

হানাফিদের প্রাধান্যের কারণগুলো নিম্নেযুক্ত,

১. এ অনুচ্ছেদের হাদিসটির বাস্তব ব্যাখ্যা রাসূল ﷺ তারিস রাতে ঘটনায় বর্ণনা করেছেন। এ জন্যই তা'রিসের হাদিস এ ঘটনায় মূলের মর্যাদা রাখে। এখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট বিদ্যমান রয়েছে যে, রাসূল ﷺ সজাগ হয়েই সেখানে নামাজ পড়ার পরিবর্তে সেখান থেকে সফর করে সামান্য আগে তাশরিফ নিয়ে গেছেন। সেখানে গিয়ে নামাজ আদায় করেছেন, সূর্য যখন অনেকটুকু ওপরে উঠে গিয়েছে।

০ এ হাদিসের জবাব হাফেজ ইবনে হাজার (র.) এভাবে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে, রাসূলে আকরাম ﷺ এ কারণে নামাজ বিলম্বিত করেননি যে, সেটি মাকরূহ ওয়াক্ত ছিলো; বরং এই বিলম্ব ও সেখান থেকে রওয়ানা এজন্য করেছিলেন যাতে শয়তানের প্রভাবের স্থান সে উপত্যকা থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন। যেমন, রাসূল ﷺ-এর বক্তব্য[১] فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان (এটি এমন এক স্থান যাতে আমাদের কাছে শয়তান উপস্থিত হয়েছিল।)

তবে এই জবাবটি জয়িফ। কারণ, কোনো স্থানে শয়তানি প্রভাব পড়া নামাজকে ওয়াজিব ওয়াক্ত থেকে বিলম্বিত করার কোনো শরয়ি কারণ নয়; বরং নামাজ শয়তানি প্রভাবের প্রতিষেধক। অতএব, বাস্তব ঘটনা এটাই যে, সেখানে নামাজ দেরি করেছিলেন মাকরূহ ওয়াক্ত অতিক্রম করার জন্য। কিন্তু জায়েজ ওয়াক্তের অপেক্ষায় যতোটুকু সময় অতিক্রান্ত হয় এটাকে তিনি সে উপত্যকায় ব্যয় করতে পছন্দ করেননি, সামনে এগিয়ে গেছেন। আর এর কারণ বর্ণনা করেছেন فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ।

প্রশ্ন : অবশ্য একটি বর্ণনা দ্বারা এখানে প্রশ্ন হতে পারে, সেটি হচ্ছে মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে[২] এই বর্ণনাটি ইবনে জুরাইজ-'আতা সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে। তাতে নিম্নেযুক্ত শব্দগুলো রয়েছে,

فركع ركعتين في معرسه ثم سار ساعة ثم صلى الصبح .

'তারপর তিনি তাঁর রাতের অবস্থান স্থলে দু'রাকাত নামাজ পড়লেন। তারপর কিছুক্ষণ সফর করলেন। তারপর ফজরের নামাজ আদায় করলেন।'

জবাব : প্রথম এ বর্ণনাটি জয়িফ।[৩] কেনোনা, এটি হলো হজরত আ'তার মুরসাল। তাঁর মুরসালগুলো সম্পর্কে মুহাদ্দিসিনের বক্তব্য হলো,

ومراسيل عطاء اضعف المراسيل .

এ বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, রাসূল ﷺ ওযুও করেছিলেন সেখান থেকে রওয়ানা হওয়ার পর। এজন্য বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে এই জায়গাতে রাসূল ﷺ কর্তৃক দু'রাকাত নামাজ আদায় করা অযৌক্তিক মনে হয়। –সংকলক

সমস্ত মুরসালের মধ্যে তাঁর মুরসাল হাদিসগুলো দুর্বলতম। বিশেষতো যখন তাতে অন্য সমস্ত নির্ভরযোগ্য রাবিদের সাথে বিরোধিতা হয়, যাঁরা শুধু অন্য জায়গায় গিয়ে নামাজ পড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া যদি এই বর্ণনাটিকে সঠিক মেনে নেওয়া হয়, তবুও প্রশ্ন হয় যদি তাতে শয়তানি প্রভাব সত্ত্বেও দু'রাকাত পড়া যায়। তাহলে আর দু'রাকাত পড়তে কি অসুবিধা ছিলো?

০ হানাফিদের ওপরযুক্ত প্রমাণের একটি জবাব আল্লামা নববি (র.) এই দিয়েছেন যে, নামাজে বিলম্ব মাকরূহ ওয়াক্ত হওয়ার কারণে ছিলো না; বরং এর কারণ ছিলো সাহাবায়ে কেরাম তখন প্রয়োজনীয় হাজতে মশগুল ছিলেন। কিন্তু এ ব্যাখ্যাটিও যথার্থ নয়। কেনোনা, হাজত থেকে অবসর হওয়ার পর এ প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয়ে গেছে। সে সময় নামাজ পড়ে নেওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রিয়নবী ﷺ নামাজ পড়েননি; বরং সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে অন্যত্র পৌঁছে নামাজ পড়েছেন। তাছাড়া তাহাবির এক বর্ণনা অনুযায়ী হাজত সেরে অন্যত্র পৌঁছে অবসর লাভ করেছিলেন।

২. মাকরূহ ওয়াক্তগুলোতে নামাজ নিষিদ্ধ সংক্রান্ত হাদিসসমূহ অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির। আর এসব ওয়াক্তের সব ধরনের নামাজ নাজায়েজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এই অবৈধতার ব্যাপকতায় কাজা নামাজগুলোও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

টীকা- ১. নাসায়ি : ১ম খণ্ড, كتاب المواقيت باب كيف يقضى الفائت من الصلوة

টীকা- ২. ২/৫৮৮।

টীকা- ৩. অন্য কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারাও এর সহায়তা হয়। আবু দাউদ : ১/৬৩, باب فيمن نام عن صلوة او نسيها এর মধ্যে হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনায় নিম্নেযুক্ত শব্দগুলো বর্ণিত হয়েছে,

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال! فقال اخذ بنفسى الذى اخذ بنفسك يا رسول الله! بابى انت وامى فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ النبى صلى الله عليه وسلم وامر بلالا فاقام لهم الصلوة وصلى لهم الصبح الخ

'রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম জাগ্রত হয়েছিলেন। ফলে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেলেন। বললেন, বিলাল! জবাবে বিলাল বললেন, আপনার আত্মাকে যে ধরেছে আমাকেও সেই ধরেছে। (ঘুম চেপে বসেছে।) ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি আমার মাতা-পিতা উৎসর্গিত হোন। তারপর তাঁরা তাঁদের সাওয়ারিগুলো কিছুক্ষণ সামনের দিকে চালালেন। তারপর নবী করিম ﷺ ওজু করলেন। বিলাল (রা.)কে নামাজের একামত দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং তাদেরকে নিয়ে ফজরের নামাজ পড়লেন।'

৩. আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের শব্দ– فليصلها اذا ذكرها (যখন তা স্মরণ করবে তখন সে নামাজ আদায় করে নিবে।)-এর ব্যাপকতার ওপর স্বয়ং ইমাম শাফেয়ি (র.) আমল করেন না। কেনোনা তাঁদের মতেও কোনো কোনো অবস্থায় নামাজ বিলম্বিত করা জরুরি হয়ে পড়ে। যেমন কোনো মহিলার এমন সময় নামাজের কথা স্মরণ হলো, যখন সে ছিলো ঋতুবতী। তখন ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মতেও এ মহিলার জন্য পবিত্র হওয়া পর্যন্ত নামাজ বিলম্বিত করা জরুরি। যেনো এ স্থানে ইমাম শাফেয়ি (র.)-ও এ হাদিসকে খাস করে নিতে বাধ্য। আর যখন এক স্থানে ব্যাপকতা শেষ হয়ে গেলো। অতএব, মাকরূহ সময়গুলোকে খাস করে নিতে অসুবিধা কি? বাস্তবতা হলো, এ হাদিসের অর্থ শুধু এতোটুকু যে, স্মরণ আসার পর শরয়ি মূলনীতি মুতাবেক নামাজ আদায় করতে হবে। এবার যদি শরয়ি মূলনীতি অনুযায়ী নামাজ বিলম্বিত করার কোনো কারণ থাকে তাহলে বিলম্বিত করা আবশ্যক হবে।

৪. 'রাসায়িলুল আরকানে' আল্লামা বাহরুল উলুম লাখনবি (র.) আরেকটি পদ্ধতিতে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, اذا ذكرها বাক্যে اذا হরফটি যেমনভাবে জরফের (অধিকরণের) অর্থে ব্যবহার হয়, এমনভাবে শর্তের অর্থেও ব্যবহার হতে পারে। কবির বক্তব্যে যেমন আছে,

اذا تصبك خصاصة فتجمل 'যদি তোমার হাজত-প্রয়োজন দেখা দেয় তবে তুমি উত্তমরূপে ধৈর্যের পরিচয় দাও।'

এবার যদি আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস اذا ذكرها -কে ان ذكرها-এর অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে কোনো প্রশ্নই থাকবে না। কারণ এমতাবস্থায় অর্থ হবে, যদি স্মরণে এসে যায় তাহলে নামাজ পড়ে নাও। প্রকাশ থাকে যে, এই স্মরণ আসা ওয়াক্তের সাথে শর্তায়িত নয়।

৫. হজরত গাঙ্গুহি (র.) বলেছেন, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি নামাজ আদায়ের বিবরণে নস, আর ওয়াক্তের বিবরণে জাহের। বস্তুত নস জাহেরের ওপর প্রাধান্য লাভ করার বিষয়টি নির্দিষ্ট। –আল-কাওকাবুদ্ দুররি : ১/১০০

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّجُلِ يَنْسَى الصَّلٰوةَ (صـ ٤٣)

অনুচ্ছেদ- ১৭ : যে ব্যক্তি নামাজ ভুলে যায় তার প্রসঙ্গে (মতন ৪৩)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ نَسِىَ صَلٰوةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا .

১৭৮. অর্থ : হজরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো নামাজ ভুলে গেছে সে যেনো নামাজের কথা স্মরণ হলে তখন তা আদায় করে নেয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

সামুরা ও আবু কাতাদা (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'আনাস (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح। আলি ইবনে আবু তালেব (রা.) থেকে বর্ণনা করা হয় যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাজ ভুলে গেছে সে নামাজ আদায় করে নিবে যখন তা স্মরণ হয়। চাই ওয়াক্তের মধ্যে হোক বা অন্য কোনো সময়। এটা হলো, আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর মাজহাব। আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণনা করা হয় যে, তিনি আসরের নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। জাগ্রত হয়েছিলেন সূর্যাস্তের সময়। তারপর সূর্যাস্তের আগে তিনি নামাজ আদায় করে নেন। এই মত পোষণ করেছেন কূফাবাসীর একটি দল। কিন্তু আমাদের সাথীগণ মত পোষণ করেছেন হজরত আলি ইবনে আবু তালেব (রা.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী।'

দরসে তিরমিযী

يصليها متى ذكرها فى وقت او فى غير وقت : ইমামত্রয় এর অর্থ এই বলেন, চাই জায়েজ ওয়াক্ত হোক অথবা মাকরূহ ওয়াক্ত। কিন্তু হানাফিগণ এর এই ব্যাখ্যা করেন– চাই আদায়ের ওয়াক্ত হোক অথবা কাজার। এ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি বাহ্যিক শব্দের আলোকে অধিক প্রাধান্যের উপযোগী। কেনোনা, গায়রে ওয়াক্ত শব্দটির প্রয়োগ মাকরূহ ওয়াক্তের পরিবর্তে কাজা ওয়াক্তের ওপর হয়ে থাকে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّجُلِ تَفُوْتُهُ الصَّلَوَاتُ بِاَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ (صـ ٤٣)

অনুচ্ছেদ- ১৮ : যার কয়েক ওয়াক্ত নামাজ ছুটে গেছে সে আরম্ভ করবে কোন ওয়াক্ত থেকে? (মতন ৪৩)

عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ (فى بن مسعود (رضـ) اَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ شَغَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ اَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتّٰى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَاشَاءَ اللّٰهُ . فَاَمَرَ بِلَالًا فَاَذَّنَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ .

১৭৯. অর্থ : হজরত আবু উবায়দা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ (রা.) বলেছেন, খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মুশরিকরা যুদ্ধে ব্যস্ত রেখে চার ওয়াক্ত নামাজ থেকে বিরত রাখে। এমনকি তখন আল্লাহর ইচ্ছায় রাতের কিছু অংশ অতিক্রান্ত হয়ে যায়। তারপর তিনি বিলাল (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন, তিনি আজান দিলেন তারপর একামত দিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ জোহরের নামাজ পড়লেন। তারপর বিলাল একামত দিলে তিনি আসরের নামাজ পড়লেন। তারপর একামত দিলে তিনি মাগরিবের নামাজ পড়লেন। তারপর একামত দিলে তিনি এশার নামাজ আদায় করলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু সাইদ ও জাবের (রা.) থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'আবদুল্লাহর হাদিসটির সনদে কোনো অসুবিধা নেই। তবে আবু উবায়দা আবদুল্লাহ হতে শুনেননি। এ মতই ছুটে যাওয়া নামাজ সম্পর্কে কোনো কোনো আলেম অবলম্বন করেছেন যে, ব্যক্তি প্রতিটি নামাজের জন্য একামত দিবে যখন তা কাজা করবে। আর যদি একামত না দেয় তবুও যথেষ্ট হবে। ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মাজহাব এটা।'

حدثنا محمد بن بشار (فى ن بـ بندار) نا معاذ بن هشام قال (فى ن بـ ليس بلفظ "قال")
حدثنى ابى عن يحيى بن ابى كثير نا ابو سلمة بن عبد الرحمن عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (رضـ) قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا كِدْتُ اُصَلِّى الْعَصْرَ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَاللّٰهِ اِنْ صَلَّيْتُهَا . قَالَ فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَتَوَضَّأْنَا فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَلْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ .

১৮০. অর্থ : হজরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) খন্দকের যুদ্ধে কুরাইশের কাফেরদেরকে গালি দিতে লাগলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সূর্য ডুবে গেলো; অথচ আমি আসরের নামাজও আদায় করতে পারলাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম আমিও তা আদায় করার সুযোগ পাইনি। উমর (রা.) বললেন, তারপর আমরা 'বুতহান' উপত্যকায় গিয়ে অবতরণ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ওজু করলেন, আমরাও ওজু করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যাস্তের পর আসরের নামাজ আদায় করলেন, এরপর আদায় করলেন মাগরিবের নামাজ। (ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (রহ.) বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।)

দরসে তিরমিযী

عن أربع صلوات يوم الخندق : এটা হলো খন্দকের যুদ্ধের কাহিনী। সমস্ত বর্ণনা এ ব্যাপারে এক ধরনের যে, খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিছু নামাজ কাজা হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু এগুলোর সংখ্যা ও (ওয়াক্ত) নির্ধারণে বর্ণনাগুলোতে বিরোধ রয়েছে। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে চার ওয়াক্ত নামাজ কাজা হওয়ার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বোখারি, মুসলিমের[১] বর্ণনায় শুধু আসরের নামাজ কাজা হওয়ার উল্লেখ রয়েছে। মুয়াত্তার[২] বর্ণনায় জোহর ও আসরের কথা আলোচিত হয়েছে। জোহর, আসর ও মাগরিবের বিবরণ রয়েছে আরেকটি বর্ণনায়[৩]।

অনেকে এগুলোকে একই ঘটনা সাব্যস্ত করে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য حفظ كل ما لم يحفظه الاخر এ মূলনীতি কাজে লাগিয়েছেন যে, মূলত তিন ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়েছিলো। কিন্তু বিভিন্ন রাবি কোনো একটি বা দুটির কথা আলোচনা করেছেন, অবশিষ্টটির কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু এই জবাবটি প্রশান্তিদায়ক নয়। কারণ, হজরত জাবের (রা.)-এর পরবর্তী হাদিস যেটি বোখারি-মুসলিমেও বর্ণিত হয়েছে, তাতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ মাগরিবের ওয়াক্তে আসরের নামাজ কাজা করেছেন। অথচ আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে এশার ওয়াক্তে চার ওয়াক্ত নামাজ কাজা করার উল্লেখ রয়েছে। অতএব এ দুটি বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান হতে পারে না। বিশুদ্ধ বক্তব্য হলো, খন্দকের যুদ্ধে ব্যস্ততা সামঞ্জস্য বিধান হতে পারে না। বিশুদ্ধ বক্তব্য হলো, খন্দকের যুদ্ধে ব্যস্ততা অব্যাহত ছিলো একাধারে কয়েক দিন। তাতে কয়েকবার নামাজ কাজা হয়েছিল। সুতরাং এসব বর্ণনা প্রযোজ্য বিভিন্ন ঘটনার ক্ষেত্রে।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসে রূপক অর্থে চারটি নামাজ কাজা হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কেনোনা এ স্থলে শুধু তিনটি নামাজ কাজা হয়েছিল জোহর, আসর, মাগরিব। অবশ্য এশার নামাজে যেহেতু স্বাভাবিক ওয়াক্ত থেকে বিলম্ব হয়েছিলো। এজন্য আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে اربع صلوات তথা চার নামাজের আওতায় এশাকেও শুধু তাগলিবের ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যথায় মূলত এশার নামাজ কাজা হয়নি। যেমন আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের শব্দগুলো তা প্রমাণ করে, حتى ذهب من الليل ماشاء الله (এমনকি রাতের একটি অংশ চলে গেছে।)

এ স্থলে রাসূল ﷺ চার ওয়াক্তের নামাজ একসাথে একত্রে পড়েছিলেন এবং বর্ণনাগুলো এ ব্যাপারে একমত যে, রাসূল ﷺ এ চার নামাজ আদায়ে তারতিবের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের শব্দগুলো তা প্রমাণ করে,

فأمر بلالا فاذن ثم أقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى العشا

তিনি 'বিলাল (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন, বিলাল আজান দিলেন, তারপর একামত দিলেন, তারপর তিনি জোহরের নামাজ পড়লেন। তারপর বিলাল একামত দিলেন তিনি আসরের নামাজ আদায় করলেন। তারপর বিলাল একামত দিলেন তিনি মাগরিবের নামাজ আদায় করলেন। তারপর একামত দিলে তিনি এশার নামাজ আদায় করলেন।'

০ এ তারতিবের শরয়ি মর্যাদা সম্পর্কে অবশ্য ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য আছে। ইমাম শাফেয়ি ও আবু সাওরের মতে এ তারতিব মোস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। এর পরিপন্থি ইমামত্রয় এবং জমহুরের মতে কাজা নামাজ আদায়ে এই তারতিব ওয়াজিব। বস্তুত হানাফিদের মতে কাজা নামাজ অধিক হলে, সময় সংকীর্ণ হলে এবং ভুলে গেলে এই তারতিব বাতিল হয়ে যায়। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে তারতিব সময় সংকীর্ণতা ও

টীকা- ১. বোখারি : ১/৮৩-৮৪ باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت . মুসলিম ১/২২৬ باب الدليل لمن قال الصلوة الوسطى هى صلوة العصر مرتب

টীকা- ২. মা'আরিফুস্ সুনান : ১/১০৮,

টীকা- ৩. নাসায়ির বর্ণনা : ১/১০২ باب كيف يقضى الفائتة من الصلوة

বিস্মৃতির কারণে তো বাদ হয়ে যায়; কিন্তু কাজা নামাজের আধিক্যের কারণে বাদ পড়ে না। কিন্তু ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে বিস্মৃতির কারণেও বাদ হয় না। বরং এটা শুধু সময়ের সঙ্কীর্ণতার ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, তরতিব বাতিল হয় কেবল তখনই।

শাফেয়ি (র.) বলেন, অনুচ্ছেদের হাদিসে শুধুমাত্র রাসূল ﷺ-এর আমল বর্ণিত আছে, যা নিঃসন্দেহে তারতিব অনুযায়ীই ছিলো। এ আমলটি মোস্তাহাবের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। কারণ, ওয়াজিব হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই। হানাফিদের পক্ষ হতে 'বাহরুর রায়েকে' আল্লামা ইবনে নুজাইম (র.), 'ফাতহুল কাদিরে' শায়খ ইবনে হুমাম (র.), মাওলানা আব্দুল হাই লাখনবি (র.) আত্ 'তা'লিকুল মুমাজ্জাদে' লিখেছেন যে, এ মাসআলায় ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর বক্তব্য মূল। কিন্তু হানাফি অন্যান্য আলেম তাঁর বক্তব্যকে শাজ বা নগণ্য সাব্যস্ত করে তা রদ করেছেন।

রাসূল ﷺ-এর আমলকে ওয়াজিবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরেছেন। যার দুটি নিদর্শন আছে,

নবী করিম ﷺ-এর আরেকটি ইমামত্রয় এরশাদ আছে, যার আলোকে বোঝা যায় যে, আলোচ্য অধ্যায়ের হাদিসে তাঁর আমলও ওয়াজিবের জন্যই। সেই এরশাদটি হচ্ছে,[১] صلوا كما رأيتموني اصلي (আমাকে যেমন নামাজ পড়তে দেখো তোমরা অনুরূপ নামাজ আদায় করো।) এ নির্দেশটি ওজরের জন্য।

দ্বিতীয় হলো, ইমাম মুহাম্মদ (র.) মুয়াত্তায়[২] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর একটি বক্তব্য বর্ণনা করেছেন। যা দ্বারা তারতিব ওয়াজিব বোঝা যায়।[৩]

ما كدت اصلي العصر حتى تغرب الشمس : এর দ্বারা কোনো কোনো শাফেয়ি মতাবলম্বী এর দ্বারা এ প্রমাণ পেশ করেছেন যে, ভুলকারীর জন্য সূর্যাস্তের সময় নামাজ পড়া জায়েজ। কারণ كاد শব্দটি এই অর্থ বুঝায় যে, সূর্যাস্তের পূর্বে নামাজ পড়তে পারবো না প্রায় এ রকম অবস্থায় ছিলাম; কিন্তু আদায় করে ফেলেছি।

فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب .

'রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যাস্তের পর (আসরের) নামাজ আদায় করে তারপর মাগরিবের নামাজ আদায় করলেন।'

হানাফিদের প্রসিদ্ধ মাজহাব হলো, সেদিনকার আসর সূর্যাস্তের সময়ও পড়া যেতে পারে। এ বর্ণনা এ মাজহাবের পরিপন্থি। কারণ, রাসূল ﷺ সূর্যাস্তের পর পর্যন্ত নামাজ বিলম্বিত করেছেন। হজরত শাহ সাহেব (র.) বলেছেন, বস্তুত হানাফিদের মাজহাব বৈধতার নয়, বরং বিশুদ্ধতার। সুতরাং কোনো প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকে না।

টীকা- ১. আল্লামা শায়খ শে'রাণী (র.) বলেছেন, আমার শায়খ আলি আল-খাওয়াস বলতেন, মধ্যবর্তী নামাজ কখনও হয় ফরজ, আবার কখনও হয় আসর নামাজ। এর গোপন রহস্য কেবল সামানাসামনি ব্যতিত আলোচনা করা যায় না। –আল-মীজানুল কুবরা : ১/১৪৬

টীকা- ২. মুয়াত্তা মুহাম্মদ, ছাপা নূর মুহাম্মদ ঃ ১৩২, باب الرجل يصلى ويذكر ان عليه صلوة فائتة মালেক-নাফে'-ইবনে উমর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি তার কোনো নামাজ ভুলে গেছে তারপর একমাত্র ইমামের সঙ্গে থাকা অবস্থায়ই তা স্মরণ করেছে, যখন ইমাম সালাম ফিরাবে তখন সে ভুলে যাওয়া নামাজ আদায় করবে। তারপর অন্য নামাজ আদায় করবে। এর সহায়ক এবং আর বিশদ বিবরণদাতা হলো, 'মাজমাউজ জাওয়ায়িদে' (১/৩২৪, باب فى من صلى صلوة وعليه غيرها), উল্লিখিত মারফু হাদিসটি। ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, যে কোনো নামাজ ভুলে গিয়ে ইমামের সাথে থাকা অবস্থায় তা স্মরণ করেছে সে নামাজ পরিপূর্ণ করে ফেলবে এবং ভুলে যাওয়া নামাজ কাজা করে নিবে। তারপর ইমামের সঙ্গে যে নামাজ আদায় করেছে তা দোহরিয়ে নিবে। (হায়সামি (র.) বলেছেন, হাদিসটি তাবারানি আওসাতে বর্ণনা করেছেন। এর রাবিগণ নির্ভরযোগ্য। তবে তাবারানির উস্তাদ মুহাম্মদ ইবনে হিশাম আল-মুস্তামলির কথা কেউ আলোচনা করেছেন বলে আমি পাইনি। হাদিস থেকে জানা গেলো যে, মুয়াত্তার বর্ণনাটিও মারফু।)

টীকা- ৩. আবু মুজ'আ হাবিব ইবনে সিবা' নামক সাহাবি হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাগরিবের নামাজ পড়েছেন, অথচ আসরের নামাজের কথা ভুলে গেছেন। ফলে তিনি সাহাবিগণকে বললেন, তোমরা আমাকে আসরের নামাজ পড়তে দেখেছ? তাঁরা বললেন, না, হে আল্লাহর রাসূল! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুয়াজ্জিনকে নির্দেশ দিলেন, তিনি আযান দিলেন তারপর ইকামত দিলেন। ফলে নবী করিম ﷺ আসরের নামাজ পড়লেন ও প্রথম নামাজটি ভঙ্গ করে ফেললেন। তারপর আদায় করলেন মাগরিবের নামাজ। হায়সামি (র.) বলেছেন, হাদিসটি ইমাম আহমদ (র.) বর্ণনা করেছেন। আর তাবারানি বর্ণনা করেছেন 'কাবির'। তবে এতে ইবনে লাহি'আহ নামক একজন জয়িফ রাবি আছেন। –মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ১/৩২৪ باب فى من صلى صلة وعليه غيرها কিন্তু একটি সহায়ক হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। –সংকলক

بَابُ مَاجَاءَ فِى الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى اَنَّهَا الْعَصْرُ (صـ ٤٤)

অনুচ্ছেদ- ১৯ : মধ্যবর্তী নামাজ হলো আসরের নামাজ (মতন ৪৪)

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اَنَّهٗ قَالَ فِىْ صَلٰوةِ الْوُسْطٰى صَلٰوةِ الْعَصْرِ

১৮১. অর্থ : 'হজরত সামুরা ইবনে জুনদাব (রা.) হতে বর্ণিত, নবী কারিম ﷺ বলেছেন মধ্যবর্তী নামাজ হলো আসরের নামাজ।'

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم صَلٰوةُ الْوُسْطٰى صَلٰوةُ الْعَصْرِ -

১৮২. অর্থ : 'হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মধ্যবর্তী নামাজ হলো আসরের নামাজ।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি সহিহ। আলি, আয়েশা, হাফসা, আবু হুরায়রা ও আবু হাশেম ইবনে উতবা (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, আলি ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন, সামুরা (রা.) হতে হাসানের হাদিসটি হাসান। হাসান সামুরা (রা.) হতে এটি শুনেছেন।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, মধ্যবর্তী নামাজ সম্পর্কে সামুরার হাদিসটি হাসান। এটি সাহাবি প্রমুখ অধিকাংশ আলেমের মত। জায়দ ইবনে সাবেত ও আয়েশা (রা.) বলেছেন, মধ্যবর্তী নামাজ হলো সালাতুজ্ জোহর। ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর (রা.) বলেছেন, মধ্যবর্তী নামাজ হলো আসরের নামাজ।

حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى نا قريش بن انس عن حبيب بن الشهيد قال قال لى محمد بن سيرين سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته قال سمعته من سمرة بن جندب -

হজরত আবু মূসা-কুরাইশ-হাবিব ইবনে শহিদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনে সিরিন আমাকে বলেছেন, তুমি হাসানকে জিজ্ঞেস করো, আকিকার হাদিসটি তিনি কার কাছ থেকে শুনেছেন। এরপর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এটি শুনেছি সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) থেকে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল-আলি ইবনে আবদুল্লাহ-কুরাইশ ইবনে আনাস বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ বলেছেন, আলি বলেছেন সামুরা থেকে হাসানের শ্রবণ বিশুদ্ধ এবং তিনি প্রমাণ পেশ করেছেন এ হাদিসটি দ্বারা।

عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال فى صلوة الوسطى صلوة العصر -

০ কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ হতে মধ্যবর্তী নামাজের হিফাজতের জন্য বিশেষভাবে তাকিদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মধ্যবর্তী নামাজ নির্ণয়ে ফুকাহা ও মুহাদ্দিসিনের প্রচণ্ড মতবিরোধ রয়েছে। এমনকি এমন কোনো নামাজ নেই যার সম্পর্কে মধ্যবর্তী নামাজ হওয়ার কোনো বক্তব্য নেই। হাফেজ দিমইয়াতি (র.) তো এ বিষয়ে كشف المغطى عن الصلوة الوسطى নামে স্বতন্ত্র একটি পুস্তিকা লিখে ফেলেছেন এবং তাতে এর ব্যাখ্যায় ১৯টি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। তবে প্রসিদ্ধ হলো তিনটি বক্তব্য,

১. ইমাম শাফেয়ি (র.) হতে একটি বর্ণনা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য ফজর নামাজ।

২. ইমাম মালেক (র.)-এর একটি বক্তব্য বর্ণিত আছে, এর দ্বারা জোহরের নামাজ উদ্দেশ্য।

৩. ইমাম আবু হানিফা এবং অধিকাংশ আলেমের মতে এর দ্বারা আসরের নামাজ উদ্দেশ্য। ইমাম মালেক এবং শাফেয়ি (র.) থেকেও অনুরূপ একটি বক্তব্য বর্ণিত আছে। মুহাক্কিক মালেকি এবং শাফেয়ি মতাবলম্বীগণও এটিই পছন্দ করেছেন। এ বক্তব্যটি বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা অধিক শক্তিপ্রাপ্ত। কারণ এর সহায়তায়ই মারফু হাদিসগুলো অধিক।[১]

وقد سمع عنه : রিজাল শাস্ত্রবিদদের মতে মতদ্বৈধতা রয়েছে যে, হজরত হাসান বসরি (র.)-এর শ্রবণ হজরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) থেকে প্রমাণিত কি না? অনেকে বলেছেন, একটি হাদিসও শোনেননি। অনেকে বলেছেন, শুধু আকিদার একই হাদিস শোনার বিষয় প্রমাণিত, অন্য কোনো হাদিস নয়। আর তৃতীয় আরেকটি বক্তব্য হলো, হজরত হাসান বসরি (র.) একাধিক হাদিস শুনেছেন হজরত সামুরা (রা.) থেকে।

ইমাম বোখারি ও তিরমিযী (র.) শ্রবণ প্রমাণিত হওয়ার পক্ষে।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ (ص ٤٥)

অনুচ্ছেদ- ২০ : ফজর ও আসরের পর নামাজ আদায় করা মাকরূহ প্রসঙ্গে (মতন ৪৫)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (رضـ) وَكَانَ مِنْ أَحَبِّهِمْ إِلَى أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم نَهٰى عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ -

১৮৩. অর্থ : হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি একাধিক সাহাবি হতে শুনেছি, তার মধ্যে রয়েছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)। তিনি ছিলেন আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাজের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত নামাজ পড়তে অনুরূপভাবে আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আলি, ইবনে মাসউদ, আবু সাইদ, উতবা ইবনে আমের, আবু হুরায়রা, ইবনে উমর, সামুরা ইবনে জুনদুব, সালামা ইবনুল আকওয়া' জায়েদ ইবনে সাবেত, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, মু'আজ ইবনে আ'ফরা, সুনাবিহি, আয়েশা, কা'ব ইবনে মুররাহ, আবু উমামা, আমর ইবনে আবাসা, ইয়ালা ইবনে উমাইয়া ও মু'আবিয়া (রা.) থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। তবে সুনাবিহি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেননি।

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, উমর (রা.) হতে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح। এটা সাহাবি ও তৎপরবর্তী অধিকাংশ ফকিহের মত। তাঁরা ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত নামাজ মাকরূহ মনে করেছেন। তবে কাজা নামাজ আসর ও ফজরের পর আদায় করাতে কোনো দোষ নেই। আলি ইবনুল মাদিনি (র.) বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ বলেছেন, (তিনি বলেন) শো'বা বলেছেন; কাতাদা আবুল আলিয়া থেকে শুনেছেন শুধু তিনটি বিষয়।

এক. উমর (রা.)-এর হাদিস যে, নবী করিম ﷺ নিষেধ করেছেন আসরের পর সূর্যাস্তের আগে এবং ফজরের পর সূর্যোদয়ের আগে নামাজ পড়তে।

দুই. রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদিস যে, তিনি বলেছেন, 'আমি ইউনুস ইবনে মাত্তা থেকে শ্রেষ্ঠ'-একথা বলা কারও জন্য শোভা পায় না।

তিন. আলি (রা.)-এর হাদিস-'বিচারক তিন প্রকার।'

টীকা- ১. আল্লামা শায়খ শে'রানি(র.) বলেছেন- আমার শায়খ আলি-খাওয়াস বলতেন, মধ্যবর্তী নামাজ কখনও হয় ফজর, আবার কখনও হয় আসর নামাজ। এর গোপন রহস্য কেবল সামনা-সামনি ব্যতিত আলোচনা করা যায় না। -আল-মিজানুল কুবরা : ১/১৪৬

দরসে তিরমিযী

○ এ হাদিস অনুযায়ী ফজর এবং আসরের পর সাধারণ হুকুম তো এটাই যে, নামাজ পড়া নাজায়েজ। অবশ্য এই হুকুম থেকে কাজা নামাজ আদায়ের বিষয়টি ব্যতিক্রমভুক্ত। এই ব্যতিক্রমভুক্তির ওপর আল্লামা নববি (র.) ইজমা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেছেন[১] যে, সাহাবায়ে কেরামের জামানায় এ বিষয়ে মতানৈক্য ছিলো, এজন্য একটি দল পূর্ববর্তীদের থেকে সাধারণ বৈধতার বক্তব্য বর্ণনা করেছিলেন। এ হিসেবে নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদিসগুলো রহিত। ফলে দাউদ জাহেরি এবং ইবনে হাজম (র.)-এর ওপরই দৃঢ় বিশ্বাস করেছেন। কিন্তু অনেকে সাধারণভাবে নিষিদ্ধতার পক্ষে। ফলে আবু বকর এবং কা'ব ইবনে উজরা (রা.) এসব সময়ে কাজা নামাজ আদায় করাও বলেন।

এ মাসআলাটির বিস্তারিত বিবরণ হলো, মাকরূহ ওয়াক্ত দুই প্রকার,

১. তিন ওয়াক্ত, তথা সূর্যোদয়, ঠিক দ্বিপ্রহর এবং সূর্যাস্তের সময়।

২. আসর নামাজ এবং ফজর নামাজের পরবর্তী সময়।

প্রথম প্রকার সম্পর্কে হানাফিদের মাজহাব হলো, তাতে সর্বপ্রকার নামাজ অবৈধ। ফরজ হোক বা নফল। ইমামত্রয়ের মতে ফরজগুলো জায়েজ, নফলগুলো নাজায়েজ। অবশ্য ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মতে কারণ বিশিষ্ট নফলগুলোও জায়েজ। এ মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে এসেছে। রইলো মাকরূহ ওয়াক্তগুলোর দ্বিতীয় প্রকার– তথা ফজর নামাজ ও আসর নামাজ পরবর্তীকাল। এগুলো সম্পর্কেও ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মাজহাব এটাই যে, এগুলোতেও ফরজ ও কারণ বিশিষ্ট নফল নামাজ সবই নাজায়েজ। অবশ্য কারণ বিশিষ্ট নয় এমন নফল নামাজ এ সময়গুলোতে مكروه।

তার মতে কারণ বিশিষ্ট নফলের অর্থ তাঁর মতে এমন নফল, যেগুলোর কারণ বান্দার ইচ্ছা ব্যতিত অন্য কোনো জিনিসও হয়। যেমন তাহিয়্যাতুল ওজু, তাহিয়্যাতুল মসজিদ, শুকরানা নামাজ, ঈদের নামাজ, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের নামাজ।

এসব ওয়াক্তে ফরজ নামাজগুলোতো হানাফিদের মতে বৈধ; কিন্তু নফলগুলো চাই কারণ বিশিষ্ট হোক, বা না হোক, সবই অবৈধ।

কিন্তু শাফেয়ি মতাবলম্বীগণের মতে হেরেমে মক্কায় কারণ বিশিষ্ট নয়, এমন নফলগুলোও বৈধ। অথচ হানাফিদের মতে এ ব্যতিক্রমভুক্তিও ধর্তব্য নয়;[২] এবং এসব সময়ে সব জায়গায় সর্বপ্রকার নফল অবৈধ।

একতো সেসব বর্ণনার ব্যাপকতা দ্বারা ইমাম শাফেয়ি (র.) প্রমাণ পেশ করেন, যেগুলোতে তাহিয়্যাতুল ওজু বা তাহিয়্যাতুল মসজিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এগুলোতে মাকরূহ ওয়াক্ত কিংবা গাইরে মাকরূহ ওয়াক্তের কোনো তাফসিল বর্ণিত হয়নি। তাছাড়া হেরেম শরিফের মাসআলায় হজরত জুবায়র ইবনে মুতইম (রা.)-এর নিম্নেযুক্ত মারফু হাদিসটি দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন, যাতে বর্ণিত হয়েছে নবী করিম ﷺ-এর এই বক্তব্য,

يا بنى عبد مناف! لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار [৩]۔

'হে আবদে মানাফের সন্তানরা! বায়তুল্লাহ শরিফে কাউকে তাওয়াফ করতে নিষেধ করো না এবং (এখানে) যে কোনো সময় রাত্রে হোক বা দিনে নামাজ আদায় করতে নিষেধ করো না।'

এর পরিপন্থি হানাফিগণ হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস এবং সেসব বর্ণনার ব্যাপকতা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন, যেগুলোতে ফজরের পর ও আসরের পর নামাজ থেকে সাধারণত নিষেধ করা হয়েছে। হানাফিগণ তাহিয়্যাতুল মসজিদ সংক্রান্ত হাদিসগুলো এবং ওপরযুক্ত لا تمنعوا احدا হাদিসটিকে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা বিশেষিত মনে করেন।

টীকা- ১. ফতহুল বারি : ২/৪৭

টীকা- ২. মালেক (র.) বলেছেন, নফলগুলো হারাম ফরজগুলো নয়। ইমাম আহমদ (র.) ও তাঁর স্বপক্ষে রয়েছেন। কিন্তু শুধুমাত্র তাওয়াফের দু'রাকাত তিনি ব্যতিক্রমভুক্ত করেছেন। –ফাতহুল বারি : ২/৪৭।

টীকা- ৩. আল্লামা নিমবি (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি পঞ্চ ইমামসহ অন্যরা বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী ও হাকেম প্রমুখ এ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। অবশ্য এর সনদে কিছু আপত্তি আছে। এ কারণে আল্লামা জায়লায়ি (র.)ও এ হাদিসের সনদে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। দ্রষ্টব্য 'আছারুস সুনান : ১৯১-১৯২ باب اباحة الصلوة فى الساعات كلها بمكة

হানাফিদের অবস্থানের প্রাধান্যের কারণ হলো, 'নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদিস প্রচুর। অতএব সতর্কতার দাবি হলো নিষিদ্ধতার ওপর আমল করা বাকি রইলো, يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا সংক্রান্ত হাদিস। এটা সম্পর্কে কথা হলো, প্রথমতো এটির সনদে ইমাম তাহাবির বক্তব্য মতে ইজতেরাব রয়েছে। আর যদি এই বর্ণনাটি সহিহ হয় তবুও এর উদ্দেশ্য হলো, শুধু হেরেমের রক্ষকদেরকে সর্বদা হেরেম খোলা রাখার জন্য এবং তাওয়াফ ও নামাজে বিধিনিষেধ আরোপ না করার জন্য দিকনির্দেশনা দেওয়া। এর এই উদ্দেশ্য কখনও নয় যে, হেরেম শরিফে নামাজ আদায়কারিদের জন্য কোনো মাকরূহ ওয়াক্ত নেই। (আছারুস্ সুনান-নিমবি (র.) : ১৯১)

সহিহ ইবনে হাব্বানের বর্ণিত হাদিসের নিম্নেযুক্ত শব্দাবলি দ্বারা হানাফিদের এই জবাবের সহায়তা হয়,

يا بني عبد المطلب ! ان كان لكم من الأمر شيئ فلا اعرفن احدا منكم ان يمنع من يصلي عند البيت اى ساعة شاء من ليل او نهار [১] ۔

'হে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানরা! যদি তোমাদের কোনো কর্তৃত্ব থেকে থাকে তবে আমি যেনো তোমাদের কারও ব্যাপারে বায়তুল্লাহর কাছে রাত দিনে যে কোনো সময়ে কাউকে নামাজ আদায়ে নিষেধ করতে কখনও না জানি।'

হানাফি মাজহাবের প্রাধান্যের একটি কারণ এটিও যে, বোখারিতে প্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণিত আছে[২],

وطاف عمر بعد صلوة الصبح فركب حتى صلى ركعتين بذى طوى ۔

'উমর (রা.) ফজর নামাজের পর তওয়াফ করলেন, তারপর আরোহণ করে চলে এলেন। দু'রাকাত নামাজ পড়লেন জিতুয়া নামক স্থানে।'

এটা এর সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, এসব ওয়াক্তে কারণবিশিষ্ট নফলও অবৈধ। অন্যথায় হজরত উমর (রা.) হেরেমে কা'বার ফজিলত ত্যাগ করার মতো ব্যক্তি ছিলেন না। তাছাড়া বোখারি[৩] শরিফে একটি বর্ণনা আছে,

عن ام سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة واراد الخروج ولم تكن ام سلمة طافت بالبيت وارادت الخروج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلوة للصبح فطوفى على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك ولم تصل حتى خرجت ۔

'হজরত রাসূলে করিম ﷺ-এর অর্ধাঙ্গিনী উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তখন তিনি মক্কায় এবং সেখান থেকে বের হওয়ার জন্য মনস্থ করেছেন। কিন্তু উম্মে সালামা (রা.) বায়তুল্লাহ শরিফের তওয়াফ করেননি। তিনিও সেখান হতে বেরুতে চেয়েছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, যখন ফজরের নামাজ আদায় করা হয় তখন তুমি তোমার উটের ওপর থেকে তওয়াফ করো লোকজন যখন নামাজরত থাকে। ফলে তিনি তাই করলেন। তিনি নামাজ পড়লেন না সেখান থেকে বের হওয়ার পূর্বে।'

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, হাদিসগুলো যেহেতু ব্যাপক তাহলে কাজা নামাজগুলো আদায় করা জায়েজ সাব্যস্ত করা হয়েছে কেনো?

জবাব : এই ব্যতিক্রমভুক্তির কারণ ইমাম তাহাবি (র.) এই বর্ণনা করেছেন যে, এই সময় সত্তাগতভাবে কোনো মাকরূহ নেই। যার প্রমাণ হলো, সেদিনের ফজর এবং আসর বিনা মাকরূহ জায়েজ। সুতরাং এসব সময়ে নামাজ মাকরূহ হওয়ার এ ব্যতিত কোনো কারণ নেই যে, এ সময়কে ফরজগুলোর সাথে ব্যস্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং এ ওয়াক্তে নফলসমূহ তো অবৈধ হবে, কিন্তু ফরজগুলো যে কোনো প্রকারেরই হোক না কেনো সেগুলো বৈধ। কেনোনা, ওয়াক্ত প্রস্তুতির জন্য মূল উদ্দেশ্যই এটি।

টীকা- ১. মাওয়ারিদুজ্ জাম'আন : ১৬৫, হাদিস নং ৬২৭

টীকা- ২. বোখারি : ১/২২০, كتاب المناسك باب الطواف بعد الصبح والعصر

টীকা- ৩. বোখারি : ১/২২০, كتاب المناسك، باب من صلى ركعتى الطواف خارجا من المسجد

بَابُ مَاجَاءَ فِى الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ (ص ٣٥)

অনুচ্ছেদ- ২১ : আসরের পর নামাজ পড়া প্রসঙ্গে (মতন ৪৫)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ اِنَّمَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ لِاَنَّهُ اَتَاهُ مَالٌ فَشَغَلَهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّى هُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ لَمْ يُعِدْلُهُمَا ـ

১৮৪. অর্থ : হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের পর দু'রাকাত নামাজ আদায় করেছেন। কেনোনা তাঁর নিকট কিছু মাল এসেছিলো (তিনি সেগুলো বণ্টনে) ব্যস্ত ছিলেন। এটা তাঁকে জোহরের পর সে দু'রাকাত নামাজ থেকে বিরত রেখেছিল। এ দু'রাকাতই তিনি আসরের পর আদায় করেছেন। তারপর এ দু'রাকাতের পুনরাবৃত্তি ঘটাননি আর কখনো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আয়েশা, উম্মে সালামা, মায়মুনা ও আবু মূসা (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'আবু মূসা (রা.)-এর হাদিসটি حسن। একাধিক সাহাবি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আসরের পর দু'রাকাত আদায় করেছেন। এটি নবী করিম ﷺ হতে বর্ণিত যে, তিনি আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদিসটি বিশুদ্ধতম। কেনোনা তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (আসরের পরে) দু'রাকাতের পুনরাবৃত্তি ঘটাননি কখনও।

জায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) হতে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদিসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আয়েশা (রা.) থেকে অনেক হাদিস বর্ণিত আছে। তাঁর থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে, নবী কারিম ﷺ যখনই আসরের পর তাঁর কাছে প্রবেশ করেছেন, তখন দু'রাকাত নামাজ আদায় করেছেন। আয়েশা (রা.) সূত্রে উম্মে সালামা (রা.)-এর সনদে নবী করিম (স.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নিষেধ করেছেন আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত নামাজ পড়তে।

o এ বিষয়ে অধিকাংশ আলেম একমত হয়েছেন, আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত নামাজ পড়া মাকরূহ। তবে এ থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত নামাজগুলো ব্যতিত। যেমন আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত ও ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত তাওয়াফের পর মক্কা শরিফে নামাজ পড়া।

এ ব্যাপারে নবী কারিম ﷺ হতে অনুমতি বর্ণিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম ও তৎপরবর্তী একদল আলেম আসর ও ফজর নামাজের পর মক্কা মু'আজ্জমায়ও নামাজ মাকরূহ মনে করেছেন। সুফিয়ান সাওরি ও মালেক ইবনে আনাস ও কোনো কোনো কুফাবাসী এমতই পোষণ করেন।

দরসে তিরমিযী

فصلاهما بعد العصر ثم لم يعدلهما : রাসূল (স.) কর্তৃক আসরের পর দু'রাকাত নামাজ পড়ার ব্যাপারে বর্ণনাগুলো বিপরীতধর্মী। হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ওপরযুক্ত হাদিসগুলো দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রিয়নবী ﷺ এ দু'রাকাত শুধু একবার পড়েছিলেন। 'মু'জামে তাবারানি'তে[১] বর্ণিত হজরত আয়েশা এবং 'মুসনাদে আহমদে'[২] বর্ণিত হজরত উম্মে সালামা (রা.)-এর একটি বর্ণনা দ্বারাও সেটাই বোঝা যায় যে, তিনি এ নামাজ পড়েছেন শুধু একবার।

টীকা- ১. আয়েশা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার আসরের নামাজের পূর্বে দু'রাকাত নামাজ ছুটে গেছে। যখন তিনি নামাজ থেকে ফিরলেন, তখন এ দু'রাকাত আদায় করে নিলেন। এরপর আর এ দু'রাকাতের পুনরাবৃত্তি করলেন না। (অপর পৃষ্ঠায়)

অবশ্য সহিহ বোখারিতে[৩] হজরত আয়েশা (রা.)-এর একটি বর্ণনা রয়েছে,

ما كان النبى صلى الله عليه وسلم ياتينى فى يوم بعد العصر الا صلى ركعتين .

তাছাড়া সহিহ মুসলিমে হজরত আয়েশা (রা.)-এরই বর্ণনায় আসরের পর দু'রাকাতের উল্লেখ রয়েছে, যাতে (أى دام عليها) اثبتها (এই দু'রাকাত তিনি স্থায়ীভাবে আদায় করেছেন।) শব্দও বিদ্যমান আছে।[৪] সর্বদা এর দ্বারা এ আমল করেছেন বলে বোঝা যায়। এ ব্যতিত মুসলিম শরিফে[৫] হজরত আয়েশা (রা.)-এর আরেকটি বর্ণনা রয়েছে।

عن عائشة (رض) قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندى قط

'হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, 'আসরের নামাজের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও আমার কাছে দু'রাকাত পরিহার করেননি।'

এ থেকেও এটি দায়েমি আমল বোঝা যায়। স্বতন্ত্রভাবে কেউ এ বিরোধ অবসানের জন্য মনোযোগ দেননি। অবশ্য হাফেজ ইবনে হাজার (র.) এদিকে কিছু ইঙ্গিত করেছেন। সামগ্রিকভাবে বর্ণনাগুলো দেখলে বোঝা যায় যে, সর্বদা এ আমল করার বর্ণনাগুলো আসাহ। আর যেগুলোতে শুধু একবার করার কথা বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর বেশিরভাগ সনদগতভাবে জয়িফ। যেমন, হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদ হাদিসটিকে ইমাম তিরমিযী (র.) হাসান সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু অন্যান্য মুহাদ্দিস এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, এ হাদিসটি জারির ইবনে আব্দুল হামিদ-আতা ইবনুস্ সায়েব সূত্রে বর্ণিত। আর এ বিষয়টির সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে, জারির ইবনে আব্দুল হামিদ যে কালে আতা ইবনুস্ সায়েব থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন সে সময় তাঁর স্মৃতিতে গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়ে গেছে। এ বর্ণনাটি এজন্য জয়িফ এবং হজরত আয়েশা (রা.)-এর বিশুদ্ধ হাদিসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। রইলো 'মু'জামে তাবারানি'তে বর্ণিত হজরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনা। এতেও কাত্তাত নামক একজন রাবি রয়েছেন, যাকে বড় মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে। এ কারণে এ হাদিসটিও প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্যতা রাখে না। অবশ্য মুসনাদে আহমদের বর্ণনা যাতে হজরত উম্মে সালামা (রা.)-এর পক্ষ থেকে দায়েমি আমল না হওয়ার বিবরণ রয়েছে, সেটি সনদগত প্রশ্ন থেকে মুক্ত। এজন্য এটিকে জয়িফ বলে রদ করা যায় না। অতএব, সহিহ বোখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হজরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনার সাথে এর বিরোধ থেকে যায়। হাফেজ ইবনে হাজার (র.) এই বিরোধ অবসানের জন্য المثبت مقدم على النافى মূলনীতি অবলম্বন করে বলেছেন, হজরত উম্মে সালামা (রা.) যে নামাজ না পড়ার কথা বলেছেন সেটি তাঁর জানা মুতাবেক। আর হজরত আয়েশা (রা.) যে পড়ার কথা বলেছেন, সেটা তাঁর জ্ঞান মুতাবেক। এই জবাবটি প্রশান্তিদায়ক হতে পারতো।

(হায়সামি (র.) বললেন), আমি বলবো হজরত আয়েশা (রা.) থেকে এ ছাড়া অন্য হাদিসও রয়েছে সহিহ (বোখারি)তে। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তাবারানি আওসাতে। তাতে রয়েছে আবু ইয়াহইয়া আল-কাত্তাত নামক একজন রাবি। তাঁকে আহমদ ও ইবনে মাইন (র.) জয়িফ বলেছেন একটি বর্ণনায়। আবার অন্য বর্ণনায় তাঁকে ইবনে মাইন (র.) নির্ভরযোগ্য বলেছেন। মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ২/২২৩, باب الصلوة بعد العصر از مرتب عفى عنه

টীকা- ২. ৬/২২৯, মা'আরিফুস্ সুনান : ২/১৩৫-১৩৬

টীকা- ৩. ১/৮৩ كتاب المواقيت باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها

টীকা- ৪. মুসলিম : ১/২৭৭, কিতাবু ফাজায়িলিল কোরআন, باب الأوقات التى نهى عن الصلوة فيها *আবু সালামা বলেছেন, তিনি আসরের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ যে দু'রাকাত আদায় করতেন সে দু'রাকাত সম্পর্কে হজরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট জিজ্ঞেস করেছিলেন। জবাবে তিনি বলেছেন, আগে তিনি এ দু'রাকাত নামাজ আদায় করতেন। তারপর (একবার) এ দু'রাকাত থেকে তিনি বিরত রয়েছেন, অথবা ভুলে গেছেন। তারপর আসরের নামাজের পর সে দু'রাকাত আদায় করে নিয়েছেন। তারপর এ দু'রাকাত তিনি স্থায়ীভাবে পড়েছেন। বস্তুত তাঁর অভ্যাস ছিলো যখন তিনি কোনো নামাজ আদায় করতেন তখন স্থায়ীভাবে করতেন। –সংকলক।*

টীকা- ৫. মুসলিম : ১/২৭৭, باب الأوقات التى نهى عن الصلوة فيها

তবে এর ওপর একটি শক্তিশালী প্রশ্ন হয় সহিহ মুসলিমে[১] বর্ণিত কুরাইবের একটি বর্ণনা দ্বারা। তিনি বলেন,

اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَزْهَرَ وَالْمِسْوَرَ بْنِ مَخْرَمَةَ اَرْسَلُوْهُ اِلٰى عَائِشَةَ (رض) زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالُوْا اِقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيْعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقُلْ اَنَا اخبر نَا اَنَّكَ تُصَلِّيْنَهَا وَقَدْ بَلَغَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْهَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ اَصْرَفُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّاس عَنْهَا قَالَ كُرَيْبُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَبَلَغْتُهَا مَا اَرْسَلُوْنِىْ بِهِ ـ فَقَالَتْ سَلْ اُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ اِلَيْهِمْ فَاَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّوْنِىْ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا اَرْسَلُوْنِىْ بِهِ اِلٰى عَائِشَةَ (رض) ـ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنْهُمَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيْهَا اَمَّا حِيْنَ صَلَّاهَا فَاِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ عِنْدِىْ نِسْوَةٌ مِّنْ بَنِىْ حَرَامٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَصَلَّاهُمَا فَاَرْسَلْتُ اِلَيْهِ الْجَارِيَةَ ـ فَقُلْتُ قُوْمِىْ بِجَنْبِهِ فَقُوْلِىْ لَهُ تَقُوْلُ اُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَسْمَعُكَ تَنْهٰى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَاَرَاكَ تُصَلِّيْهَا ـ فَاِنْ اَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَاْخِرِىْ عَنْهُ قَالَتْ فَفَعَلَتْ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَاْخَرَتْ عَنْهُ ـ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا ابْنَةَ اَبِىْ اُمَيَّةَ! سَأَلْتُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ اَنَّهُ اَتَانِىْ اَنَاسٌ مِّنْ بَنِىْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْاِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُوْنِىْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ ـ

'হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আব্দুর রহমান ইবনে আজহার ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা কুরাইবকে রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী হজরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে প্রেরণ করেছেন। তাঁরা বললেন, তুমি গিয়ে তাঁর কাছে আমাদের সবার সালাম বলো এবং তাঁকে আসর পরবর্তী দু'রাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো এবং বলো আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, আপনি নাকি এ নামাজ আদায় করেন। অথচ আমাদের নিকট হাদিস পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন এ নামাজ থেকে। হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, আর আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)সহ লোকজনকে এ নামাজ থেকে ফিরাতাম। তারপর আমি আয়েশা (রা.)-এর নিকট প্রবেশ করলাম; তাঁদের প্রেরিত সংবাদ পৌঁছালাম। এতদশ্রবণে তিনি বললেন, বিষয়টি উম্মে সালামা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করো। তখন আমি তাঁদের নিকট চলে এলাম এবং আয়েশা (রা.)-এর কথা তাঁদের কাছে বললাম। তাঁরা আমাকে উম্মে সালামা (রা.)-এর কাছে সেই সংবাদ নিয়ে পুনরায় পাঠালেন, যেমন পাঠিয়েছিলেন আয়েশা (রা.)-এর কাছে। উম্মে সালামা (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি এই দু'রাকাত সম্পর্কে নিষেধ করতে শুনেছি। তারপর তাঁকে এ দু'রাকাত পড়তেও দেখেছি। কিন্তু তিনি তখন এ দু'রাকাত আদায় করেছেন যখন তিনি আসরের নামাজ আদায় করেছেন। এরপর আমার নিকট প্রবেশ করেছেন, আমার কাছে তখন আনসারি গোত্র বনু হারামের কিছু সংখ্যক মহিলা ছিলেন। তারপর তিনি সে দু'রাকাত নামাজ আদায় করলেন। তখন আমি তাঁর নিকট একজন বাঁদি প্রেরণ করলাম। বললাম, তুমি গিয়ে প্রিয়নবী ﷺ-এর পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে। তাঁকে বলবে– উম্মে সালামা আপনাকে জিজ্ঞেস করছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে এ দু'রাকাত আদায়ে নিষেধ করতে শুনেছি। অথচ আপনাকে দেখছি তা আদায় করতে। যদি তিনি হাতে ইশারা করেন, তাহলে তাঁর কাছ থেকে পেছনে সরে আসবে। উম্মে সালামা বলেছেন, তারপর বাঁদি তাই করলো। তিনি হাতে ইঙ্গিত করলেন, ফলে বাঁদি পেছনে সরে এলো। তিনি নামাজ থেকে ফিরে এসে বললেন, হে আবু উমাইয়ার কন্যা! তুমি আমাকে আসরের পর দু'রাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছ। আসলে ব্যাপার হলো, বনু আব্দুল কায়সের কিছু লোক মুসলমান হয়ে

আমার নিকট উপস্থিত হয়েছে, তাঁরা আমাকে জোহর পরবর্তী দু'রাকাত থেকে বিরত রেখেছে। এ হলো সে দু'রাকাত।'

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, হজরত আয়েশা (রা.)-এর জ্ঞানের ভিত্তিও ছিলেন হজরত উম্মে সালামা (রা.)। এ জন্যই তিনি হজরত উম্মে সালামা (রা.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করার জন্য দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। তাছাড়া তাহাবিতে একটি হাদিস আছে এভাবে,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ اَنَّ مُعَاوِيَةَ اَرْسَلَ اِلٰى عَائِشَةَ (رضـ) يَسْأَلُهَا عَنِ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ لَيْسَ عِنْدِىْ صَلَّاهُمَا وَلٰكِنْ اُمُّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْنِىْ اَنَّهُ صَلَّاهُمَا عِنْدَهَا ـ فَاَرْسَلَ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ صَلَّاهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِىْ لَمْ اَرَهُ صَلَّاهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ ـ فَقَالَ هُمَا سَجْدَتَانِ كُنْتُ اُصَلِّيْهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَقُدِّمَ عَلَيَّ قَلَائِصُ مِّنَ الصَّدَقَةِ فَنَسِيْتُهُمَا حَتّٰى صَلَّيْتُ الْعَصْرَ ثُمَّ ذَكَرْتُهُمَا فَكَرِهْتُ اَنْ اُصَلِّيْهُمَا فِى الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ يَرَوْنِىْ فَصَلَّيْتُهُمَا عِنْدَكِ ـ

'হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু সুফিয়ান হতে বর্ণিত যে, মু'আবিয়া (রা.) আয়েশা (রা.)-এর কাছে সংবাদ পাঠালেন, আসরের পর দু'রাকাত সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করার জন্য। জবাবে তিনি তাঁকে বললেন, তিনি এ দু'রাকাত আমার নিকট পড়েননি। তবে উম্মে সালামা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এ দু'রাকাত তাঁর কাছে পড়েছেন। তারপর মু'আবিয়া (রা.) উম্মে সালামা (রা.)-এর কাছে সংবাদ পাঠালেন। জবাবে তিনি বললেন, এ দু'রাকাত রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট পড়েছেন। তবে এর পূর্বে ও পরে এ দু'রাকাত তাঁকে আমি পড়তে দেখিনি। আমি জিজ্ঞেস করেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আসরের পর যে দু'রাকাত নামাজ আদায় করলেন সেটি আবার কোন নামাজ? এ দু'রাকাত তো আপনি পূর্বে ও পরে আর আদায় করেননি। এতদশ্রবণে তিনি বললেন, এ দু'রাকাত আমি জোহরের নামাজের পর পড়তাম। তারপর আমার নিকট সদকার কিছু তাগড়া উটনি এলো। ফলে আমি সে দু'রাকাত নামাজের কথা ভুলে গেছি। আসর পড়ে ফেলেছি। এরপর তা স্মরণে এসেছে। কাজেই এ দু'রাকাত মসজিদে পড়তে আমি অপছন্দ করেছি। কেনোনা, লোকজন আমাকে দেখবে। এজন্য এ দু'রাকাত আমি তোমার কাছে পড়েছি।'

এ হাদিস দ্বারাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হজরত আয়েশা (রা.)-এর জানার ভিত্তি ছিলেন হজরত উম্মে সালামা (রা.)। এরপর সহিহ বোখারি ও মুসলিমের বর্ণনায় হজরত আয়েশা (রা.)-এর পক্ষ হতে নিয়মিত স্থায়ীভাবে আমল করার বিষয়টি বোধগম্য নয়।

০ অধম কোনো কিতাবে এ প্রশ্নের কোনো প্রশান্তিদায়ক জবাব পায়নি। অবশ্য গভীরভাবে চিন্তা করলে যে কথাটি বুঝে আসে সেটি হলো, প্রথমদিকে সর্বাগ্রে এ ঘটনা হজরত উম্মে সালামা (রা.)-এর সামনে সংঘটিত হয়েছিলো। হজরত আয়েশা (রা.) যার সম্পর্কে বলেন,

ليس عندى صلاهما ولكن ام سلمة حدثتنى انه صلاهما عندها ـ

'আমার কাছে দু'রাকাত তিনি আদায় করেননি তবে উম্মে সালামা আমাকে বলেছেন, তিনি তাঁর কাছে এ দু'রাকাত পড়েছেন।'

তবে রাসূল ﷺ-এর অভ্যাস ছিলো, যখন তিনি কোনো কাজ শুরু করতেন তখন তা করে যেতেন নিয়মিত স্থায়ীভাবে। এজন্য তিনি হজরত উম্মে সালামা (রা.)-এর নিকট একবার আসরের পর দু'রাকাত আদায় করে তারপর নিজ এই মা'মুলটি অব্যাহত রেখেছেন। তবে এ অব্যাহত রাখার বিষয়টি সম্পর্কে হজরত আয়েশা (রা.) জানতে পারেন, হজরত উম্মে সালামা (রা.) জানতে পারেননি। তাই হজরত আয়েশা (রা.) বলেন,

[1]ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندى قط ـ

'রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের পর দু'রাকাত নামাজ আমার কাছে কখনও পরিহার করেননি।'

বেশির ভাগ বর্ণনার মাঝে এ ব্যাখ্যার আলোকে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়।

০ তারপর আসরের পর এ দু'রাকাত সাধারণ উম্মতের ক্ষেত্রে কী মর্যাদা রাখে– এতে সামান্য মতভেদ আছে। ইমাম শাফেয়ি (র.) এটাকে বৈধ বলেন। হজরত আয়েশা (রা.)-এর সেসব বর্ণনা দ্বারা তিনি প্রমাণ পেশ করেন যেগুলোতে স্থায়ীভাবে রাসূল ﷺ এ দু'রাকাত আদায় করেছেন বলে উল্লেখ আছে। ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে আসরের পর দু'রাকাত উম্মতের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ। হজরত আয়েশা (রা.)-এর যে বর্ণনায় হজরত রাসূল ﷺ-এর দু'রাকাত স্থায়ীভাবে আদায় করেছেন বলে উল্লেখ আছে সে বর্ণনাটিকে ইমাম আবু হানিফা (র.) তাঁর বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করেন।

ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর প্রমাণ সেসব হাদিস যেগুলোতে আসরের পর দু'রাকাত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। এই আমল রাসূল ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য। উম্মতের জন্য অবৈধতার কয়েকটি দলিল হানাফিদের পক্ষে নিম্নরূপ,

১. তাহাবি[1] মুসনাদে আহমদ এবং সহিহ ইবনে হাব্বানে[2] হজরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, যখন রাসূল ﷺ আসরের পর দু'রাকাত পড়লেন তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

يا رسول الله! افنقضيهما اذا فاتتا، قال لا ـ

এ দু'রাকাত ছুটে গেলে কি 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা আমরা কাজা করবো জবাবে তিনি বললেন, না।'

বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ এ হাদিসটি। হাফেজ ইবনে হাজার (র.) এর জবাব দিতে গিয়ে এর সূত্রটিকে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন।[3] কিন্তু বাস্তবতা হলো, তাহাবি ইত্যাদির সনদের ওপরে তো প্রশ্ন হতে পারে, কিন্তু মুসনাদে আহমদে এ বর্ণনাটি যে সনদে এসেছে সেটি মজবুত। এ কারণে আল্লামা হায়সামি 'মাজমাউজ জাওয়ায়িদ'[4] এই বর্ণনাটি বর্ণনা করার পর বলছেন,

رواه احمد وابن حبان فى صحيحه و رجال احمد رجال الصحيح ـ

ইমাম আহমদ এবং ইবনে হাব্বান তাঁর সহিহে 'হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আহমদের রাবিগণ সহিহ বোখারির বর্ণনাকারি।'

'তালখিসুল হাবিরে' স্বয়ং হাফেজ ইবনে হাজার (র.) 'মুসনাদে আহমদের' সূত্রে এ রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন এবং এর ওপর নীরবতা অবলম্বন করেছেন। অনেকে এর সনদের ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, এটি হাম্মাদ ইবনে সালামা-জায়েদ ইবনে জাদ'আন সূত্রে বর্ণিত। আর যে যুগে হাম্মাদ জায়েদ ইবনে জাদ'আন থেকে হাদিসগুলো গ্রহণ করেছেন তখন জায়েদ ইবনে জাদআনের স্মৃতিশক্তিতে গোলমাল সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু হজরত শাহ সাহেব (র.)-এর এই জবাব দিয়েছেন, আমি সহিহ মুসলিম তালাশ করেছি, দেখলাম তাতে অনেক হাদিস এ সনদে বর্ণিত। আর মুসলিমের বর্ণনাগুলোর বিশুদ্ধতা সর্বজন বিদিত। তখন এই প্রশ্ন হয়ে পরে একেবারে তাৎপর্যহীন।

টীকা- ১. এ হাদিসটি শরহে মা'আনিল আছার : ১ম খণ্ড باب الركعتين بعد العصر -এর শেষের দিকে বর্ণনা ইমাম ত্বাহাবি (র.) করেছেন। তাতে রয়েছে (হজরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন) আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ দু'রাকাত যখন কাজা হয়ে যাবে তখন কি আমি এগুলো পড়ে নিবো? তিনি বললেন, না।

টীকা- ২ মাওয়ারিদুজ্ জাম'আন : ১৬৪, হাদিস নং ৬২৩, قال ابن حبان اخبرنا احمد بن على ابن المثنى نا ابو خيثمة نا يزيد بن هارون نا احمد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن ام سلمة افنصليهما اذا فاتتا قال لا ـ হজরত ইবনে হাব্বান বলেছেন, আহমদ ইবনে আলি ইবনে মুসান্না....... উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত যে, এ দু'রাকাত ছুটে গেলে কি তা আমরা কাজা করবো? জবাবে তিনি বললেন, না।

২. আবু দাউদ শরিফে হজরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনা রয়েছে,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال .

'আসরের পর রাসূল ﷺ নামাজ পড়তেন। তবে অন্যদের তা থেকে নিষেধ করতেন। তিনি একাধারে রোজা রাখতেন অথচ অন্যদেরকে নিষেধ করেছেন এ রোজা রাখতে।'

রাসূল ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য এবং উম্মতের ক্ষেত্রে এ বর্ণনাটি আসরের পর নামাজ অবৈধতার ব্যাপারে স্পষ্ট। হাফেজ ইবনে হাজার (র.) এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের এটা হলো عنعنة। কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক সম্পর্কে এই তাহকিক পবিত্রতা পর্বে হয়ে গেছে যে, তিনি হাসান হাদিসের রাবিদের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁর হাদিসগুলো প্রমাণযোগ্য। এজন্য এ হাদিস বর্ণনা করার পর ইমাম আবু দাউদ (র.) নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তাঁর মতে যা হাদিসের প্রামাণিকতা ও প্রমাণযোগ্যতার আলামত।

৩. সহিহ মুসলিমে হজরত আয়েশা (রা.) আসরের পর দু'রাকাত আদায় সম্পর্কে বলেন, وكان اذا صلى صلوة اثبتها (যখন তিনি কোনো নামাজ পড়তেন, তখন তা স্থায়ীভাবে আদায় করতেন।) রাসূল ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য হওয়ার প্রমাণ পেশ করছে এই বর্ণনার পূর্বাপরও ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الصَّلٰوةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ (ص ٤٥)

অনুচ্ছেদ- ২২ : মাগরিবের আগে নামাজ পড়া প্রসঙ্গে (মতন ৪৫)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلٰوةٌ لِمَنْ شَاءَ .

১৮৫. অর্থ : হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ বললেন, প্রতিটি আজান একামতের মাঝে নামাজ রয়েছে, যার ইচ্ছা (সে পড়তে পারে।)'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফালের হাদিস حسن صحيح। মাগরিবের পর সাহাবায়ে কেরাম নামাজ সম্পর্কে মতবিরোধ করেছেন, তাঁদের অনেকে মাগরিবের পূর্বে নামাজ আদায়ের মত পোষণ করেন না। একাধিক সাহাবি থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা মাগরিবের পূর্বে আজান ও একামতের মাঝে দু'রাকাত নামাজ আদায় করতেন। আহমদ ও ইসহাক (র.) বলেছেন, কেউ এ দু'রাকাত পড়লে ভালো। এ দু'রাকাত পড়া তাদের মতে মোস্তাহাব।

দরসে তিরমিযী

كهمس بن الحسين : বেশির ভাগ কপিতে حسين তাসগির সহকারে আছে। কিন্তু রিজাল শাস্ত্রের গ্রন্থাবলিতে এই নামের কোনো রাবির আলোচনা পাওয়া যায় না। অতএব সহিহ হলো এটা كهمس بن الحسن। এ জন্যই কোনো কোনো মিসরি কপিতে অনুরূপই আছে। بين كل اذانين صلوة لمن شاء

○ এই বর্ণনার বাহ্যিক শব্দাবলি দ্বারা বোঝা যায়, মাগরিবের আজান ও একামতের মাঝে কোনো নামাজ বিধিবদ্ধ আছে। এজন্য মাগরিবের আগে নামাজ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ি (র.) হতে দুটি বক্তব্য বর্ণিত আছে। 'শরহুল মুহাজ্জাবে' আল্লামা নববি (র.) তাঁর থেকে মোস্তাহাবের বক্তব্য বর্ণনা করেছেন; কিন্তু শরহে মুসলিমে বৈধতার। ইমাম আহমদ (র.) থেকেও দুটি বর্ণনা আছে। ইমাম

তিরমিযী (র.) তাঁর মাজহাব মাগরিবের পূর্বে দু'রাকাত মোস্তাহাব বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আল্-মুগনিতে ইবনে কুদামা (র.) বৈধতার বক্তব্য বর্ণনা করেছেন। হানাফি ও মালেকিদের মতে মাগরিবের আগে দু'রাকাত নফল مكروه।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি শাফেয়ি ও হাম্বলিদের প্রমাণ। হানাফিগণ এর জবাবে প্রমাণরূপে সুনানে দারাকুতনি[১] বায়হাকি এবং মুসনাদে বাজ্জারের এই বর্ণনা দ্বারাই প্রমাণ পেশ করেন, যাতে মাগরিবের নামাজকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে। এ কারণে হাদিসটি দারেকুতনি[২] এবং বায়হাকিতে বর্ণিত আছে নিম্নেযুক্ত ভাষায়,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عند كل اذانين ركعتين ما خلا صلوة المغرب .

'রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মাগরিবের নামাজ ব্যতিত অন্যসব আজান একামতের মাঝে দু'রাকাত নামাজ আছে।'

হানাফিদের দলিলও এবং বিরোধীদের জবাবও এ হাদিসটি।

প্রশ্ন : অনেকে এর ওপর প্রশ্ন করেছেন যে, এই ব্যতিক্রমভুক্তি জয়িফ। এমনকি আল্লামা ইবনুল জাওজি (র.) মওজু বা জাল হাদিসের অন্তর্ভুক্ত করে উল্লেখ করেছেন।[৩]

জবাব : প্রথমতো আল্লামা ইবনুল জাওজি (র.)-এর কঠোরতা বিখ্যাত। দ্বিতীয়তো এ বর্ণনাটির পূর্নাঙ্গ তাহকিক করেছেন اللالى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة তে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতি (র.)। বলেন, মূলত হাইয়ান নামক দু'জন রাবি আছেন। একজন হাইয়ান ইবনে আবদুল্লাহ আদ্ দারেমি, আরেকজন হাইয়ান ইবনে উবায়দুল্লাহ আল-বসরি। নিঃসন্দেহে ফাল্লাস বড় মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছেন হাইয়ান দারেমিকে। তবে হাইয়ান বসরি[৪] সত্যবাদী। আর এ বর্ণনাটি বর্ণিত তাঁর সূত্রেই।

এর ওপর ইমাম বায়হাকি (র.) প্রশ্ন করেছেন, আল্লামা সুয়ুতি (র.) যদিও বর্ণনা করেছেন,

رواه حيان بن عبيد الله عن عبد الله بن بريدة واخطأ فى اسناده واتى بزيادة لم يتابع عليها[৫] .

'হজরত হাইয়ান ইবনে উবায়দুল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা হতে এটি বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি এর সনদে ভুল করেছেন। আবার কিছু অতিরিক্ত অংশ বর্ণনা করেছেন যার কোনো মুতাবে' নেই।'

তারপর ইমাম বায়হাকি (র.) ইমাম ইবনে খুজায়মা (র.)-এর বক্তব্যও বর্ণনা করেছেন। তিনি তাতে বলেছেন,

وزاد علما بأن هذه الرواية خطأ ان ابن المبارك قال فى حديثه عن كهمس فكان ابن بريدة يصلى قبل المغرب ركعتين فلو كان ابن بريدة قد سمع من أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم هذا الإستثناء الذى زاد حيان بن عبيد الله فى الخبر مما خلا صلوة المغرب لم يكن يخالف خبر النبى صلى الله عليه وسلم[٦] .

টীকা- ১. দারাকুতনি : ২/৪৭৪, كتاب الصلوة باب من جعل قبل صلوة المغرب ركعتين

টীকা- ২. দারাকুতনি : ১/২৬৪ كتاب الصلوة باب الحث على الركوع بين الاذانين فى كل صلوة والركعتين قبل المغرب والاختلاف فيه

টীকা- ৩. কিন্তু মওজু বলে সিদ্ধান্ত দেননি। শুধু বলেছে, هذا حديث لا يصح অর্থাৎ, এ হাদিসটি সহিহ নয়। الموضوعات لابن الجوزى (رح) ٢/ ٩٢

টীকা- ৪. তার সম্পর্কে আবু হাতেম বলেছেন, 'সত্যবাদী'। আর ইসহাক ইবনে রাওয়াইহ বলেছেন, 'তিনি সত্যবাদী পুরুষ ছিলেন', ইবনে হাব্বান (রা.) তাঁকে নির্ভরযোগ্যদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। আর ইবনে হাজম (র.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'অজ্ঞাত'। কিন্তু তিনি ঠিক বলেননি। اللالى المصنوعة ٢/ ١٥ نقلا عن الميزان

টীকা- ৫. বায়হাকি : ২/৪৭৪।

টীকা- ৬. সুনানে কুবরা-বায়হাকি : ২/৪৭৪ باب من جعل قبل صلوة المغرب ركعتين

'তিনি আরও জানিয়েছেন যে, এ বর্ণনাটি ভুল। 'কাহমাস হতে' ইবনে মুবারক (র.) তাঁর হাদিসে বলেছেন যে, ইবনে বুরায়দা মাগরিবের আগে দু'রাকাত নামাজ পড়তেন। যদি ইবনে বুরায়দা তাঁর পিতা সূত্রে নবী কারিম ﷺ 'মাগরিব ছাড়া' বলে হাদিসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি নবী করিম ﷺ-এর হাদিসের বিরোধিতা করেননি।'

ইমাম বায়হাকি ও ইবনে খুজাইমা (র.)-এর ধারণা যদি সঠিক হয়, তাহলে এই বর্ণনা দ্বারা হানাফিদের প্রমাণ জয়িফ হয়ে যায়।[১]

০ আবু দাউদে[২] বর্ণিত হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর হাদিস হানাফিদের দ্বিতীয় প্রমাণ,

عن طاؤس قال سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها رخص [١] فى الركعتين بعد العصر .

'হজরত তাউস বলেছেন, ইবনে উমর (রা.)-কে মাগরিবের আগে দু'রাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমি তা কাউকে পড়তে দেখিনি। কিন্তু তিনি অনুমতি দিয়েছেন আসরের পর দু'রাকাত পড়ার।'

ইবরাহিম নাখয়ির বর্ণনা হানাফিদের তৃতীয় প্রমাণ,

قال لم يصل ابو بكر ولا عمر ولا عثمان رضى الله تعالى عنهم قبل المغرب ركعتين [٣]

'হজরত আবু বকর, উমর, উসমান (রা.) কেউ মাগরিবের আগে দু'রাকাত পড়েননি।'

তবে এসব বর্ণনা দ্বারা সুন্নত নয় এ কথাতো প্রমাণ করা যায়; কিন্তু অবৈধ এ কথা প্রমাণ করা যায় না। কারণ এসব রেওয়ায়াতে 'পড়েননি' বলা হয়েছে; নিষেধ করেছেন বলা হয়নি। অথচ শাফেয়ি মতাবলম্বীদের নিকট বৈধতার ওপর মজবুত প্রমাণাদি আছে।

১. সহিহ বোখারিতে আছে,

عبد الله بن المزنى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلوة المغرب قال فى الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة [٤] .

'হজরত আবদুল্লাহ মুজানি নবী কারিম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, তোমরা মাগরিব নামাজের আগে নামাজ পড়। তৃতীয় বারে তিনি বললেন, 'যার ইচ্ছা'। লোকজন এটাকে সুন্নত হিসেবে গ্রহণ করবেন– এটা অপছন্দ করার কারণে।'

টীকা- ১. 'আল-জাওয়ারুন্ নাকি'তে আলাউদ্দিন আল-মারদিনি (র.) বলেছেন, 'আমি বলি, ইমাম বাজ্জার (র.) এ হাদিসটি (হাইয়্যান ইবনে উবায়দুল্লাহ আল-বসরির হাদিস) ইমাম বাজ্জার বর্ণনা করেছেন। তারপর বলেছেন হাইয়্যান বসরার অধিবাসী এক ব্যক্তি। তিনি প্রসিদ্ধ। তাঁর মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই। আবু হাতেম তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি সত্যবাদী'। ইবনে হাব্বান (র.) তাঁকে নির্ভরযোগ্য রাবিদের মধ্যে তাবে তাবেইনের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম হাকেম (র.) যিনা অধ্যায়ে তাঁর একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদকে সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন।

অতএব, এটি নির্ভরযোগ্য রাবির অতিরিক্ত অংশ। অতএব, বলতে হবে ইবনে বুরাইদার এখানে দুটি সনদ রয়েছে। ইবনে মুগাফফাল থেকে তিনি এ অতিরিক্ত অংশটুকু শুনেছেন। তিনি তাঁর পিতা থেকে অতিরিক্ত অংশ শ্রবণ করেছেন। টীকা. সুনানে কুবরা বায়হাকি : ২/৫৭৫-৫৭৬ –সংকলক।

টীকা- ২. ১/১৮২ باب الصلوة قبل المغرب এবং এ হাদিসটি ইমাম বায়হাকি (র.) তাঁর সুনানে কুবরা : ২/৮৭৪-৮৭৫ باب من جعل قبل صلوة المغرب ركعتين তেও বর্ণনা করেছেন।

টীকা- ৩. অর্থাৎ, আসরের পর দু'রাক'আতের অনুমতি দিতে আমি কাউকে দেখিনি।

টীকা- ৪. বায়হাকি : ২/৪৭৬ باب من جعل قبل صلوة المغرب ركعتين

২. হজরত আনাস (রা.) থেকে সহিহ বোখারিতে[১] একটি বর্ণনা রয়েছে,

قال كان المؤذن اذا اذن قام ناس من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يبتدرون السوارى حتى يخرج النبى صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيئ

'তিনি বলেছেন, মুয়াজজিন যখন আজান দিতেন তখন অনেক সাহাবি স্তম্ভগুলোর দিকে দৌড়ে যেতেন, নবী করিম ﷺ-এর বের হবার আগে। তাঁরা তখন মাগরিবের আগে দু'রাকাত নামাজ আদায় করতেন। তবে আজান ও ইকামতের মাঝে কোনো কিছু নেই।

৩. আবু দাউদে[২] একটি বর্ণনা আছে,

عن أنس مالك قال صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت لأنس أراكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رانا فلم يأمرنا ولم ينهنا ـ

অর্থ : হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মাগরিবের আগে আমি দু'রাকাত নামাজ আদায় করেছি। বর্ণনাকারি বলেন, আমি আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ কি আপনাদের (তা করতে) দেখেছেন? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমাদেরকে দেখেছেন, তবে এ ব্যাপারে তিনি আমাদেরকে আদেশও দেননি আবার নিষেধও করেননি।'

এসব বর্ণনা দ্বারা মাগরিবের আগে দু'রাকাত বৈধ প্রমাণিত হয়। তাই মুতা'আখখিরিন হানাফিদের মধ্যে শায়খ ইবনে হুমাম (র.) বৈধতার বক্তব্যটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই বক্তব্যটিকে প্রাধান্য দিয়ে হজরত শাহ সাহেব (র.)ও বলেছেন, অনেক বর্ণনা দ্বারা মাগরিবের আগে দু'রাকাত মোস্তাহাব নয় একথা তো প্রমাণিত হয়; কিন্তু এটাকে মাকরূহ কিংবা বিদআত বলার কোনো সুযোগ নেই।

মোটকথা, মাগরিবের আগে দু'রাকাত বর্ণনাগুলোর আলোকে বৈধ। অবশ্য তা না পড়া উত্তম মনে হয়। যার কারণ দুটি,

এক. মাগরিবের নামাজ বিভিন্ন হাদিসে তাড়াতাড়ি পড়ার তাকিদ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রদান করা হয়েছে। আর এ দু'রাকাত এর পরিপন্থি।

দুই. অধিকাংশ সাহাবি এই দু'রাকাত পড়তেন না এবং হাদিসসমূহের সহিহ অর্থ সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত হয়। যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম সাধারণতো এগুলো বর্জন করেছেন এজন্য তরক করাই উত্তম মনে হয়।[৩] অবশ্য কেউ পড়লে তা নিন্দনীয়ও না।

টীকা- *১. ১/৮৭ كتاب الأذان باب كم بين الأذان والإقامة -সংকলক।*

টীকা- *২. ১/১৮২. باب الصلوة قبل المغرب ।*

টীকা- *৩. হজরত সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব (র.)-এর কাছে মাগরিবের আগে দু'রাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে জবাবে তিনি বললেন, 'সা'দ ইবনে মালেক ব্যতিত অন্য কোনো ফকিহকে এ দু'রাকাত পড়তে আমি দেখিনি।' আর আবু সায়িদ আল জাদরির বক্তব্য হলো, 'সা'দ ইবনে-মালেক ব্যতিত কোনো সাহাবিকে আমি এই দু'রাকাত পড়তে দেখিনি।' মু'তাসার, বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ (৪/১১৫) আহমদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন আমি শুধু তা একবার করেছি। লোকজনকে তা আমি করতে দেখিনি, ফলে আমি তা বর্জন করেছি। –মা'আরিফুস সুনান : ২/১৪৫-১৪৬ থেকে চয়নকৃত। সংকলক*

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ (صـ ٤٥)

অনুচ্ছেদ- ২৩ : সূর্যাস্তের আগে যে এক রাকাত আসরের নামাজ আদায় করেছে (মতন ৪৫)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الْعَصْرَ .

১৮৬. অর্থ : হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ বলেছেন, যে সূর্যোদয়ের আগে এক রাকাত নামাজ পেলো সে ফজরের নামাজ পেলো। আর যে সূর্যাস্তের আগে আসরের এক রাকাত পেলো সে আসরের নামাজ পেলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আয়েশা (রা.) হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح। আমাদের সঙ্গীগণ এবং শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক (র.) এ মতই পোষণ করেন। তাঁদের মতে এ হাদিসের উদ্দেশ্য ওজর বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য। যেমন কেউ নামাজ না পড়ে ঘুমাল। অথবা নামাজ পড়তে ভুলে গেলো, তারপর জাগ্রত হলো এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় নামাজের কথা স্মরণ করলো।

দরসে তিরমিযী

فقد ادرك الصبح : এই হাদিসটির দ্বিতীয় অংশটি ঐকমত্য। অর্থাৎ যদি আসর নামাজের মাঝে সূর্যাস্ত হয়ে যায় আর বাকি নামাজ সূর্যাস্তের পর আদায় করা হয় তাহলে নামাজ আদায় হয়ে যায়। অবশ্য ইমাম তাহাবি (র.)-এর মাজহাব হলো, ফজর এবং আসর উভয়টিতে নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। প্রথমাংশের ব্যাপারে হানাফি এবং ইমামত্রয়ের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইমামত্রয় ফজর এবং আসরের মাঝে কোনো পার্থক্য করেন না। ফজরেও নামাজ ফাসেদ হয় না বলে হুকুম দেন। তবে ফজর নামাজকে হানাফিগণ বলেন ফাসেদ।

যদি সূর্য উপরে উঠা পর্যন্ত মুসল্লি অপেক্ষা করে এবং এরপর দ্বিতীয় রাকাত পড়ে তবে সেটা নফল হয়ে যায় ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ (র.) -এর মতে। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে নামাজ সম্পূর্ণ বাতিল।

আলোচ্য অধ্যায়ের হাদিস দ্বারা ইমামত্রয়ের এবং জমহুর প্রমাণ পেশ করেন। যাতে বলা হয়েছে,

من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر .

ফজর এবং আসরের মাঝে এ হাদিসে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। আলোচ্য অধ্যায়ের হাদিসটি হানাফিদের সম্পূর্ণ বিরোধী। বিভিন্ন মাশায়েখে হানাফিয়া এর জবাব দেওয়ার প্রতি বিশেষ জোর দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, প্রশান্তিদায়ক কোনো জবাব প্রদান করা যায়নি। হানাফি মাজহাবে এ কারণে এ হাদিসটিকে করা হয়েছে জটিলসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

তাহাবি (র.) মাকরূহ ওয়াক্তগুলোতে নামাজ নিষিদ্ধ সংক্রান্ত হাদিসগুলো দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন এবং আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটির এ ব্যাখ্যা দেন যে, এ হাদিসটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাদের ওপর প্রথমবার নামাজ ফরজ

হচ্ছে। যেমন, শিশু যখন বালেগ হয়, কাফের যখন মুসলমান হয়, এমনভাবে ঋতুবতী যখন পবিত্র হয়ে যায়। হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, যদি তারা এতোটুকু সময় পেয়ে যায়, যাতে এক রাকাত আদায় করা যায়, তবে তাদের ওপর নামাজ ফরজ হয়ে গেলো। এর কাজা ওয়াজিব। এই উদ্দেশ্য নয় যে, তারা যদি তখন এক রাকাত পড়ে আরেক রাকাত পরে পড়ে তবে নামাজ জায়েজ হবে। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি আসলে ইমাম তাহাবি (র.)-এর মতে এমন,

من ادرك من الصبح وقت ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك وجوب صلوة الصبح ومن ادرك من العصر وقت ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك وجوب صلوة العصر ـ

'সূর্যোদয়ের আগে ফজরের এক রাকাতের ওয়াক্ত পেলো, সে ফজরের নামাজের উজুব বা আবশ্যকতা পেয়ে গেলো। আর যে সূর্যাস্তের আগে আসরের এক রাকাতের সময় পেল সে আসরের নামাজের ওয়াজিব হওয়া পেয়ে গেলো।'

প্রশ্ন : এখানে তাহলে ফজর আর আসর খাস করার কারণ কি? এ হুকুম তো পাঁচ নামাজেই সমান।

জবাব : ইমাম তাহাবি (র.)-এর এই জবাব দেন যে, ফজর আর আসরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া যেহেতু সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট, এজন্য বিশেষভাবে এগুলোর কথা আলোচনা করা হয়েছে। অন্যথায় হুকুম ব্যাপকই। কিন্তু ইমাম তাহাবি (র.)-এর ব্যাখ্যা সেসব রেওয়ায়াতে অচল, যেগুলোতে[১] فليتم صلوته ২ يتم صلوته (সে যেনো তার নামাজ পূর্ণ করে) অথবা[৩] فليصل اليها اخرى (সে যেনো এর সাথে আরেক রাকাত মিলিয়ে পড়ে।) শব্দ অতিরিক্ত এসেছে। অথবা যেগুলোর শব্দ নিম্নেযুক্ত,

من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس وركعة بعد ما تطلع فقد ادرك الصبح ٤ ـ

'সূর্যোদয়ের আগে এক রাকাত এবং সূর্যোদয়ের পর এক রাকাত পেলো, সে ফজরের এক রাকাত পেলো।'

ইমাম তাহাবি (র.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী এসব শব্দের কোনো ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

এটাতো ছিলো ইমাম তাহাবি (র.)-এর মাজহাব এবং যেসব হানাফি ফজর এবং আসরের মাঝে ব্যবধানের প্রবক্তা তাঁদের মতে আলোচ্য হাদিসের ব্যাখ্যা খুবই মুশকিল।

০ হানাফিদের পক্ষ থেকে যে প্রমাণ পেশ করা হয় সেটি হচ্ছে, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস সেসব হাদিসের বিরোধী, যেগুলোতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় নামাজ পড়তে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। যখন দু'ধরনের হাদিস পরস্পর বিরোধী হলো, কাজেই উভয়টি বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং, বাতিল হয়ে যাওয়ার কারণে আমরা কিয়াসের শরণাপন্ন হলাম। আর কিয়াসের দাবি হলো, ফজরের নামাজ ফাসেদ এবং আসর সঠিক হওয়া। কেনোনা ফজরের ওয়াক্তে কোনো অসম্পূর্ণ সময় নেই, পূর্ণ ওয়াক্তই কামেল বা পূর্ণাঙ্গ। অতএব শেষ ওয়াক্তে তার ওপর নামাজ ওয়াজিব হয়েছে পূর্ণাঙ্গরূপে। কিন্তু সূর্যোদয় প্রতিবন্ধক হওয়ার কারণে আদায় হলো অসম্পূর্ণভাবে। আর পূর্ণাঙ্গভাবে ওয়াজিব হলে আদায় যদি অসম্পূর্ণ হয়, তাহলে তা ফাসেদের কারণ হয়। এর পরিপন্থি আসরের ওয়াক্তে সূর্য হরিদ্রা রং ধারণ করা থেকে নিয়ে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময়টুকু অসম্পূর্ণ। কাজেই যে ব্যক্তি আসরের শেষ সময়ে নামাজ আরম্ভ করেছে অসম্পূর্ণভাবে তার ওপর নামাজ ওয়াজিব হয়েছে, আবার আদায়ও হলো অসম্পূর্ণভাবে। যেহেতু যেমনিভাবে ওয়াজিব হয়েছে তেমনিভাবে আদায়ও করেছে, এ জন্য তার নামাজ নষ্ট হয়নি।

টীকা- ১. সুনানে কুবরা– বায়হাকি : ১/৩৭৯ كتاب الصلوة باب الدليل على انه لا تبطل بطلوع الشمس فيها

টীকা- ২. দারাকুতনি : ১/৩৮৩ . باب قضاء الصلوة بعد وقتها ومن دخل فى صلوة فخرج وقتها قبل تمامها

টীকা- ৩. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বায়হাকি সুনানে কুবরায় : ১/৩৭৯ باب الدليل على انه لا تبطل بطلوع الشمس فيها *এবং সুনানে দারাকুতনি : ১/৩৮২* باب قضاء الصلوة بعد وقتها ومن دخل فى صلوة فخرج وقتها قبل تمامها

টীকা- ৪. বায়হাকি ১/৩৮২ باب الدليل على انه لا تبطل بطلوع الشمس فيها

এ ব্যাখ্যাটিই পেশ করা হয় মাশায়েখে হানাফিয়ার পক্ষ হতে। শায়খ ইবনে হুমাম (র.)-ও এ ব্যাখ্যাই করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এই ব্যাখ্যার ওপর অগণিত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। যেমন একটি প্রশ্ন হয় যে, এসব ব্যাখ্যা আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস এবং মাকরূহ ওয়াক্তগুলোতে নামাজ নিষিদ্ধ সংক্রান্ত হাদিসগুলোর মাঝে বিরোধ প্রমাণ করার ওপর নির্ভরশীল। অথচ বাস্তবিক পক্ষে উভয়ের মাঝে কোনো প্রকার বিরোধ নেই। কেনোনা, সেখানে শুধু নিষেধ রয়েছে। নফি নেই। আর এখানে রয়েছে ইসবাত বা হ্যাঁ। পরস্পর বিরোধ হয় নফি আর ইসবাত বা হ্যাঁ-না এর মাঝে। নাহি আর ইসবাতের মাঝে নয়। অন্য ভাষায় নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদিসের আলোচ্য বিষয় হলো বৈধতা এবং অবৈধতার। আর আলোচ্য হাদিসের আলোচ্য বিষয় ফাসেদ হওয়া না হওয়া। বিশেষতো হানাফিদের মাজহাব অনুযায়ী তো নিশ্চিতরূপে বিরোধ হয় না। কারণ হানাফিদের মূলনীতি হলো, শরয়ি কাজকর্ম থেকে নিষেধাজ্ঞা নিষিদ্ধ বস্তুর বিশুদ্ধতাকে আবশ্যক করে। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, হানাফিগণ ক্রিয়াকে দু'প্রকারে ভাগ করেছেন আফআলে শরয়িয়্যাহ ও আফআলে হিস্‌সিয়্যাহ।

এক. আফআলে শরয়িয়্যাহ হলো, সেসব ক্রিয়া যেগুলোর সংজ্ঞা এবং হাকিকত ও শর্ত-শরায়েত শরিয়ত আসার আগে জানা ছিলো না। যেমন– নামাজ, জাকাত, রোজা এসব।

দুই. আফআলে হিস্‌সিয়্যাহ। শরিয়তের ওপর এগুলোর হাকিকত জাঁনা মওকুফ ছিলো না। যেমন, জিনা ইত্যাদি। এসব ক্রিয়ার ফল শরয়ি মতেও ধর্তব্য নয়। অর্থাৎ, এতে নিষেধাজ্ঞা দ্বারা নিষিদ্ধতা ও অশুদ্ধতা দুটোই প্রমাণিত হয়। কিন্তু আফআলে শরয়িয়্যাহ বা শরয়ি কর্মগুলো অন্য রকম। কারণ এগুলোতে নিষেধাজ্ঞার ফল হলো, শুধু নিষিদ্ধতা, অশুদ্ধতা নয়। যেমন, হাদিসে[১] কোরবানির দিনগুলোতে রোজা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। কিন্তু হানাফিদের মতে কোরবানির দিন রোজা রাখা নাজায়েজ হওয়া সত্ত্বেও ধর্তব্য হয়। অর্থাৎ যদি রেখে ফেলে তবে শুদ্ধ হয়ে যাবে। অন্যথায় সাধ্যাতীত বিষয়ের দায়িত্ব অর্পণ আবশ্যক হয়ে পড়বে। কারণ নিষেধাজ্ঞা এমন জিনিস সম্পর্কেই হতে পারে যেগুলো ক্ষমতাধীন। অন্যথায় নাহি তথা নিষেধ আর নাহি থাকতো না; বরং নফি হয়ে যেতো। এর বিপরীত ইন্দ্রিয়ানুভূত কাজগুলো। এগুলোর অস্তিত্ব শরিয়ত ব্যতিত সম্ভব। কাজেই যদি শরিয়ত মতে এসব ক্রিয়ার ফল মেনে না নেওয়া হয় তাহলে ক্রিয়ার নফি আবশ্যক হতো না। এমন করে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় নামাজ নিষেধ হওয়ার অর্থ হবে তখন নামাজ পড়া তো বৈধ নয়, কিন্তু যদি কেউ পড়ে ফেলে তাহলে নামাজ হয়ে যাবে। এ কথাটি হানাফিদের মূলনীতির হুবহু মুতাবেক। এ বিষয়টি যখন নির্ধারিত হয়ে গেলো যে, নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদিসগুলো নামাজের অবৈধতা বোঝায়, আর আলোচ্য অধ্যায়ের হাদিসটি বোঝায় নামাজের বিশুদ্ধতা। সুতরাং কোনো বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। আর যখন বিরোধ রইলো না, সুতরাং কিয়াসের শরণাপন্ন হওয়াও এখন বেহুদা।

এই প্রশ্নটি খুবই শক্তিধর। পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের গ্রন্থরাজিতে এর কোনো সমাধান পাওয়া যায় না। অবশ্য 'বাওয়াদিরুন্ নাওয়াদির' নামক গ্রন্থে হাকিমুল উম্মত হজরত মাওলানা আশরাফ আলি থানবি (কু. সি.) এ প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, মাকরূহ ওয়াক্তে নামাজ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা শুধু নাহি নয়, বরং নফিও। কেনোনা, হজরত আবু সায়িদ খুদরি (রা.)-এর শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত এসেছে,

لا صلوة بعد الفجر حتى تبزغ[২] الشمس ولا صلوة بعد العصر حتى تغرب الشمس [৩] -

'সূর্যোদয়ের আগে ফজরের নামাজের পর কোনো নামাজ নেই এবং সূর্যাস্তের আগে আসরের নামাজের পর কোনো নামাজ নেই।'

এটা নাহি নয়; বরং নফি। যা থেকে বোঝা যায় যে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় নামাজ শুধু অবৈধই নয়; বরং ফাসেদও। আর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে তা সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং বিরোধ প্রমাণিত হলো এবং

টীকা- ১. মুসলিমের (১/৩৬০) হাদিসগুলোতে অনুরূপ রয়েছে। باب تحريم صوم يومى العيدين

টীকা- ২. تبزغ *অর্থাৎ, উদিত হওয়া।*

টীকা- ৩. নাসায়ি : ১/৬৬, ছাপা মাকতাবা সালাফিয়া, লাহোর। كتاب المواقيت باب النهى عن الصلوة بعد العصر

কিয়াসের শরণাপন্ন হওয়া যথার্থ হলো। যদিও হযরতের এ তাহকিক অন্য সব তাহকিকের তুলনায় অধিক গ্রহণযোগ্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও সমস্যাটির সমাধান হয়েছে বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে না। প্রথমতো এ জন্য যে, لا صلوة অনেক ক্ষেত্রে নাহির অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন রাসূল ﷺ-এর হাদিস لا صلوة لجار المسجد الا فى المسجد[১] (মসজিদের প্রতিবেশীর কোনো নামাজ নেই মসজিদ ব্যতিত) ও لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب[২] (যে সূরা ফাতেহা পড়ে না, তার কোনো নামাজ হয় না।)-এ।

এমনভাবে ওপরযুক্ত হাদিসেও নফি নাহির অর্থে আসতে পারে। আর উল্লিখিত হাদিসের এ ব্যাখ্যা উত্তম দুই কারণে।

প্রথমতো এজন্য যে, অন্য সব বর্ণনায় নাহির শব্দ এসেছে। বস্তুত শুধুমাত্র একটি বর্ণনাকে অনেকগুলো বর্ণনার ওপর প্রযোজ্য ধরা উত্তম হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়তো নফির অর্থ নিলে বিরোধ সাব্যস্ত হয়। যা দ্বারা বাতিল বলার প্রয়োজন হয়। আর নাহির অর্থ নিলে বিরোধের অবসান ঘটে। স্পষ্ট বিষয় হলো, এমন অর্থ উদ্দেশ্য করা উত্তম যা দ্বারা বৈপরীত্যের অবসান ঘটে, এমন অর্থের তুলনায় যা উদ্দেশ্য করলে বৈপরীত্য প্রমাণিত হয় এবং পূর্ণ বর্ণনাই বাতিল হয়ে যায়, যাকে বলে ابطال الشئ بنفسه বা নিজেই নিজেকে বাতিল করে দেওয়া।

প্রথমতো যদি বিরোধ মেনেও নেওয়া হয়, তাহলেও যে কিয়াস হানাফিগণ পেশ করেছেন, স্বয়ং তাতে ওয়াজিব ও আদায় হওয়ার মধ্যে পূর্ণতা ও ত্রুটির দিকে লক্ষ্য করে নামাজ ফাসেদ হওয়ার বিষয়টি প্রশ্ন সাপেক্ষ্য। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, যদিও ওয়াজিব হুবহু আদায়ের সময়ই হয়ে থাকে, কিন্তু সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব হয়ে থাকে ওয়াক্তের শুরুতে। অতএব, শুধু ওয়াজিবের দিকে লক্ষ্য করলে না ফজরের নামাজ জায়েজ হওয়ার কথা, না আসরের। দ্বিতীয়তো وجوب اداء-ই যদি ধর্তব্য হয় তাহলেও এ মূলনীতি স্বীকৃত নয় যে, وجوب اداء যদি পূর্ণাঙ্গ ওয়াক্ত হয় আর আদায় করা হয় অসম্পূর্ণ ওয়াক্তে, তবে সেটি নামাজ ফাসেদ হওয়ার কারণ হয়ে যায়। কারণ এর দাবি হলো, যদি কোনো ব্যক্তি সূর্য হলুদ আকার ধারণ করার সামান্য পূর্বে পূর্ণাঙ্গ ওয়াক্তে আদায় শুরু করে দেয় আর হলুদ রং ধারণ করার পর মাকরূহ সময়ে শেষ করে তাহলে তার নামাজও ফাসেদ হওয়ার কথা। কেনোনা, وجوب اداء হয়েছে কামেল ওয়াক্তে, আর আদায় হয়েছে নাকেস ওয়াক্তে। কিন্তু এমন নামাজ ফাসেদ হওয়ার কথা কেউ বলেন না। মোটকথা, হানাফিদের এ কিয়াসের ওপর বিভিন্ন রকমের প্রশ্নাবলির কোনো সন্তোষজনক জবাব অধম এখনও পায়নি।

০ আল্লামা ইবনুল মালেক (র.) তৃতীয় আরেকটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেটি হলো فقد ادرك الصبح দ্বারা উদ্দেশ্য فقد ادرك ثواب الصبح। আর উদ্দেশ্য হবে এই যে, কোনো ব্যক্তি যদি সূর্যোদয়ের আগে এক রাকাত পড়ে ফেলে তাহলে সে ফজর নামাজের সওয়াব পেয়ে যাবে। যদিও তার নামাজ ফাসেদই হোক না কেনো, আর তার ওপর কাজা আবশ্যক হোক না কেনো। কিন্তু এর ওপর প্রশ্ন হয় যে, সহিহ বোখারিতে[৩] এই হাদিসটির সাথে فليتم صلوته এবং সুনানে বায়হাকিতে[৪] فيصلى اليها اخرى শব্দ এসেছে। এসব শব্দের ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যা অমিল রয়ে যায়।

আলোচ্য হাদিসটির আরেকটি ব্যাখ্যা হজরত শাহ সাহেব (র.) দিয়েছেন। সেটি হলো, এই হাদিসটি মূলত মাসবুক সংক্রান্ত। এর উদ্দেশ্য তাই যা হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর অপর একটি মারফু হাদিসের। হাদিসটি হলো,

من ادرك ركعة من الصلوة فقد ادرك الصلوة[৫] -

টীকা- ১. দারাকুতনি : ১/১২০ كتاب الصلوة، باب الحث لجار المسجد على الصلوة فيه عن الصلوة بعد العصر

টীকা- ২. মুসলিম : ১/১৬৯। باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة وانه اذا لم يحسن الفاتحة ولا امكنه تعلمها قرأ ما تيسر له غيرها

টীকা- ৩. ১/৭৯, কিতাবু মাওয়াকিতিস্ সালাত باب من ادرك ركعة من العصر। 'আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামাজের এক রাকাত পায়, সে যেনো তার নামাজ পূর্ণ করে। আর যখন সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাকাত পায় তখন যেনো সে তার নামাজ পূর্ণ করে।'

টীকা- ৪. বায়হাকি ১/৩৭৯ باب الدليل على انها لا تبطل بطلوع الشمس فيها

টীকা- ৫. বোখারি : ১/৮২, كتاب المواقيت الصلة، باب من ادرك من الصلوة ركعة

'মাসবুক এক রাকাতও যদি পেয়ে যায়, তাহলে সে জামাতের সাওয়াব লাভ করবে।' কিন্তু তার ওপরও সে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, তাহলে আসর এবং ফজরকে কেনো খাস করা হলো? এর জবাব হজরত শাহ সাহেব (র.) এই দিয়েছেন যে, এই দুটি নামাজের গুরুত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। যেমন হজরত ইবনে ফুজালা (রা.)-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে [১] حافظ على العصرين (ফজর এবং আসর এ দুটি নামাজের হেফাজত করো)

প্রশ্ন : হজরত শাহ সাহেব (র.)-এর এই ব্যাখ্যার ওপর একটি প্রশ্ন হলো যে, এ হাদিসটি বায়হাকি 'সুনানে কুবরা'য় বর্ণনা করেছেন নিম্নেযুক্ত ভাষায়,

من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس و ركعة بعد ما تطلع فقد ادرك الصبح [২]

এ থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, সূর্যোদয়ের পর এক রাকাত পড়লে নামাজ ফাসেদ হয় না।

জবাব : এ প্রশ্নের জবাব হজরত শাহ সাহেব (র.) এই দিয়েছেন যে, মূলত এ হাদিসটি হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর আরেকটি হাদিসের সার-সংক্ষেপ। যাতে বলা হয়েছে,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس [৩] -

'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ফজরের দু'রাকাত পড়েনি সে যেনো তা সূর্যোদয়ের পরে পড়ে নেয়।'

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে এ দুটি বর্ণনা বর্ণিত এবং উভয়টির নির্ভরস্থল কাতাদা। এজন্য এ দুটিই বাহ্যত একই হাদিস। আর এতে সূর্যোদয়ের আগে এক রাকাত দ্বারা উদ্দেশ্য ফরজ নামাজ, যেটি সে সূর্যোদয়ের পর আদায় করেছে। আর সূর্যোদয়ের পরে এক রাকাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফজরের সুন্নতসমূহ, যেগুলো সে সূর্যোদয়ের পরে আদায় করবে।

০ তবে এ ব্যাখ্যার ওপর একটি শক্তিশালী প্রশ্ন হয় যে, বায়হাকিতে[৪] পূর্ণাঙ্গ বর্ণনাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে,

من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس وركعة بعد ما تطلع فقد ادرك الصبح

ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس وثلاثا بعد ما تغرب فقد ادرك العصر -

'যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের আগে ফজরের এক রাকাত আর এক রাকাত সূর্যোদয়ের পর পেলো, সে ফজরের নামাজ পেলো। আর যে সূর্যাস্তের পূর্বে এক রাকাত আসর পেলো আর তিন রাকাত পেলো সূর্যাস্তের পরে, সে আসরের নামাজ পেলো।'

মনে রাখতে হবে যে, এ হাদিসের দ্বিতীয় অংশে রাকাত দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে না সুন্নত। সুতরাং এ হাদিসের প্রথমাংশেও রাকাত দ্বারা ফজরের সুন্নত উদ্দেশ্য নেওয়া জটিল। স্বয়ং মাআরিফুস্ সুনান গ্রন্থকার শাহ সাহেবের এই ব্যাখ্যাটিকে অনেক বিস্তারিতভাবে বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু স্বয়ং নিজেও তিনি স্বীকার করেছেন যে, এতেও মনে প্রশান্তি আসে না। তাছাড়া এসব ব্যাখ্যার ওপর একটি যৌথ প্রশ্ন হয় যে, একটি হাদিসকে নিজ বাহ্যিক অর্থ থেকে অন্য দিকে নিয়ে তা'বিল করা কোনো নস অথবা শরয়ি প্রমাণের কারণে হতে পারে। এ ব্যাপারে আসর ও ফজরের মাঝে পার্থক্য করার জন্য হানাফিদের নিকট কোনো স্পষ্ট নস বা প্রমাণ নেই। শুধু কিয়াস আছে। তাও আবার দৃঢ় না।

টীকা- ১. আবু দাউদ : ১/৬১ باب المحافظة على الصلوات পূর্ণ বর্ণনাটি এমন- ফুজালা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি যেসব বিষয় আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে- পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের হেফাজত করো। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, এ সময়গুলোতে আমার ব্যস্ততা রয়েছে। অতএব, আপনি আমাকে একটি ব্যাপক বিষয়ের নির্দেশ দিন। যখন আমি তা করবো তা আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। এ শুনে তিনি বললেন, তুমি দুই আসরের নামাজের হেফাজত করো। অথচ এটি আমাদের ভাষায় ছিলো না। আমি জিজ্ঞেস করলাম দুই আসরের নামাজ কি? জবাবে তিনি বললেন, সূর্যোদয়ের পূর্বে এক নামাজ আর সূর্যাস্তের পূর্বে এক নামাজ। -সংকলক

টীকা- ২. সুনানে কুবরা বায়হাকি : ১/৩৭৯ باب الدليل على انها لا تبطل بطلوع الشمس فيها ।

টীকা- ৩. তিরমিযী : ১ম খণ্ড ابواب الصلوة باب ما جاء في اعادتهما بعد طلوع الشمس ।

টীকা- ৩. বায়হাকি : ১/৩৭৯, كتاب الصلوة باب الدليل على انها لا تبطل بطلوع الشمس فيها

এ মাসআলাতে হানাফিদের পক্ষ হতে এমন কোনো একটি ব্যাখ্যাও এখন পর্যন্ত অধমের দৃষ্টিতে পড়েনি, যেটি প্রশান্তিদায়ক ও পূর্ণাঙ্গ। এজন্য হাদিসকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হানাফিদের মাজহাবের ওপর ফিট করা কোনো ক্রমেই সঙ্গত নয়। এ জন্যই হজরত গাঙ্গুহি (র.) বলেছেন, এ হাদিসের ব্যাপারে হানাফিদের সমস্ত ব্যাখ্যা নিস্তেজ এবং হাদিসে টানা-হেচঁড়া করার পরিবর্তে মুক্ত মনে স্পষ্ট আকারে বলা উচিত যে, এ সম্পর্কে হানাফিদের প্রমাণাদি আমাদের অবোধগম্য এবং এসব ওয়াক্তে নামাজ পড়া অবৈধ তো ঠিক, কিন্তু যদি কেউ পড়ে ফেলে তাহলে তা আদায় হয়ে যাবে।

হজরত গাঙ্গুহি (র.)– ব্যতিত 'বাহরুর রায়েক' গ্রন্থকার এবং আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানি (র.) ও প্রমাণাদি লক্ষ্য করে ইমামত্রয়ের মাজহাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সম্ভবতো এ কারণেই ইমাম আবু ইউসুফ (র.) হতে এমন এক বর্ণনা বর্ণিত আছে যে, সূর্যোদয়ের কারণে ফজরের নামাজ ফাসেদ হয় না। অবশ্য তিনি বলেন যে, যদি নামাজের ভেতরে সূর্যোদয় হয়ে যায়, তাহলে মুসল্লির উচিত সে সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা, যতোক্ষণ না সূর্যোদয় ঘটে এবং সূর্য উপরে উঠে যায়। তারপর উচিত নামাজ পূর্ণ করা।[১]

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ (صـ ٤٦)

অনুচ্ছেদ- ২৪ : দুই ওয়াক্ত নামাজ একসঙ্গে আদায় করা প্রসঙ্গে (মতন ৪৬)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِيْنَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ قَالَ فَقِيْلَ لَه ابْنَ عَبَّاسٍ (رضـ) مَا اَرَادَ بِذٰلِكَ؟ قَالَ اَرَادَ اَنْ لَّا تَحْرَجَ اُمَّتُهُ ـ

১৮৭. অর্থ : হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জোহর, আসর এবং মাগরিব ও এশার নামাজ একত্রে পড়েছেন। অথচ কোনো ভয়ও ছিলো না, বৃষ্টিও ছিলো না। বর্ণনাকারি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, এর দ্বারা তিনি কি উদ্দেশ্য করেছেন? জবাবে তিনি বললেন, উম্মত কষ্টে পতিত হোক তা তিনি চাননি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এ হাদিসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, সায়িদ ইবনে জুবায়র এবং আবদুল্লাহ ইবনে শাকিক আল-উকায়লি এটি বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيٰى بْنُ خَلَفٍ الْبصرى حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابيه عن حنش عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ اَتٰى بَابًا مِّنْ اَبْوَابِ الْكَبَائِرِ ـ

১৮৮. অর্থ : হজরত আবু সালামা ইয়াহইয়া ইবনে খালাফ আল-বাসরি-মু'তামির ইবনে সুলায়মান-তার পিতা- হানাশ-ইকরিমা-ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী করিম ﷺ হতে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, যে কোনো ওজর ব্যতিত দুই ওয়াক্ত নামাজ একসঙ্গে আদায় করলো যে, অনেকগুলো কবিরা হতে একটি কবিরা গোনাহের অধ্যায় আরম্ভ করলো।

টীকা- ১. যেনো এটাকে ভালো মনে করেছেন। যাতে নামাজের কিছু অংশ ওয়াক্তের মধ্যে আদায় হয়। আর যদি নামাজ ফাসেদ করে ফেলে তাহলে পূর্ণ নামাজ ওয়াক্তের বাইরে আদায়কারি হবে। অথচ নামাজে কিছু অংশ ওয়াক্তের ভেতরে আদায় করা ওয়াক্তের বাইরে পূর্ণ নামাজ আদায় করা অপেক্ষা উত্তম। সাগনাকি (র.) মাবসুতের বরাতে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। মাআরিফুস সুনান/ফাতহুল মুলহিম/... তানকিহ : ২/২৪৫ والله اعلم

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হানাশ হলেন, আবু আলি আর্-রাহাভি। তিনি হলেন, হানাশ ইবনে কায়স এবং তিনি মুহাদ্দিসিনের নিকট জয়িফ। আহমদ প্রমুখ তাঁকে জয়িফ বলেছেন। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রেও পড়তে পারবে না, হ্যাঁ, সফর এবং আরাফার ব্যাপার ভিন্ন। কোনো কোনো তাবেয়ি আলেম রুগ্ন ব্যক্তির জন্য দুই ওয়াক্ত নামাজ এক ওয়াক্তে পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। আহমদ ও ইসহাক (র.) এ মতই পোষণ করেন। আর কোনো কোনো আলেম বলেছেন শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক। কিন্তু ইমাম শাফেয়ি (র.) রোগীর জন্য দুই নামাজ একত্রে পড়ার পক্ষে না।'

দরসে তিরমিযী

جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر : আয়িম্মায়ে কেরামের এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, বিনা ওজরে দুই (ওয়াক্ত) নামাজ একত্রে পড়া অবৈধ। অবশ্য ইমাত্রয়ের মতে ওজর অবস্থায় দুই নামাজ একত্রে পড়া জায়েয আছে। তারপর ওজরের বিস্তারিত বিবরণে মতবিরোধ রয়েছে। শাফেয়ি এবং মালেকিদের মতে সফর ও বৃষ্টি ওজর। ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে রোগও ওজর। তারপর সফরের মধ্যেও ইমাম শাফেয়ি (র.) পূর্ণ সফরের পরিমাণকে ওজর সাব্যস্ত করেন। কিন্তু ইমাম মালেক (র.) বলেন যে, দুই ওয়াক্ত পড়া শুধু তখন বৈধ যখন মুসাফির সফর অবস্থায় থাকবে। যদি কোথাও অবস্থান করে চাই এক দিনের জন্যই হোক না কেনো, তবে সেখানে দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রে পড়া জায়েজ নেই। বরং ইমাম মালেক (র.)-এর একটি বর্ণনা হলো সাধারণ সফরের অবস্থাও যথেষ্ট নয়; বরং যখন কোনো কারণে দ্রুত চলা জরুরি হয় তখন দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রে পড়া বৈধ হবে, তাছাড়া নয়।

তাঁদের সবার মতে আগেও এ দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রে পড়া বৈধ এবং পরেও। পরে একত্র করার জন্য তাঁদের মতে শর্ত হলো প্রথম নামাজের ওয়াক্ত অতিক্রান্ত হওয়ার আগে আগে একত্রে নামাজ পড়ার নিয়ত করে নিতে হবে। আর আগে দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রে পড়ার জন্য শর্ত হলো, প্রথম নামাজ শেষ করার পূর্বেই দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রে পড়ার নিয়ত করে নিতে হবে। তাছাড়া দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রে পড়া বৈধ নয়।

প্রকৃত অর্থে দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রে পড়া শুধু আরাফা এবং মুজদালিফায় বিধিবদ্ধ। তাছাড়া কোথাও জায়েজ নেই এবং তাতে ওজর থাকা বা না থাক ও ধর্তব্য নয়, এটি ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মাজহাব।[১]

বাহ্যিক আকারে দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রেও পড়া জায়েজ আছে। যাকে কার্যত একত্রিতকরণও বলে। এর পদ্ধতি এই হবে যে, জোহরের নামাজ একেবারে শেষ ওয়াক্তে আর আসরের নামাজ একেবারে শুরু ওয়াক্তে আদায় করবে। এভাবে উভয় নামাজ স্ব স্ব ওয়াক্তে আদায় হবে। অবশ্য একসঙ্গে হওয়ার কারণে বাহ্যত এটাকে বলা হয়েছে 'দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রিকরণ'।

ইমামত্রয় হজরত আনাস (রা.) এবং ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সেসব বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন, যেগুলোতে রাসূল ﷺ তাবুকের যুদ্ধে জোহর-আসর এবং মাগরিব ও এশার নামাজ একত্রে পড়েছেন বলে উল্লেখ আছে।[২]

এ অর্থবোধক বর্ণনা সিহাহের প্রায় সবগুলো কিতাবে আছে। তাছাড়া আবু দাউদ[৩] ইত্যাদিতেও হজরত মু'আজ ইবনে জাবাল (রা.)-এর বর্ণনা আছে। যা দ্বারা বোঝা যায়, দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রকরণের বৈধতা।

টীকা- ১. এটা হলো, হজরত হাসান ও নাখয়ি (র.)-এর বক্তব্য। ফাতহুল বারি : ২/৪৬৪।

টীকা- ২. যেমন মুসলিমের রেওয়ায়াতে হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবুকের যুদ্ধের সফরে নামাজ একত্রে পড়েছেন। সেখানে জোহর আর আসর একত্রে পড়েছেন। অনুরূপভাবে মাগরিব ও এশা। –মুসলিম ১/২৪৬, كتاب صلوة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بين الصلوتين فى السفر ـ مرتب عفى عنه

টীকা- ৩. আবু দাউদ ১/১৭২ باب الجمع بين الصلوتين

হানাফিদের দলিলগুলো নিম্নেযুক্ত,

قوله تعالى ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ـ (سورة نساء، رقم الاية ١٠٣)

وقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ـ (سورة ماعون، رقم الاية ٤ پاره ٣٠)

وقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى ـ (سورة بقرة، رقم الاية ٢٣٨)

'নিশ্চয় নামাজ মু'মিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ।' 'সে সব নামাজিদের জন্য ধ্বংস যারা নামাজ থেকে উদাসীন।' 'নামাজগুলোর হেফাজত কর বিশেষতো মধ্যবর্তী নামাজ।'

এ বিষয়টি এসব আয়াতে স্পষ্ট যে, নামাজের ওয়াক্তগুলো সুনির্ধারিত। এগুলো সংরক্ষণ করা ওয়াজিব। এসব ওয়াক্তের খেলাফ করা আজাবের কারণ। প্রকাশ থাকে যে, এসব আয়াত অকাট্যরূপে প্রমাণিত। এগুলোর অর্থও সুনিশ্চিত। খবরে ওয়াহিদগুলো এগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। খবরে ওয়াহিদগুলোতে যখন যথার্থ ব্যাখ্যারও সুযোগ থাকে।

২. বোখারিতে[১] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনায় রয়েছে,

قال ما رأيت النبى صلى الله عليه وسلم صل صلوة لغير ميقاتها الا صلوتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها (المعتاد)

'তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আমি কখনও ওয়াক্ত ব্যতিত কোনো নামাজ পড়তে দেখিনি, শুধুমাত্র দুটি নামাজ ব্যতিত। মাগরিবের নামাজ ও এশার নামাজ তিনি একত্রে পড়েছেন এবং ফজরের নামাজ তিনি আদায় করেছেন তার ওয়াক্তের আগে।'

৩. হজরত আবু কাতাদা (রা.)-এর বর্ণনা সুনান গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করেছেন। তাতে রাসূল ﷺ-এর এরশাদ বর্ণিত হয়েছে,

ليس فى النوم تفريط انما التفريط فى اليظقة بان يؤخر الصلوة الى وقت اخرى [٢] ـ

'ঘুমে কোনো শিথিলতা নেই। শিথিলতা হলো জাগ্রত অবস্থায়। যেমন, এক নামাজ বিলম্ব করে অন্য ওয়াক্তে আদায় করে নিলো।'

৪. নামাজের ওয়াক্তগুলো সুনির্দিষ্ট এবং সীমিত। এটা মুতাওয়াতিররূপে প্রমাণিত। খবরে ওয়াহিদগুলো তাতে প্রমাণ করতে পারে না।

এসব প্রমাণাদির আলোকে ইমামত্রয়ের সমস্ত প্রমাণাদির জবাব হলো, দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রে পড়ার যতোগুলো বর্ণনা বর্ণিত আছে সেগুলোতে প্রকৃত অর্থে নামাজ একত্রে পড়া উদ্দেশ্য নয়; বরং বাহ্যিকভাবে একত্রিত করা উদ্দেশ্য। এর প্রমাণ নিম্নেযুক্ত দলিলগুলো,

এক. সহিহ বোখারিতে[৩] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর হাদিস রয়েছে,

قال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير فى السفر يؤخر صلوة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء قال سالم وكان عبد الله بن عمر يفعله اذا اعجله السير يقيم المغرب فيصليهما ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء الخ ـ

টীকা- ১. বোখারি : ১/২২৮ كتاب المناسك باب متى يصلى الفجر بجمع (اى بمزدلفة) واخرجه مسلم ايضا فى كتاب الحج فى باب استحباب زيادة التغليس لصلوة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر جا صـ٤١٨

টীকা- ২. لفظه للطحاوى باب الجمع بين الصلوتين

টীকা- ৩. ১/৪৯, ابواب تقصير الصلوة باب هل يؤذن او يقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء

'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি– যখন তাঁকে দ্রুত সফর করতে হতো তখন তিনি মাগরিবের নামাজ পড়তেন দেরি করে। এমনকি মাগরিব ও এশার নামাজ একত্রে পড়তেন। সালেম বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-ও এমন করতেন। যখন তাঁকে দ্রুত সফর করতে হতো, তখন তিনি একামত দিয়ে মাগরিবের নামাজ তিন রাকাত পড়তেন। তারপর সালাম ফিরাতেন। তারপর অল্পক্ষণ দেরি করে একামত দিয়ে এশার নামাজ আদায় করতেন।'

১. স্পষ্ট ভাষায় এতে বলা হয়েছে যে, হজরত ইবনে উমর (রা.) মাগরিব নামাজ থেকে অবসর হওয়ার পর কিছুক্ষণ সময় অপেক্ষা করতেন। তারপর এশার নামাজ পড়তেন। এ অপেক্ষার এছাড়া অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে না যে, তিনি এশার নামাজের ওয়াক্ত আসা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস কামনা করছিলেন। স্বয়ং হাফেজ ইবনে হাজার (র.)-ও স্বীকার করেছেন যে, এতে বাহ্যিকরূপে নামাজ একত্রিত করার প্রমাণ পাওয়া যায়।

–ফাতহুল বারি : ২/৪৬৫

২. আবু দাউদে নাফে'-আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াকিদ সূত্রে বর্ণিত এর চেয়ে স্পষ্টতর বর্ণনা রয়েছে,

ان مؤذن ابن عمر (رضـ) قال الصلوة قال سر سر ـ حتى اذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا عجل به امر صنع مثل الذى صنعت ـ

'হজরত ইবনে উমর (রা.)-এর মুয়াজ্জিন বললেন, নামাজ (পড়ুন)। ইবনে উমর বললেন, চলো, চলো। এমনকি যখন শুভ্রতা অদৃশ্য হওয়ার পূর্বক্ষণ এলো তখন তিনি অবতরণ করে মাগরিবের নামাজ পড়লেন। তারপর শুভ্রতা অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর এশা আদায় করলেন। তারপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখন কোনো কাজের ফলে দ্রুত সফল করতে হতো, তখন তিনি অনুরূপ করতেন আমি যেমন করেছি।'

এ হাদিসটি বর্ণনা করে ইমাম আবু দাউদ (র.) শুধু নীরবতা অবলম্বন করেছেন তাই নয়; বরং এর একটি মুতাবে'ও সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। যার শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত,

عبد الله بن الأعلى عن نافع قال حتى اذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما ـ

'নাফে' বলেছেন, এমনকি যখন শাফাক তথা শুভ্রতা বা লালিমা খতম হয়ে যাওয়ার সময় এলো তখন তিনি নেমে দুটি নামাজ পড়লেন একত্রে।'

আর ইমাম দারাকুতনিও নিজ সুনানে এ বর্ণনাটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করে নীরবতা অবলম্বন করেছেন।

৩. সহিহ মুসলিমে হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা নিম্নেযুক্ত,

قال صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، قلت يا ابى الشعثاء اظنه اخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قال وانا اظن ذلك ـ

'তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আমি আট রাকাত একসঙ্গে এবং সাত রাকাত এক সঙ্গে আদায় করেছি। আমি বললাম, আবুশ্‌শা'ছা! আমার মনে হয়, তিনি জোহরের নামাজ দেরিতে পড়েছেন আর আসরের নামাজ আগে পড়েছেন, মাগরিবের নামাজ দেরিতে পড়েছেন আর এশার নামাজ পড়েছেন আগে আগে। রাবি বললেন, আমিও তা ধারণা করি।'

হাদিসের দুইজন বর্ণনাকারির ধারণা এ বর্ণনা হানাফিদের পক্ষে। এইসব বর্ণনা বাহ্যিকরূপে দুই নামাজ একত্র করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্পষ্ট।

৪. তিরমিযীতে পরবর্তী একটি হাদিস হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত আছে

من جمع بين الصلوتين من غير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر ـ

'কোনো ওজর ব্যতিত যে দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রে পড়ে, সে একটি কবিরা গোনাহের অধ্যায় সূচনা করলো।'

সনদগতভাবে এটি যদিও জয়িফ। কেননা এটি নির্ভর করছে হানাশ ইবনে কায়সের ওপর। যাঁর সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, মুহাদ্দিসিনের মতে তিনি জয়িফ। ইমাম আহমদ প্রমুখ তাকে জয়িফ বলেছেন। কিন্তু মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদের একটি বর্ণনা দ্বারা এর সহযোগিতা হয়। বর্ণনাটি নিম্নেযুক্ত,

قال محمد (رحـ) بلغنا عن عمر بن الخطاب (رضـ) أنه كتب فى الافاق ينهاهم ان يجمعوا بين الصلوتين ويخبرهم ان الجمع بين الصلوتين فى وقت واحد كبيرة من الكبائر [১] ـ

'ইমাম মুহাম্মদ বলেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে আমাদের কাছে হাদিস পৌঁছেছে। তিনি রাষ্ট্রের বিভিন্ন দিগন্তে চিঠি পাঠিয়ে দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রে পড়তে নিষেধ করেছেন এবং তাদেরকে বলেছেন, দুই ওয়াক্ত নামাজ এক ওয়াক্তে পড়া একটি কবিরা গোনাহ।'

৫. কিছু অবস্থাতে প্রকৃত অর্থে দুই নামাজ একত্রিত করার প্রবক্তারাও বাহ্যিক অর্থে একত্রিত করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করতে বাধ্য। যেমন হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস,

قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ـ

অন্যান্য আয়িম্মায়ে কেরামও এখানে একত্রিত করার অর্থ উদ্দেশ্য করতে বাধ্য। শুধু ইমাম আহমদ (র.) এটাকে রুগ্ন অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেছেন। কিন্তু এ বিষয়টিও একেবারে অযৌক্তিক যে, গোটা আবাদি এলাকায় সবাই তখন রুগ্ন হয়ে পড়েছেন।

আর যখন হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, এই একত্রিত করা দ্বারা আপনার কী উদ্দেশ্য? তখন শুধু এতোটুকু বলেছেন যে, যাতে উম্মত কষ্টের মধ্যে না পড়ে। যদি এর কারণ রোগ হতো, তাহলে হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) এটা অবশ্যই বলতেন। এজন্য 'ফাতহুল বারিতে 'হাফেজ ইবনে হাজার (র.)[২] স্বীকার করেছেন যে, বাহ্যিকরূপে একত্রিত করারই উদ্দেশ্য নেয়া উত্তম। বাস্তবতাও এটা যে, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটির এ ব্যতিত অন্য কোনো ব্যাখ্যার পথ নেই। যখন এ বর্ণনায় বাহ্যিকরূপে নামাজ একত্রিত করা উদ্দেশ্য হবে তখন অন্য বর্ণনাগুলোও অবশ্যই বাধ্যতামূলক বাহ্যিকরূপে প্রযোজ্য হবে একত্রিত করার জন্যই।

৬. একত্রিত করার দ্বারা যদি বাহ্যিকরূপে একত্রিত করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সবগুলো বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়। এর বিপরীত যদি প্রকৃত অর্থে একত্রিত করা উদ্দেশ্য হয়, তবে আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদিস এবং বোখারি-মুসলিমে বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদিস,

ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة غير ميقاتها الخ

সম্পূর্ণ বর্জন করতে হয়। প্রকাশ থাকে যে, সে ব্যাখ্যাই প্রধান হবে যাতে সবগুলো বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়।

৭. 'ফাতহুল মুলহিমে' আল্লামা উসমানি (র.) বাহ্যিক একত্রিত করা উদ্দেশ্য হওয়ার ওপর একটি সূক্ষ্মতম কারণ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হাদিসগুলোতে যেখানেই দুই নামাজ একত্রিত করার কথা আলোচিত হয়েছে, সেখানে জোহর আর আসর অথবা মাগরিব আর এশা দুটি একত্রিত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলো ব্যতিত অন্য কোনো দুটি নামাজ না একত্রিত করার কথা প্রমাণিত আছে, না কেউ এর বৈধতার প্রবক্তা। এ জন্য ইমামত্রয়ও ওপরযুক্ত দুটি নামাজ একত্রিত করারই পক্ষে। ফজর এবং জোহর, অথবা আসর আর মাগরিব, অথবা

টীকা- ১. (قال محمد) اخبرنا بذلك الثقات عن الاعلى بن الحارث عن مكحول مؤطاء امام محمد، باب الجمع بين الصلوتين فى السفر والمطر صـ ١٢٩- ١٣٠ (طبع نور محمد) مرتب عفى عنه

টীকা- ২. جلد ٢ صـ١٩ باب تاخير الظهر الى العصر واستحسن هذا القول القرطبى وامام الحرمين وجزم ابن الماجشون والطحاوى وقواه ابن سيد الناس كذا فى الفتح

এশা আর ফজর একত্রিত করা সকলের মতে অবৈধ, না কোনো বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। এবার যদি প্রকৃত অর্থে একত্রিত করা উদ্দেশ্য হয়, তবে এ পার্থক্যের কোনো যৌক্তিক কারণ বুঝে আসে না যে, জোহর আর আসর একত্রিত করা তো জায়েজ; কিন্তু আসর আর মাগরিব একত্রিত করা অবৈধ।

তবে যদি বাহ্যিকরূপে একত্রিত করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বুঝে আসে এর যৌক্তিক কারণ। সেটি হলো, ফজর এবং জোহর বাহ্যিকরূপে একত্রিত করা এজন্য সম্ভব নয় যে, মাঝখানে একটি দীর্ঘ সময় বেকার প্রতিবন্ধক। আর আসর-মাগরিব এবং এশা-ফজর দুটিতে বাহ্যিক আকারে একত্রিত করা এজন্য সম্ভব নয় যে, আসর আর এশার শেষ ওয়াক্ত মাকরূহ। এতে বোঝা যায় যে, রাসূল ﷺ দুই নামাজ বাস্তবে একত্রিত করার যে কথা বলেছেন সেটি ছিলো বাহ্যিকরূপে একত্রিকরণ, প্রকৃত অর্থে নয়। তা নাহলে তা হতো সব নামাজেই।

বাহ্যিক আকারে একত্রিকরণ উদ্দেশ্য নেওয়ার ওপর ইমামত্রয়ের পক্ষ থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়ে থাকে।

প্রথম প্রশ্ন : এই করা হয় যে, সহিহ মুসলিমে[১] হজরত আনাস (রা.)-এর কোনো কোনো বর্ণনা এমন রয়েছে যেগুলোতে বাহ্যিক আকারে একত্রিত করণ উদ্দেশ্য করা সম্ভব নয়। যেমন, হজরত আনাস (রা.)-এর এক বর্ণনায় শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত,

عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم اذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر الى اول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق ـ

'হজরত আনাস (রা.) নবী করিম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, তাঁকে যখন দ্রুত সফর করতে হতো তখন তিনি জোহরকে আসরের প্রথম ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করতেন। তখন দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রে পড়তেন এবং মাগরিবের নামাজ বিলম্ব করতেন ফলে আকাশের শুভ্রতা অদৃশ্য হওয়ার সময় মাগরিব ও এশা একত্রে পড়তেন।'

উত্তর : ওপরযুক্ত প্রমাণাদির আলোকে يؤخر الظهر الى اول وقت العصر বাক্যে গায়া মুগায়ার অন্তর্ভুক্ত হয় না। حين يغيب الشفق শব্দের অর্থ হলো, মাগরিব এমন সময় পড়েছেন যখন লালিমা ছিলো উধাও হওয়ার নিকটবর্তী। এর সহায়তা এর দ্বারাও হয় যে, আবূ দাউদে[২] হজরত ইবনে উমর (রা.)-এর একটি ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার তাঁকে তাঁর স্ত্রী হজরত সফিয়্যাহ[৩] (রা.)-এর রোগের কারণে দ্রুত সফর করতে হয়েছে। ফলে তিনি মাগরিবের নামাজ বিলম্বে পড়েছেন। এ বিলম্বের বিবরণে আবূ দাউদের শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত,

فسار حتى خاب الشفق فنزل فجمع بينهما ـ

'তারপর তিনি সফর করেন, এমনকি শাফাক অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর তিনি নেমে দুই নামাজ পড়েন একত্রে।'

এক বর্ণনায়[৪] حتى كان بعد غروب الشفق আরেক বর্ণনায়[৫] حتى اذا كان بعد ما غاب الشفق আরেক বর্ণনায়[৬] حتى اذا كان يغيب الشفق, আরেক বর্ণনায়[৭] حتى اذا كان ان يغيب الشفق শব্দ এসেছে। মুসলিমের বর্ণনায়[৮] এসেছে– بعد ان يغيب الشفق। এখানে ব্যতিত আর কোনো পদ্ধতি সামঞ্জস্য বিধানের নেই যে, حتى اذا كاد يغيب الشفق -কে আসল সাব্যস্ত করে অন্যান্য বর্ণনাগুলোকে এরই ওপর প্রযোজ্য করা এবং বলা

টীকা- ১. মুসলিম : ১/২৪৫ كتاب صلوة المسافر وقصرها باب جواز الجمع بين الصلوتين فى السفر

টীকা- ২. ১ম খণ্ড, ابواب صلوة السفر باب الجمع بين الصلوتين

টীকা- ৩. হজরত ইবনে উমর (রা.)-কে সংবাদ দেওয়া হয়েছিলো যে, হজরত সফিয়্যাহ (রা.) ভীষণ অসুস্থ, তিনি মৃত্যুর কাছাকাছি পর্যায়ে পৌঁছেছেন। এর প্রমাণ নাসায়ির বর্ণনা,

'বর্ণনাকারি বলেন, আমরা সালেম ইবনে আবদুল্লাহকে সফরের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। বললাম, আবদুল্লাহ কি সফরে কোনো নামাজ দুটি একসাথে পড়েছেন? বললেন, না। তবে মুজদালিফায় তা করেছেন। তারপর তিনি সচেতন হয়ে পড়লেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন সফিয়্যাও। তিনি তাঁর কাছে সংবাদ পাঠালেন আমি বর্তমানে দুনিয়ার শেষ দিবস ও আখিরাতের প্রথম দিবসে উপনীত। তখন তিনি যানে আরোহণ করলেন, আমিও তাঁর সাথে।.........।' –বজলুল মাজহুদ, ছাপা, সাহারানপুর : ২/২৩৫ باب الجمع بين الصلوتين সংকলক। (বাকি ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ নং টীকা অপর পৃষ্ঠায়)

যে, অর্থগতভাবে রাবিগণ বিবরণ দিয়েছেন। যেহেতু সময় কাছাকাছি ছিলো এজন্য কেউ كاد غاب الشفق কেউ قبل غيبوبة الشفق কেউ يغيب الشفق শব্দ দ্বারা এ ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। এ ব্যাখ্যা ও সামঞ্জস্য বিধান এ জন্য প্রধান যে, হজরত ইবনে উমর (রা.) সম্পর্কে পেছনে স্পষ্ট বর্ণনা এসেছে যে, তিনি বাহ্যিকরূপে নামাজ একত্র করার ওপর আমল করেছেন। যেমন সহিহ বোখারির বর্ণনায়[১] قلما يلبث حتى يقيم العشاء শব্দ, আর আবু দাউদে আছে[২] حتى اذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء শব্দ। তাছাড়া حتى اذا كاد يغيب الشفق বিশিষ্ট বর্ণনার পরবর্তী শব্দ, যেগুলো বর্ণিত হয়েছে এভাবে, نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء এগুলোও এর সহায়তা করছে।[৩] এ ব্যাখ্যাই হজরত আনাস (রা.)-এর বর্ণনায়ও করা যায় যে, حين يغيب الشفق দ্বারা উদ্দেশ্য হলো লালিমার পর শুভ্রতা অস্ত যাওয়ার নিকটবর্তী ছিলো। এর কারণ হলো, এসব শব্দের প্রকৃত অর্থ কোনো অবস্থাতেই উদ্দেশ্য হতে পারে না। কারণ, সূর্য অদৃশ্য হয়ে যাওয়া একটি মুহূর্তের ব্যাপার। আর একটি মুহূর্তে দুটি নামাজ পড়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন : দ্বিতীয় প্রশ্ন এই করা হয় যে, বাহ্যিকরূপে একত্রিত করার ওপর দুই নামাজ একত্রিত করার প্রয়োগই ঠিক নয়। কেনোনা, এতে প্রতিটি নামাজ নিজ ওয়াক্তে আদায় করা হয়। অতএব, দুই নামাজ একত্রিত করার বর্ণনাগুলোকে এই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা দূরবর্তী (অযৌক্তিক) একটি ব্যাখ্যা।

জবাব : বাহ্যিকরূপে একত্রিত করার ওপর جمع بين الصلوتين অর্থাৎ দুই নামাজ একত্রিত করার প্রয়োগ স্বয়ং রাসূল ﷺ-এর কালাম দ্বারা প্রমাণিত। বলেছিলেন হজরত হামনা বিনতে জাহ্‌শ (রা.)-কে,

فان قويت على ان تؤخرى الظهر وتعجلى العصر ثم تغتسلين حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلوتين[৪] .

'তুমি যদি পার জোহর বিলম্ব করে ও আসর আগে এনে পড়বে তারপর গোসল করে পবিত্র হবে এবং জোহর ও আসরের নামাজ একত্রে পড়বে, তারপর মাগরিবের নামাজ বিলম্ব করে এশা আগে পড়বে তারপর গোসল করে দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রে পড়বে (তাহলে তা করো)।'

তৃতীয় প্রশ্ন : এই করা হয় যে, দুই নামাজ একত্র করার উদ্দেশ্য হলো সহজ করা। আর বাহ্যিক আকারে দুই নামাজ একত্র করলে তাতে কোনো সহজতা নেই; বরং কঠিনই। কেনোনা সময় নির্ধারণের প্রতি গুরুত্বারোপ করা সবার কাজ নয়।

জবাব : দুই নামাজ বাহ্যিকরূপে একত্র করার মধ্যেও বহু আসানি রয়েছে। কারণ, মুসাফিরের আসল কষ্ট হয় বারবার অবতরণ, আরোহণ এবং ওজু করাতে। আর বাহ্যিক আকারে দুই নামাজ একত্র করলে এই জটিলতার মিটে যায়।

(পূর্বের পৃষ্ঠার টীকা)

টীকা- ৪. জামিউল উসূল : ৫/৭১৪, হাদিস নং ৪০৩৭।

টীকা- ৫. দারাকুতনি : ১/৩৯১, হাদিস নং ৮, باب الجمع بين الصلوتين فى السفر

টীকা- ৬. দারাকুতনি : ১/৩৯৩, হাদিস নং ১৭ باب الجمع بين الصلوتين فى السفر

টীকা- ৭. দারাকুতনি : ১/৩৯৪, হাদিস নং ২১ باب الجمع بين الصلوتين فى السفر

টীকা- ৮. ১/২৪৫, كتاب صلوة المسافر وقصرها باب جواز الجمع بين الصلوتين فى السفر

টীকা- ১. ১/১৪৯ ابواب تقصير الصلوة باب هل يؤذن او يقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء ،

টীকা- ২. ১/১৭১ باب الجمع بين الصلوتين

টীকা- ৩. তাছাড়া অন্য আরেকটি বর্ণনা দ্বারাও এর সহায়তা হয়, যার শব্দগুলো নিম্নরূপ, حتى اذا كان اخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم اقام العشاء ، وقد توارى الشفق فصلى بنا *(জামিউল উসূল : ৫/৭১৬, হাদিস নং ৪০৩৭, দারাকুতনি : ১/৩৯৩)* باب الجمع بين الصلوتين فى السفر

টীকা- ৪. জামে' তিরমিযী : ابواب الطهارة باب فى المستحاضة انها تجمع بين الصلوتين بغسل واحد

চতুর্থ প্রশ্ন : করা হয় যে, দেরিতে নামাজ একত্র করাকে তো প্রয়োগ করা যায় বাহ্যিক একত্র করার ওপর। কিন্তু আগে একত্রিত করার বর্ণনাগুলোতে প্রয়োগ করা যায় না বাহ্যিক একত্র করার ক্ষেত্রে।

জবাব : আগে একত্র করার আলোচনা রাসূল ﷺ কর্তৃক শুধু হজরত মু'য়াজ ইবনে জাবাল (রা.)-এর একটি বর্ণনায় এসেছে, যেটি আবু দাউদে[১] রয়েছে,

ان النبى صلى الله عليه وسلم كان فى غزوة تبوك اذا ارتحل قبل ان تزيغ ٢ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر فيصليهما جميعا واذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء واذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب .

'তাবুকের যুদ্ধে নবী করিম ﷺ ছিলেন, তিনি যখন সফর করতেন সূর্য হেলার আগে, তখন জোহরের নামাজ এবং আসরের নামাজ একত্রে পড়তেন। তার সফর করতেন। তিনি যখন মাগরিবের আগে সফর করতেন, তখন এটি দেরি করে এশার নামাজের সাথে আদায় করতেন। আর যখন মাগরিবের পর সফর করতেন তখন মাগরিবের সময় পড়তেন এশা এগিয়ে এনে।'

জবাব হলো, এ হাদিসটি চরম পর্যায়ের জয়িফ। এই হাদিসটি স্বয়ং ইমাম আবু দাউদ উল্লেখ করার পর বলেন,

لم يرو هذا الحديث الا قتيبة وحده وهى اشارة الى ضعف هذا الحديث .

'একমাত্র কুতায়রা ব্যতিত এই হাদিসটি আর কেউ বর্ণনা করেননি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে এ হাদিসের দুর্বলতার দিকে।'

সফর পর্বের আওতায় ইমাম তিরমিযী (র.) দ্বিতীয়বার باب ماجاء فى الجمع بين الصلوتين কায়েম করেছেন। এ অধ্যায়ে ইমাম তিরমিযী (র.)ও হজরত মু'আজ (রা.) এর এ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন এবং শেষে লিখেছেন,

وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة لا نعرف احدا رواه عن الليث غيره .

'হজরত মু'আজের হাদিসটি حسن غريب। একমাত্র কুতায়বা এটি বর্ণনা করেছেন। লাইছ প্রমুখ থেকে তিনি ব্যতিত আর কেউ এটি বর্ণনা করেছেন বলে আমার জানি না।'

ইমাম হাকেম (র.) যাঁর নম্রতা প্রসিদ্ধ- তিনিও এ হাদিসটিকে জয়িফ গণ্য করেছেন। তিনি উলুমুল হাদিসে ইমাম বোখারির এ বক্তব্য বর্ণনা করেছেন ان بعض الضعفاء ادخله على قتيبة (কোনো জয়িফ রাবি তা কুতায়বার ওপর প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়েছেন।) এ কারণে এ হাদিসটি অন্যান্য যতো হাফেজ বর্ণনা করেন, তারা আগে নামাজ একত্র করার কোনো আলোচনা করেন না এবং কারে বর্ণনাতেই আসরের উল্লেখ নেই। এ কারণে হজরত আনাস (রা.)-এর বর্ণনা আবু দাউদেই নিম্নেযুক্ত ভাষায় রয়েছে,

قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وسلم .

এতে আলোচনা আছে সূর্য হেলার পর শুধু জোহর পড়ার কিন্তু আসরের কোনো উল্লেখ নেই। তাই ইমাম আবু দাউদ (র.)-এর বক্তব্য প্রসিদ্ধ আছে ليس فى تقديم الوقت حديث قائم -মিরকাত : মোল্লা আলি কারি (র.)

তবে 'ফাতহুল বারিতে'[১] হাফেজ ইবনে হাজার (র.) باب اذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب -এ 'মু'জামে ইসমাঈলি' ও হাকিমের 'আরবাইনে'র বরাতে আগে নামাজ একত্রিত করার সহায়তায় একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন,

لكن روى اسحق بن راهويه هذا الحديث عن شبابة فقال كان اذا كان فى سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، اخرجه الاسمعيلى -

'হজরত ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ হাদিসটি শাবাবা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, তিনি যখন সফরে থাকতেন তারপর সূর্য হেলে যেত তখন জোহর ও আসর একত্রে পড়তেন। পুনরায় সফর করতেন।'

স্বয়ং ইসমাইলিই এই বর্ণনার ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ শাবাবা হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে একা এবং জা'ফর আল-ফিরয়াবি ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে একা। সুতরাং এখানে দুটি তাফার্‌রুদ পাওয়া যায়। তবে হাফেজ (র.) এর জবাব দিয়েছেন,

وليس ذلك بقادح فانهما امامان حافظان وقد وقع نظيره فى الاربعين للحاكم -

'এটা ক্ষতিকর নয়। তাঁরা দু'জন ইমাম হাফেজ। হাকেমের আরবাইনে এর নজির রয়েছে।'

তবে এ জবাবটি এজন্য যথেষ্ট নয় যে, স্বয়ং ইমাম ইসমাইলি এ হাদিসটিকে মা'লুল সাব্যস্ত করেছেন। মা'লুল বলা হয় এমন হাদিসকে, যার রাবিগণ বাহ্যিক দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকেন; কিন্তু তার মধ্যে আপত্তিকর কারণ বিদ্যমান থাকে, যেটা অভিজ্ঞ মুহাদ্দিসিনই অনুভব করেন। আর কোনো কোনো সময় এই কারণের ব্যাখ্যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। অতএব, যদি কোনো হাদিসকে মা'লুল সাব্যস্ত করা হয়, তবে তার জবাবে রাবিদের নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করা যথেষ্ট হয় না। তাছাড়া ইমাম হাকিম (র.) যিনি নম্রতায় খুবই প্রসিদ্ধ, তিনিও এ বর্ণনাটি মুস্তাদরাকে হাকেমে উল্লেখ করেননি; বরং এটাকে আরবাইনে উল্লেখ করেছেন। এ জন্য এ কথা বলা সম্পূর্ণ যথার্থ যে, (নামাজ) আগে একত্রিত করার ব্যাপারে কোনো বর্ণনা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়। 'উমদাতুল কারি'তে[২] এ সম্পর্কে আল্লামা আইনি (র.)-এর আলোচনা দেখা যেতে পারে।

من جمع بين الصلوتين من غير عذر الخ : ইমাম তিরমিযী (র.) এ হাদিসটিকে হানাশ ইবনে কায়সের কারণে জয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু 'ই'লাউস্ সুনানে' আল্লামা উসমানি (র.) প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, এ হাদিসটি হাসান অপেক্ষা নিম্নস্তরের নয়। এজন্য তিনি হানাশ ইবনে কায়সকে নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করার জন্য ইমাম হাকেমসহ অন্যান্য কোনো কোনো মুহাদ্দিসের বক্তব্যও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হানাশ ইবনে কায়সের জীবনী রিজাল শাস্ত্রের গ্রন্থাবলিতে দেখার পর প্রধান এটাই মনে হচ্ছে যে, তাঁর হাদিসগুলো জয়িফ । অবশ্য এ হাদিসের বিষয় অন্য কোনো কিতাবে সহিহ সনদে হজরত উমর (রা.) হতে মওকুফ আকারে প্রমাণিত হয়েছে।

টীকা- ১. ফতহুল বারি : ২/৪৭৯, ছাপা লেবাননের বৈরুত হতে, দারুল মারিফাহ্।

টীকা- ২. ৩/৫৭৪, ছাপা ইস্তাম্বুল। তিনি বলেছেন, আমি বলবো, এই অতিরিক্ত অংশটি প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে। আপনি লক্ষ্য করেননি? এ হাদিসটি হাকেম তাঁর মুস্তাদরাকে উল্লেখ করেননি। হাদিস বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে তাঁর নম্রতা প্রসিদ্ধ এবং ইমাম বোখারি হানাফিদের বিরুদ্ধে অনেক কিছু নিয়ে গবেষণার পরেও এই অতিরিক্ত অংশটুকু বর্ণনা করেননি। যদি আপনি প্রশ্ন করেন, এর আরেকটি সূত্র আছে। সেটি তাবারানি আওসাতে বর্ণনা করেছেন, حدثنا محمد بن ابراهيم بن نصر بن شنذر الاصبهانى حدثنا هارون بن عبد الله الجمال حدثنا يعقوب بن محمد الزهرى حدثنا محمد بن سعدان حدثنا ابن عجلان عن عبد الله بن الفضل عن انس بن مالك (رض) ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا كان فى سفر فزاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر والعصر جميعا الخ وقال تفرد به يعقوب بن محمد قلت قال احمد (رح) يعقوب بن محمد ليس يسوى شيئا وقال ابو زرعة واهى الحديث الخ
অবশ্য মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ২/১৬০ باب الجمع بين الصلوتين فى السفر *এ আল্লামা হায়সামি (র.) এ বর্ণনাটি 'মুজামে' তাবারানি আওসাতের বরাতে উল্লেখ করার পর বলেন, এর রাবিগণ নির্ভরযোগ্য। এভাবে রায়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়ে যায়। এর জবাবে এটাই বলা যেতে পারে যে, এটি প্রথম সূত্রের ন্যায় মা'লুল। অথবা বলা যাবে আল্লামা হায়সামির মুকাবেলায় ইমাম আহমদ, আবূ জুরআর ন্যায় বড় বড় মুহাদ্দিসিনের রায় অধিক নির্ভরযোগ্য। –সংকলক।*

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ بَدْءِ الْأَذَانِ (ص ٤١)

অনুচ্ছেদ- ২৫ : আজানের সূচনা প্রসঙ্গে (মতন ৪৮)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ لَمَّا أَصْبَحْنَا أَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ بِالرُّؤْيَا فَقَالَ إِنَّ هٰذِهِ لَرُؤْيَا حَقًّا فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَإِنَّهُ أَنْدٰى وَأَمَدُّ صَوْتًا مِنْكَ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا قِيْلَ لَكَ وَلْيُنَادِ بِذٰلِكَ . قَالَ فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِدَاءَ بِلَالٍ بِالصَّلٰوةِ خَرَجَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَجُرُّ إِزَارَهُ وَهُوَ يَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِىْ قَالَ . قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ فذلك اثبت .

১৮৯. অর্থ : 'হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, সকালে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। তারপর তাঁকে স্বপ্ন সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, এটা অবশ্যই সত্য স্বপ্ন। সুতরাং তুমি বিলালের সাথে দাঁড়াও। কেনোনা তিনি তোমার চেয়ে সুন্দর ও উচ্চৈঃস্বরের অধিকারি। তুমি তাঁর নিকট তা উচ্চারণ করো, যা তোমাকে বলা হয়েছে। আর সে যেনো তা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা দেয়। বর্ণনাকারি বলেন, যখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বিলালের নামাজের আহ্বানের আওয়াজ শুনলেন, তখন তিনি লুঙ্গি হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে রাসূল ﷺ-এর দিকে বেরিয়ে এলেন। তিনি বলছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, নিশ্চয় আমি, বিলাল যা বলেছে তার অনুরূপ স্বপ্নে দেখেছি। বর্ণনাকারি বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা। এটাই (হলো) সবচেয়ে সুদৃঢ়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইবনে উমর (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح। এ হাদিসটি এর চেয়ে দীর্ঘ ও পূর্ণাঙ্গ আকারে বর্ণনা করেছেন ইবরাহিম ইবনে সাদ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হতে। তিনি তাতে আজান দু'বার দু'বার ইকামত একবার একবার-এর ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। আবদুল্লাহ ইব্নে জায়দ হলেন ইবনে আব্দে রাব্বিহি। তাঁকে বলা হয় ইবনে আবদে রব।

নবী করিম ﷺ থেকে আজান সংক্রান্ত এই একটি হাদিস ব্যতিত বিশুদ্ধ আর কোনো কিছুই আমাদের জানা নেই। আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ ইবনে আসেম আল-মাজানির অনেক হাদিস রয়েছে নবী করিম ﷺ থেকে। তিনি হলেন, আব্বাদ ইবনে তামিমের চাচা।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُوْنَ فَيَتَحَيَّنُوْنَ الصَّلَوَاتِ وَلَيْسَ يُنَادِىْ بِهَا أَحَدٌ فَتَكَلَّمُوْا يَوْمًا فِىْ ذٰلِكَ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِتَّخِذُوْا نَاقُوْسًا مِثْلَ نَاقُوْسِ النَّصَارٰى وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِتَّخِذُوْا قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُوْدِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ أَوَلَا تَبْعَثُوْنَ رَجُلًا يُنَادِىْ بِالصَّلٰوةِ؟ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَا بِلَالُ! قُمْ فَنَادِ بِالصَّلٰوةِ .

১৯০. অর্থ : হজরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মুসলমানরা যখন মদিনায় আগমন করলেন, তারা তখন একত্রিত হতেন এবং নামাজের সময় নির্ধারণ করতেন। কেউ নামাজের জন্য আহ্বান

করতেন না। তখন এ ব্যাপারে একদিন তারা আলোচনা তুললেন। তাঁদের অনেকে বললেন, তোমরা খ্রিস্টানদের ন্যায় একটা ঘণ্টা তৈরি করে নাও। আর অনেকে প্রস্তাব দিলেন, ইহুদিদের শিঙ্গার ন্যায় শিঙ্গার ব্যবস্থা করো। রাবি বলেন, হজরত উমর (রা.) বললেন, তোমরা কি একজন লোক পাঠাবে না- যে নামাজের ঘোষণা দিবে? রাবি বললেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বিলাল! তুমি যাও, দাঁড়িয়ে নামাজের ঘোষণা দাও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি ইবনে উমরের হাদিসের মধ্যে حسن غريب।

দরসে তিরমিযী

ان هذه لرؤيا حق : এ বিষয়টি অনুচ্ছেদের হাদিসগুলো দ্বারা স্পষ্ট যে আজান বিধিবদ্ধ হয়েছিলো মদিনা তাইয়িবায়। এ কারণে জমহুর মুহাদ্দিসিন ও ঐতিহাসিকদের এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। অবশ্য হাফেজ ইবনে হাজার (রা.) তাবারানি ও ইবনে মারদুওয়াইহ-এর বরাতে এমন কোনো কোনো হাদিস বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর সারনির্যাস হলো, আজান শিক্ষা দেওয়া হয়েছে মক্কা মুকার্‌রামায়। যখন রাসূল ﷺ মি'রাজে তাশরিফ নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন জিবরাইল (আ.) তাঁকে আজান শিখিয়েছিলেন। প্রিয়নবী ﷺ ফেরেশতাদেরকে আজান দিতে শুনেছেন। কিন্তু প্রথমতো হাফেজের তাহকিক মুতাবেক এই বর্ণনাটি সূত্রগতভাবে জয়িফ। দ্বিতীয়তো যদি এ বর্ণনাগুলোকে সহিহও মেনে নেওয়া হয় তবে আল্লামা সুহায়লি (র.) 'রওজুল উনুফে' এই সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শুধু আজান শুনানো হয়েছিলো। এর হুকুম দেয়া হয়নি। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ (রা.) স্বপ্নের মাধ্যমে যখন আজানের তা'লিম দেওয়া হলো, তখন তার সে আজানের বাক্যগুলো স্মরণ এলো, যেগুলো তিনি শুনেছিলেন, মি'রাজ রজনীতে ফেরেশতাদের কাছ থেকে। এজন্য তিনি নির্দ্বিধায় বললেন- ان هذه لرؤيا حق তথা নিশ্চয় এটি সত্য স্বপ্ন। মোটকথা, আজানের সূচনা মদিনা তাইয়িবায় হয়েছিলো।

০ এরপর মতানৈক্য হচ্ছে যে, আজান শেখানো হয়েছিলো হিজরতের কোন্ বছর? হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, আজান শেখানোর ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো দ্বিতীয় হিজরিতে। কিন্তু আল্লামা আইনির মতে সন হিজরিতে শেখানো হয়েছে। প্রত্যেকের নিকটই নিজস্ব মতবাদের স্বপক্ষে প্রমাণ রয়েছে। ইমাম বোখারি (র.)-এর আচরণ দ্বারা বোঝা যায় যে, আজানের বিধিবদ্ধতা হিজরতের তৎক্ষণাত পর হয়েছিলো। এজন্য তিনি কোরআনের আয়াত[১] يا ايها الذين امنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। কেনোনা, জুম'আ হিজরতের তৎক্ষণাত পর ফরজ হয়েছিলো।

০ এ হাদিসটিকে অনেক অজ্ঞ সুফি আওলিয়ায়ে কেরামের স্বপ্ন প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। কেনোনা, রাসূল ﷺ বলেছিলেন, ان هذه لرؤيا حق তথা নিশ্চয় এটি সত্য স্বপ্ন। কিন্তু এ প্রমাণ সম্পূর্ণ বাতিল। কারণ আজানের বিধিবদ্ধতা আমাদের জন্য স্বপ্নের কারণে নয়, বরং রাসূল ﷺ-এর সত্যায়নের কারণে এবং এ বাক্যগুলোকে অনুমোদনের কারণে। কেনোনা, তিনি সচেতন অবস্থায় এসব বাক্যের হুকুম দিয়েছেন এবং এ স্বপ্নটির সত্যায়ন করেছিলেন। এ জন্য যদি রাসূল ﷺ এ স্বপ্নের প্রতি সত্যায়ন না করতেন এবং তদানুযায়ী আমল করার নির্দেশ না দিতেন তাহলে আমল করা হতো না এর ওপর।

মূলকথা, যেহেতু রাসূল ﷺ-এর পর কারো স্বপ্নের সত্যতার জ্ঞান কোনো নিশ্চিত মাধ্যম দ্বারা হয় না, এজন্য স্বপ্ন দীনের কোনো প্রমাণ নয়। তাই রাসূল ﷺ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ (রা.)-এর স্বপ্নের সত্যায়ন এজন্য করেছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ মি'রাজ রজনীতে ফেরেশতাদের কাছ থেকে এসব শ্রুত বাক্যগুলো স্মরণে এসেছিলো। এ ব্যাপারে ঐকমত্য আছে যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়েদ (রা.)-কে স্বপ্নে আজান শেখানো

টীকা- ১. সূরা জুম'য়া- মাদানি, আয়াত-৯

হয়নি, ততোক্ষণ পর্যন্ত এসব প্রসিদ্ধ বাক্যে আজান দেয়ার পদ্ধতি ছিলো না। হজরত ইবনে উমর (রা.)-এর পরবর্তী হাদিসটি দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রথম দিকে নামাজের জন্য কোনো সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হতো। সে সময় মতো সাহাবিগণ জমা হয়ে যেতেন। পরবর্তীতে পরামর্শ হলো, হজরত উমর (রা.) রায় দিলেন اولا تبعثون رجلا ينادى بالصلوة অর্থাৎ, কোনো আহ্বানকারি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হোক। ফলে রাসূল ﷺ হজরত বিলাল (রা.)-কে বললেন, يا بلال قم فناد بالصلوة। এতে আহ্বান দ্বারা আজান নয়; বরং الصلوة جامعة বাক্য উদ্দেশ্য। যেমন,

হজরত সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব (র.)-এর একটি মুরসাল বর্ণনা দ্বারা 'তাবাকাতে ইবনে সাদে'[১] বোঝা যায়। তাছাড়া হজরত নাফে' ইবনে জুবায়রের একটি বর্ণনাও তা প্রমাণ করে। যার শব্দগুলো নিম্নে বর্ণিত হয়েছে,

فصيح باصحابه الصلوة جامعة ۔[২]

'উচ্চৈঃস্বরে লোকজনকে আহ্বান করা হলো 'আস্ সালাতু জামি'আতুন' তথা নামাজ তৈরি'।[২]

তবে আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ (রা.)-কে পরবর্তীতে স্বপ্নের মাধ্যমে আজান শেখানো হয়েছিলো, তারপর থেকে প্রচলিত হয়েছে বর্তমান আজানের বাক্যগুলো।

فقم مع بلال فانه اندى وامد صوتا : اندى শব্দের অর্থ কামুস' গ্রন্থকার লিখেছেন 'সুন্দরতম'। আর অন্য কোনো কোনো অভিধানবিদ এর অর্থ উচ্চ আওয়াজবিশিষ্ট বর্ণনা করেছেন।

প্রথম সুরতে এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুয়াজজিনের গলার স্বর সুন্দর হওয়া উত্তম। আর দ্বিতীয় সুরতে আওয়াজ বড় হওয়া উত্তম বোঝা যায়।

فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلوة خرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

এ থেকে বোঝা যায়, হজরত উমর (রা.) আজানের শব্দাবলি বিধিবদ্ধ হওয়ার কথা তখন জানতে পেরেছিলেন, যখন হজরত বিলাল (রা.) আজান দিয়েছেন। কিন্তু আবু দাউদ[৩] ইত্যাদির বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, যখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ (রা.) নিজ স্বপ্ন শুনাচ্ছিলেন, তখন হজরত উমর (রা.) সত্তাগতভাবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন; বরং আবু দাউদের[৪] এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে নিম্নের শব্দগুলো,

টীকা- ১. ফাতহুল বারি : ২/৬৬ كتاب ابواب الاذان باب بدأ الأذان

টীকা- ২. হজরত ইবনে ইসহাক বলেছেন, আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন উতবা ইবনে মুসলিম-নাফে' ইবনে জুবায়র সূত্রে, আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, ইবনে জুরাইজ-নাফে' ইবনে জুবায়র প্রমুখ সূত্রে। মি'রাজ রজনীর সকালে জিবরাইল (আ.)-এর আকস্মিক আগমন ব্যতিত অন্য কিছু তাঁকে ভীত-সন্ত্রস্ত করেনি। সূর্য হেলে যাওয়ার পর জিবরাইল (আ.) অবতীর্ণ হলেন। এজন্য এটিকে প্রথম নামাজ বলে নামকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, জোহরের নামাজ। ফলে তিনি নির্দেশ দিলেন, রাসূল ﷺ-এর সাথিদেরকে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা দেওয়া হলো, নামাজ তৈয়ার। সাহাবায়ে কেরাম একত্রিত হলেন, তারপর জিবরাইল (আ.) নবী কারিম ﷺ-এর ইমামতি করলেন। আর নবী করিম ﷺ ইমামতি করলেন লোকজনের। তারপর তিনি হাদিসটি উল্লেখ করেন।

–ফাতহুল বারি : ২/৩ كتاب مواقيت الصلوة ۔ مرتب عفى عنه

টীকা- ৩. তারপর একজন আনসারি সাহাবি এলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যখন আপনার গুরুত্বারোপের বিষয়টি দেখলাম, এ বিষয়ে যখন চিন্তা করলাম, এক ব্যক্তিকে দেখলাম যেনো তার গায়ে সবুজ রঙের এক জোড়া পোশাক। লোকটি মসজিদের ওপর দাঁড়িয়ে আজান দিয়েছে। তারপর কিছুক্ষণ বসে থেকেছে। তারপর দাঁড়িয়ে আজানের অনুরূপ বাক্য বলেছে, তবে তাতে قد قامت الصلوة-ও বলছে। যদি লোকজন এ কথা না বলতো, ইবনুল মুসান্না (তাঁর বর্ণনায়) বলেছেন, লোকজন যদি না বলতো তাহলে, আমি অবশ্যই বলতাম, আমি ছিলাম সজাগ-বিনিদ্র। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইবনুল মুসান্না আরও বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কল্যাণ দেখিয়েছেন। উমর ولقد শব্দ বলেননি। অতএব, তুমি বিলালকে নির্দেশ দাও সে যেনো আজান দেয়। রাবি বলেন, তারপর উমর (রা.) বলেন, নিশ্চয় সে যেমন স্বপ্ন দেখেছে আমিও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু যেহেতু সে আমার ওপর অগ্রগামী হয়েছে তাই আমি লজ্জাবোধ করলাম।

–আবু দাউদ : ১/৭৪, باب كيف الاذان طبع ولى محمد ايند سنز ۔ مرتب عفى عنه

টীকা- ৪. ১/৭১, باب بدأ الأذان

قال وكان عمر بن الخطاب قد راى قبل ذلك فكتمه عشرين يوما قال ثم اخبر النبى صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك ان تخبرنى فقال سبقنى عبد الله بن زيد فاستحييت .

'বর্ণনাকারী বলেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর আগে এ স্বপ্ন দেখেছিলেন। তারপর তিনি বিশ দিন পর্যন্ত এ স্বপ্ন গোপন রেখেছিলেন। বর্ণনাকারি বলেন, তারপর তিনি এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ -কে সংবাদ দিয়েছিলেন। তখন তিনি বললেন, এতোদিন তুমি আমাকে সংবাদ দাওনি কেনো? কি প্রতিবন্ধক ছিলো? জবাবে তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ আমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেছে ফলে আমি সংকোচ অনুভব করি।'

বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এমন বিভিন্নমুখী বর্ণনার কারণে। এটাকে এভাবে বিদূরিত করা যায় যে, মূলত হজরত উমর (রা.) এ স্বপ্ন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ (রা.)-এরও বিশ দিন পূর্বে দেখেছিলেন। তবে তিনি এ স্বপ্ন ভুলে গিয়েছিলেন। তারপর যখন হজরত আবদুল্লাহ (রা.) স্বপ্ন শুনালেন তখন নিজের স্বপ্ন স্মরণে এসেছে। কিন্তু তিনি লজ্জাবশত নীরব থাকেন। কেনোনা হজরত আবদুল্লাহ (রা.) অগ্রগামী হয়ে গেছেন। পরবর্তীতে হজরত বিলাল (রা.) আজান দিলেন তখন তিনি এসে রাসূল ﷺ-এর কাছে বললেন,

يا رسول الله والذى بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذى قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد فذالك اثبت كذا فى رواية الباب .

সমস্ত বর্ণনার মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়। তারপর 'মু'জামে তাবারানি আওসাতে'র একটি বর্ণনায় আছে, হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-কেও স্বপ্নে আজান শেখানো হয়েছিলো। বরং অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে ইমাম গাজালি (র.)-এর 'আল-ওয়াসি'তে দশের অধিক সাহাবি সম্পর্কে। কিন্তু এটাকে ইবনে সালাহ এবং ইমাম নববি (র.) প্রত্যাখ্যান করেছেন।[১]

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّرْجِيْعِ فِى الْاَذَانِ (ص ٤٨)

অনুচ্ছেদ- ২৬ : আজানে তারজি প্রসঙ্গে (মতন ৪৮)

عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَقْعَدَهٗ وَاَلْقٰى عَلَيْهِ الْاَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا قَالَ اِبْرَاهِيْمُ مِثْلَ اَذَانِنَا . قَالَ بِشْرٌ فَقُلْتُ لَهٗ اَعِدْ عَلَىَّ فَوَصَفَ الْاَذَانَ بِالتَّرْجِيْعِ .

১৯১. **অর্থ :** হজরত আবু মাহজুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে একটি একটি হরফ করে আজান শিখিয়েছেন। ইবরাহিম বলেছেন, আমাদের আজানের মতো। বিশর নামক বর্ণনাকারি বলেন, আমি তাঁকে (ইবরাহিমকে) বললাম, আমার সামনে আজানটি পুনরাবৃত্তি করুন। তখন তিনি আজানটির বিবরণ দিলেন তারাজি সহকারে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আজান সম্পর্কিত আবু মাহজুরা (রা.)-এর হাদিসটি বিশুদ্ধ। আবু মাহজুরা (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। এর ওপর মক্কায় আমল অব্যাহত। ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মাজহাব এটা।

عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ الْاَذَانَ تِسْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً وَالْاِقَامَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً .

টীকা. ১. বিস্তারিত এ বিবরণ 'ফাতহুল বারি' : ২/৬৩, كتاب ابواب الأذان باب بدأ الأذان থেকে গৃহীত।

১৯২. অর্থ : হজরত আবু মাহজুরা (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করিম ﷺ তাঁকে ১৯ কালিমা আজানে আর ১৭টি কালিমা ইকামাত শিক্ষা দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। আবু মাহজুরার নাম সামুরা ইবনে মি'য়ার। কোনো কোনো আলিম আজানে এ মাজহাব অবলম্বন করেছেন। আবু মাহজুরা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার একবার বলে ইকামত দিতেন।

فوصف الاذان بالترجيع : ترجيع অর্থ তাওহিদ, রিসালতের দু'সাক্ষ্যকে দু'বার ছোট আওয়াজে বলার পর পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে বলা। যেহেতু আজানে তারজি ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মতে উত্তম। এজন্য তাঁর মতে আজানের বাক্য ১৯টি। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে ১৭টি। কারণ, তিনিও তারজি'-এর প্রবক্তা। অবশ্য তাঁর মতে আজানের প্রথম দিকে তাকবির শুধু দু'বার। হাম্বলি এবং হানাফিদের মতে আজানের বাক্য ১৫টি। যেগুলোতে তারজি' নেই এবং আজানের শুরুতে তাকবির শুধু চারবার। কিন্তু শুধু উত্তমতার ক্ষেত্রে এ মতপার্থক্য। এজন্য হানাফিদের মতেও তারজি' বৈধ। ইমাম সারাখসি (র.) এবং অন্য কোনো কোনো ফুকাহায়ে হানাফি যে, তারজি'কে মাকরূহ লিখেছেন এর দ্বারা উদ্দেশ্য অনুত্তম। মাকরূহ শব্দটি কোনো কোনো সময় উত্তমের বিপরীত অর্থেও ব্যবহার হয়। যেমন আল্লামা শামি (র.) লিখেছেন, আশুরার রোজা একটি রাখা কোনো কোনো ফকিহ মাকরূহ বলেছেন। তবে এর দ্বারা অনুত্তম উদ্দেশ্য।

তাকবিরে দু'বার হওয়ার ওপর ইমাম মালেক (র.) পরবর্তী অনুচ্ছেদে হজরত আনাস (রা.)-এর বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন।

امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة : একটি বাক্যকে দু'বার বলা شفع শব্দের অর্থ। তাকবিরও তাতে অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া পরবর্তী অনুচ্ছেদের সাথে সংশ্লিষ্ট অধ্যায় (باب ان الاقامة مثنى مثنى)-এ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ (রা.)-এর বর্ণনাও তাঁর প্রমাণ।

قال كان اذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا فى الاذان والاقامة ـ

'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আজান ও ইকামত ছিলো জোড়া জোড়া।'

০ তবে জমহুর এর জবাবে সেসব হাদিস পেশ করেন যেগুলোতে স্পষ্টাকারে চারবার তাকবিরের কথা রয়েছে। এজন্য হজরত আবু মাহজুরা, হজরত বিলাল, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ এবং হজরত সাদ আল-কুরাজ (রা.)-এর আজান যেসব বর্ণনায় অক্ষরে অক্ষরে বর্ণিত আছে সেসব বর্ণনায় চারবার তাকবিরের কথা বর্ণিত হয়েছে। এসব বর্ণনা আবু দাউদ ইবনে মাজাহ ইত্যাদিতে বিদ্যামান আছে। অতএব, شفع اذان -এর অর্থ হলো, দুই শাহাদাতে এবং দুই হায়্যাআলায় দু'বার পড়া। অথবা, এটাও হতে পারে– যেহেতু আল্লাহু আকবার দুই বার এক শ্বাসে আদায় করা হয় এজন্য দুটি তাকবিরকে এক এবং চার তাকবিরকে শাফা' বা জোড়া বলা হয়েছে। যেনো উদ্দেশ্য এদিকে ইঙ্গিত করা যে, চার তাকবির যেনো আদায় করা হয় এক সঙ্গে।

মালেকি এবং শাফেয়িগণ তারজি' প্রমাণ করার ক্ষেত্রে হজরত আবু মাহজুরা (রা.)-এর হাদিস পেশ করেন,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقعده والقى عليه الاذان حرفا حرفا قال ابراهيم مثل اذاننا قال بشر فقلت له اعد على فوصف الاذان بالترجيع ـ

'তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বসিয়ে একটি একটি হরফ করে আজান শিখিয়েছেন। ইবরাহিম বলেছেন, আমাদের আজানের মতো। বিশর বলেছেন, আজানটির পুনরাবৃত্তি করুন, তখন তিনি (ইবরাহিম) তারজি' সহকারে আজানটির বিবরণ দিয়েছেন।'

তেমনিভাবে এ অধ্যায়ে আবু মাহজুরা (রা.)-এর অন্য একটি বর্ণনা দ্বারাও তারজি' প্রমাণ করেন,

ان النبى صلى الله عليه وسلم علمه الاذان تسع عشرة كلمة والاقامة سبع عشر كلمة -

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ (রা.)-এর বর্ণনা হানাফি এবং হাম্বলিদের প্রমাণ যে, তাঁকে স্বপ্নযোগে আজান শেখানো হয়েছিলো। তাতে তারজি' ছিলো না।[১] এমনভাবে হজরত বিলাল (রা.) আখেরি ওয়াক্ত পর্যন্ত তারজি' ছাড়া আজান দিতে থাকেন। এজন্য হজরত সুয়াইদ ইবনে গাফালা (রা.) বলেন[২]– سمعت بلالا يؤذن مثنى ويقيم مثنى এবং হজরত সুয়াইদ ইবনে গাফালা মুখাজরামি ছিলেন। 'তাকবিরে' ইবনে হাজার (র.) লিখেছেন যে, তিনি ঠিক সেদিন মদিনা তাইয়িবায় পৌঁছেন যেদিন রাসূল ﷺ-এর দেহ মুবারক দাফন করা হয়। অতএব প্রকাশ থাকে যে, তিনি হজরত বিলাল (রা.)-এর আজান নবীজি ﷺ-এর ওফাতের পরে শুনেছেন। সুতরাং যারা বলেন যে, হজরত বিলাল (রা.)-এর আজানে হজরত আবু মাহজুরা (রা.)-এর ঘটনার পর পরিবর্তন এসে গিয়েছিলো, তাদের বক্তব্য হয়ে যায় এ বর্ণনা দ্বারা।

তিরমিযী শরিফে[৩] বর্ণিত হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়েদ (রা.)-এর বর্ণনা হানাফিদের তৃতীয় প্রমাণ-

قال كان اذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا فى الاذان والاقامة -

নাসায়িতে[৫] বর্ণিত হজরত ইবনে উমর (রা.)-এর বর্ণনা চতুর্থ প্রমাণ।

قال كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى الخ

'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামানায় আজান ছিলো জোড়া জোড়া।'

হজরত আবু মাহজুরা (রা.)-এর বর্ণনার জবাব হিদায়া গ্রন্থকার[৬] এ দিয়েছেন যে, وكان ما رواه تعليما فظنه ترجيعا الخ অর্থাৎ, রাসূলে আকরাম ﷺ তা'লিমের উদ্দেশে শাহাদতদ্বয়ের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। আবু মাহজুরা মনে করেছেন এটা আজানের অংশ। কিন্তু হিদায়া গ্রন্থকারের এ ব্যাখ্যা হজরত আবু মাহজুরা (রা.)-এর অনুধাবন সম্পর্কে কুধারণার ওপর নির্ভরশীল, যা সঙ্গত নয়। তাছাড়া আবু দাউদের[৭] বর্ণনায় قال ارجع فمد من صوتك اشهد ان لا اله الا الله الخ (তিনি বললেন, যা। তোমরা আওয়াজ উঁচু করো, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু........।) বাক্যটি তা প্রত্যাখ্যান করছে। অনেকে এ জবাব দিয়েছিলেন যে, তাবরানি[৮] 'মু'জামে আওসাতে' হজরত আবু মাহজুরা (রা.) এর আজান তারজি' ব্যতিত বর্ণনা করেছেন।[৯] কিন্তু এ জবাবটিও প্রশান্তিদায়ক নয়। কেনোনা, তাবারানি ইত্যাদির বর্ণনা সেসব অধিক বর্ণনার মুকাবেলা করতে পারে না যেগুলো তারজি' সহকারে বর্ণিত।

টীকা- ১. আবু দাউদের হাদিস : ১/৭১-৭২ (طبع ولى محمد ايند سنز، كراچى) كتاب الصلوة باب كيف الأذان

টীকা- ২. শরহে মা'আনিল আছার : ১ম খণ্ড كتاب الصلوة باب اقامة كيف هى

টীকা- ৩. শব্দ তিরমিযীর : ১ম খণ্ড باب ماجاء، فى ان الإقامة مثنى مثنى

টীকা- ৪. ইবনুল জাওজি (র.) তাহকিকে বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ (র.)-এর হাদিস আজানের ব্যাপারে মূল। তাতে কিন্তু তারজি' নেই। এতে বোঝা যায় যে, তারজি' মাসনুন নয়। حواشى اثار السنن للنيموى ـ ص ٥١ باب ماجاء، فى عدم الترجيع ـ مرتب عفى عنه

টীকা- ৫. শব্দ নাসায়ির : ১ম খণ্ড, كتاب الاذان بدأ الاذان হাদিসটি আবু দাউদও বর্ণনা করেছেন। ১/৭৬ باب فى الإقامة।

টীকা- ৬. হিদায়া : ১ম খণ্ড باب الأذان।

টীকা- ৭. ১/৭৩ باب كيف الأذان।

টীকা- ৮. শায়খ বিন্নুরি (র.) মা'আরিফুস সুনান : ২/১৮১. باب ماجاء، فى الترجيع فى الاذان فى تحقيق وجه الترجيع فى اذان ابى محذورة তে বর্ণনা করেছেন।

টীকা- ৯. এমনভাবে মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে : (২/৪৫৮) ও মুহাদ্দিস আব্দুর রাজ্জাক ইবনে জুরাইজ-উসমান-তার পিতা শায়খ মাওলা আবু মাহজুরা ও উম্মে আব্দুল মালেক ইবনে আবু মাহজুরা সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

০ একটি জবাব দিয়েছেন আল্লামা ইবনে কুদামা হাম্বলি 'আল-মুগনি'তে। যার সারনির্যাস হলো, হজরত আবু মাহজুরা (রা.) ছোট বাচ্চা এবং কাফের ছিলেন। তায়েফ থেকে রাসূল ﷺ-এর প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁর জনপদের নিকট মুসলমানদের অবস্থান করতে হয়েছিলো। সেখানে মুসলমানরা আজান দিলো। তখন আবু মাহজুরা এবং তাঁর সাথি-সঙ্গীরা ঠাট্টাচ্ছলে আজান নকল করতে আরম্ভ করলো। রাসূলে আকরাম ﷺ তাদেরকে ডাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু আওয়াজের অধিকারী কে ছিলো? জানা গেলো হজরত আবু মাহজুরা (রা.)-এর আওয়াজ সবচেয়ে উঁচু ছিলো। হজরত আবু মাহজুরা (রা.)-কে পেলেন সুমিষ্ট বুলন্দ আওয়াজের অধিকারী। তখন তাঁর মাথার ওপর হাত বুলালেন। ফলে তাঁর অন্তরে ঈমান প্রবিষ্ট হলো। এ সুযোগে রাসূল ﷺ তাঁকে মুসলমান বানানোর পর আজানও শিখিয়েছেন। সুতরাং প্রথম শাহাদতদ্বয়ের উদ্দেশ্য ছিলো তাঁকে মুসলমান বানানো। আর দ্বিতীয়বার শাহাদতদ্বয়ের উদ্দেশ্য ছিলো আজান শিক্ষা দেওয়া। তারপর যখন রাসূল ﷺ তাঁকে মক্কা মু'আজ্জামায় মুয়াজজিন নিয়োগ করলেন তখন নিজে তারজি'কে তাঁর আজানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং চার বার শাহাদত অবশিষ্ট রাখেন। কেনোনা, এর বদৌলতে তাঁর ঈমানের দৌলত লাভ হয়েছিলো। এ ঘটনাটিকে স্মারক বানানোর উদ্দেশে তারজি' বহাল রেখেছেন। কিন্তু এটা শুধু তাঁরই বৈশিষ্ট্য, ব্যাপক হুকুম ছিলো না। এর প্রমাণ হলো, এ ঘটনার পরও রাসূল ﷺ হজরত বিলাল (রা.)-এর আজানে কোনো পরিবর্তন ঘটাননি; বরং প্রমাণিত আছে যে, হজরত বিলাল (রা.) শেষ পর্যন্ত তারজি' ব্যতিত আজান দিতে থাকেন। যেমন সুওয়াইদ ইবনে গাফালার বর্ণনায় আগে বলা হয়েছে। ইবনে কুদামার জবাবের সারনির্যাস হলো তারজি' হজরত আবু মাহজুরা (রা.)-এর বৈশিষ্ট্য।

তবে সামগ্রিকভাবে বর্ণনাগুলোর প্রতি গভীর দৃষ্টিতে দেখার পর সমস্ত ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে হজরত শাহ ওলিউল্লাহ (র.)-এর ব্যাখ্যা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সর্বোৎকৃষ্ট ও প্রধান মনে হয়। তিনি বলেছেন,

ان الاختلاف فى كلمات الاذان كالاختلاف فى احرف القران كلها شاف ـ

বস্তুত শুরু থেকেই আল্লাহর পক্ষ থেকে আজানের এসব বাক্য নাজিলকৃত ছিলো। হজরত বিলাল (রা.)-এর আজানে তারজি' ছিলো না; কিন্তু হজরত আবু মাহজুরা (রা.)-এর আজানে ছিলো। এর সহায়তা এর ফলেও হয় যে, কুবার মুয়াজজিন হজরত সা'দ আল-কুরাজ (রা)-এর আজানে তারজি' ছিলো।[১] এতে বোঝা যায় তারজি' হজরত আবু মাহজুরা (রা.)-এর বৈশিষ্ট্য ছিলো না। কিন্তু হজরত সা'দ আল-কুরাজের ছেলে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র (রা.)-এর খেলাফতকালেও তারজি' ব্যতিত আজান দিতেন।[২] বরং 'মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা'[৩] ইত্যাদিতে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সম্পর্কে অনেক বর্ণনা বর্ণিত আছে যে, তিনি শাহাদাতদ্বয় তিনবার বলতেন। এই সমষ্টি থেকে প্রমাণিত হয় যে, এসব পদ্ধতি রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত এবং জায়েজ। অবশ্য হানাফিগণ তারজি' না করার বিষয়টিকে একেতো এ কারণে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, হজরত বিলাল (রা.)-এর সাধারণ আমল ছিলো তারজি' ব্যতিত আজান দেওয়া।[৪] অথচ সফরে এবং বাড়িতে সর্বদা তিনি রাসূল ﷺ-এর সাহচর্যে থেকেছেন।

তাছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ (রা.)-এর বর্ণনাটি তারজি' বিহীন। অথচ এটি আজানের ব্যাপারে মূল ভিত্তির মর্যাদা রাখে। অতএব, তারজি' না হওয়াই প্রধান। অবশ্য তারজি' এর বৈধতা সম্পর্কেও কোনো আপত্তি নেই।

টীকা. ১. সুনানে দারাকুতনি : ১/২৩৬, باب ذكر سعد القرظ

টীকা. ২. দ্রষ্টব্য : মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক : ২/৪৫৯

টীকা. ৩. নাফে' ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে উমর (রা.)-এর আজান ছিলো নিম্নেযুক্ত, الله اكبر الله اكبر شهدت ان لا اله الا الله তিনবার, شهدت ان محمدا رسول الله তিনবার, حى على الصلوة তিনবার, حى على الفلاح তিনবার, الله اكبر আমার ধারণা তিনি বলেছেন, لا اله الا الله (একবার)।

(টীকা- ৪. পরের পৃষ্ঠায়)

بَابُ مَاجَاءَ فِى اِفْرَادِ الْاِقَامَةِ (صـ ٤٨)

অনুচ্ছেদ- ২৭ : ইকামত একবার একবার বলা প্রসঙ্গে (মতন ৪৮)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ اُمِرَ بِلَالٌ اَنْ يَّشْفَعَ الْاَذَانَ وَ يُوْتِرَ الْاِقَامَةَ ۔

১৯৩. অর্থ : হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, বিলাল (রা.)-কে আজানের শব্দ দু'বার করে আর ইকামতের শব্দ একবার করে বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইবনে উমর (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'আনাস (রা.)-এর হাদিস حسن صحيح। এটা সাহাবি ও তাবেয়িদের কোনো কোনো আলেমের মাজহাব। মালেক শাফেয়ি আহমদ ও ইসহাক (র.) এ মতই পোষণ করেন।'

দরসে তিরমিযী

و يوتر الاقامة : ইমামত্রয় এ বর্ণনার ভিত্তিতে ইকামত একবার বলার প্রবক্তা। তারপর তাঁদের মাঝে সামান্য মতানৈক্য আছে যে,

১. শাফেয়ি এবং হাম্বলিদের মতে ইকামতের বাক্য এগারটি। তারমধ্যে শাহাদতদ্বয় ও حى على الصلوة، حى على الفلاح শুধু একবার করে[১]।

২. আর ইমাম মালেক (র.)-এর মতে ইকামতের বাক্য মোট দশটি। কেনোনা, তিনি ইকামতকেও একবার বলার পক্ষে। মোটকথা, একবার ইকামত বলার সপক্ষে তাঁদের প্রমাণ হলো, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি, যাতে স্পষ্টাকারে একবার ইকামত দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অবশ্য শাফেয়ি এবং হাম্বলিগণ এর থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত করেন, قد قامت الصلوة কে।

(পূর্বের পৃষ্ঠার) টীকা. ৪. সুনানে দারেকুতনি : ১/২৩৬, باب ذكر سعد القرظ এ হজরত সা'দ আল-কুরাজের বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, হজরত বিলাল (রা.)-কেও রাসূলুল্লাহ ﷺ তারজি' সহকারে আজান শিখিয়েছিলেন। উমর ইবনে সা'দ তাঁর পিতা সা'দ আল-কুরাজ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁকে বলতে শুনেছেন যে, এ আজান হলো, বিলাল (রা.)-এর। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে এ আজানের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং এটি তাঁরই ইকামত الله اكبر الله اكبر ـ الله اكبر الله اكبر ـ اشهد ان لا اله الا الله اشهد الله اله الا الله ـ اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ـ اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله তারপর তারজি' করতেনও বলতেন اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ـ حى على الصلوه حى على الصلوه ـ حى على الفلاح حى على الفلاح ـ الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ـ الخ এ বর্ণনাটির সনদ সম্পর্কে তাহকিক নেই।

মোটকথা, এ বর্ণনা এবং অন্যান্য বর্ণনার সমষ্টি দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, হজরত বিলাল (রা.)-কে রাসূল ﷺ উভয় পদ্ধতিতে আজান শিখিয়েছিলেন। অবশ্য তাঁরা তারজি' না করা তাদের মা'মূল বানিয়ে নিয়েছেন এবং সফর ও ইকামত অবস্থায় রাত দিনে পাঁচবার রাসূল ﷺ-এর সামনে তারজি' বিহীন আজান দিতে থাকেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর পর্যন্ত এই মা'মুলই ছিলো। যেমন হজরত সুওয়াইদ ইবনে গাফালা (রা.)-এর বর্ণনা দ্বারা বোঝা গেলো। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, তারজি' নাজায়েজ। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, এটা প্রধান নয়। –সংকলক

টীকা. ১. ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মতে ইকামতের বাক্যগুলো নিম্নরূপ,

الله اكبر الله اكبر ـ اشهد ان لا اله الا الله ـ اشهد ان محمدا رسول الله ـ حى على الصلوة حى على الفلاح ـ قد قامت الصلوة ـ قد قامت الصلوة ـ الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ـ كتاب الأم للإمام الشافعى (رحـ) جـ ١ صـ٨٥ ـ طبع مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، باب حكاية الاذان ـ مرتب عفى عنه

عن انس رضى الله تعالى عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة زاد يحيى فى حديثه عن ابن علية فحدثت به ايوب فقال الا الاقامة [১] .

মালেকিদের বিরুদ্ধে এই হাদিসটি প্রমাণ।[২]

৩. হানাফিদের মতে ইকামতের বাক্য মোট ১৫টি। শাহাদতদ্বয় حى على الصلوة، حى على الفلاح এবং قد قامت الصلوة তিনটি দু'বার দু'বার করে, আর শুরুতে চারবার তাকবির বলবে। যেনো আজানের পনের বাক্যে حى على الصلوة، حى على الفلاح -এর পর শুধু দু'বার قد قامت الصلوة অতিরিক্ত করা হবে।

হানাফিদের প্রমাণাদি নিম্নেযুক্ত

১. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ (রা.) হতে বর্ণিত পরবর্তী অনুচ্ছেদের (باب ماجاء فى ان الاقامة مثنى) হাদিস,

قال كان اذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا فى الاذان والاقامة .

'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আজান ইকামতের শব্দগুলো ছিলো জোড়া জোড়া।'

০ এর জবাবে শাফেয়িগণ বলেন যে, এ হাদিসটি মুনকাতে'। কেনোনা আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়েদ (রা.) হতে শুনেনি। স্বয়ং ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, وعبد الرحمن ابن ابى ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد তথা আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লা আবদুল্লাহ ইবনে জায়েদ (রা.) থেকে শোনেননি। ইমাম তিরমিযী (র.)-এর উদ্দেশ্যও এ বাক্যটি দ্বারা ইকামত জোড়া জোড়া হওয়ার ব্যাপারে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ (রা.)-এর ওপরযুক্ত বর্ণনাটিকে প্রশ্ন সাপেক্ষ করা সূত্রগতভাবে।

০ এ প্রশ্নের জবাব হানাফিগণ দিয়েছেন যে, প্রথমতো হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লা হজরত উমর (রা.)-এর শাহাদতের আট বছর পূর্বে জন্মলাভ করেছিলেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে জায়েদ (রা.)-এর ওফাত হয়েছিলো হজরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে। অতএব, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ (রা.)-এর ওফাতের সময় হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লার বয়স অন্তত পক্ষে ৭/৮ বছর হবে। আর এ বয়স উসুলে হাদীসের সিদ্ধান্ত মুতাবেক বর্ণনা গ্রহণের জন্য যথেষ্ট। এ কারণে 'আল-ইসতি'আবে' আল্লামা ইবনে আব্দুল বার হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ (রা.)-এর ছাত্রদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লাকে।

০ 'নসবুর রায়া'তে হাফেজ জামালুদ্দীন জায়লায়ি (র.) এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন যে, যখন অন্য সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে, আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লা অন্য কোনো সাহাবি সূত্রে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ

টীকা- ১. মুসলিম : ১/১৬৪, باب الأمر بشفع الأذان وايتار الاقامة الا كلمة الإقامة فإنها مثناة

টীকা- ২. ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামানায় আজানের শব্দগুলো ছিলো দু'বার দু'বার আর ইকামতের শব্দগুলো ছিলো একবার একবার। তবে ইকামতের মধ্যে قد قامت الصلوة، قد قامت الصلوة বলতেন। –আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ি। এর সনদ সহিহ। –'আছারুস্ সুনান' : ৫১-৫২, باب فى افراد الإقامة। এটিও মালেক (র.)-এর বিরুদ্ধে প্রমাণ। তবে যেহেতু এ বর্ণনাটি বাহ্যত হানাফিদেরও বিরোধী মনে হয় সেহেতু আল্লামা নিমভি (র.) 'আত্-তা'লিকুল হাসান আলা আসারিস্ সুনান' (المطبوع على حواشى اثار السنن) -এ এর জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন, আমরা বলবো, কারও কারও মাজহাব হলো, একবার একবার ইকামত বলার হুকুম রহিত হয়ে গেছে। কারণ বিলাল (রা.) নবী করিম ﷺ-এর পর ইকামতের শব্দ দু'বার দু'বার বলতেন। যেমন পরবর্তীতে আসছে। আর অনেকে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আজানের দুই কালিমার মাঝে বিচ্ছেদ ও ইকামতের কালিমাগুলো এক আদায়ের। আর অনেকে বৈধতাও এখতেয়ারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। অতএব, যার ইচ্ছা ইকামতের শব্দ দু'বার বলবে, আর যার ইচ্ছা একবার বলবে। والله اعلم . مرتب عفى عنه

(রা.)-এর এ বর্ণনা শুনেছেন, তবে আর এ প্রশ্ন বাকি থাকে না। কারণ, সাহাবি অজ্ঞাত হলে তা ক্ষতিকর নয়। এর সহায়তা এর দ্বারাও হয় যে, ইমাম তাহাবি (র)[১]ও সহিহ সনদে একটি হাদিস নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন,

عن عبد الرحمن بن ابى ليلى قال اخبرنى اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن زيد الانصارى رأى فى المنام الاذان فاتى النبى صلى الله عليه وسلم فاخبره - فقال علمه بلالا - فاذن مثنى مثنى واقام مثنى مثنى وقعد قعدة -

'হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আবি লায়লা বলেছেন, আমাকে সাহাবিগণ সংবাদ দিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ আল-আনসারি (রা.) স্বপ্নে আজান দেখেছেন। তারপর নবী করিম ﷺ-এর কাছে এসে এ সংবাদ দিয়েছেন। তিনি শুনে বললেন, এটা বিলালকে শিখিয়ে দাও। ফলে তিনি দু'বার দু'বার আজান ও ইকামতের কালিমা বললেন, আর বসলেন একবার।'

আর যদি অসম্ভবকে মেনে নিয়ে এ সূত্রটি সঠিক না হয় তবেও এ হাদিসটি সর্বোচ্চ মুরসাল হবে। আর মুরসাল জমহুরের মতে দলিল।

২. তাহাবি[২] এবং মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা ইত্যাদির বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ (রা.)-কে স্বপ্নে আজানের সাথে ইকামতও শেখানো হয়েছিলো। সেটিও ছিলো আজানের ন্যায় জোড়া জোড়া। সবচেয়ে স্পষ্ট এবং বিশুদ্ধ বর্ণনা এ ব্যাপারে[৩] মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে রয়েছে,

حدثنا ابو عبد الرحمن بقى بن مخلد قال نا ابو بكر بن ابى شيبة قال نا وكيع قال نا الاعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ابى ليلى قال نا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن زيد الانصارى (رض) جاء الى النبى عليه السلام فقال يا رسول الله رأيت فى المنام كان رجلا قام وعليه بردان اخضران على حدبة حائط فاذن مثنى واقام مثنى وقعد قعدة قال فسمع ذلك بلال فقام مثنى مثنى واقام مثنى مثنى وقعد قعدة -

'নসবুর রায়া'য় এ বর্ণনাটি বর্ণনা করার পর হাফেজ (র.) বলেন, আল্লামা তাকিউদ্দীন ইবনে দাকিকুল ইদ এ হাদিসটিকে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন। আল্লামা ইবনে হাজম (র.) লিখেছেন, هذا اسناد فى غاية الصحة অর্থাৎ, চূড়ান্ত পর্যায়ের এ সনদটি বিশুদ্ধ। আল্লামা ইবনুল জাওজি (র.) এ হাদিসটির বিশুদ্ধতা দেখে التحقيق নামক গ্রন্থে তারজি' বর্জন এবং ইকামত জোড়া জোড়া হওয়ার দিকে ঝোঁক প্রকাশ করেছেন। মূলকথা, আলোচ্য অনুচ্ছেদের এ হাদিসটি আজান ও ইকামতের ক্ষেত্রে হানাফিদের একটি মজবুত দলিল।

৩. হজরত সুওয়াইদ ইবনে গাফালার বর্ণনা যেটি এসেছে তাহাবির[৪] বরাতে আগের অনুচ্ছেদে,

سمعت بلالا يؤذن مثنى ويقيم مثنى -

'আমি শুনেছি বিলালকে দু'বার দু'বার আজান ও দু'বার দু'বার ইকামত দিতে।'

টীকা- ১. শরহে মা'আনিল আছার, কিতাবুস্ সালাত, বাবুল ইকামাতি কায়ফা হিয়া।

টীকা- ২. সূত্র ঐ।

টীকা- ৩. ১/১৩৬, ছাপা মাকতাবা সালাফিয়া, মুলতান, ما جاء فى الأذان والإقامة كيف هو

টীকা- ৪. ১ম খণ্ড, كتاب الصلوة باب الإقامة كيف هى

৪. তাহাবি[১] শরিফে হজরত আবু মাহজুরা (রা.)-এর একটি হাদিস আছে তাতে তিনি বলেন,

علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقامة سبع عشرة كلمة .

আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইকামতের ১৭টি বাক্য শিখিয়েছেন।'

তিরমিযীতে পেছনের অনুচ্ছেদে এমন অর্থবোধক বর্ণনা এসেছে।

৫. সুনানে দারেকুতনিতে[২] হজরত আবু জুহাইফা (রা.)-এর হাদিস হলো,

ان بلالا كان يؤذن للنبى صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى .

৬. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে[৩] স্বয়ং হজরত বিলাল (রা.)-এর হাদিস আছে,

عبد الزراق عن الثورى عن ابى معشر عن ابراهيم عن الاسود عن بلال (رض) قال كان اذانه واقامته مرتين مرتين .

হাফেজ মারদিনি বলেছেন[৪] هذا سند جيد (এ সনদটি উত্তম)। অবশিষ্ট আছে, সেসব বর্ণনা যেগুলোতে ইকামত একবার দেওয়ার বিবরণ রয়েছে এবং শাফেয়ি ও মালেকিদের প্রমাণ।

৭. এগুলোর জবাব হানাফিদের পক্ষ হতে সাধারণতো এ দেওয়া হয় যে, ايتار দ্বারা উদ্দেশ্য দুটি বাক্য এক শ্বাসে আদায় করা। এজন্য স্বয়ং ইমাম শাফেয়ি (র.) আল্লাহু আকবারে ايتار -কে এ অর্থে প্রয়োগ করেছেন। এ জবাবটি প্রশান্তিদায়ক হতে পারতো। কিন্তু যেসব বর্ণনায়[৫] الا الاقامة বলে ইকামতকে ব্যতিক্রমভুক্ত করেছেন তার আলোকে এ জবাবটি জয়িফ হয়ে যায়। এজন্য 'ফাতহুল মুলহিমে' আল্লামা উসমানি (র.) খেলাফে মুতাবাদির (মন দ্রুত যেদিকে যায় না) সাব্যস্ত হাদিসগুলোতে একবার ও জোড় জোড় উভয়টি প্রমাণিত আছে। এজন্য এর বৈধতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ বা প্রশ্ন নেই। তবে দেখার বিষয় হলো প্রাধান্য কোনটির।

৮. ১৭ বাক্যের বর্ণনাটিকে হানাফিগণ এজন্য প্রধান্য দিয়েছেন যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ (রা.)-এর বর্ণনা যেটি আজান ও ইকামতের ক্ষেত্রে মূল্যের মর্যাদা রাখে তাতে জোড়ের কথা প্রমাণিত আছে। পেছনে তা বলা হয়েছে। দ্বিতীয়তো হজরত বেলাল (রা.)-এর শেষ আমল ছিলো ইকামত জোড় জোড় বলা। যেমন, পেছনে হজরত সুওয়াইদ ইবনে গাফালা (রা.)-এর উল্লিখিত বর্ণনাগুলো দ্বারা বোঝা যায়। আর হজরত বিলাল (রা.)-এর ইকামতে বৈপরীত্যের[৬] পর যখন আমরা হজরত আবু মাহজুরা (রা.)-এর ইকামত দেখলাম যে, সেটিও সতেরো বাক্যবিশিষ্ট, যেমন পেছনের অনুচ্ছেদের বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, আর হজরত আবু মাহজুরা (রা.) থেকে ইকামত একবার বলার যে হাদিসটি বর্ণিত সেটি 'ফাতহুল মুলহিমে' আল্লামা উসমানির তাহকিক মতে জয়িফ, ফলে এমন মনে হচ্ছে যে, হজরত বিলাল (রা.) প্রথমে একবার ইকামতের ওপর আমল করতেন। পরবর্তীতে জোড় জোড়ের ওপর আমল করতে আরম্ভ করেন। হজরত সুওয়াইদ ইবনে গাফালা (রা.)-এর ওপরযুক্ত বর্ণনা এর একটি নিদর্শন।

টীকা- ১. সূত্র ঐ।

টীকা- ২. ১/২৪২ باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها

টীকা- ৩. ২/৪৬৩

টীকা- ৪. তাবারানি 'মুসনাদুশ্ শামিয়্যিন' জুনাদা ইবনে আবু উমাইয়া সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আর দারাকুতনি আবু জুহাইফা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সে বর্ণনাটি এর সহায়ক। টীকা মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক : ২/৪৬৩

টীকা- ৫. মুসলিম : ১/১৬৪ باب الأمر بشفع الأذان وايتار الأقامة الا كلمة الإقامة فانها مثناة

টীকা- ৬. কারণ, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الإقامة শব্দ আছে। অন্যদিকে তাহাবিতে হজরত সুওয়াইদ ইবনে গাফালা (রা.)-এর বর্ণনা হলো سمعت بلالا يؤذن مثنى ويقيم مثنى এভাবে বাহ্যত উভয়ের মাঝে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে। –সংকলক।

দ্বিতীয় নিদর্শন হলো, হজরত আবু মাহজুরা (রা.)-এর বর্ণনা। কেনোনা, তিনি নবম হিজরিতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এজন্য স্পষ্ট হলো হজরত বিলাল (রা.)-এর শেষ আমল প্রাধান্যের যোগ্য। আর আমরা প্রথমে বলে এসেছি– এ মতপার্থক্যটি প্রধান-অপ্রধানের, বৈধতা -বৈধতার নয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ أَنَّ الْاِقَامَةَ مَثْنٰى مَثْنٰى (ص ٤٨)

অনুচ্ছেদ- ২৮ : ইকামতের শব্দ দু'বার দু'বার প্রসঙ্গে (মতন ৪৮)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ (رض) قَالَ كَانَ اَذَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم شَفْعًا فِى الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ .

১৯৪. অর্থ : হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আজান ও ইকামতের শব্দগুলো জোড়া জোড়া ছিলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে জায়েদের হাদিসটি ওয়াকি'-আ'মাশ-আমর ইবনে মুররা-আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লা সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ স্বপ্নে আজান দেখেছেন। শু'বা-আমর ইবনে মুররা-আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লা-রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনেক সাহাবি সূত্রে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ (রা.) আজান স্বপ্নে দেখেছেন। এটি ইবনে আবু লায়লার হাদিস অপেক্ষা বিশুদ্ধতম। আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লা আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ (রা.) থেকে হাদিস শ্রবণ করেননি। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আজানের শব্দগুলো দু'বার ও ইকামতের শব্দগুলোও দু'বার দু'বার।

এ মতই পোষণ করেন সুফিয়ান সাওরি, ইবনে মুবারক এবং কুফাবাসীও।

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّرَسُّلِ فِى الْاَذَانِ (ص ٥٨)

অনুচ্ছেদ- ২৯ : থেমে থেমে আজানের শব্দ বলা প্রসঙ্গে (মতন ৪৮)

عَنْ جَابِرٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلَالٍ يَا بِلَالُ! اِذَا اَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فِيْ اَذَانِكَ وَاِذَا اَقَمْتَ فَاحْدُرْ وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَاِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرَغُ الْاٰكِلُ مِنْ اَكْلِهٖ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهٖ وَالْمُعْتَصِرُ اِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهٖ وَلَا تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِيْ .

১৯৫. অর্থ : হজরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, বিলাল (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিলাল! যখন তুমি আজান দাও তখন ধীরে ধীরে তাড়াহুড়া না করে ওয়াক্‌ফসহকারে আজান দাও। আর যখন ইকামত দাও তখন দ্রুত শব্দগুলো বলো। তোমার আজান ও ইকামতের মাঝে এতোটুকু সময় রাখা যতোটুকু সময় ভক্ষণকারি তার খানা থেকে, পানকারি তার পান থেকে, পেশাব-পায়খানার চাপে পতিত ব্যক্তি যখন পায়খানায় প্রবেশ করে তখন সে তার হাজত পূরণ করে অবসর হতে পারে। আর আমাকে দেখার আগে তোমরা দাঁড়িও না। (মুনকার। এর সনদে আবদুল মুনইম ইবনে নুআইম রাবি সমালোচিত। তিনি গ্রহণযোগ্য নন।)

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ نَحْوَهٗ .

১৯৬. অর্থ : হজরত 'আবদ ইবনে হুমাইদ ইউনুস ইবনে মুহাম্মদ সূত্রে আব্দুল মুনয়িম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, জাবেরের এ হাদিসটি আমরা আব্দুল মুনয়িমের এ সূত্র ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে জানি না। এ সনদটি মজহুল।

দরসে তিরমিযী

يا بلال اذا اذنت فترسل فى اذانك : ترسل অর্থ, প্রশান্তির সাথে কোনো কাজ করা। আজানে ترسل দ্বারা, আজানের বাক্যগুলোতে ওয়াক্‌ফ করা উদ্দেশ্য।

واذا اقمت فاحدر : حدر- অর্থ, তাড়াতাড়ি করা। ইকামতের حدر দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইকামতের বাক্যগুলোকে একসঙ্গে অব্যাহতভাবে আদায় করা। এ মাসআলাটি সর্বসম্মত যে, আজানে ترسل এবং ইকামতে حدر মাসনুন।

قال ابو عيسى حديث جابر هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه : অর্থাৎ, এ হাদিসটি নির্ভর করে আব্দুল মুনইমের ওপর, অন্য কোনো রাবি এ হাদিসটি বর্ণনা করেননি। কিন্তু এ বক্তব্য ইমাম তিরমিযীর নিজস্ব জ্ঞান অনুযায়ী হয়েছে। অন্যথায় হাকেম[১] এবং ইবনে আদি প্রমুখ এ হাদিসটি অন্য কোনো কোনো বর্ণনাকারি থেকেও বর্ণনা করেছেন এবং এ বিষয়টি হাদিসের অন্য কোনো কোনো কিতাবে অন্যান্য সাহাবি হতেও বর্ণিত আছে। অনুচ্ছেদে যদিও এ এই সবগুলো হাদিস সনদগতভাবে জয়িফ; কিন্তু এগুলো গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে দুই কারণে।

এক. একাধিক সূত্রের জন্য।

দুই. ইজমায়ি আমল দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ اِدْخَالِ الْاَصْبَعِ الْاُذُنَ عِنْدَ الْاَذَانِ (ص ٤٩)

অনুচ্ছেদ- ৩০ : আজানের সময় কানে আঙুল ঢুকানো প্রসঙ্গে (মতন ৪২)

عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ (رض) قَالَ رَاَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَيَدُوْرُ وَيَتْبَعُ فَاهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا وَاِصْبَعَاهُ فِىْ اُذُنَيْهِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِىْ قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ اُرَاهُ قَالَ مِنْ اَدَمٍ فَخَرَجَ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنَزَةِ فَرَكَزَهَا بِالْبَطْحَاءِ . فَصَلّٰى اِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى بَرِيْقِ سَاقَيْهِ قَالَ سُفْيَانُ نُرَاهُ حِبَرَةً .

১৯৭. অর্থ : হজরত আবু জুহায়ফা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, বিলাল (রা.)-কে আমি দেখেছি- তিনি আজান দিচ্ছেন আর ঘুরছেন এবং চেহারা এদিকে ওদিকে তথা ডান দিকে ও বাম দিকে ফিরাচ্ছেন। তখন তাঁর আঙুলগুলো তাঁর কানের মধ্যে ছিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি লাল তাঁবুতে উপস্থিত। বর্ণনাকারি বলেছেন, আমার

টীকা. ১. আল্লামা বিন্নৌরি (র.) বলেছেন, হাকেম (র.) আমর ইবনে ফয়েদ আল-আসওয়াদি সূত্রে ইয়াহইয়া ইবনে মুসলেম থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এটি আরেকটি সূত্র। ইমাম তিরমিযী (র.) এটি সম্পর্কে অবহিত হননি। এজন্য তিনি বলেছেন, আমরা এ সূত্র ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে হাদিসটি জানি না। যেমন, ইমাম হাকেম (র.) তিরমিযীর সূত্রটি সম্পর্কে না ওয়াকিফহাল ছিলেন। বস্তুত আমর ইবনে ফায়েদ অপাংক্তেয়। এমনভাবে ইবনে আদি ইয়াহইয়া ইবনে মুসলিম সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আজান ধীরে ধীরে ও ইকামত দ্রুত দেওয়ার নির্দেশ দিতেন। এ হাদিসের সনদে রয়েছেন, আমর ইবনে শিমর নামক এক ব্যক্তি, তিনি অপাংক্তেয়। .... । মা'আরিফুস্ সুনান : ১/১৯৬-১৯৭ باب ماجاء فى الترسل فى الأذان ـ مرتب عفى عنه

ধারণা সে তাঁবুটি ছিলো চর্ম নির্মিত। তারপর বিলাল (রা.) তাঁর সামনে একটি লাঠি নিয়ে বের হলেন। 'বাতহা' নামক উপত্যকায় এটি গেড়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এটিকে সামনে রেখে নামাজ আদায় করলেন। তাঁর সামনে অতিক্রম করছিলো কুকুর এবং গাধা। তাঁর গায়ে ছিলো এক জোড়া লাল (রেখাবিশিষ্ট) কাপড়। যেনো এখনও তাঁর পায়ের গোছাদ্বয়ের চমক আমি দেখতে পাচ্ছি। সুফিয়ান বলেন, আমাদের ধারণা (তাঁর গায়ে সে পোশাকটি ছিলো 'হিবারা' (ইয়ামানি কাপড়বিশেষ)।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আবু জুহায়ফার হাদিসটি حسن صحيح। ওলামায়ে কেরামের নিকট এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা আজানে মুয়াজজিনের কানে আঙুল ঢুকানো মোস্তাহাব মনে করেন। আর কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ইকামতেও তার আঙুল কানে প্রবিষ্ট করবে আওজায়ি (র.)-এর মাজহাব এটা। আবু জুহায়ফার নাম হলো, وهاب الساعي

দরসে তিরমিযী

رأيت بلالا يؤذن ويدور : বিদায় হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনকালের এ ঘটনাটি যখন রাসূল ﷺ মুহাসসার নামক স্থানে অবস্থান করেছেন। সেখানে বিলাল (রা.) যেহেতু গম্বুজ আজান দিয়েছিলেন এজন্য ঘুরতে হয়েছে। এতে প্রমাণিত হলো, যদি মিনারা ইত্যাদিতে আজান দেওয়া হয় তাহলে ঘোরা উচিত। এজন্য হানাফি মূল পাঠগুলোতে রয়েছে, ويستدبر في صومعته (তার আজান খানায় ঘুরবে)।

و يتبع فاه ههنا وههنا واصبعاه في اذنيه : তথা চেহারা গম্বুজের দরজা হতে বের করে দেবে। আঙুলগুলো থাকবে দু'কানের ভেতরে। আজানের সময় কানে আঙুল দেওয়া মুস্তাহাব। কেনোনা, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বর্ণনা করেছেন যে, এর ফলে আওয়াজ বড় হয়।[১]

অনেক আলেম এর কারণ লিখেছেন যে, শ্বাসের ওপর আওয়াজ নির্ভর করে। আর কান বন্ধ করে ফেললে শ্বাসের একটি ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায় এবং পুরো শ্বাস মুখের ভেতর কেন্দ্রভূত হয়ে যায়, যার ফলে আওয়াজ বড় হয়। কিন্তু এ কথাটি প্রাচীন চিকিৎসা তত্ত্ব অনুযায়ী। আধুনিক চিকিৎসা তত্ত্বানুযায়ী কানের সাথে শ্বাসের ছিদ্রের কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং আওয়াজ বুলন্দ হওয়ার এ ব্যাখ্যা প্রশ্নসাপেক্ষ। والله اعلم

ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء : হানাফিদের মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য রেখাবিশিষ্ট একজোড়া কাপড়। কেনোনা, পূর্ণাঙ্গ লাল (পোশাক পুরুষের জন্য) مكروه।

بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّثْوِيْبِ فِى الْفَجْرِ (صـ ٤٩)

অনুচ্ছেদ- ৩১ : ফজরের আজানের পর নামাজের ঘোষণা দেওয়া প্রসঙ্গে (মতন ৪৯)

عَنْ بِلَالٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صليى الله عليه وسلم لَا تُثَوِّبَنَّ شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ اِلَّا فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ ـ

টীকা- ১. হিশাম ইবনে আম্মার রাসূল (স)-এর মুয়াজজিন। আব্দুর রহমান ইবনে সা'দ উবাই-তাঁর পিতা-তাঁর দাতা সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল (রা.)-কে তাঁর কানে আঙুল ঢুকাতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, এটা তোমার আওয়াজ উঁচু করার কারণ হবে। –সুনানে ইবনে মাজাহ, ছাপা, নূর মুহাম্মদ, পৃষ্ঠা : ৫২, ابواب الاذان والسنة فيها ، باب السنة في الأذان . مرتب عفى عنه।

১৯৮. অর্থ : হজরত বিলাল (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ফজরের নামাজ ব্যতিত অন্য কোনো নামাযে তুমি আজানের পর নামাজের ঘোষণা দিও না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু মাহজুরা (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, বিলাল (রা.)-এর হাদিসটি আবু ইসরাইল আল-মালাইর হাদিস ব্যতীত অন্য কোনোভাবে আমরা জানি না। আবু ইসরাইল এ হাদিসটি হাকাম ইবনে উতায়বা হতে শুনেননি। তিনি বলেছেন, তিনি এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন শুধু হানা ইবনে উমারা সূত্রে হাকাম ইবনে উতায়বা থেকে। আবু ইসরাইলের নাম হলো ইসমাইল ইবনে আবু ইসহাক। তিনি মুহাদ্দিসিনের মতে তেমন শক্তিশালী নন।

তাসবিবের ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম মতবিরোধ করেছেন। অনেকে বলেছেন, তাসবিব হলো, ফজরের আজানে 'আস্ সালাতু খায়রুম মিনান নাওম' বলা। এটা হলো, ইবনে মুবারক (র.)-এর মাজহাব। আর ইসহাক (র.) তাসবিবের আরেকটি অর্থ বলেছেন। তিনি বলেছেন, এ বিদআত লোকজন রাসূলে আকরাম ﷺ-এর পর তৈরি করেছে যে, যখন মুয়াজজিন আজান দিবে তখন লোকজন দেরি করে আসলে সে আজান ও ইকামতের মাঝে বলবে قد قامت الصلوة، حى على الفلاح। ইসহাক (র.) যে তাসবিবের কথা বলেছেন, এটাকে ওলামায়ে কেরাম মাকরূহ মনে করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর যে নতুন জিনিস লোকজন তৈরি করেছে এবং যার ব্যাখ্যা ইবনে মুবারক অথবা আহমদ (র.) দিয়েছেন যে, তাসবিব হলো, মুয়াজজিন কর্তৃক ফজরের নামাজ (এর আজানে) الصلوة خير من النوم বলা। সেটা সহিহ উক্তি। এটাকেও তাসবিব বলা হয়। ওলামায়ে কেরাম এটাকে পছন্দ করেছেন এবং এটা বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ফজরের নামাজে বলতেন الصلوة خير من النوم বলতেন।

হজরত মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর সঙ্গে এক মসজিদে প্রবেশ করলাম, তখন সেখানে আজান হয়ে গেছে। আমরা মনস্থ করছিলাম সেখানে নামাজ পড়বো। তারপর মুয়াজজিন তাসবিব করলেন। ফলে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সে মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি আরও বললেন, আমাদের সঙ্গে এ বিদআতির কাছ থেকে বেরিয়ে এসো। সেখানে তিনি নামাজ পড়লেন না। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) শুধু ওই তাসবিবকে মাকরূহ মনে করেছেন, লোকজন যেটি আবিষ্কার করেছে পরবর্তীতে।

দরসে তিরমিযী

عن بلال (رضـ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثوبن فى شئ من الصلوات الا فى صلوة الفجر -

تثويب শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ঘোষণার পর ঘোষণা দেওয়া। শরয়ি মতে এর প্রয়োগ দুটি জিনিসের ওপর হয়।

এক. حى على الصلوة، حى على الفلاح -এর পর الصلوة خير من النوم বলা। এ تثويب বা ঘোষণা ফরজ নামাযের সঙ্গে বিশেষিত। আর অবশিষ্ট নামাজগুলোতে নাজায়েজ। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে تثويب দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য।

দুই. আজান ও ইকামতের মাঝে حى على الصلوة – الصلوة جامعة বা এ ধরনের অন্য কোনো বাক্য ব্যবহার করা। এ অর্থ হিসেবে تثويب-কে অধিকাংশ আলেম বিদআত ও মাকরূহ বলেছেন। কেনোনা, এটা

রিসালত যুগে ছিলো না। অবশ্য ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইকামতের কিছু পূর্বে এলমি কাজে রত লোকদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া পছন্দ করতেন। এর কারণ মূলত এ ধরনের স্মরণ করানো মুবাহ ছিলো। কারণ, নসগুলোতে না এ সম্পর্কে নির্দেশ করা হয়েছিলো, না নিষেধ। কিন্তু কোনো কোনো অঞ্চলে এ تثويب কে সুন্নাতরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই ওলামায়ে কেরাম এটাকে বিদআত বলেছেন। কিন্তু যদি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সুন্নাত ও ইবাদত মনে না করে এটা অবলম্বন করে বলা হয় তবে তা বৈধ, এতে কোনো অসুবিধা নেই। এটা হলো এ প্রসঙ্গে মধ্যপন্থি উক্তি। এজন্য আল্লামা শামী প্রমুখ লিখেছেন যে– বিচারপতি, মুফতি এবং অন্যান্য দীনি কাজে রত লোকদের জন্য تثويب -এর অবকাশ রয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ مَنْ اَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ (ص ٤٥)

অনুচ্ছেদ- ৩২ : আজান দেবে যে ইকামতও দেবে সে (মতন ৫০)

عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَنْ اُؤَذِّنَ فِيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَاَذَّنْتُ فَاَرَادَ بِلَالٌ اَنْ يُّقِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِنَّ اَخَا صُدَاءٍ قَدْ اَذَّنَ وَمَنْ اَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ ۔

১৯৯. অর্থ : হজরত জিয়াদ ইবনুল হারেস আস্-সুদায়ি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন ফজরের নামাজে আজান দেওয়ার। ফলে আমি আজান দিলাম। তারপর বিলাল (রা.) ইকামত দেওয়ার জন্য মনস্থ করলেন। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সুদায়ি ভাই আজান দিয়েছে। আর আজান দেবে যে একামত দেবে সে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইবনে উমর (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'জিয়াদের হাদিস আমরা শুধুমাত্র ইফরীকি হতে জানি। তিনি মুহাদ্দিসিনের মতে জয়িফ। ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ আল-কাত্তান তাঁকে জয়িফ বলেছেন। ইমাম আহমদ (র.) বলেছেন, ইফরীকি থেকে জানি। তিনি মুহাদ্দিসিনের মতে জয়িফ। ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ আল-কাত্তান তাঁকে জয়িফ বলেছেন। ইমাম আহমদ (র.) বলেছেন, ইফরীকির হাদিস আমি লিখি না।' তিনি (তিরমিযী) আরো বলেছেন, 'মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল (র.)-কে আমি তাঁর ব্যাপারটি শক্তিশালী করতে দেখেছি। তিনি বলতেন, ইফরীকি মুকারিবুল হাদিস (শব্দটির ব্যাখ্যা পেছনে এসেছে)। অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, আজান দিবে যে একামত দিবে সে।'

দরসে তিরমিযী

ومن اذن فهو يقيم : এই আমলটি ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মতে ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা (র.) বলেন, এটা মোস্তাহাব। অতএব, মুয়াজজিন থেকে অনুমতি পেলে অন্য কেউ ইকামত বলতে পারে। তবে শর্ত হলো, এর ফলে মুয়াজজিনের কোনো কষ্ট-তকলিফ না হতে হবে। তার কষ্ট হলে তা মাকরূহ। আল্লামা কাসানি বাদায়ে' গ্রন্থে এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন।

মোস্তাহাবের ক্ষেত্রে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটিকে প্রয়োগ করার কারণ দারাকুতনি ইত্যাদির বর্ণনাগুলো যে, কোনো কোনো সময় হজরত বিলাল (রা.) আজান দিতেন এবং ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) ইকামত বলতেন।

কোনো কোনো সময় এর বিপরীত হতো। এসব বর্ণনার ওপর যদিও সনদগতভাবে কিছু কথাবার্তা ও প্রশ্ন[১] রয়েছে; কিন্তু এ অর্থ যেহেতু বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত, এজন্য মোস্তাহাবের ক্ষেত্রে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি প্রয়োগের জন্য যথেষ্ট। অথচ আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটিও জয়িফ। ইমাম তিরমিযী (র.) তাই বলেন,

قال ابو عيسى حديث زياد انما نعرفه من حديث الافريقى والافريقى هو ضعيف عند اهل الحديث .

এ হাদিসটি আবু দাউদ বর্ণনা করার পর বলেন, উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর আল-কাওয়ারিরি-আব্দুর রহমান ইবনে মাহদি-মুহাম্মদ ইবনে আমর-আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমার দাদা আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ (পূর্বেযুক্ত) এ হাদিসটি বর্ণনা করতেন। তিনি বলেছেন, তারপর আমার দাদা ইকামত দিয়েছেন।

مرتب تجاوز الله عن ذنبه الجلى والخفى

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْأَذَانِ بِغَيْرِ وُضُوْءٍ (ص ـ ٥٠)

অনুচ্ছেদ- ৩৩ : ওজু ব্যতিত আজান দেওয়া মাকরূহ প্রসঙ্গে (মতন ৫০)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يُؤَذِّنُ اِلَّا مُتَوَضِّئٌ .

২০০. **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ বলেছেন, কেবল ওজুকারী আজান দিবে। তাছাড়া অন্য কেউ যেনো আজান না দেয়।

حدثنا يحيى بن موسى نا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال ابو هريرة لا ينادى بالصلوة الا متوضئ .

২০১. **অর্থ :** হজরত ইবনে শিহাব বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, ওজুকারি ব্যতিত আর কেউ যেনো নামাযের আজান না দেয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এটি প্রথম হাদিস অপেক্ষা আসাহ। আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিসটিকে ইবনে ওহাব মারফু আকারে বর্ণনা করেননি। এটি ওলিদ ইবনে মুসলিমের হাদিস অপেক্ষা বিশুদ্ধতম।

টীকা. ১. অবশ্য আবু দাউদ : ১/৭৬, باب الإقامة -এ এ অর্থবোধক একটি বর্ণনা আছে যেটি সহিহ এবং 'যে আজান দিবে সে ইকামত দিবে এটা ওয়াজিব নয়' প্রমাণ করে।

'উসমান ইবনে আবু শায়বা-হাম্মাদ ইবনে খালেদ-মুহাম্মদ ইবনে আমর-মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ-তাঁর চাচা আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী করিম ﷺ আজানে এমন কিছু বিষয় মনস্থ করলেন, যেগুলোর একটিও পূর্বে করেননি। রাবি বলেন, তারপর আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ (রা.)-কে স্বপ্নযোগে আজান দেখানো হলো। ফলে তিনি নবী করিম ﷺ-এর নিকট এসে এ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন। তিনি বললেন, তুমি এটি বিলালকে শিক্ষা দাও। তখন তিনি তাঁকে তা শিক্ষা দিলেন। তারপর বিলাল আজান দিলেন। ফলে আবদুল্লাহ (রা.) বললেন, আমি তা স্বপ্নে দেখেছি। আমি তো আজান দেওয়ার জন্য মনস্থ করছিলাম। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তাহলে তুমি ইকামত দাও।

ইমাম আবু দাউদ (র.) এ বর্ণনাটির ওপর নীরবতা অবলম্বন করেছেন, যা তার মতে হাদিস সহিহ অথবা কমপক্ষে হাসান হওয়ার প্রমাণ। ইলাউস্ সুনান গ্রন্থকার باب من اذن فهو يقيم وان ذلك يستحب -এর অধীনে এ হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন, আবু দাউদ এ হাদিসটি বর্ণনা করে তাতে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। ইবনে আব্দুল বার (র.) বলেছেন, এর সনদ হাসান। -আত্-তালখিসুল হাবির : ১/৭৮-হাজেমি-জায়লায়ি : ১/১৪২।

জুহরি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে হাদিস শুনেননি। বিনা ওজুতে আজান সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম মতবিরোধ করেছেন। ফলে কোনো কোনো আলেম এটাকে মাকরূহ মনে করেছেন। শাফেয়ি ও ইসহাক (র.) এ মতই পোষণ করেন। আবার কোনো কোনো আলেম এর অনুমতি দিয়েছেন। সুফিয়ান, ইবনে মুবারক ও আহমদ (র.) এ মতই পোষণ করেন।

দরসে তিরমিযী

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضى : ইমাম শাফেয়ি (র.) এর মাজহাব এমনই। তাঁর মতে আজান ও ইকামত উভয়টির জন্য ওজু শর্ত। হানাফি এবং মালেকিদের থেকে এক বর্ণনা হলো, আজানের জন্য ওজু জরুরি নয়, ইকামতের জন্য জরুরি। কিন্তু হিদায়া গ্রন্থকার হানাফিদের মাজহাব শাফেয়িদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশ আলেম এটাই অবলম্বন করেছেন। এ বক্তব্যের ওপর তো কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু যারা আজানের জন্য ওজু জরুরি মনে করেন না, তারা আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের নিষেধকে মাকরূহে তানজিহির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করেন। কিন্তু প্রমাণাদির আলোকে প্রথম মাজহাবটিই প্রধান। কেনোনা, নাহির বাস্তবতা হলো হারাম করা। আর তানজিহির ওপর প্রয়োগ করার জন্য কোনো উল্লেখযোগ্য কোনো প্রমাণ নেই।

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ الْاِمَامَ اَحَقُّ بِالْاِقَامَةِ

অনুচ্ছেদ- ৩৪ : ইমামের উপস্থিতিতে ইকামত দেওয়া উচিত প্রসঙ্গে

جابر بن سمرة (رضـ) يقول كَانَ مُؤَذِّنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يُمْهِلُ فَلَا يُقِيْمُ حَتّٰى اِذَا رَأٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ خَرَجَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ حِيْنَ يَرَاهُ.

২০২. **অর্থ :** হজরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুয়াজজিন তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে থাকতেন, ইকামত দিতেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখন বেরিয়ে আসতে দেখতেন তখন নামাজের ইকামত দিতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, জাবের ইবনে সামুরার হাদিসটি حسن। সিমাকের হাদিসটি এ (ইসরাইলের) সূত্র ব্যতিত আমরা জানি না। অনেক আলেম অনুরূপই বলেছেন যে, মুয়াজজিন আজানের অধিক হকদার, আর ইমাম অধিক হকদার ইকামতের। অর্থাৎ, ইকামত দেওয়া উচিত কেবল ইমাম উপস্থিত হলেই।

ইকামতের যোগ্যতম হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইকামত তখন হওয়া উচিত যখন তিনি ইচ্ছা করবেন।

দরসে তিরমিযী

كان موذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم حتى اذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج اقام الصلوة حين يراه .

ফুকাহায়ে কেরাম এরই দ্বারা প্রমাণ পেশ করে বলেন, ইমামের বের হওয়ার পর ইকামত হওয়া উচিত। আর ইমাম বের হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যদি ইমাম মসজিদের কাতারগুলো থেকে বাইরে থাকেন তবে কাতারগুলোর দিকে আসা। আর যদি কাতারগুলোতে বসা থাকেন, তাহলে মুসল্লার দিকে যাওয়ার জন্য দাঁড়ানো। আর এ সীমাবদ্ধতার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এর আগে ইকামত বলা অনুত্তম। হ্যাঁ, এর চেয়ে সামান্য বিলম্ব হলেও مكروه বিহীন বৈধ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْاَذَانِ بِاللَّيْلِ (صـ ٥٠)

অনুচ্ছেদ- ৩৫ : রাতে আজান দেওয়া প্রসঙ্গে (মতন ৫০)

عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى تَسْمَعُوْا تَأْذِيْنَ اِبْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ .

২০৩. অর্থ : হজরত সালেমের পিতা থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ বলেছেন, বিলাল রাতে আজান দেবে। সুতরাং, ইবনে উম্মে মাকতুমের আজান শোনা পর্যন্ত তোমরা খাও এবং পান করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'ইবনে মাসউদ, আয়েশা, উনাইসা, আনাস, আবু জর ও সামুরা (রা.) হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।'

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'ইবনে উমর (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح। ওলামায়ে কেরাম রাতের আজান সম্পর্কে মতবিরোধ করেছেন। অনেক আলেম বলেছেন, মুয়াজজিন যখন (ফজর হওয়ার আগে) আজান দিবে তবে সেটাই যথেষ্ট হবে– পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। এটা মালেক, ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর মাজহাব কোনো কোনো আলেম বলেছেন, রাতে আজান দিলে তা দোহরাতে হবে। এ মতই পোষণ করেন, সুফিয়ান সাওরি (র.)। হাম্মাদ ইবনে সালামা আইয়ুব সূত্রে নাফে'-এর সনদে ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বিলাল (রা.) রাতে আজান দিয়েছেন। তখন নবী করিম ﷺ তাঁকে এ ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন যে, বান্দা ঘুমিয়ে পড়েছিলো।'

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি غير محفوظ। বিশুদ্ধ হলো, উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর প্রমুখ সূত্রে নাফে'-এর সনদে ইবনে উমর (রা.)-এর হাদিস- নবী কারিম ﷺ এরশাদ করেছেন, বিলাল রাতে আজান দিবে। অতএব, তোমরা ইবনে উম্মে মাকতুমের আজান পর্যন্ত খাও এবং পান করো। আব্দুল আজিজ ইবনে আবু রাওয়াদ নাফে' থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উমর (রা.)-এর এক মুয়াজজিন রাত্রে আজান দিয়েছেন। তখন তিনি তাঁকে আজান দোহ্‌রানোর নির্দেশ দিয়েছেন, এটি বিশুদ্ধ নয়। কারণ, এটি রাফে'-উমর সূত্রে মুনকাতে'। সম্ভবত হাম্মাদ ইবনে সালামা এ হাদিসটিই (ইবনে উমরের আছর) উদ্দেশ্য করেছেন। সহিহ হলো, আবদুল্লাহ ইবনে উমর প্রমুখের বর্ণনা নাফে'-ইবনে উমর (রা.) সূত্রে এবং জুহরি-সালেম-ইবনে উমর (রা.) সূত্রে যে, নবী কারিম ﷺ বলেছেন, বিলাল রাতে আজান দেবে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, যদি হাম্মাদের হাদিসটি সহিহ হয়, তাহলে এ হাদিসের কোনো অর্থ হয় না। কেনোনা, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, বিলাল রাতে আজান দিবে। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। ফজর উদয় হবার পূর্বে আজান দেওয়ার সময় যদি তিনি তাকে আজান দোহরানোর নির্দেশ দিতেন, তাহলে এ কথা বলতেন না যে, বিলাল রাতে আজান দিবে। আলি ইবনুল মাদিনি (র.) বলেছেন, 'হাম্মাদ ইবনে সালামা-আইয়ুব-নাফে'-ইবনে উমর-নবী করিম ﷺ সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি অসংরক্ষিত। হাম্মাদ ইবনে সালামা তাতে ভুল করেছেন।'

দরসে তিরমিযী

ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تاذين ابن ام مكتوم .

উল্লেখিত হাদিসে তিনটি আলোচ্য বিষয় রয়েছে।

০ ১ম আলোচ্য বিষয় হলো, হজরত বিলাল (রা.) সম্পর্কে এ হাদিসে বলা হয়েছে যে, তিনি রাত্রিবেলা আজান দিতেন, আর আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) সকালে; কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার (র.) ফাতহুল বারিতে[১] সহিহ ইবনে খুজায়মা, সহিহ ইবনে হাব্বান, ইবনুল মুনজির এবং তাহাবির[২] বরাতে হজরত উনাইসা (রা.) থেকে এর পরিপন্থী হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) রাত্রে আজান দিতেন আর বিলাল (রা.) সকালে। এর সহায়ক হলো নাসায়ির[৩] বর্ণনা এবং হারেস ইবনে উসামা সূত্রে ওরওয়ার মুরসাল বর্ণনা এর শাহিদ,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تغيروا باذان ابن ام مكتوم ولكن اذان بلال (رض) . [٤]

'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইবনে উম্মে মাকতুমের আজানে তোমরা ধোঁকায় পড়ো না। কিন্তু বিলালের আজানে।'

০ এর বৈপরীত্যের জবাব হলো, বস্তুত এ দুটো ভিন্নধর্মী বর্ণনা বিভিন্ন সময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বাস্তব ঘটনা মূলত এ ছিলো যে, প্রথম দিকে হজরত উম্মে মাকতুম (রা.) রাত্রে আজান দিতেন আর হজরত বিলাল (রা.) সকালে; কিন্তু ধীরে ধীরে হজরত বিলাল (রা.)-এর দৃষ্টিশক্তি জয়িফ হয়ে গেলো। যার ফলে তিনি দু'একবার ধোঁকায় পড়েছেন; ফজর উদয় হওয়ার আগে আজান দিয়ে ফেলেছেন। একবার এমন হলো যে, তিনি ওয়াক্ত আসার পূর্বে আজান দিয়ে ফেলেছেন। তখন প্রিয়নবী ﷺ এর ক্ষতিপূরণের জন্য তাঁর দ্বারা ঘোষণা করালেন, যেমন আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে রয়েছে,

ان بلالا اذن بليل فامره النبى صلى الله عليه وسلم ان ينادى ان العبد قد نام (اى سها عن وقت صلوة الصبح .

প্রিয়নবী ﷺ এ সময়েই বলেছেন,[৫] لا يغنكم اذان بلال فان في بصره شيئا [৬] মোটকথা, যখন বিলাল (রা.)-এর ভুল বেশি হতে লাগলো, তখন রাসূল ﷺ মুয়াজজিনদের তারতিব পাল্টে দিলেন। হজরত বিলাল

টীকা- ১. ২/৮৫।

টীকা- ২. হাবিব ইবনে আব্দুর রহমান-তাঁর ফুফু উনাইসা হতে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই ইবনে উম্মে মাকতুম রাতে আজান দিবে। অতএব, তোমরা বিলালের আজান শোনা পর্যন্ত খাও এবং পান করো।

باب التأذين للفجر اى وقت وهو بعد طلوع الفجر او قبل ذلك –'শরহে মা'আনিল আছার' : ১/৬৮

টীকা- ৩. ১/১০৫, ছাপা নূর মুহাম্মদ, كتاب الاذان باب هل يؤذنان جميعا او فرادى আয়েশা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, বিলাল যখন আজান দেয়, তখন তোমরা ইবনে উম্মে মাকতুমের আজান পর্যন্ত খাও এবং পান কর। –সংকলক।

টীকা- ৪. আল-মাতালিবুল আলিয়া : ১/১৬৪, হাদিস নং ২২৮।

টীকা- ৫. শরহে মা'আনিল আছার : ১/৬৮, এটি হজরত আনাস (রা.)-এর হাদিস। তাহাবি (র.) এ হাদিসটি উল্লেখ করার পর বলেন, এ হাদিসটি প্রমাণ করে যে, বিলাল (রা.) ফজরের সময় মনস্থ করতেন। তাঁর চোখের জয়িফতার কারণে তিনি ভুল করে ফেলতেন। এজন্য রাসূল ﷺ লোকজনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে তাঁর আজানের ওপর আমল না করে। কারণ, তার চোখের সমস্যার কারণে তিনি ভুলে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। –সংকলক।

টীকা- ৬. শায়বান বলেছেন, আমি সাহরি খেয়ে মসজিদে এলাম। তারপর নবী করিম ﷺ -এর হুজরার সঙ্গে হেলান দিয়ে বসলাম। দেখলাম তিনি সাহরি খাচ্ছেন। তিনি বললেন, আবু ইয়াহইয়া? বললাম, হ্যাঁ। বললেন, এস খাবার খেতে। আমি বললাম, আমিতো রোজার ইচ্ছা করছি। তিনি বললেন, আমিও তো রোজা রাখতে চাই; কিন্তু আমাদের এ মুয়াজজিনের চোখে সমস্যা আছে। সে ফজর উদয় হবার পূর্বে আজান দিয়ে ফেলেছে, তারপর মসজিদের দিকে বেরিয়ে গেছে। আর খানা নিষিদ্ধ করে ফেলেছে। পক্ষান্তরে তিনি সকাল হবার পূর্বে আজান দিতেন। হাফেজ (র.) 'দিরায়া'য় বলেছেন, 'এর সনদ সহিহ।' –আছারুস সুনান : ৫৬, ابواب الاذان، باب ماجاء في اذان الفجر قبل طلوعه .

(রা.)-কে রাতের আজানের জন্য নিয়োগ করলেন। পক্ষান্তরে হজরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) যেহেতু অন্ধ ছিলেন এজন্য তিনি নিজে দেখে ফজরের আজান দিতেন না বরং যখন লোকজন তাঁকে সকাল হওয়ার সংবাদ দিতেন তখন আজান দিতেন। এ জন্য বোখারির[১] বর্ণনায় রয়েছে,

وكان رجلا اعمى لا ينادى حتى يقال له اصبحت اصبحت .

'তিনি অন্ধ ব্যক্তি ছিলেন। ততোক্ষণ পর্যন্ত তিনি আজান দিতেন না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে 'সকাল হয়েছে, সকাল হয়েছে' না বলা হতো।'

মোটকথা, এ পরিবর্তনের পর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি বলেছেন,

ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمع تأذين ابن ام مكتوم .

এ অনুচ্ছেদের বর্ণনাগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের সবচেয়ে সুন্দরতম পন্থা এটাই।

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় হলো, ফজরের আজান ফজরের আগে দেওয়া যায় কী না? এ সম্পর্কে ইমামত্রয় ইমাম আবু ইউসুফ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ এবং আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের মাজহাব হলো ফজরের আজান ওয়াক্ত আসার পূর্বে দেওয়া যায় এবং এমতাবস্থায় এর পুনরাবৃত্তিও ওয়াজিব নয়। তবে এটা শুধু ফজরের বৈশিষ্ট্য। অন্য কোনো নামাযে এমন হতে পারে না। কিন্তু ইমাম আজম, ইমাম মুহাম্মদ, সুফিয়ান সাওরির মাজহাব হলো, ফজরের আজানের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগে অবৈধ। যদি দেওয়া হয় তাহলে তা পুনরায় দেওয়া ওয়াজিব।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি দ্বারা ইমামত্রয় প্রমাণ পেশ করেন, যাতে হজরত বিলাল (রা.) কর্তৃক রাত্রে আজান দেওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু প্রকাশ থাকে যে, তাঁদের এ প্রমাণ পূর্ণাঙ্গ হয় না। কেনোনা, তাঁদের এ প্রমাণ তখন সঠিক হতো যখন রাসূল ﷺ-এর জামানায় রাতের আজানের ওপর ক্ষান্ত করা হতো, এটাকেই যথেষ্ট মনে করা হতো। অথচ যেসব বর্ণনায় রাতে আজান দেওয়ার কথা বর্ণিত আছে সেগুলোতে এটাও আছে যে, দ্বিতীয় আজান দেওয়া হয়েছে ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পর।

হানাফিদের প্রমাণাদি নিম্নেযুক্ত

১. আবু দাউদে হজরত বিলাল (রা.)-এর বর্ণনায় রয়েছে,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا و مد يديه عرضا [২] .

'রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেছেন, তোমার সামনে ফজর এভাবে স্পষ্ট হওয়া ব্যতীত আজান দিয়ো না। তিনি দুহস্ত প্রস্থে লম্বা করে বিষয়টি বুঝিয়েছেন।'

আর বায়হাকির বর্ণনায়– যেটির রাবিগণ সেকাহ– শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত,

---

টীকা- ১. ১/৮৬ كتاب الاذان، باب اذان الاعمى اذا كان له من يخبره

টীকা- ২. ১/৭৯ باب فى الاذان قبل دخول الوقت ইমাম আবু দাউদ (র.) ওপরোক্ত হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন, শাদ্দাদ বিলালকে পাননি। বজলুল মজহুদ গ্রন্থকার আল্লামা সাহারানপুরি (র.) বলেন, গ্রন্থকার এ হাদিসটির জয়িফতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন মুনকাতে' ও মুরসাল হওয়ার কারণে। ওলামায়ে কেরাম শাদ্দাদের হাদিস রদ করা ও বিলাল থেকে তা গ্রহণ করার ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও আহমদ (র.)-এর মতে ব্যাপক আকারে গ্রহণযোগ্য। জমহুর নীরবতা অবলম্বনের পক্ষে। বিস্তারিত মাজহাবের বিবরণ 'নুখবাতে'দ্রষ্টব্য। শাদ্দাদ সম্পর্কে হাফেজ (র.) বলেন, ইনি ইয়াজ আল জাজরির আজাদকৃত দাস এবং তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। বিলাল থেকে মুরসালরূপে হাদিস বর্ণনা করেন। চতুর্থ শ্রেণির রাবি। (বজলুল মাজহুদ ও আবু দাউদের টীকাগুলো থেকে চয়নকৃত।)

انه صلى الله عليه وسلم قال يا بلال لا تؤذن حتى يطلع الفجر [১] -

'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিলাল! ফজর হওয়ার আগে তুমি আজান দিয়ো না।'

২. তাহাবিতে[২] হজরত হাফসা বিনতে উমর (রা.)-এর বর্ণনায় রয়েছে,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اذن المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتى الفجر ثم خرج الى المسجد وحرم الطعام وكان لا يؤذن حتى يصبح -

'মুয়াজজিন ফজরের আজান দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের দু'রাকাত পড়তেন। তারপর মসজিদের দিকে বেরিয়ে যেতেন। খানা নিষিদ্ধ করতেন। আর মুয়াজজিন সকাল হওয়ার আগে আজান দিতেন না।'

৩. 'আত-তামহিদ' নামক গ্রন্থে হাফেজ ইবনে আব্দুল বার (র.) হজরত আয়েশা (রা.)-এর হাদিস বর্ণনা করেছেন,

قالت ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر - 'তিনি বলেছেন, তারা ফজর স্পষ্ট হওয়ার আগে তাঁরা আজান দিতেন না।'

এ হাদিসটি ইমাম ইবনে আবু শায়বাও[৩] বর্ণনা করেছেন।[৪] আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত হজরত ইবনে উমর (রা.)-এর হাদিস,

ان بلالا اذن بليل فامره النبى صلى الله عليه وسلم ان ينادى ان العبد قد نام -

ইমাম তিরমিযী ব্যতিত এ বর্ণনাটি ইমাম আবু দাউদ[৫] তাহাবি[৬] দারাকুতনি[৭] প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ 'সুনানে বায়হাকি'তে আছে,

عن ابن عمر (رض) ان بلالا اذن قبل الفجر فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك فقال استيقظت وانا وسنان فظننت ان الفجر طلع فامره النبى صلى الله عليه وسلم ان ينادى بالمدينة ثلاثا ان العبد قد نام ثم اقعده الى جنبه حتى طلع الفجر -

-(قال النيموى اسناد حسن) [৮]

'হজরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত যে, ফজরের আগে বিলাল (রা.) আজান দিয়েছিলেন। তখন নবী করিম ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি এটা কেনো করলে? জবাবে তিনি বললেন, চোখে নিদ্রা অবস্থায় আমি সজাগ হয়ে

টীকা- ১. ই'লাউস্ সুনান : ২য় খণ্ড باب ان لا يؤذن قبل الفجر

টীকা- ২. শরহে মা'আনিল আছার : ১ম খণ্ড باب التأذين للفجر اى وقت هو *। আল্লামা নিমবি (র.) 'আছারুস্ সুনানে' : ৫৬-৫৭* باب ماجاء فى اذان الفجر قبل طلوعه *তে এ হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন, এটি বর্ণনা করেছেন তাহাবি ও বায়হাকি। এর সনদ উত্তম।*

টীকা- ৩. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ১ম খণ্ড, باب من كره ان يؤذن المؤذن قبل الفجر

টীকা- ৪. আবুশ শায়খ (র.) ও এটি كتاب الاذان *-এ উল্লেখ করেছেন। হাফেজ (র.) দিরায়াতে উল্লেখ করেছেন। এর সম্বোধন করেছেন আবুশ শায়খের দিকে* كتاب الاذان *এ এবং সনদ সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন। ইবনুত তারকুমানি (র.) 'আল-জাওহারুন্ নাকি'তে বলেছেন, এর সনদ সহিহ। – আছারুস্ সুনান*

টীকা- ৫. সুনানে আবু দাউদ : ১/৭৯ باب فى الاذان قبل دخول الوقت

টীকা- ৬. শরহু মা'আনিল আছার : খণ্ড ১ باب التأذين للفجر اى وقت هو بعد طلوع الفجر او قبل ذالك

টীকা- ৭. সুনানে দারাকুতনি : ১/৯১.

টীকা- ৮. আছারুস্ সুনান : ৫৬, باب ماجاء فى اذان الفجر قبل طلوعه

গেছি। মনে করেছি ফজর উদয় হয়ে গেছে। তখন নবী করিম ﷺ তাঁকে নির্দেশ দিলেন, মদিনাতে তিনবার এ ঘোষণা দেওয়ার জন্য যে, বান্দা ঘুমিয়ে পড়েছিলো। তারপর তাঁকে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত তার পাশে বসিয়ে রেখেছিলেন।'

হানাফিদের মাজহাবের স্বপক্ষে এ বর্ণনাটি স্পষ্ট যে, রাতের আজান যথেষ্ট নয়। কিন্তু ইমাম তিরমিযী (র.) এ বর্ণনা সম্পর্কে বলেন, هذا حديث غير محفوظ।

এজন্য ইমাম তিরমিযী (র.) এ হাদিসটির ওপর দুটি প্রশ্ন করেছেন।

প্রথম প্রশ্ন : এ হাদিসটি হাম্মাদ ইবনে সালামা বর্ণনা করেছেন একা। এ বিবরণে তাঁর ভুল হয়ে গেছে। মূলত হজরত ইবনে উমর (রা.)-এর বর্ণনা ছিলো, হজরত উমর (রা.)-এর মুয়াজজিন মাসরূহ রাত্রি বেলা আজান দিয়েছিলেন। তখন হজরত উমর (রা.) তাকে পুনরায় আজান দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হাম্মাদ ইবনে সালামার ভুল হয়ে গেছে। তিনি এ ঘটনা স্বয়ং রাসূল ﷺ এবং হজরত বিলালের মধ্যকার বলে বর্ণনা করেছেন।

তবে এর জবাব হলো, হাম্মাদ ইবনে সালামা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তিনি যদি একা কিছু বর্ণনা করেন তবে এটা ক্ষতিকর নয়। তাছাড়া বস্তুত বিবরণে তিনি একাও নন। কেনোনা, দারাকুতনিতে সায়িদ ইবনে জিরবি হাম্মাদ ইবনে সালামার মুতাবা'আত করেছেন। তাছাড়া ইমাম দারাকুতনি (র.) আরেকটি সূত্র উল্লেখ করেছেন যাতে কাজি ইমাম আবু ইউসুফ (র.)[১] সায়িদ ইবনে আবু আরূবা-কাতাদা-আনাস (রা.) সূত্রে হাম্মাদ ইবনে সালামার মুতাবা'আত করেছেন। কাজেই এ বর্ণনায় হাম্মাদ একা এ দাবী করা কতোটুকু ঠিক হবে![২]

অবশিষ্ট আছে, ইমাম তিরমিযী (র.) কর্তৃক হাম্মাদ ইবনে সালামার ওপর ভুলের আপত্তি। আসলে এটা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এটা প্রমাণবিহীন শুধু দাবি। কারণ, হাম্মাদ ইবনে সালামা নির্ভরযোগ্য রাবি এবং মুসলিমের রাবিদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর প্রতি প্রমাণবিহীন ভ্রমের সম্বোধন করা কিভাবে সঠিক হতে পারে? বাস্তবতা হলো, হজরত বিলাল (রা.)-এর ঘটনাকে হজরত উমর (রা.)-এর মুয়াজজিন মাসরূহ-এর ঘটনার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা কোনোক্রমেই ঠিক নয়। কেনোনা, এ দু'টি ভিন্ন ঘটনা।[৩]

হজরত বিলাল (রা.)-এর এ ঘটনার ওপর ইমাম তিরমিযী (র.) দ্বিতীয় প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, হজরত ইবনে উমর (রা.)-এর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে (এ অনুচ্ছেদের প্রথম হাদিসে) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এরশাদ করেছেন যে, ان بلالا يؤذن بليل। সুতরাং এটা কিভাবে সম্ভব! যে, তিনি হজরত বিলাল (রা.)-কে রাত্রে আজান দেওয়ার কারণে সাজা দিবেন?

০ এর বিস্তারিত জবাব পেছনে গেছে যে, এ দুটি ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন সময়ের। শাস্তির ঘটনা প্রথমদিকের, যখন হজরত বিলাল (রা.) ফজরের সময় আজান দিতেন। আর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে সে সময়কার ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে যখন হজরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) ফজরের আজান দিতে শুরু করেছিলেন।

টীকা. ১. 'ই'লাউস্ সুনান' গ্রন্থকার আল্লামা উসমানি (র.) বলেছেন, আল্লামা তারকুমানি 'আল-জাওয়াহারুন্ নাকি'তে বলেছেন– আমি বলি, আবু ইউসুফ (র.)-কে ইমাম বায়হাকি (র.) باب المستحاضة تغتسل عنه اثر الدم -এর নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তিনি বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর নির্ভরযোগ্য সঙ্গীগণ হলেন, আবু ইউসুফ, বিচারপতি নির্ভরযোগ্য, আবু ইয়াজিদ নির্ভরযোগ্য, জুফার ইবনে হুজাইল নির্ভরযোগ্য, কাসিম ইবনে মা'ন নির্ভরযোগ্য। (ই'লাউস্ সুনান : ২য় খণ্ড, باب ان لا يؤذن قبل الفجر)

টীকা. ২. এর মুতাবি'আত ও শাওয়াহিদের জন্য দ্রষ্টব্য 'আছারুস্ সুনান' : ৫৬, باب ماجاء فى طلوع الفجر قبل طلوعه এমনভাবে তাঁর জয়িফ মুনকাতে' শাহেদ রয়েছে, 'ইসহাক ইবনে রাহওয়াইয়ের মতে তাঁর মুসনাদে আবু নসর সূত্রে।

তিনি বলেন, বিলাল (রা.) বললেন, আমি রাত্রে আজান দিয়েছি। তখন নবী কারিম ﷺ বললেন, তুমি তো মানুষের খাওয়া-দাওয়া ও পানে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করলে। যাও আবার উপরে আরোহণ করে ঘোষণা দাও, বান্দা ঘুমিয়ে পড়েছিলো। ফলে আমি গেলাম, আর আমি বলছিলাম, হায়! বিলালকে যদি তার মা জন্ম না দিতেন! তার কপালের ঘামে তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে গেছেন। তখন আমি তিনবার ঘোষণা দিলাম। তোমরা শুনে রেখো, বান্দা ঘুমিয়ে পড়েছিলো। –আল-মাতালিবুল আলিয়া : ১/৬৪, হাদিস নং ২২৭

টীকা. ৩. আবু দাউদ : ১/৭৯, باب فى الاذان قبل دخول الوقت এর অধীনে এই উভয় ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা উল্লেখ রয়েছে। –সংকলক

আলোচ্য অনুচ্ছেদে হাদিস ان بلالا يؤذن بليل দ্বারা ইমামত্রয়ের প্রমাণ পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। কেনোনা, তাঁরা গোটা হাদিস ভাণ্ডারে এমন কোনো একটি বর্ণনা পেশ করতে পারবেন না, যাতে শুধু রাতের আজান যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। বিস্ময়ের ব্যাপার মনে হচ্ছে যে, যার উৎস কোনো একটি স্পষ্ট বর্ণনাও নেই এতো বড় বড় ইমামগণ এমন একটি বিষয়ে কিভাবে একমত হয়ে গেলেন!

হানাফি মাজহাব এ বিষয়ে খুবই শক্তিশালী। কেনোনা, যৌক্তিকভাবেও এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, আজানের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হল নামাজের ওয়াক্ত সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়া। আর রাতে আজান দিলে ঘোষণা হয় না; বরং করা হয় বিভ্রান্ত।

প্রশ্ন : তৃতীয় আলোচ্য বিষয় হলো, রাসূল ﷺ-এর জামানায় রাত্রে আজান কেনো দেওয়া হতো?

জবাব : অনেকে এর জবাবে বলেছেন, এটি ছিলো তাহাজ্জুদের আজান। এ জবাব তাঁদের মাজহাব অনুযায়ী সঠিক হতে পারে, যারা তাহাজ্জুদের আজানকে বিধিবদ্ধ বলেন। কিন্তু অধিকাংশ হানাফি নফলের জন্য আজান বিধিবদ্ধ মানেন না। তাঁদের মতে এই জবাব সঠিক হবে না। ফলে, অধিকাংশ হানাফি এ জবাব দেন যে, দুই বার আজান শুধু রমজানে হতো। এর উদ্দেশ্য হতো সাহাবির জন্য জাগ্রত করা। এই জবাব গ্রহণ করেছেন শায়খ আনওয়ার (র.), তেমনিভাবে আল্লামা নিমবি (র.) ও আছারুস্ সুনানে এ জবাবটি পছন্দ করেছেন।[১]

এ জন্য আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের বাক্য فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تاذين ابن مكتوم এ বিষয়টি প্রমাণ করেছে। তাছাড়া অন্য কোনো কোনো হাদিসে[২] এ বিষয়টির সুস্পষ্ট বিবরণও আছে, لينبه نائمكم।

প্রশ্ন : তারপরও অবশ্য একটি প্রশ্ন থেকে যায়। সেটি হচ্ছে তাহাবি[৩] ইত্যাদির বর্ণনায় হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত,

ولم يكن بينهما (اى بين الأذانين) الا مقدار ما ينزل هذا ويصعد هذا ـ

'এ দুই আজানের মাঝে শুধু এতোটুকু সময়ের ব্যবধান হতো যে, একজন নীচু নামতেন আর একজন উপরে আরোহণ করতেন।'

যা দ্বারা বোঝা যায়, দু'আজানের মাঝে খুব কম সময় ব্যবধান হতো। কাজেই আজান একাধিক হওয়ার ও প্রথম আজান দ্বারা রোজাদারদের জাগ্রত করার হেকমত তখন স্পষ্ট হয় না।

জবাব : এর জবাবে আল্লামা নববির বক্তব্য দ্বারা পাওয়া যায়। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, হজরত বিলাল (রা.) আজান দেওয়ার পর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বসে বসে দোয়া করতেন। তারপর যখন ফজর উদয় হওয়ার নিকটবর্তী হতো তখন সেখান থেকে নামতেন এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-কে জাগাতেন।

টীকা. ১. আল্লামা নিমবি (র.) বলেন, এসব বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ফজরের নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে এর জন্য আজান দেওয়া যাবে না। বাকি রইলো, ফজর উদয়ের পূর্বে বিলালের আজান। এটা ছিলো রমজানে ঘুমন্তদের জাগানোর জন্য আর ইবাদতে রতদের বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের জন্য, এটা নামাজের জন্য ছিলো না। আর রমজানের বাইরে তা ছিলো ভুলবশত। কারণ, তিনি মনে করেছিলেন ফজর উদয় হয়েছে। ৫৭ : والله اعلم بالصواب، باب ماجاء فى اذان الفجر قبل طلوعه، اثار السنن

টীকা. ২. আছারুস্ সুনান : ৫৫ باب ماجاء فى اذان الفجر قبل طلوعه

হজরত ইবনে মাসউদ (রা.) নবী কারিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, বিলালের আজান যেনো তোমাদের কেউর সাহরিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে। কারণ, সে রাত্রে আজান দেয়। যাতে তোমাদের তাহাজ্জুদগুজার ব্যক্তি ফিরে যেতে পারে এবং তোমাদের ঘুমন্ত ব্যক্তি সজাগ হতে পারে। নিমবি (র.) বলেন, শায়খ (র.) এ হাদিসটি ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বোখারি (র.) এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সহিহ বোখারি : ১/৮৭, كتاب الاذان باب الاذان قبل الفجر এর অধীনে, আর ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন সহিহ মুসলিমে : ১/৩৫০ كتاب الصيام باب بيان ان الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر الخ

টীকা- ৩, ১/৬৮ باب التاذين للفجر اى وقت هو بعد طلوع الفجر او قبل ذلك

তারপর তিনি আজান দেওয়ার জন্য ওপরে আরোহণ করতেন। অতএব উভয়ের উঠা নামার মধ্যে যদিও বেশি ব্যবধান ছিলো না; কিন্তু উভয় আজানের মাঝে এতোটুকু ব্যবধান অবশ্যই ছিলো যে, তাতে সাহরি খাওয়া যায়। বিশেষতো সে লৌকিকতাশূন্য সহজ-সরল জীবনযাপনের সময় সাহরি খাওয়ার জন্য ব্যয় হতো না দীর্ঘ সময়।

والله سبحانه وتعالى اعلم

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْخُرُوْجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْاَذَانِ (ص ٥٠)

অনুচ্ছেদ- ৩৬ : আজানের পর মসজিদ থেকে চলে যাওয়া মাকরূহ প্রসঙ্গে (মতন ৫০)

عَنْ اَبِى الشَّعْثَاءِ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا اُذِّنَ فِيْهِ بِالْعَصْرِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم .

২০৪. অর্থ : হজরত আবুশ্ শা'ছা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আসরের নামাযের আজানের পর এক ব্যক্তি মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেলো, তখন আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, এ লোকটি আবুল কাসিম ﷺ-এর অবাধ্যতা করলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, উসমান (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح। সাহাবি ও তাবেয়ি আলেমদের আমল এর ওপর অব্যাহত যে, ওজর ব্যতিত আজান হওয়ার পর মসজিদ থেকে কেউ বের হয়ে চলে যাবে না। সে ওজর হলো, ওজু ব্যতিত হওয়া অথবা অন্য কোনো জরুরি কাজ থাকা। ইবরাহিম নাখয়ি থেকে বর্ণনা করা হয়, তিনি বলেছেন, মুয়াজজিনের ইকামত আরম্ভ হওয়ার আগে বেরিয়ে চলে যেতে পারবে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আমাদের মতে এটা তার জন্য প্রযোজ্য যার মসজিদ থেকে বেরিয়ে চলে যাওয়ার ওজর রয়েছে। আবুশ্ শা'ছার নাম হলো, সুলায়ম ইবনুল আসওয়াদ। তিনি হলেন, আশ্আছ ইবনে আবুশ্ শা'ছা। আশ্আছ ইবনে আবুশ শা'ছা এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর পিতা থেকে।

দরসে তিরমিযী

خرج رجل من المسجد بعد اذن فيه بالعصر فقال ابو هريرة (رضـ) اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم .

এরপর আরেকটি অংশ মুসনাদে আহমদে[১] অতিরিক্ত রয়েছে,

ثم قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم فى المسجد فنودى بالصلوة فلا يخرج احدكم حتى يصلى .

'তারপর আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিলেন, তোমরা যখন মসজিদে থাকো, তারপর নামাজের আজান দেয়া হয়, তখন তোমাদের কেউ যেনো নামাজ পড়ার আগে বেরিয়ে না যায়।'

যা থেকে বোঝা যায়, এ নাহি রাসূল ﷺ কর্তৃক। এ বিষয়ে মৌলিকভাবে কোনো মতবিরোধ নেই যে, বিনা ওজরে আজানের পর মসজিদ থেকে বের হওয়া মাকরূহ। অবশ্য ওজরের বিস্তারিত বিবরণে মতানৈক্য আছে

টীকা. ১. মুসনাদে আহমদ : ২/৫৩৭, যেরূপ বর্ণিত আছে মা'আরিফুস সুনানে : ২/২২৩ উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায়।

সামান্য কিছু। এ সম্পর্কে হানাফিদের মাজহাব হলো, যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো মসজিদের ইমাম হয় অথবা নিজে নামাজ পূর্বে পড়ে ফেলে, অথবা কোনো জরুরি কাজ সামনে এসে যায় এবং অন্য কোনো স্থানে জামাত পাওয়ার আশা থাকে তাহলে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া তার জন্য।

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে হয়তো কোনো মাধ্যমে জানতে পেরেছেন, যে বের হয়ে যাচ্ছে তার কোনো ওজর ছিলো না। তানা হলে শুধু মসজিদ থেকে বের হওয়ার কারণে নাফরমানির হুকুম লাগানো বিশুদ্ধ নয়। কেনোনা, হতে পারে সে কোনো সমস্যা পতিত।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْاَذَانِ فِى السَّفَرِ (٥٠)

অনুচ্ছেদ- ৩৭ : সফরকালে আজান দেওয়া প্রসঙ্গে (মতন ৫০)

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ (رضـ) قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِىْ فَقَالَ لَنَا اِذَا سَافَرْتُمَا فَاَذِّنَا وَاَقِيْمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا ۔

২০৫। অর্থ : মালেক ইবনুল হুয়াইরিস (রা.) বলেন, আমি আমার এক চাচাতো ভাইসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমাদেরকে এরশাদ করলেন, তোমরা যখন সফর কর তখন আজান ও ইকামত দাও। যে তোমাদের দু'জনের মধ্যে সবচেয়ে বড় সে যেনো তোমাদের ইমামতি করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'এ হাদিসটি হাসান সহিহ। অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা সফরকালে আজানকে পছন্দ করেছেন। আর অনেকে বলেছেন, ইকামতই যথেষ্ট। আজান তার ওপর জরুরি যে লোকজনকে সমবেত করতে চায়। তবে প্রথম বক্তব্যটি বিশুদ্ধতম। এ মতই পোষণ করেন আহমদ ও ইসহাক (র.)।'

দরসে তিরমিযী

اذا سافرتما فاذنا واقيما : সফরে যেখানে অন্য লোকজনের জামাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশা না থাকবে ইমাম শাফেয়ি ও আহমদ (র.) -এর মতে সেখানেও আজান ইকামত উভয়টি সুন্নত। ইমাম আবু হানিফা ও মালেক (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এমতাবস্থায় শুধু ইকামতের ওপর হলেও বিনা মাকরূহে জায়েজ এবং আজান মাসনুন নয়। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি শাফেয়ি ও হাম্বলিদের মাজহাবের সহায়তা করছে। ইমাম আবু হানিফা (র.) থেকেও একটি বর্ণনা অনুরূপ বর্ণিত আছে। এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন সাধারণ মাশায়িখে হানাফিয়াও যে, উচিত আজান ও ইকামত উভয়টি বলা।

وليؤمكما اكبر كما ، وانما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا سن منهما لكونهما متساويين فى العلم والقرائة ۔

'যে তোমাদের মধ্যে বড় সে যেনো তোমাদের ইমামতি করে। রাসূল ﷺ তাদের দু'জনের মধ্য থেকে এজন্য বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন যে, তারা দু'জন ছিলেন এলেম ও কেরাতে সমপর্যায়ের।'

বেশি বয়স্ক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রাধান্য দেওয়ার কারণ হলো, তাঁরা দু'জন এলেম এবং কেরাতে সমমর্যাদার ছিলেন। অন্যথায় বড় আলেমের ইমামতের অধিক হকদার হওয়ার বিষয়টি অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা সমর্পিত।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ فَضْلِ الْأَذَانِ (ص ٥١)

অনুচ্ছেদ- ৩৮ : আজান দেওয়ার ফজিলত প্রসঙ্গে (মতন ৫১)

ابن عباس (رض) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِيْنَ مُحْتَسِبًا كُتِبَتْ لَهُ بَرَائَةٌ مِنَ النَّارِ .

২০৬। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ বলেছেন, যে সাত বছর পর্যন্ত সাওয়াবের কাজ মনে করে আজান দিবে, তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি লেখা হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, ইবনে মাসউদ, সাওবান, মু'আবিয়া, আববাস, আবু হুরায়রা ও আবু সায়িদ (রা.) থেকেও এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। আর ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদিসটি গরিব। আবু তামিলার নাম হলো, ইয়াহইয়া ইবনে ওয়াজিহ। আবু হামজা আস্-সুক্কারির নাম হলো, মুহাম্মদ ইবনে মায়মূন। পক্ষান্তরে জাবের ইবনে ইয়াযিদ আল-জু'ফিকে লোকজন জয়িফ বলেছেন। তাকে ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ ও আব্দুর রহমান ইবনে মাহদি বর্জন করেছেন।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, জারূদকে আমি বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি ওয়াকি'কে বলতে শুনেছি, জাবের জু'ফি যদি না হতেন, তাহলে কুফাবাসী হাদিসবিহীন অবস্থায় থাকতো। আর যদি হাম্মাদ না থাকতেন, তাহলে কুফাবাসী থাকতেন ফিকহ্‌বিহীন অবস্থায়।

দরসে তিরমিযী

من اذن سبع سنين محتسبا كتبت له برائة من النار : আজানের ফজিলত সম্পর্কে অনেক সহিহ হাদিস বিদ্যমান রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র.) وفى الباب দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন সেগুলোর দিকে। কিন্তু এখানে ইমাম তিরমিযী (র.) একটি জয়িফ হাদিস উল্লেখ করেছেন। এজন্য স্বয়ং ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, وحديث ابن عباس (رض) حديث غريب অর্থাৎ, ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদিসটি গরিব। এর কারণ একটাই যে, ইমাম তিরমিযী উল্লেখ করার যেগুলো আর কেউ উল্লেখ করেনি।

لولا جابر الجعفى لكان اهل الكوفة بغير حديث : জাবের জু'ফিকে নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করা হজরত ওয়াকি' (র.)-এর এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য। যার সারনির্যাস হলো, জাবের জু'ফির নিকট অনেক হাদিস মুখস্থ ছিলো এবং তিনি বহু হাদিস কুফাবাসীর নিকট পৌঁছিয়েছেন।

বস্তুত জাবের জু'ফি সম্পর্কে হাদিসের ইমামগণের মতপার্থক্য রয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল-কাত্তান, আব্দুর রহমান ইবনে মাহদি এবং ইমাম আজম আবু হানিফা (র.)। তাঁর সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর একটি বক্তব্য স্পষ্ট,

ما رأيت اكذب من جابر الجعفى كلما اتيته بمسئلة جاء نى فيه بحديث .

'আমি জাবের জু'ফি অপেক্ষা বড় মিথ্যুক আর দেখিনি। আমি যখনই তার সামনে কোনো মাসআলা পেশ করি তখন সে তার সমর্থনে আমার সামনে কোনো হাদিস পেশ করে।'

তাঁর জয়িফতার কারণ সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। অনেকে বলেছেন, সে ছিলো ভেলকিবাজ। কেউ বলেছেন, সে এতো হাদিস মুখস্থ করার দাবী করতো যেগুলো কণ্ঠস্থ করা মুশকিল। আর কেউ বলেছেন, তাঁর মধ্যে ছিলো বেপরোয়া রোগ। যদিও অকাট্যভাবে জয়িফতার জন্য এ সমস্ত কারণ যথেষ্ট নয়, তা সত্ত্বেও স্মরণশক্তি ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য করেও অধিকাংশ আলেম তাঁকে জয়িফ বলেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنَ مُؤْتَمَنٌ

অনুচ্ছেদ- ৩৯ : ইমাম জামিন, মুয়াজজিন আমানতদার প্রসঙ্গে

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَلْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اَللّٰهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ -

২০৭. **অর্থ :** আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইমাম দায়িত্বশীল আর মুয়াজজিন আমানতদার। হে আল্লাহ! ইমামদের সৎপথ দেখাও, মুয়াজজিনদের ক্ষমা করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আয়েশা, সাহল ইবনে সা'দ এবং উকবা ইবনে আমের (রা.) থেকেও 'এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। সুফিয়ান সাওরি, আবু হুরায়রার হাদিসটি হাফস ইবনে গিয়াস ও আরও একাধিক ব্যক্তি আ'মাশ-আবু সালেহ-আবু হুরায়রা সূত্রে নবী কারিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। আ'মাশ থেকে বর্ণনা করেছেন আসবাত ইবনে মুহাম্মদ, তিনি বলেছেন, আবু সালেহ সূত্রে আবু হুরায়রার সনদে নবী করিম ﷺ হতে এ হাদিসটি আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন নাফে' ইবনে সুলায়মান মুহাম্মদ ইবনে আবু সালেহ তাঁর পিতা-আয়েশা সূত্রে নবী করিম ﷺ হতে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, মুহাম্মদকে আমি বলতে শুনেছি, আবু সালেহের হাদিসটি আয়েশা (রা.) থেকে বিশুদ্ধতম। আলি ইবনুল মাদিনি থেকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ বিষয়ে আবু সালেহ সূত্রে আবু হুরায়রার হাদিসটি এবং আবু সালেহ সূত্রে আয়েশা (রা.)-এর হাদিসটি প্রমাণিত হয়নি।

দরসে তিরমিযী

الإمام ضامن : হাদিসের এ অংশটি অন্তর্ভুক্ত জাওয়ামিউল কালিমের (কথা সংক্ষেপ অর্থ বেশি ও ব্যাপক) এবং বিভিন্ন বিতর্কিত মাসায়েলে হানাফিদের প্রমাণ।

প্রথমতো এর দ্বারা ইমামের পেছনে কেরাত তরক করার ওপর প্রমাণ পেশ করেছেন হানাফীগণ। প্রমাণের কারণ স্পষ্ট যে, ইমাম যখন মুক্তাদিদের জিম্মাদার, অতএব এর দাবি হলো তাঁর কেরাত মুক্তাদিদের জন্য যথেষ্ট। এ মাসআলাটি বিস্তারিত বিবরণসহ যথার্থ স্থানে লেখা হবে।

দ্বিতীয়তো হানাফিগণ এর দ্বারা নফল আদায়কারির পেছনে ফরজ আদায়কারির ইক্তেদা নাজায়েজ হওয়ার ওপর প্রমাণ পেশ করেছেন। কেনোনা, কোনো কিছু তার ওপরস্থ জিনিসের জিম্মাদার হয় না।

তৃতীয়তো হানাফিরা এর ওপর প্রমাণ পেশ করেছেন, এক ফরজ আদায়কারির পেছনে অন্য ফরজ আদায়কারির ইক্তেদা নাজায়েজ হওয়ার। কারণ, তার মতো সমকক্ষ অন্য জিনিসের জিম্মাদার কোনো জিনিস হয় না।

চতুর্থতো এর দ্বারা হানাফিগণ প্রমাণ পেশ করেছেন যে, ইমামের নামাজ ফাসেদ হওয়া মুক্তাদিরা নামাজ ফাসেদ হওয়াকে আবশ্যক করে।

ইমাম শাফেয়ি (র.) -এর মাজহাব হলো, ইমাম এবং মুক্তাদি স্ব-স্ব নামাজের দায়িত্বশীল নিজেরাই এবং ইমামের নামাজ ফাসেদ হওয়ার কারণে মুক্তাদির নামাজ ফাসেদ হয় না। কেনোনা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

لا تزر وازرة وزر أخرى - 'একজনের গোনাহের বোঝা অপরজন বহন করবে না।' –ফাতির : ১৮

মোদ্দাকথা, এ মাসআলাতে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি তাঁদের বিরুদ্ধে প্রমাণ। কেনোনা, এখানে ইমামকে জিম্মাদার বা দায়িত্বশীল বলা হয়েছে। অতএব, এর ওপর মুক্তাদিদের নামাজ সঠিক ও ফাসেদ হওয়া নির্ভরশীল।

হাদিসের ব্যাখ্যা ইমাম শাফেয়ি (র.) এ করেন যে, জামিনের অর্থ হলো, তত্ত্বাবধায়ক ও রক্ষক। অতএব, অর্থ এ হবে যে, ইমাম নিজ মুক্তাদিদের নামাযের তত্ত্বাবধায়ক। অর্থাৎ, যদি স্বয়ং তাঁর নামাজ ফাসেদ হয়ে যায় তবুও মুক্তাদিদের নামাজ ফাসেদ হতে দেয় না। কিন্তু এ ব্যাখ্যাটি স্পষ্ট বিষয়ের পরিপন্থি। অভিধানেরও খেলাফ, বর্ণনারও বিরোধী। স্বয়ং সাহাবায়ে কেরাম এ হাদিসের সেই অর্থই বুঝেছেন যা হানাফিগণ অবলম্বন করেছেন। এজন্য সাহাবায়ে কেরাম জামিন শব্দটিকে দায়িত্বশীল অর্থে বুঝতেন। আর দায়িত্বশীলের ফাসাদ যার পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল তার (অধীনস্থের) ফাসাদকে আবশ্যক করে। ইবনে মাজাহতে[১] বর্ণিত সাহল ইবনে সা'দ সাইদি (রা.)-এর বর্ণনার মাধ্যমে এর সহায়তা হয়।

حدثنا أبو حازم قال كان سهل بن سعد الساعدى يقدم فتيان قومه يصلون بهم - فقيل له تفعل ولك من القدم مالك - قال انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الامام ضامن فان احسن فله ولهم وان اساء يعنىْ فعليه ولا عليهم -

'আবু হাজেম বলেন, সাহল ইবনে সা'দ সাইদি (রা.) তাঁর কওমের যুবকদের সামনে অগ্রসর করে দিতেন'। লোকজন নামাজ আদায় করতেন তাদের ইমামতিতে তাঁকে বলা হলো, আপনি এমন কাজ করেন, আপনার তো অনেক মর্যাদা রয়েছে! জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আমি বলতে শুনেছি, ইমাম জামিন। তিনি যদি ভালো করেন, তবে তা তাঁর জন্য ও মুক্তাদিদের জন্য ভালো। আর যদি খারাপ করেন, তাহলে তাঁর বিপদ চাপবে তার ওপর, মুকতাদিদের ওপর চাপবে না।'

হজরত উকবা ইবনে আমের জুহানি (রা.)-এরও এ ধরনের একটি ঘটনা ইবনে মাজাহ (র.) উল্লেখ করেছেন।[২] এসব বর্ণনার স্পষ্ট বিষয় এটাই যে, জামিনের অর্থ দায়িত্বশীলই এবং হজরত সাহল (রা.) এর সে অর্থই বুঝেছেন যা হানাফিগণ বুঝেছেন। এর দাবি হলো, ইমামের নামাজ ফাসেদ হওয়ার ফলে মুক্তাদিদের নামাজও ফাসিদ হয়ে যায়। এটি আরেকটি বিষয় যে, এর গোনাহ মুক্তাদিদের পরিবর্তে ইমামেরই হয়। বাকি রইলো, لا تزر وازرة وزر اخرى আয়াতটির ব্যাপার। বস্তুত এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করা সঠিক নয়। কেনোনা, এ আয়াতটি হলো কোনো কর্মের শুদ্ধতা অশুদ্ধতা সংক্রান্ত নয়; গোনাহ ও সাওয়াব সংক্রান্ত।

لم يثبت حديث ابى صالح الخ : আলি ইবনুল মাদিনি (র.)-এর এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য প্রবল ধারণা অনুযায়ী এ যে, তিনি আ'মাশের শ্রবণকে আবু সালেহ থেকে বিশুদ্ধ মানেন না। তাই তিনি দুটি বর্ণনাকেই জয়িফ বলেছেন।[৩] কিন্তু হাফেজ আবু জুরআ এবং ইমাম বোখারি ও অন্যান্য মুহাদ্দিস এ হাদিসটিকে নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন। বাস্তবতা হলো, এ হাদিসটি বিভিন্ন বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে। হাফেজ ইবনে হাব্বান (র.) তাই হজরত আয়েশা ও আবু হুরায়রা (রা.) উভয়ের হাদিসকে বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন, আবু সালেহ একবার এ হাদিস আবু হুরায়রা (রা.) থেকে শুনেছেন, আরেকবার হজরত আয়েশা (রা.) থেকে শুনেছেন।

بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ (صـ ٥١)

অনুচ্ছেদ- ৪০ : মুয়াজজিনের আজানের সময় জবাবে কী বলবে? (মতন ৫১)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ۔

টীকা- ১. ছাপা নূর মুহাম্মদ, পৃষ্ঠা : ৬৯, باب ما يجب على الإمام

টীকা- ২. باب ما يجب على الإمام

টীকা- ৩. অর্থাৎ, আবু সালেহ-আবু হুরায়রা এর হাদিস এবং আবু সালেহ-আয়েশা (রা.)-এর হাদিস যেগুলোর বরাত তিরমিযীতে আছে।

২০৮. অর্থ : আবু সায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন আজান শোনো তখন মুয়াজজিন যা বলে তার অনুরূপ বলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এ অনুচ্ছেদে আবু রাফে', আবু হুরায়রা, উম্মে হাবিবা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবদুল্লাহ ইবনে রবি'আ, আয়েশা, মুয়াজ ইবনে আনাস ও মুয়াবিয়া (রা.) থেকে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আবু সায়িদের হাদিসটি হাসান সহিহ। অনুরূপভাবে মা'মার ও একাধিক ব্যক্তি জুহরি থেকে মালেকের হাদিসের ন্যায় হাদিস বর্ণনা করেছেন। আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক জুহরি থেকে এ হাদিসটি সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব সূত্রে আবু হুরায়রার সনদে নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য মালেকের বর্ণনাটি বিশুদ্ধতম।

দরসে তিরমিযী

اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن : ইমাম শাফেয়ি এবং ইমাম মালেক (রা.) থেকে একটি বর্ণনা হলো, তাঁরা এ হাদিসের বাহ্যিক ব্যাপকতার ওপর আমল করতে গিয়ে বলেন, حى على الصلوة حى على الفلاح -এর জবাব দেওয়া হবে অনুরূপ বাক্য দ্বারা। কিন্তু হানাফি ও হাম্বলিগণ এবং অধিকাংশের মাজহাব হলো حى على الصلوة حى على الفلاح -এর জবাব হলো لا حول ولا قوة الا بالله মুসলিমে[১] এ মাজহাবটি হজরত উমর (রা.) -এর বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। যাতে حى على الصلوة حى على الفلاح -এর জবাবে স্পষ্ট ভাষায় لا حول ولا قوة الا بالله বা حوقلة উল্লেখ করা হয়েছে। এ হাদিসটি ব্যাখ্যামূলক হওয়ার কারণে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটিকে খাসকারি। হাফেজ ইবনে হাজার (র.) এটাকে সাব্যস্ত করেছেন জমহুরের মাজহাব হিসেবে। যা থেকে বোঝা যায় যে, শাফেয়ি এবং মালেকিদের ফতওয়া এটার ওপরই।

* দ্বিতীয় মাসআলাটি হচ্ছে, আলোচ্য অনুচ্ছেদে হাদিসটির নির্দেশ ওয়াজিব না মোস্তাহাব হিসেবে? হাম্বলিগণ ও অন্যদের থেকে ওয়াজিব হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। হানাফিদের কোনো কোনো মূলপাঠেও অনুরূপ বক্তব্য বর্ণিত আছে। অবশ্য এটাকে শামসুল আয়িম্মা হুলওয়ানি প্রমুখ মোস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাব্যস্ত করেন এবং পদক্ষেপ দ্বারা এ ডাকে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব বলেন। এরই ওপর ফতওয়া। হানাফিদের মতে ইকামতের জবাবও মোস্তাহাব।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ كَرَاهِيَةِ اَنْ يَّاْخُذَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى الْاَذَانِ اَجْرًا (صـ ٥١)

অনুচ্ছেদ- ৪১ : আজান দিয়ে মুয়াজজিন কর্তৃক পারিশ্রমিক গ্রহণ করা মাকরূহ (মতন ৫১)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ قَالَ اِنَّ مِنْ اٰخِرِ مَا عَهِدَ اِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَتَّخِذَ مُؤَذِّنًا لَا يَاْخُذُ عَلٰى اَذَانِهٖ اَجْرًا ـ

২০৯. অর্থ : উসমান ইবনে আবুল আস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সর্বশেষ নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেনো এমন একজন মুয়াজজিন রাখি আজানের বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, ওসমানের হাদিসটি হাসান। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা আজান দিয়ে পারিশ্রমিক নেওয়াকে মাকরূহ ভাবেন। আজান দিয়ে সওয়াব কামনা করা মুয়াজজিনের জন্য তারা ভালো মনে করেছেন।

টীকা. ১. ১/১৬৬-১৬৭, باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ثم يسئل له الوسيلة

দরসে তিরমিযী

عن عثمان بن أبى العاص قال ان من اخر ما عهد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا ـ

ইবাদতের ওপর এখানে পারিশ্রমিকের বিষয়টি এসে পড়ে। বাহ্যত এ বিষয়ে হাদিসগুলো পরস্পর বিরোধী। হজরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)[১]-এর বর্ণনা যাতে তিনি কোরআন শিক্ষা দিয়ে একটি কামান পারিশ্রমিক হিসেবে উসুল করেছিলেন এবং রাসূল ﷺ এর ফলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, এটি ইবাদতের ওপর পারিশ্রমিক অবৈধ হওয়ার দলিল। এ অনুচ্ছেদের হাদিসটিও এর সহায়ক। এ কারণে হানাফিদের মূল মাজহাবও এটাই যে, ইবাদত করে পারিশ্রমিক নেওয়া অবৈধ। হাম্বলিগণও এর অবৈধতার বক্তা। কিন্তু শাফেয়িদের মত এর সম্পূর্ণ বিপরীত যে, কোরআন ইত্যাদি তা'লিম দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ। তাদের প্রমাণ হজরত আবু সায়িদ খুদরি (রা.)[২]-এর বর্ণনা। যাতে তিনি সাপে দংশনকৃত এক ব্যক্তির ওপর সূরা ফাতিহা পড়ে চিকিৎসা করেছিলেন এবং এর বিনিময়ে উসুল করেছিলেন এক পাল বকরি।

পূর্ববর্তী হানাফিগণের বক্তব্য যদিও এ ব্যাপারে নাজায়েজেরই, কিন্তু পরবর্তী হানাফিগণ জরুরতের ভিত্তিতে বৈধতার ফতওয়া দিয়েছেন। জরুরতের ব্যাখ্যা হলো, প্রথম শতাব্দিতে যেহেতু মুয়াজজিন, ইমাম, মুয়াল্লিম ও মুফতিদের বেতন রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে নির্ধারিত ছিলো, বিনিময় ব্যতিত খেদমত করা তাদের জন্য জটিল ছিলো

টীকা. ১. তিনি বলেন, এক ব্যক্তিকে আমি কোরআন শিখালাম। সে আমাকে উপঢৌকন দিলো একটি তীরের ধনুক। এ বিষয়ে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আলোচনা করলে তিনি বলেন, যদি তা গ্রহণ করে থাকো, তবে জাহান্নমের একটি তীর-ধনুক গ্রহণ করলে। তখন আমি এটা ফেরত দিয়ে দেই।

এমনিকরে হজরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আহলে সুফফার কিছু লোককে আমি কোরআন ও লেখা শিক্ষা দেই। তখন এক ব্যক্তি আমাকে একটি তীর-ধনুক দিয়ে দেন। আমি বললাম, এটা কোনো সম্পদ নয়। আমি এটা আল্লাহর রাস্তায় নিক্ষেপ করবো। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি বললেন, যদি জাহান্নামের বেড়ি পরতে তোমার কাছে আনন্দ লাগে তবে তা গ্রহণ করো। এ দুটি হাদিস ইমাম ইবনে মাজাহ ابواب التجارات باب الأجر على تعليم القران *পৃষ্ঠা ১৫৬ তে বর্ণনা করেছেন।*

টীকা- ২. হজরত আবু সায়িদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সফরে গিয়ে রাসূল ﷺ এর একদল সাহাবি আরবের এক গোত্রে অবস্থান করলেন। তাঁরা তাদের কাছে মেহমানদারি কামনা করলে তারা তা অস্বীকার করলো। তারপর সে গোত্রের নেতাকে দংশন করা হলে তারা বহু চেষ্টা-তদবির করলো। কিন্তু কোনো কিছুতেই উপকৃত হতে পারলো না। তারপর তাদের কেউ বললো, তোমরা যদি আমাদের গোত্রে অবস্থানরত দলের কাছে যেতে তাহলে ভালো হতো। তাদের কারও কাছে হয়তো কোনো তদবির থাকতে পারে। তারপর তারা এসে বললো, হে সম্প্রদায়! আমাদের নেতা দংশিত হয়েছেন। আমরা তার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছি, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। তোমাদের কারো কাছে কি কোনো তদবির আছে? তখন তাদের কেউ বললেন, (মুসলিমের বর্ণনা অনুসারে তিনি আবু সায়িদ খুদরি (রা.)) হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, আমি ঝাড়-ফুঁক করতে পারি। আল্লাহর কসম, আমরা তোমাদের নিকট মেহমানদারি কামনা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা আমাদের মেহমানদারি করনি। অতএব আমি তোমাদের ঝাড়-ফুঁক করবো না যতোক্ষণ না তোমরা আমাদের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করবে। তারপর উভয়ের মাঝে সমঝোতা হলো এক পাল বকরির। এরপর তিনি দংশিত ব্যক্তির ওপর থুতু নিক্ষেপ করলেন এবং পড়তে লাগলেন, الحمد لله رب العالمين *তারপর যেনো তাকে রশি থেকে মুক্ত করে দেওয়া হলো। তার শরীরে আর কোনো রোগই থাকলো না। তিনি চলতে লাগলেন। বর্ণনাকারি বলেন, তারপর যে পারিশ্রমিকের ওপর সমঝোতা হয়েছিলো তারা তা পূর্ণরূপে দিয়ে দিলেন। তখন তাঁদের অনেকে বললো, এগুলো বণ্টন করে দাও। যিনি মন্ত্র দিয়ে ঝাড়লেন তিনি বললেন, রাসূল ﷺ এর নিকট এসে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তাঁর নির্দেশ না জানা পর্যন্ত তোমরা তা করো না। তারপর এ বিষয়ে তাঁরা রাসূল ﷺ এর নিকট এসে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, তুমি কীভাবে জানতে পারলে এটা মন্ত্র? তারপর বললেন যে, তোমরা ঠিক করেছো। এগুলো বণ্টন করে দাও। এক অংশ আমাকেও দিও। (যেনো তিনি তাদের রায় সঠিক হওয়ার বিষয়টি পূর্ণরূপে সমর্থন করলেন।) তারপর রাসূল ﷺ হেসে দিলেন। আবু আবদুল্লাহ বলেন, শো'বা বলেছেন, আমাদেরকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু বিশর। তিনি বলেন, আমি এটি শুনেছি আবুল মুতাওয়াক্কিলের নিকট। হাদিসের শব্দগুলো বোখারির : ১/৩০৪,* كتاب الاجارات باب ما يعطى فى الرقية على احياء العرب بفاتحة الكتاب *-এই হাদিসটি আবু দাউদও সুনানে আবু দাউদে বর্ণনা করেছেন। ২/৫৪৪,* كتاب الطب، باب كيف الرقى

না এবং পারিশ্রমিক ব্যতিত ইবাদতের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিলো; কিন্তু যখন এ ধারা শেষ হয়ে গেছে এবং বেতন বন্ধ হয়ে গেছে তখন তা'লিম, আজান, ইমামত, ফতওয়া প্রদান ও বিচারকার্যে সমস্যা হয় এবং এরপর সমস্ত দীনি নিদর্শনগুলোতে বিশৃঙ্খলা, বরং ধ্বংসের মারাত্মক আশংকা দেখা দিতে লাগলো। তাই পরবর্তী হানাফিগণ পারিশ্রমিক নেওয়ার অনুমতি দিয়ে দেন।

তাই অনুমতি দাতাদের মধ্যে দুটি দল আছে।

* এক দলের বক্তব্য, এ অনুমতি দেওয়া হয়েছে সময় আবদ্ধ রাখার ভিত্তিতে। অতএব, এটা না ইবাদতের ওপর পারিশ্রমিক এবং না হানাফি মাজহাব থেকে বেরিয়ে আসা। কিন্তু এ মতের আলোকে যেসব ইবাদতে সময় আটকে রাখা হয় না, অথবা বাস্তবে সময় আবদ্ধ করা হয় না, যেমন ছুটির সময় সেগুলোর পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েজ হবে না।

* দ্বিতীয় দলের বক্তব্য হলো, সময় আটকে রাখার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই; বরং এ মাসআলাতে ভীষণ প্রয়োজনের ভিত্তিতে ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মাজহাব অবলম্বন করা হয়েছে। আর এমন করা ভীষণ প্রয়োজনের মুহূর্তে বৈধ। এটা ঠিক এমনই যেমন হানাফিগণ নিখোঁজ স্বামীর মাসআলায় প্রয়োজনের খাতিরে মালেকি মাজহাব অবলম্বন করেছেন। এর ফলে সময় আবদ্ধ রাখার ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই। এ দ্বিতীয় বক্তব্যটি বিশুদ্ধতার কাছাকাছি।

প্রয়োজন বিশেষ রদবদল হতে পারে শুধু সেসব আহকামে যেগুলোতে ইজতেহাদ করা হয়েছে, তথা ইজতেহাদি বিষয়। অথবা যেগুলোতে প্রমাণাদি বিপরীতধর্মী। সর্বসম্মত ও নস দ্বারা প্রমাণিত বিধিবিধানে জরুরত আদৌ গ্রহণযোগ্য না।

بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الدُّعَاءِ (٥١)

অনুচ্ছেদ- ৪২ : মুয়াজজিন আজান দিলে কী দোয়া পড়বে? (মতন ৫১)

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ حِيْنَ يُؤَذِّنُ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ.

২১০. **অর্থ :** সা'দ ইবনে আবুল ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের আজান শুনে নিম্নেযুক্ত দোয়াটি পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার গোনাহগুলো ক্ষমা করে দিবেন। দোয়াটি হলো, ... وانا اشهد, অর্থাৎ, আমিও সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ব্যতিত আর কোনো প্রভু নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো অংশিদার নেই। এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও রাসূল। আল্লাহকে প্রভু হিসেবে, ইসলামকে জীবন বিধানরূপে এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে রাসূল হিসেবে মেনে নিতে আমি রাজি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি হাসান, সহিহ, গরিব। আমরা লায়ছ ইবনে সা'দ সূত্রে হুকাইম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কায়স সূত্রে বর্ণিত হাদিস ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে এটি জানি না।

بَابٌ مِنْهُ اَيْضًا (صـ ٥١)

অনুচ্ছেদ- ৪৩ : পূর্বোযুক্ত অনুচ্ছেদ সংক্রান্ত আরেকটি অনুচ্ছেদ (মতন ৫১)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ اِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ

২১১. অর্থ : জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে আজান শুনে নিম্নেযুক্ত দোয়া পড়বে তার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে। দোয়াটি হলো নিম্নরূপ,

اللهم رب هذه الدعوة التامة .... الخ তথা আয় আল্লাহ! এ পূর্ণাঙ্গ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত নামাজের মালেক! তুমি মুহাম্মদ ﷺ-কে ওসিলা (জান্নাতে একমাত্র তাঁর জন্য নির্ধারিত উঁচু মর্যাদা।) এবং মর্যাদা (সমস্ত মাখলুকের চেয়ে অতিরিক্ত মর্তবা) দান করো এবং তাঁকে পৌঁছে দাও তোমার প্রতিশ্রুতি প্রশংসিত স্থানে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, জাবের (রা.)-এর হাদিসটি মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির সূত্রে حسن غريب। আমরা শু'আইব ইবনে আবু হামজা ব্যতিত আর কেউ এটি বর্ণনা করেছেন বলে জানি না।

দরসে তিরমিযীর বক্তব্য

এর আগে ইমাম তিরমিযী (র.) باب ما يقول اذا اذن المؤذن فى الدعاء কায়েম করেছিলেন। এরপর ওপরযুক্ত অনুচ্ছেদ দাঁড় করেছেন।

ات محمد الوسيلة

الوسيلة لغة هى ما يتقرب به الى التكبير والمراد ههنا ما يتقرب به الى الله تعالى ـ

وسيلة শব্দের আভিধানিক অর্থ, যা দ্বারা বড় মনীষীর নৈকট্য অর্জন করা যায়। এখানে উদ্দেশ্য যা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়। কারও কারও বক্তব্য হলো, এটি জান্নাতের একটি উচ্চ স্তরের নাম। কোনো কোনো কিতাবে বর্ণিত আছে, এরপর والدرجة الرفيعة শব্দও। হাফেজ ইবনে হাজার (র.) প্রমুখ বলেন, এগুলো ভিত্তিহীন; কিন্তু আল্লামা ইবনুস্ সুন্নি (র.) 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লা'তে একটি বর্ণনায় নাসায়িির বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, তাতে এ শব্দগুলো আছে; কিন্তু সুনানে নাসায়িতে বিদ্যমান নেই। অবশ্য ইমাম নাসায়িির একটি কিতাব 'আমালুল ইয়ামি ওয়াল লায়লা'ও আছে। এ অতিরিক্ত অংশটি সম্ভবত সেখানে রয়েছে।[২]

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ الدُّعَاءَ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ (صـ ٥١)

অনুচ্ছেদ- ৪৪ : আজান ও ইকামতের মাঝে দোয়া না মঞ্জুর হয় না (মতন ৫১)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ ـ

টীকা- ১. অর্থাৎ, আবু সালেহ-আবু হুরায়রা এর হাদিস এবং আবু সালেহ-আয়েশা এর হাদিস- তিরমিযীতে আছে যেগুলোর বরাত।

টীকা- ২. আরফুশ্শাজিতে উল্লেখ রয়েছে যে, এটি 'সুনানে কুবরা'তে আছে। সম্ভবত এর দ্বারা উদ্দেশ্য নাসায়িির 'সুনানে কুবরা'।

২১২. অর্থ : আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, আজান ও ইকামতের মাঝে দোয়া প্রত্যাখ্যাত হয় না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (রহ.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত হাদিসটি হাসান। ইবনে ইসহাক আল হামদানি (রহ.) আনাস (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ كَمْ فَرَضَ اللّٰهُ عَلٰى عِبَادِهٖ مِنَ الصَّلَوَاتِ (صـ ٥١)

অনুচ্ছেদ- ৪৫ : আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের ওপর কতো ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন (মতন ৫১)

عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِهِ الصَّلٰوةُ خَمْسِيْنَ ثُمَّ نُقِصَتْ حَتّٰى جُعِلَتْ خَمْسًا ثُمَّ نُوْدِىَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّهٗ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ ـ وَاِنَّ لَكَ بِهٰذَا الْخَمْسِ خَمْسِيْنَ ـ

২১৩. অর্থ : আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মেরাজের রাতে রাসূলে আকরাম ﷺ-এর ওপর ফরজ করা হয়েছিলো পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ। তারপর কমাতে কমাতে পাঁচ ওয়াক্ত করা হয়েছে। তারপর ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, মুহাম্মদ! আমার নিকট কথায় কোনো রদবদল হয় না। আপনার জন্য এ পাঁচ ওয়াক্তের বিনিময়ে রয়েছে পঞ্চাশ ওয়াক্ত (এর সওয়াব রয়েছে)।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

উবাদা ইবনে সামেত, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ, আবু কাতাদা, আবু জর, মালেক ইবনে শা'ছা ও আবু সায়িদ খুদরি (রা.) থেকেও এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আনাস (রা.) -এর হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

فرضت على النبى صلى الله عليه وسلم ليلة اسرى به الصلوة خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا ـ

পঞ্চাশ ওয়াক্ত থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের দিকে স্থানান্তর এটা নস্খ (রহিত হওয়া) ছিলো কি না? এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। অনেকে এটাকে নসখ সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু এর ওপর প্রশ্ন হয় যে, (অন্যদের নিকট) পৌঁছানোর আগে কারও মতে নসখ বৈধ নয়। অতএব, বিশুদ্ধ বক্তব্য হলো এটি নসখ ছিলো না; বরং হজরত কাশ্মীরি (র.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী ৫০ ওয়াক্তের হুকুম ছিলো উর্ধ্বজগতের হিসেবে। আর এখনও নামাজ সেখানের হিসেবে ৫০ ওয়াক্তই। কারণ, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব উর্ধ্বজগতে ৫০ -এর সমান হবে। এর সহায়তা আলোচ্য অনুচ্ছেদের নিম্নেযুক্ত হাদিসের বাক্য দ্বারা সমর্থন হয়,

ثم نودى يا محمد! انه لا يبدل القول لدى وان لك بهذا الخمس خمسين ـ

প্রশ্ন : কোনো কোনো মুলহিদ এ হাদিসের ওপর প্রশ্ন তোলেন যে, এর দ্বারা বোঝা যায়, নাউজুবিল্লাহ এ কথাটি আল্লাহর এবং রাসূল ﷺ এর কারো জানা ছিলো না। এ উম্মত পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের ক্ষমতা রাখবে না;

বরং এ কথা জানা হয়েছে মুসা (আ.)-এর মনোযোগ আকৃষ্ট করার কারণে। আর যদি এ বিষয়ে জ্ঞান থাকতো এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজই ফরজ করা উদ্দেশ্য হতো, তবে পঞ্চাশ ওয়াক্তের হুকুম দিয়ে পরে বারবার এতে কমানোর কি হেকমত ছিলো কি?

জবাব : এই প্রশ্নটি কিন্তু অজ্ঞতা নির্ভর। আল্লাহ তা'লার সবকিছু জানা ছিলো। কিন্তু প্রথম থেকেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করার পরিবর্তে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের নির্দেশ করার মধ্যে ছিলো বহু হেকমত। সৃষ্টিকর্তার হিকমতগুলো আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়। তবে তা সত্ত্বেও কয়েকটি হেকমত বুঝে আসে,

১. এভাবে উদ্দেশ্য ছিলো উম্মতে মুহাম্মাদিয়া ﷺ-কে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের সাওয়াব দান করা। এ পদ্ধতি অবলম্বন করে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের সমান সওয়াব হওয়ার অধিক একিন ও বিশ্বাস তৈরি করা হলো।

২. আল্লাহর নেয়ামতের অনুভূতি এবং এর ওপর আনন্দ এ পদ্ধতিতে বেশি ছিলো।

৩. রাসূল ﷺ-এর বারবার সাক্ষাৎ পাবার ভাগ্য হলো।

৪. এতে প্রকাশিত হলো রাসূল ﷺ-এর নৈকট্যের মর্তবা এবং সুপারিশকারি ও তাঁর সুপারিশ গ্রহণীয় হওয়ার গুণ।

৫. এর ফলে হজরত মুসা (আ.)-এর সাথে উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার প্রতি কল্যাণকামিতা ও স্নেহ-মমতা প্রকাশ পেলো এবং তাঁর রায় সঠিক হওয়ার কারণে তাঁর ফজিলত প্রকাশিত হলো।

তা ব্যতিত আল্লাহই জানেন আরও কতো হেকমত এমন থাকবে যেগুলো অনুধাবনে মানুষের বিবেক অক্ষম। যদি এমনটি না হতো তাহলে এসব হেকমত প্রকাশ পেতো না।

بَابٌ فِىْ فَضْلِ الصَّلٰوَاتِ الْخَمْسِ (صـ ٥٢)

অনুচ্ছেদ- ৪৬ : পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ফজিলত (মতন ৫২)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ مَالَمْ يَغْشَ الْكَبَائِرَ .

২১৪। **অর্থ :** আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও এক জুম'আ থেকে অপর জুম'আ পর্যন্ত সবগুলো নামাজ মধ্যবর্তী সময়ের গোনাহের কাফ্ফারা, কবিরা গোনাহে যতোক্ষণ না লিপ্ত হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

জাবের, আনাস ও হানজালা আল-উসায়দি (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'আবু হুরায়রার হাদিসটি হাসান সহিহ।'

দরসে তিরমিযী

الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارات لما بينهن

প্রশ্ন : এর ওপর একটি প্রশ্ন হয়, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যখন রাত দিনের জন্য কাফ্ফারা, তাহলে জুম'আর নামাজ পুরো সপ্তাহের কাফ্ফারা হওয়ার দ্বারা অতিরিক্ত কী ফায়দা হাসিল হলো?

জবাব : হজরত শাহ সাহেব (র.) জবাব এ দিয়েছেন যে, হাদিসটি মূলত বলে দিচ্ছে কিছু কর্মের কতগুলো বৈশিষ্ট্য দিচ্ছে। যেমনভাবে দুনিয়ার জড় বস্তুগুলোতে কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে এবং কিছু যুক্ত। আর যুক্ত হলো,

অনেকগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের সমষ্টির নাম। অতএব, এমন হওয়া সম্ভব যে, কোনো যুক্ত বৈশিষ্ট্যের বৈশিষ্ট্যও সেগুলোই হবে যেগুলো কয়েকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মিলে হয়। অতএব, আলোচ্য অধ্যায়ের হাদিসে মর্যাদা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মর্যাদা স্বতন্ত্রগুলোর ন্যায়। আর এক জুম'আ থেকে অপর জুম'আর মর্যাদা যুক্তের ন্যায়। উভয়ের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন।

আল্লামা আইনি (র.)-ও একটি জবাব দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে, যেসব আমল সগিরা গোনাহগুলোর কাফ্ফারা হয় সেগুলোর নিয়ম হলো, যদি কারও আমলনামায় সগিরা গোনাহ থাকে তবেতো সেগুলোর কাফ্ফারা হয়ে যায়, আর যদি সগিরা গোনাহ না থাকে তাহলে দরজা বুলন্দ হওয়ার কারণ হয়ে যায়। অতএব, যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের গোনাহ মাফ হয়ে যায় তাহলে এক জুম'আ থেকে অপর জুম'আ মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়ে যাবে। এ জবাবটি অধিকতর সুস্পষ্ট।

ما لم يغش الكبائر : এর দু'ধরনের ব্যাখ্যা করা যায়,

প্রথম সম্ভাবনা হলো, এটাকে অর্থগতভাবে সাব্যস্ত করা হবে ইস্তিসনা (ব্যতিক্রমভুক্তি)। এর অর্থ হবে ওপরযুক্ত আমলগুলো কবিরা গোনাহগুলোর জন্য নয়, সগিরা গোনাহগুলোর জন্য কাফ্ফারা হবে।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা আছে এই, এটাকে সাব্যস্ত করা হবে শর্তের পর্যায়ভুক্ত। এর অর্থ এ হবে যে, ওপরযুক্ত আমলগুলো সগিরা গোনাহ্ সমূহের জন্য শুধু তখন কাফ্ফারা হতে পারে, যখন মানুষ কবিরা গোনাহে লিপ্ত না হবে। আর যদি কেউ কবিরা গোনাহে লিপ্ত হয় তাহলে তার সগিরা গোনাহগুলোও এসব আমল দ্বারা মাফ হবে না।

অনেকে উদ্দেশ্য করেছেন প্রথম অর্থ, আর কোনো কোনো আলেম দ্বিতীয় অর্থ। দ্বিতীয় অর্থের সহায়তা সে আয়াতের বাহ্যিক অর্থ দ্বারাও হয়, যাতে বলা হয়েছে,

ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم -

'তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে যেসব কবিরা গোনাহ থেকে, তোমরা যদি সেসব কবিরা গোনাহ থেকে পবিত্র থাকো, তাহলে আমি মিটিয়ে দিব তোমাদের সগিরা গোনাহগুলো।'

মনে রাখতে হবে যে, হানাফিদের কাছে যেহেতু শর্তের অর্থ ধর্তব্য হয় না, সেহেতু তাঁদের নিকট এ আয়াত এবং হাদিসের এ নয় যে, সগিরা গোনাহ কবিরা গোনাহ থেকে বিরত না থাকলে মাফ হবে না।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ (ص ٥٢)

অনুচ্ছেদ- ৪৭ : জামাতের ফজিলত প্রসঙ্গে (মতন ৫২)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى الصَّلٰوةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً -

২১৫. অর্থ : ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একাকি নামাজ অপেক্ষা জামাতে নামাজ মর্যাদা রাখে সাতাইশগুণ বেশি। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, উবাই ইবনে কা'ব, মু'আজ ইবনে জাবাল, আবু সায়িদ, আবু হুরায়রা ও আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকেও এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, ইবনে উমর (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح। নাফে' ইবনে উমর (রা.) সূত্রে অনুরূপভাবে নবী করিম ﷺ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, একাকি নামাজের তুলনায় জামাতের নামাজ সাতাইশগুণ বেশি মর্যাদা রাখে। নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনাকারি অধিকাংশ রাবি বলেছেন, 'পঁচিশগুণ'। 'সাতাইশগুণ' বলেছেন ইবনে উমর (রা.)।

عن ابى هريرة (رضـ) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان صلوة الرجل فى الجماعة تزيد على صلوته وحده بخمس (فى ن ب خمسة) و عشرين جزء ـ

২১৬. অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একাকি নামাজের চেয়ে জামাতের নামাজ মর্যাদা রাখে পঁচিশগুণ বেশি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'এ হাদিসটি حسن صحيح।'

দরসে তিরমিযী

صلوة الجماعة تفضل على صلوة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة ـ

* সাতাইশ সংখ্যা বিশেষিত করা সম্পর্কে 'ফাতহুল বারি'তে হাফেজ ইবনে হাজার (র.) আল্লামা বলকিনি (র.) থেকে একটি সূক্ষ্ম হেকমত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, জামাত প্রয়োগ করা হয় সর্বনিম্ন তিনের ক্ষেত্রে। অতএব, একটি জামাত অন্তর্ভুক্ত হয় মূলত তিনটি নেকির। আর كل حسنة بعشر امثالها তথা প্রতিটি নেকি দশগুণ হয়। এভাবে এ তিনটি নেকি নিজ ফজিলত হিসেবে ৩০টি নেকির সমান হয়। আর ৩০-এর সংখ্যা আসল এবং ফজিলত উভয়ের সমষ্টি। তা থেকে আসল তিন বের করে দিলে সাতাইশই ফজিলতের সংখ্যা থেকে যায়।

এ ব্যাখ্যাটি সেসব বর্ণনা অনুযায়ী যেগুলোতে সাতাইশ সংখ্যা উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য যেসব বর্ণনায় পঁচিশের[১] কথা উল্লেখ রয়েছে সেগুলোতে এ হিসাব পরিপূর্ণ ফিট হয় না।

* তারপর যেসব বর্ণনায় সাতাইশের পরিবর্তে এসেছে পঁচিশ, বাহ্যত সেগুলোর সাথে সাতাইশের বিরোধ পাওয়া যায়। এ বিরোধ অবসানের ও উভয় প্রকার বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য অনেক ধরণের জবাব দেওয়া হয়েছে-

১. কেউ বলেছেন, বেশি সংখ্যাকে কম সংখ্যা না করে না।

২. অথবা এ পার্থক্য খুশু-খুজু বা একাগ্রতা বিনয় হিসেবে।

৩. অথবা পঁচিশ গোত্রীয় (পাঞ্জেগানা) মসজিদের জন্য আর সাতাইশ জামে মসজিদের জন্য।

৪. কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার (র.) আরেকটি জবাব দিয়েছেন–যেটি হাফেজ বলকিনি (র.)-এর ওপরযুক্ত ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেটি হলো, ন্যূনতম জামাত হয় দু'জনে। একজন ইমাম আরেকজন মুক্তাদি। অতএব, যেসব বর্ণনায় পঁচিশ সংখ্যা উল্লিখিত হয়েছে সেখানে শুধু ফজিলতের সওয়াব বর্ণনা করা হয়েছে। আর যেসব বর্ণনায় সাতাইশের কথা উল্লিখিত হয়েছে সেগুলোতে ফজিলতের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে দু'জনের আসল সওয়াবকেও। এভাবে সাতাইশের কোটা দাঁড়িয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْمَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَا يُجِيْبُ (صـ ٥٢)

অনুচ্ছেদ- ৪৮ : যে আজান শোনে ডাকে সাড়া না দেয় (মতন ৫২)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ فِتْيَتِىْ اَنْ يَّجْمَعُوْا حُزَمَ الْحَطَبِ ثُمَّ اٰمُرُ بِالصَّلٰوةِ فَتُقَامُ ثُمَّ اُحَرِّقُ عَلٰى اَقْوَامٍ لَا يَشْهَدُوْنَ الصَّلٰوةَ ـ

২১৭. অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ বলেছেন, আমি ইচ্ছা করেছি আমার যুবকদেরকে নির্দেশ দিবো, তারা কাঠের বোঝা একত্র করবে, তারপর আমি নামাজের নির্দেশ দিবো, নামাজ কায়েম করা হবে, তারপর যারা নামাজে উপস্থিত হয় না সেসব লোকের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিবো।

টীকা. ১. বোখারির ১/৮৯-৯০, باب فضل صلوة الجماعة বর্ণনা গুলোতে অনুরূপ আছে। অন্যান্য রেওয়ায়াতেও এমন বিদ্যমান।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইবনে মাসউদ, আবুদ দারদা, ইবনে আব্বাস, মুয়াজ ইবনে আনাস ও জাবের (রা.) থেকেও এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح। একাধিক সাহাবি থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা বলেছেন, যে আজান শুনেছে তারপরও এ ডাকে সাড়া দেয়নি তার নামাজ হয়নি। আর কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এটি কঠোরতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারও জন্য ওজর ব্যতীত জামাত ছেড়ে দেওয়া বৈধ নয়।

قال مجاهد وسئل ابن عباس (رض) عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة؟ قال هو في النار .

২১৮. অর্থ : মুজাহিদ বলেন, এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে দিনে রোজা রাখে, রাতে নফল পড়ে, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি আদায় করে, কিন্তু জুম'আ ও জামাতে হাজির হয় না। তিনি জবাবে বললেন, লোকটি জাহান্নামে যাবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হাদিসটি আমাদেরকে হান্নাদ মুহারিবি-লাইছ-মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটির সনদ صحيح ।

হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, সে জামাতে এবং জুমাতে হাজির হয় না, এর প্রতি বিমুখ হয়ে জুম'আ ও জামাতকে হালকা মনে করে এবং এগুলোকে তুচ্ছ মনে করে।

এখানে জবাব দেওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য কার্যত ডাকে সাড়া দেওয়া তথা জামাতে শরিক হওয়া।

দরসে তিরমিযী

ثم احرق على اقوام لا يشهدون الصلوة : এ বর্ণনার ভিত্তিতে ইমাম আহমদ (র.)-এর মাজহাব এ যে, জামাতে হাজির হওয়া ফরজে আইন; বরং তাঁর থেকে একটি বর্ণনা এটাও আছে যে, বিনা ওজরে একাকি নামাজ আদায়কারির নামাজ ফাসেদ। ইমাম আবু হানিফা (র.) -এর প্রসিদ্ধ বক্তব্য হলো ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম শাফেয়ি (র.) এটাকে ফরজে কেফায়া এবং সুন্নাতে আইন সাব্যস্ত করেন। ইমাম আবু হানিফা (র.) -এরও একটি বর্ণনা অনুরূপ এবং ফতওয়াও এর ওপর।

সবার মতে জামাত তরক করার কিছু ওজর আছে। আর এ অনুচ্ছেদ অত্যন্ত উদার। হজরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, এ মতানৈক্য মূলত অভিব্যক্তির ইখতেলাফ। পরিণতির দিক দিয়ে অধিক পার্থক্য নেই। কারণ, বর্ণনাগুলোর আলোকে একদিকে জামাতের ব্যাপারে কঠোরতা বোঝা যায়, অপরদিকে সাধারণ ওজরের কারণে জামাত ত্যাগ করার অনুমতি বোঝা যায়। প্রথম প্রকারের বর্ণনাগুলো যদি দেখা যায় তবে বোঝা যায় যে, এর স্তর ফরজ-ওয়াজিবের চেয়ে কম না হওয়া উচিত। আর দ্বিতীয় প্রকারের বর্ণনাগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে এর স্তর এতো উঁচু পরিলক্ষিত হয় না। এজন্য হাম্বলি এবং হানাফিগণ বলেছেন যে, প্রথম শ্রেণি বর্ণনাগুলোকে আসল সাব্যস্ত করে জামাতকে ফরজ-ওয়াজিব বলে দিয়েছেন; কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণি বর্ণনাগুলোর দিকে তাকিয়ে জামাত তরক করে ওজরের দ্বার সুপ্রশস্ত করে দিয়েছেন। আর শাফেয়িগণ এর পরিপন্থি জামাতকে সুন্নত বলে ওজরের পরিধি সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছেন। অতএব পরিণতির দিকে লক্ষ্য করলে বেশি পার্থক্য থাকে না।

و سئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة و لا جماعة فقال هو في النار .

তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং আগুনে থাকবে সাময়িক শাস্তি ভোগ করার জন্য কিংবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য সে ব্যক্তি যে, জামাতকে মামুলি মনে করে হালকা ভাবার কারণে, কিংবা এর বিধিবদ্ধতাকে অস্বীকার করার জন্য জামাতে যায় না। এমতাবস্থায় فِي النَّارِ এর অর্থ দাঁড়াবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ ثُمَّ يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ (ص ٥٢)

অনুচ্ছেদ- ৪৯ : একাকি যে নামাজ পড়ে তারপর জামাত পায় (মতন ৫২)

عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ الْاَسْوَدِ (في ن ب العامرى) عَنْ اَبِيْهِ (رض) قَالَ شَهِدْتُّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فِيْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ (ف ن ب قال) فَلَمَّا قَضٰى صَلٰوتَهُ في ن ب صلاته وَانْحَرَفَ فَاِذَا (في ن ب ليس ق) هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِيْ اُخْرَى الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ فَقَالَ عَلَيَّ بِهِمَا فَجِيْئَ بِهِمَا تَرْعُدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا اَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ فَقَالاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِيْ رِحَالِنَا قَالَ فَلاَ تَفْعَلاَ اِذَا صَلَّيْتُمَا فِيْ رِحَالِكُمَا ثُمَّ اَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَاِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ.

২১৯. **অর্থ :** হজরত জাবের ইবনে ইয়াজিদ ইবনুল আসওয়াদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাঁর হজের সময় ছিলাম। তাঁর সঙ্গে মসজিদে খায়ফে (মিনায় অবস্থিত) ফজরের নামাজ আদায় করেছি। তিনি যখন নামাজ শেষ করলেন এবং মোড় ফিরলেন তখন লোকজনের পেছনে দুই লোকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো, তারা রাসূল ﷺ-এর সাথে নামাজ আদায় করেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাদের দু'জনকে আমার কাছে হাজির করো। তখন তাদেরকে হাজির করা হলো। তাদের স্কন্ধের মাংশপেশী তখন কাঁপছিলো। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, আমার সাথে তোমরা নামাজ পড়লে না কেনো? এর জন্য কি প্রতিবন্ধক ছিলো? তারা দু'জন বললো, আমরা আগেই আমাদের বাড়িতে নামাজ পড়ে ফেলেছি। এ শুনে প্রিয়নবী ﷺ বললেন, এমন করবে না। যখন তোমরা তোমাদের বাড়িতে নামাজ পড়ে ফেলো, তারপর জামাত বিশিষ্ট মসজিদে উপস্থিত হও, তখন তাদের সাথে নামাজ পড়ো। কেনোনা, এটা তোমাদের জন্য নফল।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে মিহজান ও ইয়াজিদ ইবনে আমির (রা.) হতে ।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'ইয়াজিদ ইবনুল আসওয়াদের হাদিসটি حسن صحيح। এটা একাধিক আলেমের মত। সুফিয়ান সাওরি, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক (র.) এ মতই পোষণ করেন। তাঁরা বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যখন একাকি নামাজ পড়ার পর জামাত পায়, তখন সে জামাতে সব নামাজ পুনরায় আদায় করবে। আর যখন কোনো ব্যক্তি মাগরিব নামাজ একাকি পড়ে তারপর জামাত পায় তার সম্পর্কে তারা বলেছেন, এ নামাজটিও সে তার সাথে আদায় করবে। আরেক রাকাত পড়ে এটাকে জোড় বানিয়ে দিবে। বস্তুত যে নামাজটি একাকি পড়েছে তাদের মতে সেটিই হবে ফরজ।'

দরসে তিরমিযী

اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة .

একাকি নামাজ আদায় করেছে এবং পরবর্তীতে কোনো জামাত পেয়ে গেছে, সে ব্যক্তি তার জন্য নফলের নিয়তে এ জামাতে শরিক হয়ে যাওয়া এ হাদিসের ভিত্তিতে মাসনুন। ইমাম শাফেয়ি, আহমদ, ইসহাক (র.) এ হুকুমকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য ব্যাপক মনে করেন। ইমাম মালেক (র.) মাগরিবের নামাজকে এর থেকে

ব্যতিক্রমভুক্ত সাব্যস্ত করেন। ইমাম শাফেয়ি ও আহমদ (র.)-এরও একটি বর্ণনা অনুরূপ। তারপর শামিল হওয়ার সুরতে ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর একটি বক্তব্য হলো, তিন রাকাত পড়ার পর আরও এক রাকাত মিলিয়ে নিবে। আরেক বক্তব্য অনুযায়ী তিন রাকাত পড়ে সালাম ফেরাবে। ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে জামাতে অন্তর্ভুক্ত হবে শুধু জোহর আর এশায়। অবশিষ্ট নামাজগুলোতে শামিল হওয়া অবৈধ। কেনোনা ফজর এবং আসরের পর নফল নামাজ পড়া নিষিদ্ধ। আর মাগরিবের নামাজ তিন রাকাত। বস্তুত তিন রাকাত নফল।

আলোচ্য আয়াতের হাদিস দ্বারা ইমাম শাফেয়ি (র.) প্রমাণ পেশ করেন। যাতে ফরজ নামাজের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

সুনানে দারাকুতনিতে[১] হানাফিদের প্রমাণ বর্ণিত হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) -এর মারফু বর্ণনা,

ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا صليت فى اهلك ثم ادركت صلوة فصلها الا الفجر والمغرب ۔

'হজরত নবী করিম ﷺ বলেছেন, যখন তুমি ভোরে নামাজ পড়ো, তারপর নামাজ (জামাত সহকারে) পেয়ে যাও তবে ফজর ও মাগরিব ব্যতিত অন্য নামাজ আদায় কর পুনরায়।'

ফজর এবং মাগরিব পড়তে এতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আর আসরের নামাজকে ফজরের ওপর কিয়াস করে এরই পর্যায়ভুক্ত করা হবে। কেনোনা, নিষেধের কারণ উভয়টিতে এক।

তবে এ হাদিসটি মওকুফ[২] এবং মারফু উভয় ধরনের বর্ণিত আছে। মারফু বর্ণনাটি নির্ভর করে সুহাইল ইবনে সালেহ ইনতাকির ওপর। তিনি নির্ভরযোগ্য। আর 'নির্ভরযোগ্য রাবির অতিরিক্ত অংশ গ্রহণযোগ্য' এ মূলনীতির আলোকে তাঁর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া ওইসব হাদিস যেগুলো ফজর ও আসরের পর নামাজ নিষেধ হওয়া বুঝায় এবং মুতাওয়াতের, সেগুলো আল্লামা আইনির বক্তব্য মতে হানাফিদের সহায়ক দলিল।

এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা প্রমাণ। আমরা বলো, এ হাদিসটি মূল পাঠগতভাবে মুজতারিব। কারণ আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে এ ঘটনা ফজরের নামাজের বলে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু 'কিতাবুল আছার' ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এবং 'কিতাবুল আছারে' ইমাম মুহাম্মদ (র.) এটাকে জোহরের নামাজের ঘটনা সাব্যস্ত করা হয়েছে।[৩] যদি ইজতেরাব দূর করার জন্য প্রাধান্যের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তাহলে 'কিতাবুল আছারে'র বর্ণনাগুলো সনদগতভাবে অধিক দৃঢ়, ইমাম আবু হানিফা (র.) সূত্রে যেগুলো বর্ণিত। 'মা'আরিফুস্ সুনান' গ্রন্থকার লিখেছেন,

واسناد مسانيد ابى حنيفة (رحـ) من طريق الهيثم عن جابر (رضـ) احسن حالا منه (اى من اسناد رواية الباب) بلا ريب وفيه الظهر لا الصبح ٤ ۔

'মাসানি আবু হানিফার সনদ হায়সাম-জাবের সূত্রে নিঃসন্দেহে উত্তম। অর্থাৎ, এ অনুচ্ছেদের বর্ণনার সনদ অপেক্ষা। তাতে জোহরের কথা রয়েছে, ফজরের কথা নেই।'

এ হাদিসটি এভাবে হানাফিদের পরিপন্থি নয়।

والله اعلم

টীকা- ১. মা'আরিফুস্ সুনান : ১/২৭০, باب ماجاء فى الرجل يصلى وحده ثم يدرك الجماعة

টীকা- ২. শরহে মা'আনিল আছার : ১ম খণ্ড, باب الرجل يصلى فى رحله ثم ياتى المسجد والناس يصلون ইবনে উমর (রা.) বলেছেন, তুমি যখন ভোরে নামাজ পড়ার পর (জামাত সহকারে) নামাজ পাও, তখন ফজর আর মাগরিব ব্যতিত অন্য নামাজ পুনরায় আদায় কর। কারণ এ দুটি নামাজ একই দিনে পুনরায় আদায় করা যায় না।' –সংকলক

টীকা- ৩. মা'আরিফুস্ সুনান : ২/২৭৪

টীকা- ৪. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মাআরিফুস্ সুনান : ২/২৬৯-২৮২, باب ماجاء فى الرجل يصلى وحده الخ

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْجَمَاعَةِ فِىْ مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّىَ فِيْهِ مَرَّةً

অনুচ্ছেদ- ৫০ : যে মসজিদে একবার জামাত হয়ে গেছে তাতে দ্বিতীয় জামাত করা প্রসঙ্গে (মতন ৫৩)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلٰى هٰذَا؟ فَقَامَ رَجُلٌ وَصَلّٰى مَعَهُ۔

২২০. **অর্থ :** হজরত আবু সায়িদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ আদায় করে ফেলেছেন, এমন সময় এক ব্যক্তি উপস্থিত হলো। প্রিয়নবী ﷺ বললেন, কে এ লোককে সঙ্গে নিয়ে ব্যবসা করতে চাও? তারপর এক ব্যক্তি দাঁড়ালো এবং নামাজ আদায় করলো তার সঙ্গে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু উমামা, আবু মূসা ও হাকাম ইবনে উমায়র (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'আবু সায়িদ (রা.) -এর হাদিসটি حسن। এটা একাধিক সাহাবি ও তাবেয়ি আলেমের মত। তাঁরা বলেছেন, যে মসজিদে একবার নামাজ পড়া হয়ে গেছে, তাতে লোকজন কর্তৃক জামাত করাতে কোনো দোষ নেই। অন্যান্য আলেম বলেছেন, একাকি নামাজ পড়বে। সুফিয়ান, ইবনুল মুবারক, মালেক ও শাফেয়ি (র.) এমতই পোষণ করেন। তাঁরা পছন্দ করেন একাকি নামাজই।'

দরসে তিরমিযী

ايكم يتجر على هذا : يتجر শব্দটি উদ্ভূত হতে পারে تجارة থেকেও। অর্থাৎ, পরকালীন বাণিজ্য। এমতাবস্থায় অর্থ এ হবে, তোমাদের মধ্যে কে তার সঙ্গে নামাজ পড়ে নেকির ব্যবসা-বাণিজ্য করবে? আর اجر থেকেও শব্দটি উদ্ভূত হতে পারে। আসলে ছিলো يأتجر যেমন হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, ان تتزر[১] (যেটি ازار থেকে উদ্ভূত) তখন অর্থ হবে, তোমাদের কে আছে যে সওয়াব অর্জন করবে তার সঙ্গে নামাজ পড়ে।

فقام رجل : বায়হাকির[২] বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ছিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)।

وصلى معه : এটা ছিলো দ্বিতীয় জামাত। এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করেই হাম্বলিগণ ও আহলে জাহের দ্বিতীয় জামাতের বৈধতার প্রবক্তা। হাম্বলিদের দ্বিতীয় প্রমাণ হজরত আনাস (রা.)-এর সে ঘটনা যেটি ইমাম বোখারি (র.) প্রাসঙ্গিকভাবে[৩] উল্লেখ করেছেন,

وجاء انس بن مالك الى مسجد قد صلى فيه فاذن واقام وصلى جماعة ۔

'আনাস (রা.) এক মসজিদে এলেন, নামাজ পড়া যেখানে হয়ে গেছে। তিনি এসে আজান ইকামত দিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করলেন।'

টীকা- ১. قالت عائشة (رض) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر احدانا اذا كانت حائضا ان تتزر ثم يضاجعها زوجها الخ ۔ كتاب الطهارة، باب فى الرجل يصيب منها مادون الجماع ۔ (ابو داود : ج١، ص٣٥)

'আয়েশা (রা.) বলেছেন, আমাদের কেউ ঋতুবতী হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিতেন, লুঙ্গি (পেটিকোট) পরতে, এরপর তার সঙ্গে তার স্বামীকে শয়ন করতে।'

টীকা- ২. সুনানে কুবরা বায়হাকি : ৩/৬৯-৭০, তাতে রয়েছে, فقام ابو بكر فصلى معه وقد كان صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

টীকা- ৩. বোখারি : ১/৮৯, باب فضل صلوة الجماعة

বায়হাকিতেও[১] এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়টিও এতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হজরত আনাস (রা.) -এর সাথে এ জামাতে শরিক ছিলেন বিশজন।

(১) তবে ইমামত্রয় এবং জমহুরের মাজহাব হলো, যে মসজিদের ইমাম মুয়াজজিন নির্ধারিত এবং তাতে মহল্লাবাসী একবার নামাজ পড়ে ফেলেছেন সেখানে দ্বিতীয় বার জামাত করা মাকরূহ।

(২) আবু ইউসুফ (র.) হতে একটি বর্ণনা হলো, তখন যদি মিহরাব থেকে সরে আজান, ইকামত ও আহ্বান ব্যতিত নামাজ আদায় করে নেওয়া হয় তবে জায়েজ। কিন্তু মুফতাবিহি (যার ওপর ফতওয়া) বক্তব্য এটাই যে, এভাবে দ্বিতীয় জামাত করা জায়েজ নেই। অবশ্য যদি কোনো মসজিদে মহল্লাবাসী ব্যতিত অন্যরা এসে জামাত করে, তাহলে মহল্লাবাসীদের অধিকার আছে দ্বিতীয় বার জামাত করার। কিংবা যদি কোনো কোনো মহল্লাবাসী চুপে চুপে আজান দিয়ে নামাজ পড়ে ফেলে, যার সম্পর্কে মহল্লাবাসী জানতে পারেনি, তবে তাদের জন্য পুনরায় জামাত বৈধ। অথবা যদি পথের মসজিদ হয়, যার ইমাম মুয়াজ্জিন নির্ধারিত নয়, তবে তাতেও পুনরায় জামাত বৈধ। এসব পদ্ধতি ব্যতিত অন্য কোনো অবস্থাতেই জমহুরের মতে পুনরায় জামাত অবৈধ।

* তাবারানির 'মুজামে কাবির' ও 'মুজামে আওসাতে' ইমামত্রয়ের প্রমাণ বর্ণিত হজরত আবু বকরা (রা.)-এর বর্ণনা[২],

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل من نواحى المدينة يريد الصلوة فوجد الناس قد صلوا فمال الى منزله فجمع اهله فصلى بهم .

'হজরত রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনার আশপাশ থেকে নামাজ পড়তে চাইলেন। দেখলেন লোকজন নামাজ পড়ে ফেলেছে। অতঃপর তিনি জামাতে নামাজ আদায় করলেন ঘরে যেয়ে পরিবারের লোকজনকে একত্রিত করে তাদের নিয়ে।'

'মাজমাউজ জাওয়ায়িদে' আল্লামা হায়সামি (র.) এ বর্ণনাটি বর্ণনা করে বলেন, এর রাবিগণ নির্ভরযোগ্য। প্রকাশ থাকে যে, যদি দ্বিতীয় জামাত জায়েজ বা মোস্তাহাব হতো তাহলে তিনি মসজিদে নববির ফজিলত ত্যাগ করতেন না। সুতরাং মসজিদে পুনরায় জামাত মাকরূহ হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ তাঁর ঘরে নামাজ পড়া।

অনেকে হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর সে বর্ণনাটি দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন যেটি পেছনে এসেছে[৩],

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر فتيتى ان يجمعوا حزم الحطب ثم امر بالصلوة فتقام ثم احرق على اقوام لا يشهدون الصلوة .

'হজরত নবী করিম ﷺ বলেছেন, আমি ইচ্ছা করেছি, আমার যুবকদেরকে কাঠের বোঝা জমা করার নির্দেশ দিবো, তারপর নামাজ আদায়ের নির্দেশ দেবো। নামাজ আদায় করা হবে, তারপর যারা নামাজে হাজির হয় না তাদের (ঘরবাড়ি) জ্বালিয়ে দিবো।'

এ থেকে বোঝা যায়, প্রথম জামাতেই উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। আর যদি পুনরায় জামাত জায়েজ হতো, তাহলে যারা প্রথম জামাতে যাবে না, পেছনে থেকে যাবে, তাদের জন্য এ ওজর ছিলো যে, আমরা দ্বিতীয় জামাতে যাওয়ার ইচ্ছা রাখি। তাছাড়া এ অনুচ্ছেদের হাদিসটির একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ব্যতিত গোটা হাদিস ভাণ্ডারে এমন কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, যাতে মসজিদে নববিতে দ্বিতীয় জামাত করার প্রমাণ রয়েছে। বাস্তবতা হলো,

---

টীকা- ১. সুনানে কুবরা -বায়হাকি : ৩/৭০।

টীকা- ২. আছারুস্ সুনান : ১৩৫, باب ما استدل به على كراهة تكرار الجماعة قال النيموى رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد : ٢/٥٤ رجاله ثقات

টীকা- ৩. তিরমিযী : ১/৫২, باب ماجاء فى من سمع النداء فلا يجيب

দ্বিতীয় জামাতের অনুমতি হলে মসজিদের জামাতের উদ্দেশ্য এবং গাম্ভীর্য অবশিষ্ট থাকে না। অভিজ্ঞতা এটাই, যেখানে পুনরায় জামাতের প্রচলন হয় সেখানে লোকজন প্রথম জামাতে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে খুবই অলস হয়ে পড়ে। কেনোনা, মসজিদে তো সর্বদা জামাত হতেই থাকে। আরা দ্বিতীয় জামাত জায়েজ সাব্যস্ত করলে জবাবও মারাত্মক আশঙ্কা থাকে।

বাকি এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি। জমহুরের পক্ষ থেকে এর জবাব হলো, এ জামাতটি ছিলো সর্বমোট দু'জনের এবং আহ্বান ব্যতিত। আর আমাদের মতে আহ্বান ব্যতিত পুনরায় জামাত জায়েজ আছে। তবে শর্ত হলো কখনও কখনও এমন করা। বস্তুত আহ্বানের সীমা কোনো কোনো ফকিহ এ নির্ধারণ করেছেন যে, ইমাম ব্যতীত জামাতে চার জন হবে। তাছাড়া আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ছিলেন নফল আদায়কারি। আর আলোচ্য মাসআলা হলো, ইমাম এবং মুক্তাদি উভয়ে হবেন ফরজ আদায়কারী। তাছাড়া বৈধ ও মাকরূহের বিরোধের সময় মাকরূহের প্রাধান্য হয়। আবার এটাও গভীরভাবে লক্ষ্যণীয় যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্য থেকে কারও থেকে পুনরায় জামাত করেছেন বলে প্রমাণিত হয় না। এ অনুচ্ছেদের হাদিসটির ঘটনা যদি সাধারণ অনুমতির মর্যাদা রাখতো, তাহলে নিশ্চয়ই সাহাবায়ে কেরামের আমল অনুরূপ হতো।

অবশিষ্ট আছে, হজরত আনাস (রা.)-এর ঘটনা। এ মসজিদটি এখানে পথের মসজিদ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর সহায়তা এর দ্বারা হয় যে, মুসনাদে আবু ইয়ালাতে[১] স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, এটা ছিলো বনু সা'লাবার মসজিদ। এ নামের কোনো মসজিদ মদিনা তাইয়্যিবায় প্রসিদ্ধ নয়। এর ফলে এটাই স্পষ্ট হয় যে, এটা ছিলো পথের মসজিদ। অন্যথায় মদিনা তাইয়্যিবার ছোট মসজিদগুলোর আলোচনাও ছোট গ্রন্থরাজিতেও বিদ্যমান আছে। আর এর আরেকটি দলিল হলো, স্বয়ং হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত,

ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا اذا فاتتهم الجماعة صلوا فى المسجد فرادى ٢ -

'যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিগণের জামাত ছুটে যেতো তখন তাঁরা মসজিদে নামাজ আদায় করতেন একাকি।'

এটা দ্বিতীয় জামাত না হওয়ার ব্যাপারে পরিপূর্ণ স্পষ্ট। এ মাসআলাটির তাহকিকের ব্যাপারে হজরত গাঙ্গুহি (র.)-এর পুস্তিকা 'আল-কুতুফুদ্ দানিয়াহ ফি কারাহাতিল জামা'আতিস্ সানিয়া'তে দেখা যেতে পারে।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ فَضْلِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِىْ جَمَاعَةٍ (صـ ٥٣)

অনুচ্ছেদ- ৫১ : এশা ও ফজরের জামাতের ফজিলত প্রসঙ্গে (মতন ৫৩)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (رض) قَالَ قَالَ لَهُ قيام نصف ليلة وسلم مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فِىْ جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِىْ جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ -

২২১. অর্থ : হজরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে এশার জামাতে শরিক হয়, তার অর্ধ রাত্র পর্যন্ত দাঁড়িয়ে নফল নামাজ পড়ার সওয়াব লাভ হয়। আর যে এশা এবং ফজর উভয়টি জামাত সহকারে আদায় করে তার পুরো রাত দাঁড়িয়ে নফল পড়ার সওয়াব হয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমর, আবু হুরায়রা, আনাস, উমারা ইবনে আবু রুয়াইবা, জুনদাব, উবাই ইবনে কা'ব, আবু মূসা ও বুরায়দা (রা.) থেকে হাদিস বর্ণিত আছে।

টীকা. ১. ফাতহুল বারি : ২/১০৯

টীকা. ২. আল্লামা বিন্নুরি (র.) বলেন, বাদায়ি' : ১/১৫৩ তে অনুরূপ রয়েছে। -মাআরিফুস সুনান : ২/২৮৮

عن جندب بن سفيان (رضـ) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو فى ذمة الله فلا تخفروا الله فى ذمته -

২২২. অর্থ : হজরত জুনদাব ইবনে সুফিয়ান (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ বলেছেন, যে ফজরের নামাজ আদায় করে সে আল্লাহর দায়িত্বে চলে যায়। আল্লাহর জিম্মাদারিতে হস্তক্ষেপ করো না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'উসমান (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح। আব্দুর রহমান ইবনে আবু আমরা সূত্রে উসমান (রা.) হতে এ হাদিসটি মওকুফ আকারে বর্ণিত হয়েছে। আবার উসমান (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে মারফু আকারেও বর্ণিত।'

عن بريدة الاسلمى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين فى الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيمة - هذا حديث غريب -

২২৩. অর্থ : হজরত বুরায়দা আসলামি (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যারা অন্ধকারে মসজিদের দিকে যায়, তাদের জন্য কিয়ামতের দিন পূর্ণাঙ্গ জ্যোতির সুসংবাদ দাও। হাদিসটি গরিব।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ فَضْلِ الصَّفِّ الْاَوَّلِ (صـ ٥٣)

অনুচ্ছেদ- ৫২ : প্রথম কাতারের ফজিলত প্রসঙ্গে (মতন ৫৩)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا وَشَرُّهَا اٰخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ اٰخِرُهَا وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا -

২২৪. অর্থ : হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পুরুষের সর্বোত্তম কাতার হলো প্রথমটি। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো পেছনেরটি। আর মহিলাদের সর্বোত্তম কাতার হলো শেষেরটি এবং প্রথমটি হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাতার।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

জাবের, ইবনে আব্বাস, আবু সায়িদ, উবাই, আয়েশা ইরবাজ ইবনে সারিয়া ও আনাস (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'আবু হুরায়রা (রা.) -এর হাদিসটি حسن صحيح। নবী করিম ﷺ হতে বর্ণিত আছে, তিনি প্রথম কাতারের জন্য তিনবার মাগফেরাত কামনা করতেন, আর একবার দ্বিতীয়টির জন্য।

وقال النبى صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه -

২২৫। অর্থ : হজরত নবী করিম ﷺ আরও বলেছেন, যদি লোকজন আজান ও প্রথম কাতারে কি সওয়াব রয়েছে তা জানতো, তারপর লটারি ব্যতিত যদি তার সমাধান না পেতো তাহলে অবশ্যই এর জন্য লটারি দিতো।

عن ابى هريرة (رضـ) عـن النبـى صلى الله عليـه وسلـم مثلـه ـ وحدثنا قـتـيـبـة عـن مـالـك نـحـوه ـ

২২৬. অর্থ : হজরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী করিম ﷺ থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। 'কুতায়বা মালেক সূত্রে অনুরূপ হাদিস আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন।' সনদটি নিম্নযুক্ত,

حدثنا بذلك اسحاق بن موسى الانصارى نا معن نا مالك ....

ইমাম তিরমিযী (রহ.) এটি সংক্ষেপ করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ اِقَامَةِ الصُّفُوْفِ (صـ ٥٣)

অনুচ্ছেদ- ৫৩ : কাতার সোজা করা প্রসঙ্গে (মতন ৫৩)

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّىْ صُفُوْفَنَا فَخَرَجَ يَوْمًا فَرَاٰى رَجُلاً خَارِجًا صَدْرُهُ عَنِ الْقَوْمِ فَقَالَ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ ـ

২২৭. অর্থ : হজরত নু'মান ইবনে বশির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাতার সোজা করতেন। একদিন তিনি বের হয়ে দেখলেন, এক ব্যক্তির সিনা কওম হতে বেরিয়ে আছে। তখন তিনি বললেন, হয় তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করবে, নতুবা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দিবেন মতদ্বৈততা তথা বিরোধিতা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

জাবের ইবনে সামুরা, বারা, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, আনাস, আবু হুরায়রা ও আয়েশা (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'নু'মান ইবনে বশির (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح। নবী করিম ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, কাতার সোজা করা নামাজের পূর্ণাঙ্গতার কারণ। উমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি এক ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন কাতার সোজা করার জন্য। ততোক্ষণ পর্যন্ত তাকবির বলা হতো না, যতোক্ষণ তিনি সংবাদ না দিতেন যে, কাতারগুলো সোজা হয়ে গেছে। আলি ও উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা দু'জন এর খবর নিতেন ও তত্ত্বাবধান করতেন। তাঁরা বলতেন, তোমরা সমান হয়ে দাঁড়াও। আলি (রা.) বলতেন, হে অমুক! সামনে যাও, হে অমুক! পেছনে যাও।'

দরসে তিরমিযী

لتسون صفوفكم : এটি খবর তবে ব্যবহৃত ইনশার অর্থে। ব্যাপারে সবাই একমত যে, তাকিদপূর্ণ; বরং অনেকে এটাকে ওয়াজিবও বলেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে জমহুর একমত যে, এটি নামাযের শর্তগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব, এছাড়াও নামাজ হয়ে যায়। শুধু আল্লামা ইবনে হাজম জাহেরি (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, কাতার সোজা না করা অবস্থায় নামাজকে তিনি ফাসেদ বলেন। কিন্তু তাঁর এ মাজহাব তুচ্ছ।

او ليخالفن الله بين وجوهكم : এর অর্থ হতে পারে দুটি– ১) আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের মাঝে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে। ২) বিকৃত করে দেওয়া হবে তোমাদের চেহারা।

প্রথম অর্থের সহায়তা অন্য অনেক বর্ণনা দ্বারাও হয়। যেমন, আবু দাউদের[১] একটি বর্ণনায় আছে, او ليخالفن الله بين قلوبكم, আর দ্বিতীয় অর্থের সহায়তা হয় মুসনাদে আহমদের [২] বর্ণনা দ্বারা। যেটিতে মুখালাফাতের পরিবর্তে শব্দ ব্যবহার হয়েছে طمس (মিটিয়ে দেওয়া)।

بَابُ مَاجَاءَ لِيَلِيَنِيْ مِنْكُمْ أُولُوْ الْاَحْلَامِ وَالنُّهٰى (ص ٥٣)

অনুচ্ছেদ- ৫৪ : আমার কাছে যেনো দাঁড়ায় তোমাদের বিজ্ঞ ও জ্ঞানী লোকজন (মতন ৫৩)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَلِيَنِيْ مِنْكُمْ أُولُوالْاَحْلَامِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ وَلَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ وَاِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْاَسْوَاقِ .

২২৮. অর্থ : হজরত আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ বলেছেন, আমার কাছে যেনো বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও বিজ্ঞ লোকজন দাঁড়ায়। তারপর যারা তাদের নিকটবর্তী, তারপর যারা তাদের নিকটবর্তী, তোমরা মতবিরোধ করো না। অন্যথায় তোমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ জন্ম নিবে। সাবধান, বাজারের হৈচৈ থেকে দূরে থাকো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

উবাই ইবনে কা'ব, ইবনে মাসউদ, বারা ও আনাস (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে থেকে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, ইবনে মাসউদ (রা.) -এ হাদিসটি حسن غريب। নবী করিম ﷺ হতে বর্ণিত আছে, তাঁর নিকট মুহাজির এবং আনসারিগণ দাঁড়াবেন– তিনি এটা পছন্দ করতেন। যাতে তাঁরা রাসূল ﷺ থেকে নামাজ ইত্যাদি বিষয়গুলো সংরক্ষণ করতে পারেন। খালিদ আল-হাজ্জা হলেন খালেদ ইবনে মিহরান। তাঁর উপনাম হলো আবুল মানাজিল। (তিরমিযী বলেছেন,) আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইলকে বলতে শুনেছি, খালেদ আল-হাজ্জা কখনও জুতা তৈরি করেননি। তথা তিনি মুচি ছিলেন না। কিন্তু শুধু মুচির কাছে বসতেন। এজন্য তাঁকে এদিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। আবু মা'শারের নাম زياد بن كليب

টীকা. ১. ১/৯৭, باب تسوية الصفوف তাছাড়া এ অনুচ্ছেদেই হজরত বারা ইবনে আজেব (রা.)-এর হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাতারের ভেতর প্রবেশ করে এক দিক থেকে অপর দিকে চলে যেতেন। আমাদের বুকে এবং কাঁধে স্পর্শ করতেন এবং বলতেন, তোমরা ইখতেলাফ করো না (কাতারে আগে পিছে সরে)। অন্যথায় তোমাদের মতপার্থক্য সৃষ্টি হবে।

টীকা. ২. ই'লাউস্ সুনানে আল্লামা উসমানি (র.) বলেন, ওপরযুক্ত সতর্কবাণী সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। যেমন হাফেজ (র.) 'ফাতহুল বারি'তে বলেছেন, কেউ বলেছেন, প্রকৃত অর্থে এর উদ্দেশ্য চেহারাকে সমান করে দেওয়া তার সৃষ্টিকে স্বাভাবিক অবস্থা থেকে পরিবর্তিত করে ঘাড়ের মধ্যে এটাকে লাগিয়ে দিয়ে অথবা এমন কোনো পদ্ধতিতে।

এ সময় কাতার সোজা করা ওয়াজিব হবে। তাতে শিথিলতা করা হবে হারাম। বাহ্যিক অর্থের ওপর প্রয়োগ করার সহযোগিতা করতে হজরত আবু উমামা (রা.) -এর হাদিস لتسون الصفوف او لتطمسن الوجوه এ হাদিসটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন। এর সনদে জয়িফতা আছে। আর অনেকে এটাকে রূপক অর্থে প্রয়োগ করেছেন। ইমাম নববি (র.) বলেন, (স্পষ্টতর হলো, আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন) এর অর্থ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ তৈরি করে দিবেন; অন্তরে মতানৈক্য সৃষ্টি করে দিবেন। যেমন বলা হয়, تغير وجه فلان على অর্থাৎ, তার পক্ষ থেকে আমার প্রতি অপ্রীতি প্রকাশ পেয়েছে এবং তার অন্তর আমার প্রতি বিরূপ হয়ে গেছে। কারণ কাতারে বিরোধ হওয়া মানে তাদের বাহ্যিক অবস্থায় বিরোধ"। আর বাহ্যিক অবস্থার বিরোধ আভ্যন্তরীণ মতানৈক্যের কারণ। আবু দাউদের বর্ণনা এর সহায়ক ....। –ই'লাউস্ সুনান : ৪/৩১৮-৩১৯, ছাপা : مرتب - باب سنية تسوية الصف ورصها، كراچی، ادارة القرآن والعلوم الإسلامی

দরসে তিরমিযী

ليلينى منكم اولو الاحلام والنهى : احلام শব্দটি حلم বা حلم -এর বহুবচন। النهى মানে বিবেকসমূহ। উদ্দেশ্য হচ্ছে, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানী লোকদের উচিত আমার কাছে দাঁড়ানো। এর কয়েকটি হেকমত আছে।

১. যদি নামাযের স্থলাভিষিক্ত বানানোর প্রয়োজন হয় তাহলে ইমামতির যোগ্যলোক তৎক্ষণাৎ পাওয়া যেতে পারে।

২. ভুল ইত্যাদি হলে সহিহ লোকমা দেওয়া যেতে পারে।

৩. তাঁরা রাসূল ﷺ-এর নামাজ দেখে অন্যদের নিকট পৌঁছাতে পারেন।

প্রথম দুটি কারণ, বর্তমানেও অবশিষ্ট আছে। এজন্য এ হুকুমটির প্রয়োগ বর্তমানেও হবে।

واياكم وهيشات الأسواق : هيشات শব্দটি هيشة -এর বহুবচন। মানে হৈচৈ-হট্টগোল। অনেকে বলেছেন, এ বাক্যটির সাথে পূর্বের বাক্যের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই; বরং এটি একটি স্বতন্ত্র বাক্য। যাতে বেশি বেশি বাজারে যাতায়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর অনেকে বলেছেন, এটি পূর্বোক্ত বাক্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থ হচ্ছে, মসজিদে বাজারের মতো হৈচৈ-হট্টগোল করো না। আবার অনেকে বলেছেন, এর অর্থ হলো, বাজারের হট্টগোলে এমন মশগুল হয়ো না যে, নামাজে আমার সাথে দাঁড়াতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ كَرَاهِيَةِ الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِىْ (صـ ٥٣)

অনুচ্ছেদ- ৫৫ : স্তম্ভগুলোর মাঝে কাতার করা মাকরূহ প্রসঙ্গে (মতন ৫৩)

عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ مَحْمُوْدٍ قَالَ صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيْرٍ مِّنَ الْأُمَرَاءِ فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَلَمَّا صَلَّيْنَا قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ (رضـ) كُنَّا نَتَّقِىْ هٰذَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

২২৯. অর্থ : হজরত আব্দুল হামিদ ইবনে মাহমুদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, জনৈক আমিরের পেছনে আমরা নামাজ পড়েছি। লোকজনের ভিড়ের কারণে আমরা দুই স্তম্ভের মাঝে নামাজ পড়েছি। যখন আমরা নামাজ থেকে অবসর হয়েছি, তখন আনাস ইবনে মালেক (রা.) বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামানায় এ (দুই স্তম্ভের মাঝে দাঁড়ানো) থেকে বেঁচে থাকতাম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

কুররা ইবনে আয়াস আল-মুজানি থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'আনাস (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح। একদল আলেম স্তম্ভগুলোর মাঝে দাঁড়ানো মাকরূহ মনে করেছেন, এ মতই পোষণ করেন আহমদ ও ইসহাক (র.)। এ ব্যাপারে আরেক দল আলেম অনুমতি দিয়েছেন।'

ইমাম আহমদ ও ইসহাক এবং কোনো আহলে জাহের এ হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করে স্তম্ভগুলোর মাঝে কাতারবদ্ধ হওয়া মাকরূহে তাহরিমি সাব্যস্ত করেন। শাফেয়ি এবং মালেকিগণ মাকরূহ ব্যতিত এর বৈধতার প্রবক্তা। হানাফিদের থেকে এ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট বক্তব্য বর্ণিত নেই। কোনো কোনো ফিকহি এবারত দ্বারা কোনো এমন মনে হয় যে, তাঁদের মতও শাফেয়ি ও মালেকিদের মতোই। কারণ, ফিক্হের গ্রন্থাবলিতে ইমামকে দুই স্তম্ভের মাঝে দাঁড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা মাসআলা উৎসারণ করা যায় যে, দুই স্তম্ভের মাঝে

দাঁড়ানো মাকরূহ নয়। এজন্য পরবর্তী হানাফিগণ অবলম্বন করেছেন শাফেয়ি এবং মালেকিদের মাজহাব অবলম্বন করেছেন।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসটির ব্যাখ্যা হলো, মসজিদে নববির স্তম্ভগুলো সমান ছিলো না; বরং বাঁকা ছিলো। অতএব, যদি সেগুলোর মাঝে কাতার তৈরি করা হতো, তখন কাতার সোজা হতো না। এ কারণেই স্তম্ভগুলোর মাঝে কাতার মাকরূহ মনে করা হতো এবং সাহাবায়ে কেরাম তা থেকে বেঁচে থাকতেন। كتاب نتقى هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم এরও এ অর্থই। অতএব যেখানে স্তম্ভগুলো সোজা সেখানে এগুলোর মাঝে দাঁড়ানো মাকরূহবিহীন জায়েজ হবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الصَّلٰوةِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهٗ (ص ٥٤)

অনুচ্ছেদ- ৫৬ : কাতারের পেছনে একাকি নামাজ পড়া প্রসঙ্গে (মতন ৫৪)

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ اَخَذَ زِيَادُ بْنُ اَبِى الْجَعْدِ بِيَدَىَّ وَنَحْنُ بِالرَّقَّةِ فَقَامَ بِىْ عَلٰى شَيْخٍ يُّقَالُ لَهٗ وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ مِّنْ بَنِىْ اَسَدٍ فَقَالَ زِيَادٌ حَدَّثَنِىْ هٰذَا الشَّيْخُ اَنَّ رَجُلًا صَلّٰى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهٗ وَالشَّيْخُ يَسْمَعُ فَاَمَرَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّعِيْدَ الصَّلٰوةَ ـ

২৩০. অর্থ : হেলাল ইবনে ইসাফ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, জিয়াদ ইবনে আবুল জা'দ আমাকে হাত ধরে নিয়ে গেলেন আমরা তখন রাক্কা নামক স্থানে। তারপর আমাকে তিনি এক শায়খের নিকটে নিয়ে দাঁড়ালেন। সে শায়খকে বলা হতো ওয়ারিছা ইবনে মা'বাদ। তিনি ছিলেন বনু আসাদের লোক। তারপর জিয়াদ বললেন, এ শায়খ আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি কাতারের পেছনে একাকি নামাজ পড়েছিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তার নামাজ পুনরায় পড়ার নির্দেশ দিলেন। যখন জিয়াদ বলছিলেন, শায়খ তখন তা শুনেছিলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আলি ইবনে শায়বান ও ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, ওয়ারিসার হাদিসটি হাসান। কাতারের পেছনে একাকি নামাজ পড়া একদল আলেম মাকরূহ মনে করেছেন। তাঁরা বলেছেন, কাতারের পেছনে একাকি নামাজ পড়লে তা পুনরায় আদায় করে নেবে। আহমদ ও ইসহাক (র.) এ মতই পোষণ করেন। আরেক দল আলেম বলেছেন, কাতারের পেছনে একাকি নামাজ পড়লে তা তার জন্য যথেষ্ট। এ মতই পোষণ করেন সুফিয়ান সাওরি, ইবনে মুবারক ও শাফেয়ি (র.)। কুফাবাসী একদল আলেমের মতও ওয়াবিসা ইবনে মা'বাদ (রা.)-এর হাদিস মুতাবেক। তাঁরা বলেছেন, যে কাতারের পেছনে একাকি নামাজ পড়বে সে তা দোহরিয়ে নিবে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, হাম্মাদ ইবনে আবু সুলায়মান, ইবনে আবু লায়লা ও ওয়াকি' (র.)। হুসাইনের হাদিসটি হিলাল ইবনে ইয়াসার থেকে একাধিক ব্যক্তি আবুল আহওয়াজ-জিয়াদ ইবনে আবুর জা'দ-ওয়াবিসা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদিসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন। হুসাইনের হাদিসে এমন প্রমাণ রয়েছে যা থেকে বোঝা যায় যে, হিলার ওয়াবিসা (রা.)-কে পেয়েছেন। মুহাদ্দিসিনে কেরাম এ ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন, অনেকে বলেছেন, আমর ইবনে মুররা-হিলাল ইবনে ইয়াসাফ-আমর ইবনে রাশিদ-ওয়াবিসা (রা.)-এর হাদিস বিশুদ্ধতম।

অনেকে আবার বলেছেন, হুসাইন-হিলাল ইবনে ইয়াসাফ-জিয়াদ ইবনে আবুল জা'দ-ওয়াবিসা ইবনে আবু মা'বাদ (রা.)-এর হাদিসটি বিশুদ্ধতম।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এটি ওয়াবিসা ইবনে মা'বাদ (রা.)-এর হাদিস অপেক্ষা আমার নিকট বিশুদ্ধতম। কারণ, তিনি (হোসাইন) হিলাল ইবনে ইয়াসাফ-জিয়াদ ইবনে আবুল জা'দ-ওয়াবিসা ইবনে মা'বাদ (রা.) সূত্রে অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন।

عن وابصة بن معبد (رض) ان رجلا صلى خلف الصف وحده فامره النبى صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلوة ـ

২৩১. অর্থ : ওয়াবিসা ইবনে মা'বাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, কাতারের পেছনে এক ব্যক্তি একাকি নামাজ পড়েছিলেন। তখন নবী করিম ﷺ তাকে নির্দেশ দিয়েছেন নামাজ দোহরানোর।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, জারূদকে আমি বলতে শুনেছি, আমি ওয়াকি'কে বলতে শুনেছি, যখন কেউ কাতারের পেছনে একাকি নামাজ পড়বে সে তখন তা দোহরিয়ে নেবে।

* এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করে,

১. যদি পেছনের কাতারে একাকি দাঁড়িয়ে কোনো ব্যক্তি নামাজ পড়ে, তাহলে তার নামাজ ফাসেদ হয়ে যায়। এ নামাজ দোহরানো ওয়াজিব, এটা ইমাম আহমদ, ইসহাক, হাম্মাদ ইবনে আবু সুলায়মান, ইবনে আবু লায়লা এবং ওয়াকি' ইবনুল জাররাহ (র.)-এর মাজহাব।

২. আর ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ি, সুফিয়ান সাওরি (র.)-এর মাযহাব হলো, এমন ব্যক্তির নামাজ হয়ে যায়। মাকরূহ (তাহরিমি) এর পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

৩. তবে হানাফিরা এ তাফসিল বর্ণনা করেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি নামাজে এমন সময় পৌঁছে যখন কাতার পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, তখন এমন ব্যক্তির উচিত পেছনে দাঁড়ানোর সময় অন্য কোনো ব্যক্তির আগমনের অপেক্ষা করা। যদি রুকু পর্যন্ত কেউ না আসে তাহলে সামনের কাতার থেকে কাউকে টেনে এনে নিজের সাথে দাঁড় করাবে এবং তার সঙ্গে মিলে নামাজ পড়বে। অবশ্য যদি তাকে কষ্ট দেওয়ার আশংকা হয়, অথবা অজ্ঞ লোক হয় এবং এতে (এই কাজের ফলে) কোনো ফিতনার আশঙ্কা হয়, তাহলে এমতাবস্থায় একাকি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া জায়েজ। আর নামাজ সর্বাবস্থায় হয়ে যাবে, কোনো প্রকার মাকরূহ হবে না। নিশ্চিত মাকরূহ হবে যদি এসব বিধিবিধানের প্রতি লক্ষ্য না করা হয়।

জমহুরের প্রমাণ, আবু দাউদে[১] বর্ণিত হজরত আবু বকরা (রা.)-এর হাদিস,

انه دخل المسجد ونبى الله صلى الله عليه وسلم راكع قال فركعت دون الصف فقال النبى صلى الله عليه وسلم ذادك الله حرصا ولا تعد ـ

'তিনি মসজিদে এমন অবস্থায় ঢুকলেন, যখন নবী করিম ﷺ রুকু করছিলেন। তিনি বলেন, তখন আমি কাতারে পেছনে রুকু করলাম। ফলে নবী করিম ﷺ বললেন, আল্লাহ তোমার (নেক কাজের) লোভ বাড়িয়ে দিন। তবে এমনটি আর কখনও করো না।'

এতে রাসূল ﷺ হজরত আবু বকরা (রা.)-কে নামাজ দোহরানোর নির্দেশ দেননি; বরং তাঁর নামাজ মেনে নিয়ে ভবিষ্যতে এমন কাজ আর না করার তাগিদ দিয়েছেন। যা থেকে প্রমাণিত হলো, কাতারের পেছনে একাকি নামাজ ভঙ্গের কারণ নয়, যদিও মাকরূহ।

টীকা. ১. ১/৯৯, باب الرجل يركع دون الصف

১. উক্ত হাদিসের জবাব হলো, দোহরানোর এ নির্দেশ প্রযোজ্য মোস্তাহাবের ক্ষেত্রে।

২. অনেকে হানাফি এ জবাবও দিয়েছেন যে, যেহেতু তিনি অন্য ব্যক্তিকে মেলানোর চেষ্টা করা ব্যতিত একাকি নামাজ পড়েছেন এজন্য এ নামাজ মাকরূহ হয়েছে। আর হানাফিদের এ মূলনীতি যে, كل صلوة اديت مع الكراهية تجب اعادتها। 'মাকরূহ সহকারে যেসব নামাজ আদায় করা হয়েছে, সেগুলো দোহরানো ওয়াজিব'। এটি ঠিক নয়। কারণ, হানাফিদের ওপরযুক্ত মূলনীতি আল্লামা শামি (র.)-এর সুস্পষ্ট বিবরণ অনুযায়ী সে মাকরূহ সম্পর্কে যেটি মূল নামাজে সৃষ্টি হয়। বাইরের কোনো সাময়িক কারণের ভিত্তিতে যে মাকরূহ আসে তা দ্বারা নামাজ দোহরানো ওয়াজিব হয় না। যেমন ফাসেকের পেছনে নামাজ পড়া মাকরূহ। তবে কোনো ব্যক্তি যদি পড়ে নেয়, তাহলে তার নামাজ হয়ে যায়, পুনরায় পড়া ওয়াজিব হয় না। প্রথম জবাবটি উত্তম। কারণ, এখানে দোহরানোর হুকুম দেওয়া হয়েছে মোস্তাহাবরূপে, ওয়াজিব হিসেবে নয়।

এটা ছাড়াও আরেকটি জবাব এ অনুচ্ছেদের হাদিসের দেওয়া হয়েছে যে, সনদগতভাবে এ অনুচ্ছেদের হাদিসের মুজতারিব। যেমন ইমাম তিরমিযী (র.)-এর বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায়। 'আল-মা'রিফাত' নামক গ্রন্থে ইমাম বায়হাকি (র.) লিখেন,

وانما لم يخرجه صاحبا الصحيح لما وقع فى اسناده من الاختلاف .

'এ হাদিসটি বোখারি-মুসলিম এজন্য বর্ণনা করেননি, কারণ, তার সনদে রয়েছে ইখতেলাফ।'

ইমাম শাফেয়ি (র.) বলেন, لو ثبت الحديث لقلت به (হাদিসটি যদি প্রমাণিত হতো, তাহলে আমি এর প্রবক্তা হতাম।) এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ হাদিসটি ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মতে সহিহ নয়।

ইবনে মাজায়[১] হজরত আলি ইবনে শায়বান থেকে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদে আরেকটি বর্ণনা আছে। এতেও استقبل صلوتك (তোমার নামাজ নতুন করে পড়ে নাও) শব্দ দ্বারা কাতারের পেছনে একা দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়কারিদেরকে দোহরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ হাদিসটিতে মুলাজিম ইবনে আমর এবং আবদুল্লাহ ইবনে বদর দু'জন রাবি জয়িফ তাই এ হাদিসটিও প্রমাণযোগ্য নয় এবং হজরত আবু বকরা (রা.)-এর সহিহ বর্ণনার মুকাবেলা করতে পারে না। বিশেষতো যখন সাহাবার আমলও এ থেকে এর বিপরীত।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّجُلِ يُصَلِّى وَمَعَهُ رَجُلٌ (ص ٥٥)

অনুচ্ছেদ- ৫৭ : যে একজন মুক্তাদি নিয়ে নামাজ আদায় করে (মতন ৫৫)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَاْسِىْ مِنْ وَّرَائِىْ فَجَعَلَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ .

২৩২. অর্থ : ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন দাঁড়িয়েছিলাম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক রাত্রে নামাজ পড়েছিলাম। আমি তাঁর বাম পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পেছন দিক থেকে আমার মাথায় ধরে দাঁড় করিয়ে দিলেন তাঁর ডান পাশে।

টীকা. ১. অনুচ্ছেদ : একাকি কাতারের পেছনে নামাজ পড়া। পৃষ্ঠা ৭০, আবু বকর ইবনে আবু শায়বা-মুলাজিম-আমর-আবদুল্লাহ ইবনে বদর-আব্দুর রহমান ইবনে আলি ইবনে শায়বান-তার পিতা আরি ইবনে শায়বান সূত্রে বর্ণিত, শায়বান প্রতিনিধি দলের একজন ছিলেন। তিনি বলেছেন, আমরা বেরিয়ে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করলাম। তাঁর হাতে বায়আত হলাম। তাঁর পেছনে নামাজ পড়লাম। রাবি বলেন, তারপর আমরা তাঁর পেছনে আরেক নামাজও আদায় করলাম। নামাজ শেষে তিনি একাকি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, কাতারের পেছনে নামাজ পড়ছে। বর্ণনাকারি বলেন, নবী করিম ﷺ তার পাশে দাঁড়ালেন। লোকটি যখন নামাজ থেকে অবসর হলো, তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার নামাজ নতুন করে পড়ে নাও। কাতারের পেছনে যে (একাকি) নামাজ পড়ে তার নামাজ হয় না। –সংকলক

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত আনাস (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح। সাহাবি ও তৎপরবর্তী আলেমগণের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত রয়েছে। তাঁরা বলেছেন, এক ব্যক্তি যখন ইমামের সাথে থাকবে, তখন সে ইমামের ডান পাশে দাঁড়াবে।

দরসে তিরমিযী

صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم براسى من ورائ -

কোনো কোনো বর্ণনায় হাতে[১] আর কোনো কোনো বর্ণনায় কানে[২] ধরার কথাও বর্ণিত আছে; কিন্তু বিরোধ এজন্য নেই যে, তিনটিতেই হয়তো ধরেছেন– প্রথমে মাথায় তারপর কানে তারপর হাতে। এ নামাজ বহির্ভূত কাজটি ছিলো ক্ষণিকের। এজন্য নামাজের ওপর কোনো প্রভাব পড়েনি।

فجعلنى عن يمينه : এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, মুক্তাদি একজন হলে ডান দিকে দাঁড়াবে। অবশ্য দাঁড়ানোর পদ্ধতিতে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ (র.)-এর মাজহাব হলো, মুক্তাদি এবং ইমাম বরাবর দাঁড়াবে, কেউ আগে কেউ পিছে নয়।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে মুক্তাদি নিজের পাঞ্জা ইমামের গোড়ালি বরাবর রাখবে। হানাফি ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন যে, যদিও প্রমাণগতভাবে আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ (র.)-এর বক্তব্য প্রধান; কিন্তু আমল ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বক্তব্যর ওপর এবং তাতে বেশি সতর্কতা রয়েছে। কেনোনা, বরাবর দাঁড়ালে বেখেয়ালে আগে চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। অথচ ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বক্তব্য গ্রহণ করলে সেই আশংকা নেই। তাই ফতওয়াও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর বক্তব্যর ওপর।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّجُلِ يُصَلِّىْ مَعَ الرَّجُلَيْنِ (صـ ٥٨)

অনুচ্ছেদ- ৫৮ : দু'জন মুক্তাদি নিয়ে যে নামাজ পড়ে (মতন ৫৮)

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رض) قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كُنَّا ثَلٰثَةً اَنْ يَّتَقَدَّمَنَا اَحَدُنَا -

২৩৩. অর্থ : সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন, যখন আমরা তিনজন হই আমাদের একজন তখন যেনো সামনে এগিয়ে যায়।

টীকা. ১. ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি এক রাত্রে হুজুর ﷺ-এর বাম দিকে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছিলাম। ফলে তিনি আমার হাত বা বাহু ধরলেন। (আল্লামা কিরমানির বক্তব্য মুতাবেক এটি ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সন্দেহ।) তিনি আমাকে নিয়ে দাঁড় করালেন তার ডান পাশে এবং তার হাতে ইঙ্গিত করে বললেন, আমার পেছনে (দাড়াও)। বোখারি : ১/১০১, باب ميمنة المسجد والامام

টীকা. ২. হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি দীর্ঘ বর্ণনা নাসায়ির মধ্যে আছে যাতে তিনি বলেন, তারপর আমি দাঁড়ালাম। তিনি যা করলেন, আমিও অনুরূপ করলাম। তারপর আমি গিয়ে দাঁড়ালাম তাঁর পাশে। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান হাত আমার মাথায় রাখলেন এবং আমার ডান কান ধরে মলে দিলেন। তারপর তিনি দু'রাকাত নামাজ পড়লেন। .... : ১/২৪১, كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ذكر ما يستفتح به القيام

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এ বিষয়ে ইবনে মাসউদ ও জাবের (রা.) থেকেও হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, সামুরা (রা.)-এর হাদিসটি গরিব। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত আছে। তাঁরা বলেছেন, তিনজন হলে দু'জন দাঁড়াবে ইমামের পেছনে। ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি আলকামা এবং আসওয়াদ দু'জনকে নিয়ে নামাজ পড়েছিলেন। পরে একজনকে তাঁর ডানে অপর জনকে দাঁড় করিয়েছিলেন তার বামে। আর এটা তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। অনেকে স্মরণশক্তির দিক দিয়ে ইসমাইল ইবনে মুসলিম সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করেছেন।

দরসে তিরমিযী

امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا ثلاثة ان يتقدمنا احدنا : এ হাদিস অনুযায়ী জমহুরের মুক্তাদি যদি একাধিক হয় তাহলে ইমাম দাঁড়াবেন আগে। অবশ্য ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, যদি মুক্তাদি দুজন হয় তাহলে ইমাম মাঝখানে দাঁড়াবেন।

আবু ইউসুফ (র.)-এর প্রমাণ হজরত ইবনে মাসউদ (র.)-এর সে আছর ইমাম তিরমিযী (রা.) এ অনুচ্ছেদে লিখেছেন,

وروى عن ابن مسعود (رض) انه صلى بعلقمة والاسود فاقام احدهما عن يمينه والاخر عن يساره ورواه عن النبى صلى الله عليه وسلم -

হজরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর এ আছরের বিভিন্ন জবাব দেওয়া হয়েছে। যেমন, ১) এমনকরে দাঁড়ানোর হুকুম রহিত হয়ে গেছে। আর প্রবল ধারণা অনুযায়ী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সে সম্পর্কে জানতে পারেননি। ২) আরেকটি জবাব দেওয়া হয়, হজরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর আমল ছিলো স্থানের সংকীর্ণতার কারণে। আর আমাদের মতেও এমন স্থানে দাঁড়ানো বৈধ।

এই দুটি জবাব অপছন্দ করে হজরত শাহ সাহেব (কু.সি.) এগুলো প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রথম জবাবটি এজন্য যে, হজরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ন্যায় মহাজ্ঞানীর জন্য হুকুম রহিত হওয়া সম্পর্কে নাওয়াকিফহাল থাকা– তা না জানা খুবই অযৌক্তিক। দ্বিতীয় জবাব এজন্য শাহ সাহেব (র.) রদ করে দিয়েছেন যে, ওজর সম্পর্কে এ হাদিসটি নীরব। আর ওজর সম্পর্কে নীরব কোনো হাদিসকে কোনো প্রমাণ অথবা নিদর্শন ব্যতিত ওজরের ওপর প্রয়োগ করা যায় না। অতএব, হজরত শাহ সাহেব (র.) যে জবাব অবলম্বন করেছেন তা হচ্ছে, মাঝখানে দাঁড়ানো এমন অবস্থায় মাকরূহে তানজিহি। যেটি জায়েজের একটি শাখা। আর একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, রাসূল ﷺ কোনো কোনো স্থানে জায়েজের বিবরণের জন্য মাকরূহে তানজিহির ওপর আমল করেছেন। হয়তো এমনটি এখানেও হয়েছে এবং অনুসরণ করেছেন ইবনে মাসউদ (রা.)-এর।

মূলত এটা কোনো অযৌক্তিক নয়।

وقد تكلم بعض الناس فى اسمعيل بن مسلم من قبل حفظه -

তবে তাকে অন্যান্য আয়িম্মায়ে কেরাম নির্ভরযোগ্য বলেছেন। অতএব এ হাদিসটি হাসান থেকেও নিম্নস্তরের নয়। তারপর এটাও স্মরণ রাখা উচিত যে, এ হাদিসের ওপর জমহুরের প্রমাণ মওকুফ নয়; বরং পরবর্তী অনুচ্ছেদে হজরত আনাস (রা.) -এর যে বর্ণনাটি আসছে জমহুরের দলিল সেটিও। হজরত আনাস (রা.) তাতে বলেছেন,

وصففت عليه انا واليتيم ورائه والعجوز من ورائنا -

'আমি আর ইয়াতিম (একজনের নাম) তাঁর পেছনে কাতার বাঁধলাম। আর বৃদ্ধা আমাদের পেছনে ছিলেন।'

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّجُلِ يُصَلِّى وَمَعَهُ رِجَالٌ وَّنِسَاءٌ (صـ ٥٩)

অনুচ্ছেদ- ৫৯ ; যে ইমাম নারী-পুরুষদের নিয়ে নামাজ আদায় করেন (মতন ৫৯)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) اَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ (رضـ) دَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُوْمُوْا فَلْنُصَلِّ بِكُمْ قَالَ اَنَسٌ (رضـ) فَقُمْتُ اِلَى حَصِيْرٍ لَّنَا قَدْ اَسْوَدَ مِنْ طُوْلِ مَا لَبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِالْمَاءِ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ عَلَيْهِ اَنَا وَالْيَتِيْمُ وَرَائَهُ وَالْعَجُوْزُ مِنْ وَّرَائِنَا فَصَلَّى بِنَا ركعتين ثُمَّ انْصَرَفَ ـ

২৩৪. অর্থ : আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত যে, তাঁর নানী মুলায়কা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খাবার তৈরি করে দাওয়াত দিয়েছিলেন। তা তিনি খেলেন। তারপর বললেন, উঠো, তোমাদের নিয়ে নামাজ পড়বো। আনাস (রা.) বলেছেন, তারপর নামাজ পড়ার জন্য আমি একটি কালো পুরনো চাটাই নিতে গেলাম। অনেক দিন মিশ্রিত পড়ে থাকার কারণে এটি কালো বর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। তারপর আমি তাতে পানি ছিটিয়ে দিলাম। তার ওপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন। আমি এবং ইয়াতীম তার পেছনে কাতার করে দাঁড়ালাম। বৃদ্ধা (নানী) দাঁড়ালেন আমাদের পেছনে। আমাদেরকে নিয়ে তিনি দু রাকাত নামাজ পড়লেন। তারপর চলে গেলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আনাস (রা.) -এর হাদিসটি সহিহ। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত রয়েছে। তাঁরা বলেছেন, ইমামের সাথে যদি মুক্তাদি একজন পুরুষ ও একজন মহিলা হয় তবে পুরুষ ইমামের ডানে ও মহিলা তাদের পেছনে দাঁড়াবে। অনেকে এ হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন কাতারের পেছনে একাকি কোনো ব্যক্তির নামাজ পড়ার অনুমতি প্রসঙ্গে এবং তাঁরা বলেছেন, বাচ্চার ওপর নামাজ জরুরি ছিলো না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে একাকি ছিলেন। তাঁদের মাজহাবটি তবে ঠিক নয়। কারণ, নবী কারিম ﷺ তাঁকে ইয়াতিমের সাথে পেছনে দাঁড় করিয়েছেন। নবী কারিম ﷺ যদি ইয়াতিমের জন্য নামাজ সাব্যস্ত না করতেন তবে ইয়াতীমকে তাঁর সাথে দাঁড় করাতেন না। তাঁকে তাঁর ডান পাশেও খাড়া করাতেন না। মূসা ইবনে আনাস সূত্রে আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নামাজ পড়েছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে। তিনি তাঁর সঙ্গে দাঁড় করিয়েছেন। এ হাদিসে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, তিনি নামাজ পড়েছেন শুধুমাত্র নফলরূপে। এর দ্বারা তাঁদের ঘরে বরকত আনাই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য।

দরসে তিরমিযী

فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس : দীর্ঘদিন পর্যন্ত মিশ্রিত অবস্থায় থাকার কারণে। কারণ, لبس শব্দটি باب ضرب يضرب থেকে, অর্থ মিশ্রিত করা। لبس - باب سمع থেকে নয়।

انا واليتيم ورائه : এ থেকে বোঝা যায়, মহিলা একজন হলেও দাঁড়াবে পেছনে।

والعجور من ورائنا : এটা ছিলো নফল নামাজ এজন্য এর দ্বারা ইমাম শাফেয়ি (র.) নফলের জামাতের বৈধতার প্রমাণ পেশ করেন। আর হানাফিদের মতে ইস্তিসকা, তারাবিহ এবং চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণ ব্যতিত কোথাও নফলের জামাত জায়েজ নেই। কিন্তু আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস হানাফিদের প্রমাণ নয়। কারণ, এখানে জামাত আহবানের ভিত্তিতে ছিলো না। বস্তুত হানাফিদের মতে জামাত মাকরূহ তখন যখন আহবান হবে। আর আহ্বানের অর্থও তার বাস্তব উদ্দেশ্য পেছনে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইমাম ব্যতিত হবে কমপক্ষে চারজন।

بَابُ مَنْ اَحَقُّ بِالْاِمَامَةِ؟ (صـ ٥٥)

অনুচ্ছেদ- ৬০ : ইমামতের উপযুক্ত কে বেশি? (মতন ৫৫)

عَنْ اَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِيَّ (رض) يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنْ كَانُوْ فِى الْقِرَائَةِ سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَاِنْ كَانُوْا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَاِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَاَكْثَرُهُمْ (فى ن ب "اكبرهم") سِنًّا . وَلَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ فِىْ سُلْطَانِهِ وَلَا يَجْلِسُ عَلٰى تَكْرِمَتِهِ فِىْ بَيْتِهِ اِلَّا بِاِذْنِهِ قَالَ مَحْمُوْدٌ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِىْ حَدِيْثِهِ اَقْدَمُهُمْ سِنًّا .

২৩৫. অর্থ : আউস ইবনে দামআজ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি আবু মাসউদ আনসারি (রা.)-কে বলতে শুনেছি, রাসূল ﷺ বলেছেন, কিতাবুল্লাহর সবচেয়ে বড় কারি কওমের ইমামতি করবে। কেরাতে যদি সবাই সমান হয়, তাহলে সুন্নাতের সবচেয়ে বড় আলেম। যদি সুন্নাতে (এর জ্ঞানে) সবাই সমান হয় তবে আগে যে হিজরত করেছে। যদি হিজরতে সবাই সমান হয়, তবে সবচেয়ে যে বেশি বর্ষীয়ান। কারও প্রভাবাধীন স্থানে যেনো অন্য কেউ ইমামতি না করে। তার ঘরে তার সম্মানের আসনে তার অনুমতি ব্যতিত যেনো কেউ না বসে। মাহমুদ বলেছেন, ইবনে নুমাইর তাঁর হাদিসে اكثرهم سنا -এর স্থানে اقدمهم سنا (বয়সে প্রবীণ) বলেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু সায়িদ, আনাস ইবনে মালেক ইবনে হুয়াইরিস ও আমর ইবনে সালাম (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আবু মাসউদ (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত রয়েছে। তাঁরা বলেছেন, ইমামতির অধিক হকদার আল্লাহর কিতাবের সবচেয়ে বড় কারি এবং সুন্নাতের সবচেয়ে বড় আলেম। আর ইমামতির অধিক যোগ্য বাড়ির মালেক। অনেক বলেছেন, যদি বাড়ির মালেক অন্যকে অনুমতি দেয় তবে তার ইমামতিতে কোনো অসুবিধা নেই। আর এটাকে মাকরূহ মনে করেছেন। তাঁরা বলেছেন, সুন্নত হলো বাড়ির মালেক কর্তৃক নামাজ পড়ানো। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেছেন, রাসূলে আকরাম ﷺ-এর বাণী 'কোনো ব্যক্তির প্রভাবাধীন স্থানে অন্য কেউ যেনো ইমামতি না করে এবং তার সম্মানের আসবে যেনো কেউ না বসে তাদের অনুমতি ব্যতিত, এ দুটি কথার সাথেই অনুমতির সম্পর্ক রয়েছে। অনুমতি যখন দেয় তখন উভয়ের ক্ষেত্রেই এর সুযোগ রয়েছে বলে মনে করি। নামাজ পড়ানোর অনুমতি দিলে তিনি তাতে কোনো সমস্যা নেই বলে তিনি মনে করেন।

يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا فى القرائة سواء فاعلمهم بالسنة .

ইমাম আহমদ ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এ হাদিসের ভিত্তিতে বলেন, সবচেয়ে বড় কারি ইমামতের অধিক হকদার। তিনি বড় আলেমের ওপর প্রাধান্য রাখেন। সবচেয়ে বড় কারি দ্বারা উদ্দেশ্য যিনি তাজবিদ ও কেরাতে অভিজ্ঞতর এবং যার কোরআন বেশি মুখস্থ আছে। ইমাম শাফেয়ি ও মালেক (র.)-এরও একটি বর্ণনা ইমাম আহমদ ও আবু ইউসুফ (র.)-এর অনুরূপ। ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ (র.) সবচেয়ে বড় আলেম অথবা বড় ফকিহকে বড় কারির ওপর প্রাধান্য দেন। মালেকি ও শাফেয়িদের দ্বিতীয় বর্ণনা তেমনি।

ইমাম আবু হানিফা (র.) এবং অন্যদের দলিল, ওফাতের রোগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, مروا ابا بكر فليصل بالناس[১]। রাসূল ﷺ এমনভাবে ইমামতি ন্যস্ত করেছিলেন হজরত আবু বকর (রা.)-এর ওপর। অথচ হজরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) ছিলেন সবচেয়ে বড় কারি। যেমন হাদিস[২] দ্বারা প্রমাণিত। প্রকাশ থাকে যে, এখানে হজরত আবু বকর (রা.)-কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিলো। এজন্য হজরত আবু সায়িদ খুদরি (রা.) বলেন,

وكان ابو بكر هو اعلمنا[৩]। 'আবু বকর ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম।'

বড় কারিকে যদি প্রাধান্য দেওয়া উত্তম হতো, তাহলে রাসূল ﷺ ইমাম বানাতেন উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-কে।

এ হাদিসটির ব্যাখ্যা সাধারণত এই করা হয় যে, সাহাবি যুগে বড় আলেম ও বড় কারিতে কোনো পার্থক্য ছিলো না। জিনি বড় কারি ছিলেন তিনি বড় আলেমও। যেনো বড় কারি ও বড় আলিমের মাঝে সমতার সম্পর্ক। কিন্তু কয়েকটি কারণে এ জবাব সঠিক না।

* হজরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কারি সাহাবি তাদেরকেই বলা হতো যারা কোরআনে কারিমের হাফেজ হতেন। যেমন যারা বীরে মা'উনার যুদ্ধে এবং ইয়ামামার যুদ্ধে শহিদ হয়েছিলেন তাদের ক্ষেত্রে قراء শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।[৪]

দ্বিতীয়তো প্রশ্ন হয় যে, বড় কারি দ্বারা যদি বড় আলেম উদ্দেশ্য, তাহলে اقرأهم ابى بن كعب-এর অর্থ হবে হজরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) ছিলেন সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম। এটা ইজমার বিপরীত।

তৃতীয়তো আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে সবচেয়ে বড় কারি (اقرء) ও সবচেয়ে বড় আলেম (اعلم) স্পষ্টভাবে আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যা এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, বড় কারি দ্বারা বড় আলেম উদ্দেশ্য নয়।

সুতরাং বিশুদ্ধ বক্তব্য হলো, ইসলামের শুরু দিকে যখন কোরআনের হাফেজ ও কারির সংখ্যা ছিলো কম এবং প্রতিটি ব্যক্তির এতোটুকু পরিমাণ কোরআনের আয়াত মুখস্থ ছিলো না, যাদ্বারা মাসনুন কেরাতের হক আদায় হয়,

---

টীকা. ১. বোখারি : ১/৯৩, باب اهل العلم والفضل احق بالامامة। এ মাসয়ালায় ইমাম বোখারি (র.)-এর মাজহাবও হানাফিদের মতো। যেমন ওপরযুক্ত শিরোনামও এর প্রমাণ পেশ করেছেন।

টীকা. ২. আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, আবু বকর আমার উম্মতের প্রতি তাদের মধ্যে সবচেয়ে দয়ালু।। আল্লাহর হুকুমের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কঠোরতর উমর। সবচেয়ে বেশি লাজুক উসমান ইবনে আফফান। হালার হারাম সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারি মুয়াজ ইবনে জাবাল। ফারায়েজ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানের অধিকারি জায়দ ইবনে সাবেত। সবচেয়ে বড় কারি উবাই ইবনে কা'ব ....। তিরমিযী ২/২৪৩, كتاب المناقب باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن بن ثابت وابى (رضـ) بن كعب وابو عبيدة بن الجراح - مرتب عفى عنه

টীকা. ৩. বোখারি : ১/৫১৬, كتاب المناقب باب قول النبى صلى الله عليه وسلم سدر الابواب الا باب ابى بكر

টীকা. ৪. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলে আকরাম ﷺ কোনো প্রয়োজনে একদল লোককে পাঠিয়ে ছিলেন, তাদেরকে বলা হতো কুররা। তাদের উপরে চড়াও হলো বীরে মা'উনার নিকট বনি সালিমের দুটি গোত্র 'রি'ল' ও 'জাকওয়ান'। তখন কওমের লোকজন বললো, আল্লাহর কসম, তোমাদের সাথে আমাদের কোনো কাজ নেই। আমরা তোমাদের উদ্দেশ্য করে আসিনি। আমরা শুধু এদিক দিয়ে অতিক্রম করছি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক প্রয়োজনে। তারপর তারা তাদেরকে হত্যো করে।

— বোখারি : ২/৫৫৬ كتاب المغازى باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معوانة الخ

জায়দ ইবনে সাবেত (রা.) বলেন, আবু বকর (রা.) ইয়ামামা বাসীর যুদ্ধকালে আমার নিকট খবর পাঠালেন, আমি দেখলাম, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাঁর নিকট। আবু বকর (রা.) আমাকে বললেন, উমর এসে আমাকে বললেন, ইয়ামামার যুদ্ধে কোরআনের কারিদের ভীষণ ও প্রচুর হত্যাকাণ্ড হয়েছে। আমি বিভিন্ন জায়গায় কারিদের এমন ভীষণ ও প্রচুর হত্যোকাণ্ডের আশংকা করি। তবেতো কোরআনের বিরাট অংশই হাতছাড়া হয়ে যাবে। ....। — বোখারি : ২/৭৪৫, كتاب فضائل القران باب جمع القران - مرتب عافاه الله

তখন হিফজ ও কেরাতের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য ইমামতিতে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিলো বড় কারিকে। পরবর্তীতে যখন কোরআনে কারিম ভালোরূপে প্রচলিত হয়ে গেলো, তখন সবচেয়ে বড় আলেম হওয়াকে ইমামতি উত্তম বা মোস্তাহাব হওয়ার সর্বপ্রথম মানদণ্ড সাব্যস্ত করা হয়। কারণ, নামাজের শুধু একটি রুকন তথা শুধু কেরাতে বড় কারির প্রয়োজন। কিন্তু বড় আলেমের প্রয়োজন নামাজের সবগুলো রুকনে হয়ে থাকে। মোটকথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত রোগে হজরত আবু বকর (রা.)-কে ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছিলো বড় অবিরাম হওয়ার কারণেই। আর যেহেতু এ ঘটনাটি সম্পূর্ণ শেষ কালের, এজন্য এটি সেসব হাদিসের জন্য রহিতকারির মর্যাদা রাখে, বড় কারির প্রাধান্যের বিবরণ যেগুলোতে আছে।

فان كانوا فى السنة سواء فاقدمهم هجرة : ইসলামের প্রাথমিক যুগে যার ওপর ঈমান নির্ভর করতো এ হিজরত দ্বারা তা উদ্দেশ্য। পরবর্তীতে এর ওপর ঈমানের নির্ভরতা রহিত হয়ে যায়। অতএব, বেশি হকদার হওয়ার এ মানদণ্ড এখন খতম হয়ে গেছে। বর্তমানে ফুকাহায়ে কেরাম এর স্থলে সবচেয়ে বেশি পরহেজগারকে রেখেছেন। এ বিষয়টি প্রবল ধারণা মুতাবেক সে হাদিস থেকেই গৃহীত যাতে বলা হয়েছে, المهاجر من هجر ما نهى الله عنه এ হিজরতকেই পরহেজগারি বলা হয়।

ولا يؤم الرجل فى سلطانه : অর্থাৎ, যেখানে কোনো ব্যক্তির মালিকানা অথবা প্রভাব ও ক্ষমতা রয়েছে সে স্থানে তাকে যেনো মুক্তাদি না বানানো হয়। অর্থাৎ, সেখানে তিনিই নামাজ পড়াবেন যেখানে তিনি ইমাম।

ولا يجلس على تكرمته فى بيته الا باذنه : যদি দুটি جمله معطوفه-এরপর কোনো একটি ইস্তিসনা অথবা শর্ত আসে, তবে তাতে মতানৈক্য রয়েছে যে, এর সম্পর্ক দুটি বাক্যের সঙ্গে হবে, না শুধু শেষ বাক্যের সঙ্গে হবে। তাহলে ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মূলনীতি অনুসারে এখানে কোনো প্রশ্ন নেই।

প্রশ্ন : হানাফিদের মূলনীতির ওপর প্রশ্ন হতে পারে যে, الا باذنه ইস্তিসনা শুধু সম্মানিত স্থানে বসার সাথে সম্পৃক্ত হবে, প্রভাবাধীন স্থানে ইমামতের সাথে নয়। হানাফিদের মতে হুকুমের দিক দিয়ে দু'টোই বরকত।

জবাব : এটার জবাব হলো, অনুমতির সাথে প্রভাবাধীন ক্ষেত্রে ইমামতির বৈধতা এ ইস্তিসনার কারণে নয়; বরং এর কারণ মূলত এই যে, আমরা যখন প্রভাবাধীন স্থানে ইমামতি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করলাম তখন এর কারণ ছিলো– এর ফলে আসল ইমাম সাহেবের কষ্ট হবে এবং তাঁর মন ছোট হবে যে, তাঁর থেকে ইমামতি ছিনিয়ে নেওয়া হলো কি-না। কিন্তু তিনি যখন অনুমতি দেবেন তখন সে কারণ থাকে না, তাই ইমামতি বৈধ।

بَابُ مَاجَاءَ اِذَا اَمَّ اَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ (صـ ٥٥)

অনুচ্ছেদ- ৬১ : যদি লোকজনের ইমামতি করো তাহলে নামাজ সংক্ষেপ করবে (মতন ৫৫)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَمَّ اَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الصَّغِيْرَ (فى ن ب "الكبير") وَالضَّعِيْفَ وَالْمَرِيْضَ فَاِذَا صَلّٰى وَحْدَهٗ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ ـ

২৩৬. **অর্থ** : আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন লোকজনের ইমামতি করবে তখন যেনো সে অবশ্যই নামাজ সংক্ষেপ করে। কেনোনা, জামাতের মধ্যে যখন ছোট, দুর্বল এবং রোগাক্রান্ত মানুষ রয়েছে। তারপর একাকি যখন নামাজ পড়বে তখন যেনো নিজের ইচ্ছেমতো নামাজ পড়ে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আদি ইবনে হাতেম, জাবের, আনাস, জাবের ইবনে সামুরা, মালেক ইবনে আবদুল্লাহ, আবু ওয়াকিদ, উসমান ইবনে আবু আস, আবু মাসউদ, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ও ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তারা দুর্বল, বয়স্ক ও রোগাক্রান্তদের কষ্টের আশংকায় ইমামের নামাজ দীর্ঘায়িত না করার বিষয়টিকে পছন্দ করেছেন। আবুজ জিনাদের নাম হলো, আবদুল্লাহ ইবনে জাকওয়ান। আ'রাজ হলেন, আব্দুর রহমান ইবনে হুরমুজ আল-মাদিনি। তাঁর উপনাম আবু দাউদ।

عن انس (رض) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخف الناس صلوة فى تمام - وهذا حديث حسن صحيح -

২৩৭. অর্থ : আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন পূর্ণাঙ্গভাবে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত নামাজ আদায়কারি। এ হাদিসটি حسن صحيح।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

اذا ام احدكم الناس فليخفف : শাহ সাহেব (র.) বলেন, নামাজ সহজ করার সম্পর্ক শুধু কেরাতের সাথে অন্য আরকান আদায়ের সাথে নয়। অতএব, রুকু সেজদায় তিনের অধিক তাসবিহ পড়া মাকরূহ ব্যতিত জায়েজ। কারণ, রাসূল ﷺ থেকে দশ তাসবিহ পরিমাণ রুকু এবং সেজদাতে প্রমাণিত আছে। তাছাড়া কেরাত সহজ করার অর্থ হলো, প্রতিটি নামাজে মাসনুন পরিমাণ (কেরাত) থেকে বাড়বে না। অতএব, ফজরে তিওয়ালে মুফাস্সাল পড়া সহজ করার পরিপন্থি নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, সুরের খাতিরে কেরাতকে বেশি দেরি করা সহজ করার বিপরীত।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ تَحْرِيْمِ الصَّلٰوةِ وَتَحْلِيْلِهَا (ص ٥٥)

অনুচ্ছেদ- ৬২ : নামাজের বাইরের কাজ হারাম ও হালাল করা (মতন ৫৫)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا اَلتَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا اَلتَّسْلِيْمُ - وَلَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَءْ بِالْحَمْدِ وَسُوْرَةً فِىْ فَرِيْضَةٍ فِىْ فَرِيْضَةٍ اَوْ غَيْرِهَا -

২৩৮. অর্থ : আবু সাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নামাজের চাবি হলো পবিত্রতা। (নামাজ বিরোধী কাজ) হারাম করার মাধ্যম হলো তাকবির। আর (নামাজ বিরোধী কাজ) হালাল করার মাধ্যম হলো সালাম দেওয়া। যে সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা ফরজ নামাজের মধ্যে অথবা অন্য কোনো নামাজে পাঠ না করবে, তার নামাজ আদায় হবে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত আলি ও আয়েশা (রা.) থেকেও এই অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। আলি ইবনে আবু তালেব (রা.)-এর হাদিসটি সনদগতভাবে সর্বোত্তম এবং আবু সায়িদ (রা.)-এর হাদিস অপেক্ষা বিশুদ্ধতম। এটা আমরা

ওজু পর্বের শুরুতে লিপিবদ্ধ করেছি। সাহাবি ও তৎপরবর্তী আলেমদের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। সুফিয়ান সাওরি, ইবনুল মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক (র.) এ মতই পোষণ করেন যে, নামাজ পরিপন্থি কাজ হারাম করার মাধ্যম হলো তাকবির। কেউ তাকবির ব্যতিত নামাজে শামিল হতে পারে না।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আবানকে আমি বলতে শুনেছি, (তিনি বলেছেন,) আমি আব্দুর রহমান ইবনে মাহদিকে বলতে শুনেছি, কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম দিয়ে নামাজ শুরু করে কিন্তু তাকবির না বলে, তবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে না। আর যদি সে সালাম দেওয়ার পূর্বে অপবিত্র হয়ে যায় তবে আমি তাকে নির্দেশ দেবো ওজু করে তার স্থানে ফিরে এসে সে যেনো সালাম দেয়– এ বিষয়টি যথার্থ অর্থেই আছে। মুনজির ইবনে মালেক ইবনে কুতাআহ হলো, আবু নায়রার নাম।

দরসে তিরমিযী

و تحريمها التكبير : নামাজ শুরু করার জন্য তাকবির অথবা অন্য কোনো জিকির জরুরি নয়; বরং শুধু নিয়ত দ্বারা নামাজ শুরু করা যায়। এটা হজরত সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব (র.) ও হজরত হাসান বসরি (র.)-এর মাজহাব। কিন্তু শুধু নিয়ত দ্বারা জমহুরের মতে শুরু হতে পারে না; বরং জিকির জরুরি। এ মাসআলাতে আলোচ্য অধ্যায়ে হাদিসটি প্রথম মাজহাবের পরিপন্থি জমহুরের দলিল।

ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য বোঝা যায় এমন যে কোনো জিকির দ্বারা তাহরিমার ফরজ আদায় হয়ে যায়। যেমন ব্যবহার করলো الله اجل অথবা الله اعظم শব্দ, তাহলে তার নামাজের ফরজ আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু ওয়াজিব হবে দ্বিতীয়বার নামাজ আদায় করা।

ইমামত্রয় এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.) তাকবির ফরজ হওয়ার প্রবক্তা। তাঁদের মতে সৃষ্টিকর্তার তা'জিম সংক্রান্ত অন্য কোনো শব্দ এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না।

তাকবিরের শব্দ নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

১. ইমাম মালেক (র.)-এর মতে তাকবিরের শব্দ শুধু الله اكبر।

২. الله الاكبر-কেও অন্তর্ভুক্ত করেন ইমাম শাফেয়ি (র.)।

৩. ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এ দুটোর সাথে الله الكبر-কেও অন্তর্ভুক্ত করেন।

তাকবিরের শব্দ ফরজ হওয়ার ওপর তাঁরা আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের অংশ تحريمها التكبير দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন যে, এতে খবরটি معرف باللام তথা হসর বা সীমাবদ্ধতা বোঝায়। এর দ্বারা বোঝা গেলো, তাহরিমা তাকবিরের মধ্যেই সীমিত। যেমন مفتاح الصلوة পবিত্রতায় আবদ্ধ।

* এ মতপার্থক্য একটি মৌলিক মতানৈক্যের ওপর নির্ভরশীল। সেটি হচ্ছে ইমামত্রয়ের মতে ফরজ, আর ওয়াজিবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ফরজ ও সুন্নতের মাঝে আদিষ্ট বিষয়ের অন্য কোনো স্তর নেই। এ জন্য তাঁরা খবরে ওয়াহেদ দ্বারাও ফরজ সাব্যস্ত করার প্রবক্তা। এর পরিপন্থি হানাফিদের মতে ফরজ এমন আদিষ্ট বিষয়ের নাম যা কোনো قطعى الثبوت (অকাট্যভাবে প্রমাণিত) নস দ্বারা قطعى الدلالة (অকাট্য অর্থ) পদ্ধতিতে প্রমাণিত হয়। যদি কোনো আদিষ্ট বিষয় قطعى الثبوت বা قطعى الدلالة না হয় তবে এর দ্বারা ফরজ প্রমাণিত হয় না; বরং ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। এ কারণে আলোচ্য মাসআলায়ও হানাফিদের প্রমাণ কোরআনের আয়াত وذكر اسم ربه فصلى (তার প্রভুর নাম উচ্চারণ করেছে, তারপর সালাত আদায় করেছে।)

এতে সাধারণভাবে আল্লাহ তা'আলার নামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাকবিরের শব্দের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। আর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের শব্দে তাকবিরের শব্দ খাস করা হয়েছে। এটি খবরে ওয়াহেদ হওয়ার কারণে قطعی الثبوت (অকাট্যভাবে প্রমাণিত) নয়। অতএব, এর দ্বারা ওয়াজিব প্রমাণিত হবে ফরজ প্রমাণিত হবে না।

এ মৌলিক মতপার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্মরণ রাখা উচিত যে, এ এখতেলাফ চিন্তাগত। আমলিভাবে উভয় মাজহাবে স্পষ্ট কোনো পার্থক্য নেই। কারণ, তাকবিরের শব্দ ছেড়ে দিলে নামাজ উভয় দলের মতে দোহরানো ওয়াজিব থেকে যায়। পার্থক্য শুধু এতোটুকু যে, ইমামত্রয়ের মতে এমতাবস্থায়ও ফরজও আদায় হয় না। অতএব, তাদের মতে এমন ব্যক্তিকে যে তাকবিরের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে নামাজ দোহরাবে না তাকে নামাজ তরককারি বলা যাবে। এর খেলাফ হানাফিদের মতে এমন ব্যক্তিকে ওয়াজিব তরককারি গোনাহগার তো বলবে কিন্তু ব্যাপক নামাজ তরককারি করা যাবে না।

وتحليلها التسليم : যেরূপ ইখতিলাফ তাকবিরের শব্দে সালামের শব্দের মধ্যেও অনুরূপ।

নামাজ থেকে বের হওয়ার জন্য সালামের শব্দ তথা السلام عليكم ফরজ। অতএব যদি কোনো ব্যক্তি সালাম ব্যতিত অন্য কোনো পদ্ধতিতে নামাজ শেষ করে তাহলে তার নামাজ হয় না ইমামত্রয় ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে।

২. ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে মুসল্লির কর্ম দ্বারা নামাজ থেকে বের হওয়া শুধু ফরজ সালামের শব্দ সম্পর্কে মাশায়িখে হানাফিয়ার দুটি বর্ণনা আছে। ইমাম তাহাবি (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এটি সুন্নত আর শায়খ ইবনে হুমাম (র.) বলেন ওয়াজিব। দ্বিতীয় বক্তব্যটি প্রধান এবং পছন্দনীয়। অতএব যে ব্যক্তি সালামের শব্দ ব্যতীত অন্য কোনো পদ্ধতিতে নামাজ থেকে বের হয়ে যায় তার ফরজ তো আদায় হয়ে যায়, দোহরানো কিন্তু ওয়াজিব থেকে যায়।

* এ অনুচ্ছেদের হাদিসের বাক্য تحليلها التسليم ইমামত্রয়ের দলিল। কারণ, এতে খবর معرف باللام হওয়ার কারণে হসর বা সীমাবদ্ধতা বোঝায়। যার সারনির্যাস হলো, নামাজ থেকে হালাল হওয়া তাসলিমের শব্দের সাথে বিশেষিত। হানাফিদের অবস্থান এখানেও সেটাই যে, এটি খবরে ওয়াহেদ, যা দ্বারা ওয়াজিব প্রমাণিত হতে পারে, ফরজ নয়। তাছাড়া হানাফিগণ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সে ঘটনা দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেন, যাতে প্রিয়নবী ﷺ তাকে তাশাহহুদের তা'লিম দিয়ে এরশাদ করেছেন,

اذا قلت هذا او قضيت هذا فقد قضيت صلوتك ـ ان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فاقعد [১] ـ

'তুমি যখন তা বলবে অথবা তা আদায় করবে তুমি তখন তোমার নামাজ আদায় করে ফেললে। এবার দাঁড়াতে চাইলে দাঁড়াও আর বসতে চাইলে বসো।'

এ থেকে জানা গেলো যে, তাশাহহুদ পরিমাণ বসার পর অন্য কোনো ফরজ নেই। অবশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দায়েমি আমল এবং আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের শব্দ দ্বারা ওয়াজিব অবশ্যই বোঝা যায়। আমরাও এটার সমর্থক।

টীকা. ১. সুনানে আবু দাউদ : ১/১৩৯, বাবুত্ তাশাহহুদ।

بَابُ فِىْ نَشْرِ الْاَصَابِعِ عِنْدَ التَّكْبِيْرِ (ص ٥٦)

অনুচ্ছেদ- ৬৩ : তাকবির বলার সময় আঙুল সোজা করে ছড়িয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে (মতন ৫৬)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَبَّرَ لِلصَّلٰوةِ نَشَرَ اَصَابِعَهٗ ـ

২৩৯. অর্থ : আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজে তাকবির বলতেন, তখন আঙুলগুলো সোজা করে ছড়িয়ে দিতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আবু হুরায়রার হাদিসটি একাধিক ব্যক্তি ইবনে আবু জি'ব-সায়িদ ইবনে সিম'আন-আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজে প্রবেশ করতেন তখন হস্তদ্বয় ছড়িয়ে উত্তোলন করতেন। এটি ইয়াহইয়া ইবনুল ইয়ামানের বর্ণনা অপেক্ষা বিশুদ্ধতম। এ হাদিসে ইবনে ইয়ামান ভুল করেছেন।

عن سعيد بن سمعان قال سمعت ابا هديرة (رض) يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلوة رفع يديه مدا ـ

২৪০. অর্থ : সায়িদ ইবনে সিমআন বলেছেন, আমি আবু হুরায়রা (রা.)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজে দাঁড়াতেন তখন দু'হাত ছড়িয়ে উত্তোলন করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আবদুল্লাহ বলেছেন, এটি ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামানের হাদিস অপেক্ষা বিশুদ্ধতম। আর ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামানের হাদিসটি ভুল।

দরসে তিরমিযী

اذا كبر للصلوة نشر اصابعه : হজরত গাঙ্গুহি (র.) বলেন, নশরের দু' অর্থ– এক. কবজের উল্টো। অর্থাৎ, আঙুলগুলোকে সোজা রাখা। যেটি মোড়ানোর পরিপন্থি। আর দ্বিতীয় অর্থ হলো, মেলানোর বিপরীত অর্থাৎ, দুই আঙুলের মাঝে ব্যবধান রাখা মানে মিলানোর বিপরীত। এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য। অতএব, ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন যে, সেজদার সময় আঙুলগুলোকে মিলিয়ে রাখা এবং রুকুতে এগুলোর মাঝে ব্যবধান রাখা মাসনুন, আর অন্য সময়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে রাখা উচিত– এটা এ হাদিসের বিপরীত এটা নয়।

كان اذا دخل فى الصلوة رفع يديه مدا اى مادا يديه : এটা নশরের প্রথম অর্থ অনুযায়ী।

واخطأ ابن يمان فى هذا الحديث : ইমাম তিরমিযী (র.)-এর এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য যদি সনদের দুর্বলতা হয়ে থাকে তবে তাঁর বক্তব্য ঠিক হতে পারে যে, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামান থেকে ভুল হয়েছে এটা আমাদের ওলামাদের বক্তব্য। কারণ, সনদে রাবিদের সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য প্রমাণ। কিন্তু এখানে মনে হয় যে, সম্ভবত এ স্থানে ইমাম তিরমিযী (র.) ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামানের ভুল ধরেছেন সনদের ভিত্তিতে নয়; বরং মতনের ভিত্তিতে। কারণ তিনি ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামানের বর্ণনা– عن ابى هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر

للصلوة نشر اصابعه 'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজের তাকবির বলতেন তখন আঙুলগুলো খুলে ফেলতেন।' এবং উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মাজিদের বর্ণনা– سمعت ابا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الى الصلوة رفع يديه مدا[১] -এর অর্থে বিরোধ বুঝেছেন এবং বলেছেন যে, দ্বিতীয় বর্ণনাটি সহিহ আর প্রথমটি ভুল এবং ব্যাপারটি আসলে এটি। অতএব, ইমাম তিরমিযী (র.)-এর প্রশ্ন ঠিক নয়। কারণ, نشر -এর এক অর্থ মদ্দের হুবহু মুতাবেক। আর ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি نشر -এর প্রকৃত অর্থ ضد القبض সাব্যস্ত করেছেন। অতএব, উভয় প্রকার শব্দের মধ্যে মূলতো কোনো বিরোধ নেই এবং না ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামানের হাদিসকে ভুল সাব্যস্ত করার কোনো প্রয়োজন আছে।

بَابٌ فِىْ فَضْلِ تَكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى (ص ٥٦)

অনুচ্ছেদ- ৬৪ : তাকবিরে উলার ফজিলত (মতন ৫৬)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى لِلّٰهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِىْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْاُوْلٰى كُتِبَ لَهٗ بَرَاَتَانِ بَرَائَةٌ مِّنَ النَّارِ وَبَرَائَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ -

২৪১. **অর্থ :** আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে চল্লিশ দিন জামাতে তাকবিরে উলা সহ নামাজ আদায় করে তার জন্য লেখা হয় দুটি মুক্তি, জাহান্নাম ও মুনাফেকি থেকে মুক্তি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি আনাস (রা.) থেকে মওকুফ আকারে বর্ণিত হয়েছে। আল্‌ম ইবনে কুতায়বা তু'মা ইবনে আমর সূত্রে বর্ণিত হাদিস ব্যতিত আর কেউ এটাকে মারফু আকারে বর্ণনা করেছেন বলে আমি জানি না। হাবিব ইবনে আবু হাবিব আল-বাজালি সূত্রে আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে এটা শুধু তাঁর বক্তব্যরূপে বর্ণনা করা হয়। এ হাদিসটি আমাদের বর্ণনা করেছেন হান্নাদ, ওয়াকি'-খালেদ ইবনে তাহমান-হাবিব ইবনে আবু হাবিব আল-বাজালি-আনাস (রা.) তাঁর বক্তব্যরূপে। এটাকে তিনি মারফু আকারে বর্ণনা করেননি। আর ইসমাইল ইবনে আইয়াশ এ হাদিসটি উমারা ইবনে গাজিয়্যাহ-আনাস ইবনে মালেক-উমর ইবনে খাত্তাব সূত্রে নবী করিম ﷺ থেকে এ হাদিসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, এ হাদিসটি তবে সংরক্ষিত নয়। এটি মুরসাল হাদিস। উমারা ইবনে গাজিয়্যাহ আনাস ইবনে মালেক (রা.)-কে পাননি।

দরসে তিরমিযী

من صلى اربعين يوما فى جماعة يدرك التكبيرة الاولى : ১. অনেকে তাকবিরে উলার প্রয়োগ ইমামের কেরাত আরম্ভ করার পূর্বেকার সময়ের ওপর করেছেন। ২. আর অনেকে তাহরিমার মধ্যে শরিক হওয়ার ওপর। ৩. আর অনেকে রুকুর পূর্বেকার সময়ের ওপর। ৪. আর অনেকে তাকবিরে উলা পাওয়ার বাস্তব মানে প্রথম রাকাত পাওয়া সাব্যস্ত করেছেন। অধিকাংশ ফকিহ ঝুঁকেছেন– এই শেষ বক্তব্যটির দিকে।

كتب له برائة من النار وبرائة من النفاق : জাহান্নাম থেকে মুক্তি দ্বারা যদিও মুনাফেকি থেকে মুক্তি নিজে নিজে বুঝে আসতে পারে; কিন্তু এটাকে আলাদা এজন্য উল্লেখ করেছেন যে, জাহান্নাম থেকে মুক্তির বহিঃপ্রকাশ

টীকা. ১. ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামান এবং উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মাজিদ উভয়ের ওপরযুক্ত বর্ণনাগুলো এ অনুচ্ছেদে ইমাম তিরমিযী (র.) বর্ণনা করেছেন। – সংকলক।

তো হবে পরকালে। মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে এমন ব্যক্তিকে দুনিয়াতেও নিফাক থেকে পবিত্র মনে করে। এ হাদিস থেকেই সুফিয়ায়ে কেরাম চিল্লার উৎস গ্রহণ করেছেন। কারণ, এখানে চল্লিশ দিন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যদিও এ হাদিসটি জয়িফ, কিন্তু অন্য কোনো কোনো হাদিস ও বর্ণনা দ্বারা এতোটুকু অবশ্যই বোঝা যায় যে, চল্লিশ দিনে অভ্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ প্রভাব রেখেছেন। এর মৌলিক বিষয়েরও মূল হলো হজরত মূসা (আ.) কর্তৃক তুর পাহাড়ে (৪০দিন) ইতেকাফ করা।

بَابُ مَايَقُوْلُ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ (صـ ٥٣)

অনুচ্ছেদ- ৬৫ : নামাজ শুরু করার সময় কী বলবে? (মতন ৫৬)

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِ الْخُدْرِیِّ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ بِاللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا ثُمَّ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ ـ

২৪২. অর্থ : আবু সায়িদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাত্রে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের জন্য দাঁড়াতেন তখন তাকবির বলতেন। তারপর সুবহানাকাল্লাহুম্মা .... দু'আটি পড়তেন। অর্থাৎ, আয় আল্লাহ! সকল প্রশংসা পবিত্রতা তোমারই। তোমার নামটি বরকতময়। সুউচ্চ তোমার মর্যাদা। তুমি ব্যতিত আর কোনো মা'বুদ নেই। তারপর বলতেন, আল্লাহু আকবার কাবিরা, তারপর বলতেন, আউজু বিল্লাহিস্ সামিইল আলিম .... তথা, আমি সর্ব শ্রোতা সর্বজ্ঞানী আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি– বিতাড়িত শয়তান থেকে। তার কুমন্ত্রণা থেকে, ফুঁক ও জাদু মন্ত্র থেকে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আলি, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আয়েশা, জাবের, জুবায়র ইবনে মুতয়িম এবং ইবনে উমর (রা.) থেকেও এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে আবু সায়িদ (রা.)-এর হাদিসটি প্রসিদ্ধতম। একদল আলেমও হাদিসটি গ্রহণ করেছেন। আর অধিকাংশ আলেম বলেছেন, নবী করিম ﷺ হতে শুধু বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেন, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك। উমর ইবনে খাত্তাব ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে অনুরূপই বর্ণিত আছে। তাবেয়িন প্রমুখ অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। আবু সায়িদ (রা.)-এর হাদিসটির সনদে রয়েছে আপত্তি। আলি ইবনে আলি সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ (র.) আপত্তি তুলেছেন। আহমদ (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি সহিহ।

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

২৪৩. অর্থ : আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ শুরু করতেন তিনি তখন বলতেন, سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি আমরা এ সূত্র ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে জানি না। হারেসা নামক রাবি সম্পর্কে তাঁর স্মরণশক্তির ব্যাপারে কালাম করা হয়েছে। আবুর রিজালের নাম হলো, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান।

ثم يقول سبحانك اللهم : তাকবির এবং সূরা ফাতেহার মাঝখানে কোনো জিকির মাসনুন নেই; বরং তাকবিরের পর নামাজের শুরু সরাসরি সূরা ফাতেহা দ্বারা হয় ইমাম মালেক (র.)-এর মাজহাব অনুযায়ী। তাদের প্রমাণ তিরমিযী[১] শরিফে বর্ণিত হজরত আনাস (রা.)-এর বর্ণনা,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القرائة بالحمد لله رب العلمين .

'আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন (সূরা ফাতেহা) দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর, উমর এবং উসমান (রা.) কেরাত শুরু করতেন।' কিন্তু জমহুরের মতে কোনো না কোনো তাকবির এবং ফাতিহার মাঝখানে জিকির মাসনুন। ইমাম মালেক (র.)-এর প্রমাণের জবাব এ দেওয়া হয় যে, তাঁর দলিল হাদিসে ইফতিতাহ দ্বারা জাহরি (উচ্চৈঃস্বরে) কেরাত শুরু করা উদ্দেশ্য। সুতরাং আস্তে কেরাত এর বিপরীত নয়।

* এতে মতপার্থক্য রয়েছে যে, কোন জিকির তাকবির এবং সূরা ফাতেহার মাঝে উত্তম। শাফেয়িদের মতে তাওজিহ তথা– اني وجهت وجهي للذى فطر السموات والارض الخ পড়া উত্তম। আর হানাফিদের মতে ছানা উত্তম।

এ অনুচ্ছেদে ছানা প্রমাণের জন্য আবু ঈসা তিরমিযী (র.) হজরত আবু সায়িদ খুদরি এবং হজরত আয়েশা (রা.)-এর দুটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ দুটি হাদিস সনদগতভাবে প্রশ্নসাপেক্ষ। অবশ্য এ অনুচ্ছেদে হজরত আনাস ইবনে মালেক (র.) -এর হাদিস বিশুদ্ধ।

قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلوة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك [٢] .

হজরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, ইমাম শাফেয়ি (র.) স্বীয় মাজহাবের ওপর কোরআনে কারিমের সূরা আনআমের আয়াতের সহায়তা নিয়েছেন। তাতে هذا اكبر -এর পর اني وجهت وجهي للذى فطر السموات الارض الخ উল্লিখিত হয়েছে। (তাছাড়া অন্য কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন।)[৩] ইমাম আবু হানিফা (র.) সূরা তুরের সে আয়াতের সহযোগিতা নিয়েছেন, যাতে বলা হয়েছে,

و سبح بحمد ربك حين تقوم الخ 'যখন তুমি দাঁড়াও তখন বর্ণনা করো তোমার প্রভুর প্রশংসা পবিত্রতা।'

وبحمدك এখানে واو অতিরিক্ত। بحمدك শব্দটি ملتبسا -এর সঙ্গে متعلق হয়ে উহ্য ফেল اسبح -এর জমিরে ফায়েল থেকে হাল। অথবা واو আতফের জন্য। আর উহ্য ইবারত হলো, ونحمد بحمدك এমতাবস্থায় ب হবে অতিরিক্ত।

টীকা. ১. তিরমিযী : ১/৫, باب فى افتتاح القرائة بالحمد لله رب العالمين

টীকা. ২. আছারুস্ সুনান : ৭২, باب ما يقرأ بعد تكبير الإحرام এ হাদিসটি উল্লেখ করার পর আল্লামা নিমবি (র.) বলেন, এটি ইমাম তাবারানি তাঁর কিতাব 'আল-মুফরাদ ফিদ্ দোয়াতে বর্ণনা করেছেন। এর সনদ উত্তম। এরপর আল্লামা নিমবি (র.) তাহাবি এবং দারাকুতনির বরাতে সহিহ সনদে দুটি আছর উল্লেখ করেছেন যেগুলোতে হজরত উমর ফারুক এবং হজরত উসমান গনি (রা.) সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, নামাজ শুরু করার সময় তারা ছানা পড়তেন। –সংকলক।

টীকা. ৩. দ্রষ্টব্য : আছারুস্ সুনান : ৭১-৭২, باب ما يقرأ بعد تكبير الإحرام

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ تَرْكِ الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (٥٧)

অনুচ্ছেদ- ৬৬ : বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আওয়াজ দিয়ে না পড়া প্রসঙ্গে (মতন ৫৭)

ابن عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (رضـ) قَالَ سَمِعَنِىْ اَبِىْ وَاَنَا فِى الصَّلٰوةِ اَقُوْلُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَقَالَ لِىْ اَىْ بُنَىَّ! مُحْدَثٌ. اِيَّاكَ وَالْحَدَثَ. قَالَ وَلَمْ اَرَ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ اَبْغَضَ اِلَيْهِ الْحَدَثُ فِى الْاِسْلَامِ يَعْنِىْ مِنْهُ. وَقَالَ وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ (رضـ) فَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا مِنْهُمْ يَقُوْلُهَا فَلَا تَقُلْهَا اِذَا اَنْتَ صَلَّيْتَ فَقُلْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

২৪৪. অর্থ : ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা.) বলেন, আমার পিতা আমাকে নামাজে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বলতে শুনেছেন। তাই তিনি আমাকে বললেন, প্রিয় বৎস! এটাতো বিদআত। নিজেকে বিদআত থেকে বাঁচিয়ে রেখো। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামের মধ্য থেকে ইসলামে বিদআতের প্রতি অধিক বিদ্বেষপূর্ণ আর কাউকে দেখিনি অর্থাৎ, আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা.) অপেক্ষা। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর, উমর ও উসমান (রা.)-এর সাথে নামাজ পড়েছি। কিন্তু তাঁদের কাউকে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বলতে শুনিনি। অতএব, তুমি তা বলো না, তুমি যখন নামাজ পড়ো তখন বলো, আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামিন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা.)-এর হাদিসটি হাসান। অধিকাংশ সাহাবি ও তাবেয়িগণের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। সাহাবিগণের মধ্যে রয়েছেন আবু বকর, উমর, উসমান ও আলি (রা.) প্রমুখ। এ মতই পোষণ করেন সুফিয়ান সাওরি, ইবনে মুবারক, আহমদ ও ইসহাক (র.)। তাঁরা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম উচ্চৈঃস্বরে পড়ার প্রবক্তা নন।

দরসে তিরমিযী

* সেসব মহা বিতর্কিত মাসায়িলের অন্তর্ভুক্ত بسم الله الرحمن الرحيم জোরে পড়ার বিষয়টি, যেগুলোতে এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মৌখিক এবং কলমি বিতর্কের বাজার গরম ছিলো। বিভিন্ন ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম দারাকুতনি এবং খতিব বাগদাদির পুস্তিকাগুলোও অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো শাফেয়িদের মুখপত্র হিসেবে রচিত হয়েছিলো। হানাফিদের মধ্য হতে এ বিষয়ে সবচেয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন হাফেজ জামালুদ্দিন জায়লায়ি (র.)। তিনি 'নসবুর রায়া'য় এ মাসআলার ওপর প্রায় সাতশত পৃষ্ঠা লিখেছেন এবং নিজ সাধারণ রীতি পরিপন্থি অত্যন্ত জোশ ও স্বতঃস্ফূর্ততার বহি:প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এসব বিতর্ক সত্ত্বেও বাস্তবতা হলো بسم الله الرحمن الرحيم জোরে ও আস্তে পড়ার মাসআলায় মতপার্থক্য বরং উত্তম-অনুত্তমের, বৈধতা-অবৈধতার নয়।

সংক্ষিপ্তাকারে মাজহাবের বিবরণ

এ মাসআলায় ইমাম মালেক (র.)-এর মতে بسم الله الرحمن الرحيم একেবারে বিধিবদ্ধই নয়, না জোরে না আস্তে। ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মতে বিসমিল্লাহ মাসনুন। জোরে কেরাত বিশিষ্ট নামাজে জোরে, আর আস্তে

কেরাত বিশিষ্ট নামাজে আস্তে পড়তে হবে। বিসমিল্লাহ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর মতেও মাসনুন। তবে সর্বাবস্থায় এটাকে আস্তে পড়া উত্তম, চাই জোরে নামাজ বিশিষ্ট হোক অথবা আস্তে। এ মাসআলাতে কোনো কোনো আহলে জাহের যেমন ইবনে তাইমিয়্যাহ ও ইবনে কাইয়িম (র.) তাঁরাও হানাফিদের সঙ্গে কোনো কোনো মুহাক্কিক শাফেয়িও এ মাসআলায়।

বিভিন্ন মাজহাবের দলিলগুলো

আলোচ্য অধ্যায়ে বর্ণিত হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা.)-এর হাদিস ইমাম মালেক (র.)-এর প্রমাণ যাতে তিনি তাঁর ছেলেকে বিসমিল্লাহ পড়তে নিষেধ করেছেন এবং এটাকে বিদআত সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন,

وقد صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم ومع ابى بكر و عمر و عثمان فلم اسمع احدا منهم يقولها فلا تقلها اذا انت صليت فقل الحمد لله رب العالمين ـ

এছাড়া ـ باب افتتاح القرائة بالحمد لله رب العلمين -এর অধীনে হজরত আনাস (রা.) এর হাদিস আসছে,

قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر و عمر و عثمان (رضـ) يفتتحون القرائة بالحمد لله رب العلمين ـ

এ দুটি হাদিসের জবাব হানাফিদের পক্ষ থেকে এ দেওয়া হয় যে, এখানে সাধারণ বিসমিল্লাহ নয়, বরং না করা হয়েছে জোরে বিসমিল্লাহ পড়ার কথা। যার প্রমাণ হচ্ছে, এ অনুচ্ছেদের হাদিসেই আছে আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা.)-এর ছেলে বলেন,

سمعنى ابى وانا فى الصلوة اقول بسم الله الرحمن الرحيم ـ

এ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি জোরে বিসমিল্লাহ পড়ছিলেন। এর ফলে আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা.) বলেন,

اى بنى! محدث اياك والحدث ولم ار احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابغض اليه الحدث فى الإسلام ـ

আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা.) যেনো বিসমিল্লাহর বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছেন। অতএব, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে فلا تقلها শব্দটিকে প্রয়োগ করা হয়েছে فلا تجهر بها -এর অর্থে। এর প্রমাণ হলো, এ বর্ণনায় কোনো কোনো সূত্রে قول (বলা)-এর পরিবর্তে جهر (জোরে বলা) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন হাফেজ জায়লায়ি (র.) 'নসবুর রায়া'তে এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তাছাড়া فلا تقلها শব্দটিকে فلا تجهر بها-এর অর্থে গ্রহণ করা হবে এজন্য যে, সাধারণ বিসমিল্লাহ অন্যান্য বহু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। বিস্তারিত বিবরণ পরে আসছে।

ইমাম শাফেয়ি (র.) বিসমিল্লাহ জোরে পড়ার সহায়তায় অনেক বর্ণনা পেশ করেছেন। কিন্তু এগুলোর মধ্য হতে কোনো বর্ণনা এমন নেই যেগুলো সহিহও এবং স্পষ্টও। এর জন্য হাফেজ জায়লায়ি (র.) 'নসবুর রায়া'তে তাঁর সমস্ত প্রমাণাদির বিস্তারিত রদ করেছেন। এখানে পুরো আলোচনার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু শাফেয়িদের গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণাদি এবং এগুলোর ওপর পর্যালোচনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো,

১. ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর সবচেয়ে মজবুত প্রমাণ যার ওপর হাফেজ ইবনে হাজার (র.) প্রমুখ নির্ভর করেছেন সেটি হলো 'সুনানে নাসায়িতে'[১] উল্লিখিত হজরত নুআইম আল-মুজমির-এর বর্ণনা। তিনি বলেন,

صليت وراء ابا هريرة (رضـ) فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القران ـ حتى اذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال امين فقال الناس امين ـ ويقول كلما سجد الله اكبر و اذا قام من الجلوس فى الاثنتين قال الله اكبر ـ واذا سلم قال والذى نفسى بيده انى لا شبهكم صلوة برسول الله صلى الله عليه وسلم ـ

আমি আবু হুরায়রা (রা.)-এর পেছনে নামাজ পড়েছি। তিনি পড়েছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তারপর সূরা ফাতেহা শুরু থেকে ولا الضالين পর্যন্ত পড়েছেন। তারপর আমিন বলেছেন। তারপর লোকজনও আমিন বলেছেন। যখনই সেজদা করেছেন তখনই আল্লাহু আকবার বলেছেন এবং যখনই বসা থেকে উঠেছেন, উভয় রাকাতে বলেছেন, আল্লাহু আকবার। আর যখন সালাম ফিরিয়েছেন, তখন বলেছেন, তাঁর শপথ যাঁর হাতে আমার আত্মা। তোমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজের অধিক সামঞ্জস্যশীল আমি।'

এই বর্ণনার জবাব দিতে গিয়ে হাফেজ জায়লায়ি (র.) বলেন, প্রথমতো এ বর্ণনাটি শাজ এবং মা'লুল। কারণ, হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর কয়েকজন শিষ্য এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শুধু নুআইম আল-মুজমির ব্যতিত কেউ বিসমিল্লাহ পাঠের এ বাক্য বর্ণনা করেন না। যদি মেনে নিই এটা নির্ভরযোগ্য, তবুও এ বর্ণনাটি শাফেয়িদের মাজহাবের ব্যাপারে স্পষ্ট নয়। কারণ, কেরাত শব্দ দ্বারা শুধু বিসমিল্লাহ পড়া প্রমাণিত হয়, জোরে পড়া নয়। কারণ, কেরাত শব্দটিতে আস্তে পড়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব শাফেয়িদের প্রমাণ বর্ণনা দ্বারা পূর্ণাঙ্গ নয়।

২. শাফেয়িদের দ্বিতীয় প্রমাণ সুনানে 'দারাকুতনিতে'[২] বর্ণিত হজরত মু'আবিয়া (রা.)-এর ঘটনা। যেটি বর্ণনা করেছেন হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)।

قال صلى معاوية بالمدينة صلوة فجهر فيها بالقرائة فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لام القران ولم يقرأ للسورة التى بعدها ولم يكبر حين يهوى حتى قضى تلك الصلوة ـ فلما سلم ناداه من سمع ذلك من فلم يصل بعد ذلك الا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا القران وللسورة التى بعدها وكبر حين يهوى ساجدا (قال الدار قطنى) كلهم (اى رواته) ثقات ـ

'তিনি বলেছেন, একবার হজরত মু'আবিয়া (রা.) মদিনা মুনাওয়ারায় নামাজ আদায় করেছিলেন। তাতে তিনি জোড়ে কেরাত পড়েছেন। তিনি সূরা ফাতেহার জন্য বিসমিল্লাহ পড়েননি। এমনভাবে তার পরবর্তী সূরার জন্যও তা পাঠ করেননি। নীচের দিকে অবতরণের সময় তাকবিরও বলেননি। এভাবে পুরো নামাজ সমাপ্ত করেছেন। তিনি যখন সালাম ফিরালেন, তখন মুহাজির এবং আনসার শ্রোতাগণ সর্বদিক থেকে তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন, হে মু'আবিয়া আপনি কি নামাজে চুরি করেছেন, না ভুলে গেছেন? বর্ণনাকারি বলেছেন, তারপর তিনি যে কোনো নামাজ পড়েছেন, প্রত্যেকটিতে সূরা ফাতেহা ও তৎপরবর্তী সূরার জন্য বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পড়েছেন। তাকবির বলেছেন সেজদার দিকে অবতরণ করার সময়।

দারাকুতনি বলেছেন, এ হাদিসের সমস্ত বর্ণনাকারি নির্ভরযোগ্য।'

টীকা- ১. ১/১৪৪, كتاب الإفتتاح، قراءة بسم الله الرحمن الرحيم

টীকা- ২. ১/৩১১, باب وجوب قرائة بسم الله الرحمن الرحيم فى الصلوة والجهر بها واختلاف الروايات فى ذلك ـ

এই বর্ণনাটি ইমাম হাকিম (র.)-ও বর্ণনা করেছেন[১] এবং এরপর বলেছেন هذا حديث صحيح على شرط المسلم। এবং খতিব (র.) বলেন– هو اجود ما يعتمد فى هذا الباب

হাফেজ জামালুদ্দিন জায়লায়ি (র.) বলেন[২]– প্রথমতো এ হাদিসটি সনদ ও মতন উভয় দিক দিয়ে মুজতারিব এবং দ্বিতীয়তো কয়েকটি কারণে এ হাদিসটি মা'লুল,

প্রথম কারণ, হজরত আনাস (রা.) থাকতেন বসরায় এবং হজরত মু'আবিয়া (রা.) মদিনায় আগমনের সময় তাঁর মদিনায় আগমন প্রমাণিত নয়।

দ্বিতীয় কারণ, মদিনায় যেসব ওলামায়ে কেরাম হজরত মু'আবিয়া (রা.)-এর ওপর প্রশ্ন করছেন, স্বয়ং তারা ছিলেন বিসমিল্লাহ আস্তে পড়ার প্রবক্তা। তাঁদের একজন সম্পর্কেও বিসমিল্লাহ জোরে পড়ার প্রবক্তা ছিলেন বলে জানা যায়নি। অতএব, তাঁরা জোরে পড়ার দাবি করতে পারেন কিভাবে?

শাফেয়িদের তৃতীয় প্রমাণ– মুস্তাদারাকে হাকেমে হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা,

قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم .

'রাসূলুল্লাহ ﷺ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম জোরে পড়তেন।'

টীকা–১. মুস্তাদরাকে হাকেম : ১/২২৩, حديث الجهر بسم الله الرحمن الرحيم

টীকা-২. হাফেজ জায়লায়ি (রহ.) উক্ত হাদিসটি মুস্তাদরাকে হাকেমের উদ্ধৃতি দিয়ে 'নসবুর-রায়াহ' নামক কিতাবে উল্লেখ করার পর বলেছেন, এ হাদিসের কয়েকটি জবাব। (এক) এ হাদিসের ভিত্তি হলো আবদুল্লাহ ইবনে উসমান ইবনে খাইছামের ওপর। আর আবদুল্লাহ মুসলিমের রাবি হলেও বিতর্কিত। ইবনে আদি ইবনে মাইন (র) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, তার বর্ণিত হাদিসগুলো শক্তিশালী নয়। ইমাম দারাকুতনি (রহ.) বলেন, সে জয়িফ, ওলামায়ে কেরাম তাকে শিথিল সাব্যস্ত করেছেন। ইবনুল মাদিনি (রহ.) বলেন, সে মুনকারুল হাদিস। মোটকথা, তার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অতএব কোনো হাদিসকে আবদুল্লাহ একা বর্ণনা করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তাছাড়া উল্লেখিত হাদিসটির সনদ ও মতন উভয় ক্ষেত্রেই اضطراب দেখা দিয়েছে।

আর اضطراب হওয়াও দুর্বলতার একটি দিক তথা কারণ। কেনোনা এর সনদে ইবনে খাইছাম একবার আবু বকর ইবনে হাফস এর সূত্রে হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। আবার ইসমাইল ইবনে উবাইদ ইবনে রিফাআহর সূত্রে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। আর দুটি বর্ণনা দারাকুতনি (রহ.) তার কিতাবে ১১৭ পৃষ্ঠায়, ইমাম শাফেয়ি (রহ.) কিতাবুল উম্মাহ-এর ১/৯৩ পৃষ্ঠায় এবং বায়হাকি ২/৪৯ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকি কিতাবুল মাআরিফাত এ প্রথম সনদটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এর বর্ণনাকারি ইবনে জুরাইজ বড় মাপের ব্যক্তিত্ব হওয়ার কারণে। আর ইমাম শাফেয়ি (রহ.) দ্বিতীয়টিকে প্রাধান্য দেন। এটিকেও ইবনে খাইছাম বর্ণনা করেছেন। যার সনদ হলো, ইসমাইল ইবনে উবাইদ ইবনে রিফাআহ তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে, এতে দাদার কথা অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন। এ হাদিসটি তার থেকে ইসমাইল ইবনে আইয়াশ বর্ণনা করেছেন। আর তিনি দারাকুতনির মতে এবং প্রথমটি তার ও হাকেমের মতে প্রাধান্য পাবে। আর ইমাম শাফেয়ি (রহ.) এর মতে দ্বিতীয়টি অধিক প্রাধান্য পাবে। আর মতন বা মূল পাঠের اضطراب হলো– তাতে রাবি একবার বলেন, صلي فبدأ بسم الله الرحمن الرحيم لام القران .لم يقدأ بها للسوده التي بعدها যেমন ইতোপূর্বে হাকেমের বর্ণিত বর্ণনায় এবাবে অতিবাহিত হয়েছে। আর কখনো কখনো বলেন, فلم يقرأ بسم الله الدحمن الرحيم حين افتتح القرآن .قدأ بأم الكتاب যেমন, দারাকুতনির বর্ণনায় ইসমাইল ইবনে আইয়াশের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আবার কখনও বলেন, فلم يقدأ بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم لام القرآن .لا للسوره التي بعدها যেমন, দারাকুতনিতে ইবনে জুরাইজের সনদে বর্ণিত বর্ণনায় উল্লেখ আছে। কোনো হাদিসের সনদে এবং মতনে এ ধরণের ইজতিরাব হাদিসকে নিশ্চিতভাবে জয়িফ করে দেয়। কারণ এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এর বর্ণনাকারির সংরক্ষণ তথা স্মৃতিশক্তিতে ত্রুটি আছে। আর হাদিসটির দ্বিতীয় জবাব হলো, সহিহ হাদিসের জন্য শর্ত হলো তা معلل এবং شاذ না হওয়া। অথচ এ হাদিসটি شاذ। নসবুর-রায়াহ ৩৫৪-৩৫৫ (সংকলক)

'নসবুর রায়া'তে[১] হাফেজ জায়লায়ি (র.) এ বর্ণনাটি উল্লেখ করার পর বলেন, قال الحاكم اسناده صحيح و ليس له علة (হাকেম বলেছেন, এর সনদ সহিহ। তাতে কোনো ত্রুটি নেই।)

এই বর্ণনাটির জবাব দিয়েছেন এ যে, এ হাদিসটি জয়িফ। বরং এটি মওজুর কাছাকাছি এবং হাকেম (র.) কর্তৃক এটাকে সহিহ সাব্যস্ত করা হয়েছে তাঁর প্রসিদ্ধ নম্রতার ভিত্তিতে। এজন্য হাফেজ জাহাবি (র.) এ বর্ণনাটিকে জয়িফ বলেছেন। বাস্তবতা হলো, হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর দিকে সম্বোধিত এ বর্ণনাটি সহিহ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কারণ স্বয়ং ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে প্রমাণিত আছে তাঁর এ বক্তব্য,

الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قرائة الأعراب ٢ ـ

'বিসমিল্লাহর রহমানির রহিম জোরে পড়া বেদুইনদের কেরাত।'

শাফেয়িদের একটি প্রমাণ পরবর্তী অনুচ্ছেদে (باب من راى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) -এ হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদিস,

قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يفتح صلوته بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথমতো এর জবাব হলো, স্বয়ং ইমাম তিরমিযী (র.) এ বর্ণনাটি সম্পর্কে বলেছেন, قال ابو عيسى وليس اسناده بذاك (আবু ঈসা বলেছেন, এর সনদটি শক্তিশালী নয়।)

দ্বিতীয়তো জোরে বিসমিল্লাহ পড়ার ব্যাপারে স্পষ্ট বিবরণ এতে নেই। সুতরাং প্রমাণ এর দ্বারা পূর্ণাঙ্গ নয়।

এগুলোই ছিলো শাফেয়িদের মৌলিক প্রমাণাদি যা পূর্বে বর্ণনা করা হলো। খতিব বাগদাদি এবং ইমাম দারেকুতনি (র.) শাফেয়িদের সহায়তায় আরো অনেক বর্ণনা সংকলন করেছেন। কিন্তু 'নসবুর রায়া'তে হাফেজ জায়লায়ি (র.) এগুলোর এক একটিকে দুর্বল অথবা জাল সাব্যস্ত করেছেন। সংক্ষিপ্ত এ যে, শাফেয়িদের প্রমাণ হাদিসগুলো হয়তো বিশুদ্ধ নয় অথবা স্পষ্ট নয়। এজন্য 'নসবুর রায়া'তে[৩] হাফেজ জায়লায়ি (র.) এবং ফাতাওয়াতে আল্লামা ইবনে তায়মিয়া বর্ণনা করেছেন যে, যখন ইমাম দারাকুতনি (র.) বিসমিল্লাহ জোরে পড়ার বর্ণনাগুলো সংকলন করেছেন এবং এ বিষয়ের ওপর একটি পুস্তিকা সংকলন করেছেন তখন কোনো কোনো মালেকি তাঁর কাছে এলেন এবং শপথ দিয়ে তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করলেন যে, এগুলোতে সহিহ হাদিসও আছে কি না? ইমাম দারাকুতনি (র.) তখন জবাবে বললেন,

كل ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الجهر فليس بصحيح واما عن الصحابة فمنهم صحيح وضعيف ـ

'নবী করিম ﷺ থেকে জোরে পড়া সংক্রান্ত বর্ণিত সবগুলো হাদিসই অশুদ্ধ। আর যেগুলো সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর কোনোটি বিশুদ্ধ আর কোনোটি জয়িফ।'

টীকা. ১. ১/৩৪৫, হাফেজ জায়লায়ি (র.) এ হাদিসটি মুস্তাদরাকেরই বরাতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অধম মুস্তাদরাকে তালাশ করতে অক্ষম ছিলো। অবশ্য মুস্তাদরাক : ১/২৩২-২৩৩, باب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فى الصلوة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها اية *-এর অধীনে হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে এ হাদিসটি বর্ণিত আছে নিম্নেযুক্ত শব্দে,* كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
কিন্তু এর সনদে মুহাম্মদ ইবনে কায়স রাবি জয়িফ। এজন্য হাফেজ জাহাবি এ হাদিসের অধীনে বলেন, قلت محمد ضعيف *(আমি বলি মুহাম্মদ জয়িফ) –রশীদ আশরাফ।*

টীকা. ২. মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ১/৪১১, من كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

টীকা- ৩. ১/৩৫৮-৩৫৯

তাদের প্রমাণাদির দুর্বলতার স্বীকারোক্তি এর চেয়ে বেশি আর কি হতে পারে?

আর অনেক মুহাদ্দিস স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, কোনো হাদিস বিসমিল্লাহ জোরে পড়ার ব্যাপারে বিশুদ্ধ নেই। হাফেজ জায়লায়ি (র.) এর কারণ এ বর্ণনা করেছেন, রাফেজিরা বিসমিল্লাহ পড়ার প্রবক্তা ছিলো, আর তাদের সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে, كذب الناس بالحديث। (হাদিসের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় মিথ্যুক।) এজন্য তারা জোরে বিসমিল্লাহ পড়ার ব্যাপারে অনেক হাদিস জাল করেছে। এ কারণে জোরে বিসমিল্লাহ সংক্রান্ত বেশির ভাগ হাদিসের সনদ কোনো না কোনো রাফেয়ি ওপর নির্ভরশীল। এ কারণেই বোখারি, মুসলিম জোরে বিসমিল্লাহ পড়ার বর্ণনাগুলো বর্ণনা করেননি। হাফেজ জায়লায়ি (র.) বলেন যে, এ অধ্যায়ের কোনো স্পষ্ট বর্ণনা যদি সনদগতভাবে প্রমাণিত হতো, তবে আমি দুই বার কসম খেয়ে বলি ইমাম বোখারি নিজ সহিহে অবশ্যই তা উল্লেখ করতেন। কেনোনা হানাফিদের ওপর প্রশ্ন উত্থাপন ইমাম বোখারি (র.) বিশেষভাবে পছন্দ করতেন এবং তাদেরকে শব্দে স্মরণ করেন قال بعض الناس (কেউ কেউ বলেছেন।)।

হানাফিদের প্রমাণসমূহ

সংখ্যায় যদিও হানাফিদের যেসব প্রমাণাদি কম কিন্তু সূত্রগতভাবে মর্যাদাবান ও আজিমুশশান। বিশুদ্ধতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছাতে এগুলো যথেষ্ট।

১. হানাফিদের প্রথম প্রমাণ– সহিহ মুসলিমে[১] হজরত আনাস (রা.)-এর বর্ণনা,

قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابى بكر (رض) و عمر (رض) وعثمان (رض) فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم -

'তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর, উমর ও উসমান (রা.)-এর সাথে আমি নামাজ পড়েছি। তাঁদের কাউকে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পড়তে শুনিনি।'

এ বর্ণনাটি নাসায়িতে[২] নিম্নেযুক্ত ভাষায় এসেছে,

صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم فلم اسمع احدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم -

যা দ্বারা বোঝা গেলো যে, সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় না পড়ার কথা এসেছে, না পড়ার দ্বারা উদ্দেশ্য জোরে না পড়া।

২. নাসায়িতে[৩] হজরত আনাস (রা.)-এর একটি বর্ণনা রয়েছে,

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قرائة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى بنا ابو بكر و عمر فلم نسمعها منهما -

আমাদের নামাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইমামতি করেছেন, তিনি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আমাদের শুনিয়ে পড়েননি। এমনিভাবে আবু বকর (রা.) আমাদের ইমামতি করেছেন, আমাদেরকে তাঁরাও তা শুনিয়ে পড়েননি।'

টীকা. ১. ১/১৭২, باب حجة من لا يجهر بالبسملة

টীকা. ২. ১/১৪৪, كتاب الإفتتاح، ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

টীকা. ৩. ১/১৪৪, ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

এ থেকে বোঝা গেলো, জোরে বিসমিল্লাহ না পড়ার কথা বলা হজরত আনাস (রা.)-এর উদ্দেশ্য সরাসরি না পড়ার কথা নয়।

৩. তৃতীয় প্রমাণ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা.) থেকে বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস। যাতে তিনি বলেন,

سمعنى ابى وانا فى الصلوة اقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لى يا بنى محدث اياك والحدث قال ولم ار أحدا من اصحاب رسول الله صلى الله وسلم كان ابغض إليه الحدث فى الاسلام وقد صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم ومع ابى بكر (رض) وعمر (رض) وعثمان (رض) فلم اسمع احدا منهم يقولها فلا تقله اذا انت صليت فقل الحمد لله رب العلمين ـ

এ বর্ণনায় تقلها দ্বারা উদ্দেশ্য لا تجهر بها; কেনোনা আমরা হজরত আনাস (রা.)-এর যে বর্ণনা ওপরে উল্লেখ করেছি তাতে জোরে না পড়ার কথা বলা আছে। অতএব, এখানেও উদ্দেশ্য হবে তাই।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

এর ওপর শাফেয়িগণ প্রশ্ন করেন যে, এতে আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল-এর ছেলে অজ্ঞাত; কিন্তু এর জবাব হলো, মুহাদ্দিসিন স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, তাঁর নাম ইয়াজিদ এবং তাঁর সূত্রে তিনজন রাবি বর্ণনা করেন। বস্তুত উসুলে হাদিসের নিয়ম হলো, যে ব্যক্তি থেকে বর্ণনাকারি দু'জন তিনি আর অজ্ঞাত থাকেন না। আর এখানে তো তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনাকারি দুয়ের অধিক। এ কারণেই ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن। তাছাড়া বর্ণনা নাসায়িতেও[১] এ অর্থবোধক এসেছে। আর এ হাদিসের ওপর ইমাম নাসায়ি (র.) নীরবতা অবলম্বন করেছেন, তাঁর মতে তার কমপক্ষে হাসান হওয়ার দলিল।

৪. তাহাবি ও আরও অনেকে বর্ণনা করেছেন,

عن ابن عباس رضى الله عنه فى الجهر بسم الله الرحمن الرحيم قال ذلك فعل الاعراب[২] ـ

'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম জোরে পড়া সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, বেদুইনদের কাজ এটা।'

এমনিভাবে তাহাবিতেও[৩] হজরত আবু ওয়াইল (রা.)-থেকে বর্ণিত আছে,

قال كان عمر و على رضى الله عنه لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بالتامين ـ

'তিনি বলেছেন, ওমর ও আলি (রা.) দু'জনের কেউ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম এবং আউজুবিল্লাহ ও আমিন কোনোটি আওয়াজ দিয়ে পড়তেন না।'

মূলকথা, এসব বর্ণনা বিশুদ্ধ এবং স্পষ্ট হওয়ার কারণে ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর প্রমাণাদির মোকাবেলায় প্রাধান্য।

টীকা. ১. ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল আমাদের কাউকে যখন আমাদের কাউকে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পড়তে শুনতেন, তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও উমর (রা.)-এর পেছনে নামাজ পড়েছি। তাঁদের কাউকে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পড়তে শুনিনি। –নাসায়ি : ১/১৪৪ ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

টীকা. ২. শরহু মা'আনিল আছার : ১/১০০, باب قرائة بسم الله الرحمن الرحيم فى الصلوة

টীকা. ৩. ১/৯৯ باب قرائة بسم الله الرحمن الرحيم فى الصلوة

بَابُ مَنْ رَأَى الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (ص ٥٨)

অনুচ্ছেদ- ৬৭ : যে বিসমিল্লাহ জোরে পড়ার পক্ষে (মতন ৫৮)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَفْتَتِحُ صَلٰوتَهُ، بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

২৪৫. অর্থ : হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নামাজ আরম্ভ করতেন বিসমিল্লহির রহমানির রহিম দ্বারা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটির সনদ দৃঢ় বা মজবুত নয়। একাধিক আলেম সাহাবি এর প্রবক্তা। তাদের মধ্যে রয়েছেন– আবু হুরায়রা, ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, ইবনে জুবায়র (রা.) ও তৎপরবর্তী তাবেয়িন। তাঁরা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম জোরে পড়ার পক্ষে। এ মতই পোষণ করেন, শাফেয়ি, ইসমাইল ইবনে হাম্মাদ (র.)। ইসমাইল হলেন, ইবনে আবু সুলায়মান। আবু খালেদ সম্পর্কে বক্তব্য হলো যে, তিনি আবু খালেদ ওয়ালেবি। তাঁর নাম হুরমুজ। তিনি কুফার বাসিন্দা।

بَابٌ فِى افْتِتَاحِ الْقِرَائَةِ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (٥٨)

অনুচ্ছেদ– ৬৮ : সূরা ফাতেহা দিয়ে কেরাত আরম্ভ করা (মতন ৫৭)

عَنْ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ (رضـ) يَفْتَتِحُوْنَ الْقِرَائَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

২৪৬. অর্থ : হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর, উমর ও উসমান (রা.) আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন (তথা সূরা ফাতেহা) দ্বারা কেরাত শুরু করতেন।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। সাহাবা, তাবেয়িন ও তৎপরবর্তীগণ এর ওপর আমল করেছেন। তাঁরা আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন দ্বারা কেরাত শুরু করতেন। ইমাম শাফেয়ি (র.) বলেছেন, 'আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন দ্বারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর, উমর ও উসমান (রা.) কেরাত শুরু করতেন'– এ হাদিসের অর্থ হলো, তাঁরা সূরা (মিলানোর) পূর্বে সূরা ফাতেহা দ্বারা কেরাত শুরু করতেন। এর অর্থ এ নয় যে, তাঁরা সূরা ফাতেহা দ্বারা কেরাত শুরু করতেন। এর অর্থ এ নয় যে, তাঁরা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পড়তেন না। ইমাম শাফেয়ি (র.) এ মত পোষণ করেন যে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম দ্বারা কেরাত শুরু করে তা জোরে পড়বে।'

দরসে তিরমিযী

بسم الله আস্তে পড়ার ব্যাপারে এ হাদিসটিও হানাফিদের প্রমাণ। ইমাম শাফেয়ি (র.) এর এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, এখানে الحمد لله সূরার নাম হিসেবে এসেছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, সূরা ফাতেহা সূরা মিলানোর পূর্বে

পড়তেন। এ অর্থ নয় যে, بسم الله আস্তে পড়তেন। এ ব্যাখ্যাটি অযৌক্তিক তা ব্যাখ্যা করে বোঝানোর অপেক্ষা রাখে না।

بسم الله কোরআনের অংশ কী না?

এ শিরোনাম কায়েম করা উদ্দেশ্য হলো, এ মাসআলাটি বর্ণনা করা যে, بسم الله কোরআনে হাকিমের অংশ কী না? এ বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে, সূরায় নামলে হজরত সুলায়মান (আ.)-এর চিঠিতে যে বিসমিল্লাহ এসেছে সেটা সর্বসম্মতিক্রমে কোরআনে হাকিমের অংশ।[১] সূরার শুরুতে যে بسم الله পড়া হয়, সেটা সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইমাম মালেক (র.) বলেন, এটা কোরআনের অংশ নয়, বরং অন্যান্য জিকিরের ন্যায় এটিও একটি জিকির। ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর মতে, এটি সূরা ফাতেহার অংশ। অন্য সূরাগুলোর অংশ কি না এ ব্যাপারে তাঁর দুটি বক্তব্য আছে। বিশুদ্ধতম বক্তব্য হলো, অন্য সূরাগুলোরও অংশ। ইমাম আবু হানিফা (র.) -এর মতে এটি কোরআনের অংশ। কিন্তু বিশেষ কোনো সূরার অংশ নয়; বরং এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে দুই সূরার মাঝে ব্যবধানের[২] জন্য।

০ সেসব বর্ণনা ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর প্রথম প্রমাণ যেগুলো নামাজে উচ্চৈঃস্বরে বিসমিল্লাহ পড়া প্রমাণ করে। তিনি বলেন, যদি এটি ফাতেহার অংশ না হতো তবে পড়া বিধিবদ্ধ হতো না। পূর্বেকার অনুচ্ছেদে এর বিস্তারিত জবাব দেওয়া হয়েছে যে, জোরে পড়া সুন্নত বলে প্রমাণিত নয়।

০ দ্বিতীয় দলিল সুনানে নাসায়িতে[৩] বর্ণিত হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস,

قال بينما ذات يوم بين اظهرنا يريد النبى صلى الله عليه وسلم اذا غفأ اغفأ [٤] ثم رفع رأسه متبسما فقلنا له ما اضحك يا رسول الله قال نزلت على انفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الأبتر، ثم قال هل تريدون ما الكوثر الخ

'তিনি বলেছেন, একবার তিনি তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে ছিলেন। তাঁর মধ্যে হঠাৎ তন্দ্রাভাব এলো। তারপর মৃদু হাসতে হাসতে তিনি মাথা উত্তোলন করলেন, আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার হাসির কারণ কী? জবাবে তিনি বললেন, আমার ওপর এ মাত্র একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে,

بسم الله الرحمن الرحيم . انا اعطيناك الكوثر . فصل لربك وانحر . ان شانئك هو الأبتر،

তারপর তিনি বললেন, তোমরা জানো! কাউসার কি জিনিস।'

০ শাফেয়িগণ বলেন, রাসূল ﷺ এখানে بسم الله দ্বারা সূরা আরম্ভ করেছেন, যা এ সূরার অংশ হওয়ার দলিল। কিন্তু শাফেয়িদের এ প্রমাণে স্পষ্ট জয়িফতা রয়েছে। কেনোনো, بسم الله পড়ার কারণ, এটা সূরার অংশ হওয়া ছিলো না; বরং রাসূল ﷺ بسم الله পড়েছিলেন, তেলাওয়াত আরম্ভ করার জন্য।

টীকা. ১. انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم . سورة نمل الاية

টীকা. ২. যেমন হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদিস এর প্রমাণ পেশ করে– নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে সূরার শেষ জানতে পারতেন না। যখন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম নাজিল হতো, তখন তিনি বুঝতে পারতেন যে, সূরা শেষ হয়ে আরেক সূরা শুরু হয়েছে। رواه البزار باسنادين رجال احدهما رجال الصحيح . مجمع الزوائد ١٨٥/١

টীকা. ৩. ১/১৪৩-১৪৪, قرائة بسم الله الرحمن الرحيم

টীকা. ৪. اغفأ এর অর্থ হলো, তন্দ্রা। এটা অধিকাংশ সময়ের ওহি অবতীর্ণ হওয়ার অবস্থা।

০ শাফেয়িদের তৃতীয় প্রমাণ হলো, সমস্ত মুসহাফে بسم الله প্রতিটি সূরার সঙ্গে লেখা আছে। ইমাম নববি (র.) এর দ্বারা পেশ করেছেন। কিন্তু এটাও জয়িফ দলিল। কারণ, মুসহাফগুলোতে লিখিত হওয়ার ফলে প্রমাণিত হয় কোরআনের অংশত্ব সূরার অংশত্ব না।

হানাফিদের প্রমাণসমূহ

সেসব বর্ণনা হানাফিদের প্রথম প্রমাণ যেগুলোতে بسم الله জোরে না পড়ার সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। কেনোনা, بسم الله জোরে না পড়া এ সূরা ফাতেহার অংশ না হওয়াটাই বোঝায়।

০ আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে بسم الله দ্বারা কেরাত শুরু করার পরিবর্তে আলহামদুলিল্লাহ দ্বারা আরম্ভ করার বর্ণনা রয়েছে। যা প্রমাণ পেশ করছে অংশ না হওয়ার। এখানেও ইমাম শাফেয়ি (র.) সেই ব্যাখ্যাই করেছেন যে, আলহামদুলিল্লাহর উল্লেখ নাম হিসেবে হয়েছে। এটা বলা উদ্দেশ্য যে, সূরা ফাতেহা সূরা মিলানোর পূর্বে পড়তেন। কিন্তু এ ব্যাখ্যা যৌক্তিক নয়। বিবেক এটাকে গ্রহণ করে না।

০ হানাফিদের তৃতীয় প্রমাণ হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর প্রসিদ্ধ বর্ণনা,

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان سورة من القران ثلاثون اية شفعت لرجل حتى غفرله وهى تبارك الذى بيده الملك،[১] هذا حديث حسن.

'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, কোরআনের একটি সূরা ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট রয়েছে। এটি এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করেছে। ফলে তাকে মাফ করে দেওয়া হয়েছে এ সূরাটি হচ্ছে تبارك الذى بيده الملك। এ হাদিসটি হাসান।'

সূরা মুলকের আয়াত ৩০ তখনই হয় বিসমিল্লাহকে যখন এর অংশ না ধরা হয়। তা না হলে বিসমিল্লাহকেও যদি এর আয়াত ধরা হয় তাহলে আয়াত সংখ্যা হবে একত্রিশ।

০ হানাফিদের চতুর্থ প্রমাণ– কোরআনের আয়াত,

ولقد اتينك سبعا من المثانى والقران العظيم.

'আপনাকে আমি 'সাবয়ে মাসানি' (পুনরাবৃত্ত সাত আয়াত) এবং মহান কোরআন দান করেছি।'–সূরা হিজর : ৮৭

অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে, এখানে سبع مثاني দ্বারা উদ্দেশ্য সূরা ফাতেহা। কারণ এটি এমন সাতটি আয়াত দ্বারা গঠিত যেগুলো নামাজে বারবার পড়তে হয়। আর সূরা ফাতেহার সাত আয়াত তখনই হয় যখন বিসমিল্লাহকে সূরা ফাতেহার অংশ মানা হয়। তাহলে আয়াত হয়ে যাবে আটটি। সেসব সহিহ হাদিস দ্বারাও হয় এর সহায়তা যেগুলোতে রাসূল ﷺ (ফাতেহাকে) السبع المثانى সাব্যস্ত করেছেন।[২]

* হানাফিদের পঞ্চম প্রমাণ হজরত আবু হুরায়রা (রা.)- থেকে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদিস,

---

টীকা. ১. তিরমিযী ২/১৩২, ابواب فضائل القران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ماجاء فى سورة الملك

টীকা. ১. বোখারিতে যেমন, আবু সাইদ ইবনুল মু'আল্লা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মসজিদে নামাজ পড়ছিলাম এ সময় তিনি আমাকে ডাকলেন। তার ডাকে আমি সাড়া দেইনি। বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নামাজ পড়ছিলাম। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি এরশাদ করেননি? 'তোমরা আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও এবং রাসূলের ডাকে যখন তিনি তোমাদের আহ্বান করেন।' তারপর তিনি আমাকে বললেন, আমি তোমাকে অবশ্যই এমন একটি সূরা শিক্ষা দেবো। সেটি হচ্ছে কোরআনের সবচেয়ে মহান সূরা। বললেন, الحمد لله رب العلمين এটিই সাবয়ে মাসানি, এটিই কোরআনে আজিম, যা আমাকে দান করা হয়েছে।

–সহিহ বোখারি : ২/৬৪২, كتاب التفسير، باب ماجاء فى فاتحة الكتاب

فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول قال الله تعالی قسمت الصلوة بینی وبین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل . فاذا قال العبد الحمد الله رب العلمین قال الله تعالی حمدنی عبدی . واذا قال الرحمن الرحیم قال اثنی علی عبدی . فاذا قال ملك یوم الدین قال مجدنی عبدی وقال مرة فوض الی عبدی . فاذا قال ایاك نعبد وایاك نستعین قال هذا بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل فاذا قال اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین قال هذا لعبدی ولعبدی ما سأل [১] .

'তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি নামাজকে আমার ও আমার বান্দার মাঝে ভাগ করেছি অর্ধেকরূপে। আর আমার বান্দার জন্য তা রয়েছে যা সে দরখাস্ত করেছে। বান্দা যখন বলে, আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। আর যখন বলে, আররহমানির রহিম। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। যখন বলে মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। তখন তিনি বলেন, আমার বান্দা বর্ণনা করেছে আমার মাহাত্ম্য। (রাবি) আরেকবার বলেছেন আল্লাহ বলেন, বান্দা আমার নিকট সোপর্দ করেছে। তারপর যখন বলে ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাইন। তখন তিনি বলেন, আমার ও বান্দার মাঝে এটি যৌথ। আর বান্দা যা দরখাস্ত করে তার জন্য সেটি। বান্দা যখন বলে اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین তখন তিনি বলেন, এটা আমার বান্দার আর আমার বান্দা যা চায় তা তার জন্য।'

এটি হাদিসে কুদসি। এতে সূরা ফাতেহার বিস্তারিত বিবরণ ও প্রতিটি আয়াতের ফজিলত প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু এতে বিসমিল্লাহর উল্লেখ নেই, কাজেই বিসমিল্লাহ ফাতেহার অংশ না হওয়ার প্রমাণ এটিই।

এগুলো হলো হানাফিদের দলিলাদি।

* এসব দলিল দ্বারা ইমাম মালেক (র.)-ও প্রমাণ দেন। তিনি বলেন, যেহেতু বিসমিল্লাহ সূরা ফাতেহার অংশ নয়, না অন্য কোনো সূরার অংশ, সেহেতু এটি সামগ্রিকভাবে কোরআন শরিফের অংশ কিভাবে হতে পারে?

এর জবাবে আমাদের বক্তব্য হলো, বিসমিল্লাহ যেহেতু অবতীর্ণ হয়েছে সূরাগুলোর মাঝে ব্যবধানের জন্য, সেহেতু কোনো বিশেষ সূরার অংশ নয়। অবশ্য পুরা কোরআনের অংশ। কারণ, তার মধ্যেই কোরআনের সংজ্ঞা বাস্তবে পাওয়া যায়। অর্থাৎ,

كلام الله المنزل علی محمد خاتم المرسلین صلی الله علیه وسلم المكتوب فی المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة .

'আল্লাহ তা'আলার কালাম যা রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাজিলকৃত মুসহাফে লিখিত এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সন্দেহহীনভাবে ও মুতাওয়াতিররূপে বর্ণিত।'

সুতরাং বিসমিল্লাহকে অবশ্যই কোরআনে কারিমের অংশ হিসেবে মানতে হবে।

والله اعلم بالصواب

টীকা. ১. *সহিহ মুসলিম* : ১/১৬৯-১৭০, باب وجوب قرائة الفاتحة فی كل ركعة وانه اذا لم یحسن الفاتحة ولا امكنه تعلمها قرأ ما تیسرله غیرها .

টীকা. ২. *সহিহ মুসলিম* : ১/১৬৯-৭০, باب وجوب قرائة الفاتحة فی كل ركعة وانه اذا لم یحسن الفاتحة ولا امكنه تعلمها قرأ ما تیسر له غیرها

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ لَا صَلٰوةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (صـ ٥٧)

অনুচ্ছেদ–৬৯ : সূরা ফাতেহা ব্যতিত নামাজ হয় না (মতন ৫৭)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

২৪৭. 'উবাদা ইবনে সামেত (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সূরা ফাতেহা যে পড়লো না, তার নামাজই হলো না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আয়েশা, আনাস, আবু কাতাদা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, উবাদা (রা.) -এর হাদিসটি حسن صحيح। অধিকাংশ আলেম সাহাবির মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তার মধ্যে রয়েছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.)। তাঁরা বলেছেন, সূরা ফাতেহা পড়া ব্যতিত নামাজ যথেষ্ট হয় না। এ মতই পোষণ করেন ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ এবং ইসহাক (র.)।

দরসে তিরমিযী

لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب : قرأ يقرأ সাধারণতো প্রত্যক্ষভাবে মুতা'আদ্দি (সকর্মক ক্রিয়া) হয়। যেমন قرأت الكتاب বলে قرأت بالكتاب নয়। কিন্তু আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে এটাকে ب-এর মাধ্যমে মুতা'আদ্দি করা হয়েছে এর কারণ কী? বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়েছে এর জবাবে–

১. অনেকে বলেছেন, ب হরফটি এখানে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে তাবার্‌রুকের অর্থকে। লুকায়িত ইবারত মূলত এমন ছিলো,

لا صلوة لمن لم يقرأ ويتبرك بفاتحة الكتاب .

'সূরা ফাতেহা যে পড়লো না এবং এর দ্বারা বরকত অর্জন করলো না তার নামাজই হয় না।'

২. অনেকে বলেছেন, এখানে بٌ অতিরিক্ত।

৩. কিন্তু এ ব্যাপারে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা ও এলমি তাহকিক فصل الخطاب في مسئلة الكتاب নামক গ্রন্থে করেছেন হজরত শাহ সাহেব (র.)। সেটি হলো, প্রত্যক্ষভাবে যেসব ফে'ল মুতা'আদ্দি হয় কখনও কখনও সেগুলোকে ب-এর মাধ্যমে মুতা'আদ্দি করা হয়। কিন্তু উভয় অবস্থাতে অর্থগত পার্থক্য হয়। এ কারণে যখন ب-এর মাধ্যম থাকে না তখন অর্থ এই হয় যে, মাফউল পুরোপুরি মাফউল অর্থাৎ, মাফউলিয়্যাতের সঙ্গে অন্য কিছু অংশীদার নেই। আর যখন ب-এর মাধ্যম হয় তখন অর্থ হয়, মাফউলে বিহি মাফউলের অংশ। মাফউলিয়্যাতে অন্য কোনো কিছুও তার সঙ্গে অংশীদার। এজন্য ب-কে যখন প্রত্যক্ষভাবে মুতা'আদ্দি করা হয়, তখন এর মাফউলে বিহি হবে পরিপূর্ণ পঠিত বিষয়। আর অর্থ হবে পড়া হয়েছে শুধু এটাকেই, অন্য কোনো জিনিস পড়া হয় নাই। আর যখন ب -এর সাথে মুতা'আদ্দি করা হবে তখন মাফউলে বিহি হবে পঠিত বিষয়ের কোনো অংশ। অর্থ এই হবে যে, মাফউলে বিহিও পড়া হয়েছে এবং এর সাথে আরও কিছুও। এজন্য রাসূল

كان يقرأ بالفجر بق والقران-এর কেরাতের বিবরণ দিতে গিয়ে يقرأ بالطور[১] এবং في المغرب بالطور[২] المجيد[৩] শব্দ এসেছে। এগুলোর অর্থ হলো, সূরা তুর এবং সূরা কাফ শুধু পড়েননি; বরং এগুলোর সঙ্গে আরও কিছু পড়েছেন। তথা সূরা ফাতেহা। এর বিপরীত এক বর্ণনায় আছে قرأ عليهم سورة الرحمن[৪] এখানে ب হরফ নেই। অতএব, এর অর্থ হলো, শুধু পড়েছেন সূরা আর রহমান। অন্যকিছু এর সঙ্গে পড়েননি। অতএব, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে ফাতিহাতুল কিতাবের ওপর ب প্রবিষ্ট করিয়ে এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, নামাজে শুধু সূরা ফাতেহা পড়া হবে না; বরং এর সঙ্গে পড়া হবে আরও কিছু। তথা মেলাতে হবে অন্য সূরা।

শাহ সাহেব (র.) বলেন, শুধু জমখশরির কিতাবুল মুফাস্‌সালে এ মূলনীতিটি উল্লিখিত হয়েছে। তাছাড়া জমখশরি কাশ্‌শাফে وهزى اليك بجذع النخلة আয়াতের তাফসিরে যে আলোচনা করেছেন, তা দ্বারাও বোঝা যায়।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটির সঙ্গে দুটি মহাবিতর্কিত ফিকহি মাসআলা সংশ্লিষ্ট।

১. ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা পড়া। শাফেয়ি মতাবলম্বীগণ এর দ্বারা ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা ওয়াজিব হওয়ার ওপর প্রমাণ পেশ করেন। এ মাসআলাটি ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই সবিস্তারে আসবে স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদে।

২. এখানে উল্লেখযোগ্য হলো, নামাজে সূরা ফাতেহা পড়া ফরজ না ওয়াজিব।

(১) ইমামত্রয় এটাকে ফরজ ও নামাজের রুকন হিসেবে ধরেন। তাঁরা বলেন, এটা তরক করলে নামাজ সম্পূর্ণ ভেঙে যাবে। তাঁদের মতে সূরা মিলানো মাসনুন বা মোস্তাহাব। তাঁরা সূরা ফাতেহা ফরজ হওয়ার ওপর প্রমাণ পেশ করেন। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন।

(২) ইমাম আবু হানিফা (র.) বলেন, সূরা ফাতেহা পড়া ওয়াজিব নয়। ফরজ হলো সাধারণ কেরাত। এখানে এ বিষয়টিও উল্লেখ্য যে, হানাফিদের মতে সূরা ফাতেহা ও সূরা মিলানো উভয়টির হুকুম এক। তথা উভয়টি ওয়াজিব। এগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি তরক করলে ফরজ তো আদায় হয়ে যায়; কিন্তু নামাজ দোহরানো ওয়াজিব থেকে যায়।

কোরআনে কারিমের আয়াত হানাফিদের দলিল– فاقرؤوا ما تيسر من القران (অতএব তোমরা কোরআনের যতোটুকু সহজ হয় ততোটুকু তেলাওয়াত করো।) এখানে ما تيسر তথা ফরজ সাব্যস্ত করা হয়েছে যতোটুকু সহজ হয় ততোটুকু পড়া; কোনো নির্দিষ্ট সূরা নির্ধারণ করা হয়নি। আর মুতলাক খবরে ওয়াহেদ দ্বারা শর্তায়িত হতে পারে না। তাছাড়া হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর মুসলিম শরিফে একটি মারফু হাদিস বর্ণিত আছে,

من صلى صلوة لم يقرأ فيها بام القران فهى خداج ثلاثا غير تمام ـ

'সূরা ফাতেহা পড়া ব্যতিত যে নামাজ পড়লো, তার সে নামাজ অসম্পূর্ণ। এ কথাটি তিনবার বললেন। এ নামাজ সম্পূর্ণ নয়।'

টীকা. ১. বোখারি : ১/১০৬, باب الجهر بقرائة صلوة الفجر وقالت ام سلمة (رض) طفت وراء الناس والنبى صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور

টীকা. ২. বোখারি : ১/১০৫, باب الجهر فى المغرب ।

টীকা. ৩. মুসলিম : ১/১৮৭, باب القرائة فى الصبح

টীকা. ৪. তিরমিযী : ২য় খণ্ড, ابواب التفسير ، سورة الرحمن হজরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের নিকট বেরিয়ে এলেন, তারপর তিলাওয়াত করলেন সূরা আর-রাহমান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। সাহাবায়ে কেরাম নীরব ছিলেন। ফলে তিনি বললেন, জ্বিনের (সম্মেলনের) রজনীতে তাদের সামনে আমি এ সূরা পাঠ করেছিলাম। তাদের জবাব ছিলো তোমাদের চেয়ে সুন্দরতম। আমি যখনই فبأى الاء ربكما تكذبان আয়াত পর্যন্ত পৌঁছতাম, তখন তারা জবাব দিতো 'হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার কোনো নেয়ামতকে আমরা অস্বীকার করি না। অতএব, প্রশংসা একমাত্র তোমারই।' –সংকলক

خداج – শব্দের অর্থ হলো অসম্পূর্ণ। এ হাদিসে সূরা ফাতেহা ব্যতিত নামাজকে অসম্পূর্ণ তো বলা হয়েছে তবে নামাজ হয়নি আসলেই একথা তো বলা হয়নি। কাজেই প্রমাণিত হলো যে, সূরা ফাতেহা ব্যতিত নামাজের সত্তাতো সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, কিন্তু তার গুণাবলিতে ত্রুটি থেকে যাবে।

হানাফিদের পক্ষ থেকে এ অনুচ্ছেদের হাদিসটির বিভিন্ন জবাব দেওয়া হয়েছে।

* نفى كمال ব্যবহৃত হয়েছে لا তথা পূর্ণতাকে না করার জন্য। এ জবাবটি কিন্তু মুহাক্কিকিন এ জবাবটি পছন্দ করেননি। শায়খ ইবনে হুমাম (র.) এটাকে রদ করতে গিয়ে লেখেন যে, এখানে যদি لا -কে نفى كمال-এর জন্য প্রয়োগ করা হয়, তাহলে ফাতেহাকে ওয়াজিব বলাও মুশকিল হবে। যেমন, لا صلوة لجار المسجد الا فى المسجد ٢ -এ لا . نفى كمال-এর জন্য। কিন্তু মসজিদে নামাজ আদায় করা নামাজের কোনো ওয়াজিব নয়। এ কারণে মসজিদের প্রতিবেশী যদি মসজিদের পরিবর্তে ঘরে নামাজ আদায় করে নেয়, তাহলে তার নামাজ দোহরানো ওয়াজিব নয়। এর দাবি এটাই যে, ফাতেহা তরককারির নামাজও দোহরানো ওয়াজিব নয়। স্বয়ং হানাফিগণও অথচ এর প্রবক্তা নন।

* শায়খ ইবনুল হুমাম (র.) দ্বিতীয় জবাব এ দিয়েছেন যে, আলোচ্য অধ্যায়ের হাদিসটি খবরে ওয়াহেদ এর অন্তর্ভুক্ত। এর দ্বারা অতিরিক্ত সংযোজন কিতাবুল্লাহর ওপর হতে পারে না। অতএব, আমরা সাধারণ কেরাতকে তো ফরজ বলেছি; কিন্তু সূরা ফাতেহাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছি। এ জবাবের সারনির্যাস হলো যে, لا তো সত্তাকে না করার জন্যই; কিন্তু নফি দ্বারা উদ্দেশ্য হর নামাজ দোহরানো ওয়াজিব থেকে যাবে।

* হজরত শাহ সাহেব (র.) আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের সবচেয়ে প্রশান্তিদায়ক ও মুহাক্কিক সুলভ জবাব দিয়েছেন নিজ গ্রন্থ فصل الخطاب فى مسئلة ام الكتاب এ। তিনি বলেন, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে لا পূর্ণতাকে না করার জন্য নয়, ব্যবহার হয়েছে সত্তাকে না করার জন্যই। এর উদ্দেশ্য হলো, কেরাত না করার সুরতে নামাজ সম্পূর্ণ ফাসেদ হয়ে যায় যেনো এখানে কেরাত দ্বারা শুধু ফাতেহা পড়া নয় বরং সাধারণ কেরাত উদ্দেশ্য। অর্থৎ, যে ব্যক্তি সাধারণ কেরাতই পড়লো না, না সূরা মিলালো, না সূরা ফাতেহা পড়লো তার নামাজই হয় না। لا-এর نفى ذات-এর অর্থ শব্দটিও রয়েছে পাওয়া যাবে, যখন তরক করা হবে ফাতেহা ও সূরা মিলানো উভয়টি।

এজন্য এ ব্যাখ্যাটি অধিক প্রাধান্য যে, কোনো কোনো বর্ণনায় এর (এই হাদিসের) সঙ্গে فصاعدا শব্দটিও রয়েছে,

لا صلوة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا . ٣

যে ব্যক্তি ফাতেহা এবং অতিরিক্ত আরও অংশ না পড়বে তার নামাজ হবে না। অতএব, এ হাদিসের উদ্দেশ্য হবে এই, যখন কেরাত একেবারেই হবে না তখন নামাজ না হওয়ার হুকুম লাগবে। আর এ অর্থটি হানাফি মাজহাবের হুবহু অনুকূল। কোনো কোনো বর্ণনায় فصاعدا -এর পরিবর্তে فما زاد [8] অথবা

টীকা- ১. ১/১৬৯, باب وجوب قرائة الفاتحة فى كل ركعة وانه اذا لم يحسن الفاتحة ولا امكنه تعلمها قرأ ما تيسر له غيرها

টীকা- ২. দারাকুতনি : ১/৪২০, باب الحث لجار المسجد على الصلوة فيه الا من اجر

টীকা- ৩. সুনানে আবি দাউদ : ১/১১৯, باب من ترك القرائة فى صلوته عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم الخ - مرتب

টীকা- ৪. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন এ ঘোষণা দিতে যে, সূরা ফাতেহা ও অতিরিক্ত কিছু না পড়লে কোনো নামাজই হবে না। নামাজের মধ্যে যারা সূরা ফাতেহাকে ফরজ বলে সেসব প্রবক্তার বিরুদ্ধে প্রমাণ। তাছাড়া অন্য বর্ণনায় আবু হুরায়রা (রা.) আরও বলেছেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তুমি বেরিয়ে যাও। গিয়ে মদিনার লোকজনকে ঘোষণা দাও– কোরআন তেলাওয়াত ব্যতিত নামাজ হয় না। যদিও তা সূরা ফাতেহা ও তার চেয়ে অতিরিক্ত অংশ হোক। এটি সাধারণ, কেরাত ফরজ হওয়ার প্রমাণ। দুটো হাদিসই সুনানে আবু দাউদে : ১/১১৮ باب ترك القرائة فى صلوته *-এ বর্ণিত হয়েছে।*

ما تيسر[১] অথবা وايتين معها[২] শব্দও এসেছে। এসব অতিরিক্ত অংশ সনদগতভাবে বিশুদ্ধ, এগুলোর তাহকিক ইনশাআল্লাহ ইমামের পেছনে কেরাতের মাসআলায় বর্ণনা করা হবে।

যদি ধরা হয় যে, فصاعدا এবং فما ذاد ইত্যাদি অতিরিক্ত অংশ প্রমাণিত নয় তখনও ফাতেহাতুল কিতাবের ওপর ب প্রবিষ্ট করা সত্তাগতভাবে এর প্রমাণ যে, ফাতেহা ব্যতিত অন্য কিছুও পড়া উদ্দেশ্য। যেমন প্রথমে বলা হয়েছে যে, কেরাতকে ب দ্বারা মুতা'আদ্দি করার পরে অর্থ এ হবে যে, মাফউল পরিপূর্ণ পঠিত বিষয় নয়; বরং পঠিত বিষয়ের অংশ। অতএব এ হাদিস দ্বারা হানাফিদের রদ হয় না। এর সাথে সম্পৃক্ত অতিরিক্ত আরও কিছু আলোচনা ইনশাআল্লাহ কেরাত খলফাল ইমামের বর্ণনায় হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّامِيْنِ

অনুচ্ছেদ- ৭০ : আমিন বলা প্রসঙ্গে (মতন ৫৭)

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ وَقَالَ اٰمِيْنَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ ـ

২৪৮. অর্থ : হজরত ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি শুনেছি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ পাঠ করলেন এবং আমিন বললেন। এ আমিন তিনি আওয়াজ দিয়ে টেনে পড়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আলি ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত রয়েছে।

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'ওয়াইল ইবনে হুজরের হাদিসটি حسن। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা, তাবেয়িন ও তৎপরবর্তীগণের মধ্য হতে অনেক আলেম এ মতই পোষণ করেন। তাদের মতে, আমিন জোরে পড়বে, আস্তে নয়। শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক (র.) এ মতই পোষণ করেন। শো'বা এ হাদিসটি সালামা ইবনে কুহাইল-হুজর আবুল আম্বাস-আলকামা ইবনে ওয়াইল–তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ পাঠ করেছেন, অতঃপর আমিন বলেছেন এবং তাঁর আওয়াজ ছোট করেছেন।

আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'আমি মুহাম্মদকে বলতে শুনেছি, এ প্রসঙ্গে শো'বার হাদিসের চেয়ে সুফিয়ানের হাদিস বিশুদ্ধতম। এ হাদিসের বহু স্থানে শো'বা ভুল করেছেন। ফলে তিনি 'হুজর আবুল আম্বাস থেকে' বলেছেন। অথচ এটি হলো, হুজর ইবনুল আম্বাস। তাঁর উপনাম হলো, আবুস্ সাকান। তাছাড়া তিনি আরও সংযুক্ত করেছেন, 'আলকামা ইবনে ওয়াইল থেকে' অথচ সেখানে 'আলকামা থেকে' শব্দটি নেই। তাতে 'হুজর ইবনে আম্বাস-ওয়াইল ইবনে হুজর সূত্রে রয়েছে।' তিনি আরও বলেছেন, 'তিনি তাঁর আওয়াজ ছোট করেছেন', অথচ বিষয়টি হলো, তিনি তাঁর আওয়াজ করেছেন উঁচু।

টীকা- ১. আবু সায়িদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সূরা ফাতেহা ও আরও যতোটুকু সহজ হয় তা তেলাওয়াত করার জন্য। আবু দাউদ : ১/১১৮, باب من ترك القرائة فى صلوته নিমবি (র.) 'আছারুস্ সুনানে' (৭৪ باب فى قرائة الفاتحة) এ হাদিসটি উল্লেখ করার পর বলেছেন, 'এটি বর্ণনা করেছেন, আবু দাউদ, আহমদ, আবু ইয়া'লা ও ইবনে হাব্বান (র.)। এর সনদ সহিহ। –সংকলক

টীকা- ২. জাওয়াইদ ও তাখরিজুল হিদায়া– মা'আরিফুস্ সুনান : ২/৩৯২, باب ماجاء انه لا صلوة الا بفاتحة الكتاب

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'আমি আবু জুরআকে এ হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলোম। তিনি বলেছেন, এ প্রসঙ্গে সুফিয়ানের হাদিস বিশুদ্ধতম। তিনি বলেছেন, আলা ইবনে সালিহ আল-আসাদি সালামা ইবনে কুহাইল সূত্রে সুফিয়ানের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।'

قال ابو عيسى : حدثنا ابو بكر محمد بن ابان حدثنا عبد الله بن نمير عن العلاء بن صالح الأسدى عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر، عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان عن سلمة بن كهيل .

২৪৯. অর্থ : 'ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, 'আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আবান-আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর-আলা ইবনে সালিহ আল-আসাদি-সালামা ইবনে কুহাইল-হুজর ইবনে আম্বাস-ওয়াইল ইবনে হুজর সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সুফিয়ান সূত্রে সালামা ইবনে কুহাইল থেকে বর্ণিত হাদিসের ন্যায় হাদিস আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন।'

দরসে তিরমিযী

وقال امين : تامين শব্দের অর্থ হলো, আমিন বলা। আমিনের অর্থ হলো استجب دعائنا (আমাদের দোয়া কবুল করো। অথবা فليكن كذالك (এমন যেনো হয়) অথবা لا تخيب رجائنا (আমাদের আশা নিরাশায় পরিণত করো না।) তারপর অনেকে এটাকে আরবি ভাষার শব্দ সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন এটি ইসমে ফেল। কিন্তু সহিহ হলো এটি সুরিয়ানি বা সেমেটিক ভাষার শব্দ। এর সহায়তা এর দ্বারা হয় যে, বাইবেলের সহিফায় এ শব্দটি হুবহু এমন বিদ্যমান আছে। তাছাড়া হাফেজ ইবনে হাজার (র.) المطالب العالية তে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, এক ইহুদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমিন শব্দটি শুনেই ইসলাম গ্রহণ করে ছিলেন।

'আমিন' বলার দায়িত্ব কার?

এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে যে, আমিন বলা দায়িত্ব কার। জমহুরের মাজহাব হলো, আমিন বলা ইমাম মুক্তাদি উভয়ের দায়িত্ব। তা উভয়ের জন্য সুন্নত। এ ধরনের ইমাম মালেক (র.) থেকেও রয়েছে; কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনা যেটি ইবনুল কাসিম হতে বর্ণিত এবং প্রসিদ্ধতম। সেটি হলো, আমিন বলা শুধু মুক্তাদির দায়িত্ব ইমামের নয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) মুয়াত্তায়[১] বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মাজহাবও ইমাম মালেক (র.)-এর মাজহাবের অনুরূপ যে, কিন্তু তিনি 'কিতাবুল আছারে'[২] ইমাম সাহেবের মাজহাব জমহুরের ন্যায় বর্ণনা করেছেন। তাই 'কিতাবুল আছারে' তিনি লিখেন,

عن ابى حنيفة عن حماد عن ابراهيم اربع يخافت بهن الامام سبحانك اللهم وبحمدك والتعوذ من الشيطان وبسم الله الرحمن الرحيم وامين .

'ইবরাহিম থেকে বর্ণিত, ইমাম চারটি জিনিস আস্তে পড়বেন; ১. سبحانك اللهم وبحمدك ২. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ৩. بسم الله الرحمن الرحيم ৪. امين

টীকা. ১. হাদিসে ইসলামের সত্যতার আলোচনাতো আছে কিন্তু ইসলাম গ্রহণের কোনো আলোচনা নেই। বর্ণনাটি নিম্নরূপ– মুজাহিদ বলেন, এক ইহুদি মসজিদবাসীদের নিকট দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছিলো, তখন মসজিদের লোকজন আমিন বলছিলেন। এতদশ্রবণে ইহুদি বললো, যে তোমাদেরকে (আমিন) শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁর কসম, তোমরা হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছো। (মুসান্দাদ)

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية جا صـ١٢٣، باب التامين

টীকা. ২. ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা (র.) বলেছেন, ইমামের পেছনে মুকতাদিরা আমিন বলবে; ইমাম আমিন বলবেন না। – মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ : ১০৩ باب امين فى الصلوة

ইমাম মুহাম্মদ (র.) লিখেন, وبه نأخذ وهو قول ابى حنيفة (رحـ) (এটাকেই আমরা গ্রহণ করি। ইমাম আবু হানিফা (র.) এর এটাই মত।) আর 'কিতাবুল আছারে'রই বক্তব্যকে জাহিরুর রিওয়ায়াহ সাব্যস্ত করে সাধারণ আসহাবে মুতূনও (মূলপাঠ লেখকগণ) অবলম্বন করেছেন। ফতওয়ার জন্য এটাই পছন্দনীয় বক্তব্য।

* হজরত আবু হুরায়রা প্রমুখের মারফু বর্ণনা দ্বারা ইমাম মালেক (র.) প্রমাণ পেশ করেন,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين - الخ [1]

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম যখন غير المغضوب عليهم ولا الضالين বলবে, তখন তোমরা আমিন বলবে।'

ইমাম মালেক (র.) বলেন, এ হাদিসে কর্ম বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে যে, ইমামে দায়িত্ব হলো ولا الضالين বলা, আর মুক্তাদির কাজ হলো আমিন বলা। আর বণ্টন অংশিদারিত্বের পরিপন্থি।

এ বক্তব্যের জবাবে জমহুর বলেন যে, বস্তুত এ হাদিসের উদ্দেশ্য কর্ম বণ্টন নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো ইমাম ও মুক্তাদি উভয়েই একই সময়ে আমিন বলবে। এর পদ্ধতি বলা হয়েছে যে, ইমাম যখন ولا الضالين বলে অবসর হবেন মুক্তাদি তখনই আমিন বলবে, উভয়ের আমিন এক সঙ্গে বলা হয়। কেনোনা ইমামও তখন আমিন বলবেন। এজন্যে সুনানে নাসায়িতে[২] রয়েছে,

فان الملائكة تقول امين وان الإمام يقول امين -

'কারণ, ফেরেশতারা আমিন বলে, ইমামও আমিন বলে।'

আর পরবর্তী অনুচ্ছেদে (باب ماجاء فى فضل التامين) হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর মারফু বর্ণনায় আসছে, اذا امن الإمام فامنوا الخ এখানে স্পষ্ট ভাষায় ইমামের আমিন বলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এমনভাবে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে স্পষ্ট বিবরণ আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমিন বলেছেন। এসব বর্ণনা জমহুরের মাজহাবের পক্ষে সুস্পষ্ট সাপোর্টার।

আমিন আস্তে না জোরে পড়বে?

সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, আমিন জোরে ও আস্তে উভয় রকমেই পড়া বৈধ। কিন্তু কোনটি উত্তম এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে।

১. শাফেয়ি এবং হাম্বলিগণ আমিন জোরে বলা উত্তম সাব্যস্ত করেন। তারপর ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর পুরাতন বক্তব্য হলো, ইমাম মুক্তাদি উভয়েই জোরে পড়বে। আর নতুন বক্তব্য হলো, ইমাম আস্তে পড়বেন, আর মুক্তাদি জোরে। তবে শাফেয়িদের পুরাতন বক্তব্যটি পছন্দনীয়। হাফেজ (র.) এজন্য বলেন, ফতওয়া এর ওপরই।

২. ইমাম আবু হানিফা ও সুফিয়ান সাওরি (র.)-এর মতে আস্তে পড়া উত্তম। ইমাম মালেক (র.)-এর মাজহাবও হানাফিদের মতোই। যেমন, 'আল-মুদাওওনাতুল কুবরা'য় স্পষ্ট ভাষায় লেখা হয়েছে। তাছাড়া ফিক্‌হে মালেকির প্রসিদ্ধ সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য লেখক আল্লামা আহমদ দারদির (র.)-এর বক্তব্য দ্বারাও এটাই বোঝা যায়। কাজেই হাফেজ ইবনে হাজার (র.)-এর এ বক্তব্য ঠিক নয় যে, এ মাসআলায় ইমাম চতুষ্টয়ের বেশির ভাগ শাফেয়িদের সাথে।

টীকা- ১. সহিহ বোখারি : ১/১০৮, باب جهر المأموم بالتامين

টীকা- ২. নাসায়ি ১/১৪৭, جهر الامام بامين

উভয় দলের পক্ষ থেকে এমনি তো এ মাসআলাতে অনেক হাদিস পেশ করা হয়েছে প্রমাণরূপে। কিন্তু এসব বর্ণনা হয়তো সহিহ নয় কিংবা স্পষ্ট নয়। এজন্য এ মাসআলাতে হজরত ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি আলোচ্য বিষয়টির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এর দ্বারা শাফেয়ি এবং হাম্বলিরাও প্রমাণ পেশ করেন, আবার হানাফি এবং মালেকিরাও। কেনোনা এ বিষয়ে এটাই বিশুদ্ধতম বর্ণনা। মূলত আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত ওয়াইল ইবনে হুজরের হাদিসের বিবরণে বিভিন্নতা ও গড়মিল রয়েছে। এ রেওয়ায়াতটি বর্ণিত হয়েছে দুটি সূত্রে।

এক. সুফিয়ান সাওরি সূত্রে যার শব্দগুলো নিম্নরূপ,

عن وائل بن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال امين، ومد بها صوته ـ

দুই. শো'বা সূত্রে বর্ণিত,

ان النبى صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال امين وخفض بها صوته ـ

উক্ত দুই সূত্রের বর্ণনা ইমাম তিরমিযী 'জামে' তিরমিযী'তে বর্ণনা করেছেন।

শাফেয়ি এবং হাম্বলিগণ শো'বার বর্ণনা বর্জন করেন। কিন্তু হানাফি ও মালেকিগণ শো'বার বর্ণনাকে আসল সাব্যস্ত করে সুফিয়ানের বর্ণনার ব্যাখ্যা দেন যে, এতে মদ দ্বারা উদ্দেশ্য জোরে পড়া নয়; বরং আমিনের ইয়াকে টেনে পড়া।

সুফিয়ানের বর্ণনাকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য শো'বার বর্ণনার ওপর শাফেয়ি চারটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম তিরমিযীও তিনটি প্রশ্ন এখানে উল্লেখ করেছেন। আর চতুর্থ প্রশ্নটি তিনি 'কিতাবুল ইলালিল কাবিরে' উল্লেখ করেছেন। প্রশ্নগুলো এই,

১. সালামা ইবনে কুহাইলের উস্তাদের নাম উল্লেখের ব্যাপারে শু'বা কর্তৃক ভুল হয়ে গেছে। তাঁর নাম হুজ্র ইবনুল আম্বাস। সুফিয়ানের বর্ণনায় যেমন আছে। কিন্তু শো'বা হুজর আবুল আম্বাস উল্লেখ করেছেন হুজ্র ইবনুল আম্বাসের স্থলে। অথচ তাঁর উপনাম আবুস সাকান আবুল আম্বাস নয়।

২. হুজ্র ইবনুল আম্বাস এবং ওয়াইল ইবনুল হুজরের মাঝে শো'বা আলকামা ইবনে ওয়াইলের সূত্র বাড়িয়ে দিয়েছেন। অথচ মাঝে এই দুজনের কোনো সূত্র নেই। যেমন সুফিয়ানের বর্ণনা।

৩. হাদিসের মূলপাঠে مد بها صوته -এর স্থলে শো'বা خفض بها صوته বর্ণনা করেছেন। অথচ বিশুদ্ধ বর্ণনা, مد بها صوته।

৪. ইমাম তিরমিযী (র.) চতুর্থ প্রশ্ন 'আল-ইলালুল কাবিরে' করেছেন যে, আলকামার শ্রবণ তাঁর পিতা হজরত ওয়াইল ইবনে হুজর থেকে প্রমাণিত নয়। কারণ ইমাম বোখারি (র.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন তার পিতার ওফাতের ছয় মাস পর।

'উমদাতুল কারি'তে আল্লামা আইনি (র.) এসব প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব দিয়েছেন

* ১নং প্রশ্নের জবাবে, মূলত হুজরের পিতা এবং ছেলে উভয়ের নাম ছিলো আম্বাস। অতএব, তাঁকে হুজ্র আবুল আম্বাস এবং হুজর ইবনুল আম্বাস উভয়টি বলা যথার্থ। 'কিতাবুস সিকাতে' ইবনে হাব্বান (র.) স্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন যে, তাঁকে হুজ্র আবুল আম্বাসও বলা হয়, আবার হুজর ইবনুল আম্বাসও। তাই 'তাহজিবুত তাহজিবে' হাফেজ ইবনে হাজার (র.) তা স্বীকার করেছেন। এ কারণেই তাঁর নাম বর্ণনাগুলোতে উভয় রকম

উল্লিখিত হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ (র.)[১] এ বর্ণনাটি সুফিয়ান সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং এতে হুজ্‌র ইবনুল আম্বাসের স্থলে হুজ্‌র আবুল আম্বাস উল্লেখ করেছেন। যেমনটি শো'বা উল্লেখ করেছেন। এর বিপরীত ইমাম ইবনে হাব্বান (র.)[২] এ বর্ণনাটি শো'বা সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে উল্লেখ করেছেন। হুজ্‌র আবুল আম্বাসের পরিবর্তে হুজ্‌র ইবনুল আম্বাস উল্লেখ করেছেন। ইমাম দারাকুতনি (র.)[৩] ও এ বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন।

عن حجر ابی العنبس وهو ابن عنبس -

অতএব স্পষ্ট বিবরণ হয়ে গেলো যে, এটা একই ব্যক্তির দুই নাম। এ হিসেবে শো'বার বর্ণনার ওপর কোনো আপত্তি করা যায় না।

* ২ নং প্রশ্নের জবাব হলো, একজন রাবি কোনো হাদিস প্রত্যক্ষভাবে শোনেন, আবার পরোক্ষভাবেও এবং উভয় পদ্ধতিতে তা বর্ণনা করে দেন এমন প্রচুর হয়ে থাকে। এখানে অনুরূপ হয়েছে। হুজর ইবনে আম্বাস এ বর্ণনা উভয় থেকে শুনেছেন। একবার সরাসরি হজরত ওয়াইল ইবনে হুজর থেকে। যেমন সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, দ্বিতীয়বার আলকামা ইবনে ওয়াইল সূত্রে শুনেছেন। যেটির বিবরণ দিয়েছেন শো'বা। এর প্রমাণ হলো এ হাদিসটি আবু দাউদ তায়ালিসিও[৪] বর্ণনা করেছেন। সালামা ইবনে কুহাইল তাতে বলেন,

سمعت حجرا ابا العنبس قال سمعت علقمة بن وائل يحدث عن وائل سمعت من وائل -

'হুজ্‌র আবুল আম্বাসকে আমি বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আলকামা ইবনে ওয়াইল থেকে আমি হাদিস বর্ণনা করতে শুনেছি আর আমি শুনেছি ওয়াইল থেকে।'

হুজর ইবনুল আম্বাস যেনো স্বয়ং এ কথা স্পষ্ট করে দিলেন এমনভাবে যে, তিনি দুভাবেই এ বর্ণনাটি শুনেছেন। তাছাড়া আল্লামা নিমবি (র.) বলেছেন যে, মুসনাদে আহমদ এবং সুনানে আবু মুসলিম আল-কাজ্জিতেও এ স্পষ্ট বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে। এ বর্ণনাটি হুজর ইবনুল আম্বাস দুভাবেই শুনেছেন।[৫] তাছাড়া দারাকুতনিও[৬] এ রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন ইয়াজিন ইবনে জুরাই' সূত্রে,

حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر أبى العنبس عن علقمة ثنا وائل او عن وائل بن حجر -

'আমাদেরকে শো'বা হাদিস বর্ণনা করেছেন, সালামা ইবনে কুহাইল থেকে, তিনি হুজ্‌র আবুল আম্বাস থেকে, তিনি আলকামা থেকে। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে ওয়াইল হাদিস বর্ণনা করেছেন। অথবা বলেছেন, 'ওয়াইল ইবনে হুজ্‌র থেকে।'

টীকা. ১. সুনানে আবু দাউদ : ১/১৩৪-১৩৫, باب التامين وراء الامام

টীকা. ২. মাওয়ারিদুজ্‌ জাম'আন : ১২৪, হাদিস নং ৪৪৭

টীকা. ৩. দারাকুতনি : ১/৩৩৩, با التامين فى الصلوة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها

টীকা. ৪. মুসনাদে আবু দাউদ ত্বায়ালিসি : ১৩৮, হাদিস নং ১০২৪

টীকা. ৫. মুসনাদে আহমদে হাদিসটি রয়েছেন, حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر ابى العنبس قال سمعت علقمة بن وائل يحدث عن وائل وسمعت من وائل قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ *কাজ্জি তার সুনানে এ বর্ণনাটি বর্ণনা করেছেন এভাবে,* حدثنا عمرو بن مرزوق ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر عن علقمة بن وائل عن وائل قال وقد سمعه من وائل قال صلى النبى صلى الله عليه وسلم الخ حواشى اثار السنن ص٩٧-٩٨ باب ترك الجهر بالتامين .

টীকা. ৬. সুনানে দারেকুতনি : ১/৩৩৪, باب التامين فى الصلوة بعد فاتحة الكتاب والجهربها

এর জবাব হলো মুহাদ্দিসিনের এ বক্তব্য সনদ সংক্রান্ত। অর্থাৎ, রাবিদের নাম উল্লেখ করার ক্ষেত্রে কখনও কখনও শু'বার ভ্রম হয়ে যেতো। কিন্তু মূল পাঠ মুখস্থ করার যে ব্যাপারটি তাতে শু'বা চূড়ান্ত পর্যায়ের নির্ভরযোগ্য বরং সনদে তাঁর ভ্রমের কারণ হলো, তাঁর বেশির ভাগ মনোযোগ থাকতো হাদিসের মূলপাঠের প্রতি। এজন্য কোনো কোনো সময় সনদে তাঁর ভ্রম হয়ে যেতো। এ বিষয়টি 'তুহফাতুল আহওয়াজি' গ্রন্থকারও স্বীকার করেছেন যে, যদিও শু'বা থেকে রাবিদের নাম ইত্যাদিতে কোনো কোনো সময় ভুল হয়ে যেতো কিন্তু এর কারণ হলো, তিনি তাঁর স্মরণশক্তির বেশীরভাগ শক্তি ব্যয় করতেন মূলপাঠে। এতোবড় ভ্রম এমতাবস্থায় শু'বার প্রতি সম্বোধন করা মারাত্মক বাড়াবাড়ি এবং বে-ইনসাফি। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য 'আছারুস সুনান': ৯৮)

* দ্বিতীয় প্রশ্নটিও এভাবে বেকার হয়ে যায়। থাকলো তৃতীয় প্রশ্ন। ওপরযুক্ত দুটি প্রশ্নের অবসানের পর এ প্রশ্নটি নিজে নিজেই খতম হয়ে যায়। কারণ, মুহাদ্দিসিন শো'বাকে আমিরুল মু'মিনিন ফিল হাদিস সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর শীর্ষত্ব ও নির্ভরযোগ্যতা সর্বজন স্বীকৃত। অতএব, তাঁর প্রতি এ কুধারণা নিশ্চিতরূপে প্রমাণবিহীন যে, তিনি হাদিসে এতবড় তাসাররুফ করেছেন যে, مد بها-এর স্থলে বর্ণনা করে দিয়েছেন خفض بها।

* শাফেয়িগণ এর জবাব বলেন যে, শো'বা সম্পর্কে মুহাদ্দিসিন এ মত প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর মত কখনও কখনও ভ্রম হয়ে যেতো। কিন্তু সুফিয়ান সাওরি তাঁর মুকাবেলায় অধিক গ্রহণযোগ্য।

আলকামার স্বীয় পিতা ওয়াইল ইবনে হুজর থেকে শ্রবণ

এখন বাকি থাকে শুধু চতুর্থ প্রশ্ন যে, 'আলকামা ইবনে ওয়াইল হজরত ওয়াইল ইবনে হুজর থেকে শুনেননি। এ কথাটি চরম জয়িফ এবং নিরর্থক প্রশ্ন। ঘটনা হলো তাঁর বাপ থেকেই আলকামার শ্রবণ প্রমাণিত। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, হজরত ওয়াইল ইবনে হুজরের দুই ছেলে আব্দুল জাব্বার ইবনে ওয়াইল-আলকামা ইবনে ওয়াইল। আলকামা বড় আব্দুল জাব্বার ছোট। বস্তুত হজরত ওয়াইলের যে ছেলে সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে যে, তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন পিতার ওফাতের ছয়মাস পর, তিনি আব্দুল জাব্বার ইবনে ওয়াইল আলকামা নন। ইমাম তিরমিযী ابواب الحدود باب ماجاء فی المرأة اذا استکرهت علی الزنا এ একটি হাদিসের অধীনে লেখেন,

سمعت محمدا یقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم یسمع من ابیه ولا ادرکه یقال انه ولد بعد موت ابیه باشهر ـ

'মুহাম্মদকে আমি বলতে শুনেছি, আব্দুল জাব্বার ইবনে ওয়াইল ইবনে হুজর তাঁর পিতা হতে (হাদিস) শুনেননি এবং তাঁকে পাননি। বলা হয়, তিনি জন্মলাভ করেছেন তাঁর পিতার ইন্তেকালের কয়েক মাস পরে।'

এর থেকে জানা যায়, ইমাম বোখারি (র.)-এর বক্তব্য আলকামা সম্পর্কে নয়, আব্দুল জাব্বার ইবনে ওয়াইল সম্পর্কে। বরং তাহকিক হলো, আব্দুল জাব্বার সম্পর্কেও এটি বলা ঠিক নয় যে, তিনি পিতার ইন্তেকালের পর জন্মগ্রহণ করেছেন। আল্লামা নিমবি (র.)[১] প্রমাণ করেছেন যে, তাঁর জন্ম হয়েছিলো ওয়াইল ইবনে হুজরের জীবদ্দশায়। আর আলকামা তো তাঁর চেয়ে বড়। তাঁর জন্ম হজরত ওয়াইলের ওফাতের পর এবং ওয়াইলের কাছ থেকে তার না শোনার প্রশ্ন হতে পারে? এজন্য ইমাম তিরমিযী (র.) باب ما جاء فی المرأة اذا استکرهت علی الزنا-এর শেষে আলকামার শ্রবণের বিষয়টি স্পষ্ট করতে যেয়ে লিখেন,

وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من ابیه وهو اکبر من عبد الجبار بن وائل وعبد الجبار بن وائل لم یسمع من ابیه ـ

'আলকামা ইবনে ওয়াইল ইবনে হুজর তাঁর পিতা হতে (হাদিস) শুনেছেন। আব্দুল জাব্বার ইবনে ওয়াইল থেকে তিনি বয়সে বড়। আব্দুল জাব্বার ইবনে ওয়াইল তার পিতা হতে শুনেননি।'

এ ছাড়াও বিভিন্ন বর্ণনাতে স্পষ্টভাবে তাঁর পিতা থেকে তাঁর শ্রবণ প্রমাণিত। সুনানে নাসায়িতে[২] একটি বর্ণনায় রয়েছে,

اخبرنا سوید بن نصر اخبرنا عبد الله بن المبارك عن قیس بن مسلم نا العنبری حدثنی علقمة بن وائل حدثنی ابی قال ـ الخ

টীকা. ১. আছারুস্ সুনান : ৯৯-১০০,

টীকা. ২. ১/১৬১, باب رفع الیدین عند الرفع من الرکوع

'আমাদের হাদিস বর্ণনা করেছেন সুয়াইদ ইবনে নাসর, তিনি বলেন, আমাদের কায়স ইবনে মুসলিম থেকে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আম্বারি আমাদেরকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আলকামা ইবনে ওয়াইল আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার নিকট হাদিস বর্ণনা করেছেন ...।'

পিতা কর্তৃক তাঁর নিকট হাদিস বর্ণনা করার স্পষ্ট বিবরণ এতে আছে। سمعت এবং حدثنى শ্রবণবোধক শব্দ। ইমাম বোখারি (র.)-ও এ হাদিসটি নিজ جزء رفع اليدين ১ - বর্ণনা করেছেন এ এভাবে,

حدثنا ابو نعيم الفضل بن ركين انبأنا قيس بن سليم العنبرى قال سمعت علقمة بن حجر حدثنى ابى ـ الخ وائل بن

'আমাদের নিকট আবু নুআইম আল-ফজল ইবনে রুকাইন হাদিস বর্ণনা করছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে কায়স ইবনে সুলায়ম আল-আম্বারি হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি শুনেছি আলকামা ইবনে ওয়াইল ইবনে হুজর থেকে। তিনি বলেছেন, আমাকে আমার পিতা হাদিস বর্ণনা করেছেন।'

এমন বর্ণনা আরও অনেক রয়েছে, যেগুলো দ্বারা আলকামার পিতা থেকে তাঁর শ্রবণ প্রমাণিত হয়।

(দ্রষ্টব্য : আছারুস্ সুনান : ৯৯)

মোদ্দাকথা, নিঃসন্দেহে আলকামার শ্রবণ তাঁর পিতা ওয়াইল ইবনে হুজর থেকে প্রমাণিত।

সুফিয়ান সাওরির বর্ণনার প্রাধান্যতার কারণসমূহ ও এগুলোর জবাব

ইমাম তিরমিযী (র.) সুফিয়ানের বর্ণনার একজন সমর্থকও উল্লেখ করেছেন। তিনি হলেন, আলা ইবনুস সালেহ আল-আসাদি। কিন্তু এ প্রাধান্যের কারণ এজন্য যথেষ্ট নয় যে, আলা ইবনুস সালেহ[২] সর্বসম্মতিক্রমে জয়িফ এজন্য তার متابعت গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় প্রাধান্যের কারণ এ বর্ণনা করা হয় যে, আলা ইবনুস সালিহ ব্যতিত মুহাম্মদ ইবনে সালামা ইবনে কুহায়ল[৩] এবং আলি ইবনে সালেহ[৪] ও সুফিয়ানের মুতাবা'আত করেছেন।

তার জবাব হলো, মুহাম্মদ ইবনে সালামা খুবই জয়িফ। ইমাম জাহাবি (র.) বর্ণনা করেন, আল্লামা জাওজেজানি (র.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন,

ذاهب واهى الحديث[৫] (তার হাদিস জয়িফ।)

তাঁর متابعت কাজেই ধর্তব্য হতে পারে না। আর আলি ইবনে সালিহ নিঃসন্দেহে নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তাহকিক হলো, তাঁর বর্ণনা শুধু আবু দাউদে বিদ্যমান আছে। তার সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার (র.) 'আত্ তালখিসুল হাবির ফি তাখরীজির রাফিইয়িল কাবির' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, বস্তুত আবু দাউদের বর্ণনায় আলি ইবনে সালেহের নাম উল্লেখের ব্যাপারে কোনো লিপিকার অথবা বর্ণনাকারি থেকে ভুল হয়ে গেছে। মূলত তিনি

টীকা- ১. আছারুস্ সুনান : ৯৯

টীকা. ২. 'আছারুস্ সুনানে' আল্লামা নিমবি : ৯৮, বলেছেন, 'আলা ইবনুস সালেহ নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত নন।' তাকরিবে বলেছেন, তিনি সত্যবাদী। তবে তাঁর অনেক ভুল-সংশয় হয়। 'মিজানে' জাহাবি বলেছেন, আবু হাতেম বলেছেন, 'তিনি ছিলেন, শীয়াদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। ইবনুল মাদিনা বলেছেন, তিনি অনেক মুনকার হাদিস বর্ণনা করেছেন।'

টীকা. ৩. দারাকুতনি : ১/৩৩৩-৩৩৪, باب التامين فى الصلوة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها والبيهقى جا صـ٥٧، باب جهر الامام بالتامين

টীকা. ৪. সুনানে আবু দাউদ : ১/১৩৫, باب التامين ورا ء الامام

টীকা. ৫. আছারুস্ সুনান : ৯৮

আলা ইবনুস সালেহই ছিলেন। যাকে ভুলক্রমে আলি ইবনুস্ সালেহ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর প্রমাণ আল্লামা নিমবি (র.) 'আছারুস্ সুনান' (পৃষ্ঠা : ৯৮-৯৯) বর্ণনা করেছেন যে, এ তিনটি সূত্রে বর্ণনাটি বর্ণিত। তিরমিযীতে তাঁর সনদ হলো এই,

عن محمد بن ابان عن ابن نمير عن العلاء ابن صالح عن سلمة بن كهيل .

আর এক সনদ হলো মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে– عن ابن نمير عن العلاء ابن صالح

আবু দাউদে এর সনদ হলো,

عن مخلد بن خالد الشعيرى نا ابن نمير نا على بن صالح عن سلمة عن كهيل .

এর থেকে স্পষ্ট হলো যে, এ তিনটি বিবরণ নির্ণয় করে আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইরের ওপর এবং তাঁর দুই শিষ্য অর্থাৎ, মুহাম্মদ ইবনে আবান ও আবু বকর ইবনে আবু শায়বা উল্লেখ করেন তাঁর উস্তাদের নাম আলা ইবনুস সালেহ। কিন্তু শুধু মাখলাদ ইবনে খালেদ আশ্-শুআইরি তাঁর নাম আলি ইবনে সালেহ উল্লেখ করেন। বস্তুত এ বিষয়টি সিদ্ধান্তকৃত যে, মুহাম্মদ ইবনে আবান ও আবু বকর ইবনে আবু শাইবা দু'জন শু'আইবের তুলনায় বড় হাফেজ। কাজেই তাঁদের বর্ণনার প্রাধান্য হবে। এর দ্বিতীয় প্রমাণ এটাও যে, ইমাম বায়হাকি (র.) নিজ সুনানে সুফিয়ানের বর্ণনার অনেক মুতাবে' উল্লেখ করার বহু চেষ্টা করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি আলা ইবনুস্ সালেহ এবং মুহাম্মদ ইবনে সালামা ব্যতিত অন্য কোনো মুতাবে' পেশ করতে পারেননি। যদি আলি ইবনুস্ সালেহও সুফিয়ানের মুতাবাআত করতেন তাহলে অবশ্যই তিনি তা উল্লেখ করতেন। অতএব, স্পষ্ট এটাই যে, এ বর্ণনার রাবি আলি ইবনুস সালেহ নন; বরং আলা ইবনুস সালেহ।

তা ব্যতিত আলা ইবনুস্ সালেহ জয়িফ। তাই শো'বার বিপরীতে তাঁর متابعت ধর্তব্য নয়।

শাফেয়িগণ সুফিয়ানের বর্ণনার প্রাধান্যের তৃতীয় কারণ এ বর্ণনা করেন যে, স্বয়ং শু'বার এক বর্ণনা দ্বারা এর সহায়তা হয়। ইমাম বায়হাকি (র.)[১] শো'বা থেকে এমন একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যাতে خفض بها صوته-এর স্থলে এসেছে رافعا بها صوته শব্দ।

'আছারুস্ সুনানে' এর জবাব আল্লামা নিমবি (র.) এ দিয়েছেন যে, বায়হাকির এ বর্ণনাটি শাজ। কারণ, এ বর্ণনাটি ডজন ডজন সূত্রে শো'বা থেকে বর্ণিত। তার মধ্যে শুধু বায়হাকির বর্ণনায় رافعا بها صوته শব্দ এসেছে। কিন্তু অন্য সব ইমাম ও হাফেজে হাদিসগণ তাঁর থেকে خفض بها صوته বর্ণনা করেন। অতএব, এ বর্ণনাটি শাজ হওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্য নয়।

সহায়তায় হজরত আবু হুরায়রা (রা.) এর একটি বর্ণনাও সুফিয়ানের বর্ণনার পেশ করা হয় যেটি ইবনে মাজায়[২] বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

ترك الناس التامين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين حتى يسمعها اهل الصف الاول فيرتج بها المسجد .

'লোকজন আমিন বলা পরিত্যাগ করেছে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন غير المغضوب عليهم ولا الضالين বলতেন, তখন তিনি আমিন বলতেন। এমনকি প্রথম কাতারের লোকজন তা শুনতো। ফলে মসজিদে সৃষ্টি হতো গুঞ্জন।'

টীকা. ১. সুনানে কুবরা বায়হাকি : ২/৫৮, باب جهر الامام بالتمين

টীকা. ২. পৃষ্ঠা : ৬১, باب الجهر بامين

এ হাদিসটির কেন্দ্রবিন্দু হলেন বিশর ইবনে রাফে', সর্বসম্মতিক্রমে যিনি জয়িফ। আল্লামা নিমবি (র.) 'আছারুস্ সুনানে' (পৃষ্ঠা : ৯৫) হাফেজ ইবনে আব্দুল বার (র.)-এর বক্তব্য তাঁর গ্রন্থ 'আল-ইনসাফ' থেকে বর্ণনা করেছেন,

اتفقوا على انكار حديث وطرح ما رواه وترك احتاج به لا يختلف علماء الحديث فى ذلك ـ

'তাঁর হাদিস প্রত্যাখ্যান করা, বর্জন করা এবং তা দ্বারা প্রমাণ পেশ না করার ব্যাপারে সবাই একমত হয়েছেন। হাদিস বিশারদগণ কোনো মতবিরোধ এ ব্যাপারে রাখেন না।'

প্রাধান্যের চতুর্থ কারণ এ বর্ণনা করা হয় যে, সুফিয়ান সাওরি শো'বা থেকেও বড় হাফেজ। স্বয়ং শু'বা এর স্বীকারোক্তি করেছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ বক্তব্য রয়েছে, سفيان احفظ منى (সুফিয়ান আমার চেয়ে বড় হাফেজ।)

এর জবাব হলো, নিঃসন্দেহে শো'বার এ বক্তব্য প্রমাণিত এবং এ বক্তব্যটি সুফিয়ানের বর্ণনার প্রাধান্যের কারণ হতে পারে। কিন্তু শুধু এ একটি প্রাধান্যের কারণ সেসব প্রাধান্যের কারণের মুকাবেলা করতে পারে না, যেগুলো রয়েছে শো'বার বর্ণনায়।

শো'বার বর্ণনার প্রাধান্যের কারণগুলো

১. সুমহান ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও সুফিয়ান সাওরি কখনও কখনও তাদলিসও করতেন। তার পরিপন্থি শো'বা এটাকে জিনা অপেক্ষাও মারাত্মক মনে করতেন। তাঁর প্রসিদ্ধ বক্তব্য রয়েছে– لان اخر من السماء احب الى من ان ادلس (তাদলিস করার চেয়ে আসমান থেকে পড়ে যাওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয়।) তাঁর চূড়ান্ত সতর্কতা এর দ্বারা বোঝা যায়।

২. যদিও সুফিয়ান সাওরি আমিন জোরে বলার রাবি কিন্তু স্বয়ং তাঁর মাজহাব শো'বার বর্ণনা অনুযায়ী আমিন আস্তে পড়া।

৩. শো'বার বর্ণনা কোরআনের অধিক অনুকূল। কোরআনে আছে, ادعوا ربكم تضرعا وخفية (তোমাদের প্রভুর নিকট দোয়া করো বিনয়ের সাথে ও গোপনে।)

তা ছাড়া আমিনও এক প্রকার দোয়া। যার প্রমাণ হলো কোরআনে বলা হয়েছে, قد اجيبت دعوتكما (নিশ্চয় তোমাদের দোয়া কবুল করা হয়েছে।) অথচ হজরত হারুন (আ.) শুধু বলেছিলেন আমিন।

অন্য কোনো কোনো বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারাও শো'বার বর্ণনার সহযোগিতা হয়। হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর প্রসিদ্ধ হাদিস রয়েছে,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين ـ الخ [1]

'রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করছেন, ইমাম যখন غير المغضوب عليهم ولا الضالين বলে, তখন তোমরা আমিন বলো।'

এতে আমিন বলার জন্য সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে ইমামের ولا الضالين বলা। যদি জোরে আমিন পড়া উত্তম হতো, তাহলে স্বয়ং ইমামের আমিন বলার কথা উল্লেখ করা হতো। অতএব, এ বর্ণনা স্পষ্টভাবে আমিন আস্তে পড়ার দলিল।

টীকা. ১. আবু দাউদ : ১৩৪-১৩৫, باب التامين وراء الامام

এর জবাবে এর পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে (باب ماجاء فی فضل التامین) বর্ণিত হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা পেশ করা হয়– اذا امن الامام فامنوا কিন্তু এতে স্পষ্ট ভাষায় জোরে আমিন পড়ার কথা নেই; বরং বলা হয়েছে আমিন তখন বলা উচিত যখন ইমাম আমিন বলবেন, আর পেছনের হাদিসে বর্ণনা এর পদ্ধতি করা হয়েছে যে, ولا الضالين বলার পর আমিন বলবে। কারণ, ইমাম তখনই আমিন বলেন। তাহলে বস্তুত পেছনের বর্ণনাটি এ বর্ণনার ব্যাখ্যা, আর হানাফিদের মাজহাবের সহায়তা উভয়ের সমষ্টি দ্বারা হয়েছে।

দ্বিতীয় বর্ণনা যা দ্বারা শো'বার বর্ণনার সহায়তা হয়, পরবর্তী অনুচ্ছেদের সাথে সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে বর্ণিত, (باب ما جاء فی السکتتین) হজরত সামুরা (রা.) হতে হাদিস বর্ণিত আছে,

قال سکتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكر ذلك عمران ابن حصين قال حفظنا سكتة فكتبنا الى ابى ابن كعب (رض) بالمدينة فكتب الى ان حفظ سمرة . قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال اذا دخل فى صلوته واذا فرغ من القرائة قال بعد ذلك واذا قرأ ولا الضالين .

'তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দুটি নীরবতা স্মরণ রেখেছি। তারপর ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) তা অস্বীকার করলেন, তিনি বললেন, আমরা একটি নীরবতার কথা স্মরণ রেখেছি। অতএব, আমরা মদিনা মুনাওয়ারায় উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর নিকট চিঠি লিখলাম। উবাই (রা.) জবাবে লিখলেন যে, সামুরা ঠিকই স্মরণ রেখেছে। সায়িদ বলেছেন, আমরা তারপর কাতাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে নীরবতা দুটি কী? জবাবে তিনি বললেন, যখন তিনি নামাজে প্রবেশ করেন এবং যখন কেরাত থেকে অবসর হন। এরপর তিনি বলেছেন, আর যখন ولا الضالين শেষ করেন।'

এ থেকে বোঝা গেলো, ولا الضالين-এর পরে নীরবতা অবলম্বন করা হতো। যদি আমিন জোরে জোরে হতো তাহলে এ নীরবতার কোনো অর্থ হতো না। তাছাড়া আরও বর্ণনা এর সহায়তায় পেশ করা যায়।

৫. সুফিয়ানের বর্ণনাকে যদি জোরে বলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরে গ্রহণ করা হয়, তাহলে সুফিয়ানের বর্ণনাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হয়। এর পরিপন্থি যদি শো'বার বর্ণনা গ্রহণ করা হয় তাহলে সুফিয়ানের বর্ণনাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হয় না; বরং এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে। যেমন একটি ব্যাখ্যা হতে পারে এ যে, مد بها صوته দ্বারা জোরে পড়া উদ্দেশ্য নয়; বরং মদের হরফ তথা আমিনের আলিফ এবং ইয়াকে টেনে পড়া।

এই ব্যাখ্যার ওপর শাফেয়িদের পক্ষ থেকে এ প্রশ্ন হয়, যে, আবু দাউদে مد بها صوته -এর স্থানে رفع بها صوته[১] এসেছে এবং আলি ইবনে সালেহের বর্ণনায় এসেছে فجهر بامين[১]

তার জবাব হলো, رفع بها صوته তে সে ব্যাখ্যাই করা যায় مد তে করা যা হয়েছে এবং এটাও সম্ভব যে, আসল বর্ণনা مد بها صوته আর সুফিয়ানের কোনো শিষ্য এটাকে জোরে পড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরে অর্থগতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন।

অবশিষ্ট থাকলো দ্বিতীয় বর্ণনা, যাতে এসেছে جهر بامين শব্দ। এ সম্পর্কে পেছনে বলা হয়েছে যে, এটি মূলত আলা ইবনুস সালেহের বর্ণনা, যিনি জয়িফ। আর যদি এটাকে বিশুদ্ধ মেনে নেওয়া এটি অর্থগতভাবে হয় তখনও বিবরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

টীকা- ১. আবু দাউদ : ১৩৫, باب التامين وراء الامام

প্রশ্ন : শাফেয়িদের পক্ষ থেকে এ ব্যাখ্যার ওপর আরেকটি প্রশ্ন করা হয়, হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা আবু দাউদে[১] এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تلا غير المغضوب عليه ولا الضالين قال امين حتى يسمع من يليه من الصف الاول ـ

যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন غير المغضوب عليهم ولا الضالين তেলাওয়াত করতেন, তখন আমিন বলতেন। এমনকি প্রথম কাতারে অবস্থিত নিকটবর্তী মুসল্লিগণ তা শুনতেন।'

বর্ণনাটিতে মদের হরফকে টেনে পড়ার ব্যাখ্যা চলতে পারে না।

জবাব : এ বর্ণনাটি বর্ণিত বিশর ইবনে রাফে থেকে। যাঁর সম্পর্কে পূর্বে লেখা হয়েছে যে, তিনি মুহাদ্দিসিনের সর্বসম্মতিক্রমে জয়িফ। তাছাড়া ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ আল-কাত্তান বলেছেন যে, বিশর ইবনে রাফে-এর উস্তাদ আবু আবদুল্লাহ ইবনে আম্মে আবু হুরায়রা অজ্ঞাত। অতএব, সনদগতভাবে এ বর্ণনাটি নির্ভরযোগ্য নয়। তাছাড়া এর মূলপাঠেও বৈপরীত্য আছে। কারণ, তাতে একদিকে বলা হয়েছে, আমিন শুধু প্রথম কাতারের সেসব লোক শুনতেন যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটতম। কিন্তু সুনানে ইবনে মাজায়ও[২] এ বর্ণনাটি এসেছে। তাতে এসেছে فيرتج بها المسجد (মসজিদে এর গুঞ্জন শুরু হতো।) শব্দ। এটি পূর্বে বলা হয়েছে। উভয়টির বৈপরীত্য স্পষ্ট। অতএব, এ বর্ণনা বা দেরায়াত কোনো ভাবেই বিবরণটির ওপর নির্ভর করা যেতে যায় না।

৬. আর যদি মেনে নিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কখনও জোরে আমিন বলা প্রমাণিত আছে– তবে তাতে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি আমিন জোরে বলেছেন সাহাবিগণকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে, যেমন বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কোনো সময় আস্তে কেরাতবিশিষ্ট নামাজেও এক-আধটি শব্দ কেরাতে জোরে পড়ে ফেলতেন, যাতে লোকজন জানতে পারে তিনি কি পড়ছেন। বিশেষতো হজরত ওয়াইল ইবনে হুজর ছিলেন ইয়ামানের অধিবাসী। তিনি দু'একবার শুধু মদিনা তাইয়িবায় এসেছেন। এজন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমিন জোরে বলেছেন তাঁকে শোনানোর উদ্দেশে, এটাও কোনো অযৌক্তিক নয়। এর সহায়তা সে হাদিস দ্বারাও হয়, যেটি 'কিতাবুল আসমা ওয়াল কুনা'তে হাফেজ আবু বিশর আদ্ দোলাবি (র.) বর্ণনা করেছেন। ওয়াইল ইবনে হুজ্‌র এ বর্ণনায় বলেন,

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من الصلوة حتى رأيت خده من هذا الجانب ومن هذا الجانب وقرأ (أى فى الصلوة) غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال امين يمدبها صوته ما اراه الا ليعلمنا ـ

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি দেখেছি, তিনি যখন নামাজ থেকে অবসর হয়েছেন, এমনকি আমি তাঁর গণ্ড মোবারক এদিক থেকে ওদিক থেকে দর্শন করেছি এবং তিনি (নামাজে) غير المغضوب عليهم ولا الضالين পড়েছেন। তারপর আমিন বলেছেন জোরে। আমার ধারণা তিনি কেবলমাত্র আমাদের শিখানোর জন্য করেছেন।'

'আছারুস্ সুনানে' আল্লামা নিমবি (র.) এ হাদিসটি বর্ণনা করে বলেন, قلت فيه يحيى بن سلمة قواه الحاكم وضعفه جماعة (আমি বলবো, তাতে রয়েছেন ইয়াহইয়া ইবনে সালামা নামক একজন রাবি। হাকেম তাকে শক্তিশালী বলেছেন, আর তাঁকে একদল লোক জয়িফ আখ্যা দিয়েছেন।

টীকা. ১. ১/১৩৫, باب التامين وراء الامام

টীকা. ২. পৃষ্ঠা : ৬১, باب الجهر بامين

যদি এটি জমহুরের বক্তব্য অনুযায়ী জয়িফও হয় তবেও এটি সহায়কের চেয়ে নিম্নস্তরের বর্ণনা নয়। তাছাড়া সুনানে নাসায়িতে[১] হজরত ওয়াইল (রা.)-এর বর্ণনায় নিম্নেযুক্ত শব্দগুলোও রয়েছে,

فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين فسمعته وانا خلفه ـ

'যখন তিনি غير المغضوب عليهم ولا الضالين পড়লেন, তখন আমিন বললেন। আমি পেছনে থেকে তা শুনেছি।'

এ থেকে বোঝা গেলো যে, এটি এমন জোরে ছিলো না, যেমন শাফেয়ি মতাবলম্বী প্রমুখদের নিকট অভ্যাসে পরিণত হয়েছে; বরং এমন জোরে ছিলো যেমন তিনি তা'লিমের জন্য কখনও পড়তেন। 'আছারুস সুনানে' আল্লামা নিমবি (র.) লিখেন,

قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد في باب قنوت النوازل فاذا جهر به الإمام احيانا ليعلم به المأمومين فلا بأس بذلك فقد جهر عمر (رض) بالإفتتاح ليعلم المأمومين وجهر ابن عباس بقرائة الفاتحة في صلوة الجنازة ليعلمهم انها سنت ـ ومن هذا ايضا جهر الامام بالتأمين وهذا من الإختلاف المباح الذى لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه ـ

'জাদুল মা'আদে' হাফেজ ইবনুল কাইয়িম (র.) বাবু কুনূতিন নাওয়াজিলে লিখেছেন, ইমাম কোনো কোনো সময় মুকতাদিদেরকে শিখানোর জন্য জোরে আমিন বললে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। লোকজনকে শিখানোর জন্য উমর (রা.) শুরুতে জোরে পড়েছেন। ইবনে আব্বাস (রা.) জানাজার নামাজে ফাতেহা জোরে জোরে পড়েছেন। যাতে তিনি লোকজনকে শিক্ষা দিতে পারেন এটি তার সুন্নত। ইমাম কর্তৃক আমিন জোরে বলাও এর অন্তর্ভুক্ত। এটা হলো বৈধ ইখতেলাফ, এটা করলে বা ছেড়ে দিলে কঠোরতা আরোপ বা শক্তভাষা ব্যবহার করা যায় না।'

এমনকি হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও শিখানোর উদ্দেশে জোরে اعوذ بالله পড়া প্রমাণিত আছে। যেমন আল্লামা নিমবি (র.) তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, কোনো কোনো সময় সাহাবায়ে কেরামও শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশে জোরে পড়তেন। এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিলো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল দেখে। অতএব, প্রমাণিত হলো যে মুক্তাদিদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য কখনও কখনও জোরে আমিন বলা হতো।

এ বিষয়টিও গভীরভাবে লক্ষণীয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ নিয়ম যদি জোরে আমিন পড়া হতো তাহলে সমস্ত সাহাবি এটা দিনে পাঁচবার শুনতেন এবং তা মুতাওয়াতিরের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যেতো। কিন্তু আমরা দেখছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জোরে আমিন পড়ার বিবরণদাতা হজরত ওয়াইল ইবনে হুজর ব্যতিত আর কেউ নন। আবার তাঁর বর্ণনাটিতেও বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যার সম্ভাবনা আছে এবং স্বয়ং তাঁর থেকে শো'বা আস্তে পড়ার কথা বর্ণনা করেছেন। এটা কি আমিন আস্তে পড়া উত্তম হওয়ার একটি শক্তিশালী দলিল নয়?

৭. শো'বার বর্ণনা প্রাধান্যের আর একটি কারণ হলো, বর্ণনাগুলোর মাঝে বিরোধের সময় সাহাবায়ে কেরামের আমল একটি ব্যাপক সীমা পর্যন্ত সিদ্ধান্তকারি হয়ে থাকে। আর সাহাবির আমল দ্বারাও শো'বার বর্ণনা সাহাবির আমল দ্বারাও সহায়তাপ্রাপ্ত। ইমাম তাহাবি (র.) আবু ওয়াইলের হাদিস বর্ণনা করেছেন,

---

টীকা. ১. ১/৪৭, قول المأموم اذا عطس خلف الامام

قال كان عمر (رض) وعلى (رض) لا يجهر ان بسم الله الرحمن الرحيم بالتعوذ ولا بالتأمين ـ ١

'তিনি বলেছেন, বিসমিল্লাহ, আউজুবিল্লাহ, আমিন কোনোটিই উমর ও আলি (রা.) জোরে পড়তেন না।'

প্রশ্ন : এ বর্ণনাটির কেন্দ্রবিন্দু আবু সায়িদ বাক্কাল। তিনি মুহাদ্দিসিনের নিকট জয়িফ।

জবাব : আবু সাইদ বাক্কাল একজন বিতর্কিত রাবি। যদিও অনেকে তাঁকে জয়িফ বলেছেন, কিন্তু কোনো কোনো মুহাদ্দিস আলেম যেমন ইবনে জুরাইজ, হাকিম, আবু জুরআ তাঁকে নির্ভরযোগ্যও বলেছেন। মাজমাউজ জাওয়ায়িদে আল্লামা হায়সামি (র.) তাঁর সম্পর্কে লিখছেন, ثقة مدلس তথা নির্ভরযোগ্য মুদাল্লিস।

ফাতহুল বারিতে হাফেজ ইবনে হাজার (র.)ও আবু সায়িদ বাক্কালের ওপর নির্ভরশীল একটি বর্ণনা সম্পর্কে 'হাসান' বলে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইলালে কুবরা'য় ইমাম তিরমিযী (র.) ইমাম বোখারি (র.) এর বক্তব্য বর্ণনা করেছেন, هو مقارب الحديث।

এ থেকে বোঝা গেলো যে, ইমাম বোখারি (র.) -এর নিকটে তিনি নির্ভরযোগ্য। অতএব, তাঁর হাদিস হাসান অপেক্ষা নিম্নপর্যায়ের নয়। এমনভাবে হজরত উমর (রা.) -এর হাদিস রয়েছে,

اربع يخفين عن الامام التعوذ و بسم الله الرحمن الرحيم وامين واللهم ربنا ولك الحمد ـ ٢

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সম্পর্কেও এমনভাবে সহিহ সনদে প্রমাণিত আছে যে, তিনি আমল করতেন আমিন আস্তে পড়ার ওপর।[৩] এমনভাবে হজরত উমর, হজরত আলি, হজরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ন্যায় মহান ফুকাহায়ে কেরাম থেকে আমিন আস্তে পড়া প্রমাণিত হয়। অথচ এর বিপরীত কোনো সাহাবি থেকে আমিন জোরে পড়ার আমল বর্ণিত নেই। শুধু আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র সম্পর্কে তিনি আমিন জোরে বলতেন তাঁর খিলাফত কালে।[৪]

প্রথমতো হজরত উমর, আলি ও ইবনে মাসউদ (রা.)-এর আছরগুলোর মুকাবেলা করতে ইবনে জুবাইরের আছর পারে না। দ্বিতীয়তো কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়রের জামানায় আমিন পড়া বিদআত মনে করে সম্পূর্ণভাবে তা বর্জন করেছিলো। এমন লোককে রদ করতে গিয়ে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র (রা.) জোরে আমিন বলতে আরম্ভ করেছেন, এটাও যুক্তির বহির্ভূত কোনো বক্তব্য নয়।

এখন কথা হলো, কোনো সাহাবি থেকে জোরে আমিন প্রমাণিত নয় হজরত ইবনে জুবায়র এবং ওয়াইল ইবনে হুজর ব্যতিত, না বাচনিক না কর্মগত। অথচ তাঁদের দুজনের বর্ণনাতেও ব্যাখ্যার সম্ভাবনা আছে, যেমন পেছনে বলা হয়েছে। এটা কি এর অকাট্য প্রমাণ নয় যে, আমিন আস্তে পড়া উত্তম, জোরে পড়া উত্তম নয়।

* শাফেয়িগণ বায়হাকিতে বর্ণিত হজরত আতার আছর দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেন। তিনি বলেন,

ادركت مأتين من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا المسجد اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين سمعت لهم رجة بامين ـ

টীকা. ১. শরহে মা'আনিল আছার : ১/৯৯, باب قرائة بسم الله الرحمن الرحيم فى الصلوة

টীকা- ২. কানজুল উম্মাল : ৪/২৪৯ كتاب الصلوة من قسم الافعال، ادب الماموم وما يتعلق به ـ بحواله ابن جزير

টীকা- ৩. মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ২/১০৮

টীকা- ৪. দ্রষ্টব্য মা'আরিফুস্ সুনান : ২/৪১৯, فى بقية بحث التامين واسراره

টীকা- ৫. সুনানে কুবরা -বায়হাকি : ২/৫৯, باب جهر الماموم بالتامين

'এই মসজিদে আমি দুইশত সাহাবিকে পেয়েছি, যখন ইমাম غير المغضوب عليهم ولا الضالين বলেন, তখন শুনতাম তাঁদের আমিনের উচ্চ আওয়াজ।'

এর জবাবে হজরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, এ আছরটি মা'লুল। কেনোনা, হজরত আতা (র.)-এর দুইশ' সাহাবির সাথে সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয়।

হজরত হাসান বসরি (র.) তাঁর চেয়ে বয়সে বড়, তা সত্ত্বেও তাঁর সাথে মাত্র একশ বিশজন সাহাবির সাক্ষাৎ হয়েছে। তাছাড়া হজরত আতা (র.)-এর মুরসালগুলো জয়িফতম মুরসাল। যেমন 'তাদরিবুর রাবি'তে আল্লামা সুয়ুতি (র.) এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা লিখেছেন।

এসব প্রশ্নোত্তরের পর এটাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এ মাসআলায় মতপার্থক্য শুধু উত্তমতার। অন্যথায় উভয় পদ্ধতির বৈধতা সম্পর্কে উভয়দল একমত। অতএব, কোনোক্রমেই এটাকে ঝগড়ার কারণে পরিণত করা জায়েজ হবে না।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ فَضْلِ التَّامِيْنِ (صـ ٥٨)

অনুচ্ছেদ- ৭১ : আমিন বলার ফজিলত (মতন ৫৮)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَامِيْنُهُ تَامِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২৫০. **অর্থ :** আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ইমাম যখন আমিন বলে তোমরা তখন আমিন বলো। কারণ, যার আমিন ফেরেশতাদের আমিনের অনুকূল হয়, তার পূর্ববর্তী গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَاجَاءَ فِى السَّكْتَتَيْنِ (صـ ٥٩/٥٨)

অনুচ্ছেদ- ৭২ : দুটি নীরবতা প্রসঙ্গে (মতন ৫৮/৫৯)

عَنْ سَمُرَةَ (رض) قَالَ سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَاَنْكَرَ ذٰلِكَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ (فى ن ب "و") قَالَ حَفِظْنَا سَكْتَةً فَكَتَبْنَا اِلٰى اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَكَتَبَ اُبَيٌّ اَنْ حَفِظَ سَمُرَةُ قَالَ سَعِيْدٌ فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ مَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ؟ قَالَ اِذَا دَخَلَ فِى صَلٰوتِهِ وَاِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَائَةِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّآلِّيْنَ قَالَ وَكَانَ يُعْجِبُهُ اِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَائَةِ اَنْ يَّسْكُتَ حَتّٰى يَتَرَادَّ اِلَيْهِ نَفْسُهُ .

২৫১. অর্থ : হজরত সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দুটি নীরবতার কথা স্মরণ রেখেছি। হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) এটি অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, আমরা স্মরণ রেখেছি একটি নীরবতার কথা। তারপর আমরা চিঠি লিখলাম, মদিনা মুনাওয়ারায় উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর নিকট। জবাবে তিনি লিখলেন, সামুরা ঠিক মতোই মনে রেখেছেন। সায়িদ বলেছেন, আমরা কাতাদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে দুটি নীরবতা কি? তিনি বললেন,

১. নামাজে যখন প্রবেশ করবে।

২. কেরাত যখন থেকে অবসর হবে। তারপর তিনি বললেন, আর যখন ولا الضالين পড়বে। তিনি বলেছেন, কেরাত থেকে অবসর হওয়ার সময় ভালোরূপে নিঃশ্বাস নেওয়া পর্যন্ত নীরবতা অবলম্বনকে তিনি পছন্দ করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেছেন, আবু হুরায়রার হাদিসটি حسن। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তাঁরা ইমামের জন্য নামাজ শুরু করার পর এবং নামাজ থেকে অবসর হওয়ার নীরবতাকে মোস্তাহাব মনে করেন। আহমদ ও ইসহাক এবং আমাদের সঙ্গীগণ এ মতই পোষণ করেন।

দরসে তিরমিযী

فقلنا لقتادة ماهاتان السكتتان : ফাতেহা পড়ার আগে একবার নীরবতা সর্বসম্মত বিষয়, যাতে সানা পড়া হতো। এর পরিপন্থি শুধু ইমাম মালেক (র.)-এর একটি বর্ণনা। দ্বিতীয় নীরবতা হলো, সূরা ফাতেহার পর। হানাফিদের মতে আমিন বলা হবে আস্তে। শাফেয়ি ও হাম্বলিদের মতে শুধু নীরব থাকবে। তৃতীয় আরেকটি নীরবতা হলো, কেরাতের পর রুকুর পূর্বে, যা হয়ে থাকে শ্বাস ঠিক করার জন্য। এ নীরবতাকে শাফেয়ি এবং হাম্বলিগণ মোস্তাহাব সাব্যস্ত করেন। হানাফিদের মধ্য হতে আল্লামা শামি (র) এ তাফসিল বর্ণনা করেছেন, যদি কেরাতের সমাপ্তি আল্লাহর উত্তম নামগুলোর মধ্য হতে কোনো একটির ওপর হয়, যেমন, وهو العزيز الحكيم। তাহলে নীরবতা মোস্তাহাব নয়; বরং এটাকে উত্তম তাকবিরের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া। আর যদি সমাপ্তি অন্য কোনো শব্দের ওপর হয় তাহলে উচিত নীরবতা অবলম্বন করা। কিন্তু মুহাক্কিক হানাফিরা বলেছেন যে, এ তাফসিল শুধু যুক্তিনির্ভর। আলোচ্য হাদিসে হজরত কাতাদা (রা.)-এর একটি বক্তব্য কেরাতের পর নীরবতা সুন্নত প্রমাণ করছে এজন্য উচিত কিয়াসের বিপরীতে এর প্রাধান্য হওয়া উচিত এবং নীরবতাকে মাসনুন মানা।

ثم قال بعد ذلك واذا قرأ ولا الضالين : এখানে প্রশ্ন হয় যে, এখানেতো তিনটি নীরবতা হয়ে গেলো। অথচ ওপরে দ্বিবচনের শব্দ এসেছে, (يعني ما هاتان السكتتان)

অনেকে এর জবাব এ দিয়েছেন যে, বস্তুত واذا قرأ ولا الضالين পূর্বের বাক্য অর্থাৎ, واذا فرغ من القراءة-এরই বয়ান। আর অনেকে বলেছেন, হজরত সামুরা এবং উবাই ইবনে কা'ব (রা.) যে দুই নীরবতার দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন সেগুলো শেষ হয়ে গেছে اذا فرغ من القرائة পর্যন্ত। পরে হজরত কাতাদা واذا قرأ ولا الضالين বলে বর্ণনা করেছেন– নিজের পক্ষ থেকে তৃতীয় আরেকটি নীরবতার কথা।

وهذا اختتام الجزئ الأول من تقرير "جامع الترمذى" المسمى "بدرس الترمذى" لاستاذنا المشفق وشيخنا المدقق ومولانا المحقق محمد تقى العثمانى ـ زاده الله شرفا وكرامة واقبالا وسعادة وافادنا بعلومه الى يوم القيامة ـ ويليه الجزئ الثانى انشاء الله تعالى اوله "باب ماجاء فى وضع اليمين على الشمال فى الصلوة" ـ

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات والصلوة والسلام على سيدنا محمد صاحب المعجزات وعلى اله واصحابه اولى الكمالات صلوة وسلاما دائمين ما تعاقبت الاوقات وتواصلت البركات ضبط ورتبه وخرج احاديثه احقر الأنام رشيد اشرف عافه الله ورعاه التاريخ ٢٧ من شوال المكرم سـ١٣٩٩ هجرى بيوم الجمعة المبارك ـ

"প্রভুর কৃপায় দরসে তিরমিযী প্রথম খণ্ডের সমাপ্তি এখানেই ঘোষণা করলাম।
দ্বিতীয় খণ্ড শুরু হবে সালাত পর্বের বাকি অংশ থেকে।"